1062
c-5

রেফারেন্স পুস্তক
গ্রন্থাগারের বাহিরে নেওয়া নিষেধ

তৃতীয়
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
১৯৮৫-৯০

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

রেফারেন্স পুস্তক
গ্রন্থাগারের বাহিরে নেওয়া নিষেধ

তৃতীয়
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
১৯৮৫-৯০

পরিকল্পনা বিভাগ
A10623
গ্রন্থাগার
C-5
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

ইংরাজী সংস্করণঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৫

বাংলা সংস্করণঃ আগস্ট, ১৯৮৬

পরিকল্পনা বিভাগ গ্রন্থাগার
সংযোজন সংখ্যা 1062.3.
C-5

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
পরিসংখ্যান ভবন বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

মুখবন্ধ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরের বাস্তবায়নকাল ইতিমধ্যেই ১৯৮৫ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয়ে গেছে। দেশের তথ্যাভিজ্ঞ গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবিশেষের সংগে আলোচনার ভিত্তিতে পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য, কৌশল, নীতিমালা ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে একটি সুদূর-প্রসারী মতৈক্যে উপনীত হবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন প্রচেষ্টা চালিয়েছে যার কারণে এর প্রকাশনা সামান্য বিলম্বিত হয়েছে। একটি দরিদ্র দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মতো জটিল একটি বিষয়ের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করাটাই অবাস্তবিক। সেজন্যই যথাসম্ভব সাধারণভাবে স্বীকৃত জাতীয় অগ্রাধিকার, সম্পদের প্রাপ্যতা এবং সম্ভাবনাপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। তা করতে গিয়ে দেশের সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবী মহলকে পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত করা ছাড়াও এধরনের একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে তাঁদের পেশাগত দক্ষতাকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

২। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অধিকতর উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রচেষ্টাকে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে অব্যাহত রাখা হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর কালের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় ক্ষেত্রবিশেষে এটাই ছিল মূল বিষয়বস্তু। অতীতে উন্নয়ন প্রচেষ্টাগুলো সাধারণতঃ অর্থনৈতিকভাবে সমাজের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের দিকে কেন্দ্রীভূত রাখা হতো। সামগ্রীক গ্রামীণ কাঠামোর প্রেক্ষাপটে গৃহীত এধরনের প্রচেষ্টা সাধারণ অর্থে উন্নয়নের 'টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্রোচ' নামে পরিচিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিকল্পিত উন্নয়নের এধরনের পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টা বৈদেশিক অবস্থা এবং দেশে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ব্যাহত হয়েছে।

৩। প্রধানতঃ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নে ব্যর্থতার ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গৃহীত বিপুল সংখ্যক প্রকল্প তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্থানান্তরিত করা হলেও তৃতীয় পরিকল্পনা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একটি প্রধান পুনঃ নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করছে। প্রথমতঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের শেষার্ধে গৃহীত প্রশাসন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ব্যাপক ভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণ ও বিখন্ডিতকরণ প্রক্রিয়া তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সম্পন্ন হবে। এ প্রক্রিয়ার সাফল্যজনক সমাপ্তি নির্ভর করবে সমস্ত প্রশাসনিক ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের উপর। এগুলো নির্মিত হলে স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডে গতি সঞ্চারিত হবে। দ্বিতীয়তঃ উন্নয়নের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী খাতের একটা যুক্তিযুক্ত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যাশা করা যায় যে বেসরকারী খাতে যেসমস্ত শিল্প কারখানা, ক্রিয়াকলাপ ও প্রতিষ্ঠান অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারবে সেগুলো বেসরকারী খাতে ন্যস্ত করা হবে। তৃতীয়তঃ আর্থিক স্থিতিশীলতা

এবং মূল্য স্থিতিবস্থকরণের ব্যাপারেও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হবে, কারণ এগুলো হলো সংরক্ষণবাদ, বাণিজ্য শর্তের ঘন ঘন উঠানামা ও বৈদেশিক সাহায্যের অস্থিতিশীলতার মতো বহিঃস্থ প্রতিকূলতাসমূহের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৪। তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাপক পল্লী উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপসহ শিল্প ও জলসেচ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ, মৌলিক পণ্য ও সেবা উৎপাদন, উচ্চতর হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষার উচ্চহার নিশ্চিতকরণ, উন্নতমানের স্বাস্থ্য সুবিধা ও উচ্চতর পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার অর্জনের পরিমিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। যাই হোক, অনুকূল আবহাওয়া, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, এবং আরো অনুকূল বৈদেশিক পরিস্থিতির মতো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার উপর এই প্রত্যাশা অর্জন বিশেষভাবে নির্ভর করছে। উপরন্তু, বেসরকারী খাতের উপর পরিকল্পনার নির্ভরশীলতা অনেক এবং সেজন্যই পাশাপাশি বেসরকারী খাতের সাফল্যজনক তৎপরতার উপর পরিকল্পনার লক্ষ্যার্জন বহুলাংশে নির্ভর করছে।

৫। একটি পরিকল্পনা তখনই সুন্দর যখন এর বাস্তবায়ন সুষ্ঠু হয়। একটি পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবায়িত হলো এবং জাতির ভাগ্যোন্নয়নে তা কতটুকু অবদান রাখতে পারলো, তা দিয়েই এর সাফল্য পরিমাপ করা যেতে পারে। কেবলমাত্র উত্তম প্রকল্পসমূহের সময়মত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই পরিকল্পনা জাতির উদ্দেশ্যার্জনে সহায়ক হতে পারে। প্রকল্পের দক্ষ বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বদানের পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে যদি আমাদের প্রকল্প প্রণয়নের দক্ষতা ক্রমাগতভাবে শুধু হ্রাসই পেতে থাকে, যা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের জন্য একটি দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হয়ে আসছে, তাহলে পরিকল্পনা নিজেই তার শক্তি ও আয়ু হারাতে বাধ্য। মধ্যমেয়াদী যে কোন পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দেশক কর্মসূচী মাত্র, সময়ের পরিসরে তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা জরুরী হয়ে পড়ে। পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কেবলমাত্র জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সম্ভব হতে পারে এবং তৃতীয় পরিকল্পনা তা সর্বান্তঃকরণে প্রত্যাশা করছে।

৬। মন্ত্রিপরিষদে আমার সহকর্মীবৃন্দ এবং মন্ত্রণালয় ও এজেন্সীসমূহের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আমি যে সহযোগিতা পেয়েছি তা অবশ্যই উল্লেখের দাবীদার। পরিকল্পনাবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, সামাজিক চিন্তাবিদ, উন্নয়ন প্রশাসকমন্ডলী এবং বিভিন্ন খাতে উদ্যোক্তাদের অব্যাহত সহযোগিতার পাশাপাশি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবর্গ ও কর্মকর্তামন্ডলী যে নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাও আমাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হচ্ছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, যিনি পরিকল্পনা কমিশনেরও চেয়ারম্যান তাঁর সহৃদয় সমর্থন, উৎসাহ এবং পরিচালনার মাধ্যমে তৃতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে আমাদের সুপ্রচুর প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর কাছেও আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

৭। অতীতে আমরা জনগণের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে পুরোপুরিভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারিনি। কিন্তু এর জন্য এ যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের শিখিয়েছে যে, একাগ্রতা থাকলে সবরকমের প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবো। আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হয়ে আমরা যেমন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছি, ঠিক একইভাবে এই জাতি সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতেও তেমনিই সফলকাম হবে।

স্বাক্ষরিত

(সুলতান আহমেদ চৌধুরী)
বার-এ্যাট-ল
পরিকল্পনামন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩-১২-১৯৮৫

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অধ্যায়সমূহ — পৃষ্ঠা

প্রথম পর্ব: সার্বিক অধ্যায়সমূহ

১। পরিকল্পিত উন্নয়ন পর্যালোচনা — ১
২। তৃতীয় পরিকল্পনার সমষ্টিগত অর্থনৈতিক রূপরেখা — ৩৯
৩। অভ্যন্তরীণ সম্পদসমূহ — ৬১
৪। বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এবং বহিঃসম্পদ — ৮১
৫। কর্মসংস্থান, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি — ১০৯
৬। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রশাসন — ১২৩
৭। বেসরকারী খাতের উন্নয়ন — ১৩৭
৮। উপজেলা উন্নয়ন — ১৪৭

দ্বিতীয় পর্ব: খাতওয়ারী অধ্যায়সমূহ

৯। খাদ্য, কৃষি পানিসম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন — ১৫৩
১০। শিল্প ও খনিজ সম্পদ — ২৩৭
১১। জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ — ২৭৭
১২। পরিবহণ ও যোগাযোগ — ৩০৯
১৩। ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন ও পানি সরবরাহ — ৩৫৫
১৪। শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক — ৩৬৫
১৫। স্বাস্থ্য — ৩৯১
১৬। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা — ৪০৯
১৭। ক্রীড়া, সংস্কৃতি, যুব উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক এবং গণমাধ্যম — ৪৩১
১৮। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা — ৪৫৩
১৯। জনশক্তি ও শ্রম — ৪৬৫
২০। জনপ্রশাসন — ৪৭৭

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিস্তারিত সূচীপত্র

প্রথম পর্বঃ সার্বিক অধ্যায়সমূহ

প্রথম অধ্যায় ঃ পরিকল্পিত উন্নয়ন পর্যালোচনা ১

পরিচ্ছেদ ১ঃ সামগ্রিক পরিস্থিতি ১

পরিচ্ছেদ ২ঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল্যায়ন ৭

-পরিকল্পিত উদ্দেশ্যাবলী ও লক্ষ্যসমূহ ৭

-অর্থনৈতিক অগ্রগতি ৭

-জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ৮

-ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ১০

-আভ্যন্তরীণ সম্পদ পরিস্থিতি ১২

-বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের পরিস্থিতি ১৬

-রপ্তানীর অগ্রগতি ১৮

-আমদানী মাত্রা ১৯

-মুদ্রা, মূল্য ও মজুরী ১৯

-আয় ও কর্মসংস্থান ২১

-বেসরকারী খাত ২২

-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন প্রশাসন ২৪

-প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্গঠন ২৫

-সরকারী খাতে ক্ষতিপূরণ নীতি ২৬

-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতা ২৬

-প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ ২৭

-প্রকল্প বাস্তবায়ন ২৭

-খাতওয়ারী উন্নয়ন ২৯

-খাতওয়ারী বরাদ্দ ও অর্জন ৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তৃতীয় পরিকল্পনার সমষ্টিগত অর্থনৈতিক রূপরেখা ৩৯

-উন্নয়ন পর্যালোচনা ৩৯

-তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ৩৯

		পৃষ্ঠা
	-পরিকল্পনার আকার ও বরাদ্দ	৪৩
	-পরিকল্পনার অর্থ যোগান	৪৪
	-সম্পদ সংগ্রহের কৌশল	৪৪
	-লেনদেন ভারসাম্য কৌশল	৪৫
	-জি ডি পি'র কাঠামো এবং প্রবৃদ্ধি	৪৬
	-খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা	৪৮
	-আয়, ভোগ ও বণ্টন	৫০
	-প্রধান প্রধান খাতওয়ারী ইস্যু ও কৌশলাদি	৫১
	-ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়ন	৫৪
	-পরিকল্পিত ব্যয়ের খাতওয়ারী বরাদ্দ	৫৫
	-উন্নয়ন বরাদ্দের বার্ষিক বিন্যাস	৫৭
	-জেলা ও উপজেলা অবকাঠামো : খাতওয়ারী বরাদ্দ	৫৭
	-উপজেলা পরিষদসমূহে উন্নয়ন সহায়তা : খাতওয়ারী বরাদ্দ	৫৮
	-বিশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিকল্পনা : খাতওয়ারী বরাদ্দ	৫৯
তৃতীয় অধ্যায় :	**আভ্যন্তরীণ সম্পদসমূহ**	৬১
	-সম্পদ সংগ্রহের অতীত কার্যাবলী	৬১
	-দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর্যালোচনা	৬৩
	-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৭৪
	-আভ্যন্তরীণ সম্পদের অভিক্ষেপ	৭৪
	-সরকারী খাতে অর্থ সংস্থান	৭৫
	-কৌশলাদি ও নীতিমালা	৭৭
	-বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের জন্য অর্থসংস্থান	৭৮
	-মুদ্রা ও মূল্যের ব্যবস্থাপনা	৭৯
চতুর্থ অধ্যায় :	**বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এবং বহিঃসম্পদ**	৮১
	-দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর্যালোচনা	৮২
	-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৯২

		পৃষ্ঠা
	-লেনদেন ভারসাম্যের কৌশলাদি	৯২
	-আমদানী লক্ষ্যমাত্রা	৯৪
	-রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা	৯৭
	-অদৃশ্য বৈদেশিক আয় ও ব্যয়	১০১
	-ব্যক্তিগত আয় স্বদেশে প্রেরণ	১০১
	-লেনদেন ভারসাম্যের পরিস্থিতি	১০২
	-বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ	১০৩
	-বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি ও লেনদেন ভারসাম্য	১০৭
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	**কর্মসংস্থান, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি**	১০৯
	-জনসংখ্যা ও শ্রম শক্তির অংশগ্রহণ	১১০
	-বেকারত্বের কাঠামো	১১০
	-দারিদ্র্য ও বেকারত্ব	১১২
	-কর্মসংস্থানের সুযোগ	১১৩
	-খামার বহির্ভূত কর্মসংস্থান	১১৪
	-অবকাঠামো উন্নয়ন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান	১১৫
	-প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থান	১১৬
	-কর্মসংস্থান নীতি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন	১১৯
	-গ্রামীণ আত্মকর্মসংস্থান : একটি নতুন দৃষ্টিভংগী	১২০
	-কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা	১২১
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	**অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রশাসন**	১২৩
	-প্রশাসন উন্নয়ন	১২৫
	-তৃতীয় পরিকল্পনার প্রেক্ষিত	১২৭
	-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি ব্যবস্থাপনা	১২৭
	-সম্পদ ব্যবস্থাপনা	১২৯
	-প্রকল্প পরিকল্পনা ও প্রসেসিং	১৩০

		পৃষ্ঠা
	-প্রকল্প বাস্তবায়ন	১৩২
	-পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৩৩
	-প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ	১৩৪
সপ্তম অধ্যায়ঃ	**বেসরকারী খাতের উন্নয়ন**	১৩৭
	-বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের পর্যালোচনা	১৩৭
	-শিল্প-খাতে অর্থের সমস্যা	১৪১
	-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারী বিনিয়োগ	১৪৩
অষ্টম অধ্যায়ঃ	**উপজেলা উন্নয়ন**	১৪৭
	-উপজেলা পরিষদের জন্য দিক নির্দেশনা	১৪৮
	-অর্থ বরাদ্দ	১৫১

দ্বিতীয় পর্বঃ খাতওয়ারী অধ্যায়সমূহ

নবম অধ্যায়ঃ	**খাদ্য, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন**	১৫৩
	পরিচ্ছেদ ১ঃ খাদ্য ও কৃষি	১৫৩
	-অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা	১৫৩
	-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৬৪
	-উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ	১৬৪
	-মূল্যনীতি ও ভর্তুকী	১৬৬
	-বেসরকারী খাতের ভূমিকা	১৬৭
	কৃষি ঋণ নীতি	১৬৭
	-ফসল বহুমুখীকরণ কর্মসূচী	১৬৮
	-শস্যোৎপাদন কর্মসূচী	১৬৯
	-কৃষি উপকরণ কর্মসূচী	১৭৯
	-উদ্ভিদ সংরক্ষণ সার্ভিস	১৮১
	-কৃষি সম্প্রসারণ ও গবেষণা	১৮১

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

	পৃষ্ঠা
-কৃষি ঋণ	১৮৩
-গুদামজাত সুবিধাদি	১৮৪
-কৃষি পণ্যের বিপনন	১৮৪
-১৯৮৯/৯০ সালের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	১৮৫
-ভূমি ব্যবহার নীতি	১৮৫
-কর্মসূচী-ওয়ারী অর্থ বরাদ্দ	১৮৮
পরিচ্ছেদ ২ঃ বন্যানিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ	১৮৯
-অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা	১৮৯
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৫
-তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী	১৯৫
-তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা	১৯৫
-তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদি	১৯৭
-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী	১৯৮
-অর্থ বরাদ্দ	২০০
-বেসরকারী বিনিয়োগ	২০১
-নীতিগত বিষয়	২০১
পরিচ্ছেদ ৩ ঃ পশু সম্পদ উন্নয়ন	২০২
-অতীত উন্নয়নের সার্বিক চিত্র	২০৩
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	২০৪
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী	২০৪
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলাদি	২০৪
-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী	২০৫
-জনশক্তি উন্নয়ন ও গবেষণা	২০৭
-ঋণ কর্মসূচী	২০৭
-প্রধান প্রধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	২০৭
-অর্থ বরাদ্দ	২০৮

	পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ ৪ঃ মৎস্য উন্নয়ন	২০৮
-অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা	২০৯
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	২১০
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী	২১০
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	২১১
-কৌশলাদি ও উন্নয়ন কর্মসূচী	২১১
-অর্থ বরাদ্দ	২১৪
-উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	২১৪
-মাছ রপ্তানি	২১৫
পরিচ্ছেদ ৫ঃ বন উন্নয়ন	২১৬
-অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা	২১৬
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী, লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশলাদি	২১৯
-উন্নয়ন কর্মসূচী	২২১
-অর্থ বরাদ্দ	২২৫
পরিচ্ছেদ ৬ঃ পল্লী উন্নয়ন	২২৬
-পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে একটা পর্যালোচনা	২২৬
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	২৩৩
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী	২৩৩
-কৌশল ও নীতি	২৩৪
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী	২৩৫
-উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উন্নয়ন	২৩৬
-কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন খাতে অর্থ বরাদ্দ	২৩৬
দশম অধ্যায়ঃ শিল্প ও খনিজ সম্পদ	২৩৭
-শিল্প খাতের পর্যালোচনা	২৩৭
-সরকারী খাত	২৩৭

	পৃষ্ঠা
-বেসরকারী খাত	২৩৮
-উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য	২৪০
-শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি ব্যাহতকারক সমস্যাবলী	২৪১
-উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা	২৪৭
-সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর আর্থিক কর্মতৎপরতা	২৪৯
-নীতি পরিবেশে পরিবর্তন	২৫১
-রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল	২৫২
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	২৫৪
-উদ্দেশ্যাবলী	২৫৫
-শিল্পনীতি	২৫৫
-কৌশলসমূহ	২৫৬
-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী	২৬১
-অর্থ বরাদ্দ	২৭০
একাদশ অধ্যায় ঃ জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২৭৭
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ বিদ্যুৎ উন্নয়ন	২৭৯
-বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন—একটি পর্যালোচনা	২৮০
-উন্নয়নের উদ্দেশ্যাবলী (১৯৮৫-৯০)	২৮৩
-উন্নয়নের কৌশলসমূহ	২৮৪
-সুষম এবং দক্ষ উন্নয়নের নীতিসমূহ	২৮৪
-লোড-এর পূর্বাভাস	২৮৬
-বিনিয়োগ কর্মসূচী	২৮৭
-ভৌত কর্মসূচী	২৮৮
-বিনিয়োগ বরাদ্দ	২৮৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ তৈল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন	২৯০
-অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা	২৯১
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	২৯৪

পৃষ্ঠা

-তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ২৯৫

-উন্নয়নের কৌশলসমূহ ২৯৫

-উন্নয়নের নীতিমালা ২৯৬

-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী ২৯৭

-তৈল, গ্যাস ও খনিজ উন্নয়ন ২৯৭

পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলজাত দ্রব্য ২৯৯

-ভূতাত্ত্বিক জরিপ ৩০০

-অর্থ বরাদ্দ ৩০১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সনাতন নতুন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদ ৩০৩

-দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল্যায়ন ৩০৪

-তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ৩০৫

-তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ৩০৫

-সুপারিশকৃত নীতি ৩০৫

-তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলসমূহ ৩০৫

-তৃতীয় পরিকল্পনার ভৌত কর্মসূচী ৩০৬

-অর্থ বরাদ্দ ৩০৭

দ্বাদশ অধ্যায় : পরিবহন ও যোগাযোগ ৩০৯

পরিচ্ছেদ ১ : পরিবহন ৩০৯

-অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা ৩০৯

-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৩২৪

-তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী, লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশলাদি ৩২৫

-অর্থ বরাদ্দ ৩২৬

-বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩২৮

-সড়ক ও জনপথ ৩৩০

-বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা ৩৩৩

	পৃষ্ঠা
-সামুদ্রিক বন্দর	৩৩৪
-বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	৩৩৬
-শিপিং পরিদপ্তর	৩৩৬
-সামুদ্রিক বাণিজ্যিক পরিদপ্তর	৩৩৬
-মেরিন একাডেমী	৩৩৬
-অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন	৩৩৭
-বেসরকারী খাতে নৌ-পরিবহন	৩৩৭
-বেসামরিক বিমান চলাচল	৩৩৭
-বাংলাদেশ বিমান	৩৩৮
-ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার প্রস্তুতির বিশেষ কর্মসূচী	৩৩৮
পরিচ্ছেদ ২ ঃ যোগাযোগ	৩৪৩
-অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা (১৯৭৩-৮০)	৩৪৩
-দ্বিতীয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা	৩৪৩
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী, কৌশলাদী এবং নীতিমালা	৩৪৬
-ডাকঘর	৩৪৬
-টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সার্ভিস	৩৪৭
-আবহতত্ত্ব	৩৪৯
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী	৩৫০
-অর্থ বরাদ্দ	৩৫১
-সুপারিশকৃত নীতিমালা	৩৫২
ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন ও পানি সরবরাহ	৩৫৫
-অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা	৩৫৫
-উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ	৩৫৬
-বাসস্থান সমস্যা	৩৫৭
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, কৌশল ও নীতি	৩৫৭

		পৃষ্ঠা
	-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী	৩৫৮
	-অর্থ বরাদ্দ	৩৫৯
	-ঘূর্ণীঝড় পুনর্বাসন/সতর্কীকরণ কর্মসূচী	৩৬৪
চতুর্দশ অধ্যায় ঃ	**শিক্ষা ও ধর্মীয় বিষয়ক**	৩৬৫
	পরিচ্ছেদ ১ ঃ শিক্ষা	৩৬৫
	-অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা	৩৬৬
	-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৩৭০
	-তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী	৩৭০
	-তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদী	৩৭১
	-তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান নীতিমালা	৩৭১
	-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী	৩৭২
	-ঘূর্ণিঝড় পুনঃনির্মাণ কর্মসূচী	৩৮২
	পরিচ্ছেদ ২ ঃ ধর্মীয় বিষয়	৩৮২
	-অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা	৩৮৩
	-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৩৮৪
	-তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ও কৌশলাদী	৩৮৪
	-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী	৩৮৪
	-অর্থ বরাদ্দ	৩৮৫
পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ	**স্বাস্থ্য**	৩৯১
	-অতীত অগ্রগতি পর্যালোচনা	৩৯১
	-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৩৯৭
	-তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী	৩৯৭
	-তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদি	৩৯৭
	-তৃতীয় পরিকল্পনার উন্নয়ন কর্মসূচী	৩৯৯
	-ঘূর্ণিঝড় পুনঃনির্মাণ কর্মসূচী	৪০৪
	-অর্থ বরাদ্দ	৪০৫

গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠা

ষষ্ঠদশ অধ্যায় ঃ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা ৪০৯
-অতীত অগ্রগতি পর্যালোচনা ৪১০
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৪১৩
-জনসংখ্যা বিষয়ক লক্ষ্যসমূহ ৪১৩
-মাতৃমঙ্গল ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ৪১৪
-জনসংখ্যা নীতি, প্রস্তাবনা ও কৌশলাদি ৪১৪
-গর্ভনিরোধক দ্রব্যাদির ব্যবহার ৪১৬
-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী ৪১৯
-আর্থ-সামাজিক ও আইনগত ব্যবস্থাদি ৪২৪
-মহিলা কর্মসূচী ৪২৫
-জনগণের অংশগ্রহণ ৪২৫
-নূতন চিন্তাধারা ৪২৬
-বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ৪২৭
-অর্থ বরাদ্দ ৪২৮

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ ক্রীড়া, সংস্কৃতি, যুব উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক এবং গণমাধ্যম (স্কাইসওয়াম) ৪৩১

পরিচ্ছেদ ১ঃ সমাজকল্যাণ ৪৩১
-অতীত কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা ৪৩১
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৪৩২
-তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম ৪৩৩
-অর্থ বরাদ্দ ৪৩৪

পরিচ্ছেদ ২ ঃ মহিলা বিষয়ক ৪৩৪
-অতীত কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা ৪৩৫
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৪৩৬
-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী ৪৩৮
-অর্থ বরাদ্দ ৪৩৯

	পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ ৩ : যুব উন্নয়ন	৪৪০
-অতীত কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা	৪৪১
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৪৪১
-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী	৪৪২
-অর্থ বরাদ্দ	৪৪৩
পরিচ্ছেদ ৪ : গণমাধ্যম	৪৪৩
-অতীত কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা	৪৪৪
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৪৪৪
-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী	৪৪৫
-অর্থ বরাদ্দ	৪৪৫
পরিচ্ছেদ ৫ : সাংস্কৃতিক উন্নয়ন	৪৪৬
-অতীত কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা	৪৪৬
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৪৪৭
-তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী	৪৪৭
-তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদি	৪৪৭
-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচীসমূহ	৪৪৮
-অর্থ বরাদ্দ	৪৪৯
পরিচ্ছেদ ৬ : ক্রীড়া উন্নয়ন	৪৪৯
-অতীত কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা	৪৫০
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৪৫০
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী	৪৫১
-অর্থ বরাদ্দ	৪৫২
অষ্টাদশ অধ্যায় : বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি গবেষণা	৪৫৩
-অতীত কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা	৪৫৩
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৪৫৫
-তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী	৪৫৫

পৃষ্ঠা

-তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলসমূহ	৪৫৯
-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি নীতিগত সমর্থন	৪৬০
-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী	৪৬১
-অর্থ বরাদ্দ	৪৬৩
ঊনবিংশ অধ্যায় : জনশক্তি ও শ্রম	৪৬৫
-অতীত অগ্রগতি পর্যালোচনা	৪৬৫
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৪৬৯
-তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী	৪৬৯
-তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদী	৪৭০
-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী	৪৭১
-অর্থ বরাদ্দ	৪৭৫
বিংশ অধ্যায় : জনপ্রশাসন	৪৭৭
-অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা	৪৭৭
-তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৪৮২
-তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী	৪৮২
-তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদি	৪৮৩
-তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী	৪৮৪
-অর্থ বরাদ্দ	৪৮৭

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রথম পর্ব

সার্বিক অধ্যায়সমূহ

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রথম অধ্যায়

পরিকল্পিত উন্নয়ন পর্যালোচনা

পরিচ্ছেদ ১ঃ সামগ্রিক পরিস্থিতি

স্বাধীনতা অর্জনের পর হতে বাংলাদেশ পরিকল্পিত উন্নয়ন পন্থা অবলম্বন করে আসছে। এই গতিপথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যখন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে তখন দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত থাকায় অর্থনীতির পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য একটি বিরাট কর্মসূচীর আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যাহোক স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে যে আশার সঞ্চার হয় তা দেশকে বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাবার দরুন পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যাতে করে উন্নতির ফল সবাই ভোগ করতে পারে। কিন্তু বিগত বার বছরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে সব পরিকল্পিত প্রচেষ্টা নেয়া হয় তা বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ ঘটনা প্রবাহের দ্বারা ব্যাহত হয়। বহিঃগতভাবে বিগত দশকে দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি ও অচলাবস্থা এবং এর পর পরই ১৯৮০ দশকের প্রথমার্ধে বিশ্ব ব্যাপী মন্দাবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিতে অবনতি ঘটায়। এ সবের দরুন বৈদেশিক সম্পদের অন্তঃপ্রবাহ এবং রপ্তানী উভয়ই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় যার ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বন্যা, অনাবৃষ্টি এবং ঝঞ্ঝার ন্যায় ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন শস্যের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধিত হওয়ায় গ্রামীণ জনসাধারণের জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রবৃদ্ধির অর্ধেকের বেশী অংশ বিপদ সংকুলভাবে প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় অর্থনীতিতে ভংগুর অবস্থা বিদ্যমান থাকে। শীত মৌসুমে যান্ত্রিক জলসেচের উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ নাগাদ কেবলমাত্র (নীট) আবাদী জমির এক-চতুর্থাংশ সেচের আওতায় আনা সম্ভবপর হয়। মোট কথায় সম্পদের অপ্রতুলতা এবং ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে নানাবিধ ঘাটতির দরুন বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিগত পরিবর্তনে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ সম্পদের টানা পোড়নের দরুন প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

১.২। আনুক্রমিক পরিকল্পনার আকার এবং উন্নয়ন ব্যয় নিম্নের সারণীতে দেখান হইল :

সারণী ১·১

পরিকল্পনার আকার ও ব্যয়

(কোটি টাকায়)

পরিকল্পনা	পরিকল্পনার আকার	প্রকৃত ব্যয়	মোট বৈদেশিক সাহায্য অন্তঃ-প্রবাহ
(১) প্রথম পরিকল্পনা (১৯৭৩—৭৮)	৪,৪৫৫	২,০৭৪	১,৪৯১
(২) দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮—৮০) ..	৩,৮৬১	৩,৩৫৯	২,৫৮১
(৩) দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৮০—৮৫)	১৭,২০০	১৫,২৯১	৯,৭০৮

টীকা: পরিকল্পনার ব্যয় ভিত্তি বছরের পাইকারী মূল্য সূচকে সমন্বিত এবং ভিত্তি বছরের আমদানী মূল্যমানে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য উক্ত বছরের বিনিময় হার দ্বারা রূপান্তরিত।

১.৩। উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনটি পরিকল্পনাই বৈদেশিক সাহায্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের ভাগ ছিল ৭১·৯ শতাংশ এবং দ্বি-বার্ষিক ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই ভাগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৬·৮ এবং ৬৩·৫ শতাংশ। বৈদেশিক সাহায্য অন্তঃপ্রবাহে অসমতা সত্ত্বেও প্রান্তিক বছরে এর ঊর্ধ্বগতি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। সাধারণভাবে অর্থনীতি দু'ধরণের বহিঃ নির্ভরশীলতা—বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা এবং প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীলতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমূলক হয়ে দাঁড়ায় এবং উভয়ই অর্থনীতির অটল প্রবৃদ্ধিতে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে।

১.৪। এইসব দুরূহ পরিবেশের মধ্যে সরকার উন্নয়ন প্রশাসনকে আরও ব্যয়—ফলোৎপাদক এবং দক্ষকরণের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে ছিল অর্থনীতিকে সরকারের তত্ত্বাবধিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং সরকারী কর্পোরেশনগুলির পুণঃবিন্যস্তকরণ। ১৯৭৫ সাল থেকে বেসরকারী খাতের আওতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮২ সালের জুন মাসে ঘোষিত নূতন শিল্প নীতিতে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। এই শিল্পনীতিতে সরকারী খাতে (জনকল্যাণ মূলক শিল্পসহ) মোট ছয়টি শিল্প ছাড়া বাকীসব বেসরকারী খাতের জন্য বা সহ-অবস্থানরত শিল্পে তালিকাভুক্ত করা হয়। এ ছাড়াও বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহ দেবার লক্ষ্যে নমনীয় বিনিময় হার প্রবর্তনের সংগে সংগে অনুপ্রেরণার কাঠামোকে সুবিন্যস্ত ও বর্ধিত করা হয় যাতে করে রপ্তানী বৃদ্ধি পায় এবং আমদানী দেশী উৎপাদনের তুলনায় কম আকৃষ্ট হয়। ১৯৭২ এবং ১৯৮৫ সালের মধ্যে টাকার মূল্য ৪৫০ শতাংশে কমিয়ে আনা হয় এবং রপ্তানী স্থির মূল্যমানে বাৎসরিক শতকরা ৩·৬ হারে বৃদ্ধি পেয়ে কেবলমাত্র ৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সরকারী খাতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয় এবং সরকারী খাতের উন্নয়ন লক্ষ্যে দেশীয় সম্পদের সংস্থানের জন্য ভর্তুকি কমিয়ে আনা হয়। বেসরকারী খাতের সম্প্রসারণ হওয়া সত্ত্বেও সরকারী খাত অর্থনৈতিক এবং ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

১.৫। সরকারী খাতে সম্পদ সংস্থানের প্রচেষ্টা নিম্নের সারণীতে দেখানো হইল ;

সারণী ১·২

প্রধান প্রধান মূল্য সমন্বয় সাধন

(১৯৭৩—১৯৮৫)

সামগ্রী/সেবা		১৯৭৩ সালে মূল্য	১৯৮০ সালে মূল্য	১৯৮৫ সালে মূল্য	শতকরা বৃদ্ধি ১৯৭৩ হইতে ১৯৮৫ পর্যন্ত
(১) রেশন চাউল (টাকা/কেজি)	..	১.০৭	৩.৭৫	৭.১০	৫৬৪
(২) ইউরিয়া সার (টাকা/কেজি)	..	০.৮০	১.৮৭	৪.৩৩	৪৪১
(৩) সিমেন্ট (টাকা/ব্যাগ)	.	৩১.০	৭৯.০০	৯৮.০০	২১৬
(৪) বিদ্যুৎ (টাকা/কিলোওয়াট)	..	০.১৯	০.৯৯	১.৫২	৭০০
(৫) কেরোসিন (টাকা/গ্যালন)	..	১.৭০	১৭.৬৫	৩২.৭৮	১৮২৮
(৬) গ্যাসোলিন (টাকা/গ্যালন)	..	৬.৭৬	৪৭.০০	৬৮.৪৬	৯১৩
(৭) প্রাকৃতিক গ্যাস (টাকা/মিলিয়ন ঘন ফুট)		২.৩১	৮.৮৬	২০.৪২	৭৮৪
(৮) জ্বালানী তৈল (টাকা/গ্যালন)	..	১.২৪	১৫.৬০	২৪.৫৬	১৮৮০
(৯) রেল যাত্রী (টাকা/কিলোমিটার)	..	০.০৪	০.১০	০.১৪	২৫০

টীকা: প্রতি বছর ৩০শে জুন বিদ্যমান মূল্য; ১৯৭৩ সালের রেল যাত্রীভাড়া আসলে ১৯৭৪/৭৫ সালের।

এটি লক্ষণীয় যে ১৯৭০ দশকে মূল্য সমন্বয় সাধারণভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে অনুসরণ করে এবং ১৯৮০ দশকে তা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। তখন সম্পদের ঘাটতি সরকারী খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনার আকারের উপর সাংঘাতিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যা সংক্ষেপে নিম্নের পরিচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হল।

১.৬। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আকার ছিল ৪৪৫৫ কোটি টাকা (১৯৭২/৭৩ মূল্যমানে)। এর মধ্যে সরকারী খাতের বরাদ্দ ছিল ৩৯৫২ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে ছিল ৫০৩ কোটি টাকা। ১৯৭৩/৭৪ সালের প্রথম বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আকার ছিল ৩৩২.২ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনা শেষে তা ৫২৭'৮ কোটি, ১৯৭৯/৮০ সালে ৮৩০'৮ কোটি এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে ৭১৮'১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এগুলি সবই ১৯৭২/৭৩ মূল্যমানের (মূল্য সংকোচন পাইকারী মূল্য ভিত্তিক)। বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আকার বৃদ্ধি ১.৩ সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী ১.৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

(১৯৭৩/৭৪ সাল থেকে শুরু করে পরিকল্পনাগুলির প্রান্তিক বছর)

(কোটি টাকায়)

বছর	সংশোধিত এডিপি (চলতি মূল্যে)	সংশোধিত এডিপি (১৯৭২/৭৩ সালের মূল্যে)
১৯৭৩/৭৪	৪৬৪	৩৩২
১৯৭৭/৭৮	১২০৩	৫২৮
১৯৭৯/৮০	২৩৩০	৮৩১
১৯৮৪/৮৫	৩৪৯৮	৭১৮

টীকা : ১৯৭২/৭৩ ভিত্তি সালের পাইকারী মূল্যসূচক দ্বারা মুদ্রামান কমানো হয়েছে।

১.৭। ১৯৭৩/৭৪ এবং ১৯৮৪/৮৫ সালের মধ্যে স্থিরমূল্যে এ ডি পি-এর বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ৭'৩ শতাংশে দাঁড়ায়। যা হোক এই প্রবৃদ্ধির হার এক পরিকল্পনা থেকে অন্য পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্নতর হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে প্রধানতঃ ১৯৭৫/৭৬ সালের পর থেকে বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচী ১২'৩ শতাংশে বৃদ্ধি পায়; দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে তা দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পায় (২৫'৬ শতাংশ) কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে তা প্রকৃত মূল্যে কমে আসে। সরকারী খাত সম্পদের গুরুতর টানাপোড়েনের মধ্যে আসার দরুন বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচীকে প্রবৃদ্ধির পন্থা হিসাবে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এই পর্যায় ১৯৭৫/৭৬ সালে 'হার্ড কোর' কর্মসূচী প্রণয়ন এবং স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে উচ্চ মূল্যমানের নোটের বাতিলকরণ (demonetization) এবং ৫৮ শতাংশের উর্দ্ধে টাকার মূল্য কমানোর মতো কতকগুলি ব্যবস্থা নেয়া হয়। এসব ব্যবস্থা নেয়ার ফলে কর-জাতীয় আয়ের শতকরা আনুপাতিক (tax-GDP ratio) হার ১৯৭৩/৭৪ সালে ৪'২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে

১৯৭৭/৭৮ সালে ৭'৫ তে দাঁড়ায় এবং একই সময়ে সঞ্চয়—জাতীয় আয়ের শতকরা আনুপাতিক হার শূন্য থেকে ৪'৬ তে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চলতি প্রকল্পসমূহ সম্পদের অপ্রতুলতা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে নূতন প্রকল্প সংযোজিত হতে থাকে। এর ফলে সীমিত সম্পদের চাহিদার প্রতিযোগিতা প্রকট হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রকল্পসমূহের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল অতিক্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রথম পরিকল্পনার শেষে অসমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ১৩২২টিতে দাঁড়ায়; সীমিত সম্পদের মধ্যে প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হবেনা বিধায় প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্বর্তীকালীন দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা হাতে নিয়ে উন্নয়ন ধারায় বিরতি নেয়া হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে অধিকতর সংখ্যায় চলতি প্রকল্পের সম্পন্নকরণ এবং চলতি প্রকল্পের দৌরাত্ম কমানো। এই দুই বছরে বিগত পাঁচ বছরের তুলনায় অধিকতর সংখ্যায় প্রকল্প সম্পন্ন করা হয় এবং স্থানান্তরিত প্রকল্পের সংখ্যা ১৯৭৮/৭৯ সালে ১৩২২ থেকে ১৯৮০/৮১ সালে ১০৫৪ টিতে নেমে আসে যদিও দু'বছরে অনেক নুতন প্রকল্প সংযোজিত হয়।

১.৮। ১৯৮২/৮৩ সালে সম্পদের বর্ধিষ্ণু সমস্যার প্রেক্ষাপটে এ,ডি,পির একটি সার্বিক পর্য্যালোচনা করা হয়। এ সময়ে বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১৬৭৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রকল্প খুব জরুরী না হবার দরুন বাদ বা স্থগিত রাখা হয় যার ফলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পনায় নূতন এবং পুরানো প্রকল্প মিলে মোট ১২৪৮টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এর মধ্যে কারিগরী সাহায্যপুষ্ট ও নিজস্ব তহবিল হতে বাস্তবায়িত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে ২৯৮টি প্রকল্প বাতিল/স্থগিত রাখা হয়, ১০৩৭টি সম্পন্ন করা হয় এবং ৬১৩টি প্রকল্প পরবর্তী পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত করা হয়।

১.৯। বেসরকারী খাতের প্রতিটি সরকারী নীতি ক্রমান্বয়ে শিথিল করা সত্ত্বেও বেসরকারীখাত ধীরে ধীরে গতিশীলতা লাভ করে। প্রথম পরিকল্পনায় বেসরকারীখাতে ৫০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয় এবং প্রথম পরিকল্পনাকালে বেসরকারী বিনিয়োগ চলতি মূল্যে ৮৮৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়; দ্বি-বার্ষিক ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বিনিয়োগ যথাক্রমে ১১৩৫ কোটি ও ৬৮৭১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। ১৯৭২/৭৩ সালের মূল্যে বিভিন্ন পরিকল্পনায় বেসরকারী বিনিয়োগ নিম্নরূপ ছিল:

সারণী ১.৪

বেসরকারী বিনিয়োগ (১৯৭৩—৮৫)

(কোটি টাকায়)

পরিকল্পনা		পরিকল্পনার বরাদ্দ (ভিত্তি সালের মূল্যে)	বিনিয়োগ (চলতি মূল্যে)	বিনিয়োগ (১৯৭২/৭৩ সালের মূল্যে)	বিনিয়োগ (ভিত্তি সালের মূল্যে)
(১) প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	..	৫০৩	৮৮৭	৪৩৯	৪৩৯
(২) দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	..	৬০০	১,১৩৫	৪২১	৯৫৭
(৩) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	..	৬,১০০	৬,৮৭১	১,৭৭২	৪,৯৬৯

টীকা: পাইকারী মূল্যসূচক দ্বারা মুদ্রামান কমানো হয়েছে।

পরিকল্পনা মেয়াদে বেসরকারী বিনিয়োগ বাৎসরিক শতকরা ১৭'৭ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৩/৭৪ সালের ৬৮ কোটি টাকা থেকে ১৯৭৭/৭৮, ১৯৭৯/৮০, এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে যথাক্রমে ১৩৪'৬ কোটি, ২৮৫'০ কোটি এবং ৪০৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।

১.১০। বেসরকারী বিনিয়োগ দ্রুতগতিতে বাড়া সত্ত্বেও সর্বমোট পরিকল্পিত ব্যয় (সরকারী ও বেসরকারী) ১৯৭২/৭৩ সালের স্থিরমূল্যে বাৎসরিক শতকরা ৯'৯ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৩/৭৪ সালের ৪০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১১২৪'৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। উন্নয়ন ব্যয় ১৯৭৩/৭৪ সালের জাতীয় আয়ের ৭'৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৭/৭৮ এবং ১৯৭৯/৮০ সালে যথাক্রমে ১১'৩ শতাংশ এবং ১৭'২ শতাংশে উন্নীত হয়, কিন্তু ১৯৮৪/৮৫ সালে ইহা ১৫'৭ শতাংশে নেমে আসে।

১.১১। যা হোক ব্যয়ের গতিধারার প্রভাব উন্নয়ন ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করেনি। প্রথম পরিকল্পনা মেয়াদে যদিও উন্নয়ন ব্যয় ও জাতীয় আয়ের অনুপাত কম ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পর অর্থনীতিতে অব্যবহৃত ক্ষমতা বিদ্যমান থাকায় যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়। ১৯৭৬/৭৭ সালে অর্থনীতি তার স্বাভাবিক উৎপাদন পর্যায়ে পৌঁছে, এর পর অধিকতর উৎপাদনের জন্য অধিকতর বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রাক্কালে অব্যবহৃত ক্ষমতা এবং ক্ষমতা সৃজনের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের মধ্যে স্বাভাবিক সময় সাপেক্ষে (gestation lag) অধিকতর বিনিয়োগের দরুন বিভিন্ন পরিকল্পনা মেয়াদে প্রবৃদ্ধির হার ভিন্নতর হয় যা নিম্নের সারণীতে দেখানো হল:

সারণী ১'৫

অর্থনীতিতে সার্বিক পরিবর্তন

সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নির্দেশক	প্রথম পরিকল্পনা (১৯৭৩—৭৮)	দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮—৮০)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৮০—৮৫)
(১) জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি (%) ..	৬'১	৩'৫	৩'৮
(২) রপ্তানীর প্রবৃদ্ধি (%)	১'৮	—৩'২	৪'৯
(৩) আমদানীর প্রবৃদ্ধি (%) ..	০'৫	১২'৩	৪'৫
(৪) বৈদেশিক সাহায্যের প্রবৃদ্ধি (%) ..	—২'১	২'৩	৩'৩
(৫) বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের শতাংশ রূপে (প্রান্তিক বছর)	১৩'৫	১৫'৯	১৭'৩
(৬) সঞ্চয় জাতীয় আয়ের শতাংশ রূপে .. (প্রান্তিক বছর)	৪'৬	৪'২	৪'২
(৭) কর-জাতীয় আয়ের অনুপাত (প্রান্তিক বছর)	৭'৫	৮'০	৮'২

১.১২। উন্নয়ন ব্যয়ের স্বল্পতা এবং প্রতিকূল আবহাওয়াসহ বৈদেশিক অবস্থার দুর্বলতা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। ১৯৭৬/৭৭ সালে অর্থনীতি প্রাক-স্বাধীনতা আমলের জাতীয় আয় সীমায় পৌঁছায় যদিও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অর্থনীতি গুরুতরভাবে বিধ্বস্ত ও স্থানচ্যুত হয়। ১৯৭২/৭৩ সালে জাতীয় আয় ছিল ৪৫৩০ কোটি টাকা এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে এই জাতীয় আয় ১৯৭৩/৭৪ সালের মূল্যে শতকরা ৪'৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮২৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। ১৯৭৩—৮৫ সময়কালে খাদ্য

খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়, খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৭২/৭৩ সালের ১০ মিলিয়ন টন (যা ১৯৬৯/৭০ সালে ১১'৯ মিলিয়ন টন ছিল) থেকে বাৎসরিক শতকরা ৩'৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৫'৮ মিলিয়ন টনে দাঁড়ায়। গ্রামীণ উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু খাদ্য ও কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে সাধারণভাবে কৃষিখাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয় যা বাৎসরিক ৩'৮% হারে বৃদ্ধি পায়। এই প্রবৃদ্ধি জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম থাকায় জাতীয় আয়ে কৃষি খাতের অংশ ১৯৭২/৭৩ সালের ৬০'১% থেকে কমে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৫৪'৩%-এ দাঁড়ায়। অন্যদিকে শিল্পজাত উৎপাদন যা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গুরুতরভাবে কমে আসে, ১৯৭২/৭৩ এবং ১৯৮৪/৮৫ সালের মধ্যে তা যোজিত মানে প্রায় দ্বিগুণ হয়। ১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৮৪/৮৫ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনা সময়কালে শিল্পখাতে বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ৬'২%-এ দাঁড়ায় এবং জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অংশ ১৯৭২/৭৩ সালের ৭'৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৮'৬%-এ উন্নীত হয়। অর্থনীতির বাকী অংশ বাৎসরিক ৫'৮% হারে বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় আয়ে তাদের অংশ ১৯৭২/৭৩ সালের ৩২'৬% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৩৭'১%-এ উন্নীত হয়। অন্যান্য খাতের মধ্যে বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটে (বাৎসরিক শতকরা ১৪'০ হারে)। জ্বালানী সংকটের জন্য বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, ফলশ্রুতিতে জ্বালানী আমদানী খাতে খরচ ১৯৭২/৭৩ সালের ৩০'৫ মিলিয়ন ডলার থেকে সর্ব্বোচ্চ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮১/৮২ সালে ৫৪৭ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, এর পর ১৯৮৪/৮৫ সালে ৩৫৯ মিলিয়ন ডলারে নেমে আসে।

১.১৩। নিম্নের সারণীতে ১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৮৪/৮৫ সাল পর্যন্ত জাতীয় আয়ের গঠন এবং খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধি সহজতরভাবে দেখানো হল :

সারণী ১'৬

জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ও গঠন

(১৯৭২/৭৩ সালের মূল্য)

(কোটি টাকায়)

খাত		১৯৭২/৭৩ সালের জাতীয় আয়	১৯৮৪/৮৫ সালের জাতীয় আয়	বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার (%)	জাতীয় আয়ের অংশ (শতাংশে)	
					১৯৭২/৭৩	১৯৮৪/৮৫
(১) কৃষি ..	..	২৭২২'০	৪২৪৮'৬	৩'৮	৬০'১	৫৪'৩
(২) শিল্প ..	..	৩২৯'৮	৬৭৩'৮	৬'২	৭'৩	৮'৬
(৩) অন্যান্য খাত	..	১৪৭৮'২	২৯০৬'৬	৫'৮	৩২'৬	৩৭'১
মোট	..	৪৫৩০'০	৭৮২৯'০	৪'৭	১০০	১০০

পরিচ্ছেদ ২ঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল্যায়ন

২.১। দেশের ও বিদেশের বাস্তব অবস্থা এবং অতীত উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি বিশ বছর মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনার কাঠামোয়ে প্রণয়ন করা হয়। সাত বছরের প্রচেষ্টার পরেও পরিকল্পনার প্রারম্ভে দেশ নিদারুণ দারিদ্র, বেকারত্ব এবং তদুপরি সামাজিক বৈষম্যের দ্বারা জর্জরিত ছিল। কেবলমাত্র অদম্য ইচ্ছা ও অটল প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে এসব সমস্যার উত্তরণই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার হতাশাব্যঞ্জক শুরুর পর অর্থনীতিতে উন্নতি সাধিত হওয়ায় ১৯৭০ দশকের শেষার্ধে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫.২ ভাগে পৌঁছায়। দেশের অর্থ নীতির আশাপ্রদ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ১৭,২০০ কোটি টাকা সম্বলিত (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে) দ্বিতীয়-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় যার মধ্যে সরকারী খাতের জন্য ১১,১০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতের জন্য ৬,১০০ কোটি টাকা ধার্য্য করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৩.১% ও ৩.৫%-এর স্থলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ৫.৪% রাখা হয়।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্যাবলী ও লক্ষ্যসমূহ

২.২। পূর্বের পরিকল্পনাগুলির মত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উদ্দেশ্যাবলী নিদারুণ দারিদ্র, বেকারত্ব এবং অপুষ্টি, ভয়াবহরূপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অশিক্ষা এবং সর্বোপরি বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর-শীলতা এগুলির ন্যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আলোকে নির্ধারণ করা হয়। প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনার মুখ্য কৌশল ছিল খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করার জন্য কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ এবং পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনাকে কার্য্যকরী করা। যাহোক সম্পদের সীমা-বদ্ধতার জন্য পরিকল্পনার উৎপাদন ও লক্ষ্যসমূহ বাৎসরিক সার্বিক ৫.৪% প্রবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখে স্থির করা হয়। মোট আমদানী ১৯৭৯/৮০ সালের ২৩৬৬ মিলিয়ন ডলার থেকে কিছু বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে) ২৩৯৯ মিলিয়ন ডলারে এবং রপ্তানী একই সময়ে ৭২১ মিলিয়ন ডলার থেকে ১০৯৫ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে বলে ধরা হয়। যা' হউক পরিকল্পনায় জ্বালানী ও সামাজিক খাত-সমূহে অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জ্বালানী খাতে বিদ্যুৎ প্রজনন, গ্যাস উৎপাদন ও সঞ্চালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং পল্লী বিদ্যুতায়নকে জোরদার করে জ্বালানী খাতে আমদানী ব্যয় কমানোর জন্য লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়। সামাজিক খাতের লক্ষ্যসমূহ রক্ষা করা অথবা বাড়ানো হয়। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা ১৩০ লক্ষে এবং কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহারের হার ৩৭.৫%-এ রাখা হয়।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

২.৩। পরিকল্পিত ব্যয় স্থির মূল্যে ১৭,২০০ কোটি অথবা চলতি মূল্যে ২৫,০৬০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পরিকল্পনার ধার্য কৃত ১৬,০৬০ কোটি টাকার স্থলে এডিপি-এর মাধ্যমে প্রকৃত ব্যয় হয় ১৩,৯২৯ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপি-তে ১৫,২৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয় যা পরিকল্পিত ব্যয়ের ৯৫ শতাংশ এবং প্রকৃত ব্যয় পরিকল্পিত ব্যয়ের ১৩.৩ শতাংশ কম হয়েছে। এডিপি-এর মাধ্যমে মূল্য সমন্বিত সরকারী খাতের ব্যয় এই সময়ে কমবেশী প্রতি বছর প্রায় ২০০০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে এবং সর্বমোট খরচ ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে (পাইকারী মূল্য সূচক দ্বারা মুদ্রামান হ্রাসকৃত) ১০,৩৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় যার ফলে সরকারী খাতে পরিকল্পনা বরাদ্দের ৯৩.১% অর্জিত হয়।

২.৪। সীমিত সম্পদ অধিক সংখ্যক প্রকল্পের উপর বন্টনের জন্য সরকারী খাতে ব্যয়ের উন্নয়ন প্রভাব খর্বিত হয়। এটাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার একটি উদ্বেগের কারণ ছিল। পরিকল্পনাকালে কারিগরী সাহায্যপুষ্ট ও নিজস্ব তহবিল থেকে বাস্তবায়িত প্রকল্পসহ মোট ১৯৪৮টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয় এবং সবচেয়ে

বেশী সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল ১৯৮১/৮২ সালে যার সংখ্যা ছিল ১৬৭৫টি। আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২৯৮টি প্রকল্প বাদ/স্থগিত রাখা হয়। পরিকল্পনাকালে সর্বমোট ১০৩৭টি প্রকল্প সম্পন্ন করা হয় এবং ৬১৩টি প্রকল্প তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। যেখানে এর আগের পরিকল্পনাকালে পূর্বের ১০৫৪টি প্রকল্প পরিকল্পনা থেকে সংযোজিত হয়।

২.৫। এ ডি পিকে সম্পদের অপ্রতুলতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য প্রকল্প সংখ্যা কমিয়ে আনা ছাড়াও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—'কোর' এবং 'নন-কোর' খাতে করে প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলিকে অপ্রত্যাশিত সম্পদের স্বল্পতার সম্মুখে রক্ষা করা যায়। উভয় পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল সীমিত সম্পদের উপর প্রতিযোগিতামূলক চাহিদার চাপ উপশম করা এবং পর্যাপ্ত অর্থসংস্থানের মধ্য দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা। ফলে সম্পন্ন প্রকল্পের সংখ্যা ১৯৮০/৮১ সালের ১৬৩টি থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৩২৩ টিতে উন্নীত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা এটা ফুটিয়ে তুলে যে প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পদই একমাত্র বাধা নয়, যদিও তা অধিক পরিমাণ চলতি প্রকল্প বাদ দেয়ার মাধ্যমে পরিকল্পনার একটি মৌলিক সূত্র পুনঃস্থাপন করে যে পরিকল্পনার কোন সিদ্ধান্তই অপরিবর্তনীয় নয় এবং পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি ততক্ষণই ভাল যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুমান ও বহির্গত অবস্থা ঠিক থাকে এবং চলতি প্রকল্পের তথাকথিত দৌরাত্মের রূপকথাকে খণ্ডন করে।

২.৬। উন্নয়ন অর্থসংস্থাগুলোর ঋণ অনাদায়ের জন্য বেসরকারী খাতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সরকারী খাতের তুলনায় আরো গুরুতরভাবে ব্যাহত হয় যার ফলে তাদের ধার দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই ধারা ভংগ হওয়ায় উন্নয়ন অর্থ সংস্থাগুলিকে সত্যিকার অর্থে স্থবির অবস্থায় নিয়ে আসে এবং এর সাথে সাথে পরিকল্পনার শেষ বছরে বেসরকারী খাতের আধুনিক শিল্পগুলির কার্য্যকলাপও ব্যাহত হয়। এই অবস্থার মধ্যে বেসরকারী সূত্রে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণই এক আশার বস্তু ছিল যা বেশ কিছু সংখ্যক শিল্পের অর্থযোগান দেয় এবং সত্তর দশকের শেষার্ধে যে বেসরকারীকরণ ধারা শুরু হয় তা পরিকল্পনার দ্বিতীয়ার্ধে আরো জোরদার হয়। এটা এবং ১৯৮২ সালের জুন মাসে ঘোষিত নয়া শিল্প নীতি বেসরকারী খাতের উদ্যমকে একটি দুর্বল পরিবেশের মধ্যেও বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। বেসরকারী খাতের সর্বমোট বিনিয়োগ ৪৯৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায় ইহা পরিকল্পনার ধার্য্যকৃত বিনিয়োগ থেকে ১৮.৫ শতাংশ কম। বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৭.৫%।

জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি

২.৭। পরিকল্পনায় বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয় ৫.৪%; কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃত প্রবৃদ্ধি বাৎসরিক শতকরা ৩.৮ ভাগ হয়েছে বলে অনুমিত হয়। যা হোক আবহাওয়াজনিত কারণে পরিকল্পনাকালে বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হারে উঠানামা ঘটে। সবচেয়ে ভাল অগ্রগতি হয় ১৯৮০/৮১ সালে কেননা সে বছরে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয়। পরবর্তী বছর ১৯৮১/৮২ সালে খারাপ ফসল হবার দরুন কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হয় এবং সার্বিক জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ১৯৮০/৮১ সালের ৬.১% থেকে নেমে ০.৯%-এ দাঁড়ায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু মন্তব্যের প্রয়োজন। প্রথমতঃ ১৯৮০/৮১ সালের খরার ফলে ১৯৭৯/৮০ সালের তুলনায় ১৯৮০/৮১ সালে ভাল ফসল হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী সালের প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। দ্বিতীয়তঃ কম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর পরই বেশ ভাল প্রবৃদ্ধির স্বাভাবিক ধারা খণ্ডিত হয় ১৯৮২/৮৩ সালে। ১৯৮১/৮২ সালের উপেক্ষাজনক প্রবৃদ্ধির হার ০.৯% এর পরে প্রবৃদ্ধির হার মাঝারী বছরের ৩.৭% হওয়ায় এই দু'বছরে (১৯৮১—৮৩) মাথা পিছু গড় আয় বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৮২/৮৩ সালে কৃষিখাত পুণর্জীবিত হওয়ায় এই খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪.৭%-এ দাঁড়ালেও এই বছরে যে সমস্ত সমন্বয় ব্যবস্থা নেয়া হয় তাতে সার্বিক প্রবৃদ্ধি কমে আসে, শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার ১৯৮০/৮১ সালের ৮.৮% থেকে ১৯৮১/৮২ সালে ২.৯% কমে আসে এবং নির্মাণ খাতে তৎপরতা হ্রাস পায়।

২.৮। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতাসমূহ অর্থনীতির মৌলিক প্রকৃতিকে আবার উন্মোচন করে—সেটা হচ্ছে আবহাওয়ার উপর এর অত্যধিক নির্ভরশীলতা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আবহাওয়া পূর্বের চেয়ে অধিক প্রবল ভূমিকা পালন করে। পাঁচ বছরের মধ্যে অর্থনীতি তিন বছরই শস্যের কম উৎপাদন-জনিত সংকটের সম্মুখীন হয় যা খুব স্বভাবতঃ তিন বছর অন্তরকালীন একটি প্রথা হিসাবে চলে আসছিল। ১৯৮৪ সালে উপর্যুপরি বন্যার ফলে ১ মিলিয়ন টনের অধিক চাউল নষ্ট হয় এবং পূর্ববর্তী মৌসুমে বর্ধিত কার্যাকলাপের মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র এর আংশিক ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয়। ১৯৮৪ সালে অন্যান্য শস্য যথা পাট ও ইক্ষু গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থনীতি প্রতি বছর প্রাকৃতিক কারণে জাতীয় আয়ের এক শতাংশ হারায় যা অকৃষিখাত বিশেষ করে শিল্পের জন্য কাঁচামাল (যথা পাট ও ইক্ষু) সরবরাহে স্বল্পতা এবং ভোগ্যপণ্যের হ্রাসকৃত চাহিদার দরুন গৌণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্জিত প্রবৃদ্ধির চেয়ে অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেক বেশী।

২.৯। এটা উপেক্ষা করা যায়না যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আন্তর্জাতিক পরিবেশ প্রবৃদ্ধির অনুকূলে ছিলনা। বিশ্ব বাণিজ্য এবং সাহায্য প্রথম বছরগুলিতে সাধারণভাবে নিশ্চল ছিল। উন্নত অর্থনীতি সম্পন্ন দেশগুলির অনুসৃত মুদ্রা সংকোচন নীতি এবং আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য্য করে শিল্প রক্ষণ (Protectionism) পুনপ্রবর্তন ১৯৮২/৮৩ সাল বিশ্ব বাণিজ্যে অবনতি ঘটায়। বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্যে তার আমদানী রপ্তানী বিনিময় হারে অবনতির জন্য ১ বিলিয়ন ডলারের অধিক সম্পদ হারায়। প্রথম তিন বছরে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ প্রকৃত অর্থে ভিত্তি সংখ্যা ১২২৩ মিলিয়ন ডলারের নিম্নে ছিল—১৯৮০/৮১ সালে ১০৭৫ মিলিয়ন ডলার, ১৯৮১/৮২ সালে ১১৯৬ মিলিয়ন ডলার এবং ১৯৮২/৮৩ সালে ১১৯১ মিলিয়ন ডলার এবং বৈদেশিক সাহায্যের সার্বিক প্রবৃদ্ধি সত্যিকার অর্থে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি শতকরা ৩.৮ ভাগের তুলনায় শতকরা ৩.৩ ভাগে দাঁড়ায় যার মধ্যে দিয়ে অর্থনীতির অব্যবহৃত সম্ভাবনা প্রতিফলিত হয়।

২.১০। নিম্নের সারণীতে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত পরিবর্তন দেখানো হল :

সারণী ২.১

জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ও কাঠামো

(১৯৭৯/৮০ সালের উৎপাদক মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

খাত		১৯৭৯/৮০ সালের জাতীয় আয়	১৯৮৪/৮৫ সালের জাতীয় আয়	বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার (%)	জাতীয় আয়ের অংশ (শতাংশে) ১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫
(১) কৃষি	..	৮,৯১৯.১	১০,৫৮৪.৬	৩.৫	৫১.৬	৫১.০
(২) শিল্প	..	১,৪২১.৬	১,৭৭৩.৩	৪.৮	৮.২	৮.৭
(৩) অন্যান্য	..	৬,৯৩৮.৩	৮,৩৬৫.১	৩.৮	৪০.২	৪০.৩
মোট	..	১৭,২৭৯.০	২০,৭৪৩.০	৩.৮	১০০	১০০

২.১১। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার খুব বেশী বৈষম্যমূলক ছিল না যা জাতীয় আয়ের কাঠামোতে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যদি আবহাওয়ার প্রভাবকে বিবেচনা করা হয় তাহলে জাতীয় আয়ের কাঠামোতে যতটুকু পরিবর্তন লক্ষণীয় সেটাও বিলীন হয়ে যাবে। বস্তুতঃ উন্নত অর্থনীতিগুলিতে যে দীর্ঘ মেয়াদী

কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের অভাবে সেটা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। যতটুকু সীমিত সম্পদ সংস্থান করা সম্ভব হয়েছিল তা অগ্রাধিকার ভিত্তিক খাতসমূহে যথা খাদ্য এবং জ্বালানীতে বরাদ্দ করা হয় যা কেবলমাত্র দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় শর্ত (সস্তা খাদ্য ও জ্বালানী) মেটাতে পারে। খাদ্য উৎপাদনে ক্ষতির পরেও শতকরা ৩'৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়েও অর্ধ শতাংশ বেশী; বিদ্যুৎ এবং গ্যাস উৎপাদন শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি হারের চেয়েও যথাক্রমে তিন ও চারগুণ বৃদ্ধি পায়।

ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২.১২। জনসংখ্যার প্রায় ২'৪% বৃদ্ধির তুলনায় জাতীয় আয়ের শতকরা ৩'৮ ভাগ প্রবৃদ্ধি ভোগ এবং সঞ্চয় বৃদ্ধির মধ্যে তেমন সুখকর বিকল্পের অবকাশ রাখেনি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিশ্ব বাণিজ্য ও সাহায্য সামান্যতর হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশীয় সম্পদ প্রাপ্তি উন্নয়ন প্রচেষ্টায় গুরুতর বাধা হিসাবে থাকায় পরিকল্পনার মধ্যবর্তীকালে মূল্য সঞ্চয়কারী কতকগুলি ব্যবস্থা নেয়া হয় যাতে করে সরকারী খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংস্থান করা যায় এবং একই সংগে বেসরকারী খাতের সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে রাজস্ব ও আর্থিক সুবিধাদির মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এসব ব্যবস্থায় দেশীয় সঞ্চয় আহরণে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতি সাধিত হয়। প্রান্তিক বছরে (১৯৮৪/৮৫) দেশীয় সঞ্চয়ের হার শতকরা ৪'২ ভাগে দাঁড়ায় যেখানে পরিকল্পিত লক্ষ্য অধিকতর আয়ের ভিত্তিতে শতকরা ৭'৪ ভাগ ধরা হয়েছিল। বর্ধিত আয়ের এক তৃতীয়াংশের বেশী সঞ্চয় করা হয় যার ফলে সঞ্চয়ের প্রান্তিক হার (Marginal rate of saving) ৩৪'৪ শতাংশে দাঁড়ায় যা পরিকল্পনায় ১৪'৭ শতাংশ ধরা হয়। বর্ধিত আয়ের দুই-তৃতীয়াংশের কম অতিরিক্ত ভোগের অর্থসংস্থানে ব্যয়িত হয় যেখানে এই খাতে গড়ে ৯৬% ব্যয় হত। আন্তর্জাতিক পরিবেশ এবং দেশে বিরাজমান অবস্থার জন্য ভোগের বৃদ্ধি মন্থর হয়ে আসে-বাৎসরিক ১'৮%, যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শতকরা ২'৪ ভাগে দাঁড়ায়। যদিও মুদ্রা সম্প্রসারণ এবং বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ ভোগ ও ফটকাবাজি ব্যবসাকে উৎসাহিত করে, তার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির যে চাপ সৃষ্টি হয় তা সঞ্চয় প্রবণতাকে দুর্বল করে ফেলে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৮২ সালে মুদ্রা ও রাজস্ব উভয় খাতেই সমন্বয়কে উৎসাহিত এবং সমষ্টিগত চাহিদাকে কমিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়। ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের উপর সুদের হার বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতির চেয়ে প্রকৃত সুদের হার ঊর্ধে রেখে সঞ্চয়কে উৎসাহিত করা হয় এবং সরকারী খাতের পণ্য ও সেবার মূল্য বাড়িয়ে ভর্তুকী কমানো হয়। এ সবই আয় বন্টন, সঞ্চয় এবং ভোগকে ব্যাহত করে। সমষ্টিগত চাহিদার উপর তাদের নিরুৎসাহব্যঞ্জক প্রভাব একদিকে খর্বিত শিল্প প্রবৃদ্ধি এবং অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। যেখানে নানাবিধ মুদ্রা ও রাজস্ব ব্যবস্থার দ্বারা দেশীয় চাহিদা কমিয়ে আনা হয়, সেখানে রপ্তানী বৃদ্ধি (৪'৯ শতাংশে) কতগুলি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। দেশীয় চাহিদার অভাব বিনিয়োগকে বাধা দেয় এবং তা উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে ঋণ দেয়া বন্ধ করার দরুন আরও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

২.১৩। **খাদ্য পরিস্থিতিঃ** কর্মসংস্থান ও আয়ের অভাবে ভোগের ক্ষেত্রে খাদ্য ও বস্ত্রের মত মৌলিক চাহিদা বাধাপ্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা এবং এর পূর্ববর্তীকালে বেশ কিছু সংখ্যক উন্নয়ন কার্যাবলী গ্রামীণ দারিদ্র উপশমের জন্য বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু তাদের প্রভাব দারিদ্রের মাত্রার ক্রমাবনতি থামাতে এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারেনি। ন্যূনতম স্বাভাবিক পুষ্টির (২২৭৩ কে ক্যালরী) নিম্নে অবস্থানরত গ্রামীণ খানার অনুপাত ১৯৭৫/৭৬ সালের ৫১% থেকে ১৯৮১/৮২ সালে ৭৬%-এ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে "কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর" আওতায় স্বল্পকালীন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে খাদ্য পৌঁছানোর জন্য, পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণ খাদ্য শস্য বিতরণ করা হয়, যদিও খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির চেয়ে দেড়গুণ হারে

বৃদ্ধি পায়। খাদ্য ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান করে যে কেবল উৎপাদনই ভোগকে সুনিশ্চিত করতে পারেনা। ব্যাপক দারিদ্র ও বেকারত্বের মধ্যে কর্মসংস্থান এবং আয় সৃষ্টি বন্টন ও উৎপাদনের মতই দরকারী। সার্বিকভাবে গড়পড়তা ক্যালোরী প্রাপ্তি ১৯৮১/৮২ এবং ১৯৮৪/৮৫ সালের মধ্যে প্রান্তিক পর্যায়ে সামান্য ১৯৪৩ কে ক্যালোরী থেকে ১৯৫০ কে ক্যালোরীতে উন্নীত হলেও ১৯৭৫/৭৬ সালের ২০৯৪কে ক্যালোরী সীমার নীচে অবস্থান করছে এবং আমিষের (Protein) প্রাপ্তি ১৯৮১/৮২ সালে ৪৮.৪ গ্রাম থেকে আরো কমে যেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪৫.৫ গ্রামে দাঁড়ায় যা ১৯৭৫/৭৬ সালে ছিল ৫৮.৪ গ্রাম। যা হোক এই হ্রাসপ্রাপ্ত ভোগসীমার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ন্যুনতম স্বাভাবিক পুষ্টির নীচে অবস্থিত গৃহস্থালীর অনুপাত ১৯৮১/৮২ সালের ৭৬% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৬৪ শতাংশে দাঁড়ায়। খাদ্যের সরবরাহও ১৯৮১/৮২ সালের অবনতির পর কৃষির পূর্বাবস্থা প্রাপ্তির জন্যই তা বিশেষভাবে সম্ভব হয়।

২.১৪। **সঞ্চয় ও বিনিয়োগ:** সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা নেয়া সত্বেও বাংলাদেশ পরিকল্পনাকালে সঞ্চয় বিনিয়োগ এবং রপ্তানী-আমদানী পার্থক্যের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করতে থাকে যদিও বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের প্রবৃদ্ধি এবং দেশীয় সমন্বয় ব্যবস্থা এই পার্থ্যককে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনে। বৈদেশিক সম্পদের ঘাটতি ১৯৭৯/৮০ সালের মুল্যে ১৯৭৯/৮০ সালে ২৫৪৪ কোটি টাকা থেকে কমে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৫১৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, রপ্তানী-আমদানী বিনিময় থেকে উদ্ভুত ক্ষতি বাদ দিলেও ১৯৮৪/৮৫ সালের রপ্তানী-আমদানীর ঘাটতি (২৫৫৮ কোটি টাকা) প্রায় ১৯৭৯/৮০ সালের পর্যায়ে ছিল। ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে প্রকৃত অর্থে আমদানীর ৪.৫% প্রবৃদ্ধির স্থলে রপ্তানী ৪.৯% বৃদ্ধি পায়। রপ্তানী-আমদানীর পার্থক্য হ্রাস সঞ্চয়-বিনিয়োগের পার্থক্যকে বাধ্য করেই সীমিত করে আনে। রপ্তানী-আমদানী এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে আনা বাংলাদেশ বাস্তবতার মোকাবিলা এবং উন্নয়নের প্রত্যাশার যে সব প্রচেষ্টা চালিয়েছে তার সাক্ষ্য বহন করে। সর্বমোট বিনিয়োগ পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ১৬,৫৭৯ কোটি টাকার স্থলে ১৪,৬৩৫ কোটি টাকায় অনুমিত হয়। এতে বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দেয় ১১.৭%। সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা ১০,৪৭৯ কোটি এবং ৬,১০০ কোটি টাকার স্থলে যথাক্রমে ৯,৬৬৬ কোটি এবং ৪,৯৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

২.১৫। ১৯৭৯/৮০ সালের মুল্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রাক্কলিত বিনিয়োগর বছরওয়ারী বিবরণ নিম্নে দেখানো হল:

সারণী ২.২

সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ

(১৯৮০—৮৫)

বৎসর	সরকারী	বেসরকারী	মোট
১৯৭৯/৮০	২০৫৬	৭৯৯	২৮৫৫
১৯৮০/৮১	২০৩৫	৯২৪	২৯৫৯
১৯৮১/৮২	১৬৩৩	৮৬৩	২৪৯৬
১৯৮২/৮৩	২০২৫	৯১১	২৯৩৬
১৯৮৩/৮৪	১৯৯৬	১১৩২	৩১২৮
১৯৮৪/৮৫	১৯৭৭	১১৩৯	৩১১৬
মোট (১৯৮০—৮৫)	৯৬৬৬	৪৯৬৯	১৪৬৩৫
পরিকল্পনা লক্ষ্যের তুলনায় প্রকৃত বিনিয়োগ (শতাংশে):	৯২.২%	৮১.৫%	৮৮.৩%

টীকা: চলতি মুল্যে বিনিয়োগ পাইকারী মূল্যসুচক দ্বারা মুল্যমান হ্রাসকৃত।

আভ্যন্তরীণ সম্পদ পরিস্থিতি

২.১৬। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রারম্ভ হতেই এক গুরুতর সম্পদ টানাপোড়নের শিকার হয়। প্রথম দু'বছর প্রকৃত বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃ প্রবাহ পরিকল্পিত ৩০৮৪ মিলিয়ন ডলারের স্থলে ২৩৮৭ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় যাতে করে ঘাটতি হয় ২৩%। বস্তুতঃ বৈদেশিক সাহায্যের বাৎসরিক গড় অন্তঃ প্রবাহ গতিকাল অর্থে ১৯৭৯/৮০ সালের সীমায় নিশ্চল থাকে (১২২৩ মিলিয়ন ডলার)। বৈদেশিক সাহায্যের এই ঘাটতি আমদানী এবং আমদানী কর সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটায়। অন্য দিকে উন্নত দেশগুলোতে মন্দাবস্থা বিদ্যমান থাকায় রপ্তানী আয় পরিকল্পিত প্রত্যাশা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। প্রথম দুবছরে রপ্তানি আয় ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে পরিকল্পিত অভিক্ষেপ ১৭৪৮ মিলিয়ন ডলারের স্থলে ১৬৭৪ মিলিয়ন ডলারে দাড়ায়, যদিও চলতি মূল্যে প্রকৃত রপ্তানী আয় রপ্তানীর একক মূল্যে কমে যাবার দরুন ১৩৩৮ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আংশিকভাবে আমদানীর জন্য অর্থসংকুলানের সমস্যা নমনীয় করে, কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যের নিশ্চলতা এবং রপ্তানীর মন্থর প্রবৃদ্ধি আমদানীর নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে পর্য্যবসিত হয়। আমদানীর মাত্রা প্রথম দুবছর ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ৫২৮২ মিলিয়ন ডলারের জায়গায় ৪৬৯৮ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় (চলতি মূল্যে ৫১০৫ মিলিয়ন ডলার)। আমদানী স্বল্পতাহেতু করযুক্ত আমদানী (চলতি ডলার মূল্যে) প্রথম দুবছরে মন্থর গতিতে বাৎসরিক ৫.৭% বৃদ্ধি পায়। কেবলমাত্র মুদ্রার দ্রুত অবমূল্যায়ন (১৯৭৯/৮০ সালে এক ডলার = ১৫.৫ টাকা হতে ১৯৮১/৮২ সালে এক ডলার = ২০ টাকা) হওয়ায় আমদানী কর সংগ্রহ গড়ে ১৬% বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করে।

২.১৭। উপরোল্লেখিত প্রত্যক্ষ প্রভাব ব্যতিরেকে বৈদেশিক সাহায্য, রপ্তানী ও আমদানী মন্থরতা, দেশীয় উৎপাদনের সম্প্রসারণকে ব্যাহত করে, বিশেষ করে শিল্পখাতে এবং তার ফল হিসাবে আভ্যন্তরীণ আবগারী আয়কর সংগ্রহে বিঘ্ন ঘটায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৮১/৮২ সালে শস্যহানির মাধ্যমে এই অবস্থা আরো চরমে পৌছে যা কৃষিখাতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি ছাড়াও শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির পূর্ববর্তী বছরের ৮.৮% থেকে কমিয়ে ২.৯% এ নিয়ে আসে। সার্বিকভাবে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির ৫.৪% এর স্থলে বাৎসরিক গড় ৩.৫% এ দাঁড়ায়। প্রবৃদ্ধির এই ব্যর্থতা পরিকল্পিত প্রত্যাশা অনুযায়ী দেশীয় সম্পদ সংস্থানকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করে। পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরে ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে কেবলমাত্র ৪২৬৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

২.১৮। বেসরকারী খাতের অবস্থা প্রথম দুবছরে ক্রমবর্ধমান উদারনীতি গ্রহণ করার ফলে পরিকল্পিত অবস্থার চেয়ে ভাল ছিল। বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ ১৯৭৯/৮০ সালের ৭৯৯ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮০/৮১ সালে ৯২৪ কোটি টাকা এবং ১৯৮১/৮২ সালে ৮৬৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। দুবছরে বেসরকারী খাতের প্রত্যাশিত বিনিয়োগের ৯৭.৭% অর্জিত হয়।

২.১৯। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয়ক্ষেত্রে সম্পদ সংকটের দরুন পরিকল্পনা ১৭,২০০ কোটি টাকায় চূড়ান্ত করা হয়। বেসরকারী খাতের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে বেসরকারী খাতের জন্য ৬১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয় এবং বেসরকারী খাতকে আরো উৎসাহ প্রদানের জন্য ১৯৮২ সালের জুন মাসে নুতন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়। এতে দেশীয় সম্পদ ৮১৩২ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সাহায্য ৭০৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়। দেশীয় সম্পদের অনুমিত প্রাপ্যতা ১৯৮৪/৮৫ সালের সঞ্চয়ের হার শতকরা ৭.৪% এবং কর-জাতীয় আয়ের আনুপাতিক হার ৯.৫% এ উন্নীত করে যা ১৯৭৯/৮০ সালে ছিল যথাক্রমে ৪.২% এবং ৮.০%।

২.২০। যা হোক সম্পদ সংস্থান সম্পর্কে পরিকল্পিত প্রত্যাশা বিশেষ করে দেশীয় সম্পদ পরিকল্পনা মেয়াদে দেশীয় ও বৈদেশিক উভয় খাতে অপ্রত্যাশিত ঘটনা প্রবাহের দরুন যথাযথভাবে কার্য্যকরী হয়নি। ৮২/৮৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্য কমে আসে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং বাণিজ্য ১৯৮৪/৮৫

সাল নাগাদ নিম্ন পর্যায়ে থাকে। এই বিলম্বিত পুর্বাবস্থা উদ্ধার পরিকল্পনার সাবিক অর্থ সংস্থানের উপর খুব কম প্রভাবই বিস্তার করে। বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং পরিকল্পনার শেষের তিন বৎসরে ৩৭৬৬ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। নামমাত্র বৈদেশিক সাহায্যের নিশ্চল অবস্থার সংগে তুলনা করে রপ্তানী নামমাত্র অর্থে বাৎসরিক গড়হারে ১৪·৫% বৃদ্ধি পায় এবং আমদানী বৃদ্ধির হার ১·৭% ভাগে দাঁড়ায়। আমদানীকর সংগ্রহের উপর তাদের প্রতিকূল প্রভাব টাকার মুল্য বাৎসরিক ১০·৯% ভাগ হ্রাসের মাধ্যমে ১৯৭৯/৮০ সালে টাকার মুল্য এক ডলার=১৫·৫ টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে এক ডলার=২৬·০০ টাকায় এনে পুষিয়ে নেয়া হয়। টাকার মুল্যে আমদানী ব্যয় বেড়ে যাবার ফলে টাকার আমদানী ব্যয় ১৩% বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক লেন-দেনের ভারসাম্যের সমস্যাবলী দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রবৃদ্ধি কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতির স্বল্পতার জন্য ব্যাহত হয়। শিল্পের প্রবৃদ্ধি খারাপ আবহাওয়ার জন্য ঘন ঘন শস্যহানির দ্বারা গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হয়, যার ফলে গ্রামীণ আয় এবং শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়।

২.২১। ১৯৮২/৮৩ সালে বৈদেশিক লেন-দেনের ভারসাম্য এবং সম্পদ সংস্থানের সমস্যাবলী লাঘব করার জন্য ভর্তুকী এবং ক্ষতি কমানো এবং দেশীয় সম্পদ সংস্থানের জন্য সরকারী খাতে কতিপয় দ্রব্য-সামগ্রী এবং সেবার মুল্য বাড়ানো হয়। মুল্য ও রাজস্ব খাতে কতকগুলি সমন্বয় সাধন করা হয়। এই ধরনের মুল্যের উর্ধমুখী সমন্বয় প্রত্যাশিতভাবেই চাহিদা কমিয়ে আনে যাতে করে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির গতি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি ও প্রকৃতপক্ষে তা ০·৩% হারে কমে আসে। পরিকল্পনাকালে শিল্প খাতের সাবিক বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ৪·৮% এ দাঁড়ায়, যেখানে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল ৩·৮%। শিল্পখাতের এই মন্থর প্রবৃদ্ধি আভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাহত করে।

সারণী ২·৩

মূল্য সমন্বয়

(১৯৭৯/৮০ থেকে ১৯৮৪/৮৫)

(অংক টাকায়)

সামগ্রী	১৯৭৯/৮০ সালের মুল্য	১৯৮৪/৮৫ সালের মুল্য	শতকরা পরিবর্তন
খাদ্য সামগ্রী			
(১) রেশনের চাউল (প্রতি মণ)	১৩৭·০০	২৬২·০০	৯১·২
(২) রেশনের গম (প্রতি মণ)	১০৭·০০	১৬৭·০	৫৬·১
(৩) রেশনের চিনি (প্রতি সের)	৫·৬	১৩·০০	১৩২·১
মধ্যবর্তী সামগ্রী			
(৪) তুলোর সুতা (৩২ কাউন্ট/পাউণ্ড)	২০·৪৫	৩২·৯২	৬১·০
(৫) সিমেন্ট (প্রতি ব্যাগ)	৭৯·০০	৯৮·০০	২৪·১
(৬) ইউরিয়া সার (প্রতি মন)	৭০·০০	১৬১·৪৮	১৩০·৭
সেবা ও জনহিতকর কার্য			
(৭) রেলওয়ে সার্ভিস (যাত্রী ভাড়া প্রতি মাইল) ..	০·১০	০·১৪	৪০·০
(৮) বিদ্যুৎ (প্রতি কিলোওয়াট)	০·৯৯	১.৫২	৫৩·৫
(৯) প্রাকৃতিক গ্যাস (প্রতি মিলিয়ন কিউবিক ফিট) ..	৮·৮৬	২০·৪২	১৩০·৫
(১০) ডাক-মাশুল (প্রতি খাম)	০·৪০	১·০০	১৫০·০

২.২২। অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ১৯৮২ সালের নূতন শিল্পনীতি প্রবর্তন, যার ফলে বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্র বর্ধিত হয়। এই নীতির পক্ষে রাজস্ব কাঠামোর যৌক্তিকরণ করা হয় এবং উৎসাহ প্রদানমূলক কাঠামো সম্প্রসারিত করা হয়। আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামালের উপর কম হারে কর আরোপন, হ্রাসকৃত ব্যক্তিগত ও কোম্পানীকর, রপ্তানীর উপর বর্ধিত হারে কর মওকুফ, বর্ধিত হারে কর অব্যাহতি এবং বিনিয়োগ ভাতা প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কার্যকরী আমদানীকর ১৯৭৯/৮০ সালের ২৭% থেকে কমে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২৩% এ দাঁড়ায়। এর ফলে পরিকল্পনাকালে আমদানীকর ডলারে কর দেয় আমদানী ও বিনিময় হারে অব-মল্যায়নের মাধ্যমে যৌথ বর্ধিত হারের (৯১·০%) তুলনায় ১০১·৫% বৃদ্ধি পায়। কর-রাজস্বের প্রবৃদ্ধির হার বাৎসরিক ১৪·৩% এ দাঁড়ায় যেখানে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল প্রায় ১১·৭%; কর রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার প্রকৃত রূপে ২·৫% এ দাঁড়ায় যেখানে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৩·৮%। কর-জাতীয় আয়ের অনুপাত পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা ৯·৫% এর স্থলে ৮·০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮·২%-এ দাঁড়ায়।

২.২৩। পরিকল্পনাকালে রাজস্ব আয়ের অবস্থা নিম্নে দেখানো হল:

সারণী ২·৪

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কর আদায় (১৯৮০—৮৫)
(১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে)

[কোটি টাকায়]

উৎস		১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা			গড়ে প্রবৃদ্ধির হার (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আদায়	ঘাটতি (%)	
১। আমদানী শুল্ক	..	৬২৫	৪,৬১৮	৪,৪৫৫	৩·৫	১২·৪
২। আবগারী কর	..	২৮৫	৩,০০১	২,৬৪১	১২·০	১৯·৮
৩। বিক্রয় কর	..	২৮৪	২,১৬২	১,৭৩৫	১৯·৮	৭·৬
৪। আয়কর ..	..	১৮২	১,৫০৪	১,৫৬২	..	১৬·৫
৫। অন্যান্য ..	..	৮৪	৪৬৮	৭৬১	..	২১·৫
মোট ..	..	১,৪৬০	১১,৭৫৩	১১,১৫৪	৫·১	১৪·[illegible]

২.২৪। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজস্ব কর মূলতঃ আভ্যন্তরীণ দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে রাজস্ব আয়ে ঘাটতি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সাধারণভাবেই কর প্রশাসন একটি কঠিন কাজ। পরিকল্পনা-কালে নূতন ব্যবস্থাদি গ্রহণ না করলে এই ঘাটতি আরো বড় আকারে দেখা দিত।

২.২৫। দোদুল্যমান আমদানী এবং বেসরকারী খাতে উৎসাহদানমূলক ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করার জন্য সরকারী খাতে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্যায়নের মাধ্যমে (যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের পরিকল্পিত ২৮৬৯ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা ৯৪ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। সরকারী খাতের অর্থ সংস্থাসমূহ থেকে বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্রুত সম্প্রসারিত ঋণ দান কর্মসূচীর আওতায় বর্দ্ধিত হারে পুনঃ অর্থসংস্থান কর্মসূচীর মাধ্যমে অতিরিক্ত আয় হয়। যদিও সরকারী খাতে বেশ কিছু দ্রব্যের মূল্য বাড়ানো হয় এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়। সরকারী খাতের করপোরেশন থেকে আয় নিতান্তই কম ছিল। ছয়টি শিল্প করপোরেশন থেকে কেবলমাত্র ৯৩˙৮ কোটি টাকা আয় হয়।

২.২৬। সরকারের মোট রাজস্ব আয় ১৯৭৯/৮০ সালে ১,৭৭১ কোটি টাকার স্থলে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৩,৬৭৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয় এবং পরিকল্পনার ৫ বছরে মোট আয় পরিকল্পনার অভিক্ষেপ ১৬,৫৪০ কোটি টাকার স্থলে ১৪,১১৭ কোটিতে দাঁড়ায়। এতে করে ঘাটতি দাঁড়ায় ২,৪২৩ কোটি টাকা %), কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় যা ১৯৭৯/৮০ সালে জাতীয় আয়ের ১˙৭ শতাংশ ছিল তা ১৯৮৪/৮৫ সালে জাতীয় আয়ের ২˙৪ শতাংশে দাঁড়ায় এবং এই সময়ে মোট রাজস্ব জাতীয় আয়ের ৯˙৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০˙৮% এ দাঁড়ায়। সরকারী খাতে দেশীয় সম্পদ সংস্থানের প্রচেষ্টা পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হবার পিছনে কতকগুলি বিষয় বিবেচনাযোগ্য। এর মধ্যে রয়েছে প্রথমতঃ বেসরকারী খাতে উন্নয়নের জন্য কর অব্যাহতি ও কমানো, দ্বিতীয়তঃ অর্থনীতির মন্থর প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সরকারী খাতে দ্রব্যাদি ও সেবার মূল্য বেশ বাড়ানো হয়, যার ফলে চাহিদা কমে আগায় সরকারী খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বিক্রয় ও আয় বাধা প্রাপ্ত হয়।

২.২৭। রাজস্ব আয়ে মন্দ প্রবৃদ্ধি হলেও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, সরকারী খাতের কর্মচারীদের বর্দ্ধিত ক্ষতিপূরণ, খাদ্যক্রয়, ত্রাণ ব্যবস্থা প্রভৃতির ফলে সম্পদের চাহিদা বেড়ে যায়। রাজস্ব ব্যয় ১৯৭৯/৮০ সালের ১২৩৬ কোটি টাকার স্থলে মোট পরিকল্পিত অনুমিত ব্যয় ১০,২৭৮ কোটি টাকাকে ৪৫৪ কোটি টাকা ছাড়িয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৩১২৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এর ফলে উদ্বৃত্ত রাজস্ব আয় ১৯৭৯/৮০ সালে ৫৩৫ কোটি টাকা থেকে ১৯৮০/৮১ সালে ৯২৯ কোটি টাকায় উন্নীত হবার পর ১৯৮৪/৮৫ সালে ৫৪৭ কোটি টাকায় নেমে আসে এবং পরিকল্পনাকালে প্রত্যাশিত ৬২৬২ কোটি টাকার স্থলে ৩৩৮৫ কোটি টাকায় দাঁড়ানোর ফলে ঘাটতি দেখা দেয় ২৮৭৭ কোটি টাকা (৪৫˙৯%)। ১৯৮৩/৮৪ সালে সরকার ব্যাংকিং খাত থেকে বাড়তি অর্থ সরবরাহ কমিয়ে আনার জন্য বিশেষ ট্রেজারী বণ্ড চালু করে।

২.২৮। যদিও বেসরকারী খাতে সম্প্রসারিত করভিত্তিক প্রেরণাদি সরকারী খাতের ঘাটতির আংশিক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বেসরকারী খাতে তা পুরিয়ে নেবার প্রভাব ছিলনা। ৬১০০ কোটি টাকার ধার্যকৃত বেসরকারী বিনিয়োগ আশানুরূপভাবে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থসংস্থানের অভাবে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এর মূল কারণ ছিল বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব অর্থ সংস্থানের জন্য অর্থ যোগানো এবং ঋণ পরিশোধে করতে ব্যর্থতা। বেসরকারীখাতে বিনিয়োগ চলতি মূল্যে ৬৮৭১ কোটি টাকায় এবং ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে ৪৯৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায় যাতে ঘাটতি হয় ১৮˙৫%। বেসরকারী খাতের ভিতরে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মাধ্যমে ৬৮৭১ কোটি টাকার সর্বমোট বিনিয়োগের ৬৯% শতাংশের অর্থ সংস্থান হয়।

২.২৯। বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ বেসরকারী বিনিয়োগের এক বৃহৎ অংশের অর্থ যোগান দেয়। পরিকল্পনার পাঁচ বছরে চলতি মূল্যে বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ধরা হয় ২৫৪২ মিলিয়ন ডলার। যদিও প্রথম তিন বছরে বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ ১৯৭৯/৮০ সালের ২৬৩ মিলিয়ন ডলার থেকে বেশ দ্রুত বেড়ে ১৯৮২/৮৩ সালে ৫৯৮ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ১৯৮৩/৮৪ সাল থেকে তা বিশ্বে জ্বালানী মূল্যের ধ্বস এবং মধ্যপ্রাচ্যে উন্নয়ন কার্যাকলাপে গতিরোধের জন্য কমে আসে। সর্বমোট প্রেরীত অর্থের পরিমাণ ২৩৮৩ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। এতে করে ঘাটতি হয় ৬˙৩%। এর জন্য আমদানী এবং বেসরকারী সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ উভয়ই গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়।

২.৩০। রাজস্ব এবং মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশীয় সম্পদ সংস্থানের জন্য কার্যকরী প্রচেষ্টা, বেসরকারী সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জন্য রাজস্ব ও আর্থিক প্রেরণা এবং বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণের জন্য নমনীয় বিনিময় হার সত্বেও সঞ্চয় পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছতে ব্যর্থ হয়। জাতীয় সঞ্চয় ও জাতীয় আয়ের শতকরা আনুপাতিক হার পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ১১.২% এর স্থলে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৭.০% তে দাঁড়ায়।

বৈদেশিক লেন-দেন ভারসাম্যের পরিস্থিতি

২.৩১। পরিকল্পনা মেয়াদে বৈদেশিক লেন-দেনের ভারসাম্য ক্রমেই দুরূহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক সাহায্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে টানাপোড়নের মধ্যে পতিত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু করার সময় বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ ১৯৭০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বেড়ে ১৯৭৯/৮০ সালে ১২২৩ মিলিয়ন ডলারে পৌছায় এবং তা বাংলাদেশের প্রায় অর্দ্ধেকেরও বেশী আমদানীর জন্য অর্থ সংকুলান করে। এই গতি প্রবাহের আলোকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের প্রত্যাশা নির্ণয় করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম বছরেই বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ নিম্নগামী হয়ে উপর্যুপরি দু'বছরে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তপ্রবাহ ১৯৭৯/৮০ সালের সীমার নীচে থেকে যায়। পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ চলতি মূল্যে ৬৮৯৭ মিলিয়ন ডলার ধরা হয় (১৯৭৯/৮০ সালের স্থির মূল্যে ৬০৯৪ মিলিয়ন ডলার)। পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ ৬১৫৩ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে এই অন্তঃপ্রবাহ ৬২৬৩ মিলিয়ন ডলারে অনুমিত হয়। সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে ১৯৭৯/৮০ সালের নীচে বা প্রায় সমপর্যায়ে থাকে এবং ১৯৮৩/৮৪ সালে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং পরিকল্পনার শেষ বছরে ১৩২১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় যা ভিত্তিসীমার ৮.০% উপরে থাকে। যদিও নামমাত্র মূল্যে সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ অভিক্ষেপের চেয়ে ১০.৮% নীচে অবস্থান করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, সম্পদের স্বল্পতার জন্য ১৯৮২/৮৩ সাল থেকে অনুসৃত নিম্নগামী সমন্বয় নীতি আমদানী চাহিদারও হ্রাস ঘটায়। অধিকন্তু বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ যা পরিকল্পনার দু'বছরে আমদানী পর্যায়কে রক্ষা করতে সহায়তা করে, ১৯৮২/৮৩ সালে সর্বোচ্চ সীমা ৫৯৮ মিলিয়নে পৌছাবার পর ১৯৮৩/৮৪ সালে কমে আসে। প্রান্তিক বছরে তা ৪৭০ মিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। পরিকল্পনাকালে সর্বমোট প্রেরিত অর্থ পরিকল্পিত ২৩৫০ মিলিয়ন ডলার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫৩ মিলিয়ন ডলার বেশি হয়।

২.৩২। সর্বমোট আমদানীর মাত্রা ছাড়াও উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমদানীর গঠন ও বাৎসরিক প্রবাহে ব্যাপক স্থিতিশীলতার অভাব দেখা দেয়। ভিত্তি ও প্রান্তিক বছরের মধ্যে ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে আমদানী বাৎসরিক ৪.৫% হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্ত অন্তর্বর্তী সময়ে আমদানী উঠানামা করার দরুন গড় প্রবৃদ্ধির হার কেবলমাত্র ১.৭%-এ দাঁড়ায়। কেননা প্রকৃতপক্ষে আমদানী পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে সত্যিকার অর্থে ১৯৭৯/৮০ সালের সীমার নীচে বা প্রায় সমপর্যায়ে থাকে এবং এর প্রবৃদ্ধির প্রায় সবটাই প্রান্তিক বছরে ঘটে যা নিম্নে দেখানো হল :

সারণী ২.৫

আমদানী মাত্রা

(মিলিয়ন ডলারে)

বছর	আমদানী (কথিত)	আমদানী প্রকৃত
১৯৭৯/৮০	২,৩৬৬	২,৩৬৬
১৯৮০/৮১	২,৫৩৩	২,৩১৭
১৯৮১/৮২	২,৫৭২	২,৩৮১
১৯৮২/৮৩	২,৩১০	২,২৮৭
১৯৮৩/৮৪	২,৩৪২	২,৪৯৭
১৯৮৪/৮৫	২,৭০০	২,৯৫০
মোট (দ্বিতীয় পরিকল্পনা) ..	১২,৪৫৭	১২,৪৩২

টীকা : প্রকৃত আমদানী ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে।

২.৩৩ সার্বিক সাহায্য পরিস্থিতি নিম্নের সারণীতে দেখানো হল।

সারণী ২'৬

সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ

(মিলিয়ন ডলারে)

বছর	প্রকৃত অন্তঃপ্রবাহ	অন্তঃপ্রবাহ (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে)
১৯৭৯/৮০	১,২২৩	১,২২৩
১৯৮০/৮১	১,১৪৭	১,০৭৫
১৯৮১/৮২	১,২৪০	১,১৯৬
১৯৮২/৮৩	১,১৭৭	১,১৯১
১৯৮৩/৮৪	১,২৬৮	১,৩৬২
১৯৮৪/৮৫	১,৩২১	১,৪৩৯
মোট	৬,১৫৩	৬,২৬৩

যদিও সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ প্রকৃত অর্থে অভিক্ষেপকে ছাড়িয়ে যায় এটা অনস্বীকার্য যে যেখানে বাৎসরিক বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে ছিল ৩'৩% এবং এই নামমাত্র সাহায্যের মন্থরতর প্রবৃদ্ধি আমদানী শুল্ক প্রাপ্তিকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করে, যার প্রভাব আংশিকভাবে দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের দ্বারা উপশম করা হয়। টাকার মান পরিকল্পনাকালে ৬৭'৭% বা বাৎসরিক ১১'০% কমিয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১ ডলার= ১৫'৫ টাকা থেকে ২৬'০ টাকায় আনা হয়।

২'৩৪। পরিকল্পনার প্রারম্ভ থেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিবেশ উন্নত দেশসমূহের দ্বারা মুদ্রা সংকোচন নীতিমালা অনুসরণ করার ফলে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। যার ফলে পরিকল্পনার তৃতীয় বছরে বিশ্ববাণিজ্য বাস্তবিকপক্ষে হ্রাস পায়। মুদ্রা সংকোচন নীতিমালা চাহিদাকে বাধাগ্রস্ত করে। আমদানী কমিয়ে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার প্রবণতা বৃদ্ধি উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে আমদানীকে আরো সীমিত করে আনে। তাই বাংলাদেশের রপ্তানীকে দুর্বল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিবেশের মোকাবিলা করতে হয়। রপ্তানী আয়কে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এমনকি পাট ও পাটজাত দ্রব্যে বাংলাদেশ প্রধান যোগানদার হওয়া সত্ত্বেও তাকে মূল্য ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করতে হয়। তার দুর্বল অবস্থা এর মধ্য দিয়েই প্রতীয়মান হয় যে আমদানী মূল্যসূচক কমা সত্ত্বেও বাণিজ্য বিনিময় হার পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরে ৪০% কমে আসে যা পরবর্তী তিন বছরে আংশিকভাবে পুষিয়ে আনা সম্ভব হয় কেননা তার রপ্তানী

মূল্যের হ্রাস আমদানী মূল্যের তুলনায় দ্রুততর ছিল। পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরে বাণিজ্য বিনিময় হারে অবনতির জন্য বাংলাদেশ প্রায় ২০০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের প্রকৃত সম্পদ হারায় কেননা বাংলাদেশকে এক ডলার মূল্যের আমদানীর জন্য ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে ১.১৫ ডলার রপ্তানী মূল্য প্রদান করতে হয়।

রপ্তানীর অগ্রগতি

২.৩৫। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দুর্বল প্রভাব সত্বেও রপ্তানী আয় চলতি মূল্যে ১৯৭৯/৮০ সালের ৭২১ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৯৩৯ মিলিয়ন ডলারে এবং প্রকৃত অর্থে ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে ৯১৭ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। রপ্তানী মূল্যসূচক ১৯৮২/৮৩ সালে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে এবং তা ১৯৭৯/৮০ সালের ৭৭% এ দাঁড়ায়। ১৯৮২/৮৩ সালের পর তা ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় ফিরতে শুরু করে ও পরিকল্পনার শেষ বছরে ভিত্তিসীমার ১০৬%-এ পৌঁছায়। বাৎসরিক রপ্তানীর প্রবৃদ্ধির হার সত্যিকার অর্থে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার ৮.৭% নীচে অবস্থান করে। অর্জিত হার ছিল ৪.৯% এবং পরিকল্পনা মেয়াদে সর্বমোট রপ্তানী আয় পরিকল্পিত অভিক্ষেপ ৪৭৯০ মিলিয়ন ডলারের স্থলে ৪৩৯৪ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। রপ্তানীর বাৎসরিক বন্টন নিম্নে দেখানো হল:

সারণী ২.৭

রপ্তানী আয়

(মিলিয়ন ডলার)

বছর	কথিত মূল্য	প্রকৃত মূল্য
১৯৭৯/৮০	৭২১	৭২১
১৯৮০/৮১	৭১১	৮২৫
১৯৮১/৮২	৬২৬	৮৪৯
১৯৮২/৮৩	৬৮০	৯০০
১৯৮৩/৮৪	৭৮৬	৯০২
১৯৮৪/৮৫	৯৩৯	৯১৭
মোট (পরিকল্পনা মেয়াদে):	৩,৭৪২	৪,৩৯৪

টীকা: প্রকৃত মূল্য ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে।

২.৩৬। যদিও প্রকৃত রপ্তানী আয় আন্তর্জাতিক পরিবেশের অবনতির প্রেক্ষাপটে লক্ষ্যমাত্রার নীচে থাকে, অর্জিত প্রবৃদ্ধির প্রকৃত হার ৪.৯% যুক্তিসংগতভাবে সন্তোষজনক অগ্রগতি নির্দেশ করে এবং পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের (১৯৭৫—৮০) ৪.৭% এর তুলনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী যা রপ্তানী আয়ের প্রধান উৎস ১৯৭৯/৮০ সালের ৫৩০ মিলিয়ন ডলার থেকে কমে ১৯৮৪/৮৫ সালে চলতি মূল্যে ৫৪৯ মিলিয়ন ডলারে এবং ১৯৭৯/৮০ সালের

মূল্যে ৫১০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। চা ও হিমায়িত মৎস্যের রপ্তানী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সব চেয়ে উন্নতি হয় তৈরী পোষাক রপ্তানী ক্ষেত্রে যা অর্ধ মিলিয়ন ডলারের কিছু বেশী থেকে বেড়ে ১১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। রপ্তানী আয়ের বেশীর ভাগ চা, চামড়া ও হিমায়িত দ্রব্য থেকে আসার দরুন রপ্তানী আয়ে শিল্পজাত দ্রব্য থেকে আয় ১৯৭৯/৮০ সালের ৬৯'২% থেকে কমে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৬৬'১ শতাংশে দাঁড়ায় যদিও পরিকল্পনায় শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী থেকে যোজিত মূল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়।

আমদানী মাত্রা

২'৩৭। রপ্তানী আয়ের প্রকৃত অর্থে ৩৯৬ মিলিয়ন ডলার ঘাটতির বিপরীতে বৈদেশিক সাহায্য পরিকল্পিত মাত্রাকে ১৬৯ মিলিয়ন ডলারে ছাড়িয়ে যায়। তাদের পরস্পরকে বাতিল করার প্রভাব সত্ত্বেও আমদানী পরিকল্পিত মাত্রাকে ৯৪৭ মিলিয়ন ডলারে অতিক্রম করে। সর্বমোট আমদানী প্রকৃত অর্থে পরিকল্পিত মাত্রা ১১,৪৮৫ মিলিয়ন ডলারের স্থলে ১২,৪৩২ মিলিয়ন ডলারে পৌছায়; কিন্তু বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল কেবলমাত্র ১'৭%; যদিও পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি নামমাত্র ০'৩% ধরা হয়। পরিকল্পনা মেয়াদে ঋণ পরিশোধ দায়িত্ব রপ্তানী আয়ের শতকরা হিসাবে ১৯৭৯/৮০ সালের ১৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২১% এ দাঁড়ায় যার ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমান বৈদেশিক সম্পদের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। ঋণ পরিশোধের দায় ১৯৭৯/৮০ সালের ৯৩'৬ মিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৯৬'৮ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় এবং পরিকল্পনা মেয়াদে সর্বমোট ঋণ পরিশোধ দাঁড়ায় ৬৬৬ মিলিয়ন ডলারে। এ ছাড়াও স্বল্পমেয়াদী ঋণ দায় পরিশোধের ন্যায় অন্যান্য উপাদানও আমদানী প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

মুদ্রা, মূল্য ও মজুরী

২'৩৮। সত্তর দশকের দ্রুত মুদ্রা সম্প্রসারন এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষাপটে মুদ্রার তারল্যকে যা জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি, আত্মপোষনশীল খাতের মুদ্রাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি এবং দ্রব্য ও সেবায় সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে উদ্ভব হতে পারে তাকে নিরাপদ সীমার মধ্যে রাখার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনা আর্থিক নীতি প্রণয়ন করে। তদনুসারে মুদ্রা সরবরাহ ১৯৭৯/৮০ সালের ১৬৯৯ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৩৩১৩ কোটি টাকায় এবং একই সময় টাকার তারল্য ৩৪৩১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৬৫১৭ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে ধরা হয়। ১৯৮৫ সালের জুন মাসে প্রকৃত মুদ্রা সরবরাহ ছিল ৪৪৩৯ কোটি টাকা যা পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার ৩৪ শতাংশ উর্দ্ধে থাকে এবং টাকার তারল্য ১০,৭৫৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায় যা পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রাকে ৬৫% ছাড়িয়ে যায়। এই সব অধিকমাত্রায় সম্প্রসারণ ঘটে যখন প্রকৃত জাতীয় আয় পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার ৩০% নীচে থাকে। কতকগুলি বিষয় এসব সম্প্রসারণে সহায়তা করে। প্রথমতঃ দেশীয় ঋণ কার্যক্রম পরিকল্পিত প্রত্যাশার ৪১৪৭ কোটি টাকা বেশ দ্রুততর গতিতে ৮৮০৩ কোটি টাকায় সম্প্রসারিত হয়। বেসরকারী খাতই এই বর্দ্ধিত ঋণের প্রধান প্রাপক ছিল। এইখাতে ঋণ ৩৮০% বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। এর মধ্য দিয়ে অর্থনীতির ক্রমবর্দ্ধমান উদারতা ও ব্যক্তিমালিকানার প্রতি নীতির পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়। একটি বিশেষ ব্যাপার যা ঋণকে দ্রুত বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করে তা হল সাধারণভাবে ঋণ অনাদায়ের হারের অবনতি। দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক খাতের অবস্থাও তারল্য বাড়াতে ইন্ধন যোগায়। পরিকল্পনা নীট বৈদেশিক সম্পদে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ধরে নিলেও বস্তুতঃ তা বেড়ে যায়; অন্যদিকে বর্দ্ধিত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মুদ্রা সম্প্রসারণে সহায়তা করে। তৃতীয়তঃ প্রকৃত সুদ হার নীতির প্রবর্তন দীর্ঘকালীন জমাকে উৎসাহিত করে, যা মুদ্রা সম্প্রসারণের ভিত্তি স্থাপন করে। পরিশেষে পরিকল্পনা মেয়াদে বেসরকারী খাতের অর্থ চাহিদা দাতা দেশগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বেশ পরিমান বৈদেশিক সম্পদ কতকগুলি খাতের অর্থ চাহিদা বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার সহায়তায় অনুপ্রবেশ ঘটে।

২·৩৯। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ১৯৭৫ সালে কতকগুলি প্রধান পরিবর্তন সাধনের পর থেকেই বিশেষ দৃষ্টি পেয়ে আসছে। এগুলি হচ্ছে (১) ডলারে টাকার ৫৮% মূল্য হ্রাস করণ, (২) ৫০০ টাকা নোটের বাতিল করণ এবং (৩) আয়ের চেয়ে বেশী খরচ প্রথার বিরতি। কিন্তু মুদ্রা এবং তারল্যের সংখ্যা প্রতীয়মান করে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা আরও শিথিল হয়। এপর্যায়ে দেখা যায় যে অধিকতর সম্প্রসারিত মুদ্রা ও তারল্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রদত্ত সম্প্রসারিত আর্থিক সুযোগের বিরতি ঘটিয়েছে। একভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিপরীত দিকে মোড় নিয়ে১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি কালীন অবস্থায় ফিরে যায়। আর্থিক খাতে একমাত্র আশার সঞ্চার করে ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে প্রকৃত সুদ হারের প্রবর্তন যখন জমার উপর ভারপ্রাপ্ত গড় সুদের হার শতকরা দুইভাগ বাড়িয়ে ৬·৫ শতাংশে উন্নীত করা হয় এবং সেই পরিমানে ধারের হারকে প্রায় ১৩ শতাংশে বাড়ানো হয়। তখন থেকে জমা ও ধারের হার ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি যদিও আর্থিক অবস্থায় বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে তবে এর বাইরে বাছাইয়ের ভিত্তিতে যেমন অপ্রচলিত রপ্তানী এবং চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকা উন্নয়নের জন্য ঋণের হারে কিছু রদবদল করা হয়। জমার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুদের হার যেখানে ছিল ১৫% এবং সাধারণ অগ্রিমের উপর সুদের হার ছিল ১৫·৫% তা পরবর্তীতে বাড়িয়ে ১৬ শতাংশে আনা হয়।

২·৪০ পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় আর্থিক খাতের দ্রুত সম্প্রসারন এবং প্রকৃত খাতের (জাতীয় আয়) মন্থর প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সমগ্র পরিকল্পনা মেয়াদে দ্রব্য বাজারে গুরুতর মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করে। পাইকারী মূল্য সূচক বাৎসরিক ১১·৭% বৃদ্ধি পায় যেখানে ঢাকার মধ্যবিত্ত পরিবারের ভোগের মূল্যসূচক পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের ৬·৩% বৃদ্ধির স্থলে বাৎসরিক ১১·৮% হারে বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাস্ফীতির হার ১৯৮১/৮২ সাল ছাড়া মোটামোটিভাবে অপরিবর্তিত ছিল যখন কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ায় খাদ্য মূল্যকে অত্যধিক বাড়িয়ে দেয়। প্রধান যে উপকরণটি মুদ্রাস্ফীতির হারকে অটল রাখতে সহায়তা করে তা হচ্ছে খাদ্য বাজারে সরকার কর্তৃক হস্তক্ষেপ, কেননা কৃষি আবহাওয়ার খামখেয়ালীর দ্বারা প্রভাবান্বিত।

২·৪১ সঞ্চয়ের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব প্রকৃত সুদ নীতির মাধ্যমে ঢাকা দেওয়া হয় কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির উচ্চহার বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠির উপর অসামঞ্জস্য প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ ঢাকার উচ্চ আয়ের পরিবারের ভোগের মূল্যসূচক কেবলমাত্র ৮·৪% হারে বৃদ্ধি পায় যেখানে মধ্যবিত্ত ও ঢাকার নিম্নবিত্ত পরিবারের মূল্যসূচক যথাক্রমে ১১·৬% এবং ১১·৮% বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ চট্টগ্রামের শিল্প কারখানার শ্রমিকদের ভোগের মূল্যসূচক বাৎসরিক ১১% হারে বৃদ্ধি পায় যেখানে নামমাত্র শিল্প মজুরী মোটের উপর বাৎসরিক ১৪·৬% হারে বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থা প্রমাণ করে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্প কারখানার শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী বাৎসরিক ৩·৬% হারে বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির বেশীর অংশ পরিকল্পনার শেষ বছরে ঘটে যদিও এই বৃদ্ধির কিছু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় যা নিম্নে দেখানো হল:

সারণী ২·৮

শিল্প শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী

বছর	জীবনযাত্রার মূল্যসূচক	শিল্প কারখানার মজুরীসূচক	শিল্প কারখানার প্রকৃত মূল্যসূচক
১৯৭৯/৮০	৫৩৯	৩৮৯	১০০
১৯৮০/৮১	৫৭৯	৪৫২	১০৭
১৯৮১/৮২	৬৬২	৫১৫	১০৮
১৯৮২/৮৩	৭০৮	৫৫৮	১০৯
১৯৮৩/৮৪	৮০৭	৭২০	১২৪
১৯৮৪/৮৫	৯০৯	৭৭০	১১৭

টীকা: চট্টগ্রামের শিল্প কারখানার কর্মীদের জন্য জীবনযাত্রার মূল্যসূচক নেয়া হয়েছে।

২.৪২। মুদ্রাস্ফীতি শহর এবং গ্রামের খানার উপর ভিন্নতর প্রভাব বিস্তার করে কেননা দু'জায়গার বণ্টন ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক। শহর এলাকায় দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকাগুলি উদ্বৃত্ত সরবরাহের উপর নির্ভরশীল; এমন কি কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী যথা খাদ্যের বেলায়ও পল্লী এলাকাগুলো প্রকৃতির খামখেয়ালী দ্বারা প্রভাবান্বিত। ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ এলাকার মূল্যস্তর শহর এলাকা অপেক্ষা অধিকতর অস্থিতিশীল। ঢাকা অঞ্চলের পল্লীবাসিদের ভোগের মূল্যসূচক বাৎসরিক ১২.৫% বৃদ্ধি পায় যা ঢাকার মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারবর্গ যে হারে মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন হয়েছে তার চেয়ে বেশী। পল্লী অঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতি হার ১৯৮১/৮২ সালের অবনতির পর কৃষির পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং সরকার কর্তৃক খাদ্যব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের ফলে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। এটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পরিকল্পনাকালে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ খাদ্য বিতরণ করা হয়।

আয় ও কর্মসংস্থান

২.৪৩। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দারিদ্র ও বেকারত্বের প্রখরতার পরিপ্রেক্ষিতে সত্তর দশকে দারিদ্র মোচনের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক কর্মকাণ্ড বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় এবং বাইরে হাতে নেয়া হয়। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পর পরই চালু করা হয়। ১৯৭৫/৭৬ সালে এর পরিধি ১১৬ হাজার টন খাদ্য বিতরণ থেকে বেড়ে ১৯৭৯/৮০ সালে (শস্যহানির আর একটি বছরে) ৪৪০ হাজার টনে উন্নীত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে খাদ্য বিতরণের পরিমাণ ৩৫০ থেকে ৪৪০ হাজার টনের মধ্যে থাকে, পরিকল্পনার শেষ বছরে এর কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে এবং তখন এর পরিমাণ ৫৭১ হাজার টনে দাঁড়ায়। পরিকল্পনাকালে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য বিতরণ ২১.৩৭ লক্ষ টনে দাঁড়ায় যা ১৯৭৫—৮০ সালে ছিল ১১.৪৩ লক্ষ টন। এই কর্মসূচীতে স্বল্পকালীন কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে খাদ্যরূপে আয় বণ্টন হয়। পরিকল্পনাকালে ২১.৩৭ লক্ষ টন খাদ্য বিতরণ ১১৪৯ মিলিয়ন শ্রমদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। অন্যান্য কর্মসংস্থান এবং আয় সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী, গ্রামীণ ব্যাংক, স্বনির্ভর পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকাণ্ড (NGOs)। এলাকাভিত্তিক কর্মসূচীর কর্মসংস্থান ও আয়ের প্রভাব স্বাতন্ত্র বা সমষ্টিগতভাবে উল্লেখযোগ্য হয়নি কেননা এ সমস্ত কর্মসূচীতে স্বল্প পরিমাণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল এবং তুলনামূলকভাবে উৎপাদন এবং ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জলসেচের প্রযুক্তির সম্প্রসারণ খুব দ্রুত না হওয়ায় কৃষিকার্যে সরাসরিভাবে কর্মসংস্থান সুবিধা সৃষ্টি করতে পারেনি। বস্তুতঃ সেচের একরে অনেক ঘাটতি থেকে যায়। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু থাকা সত্ত্বেও গ্রামীণ বেকারত্ব বেড়ে যায়। এই সমস্যা বর্দ্ধিষ্ণু ভূমিহীনতার মধ্যে দিয়ে চরমে পৌঁছে। ক্ষুদ্র-চাষীসহ (১.৫ একর জমির নীচে) ভূমিহীন খানা গ্রামীণ খানার দুই-তৃতীয়াংশে দাঁড়ায় এবং পল্লী এলাকায় সার্বিক বেকারত্ব ২৫ শতাংশে উন্নীত হয়।

২.৪৪। জমি এবং সেচ কর্মসূচীর সীমিত ক্ষমতার জন্য কৃষিখাত বহির্ভূত কর্মসংস্থানের উপর জোর দেয়া হয়। কুটির শিল্প উন্নয়নের মধ্য দিয়ে এ ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়। কুটির শিল্পগুলিতে কম বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় বলে তাদের উন্নয়ন কম খরচে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তাদের শ্রম খুব কম, অদক্ষ কৃষি মজুরীর প্রায় ৩০%। তাই সেখানে তারা গরীব খানাগুলিকে জীবিকা নির্বাহ করতে সহায়তা করে কিন্তু দারিদ্রের উপর তাদের সার্বিক প্রভাব উল্লেখযোগ্য নয় যদিও সংখ্যাগত দিক থেকে কর্মসংস্থানের উপর তাদের প্রভাব বেশ বড়। বস্তুতঃ কম শ্রমদক্ষতার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী কৃষিবহির্ভূত কর্মসংস্থানের সুবিধাদি যেমন ধানভানা, তেল পেষা এবং হস্তচালিত তাঁত আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার সম্মুখে কমে আসছে।

২.৪৫ দেশে সীমিত সুবিধাদির জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জনসাধারণ বিদেশে কর্মসংস্থানের দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়ে। ১৯৮১ সালে দেশত্যাগী শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৭৯ সালের ২৪ হাজার এবং ১৯৮০ সালের ৩০ হাজার থেকে বেড়ে ৫৬ হাজারে উন্নীত হয় এবং পরিকল্পনার পরবর্তী বছরগুলিতে এই পর্যায়ে

থাকে, তবে ১৯৮২ সালে এর ব্যতিক্রম ঘটে যখন তা প্রায় ৬৩ হাজারে উন্নীত হয়। ১৯৮৪ সালে স্বল্পকালের জন্য কমে আসার পর, মাসিক বহিঃপ্রবাহ ১৯৮৫ সালে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যা'হোক, অদক্ষ কর্মী, যারা বেকারত্ব থেকে প্রধানতঃ দুর্ভোগ পোহায়, মধ্যপ্রাচ্যের উন্নয়ন কর্মসূচী ভাটা পড়ায় তাদের জন্য সুযোগ সুবিধাদি কমে আসে। পরিকল্পনার পাঁচ বছরে বিদেশে ৩৪০ হাজার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে ৩০০ হাজার চাকুরীতে বহাল হয় এবং বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ প্রত্যাশিত ২৫৪২ মিলিয়ন ডলারের স্থলে চলতি মূল্যে ২৩৮৩ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়।

২.৪৬। সার্বিক কর্মসংস্থান পরিস্থিতি পরিকল্পনাকালে অপরিবর্তিত থাকে। মোট ৩'৬৫ মিলিয়ন নূতন কর্মসংস্থানের স্থলে ১৯৮৪/৮৫ সালে তা ৩'২০ মিলিয়নে দাঁড়ায়। সর্বমোট ৩'৪৩ মিলিয়ন নূতন শ্রমিক তালিকাভুক্ত হয় যার ফলে বেকারত্ব বেড়ে যায়। গ্রামীণ বিধিবদ্ধ এবং অ-বিধিবদ্ধ খাতে বাড়তি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। শহরের বিধিবদ্ধ খাত বিশেষ করে সরকারী খাত বেকারত্ব অবস্থা সমাধানের জন্য খুব কমই সহায়তা করে, কেননা পরিকল্পনাকালে আধুনিক খাতে বিনিয়োগ পর্যায়ে খুব কমই উন্নতি ঘটে।

বেসরকারী খাত

২.৪৭। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বেসরকারী খাত বিশেষ ভূমিকা পালনের ফলে অর্থনীতিতে তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খাতের সীমিত সম্পদ এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উপর ক্রমশঃ চাপ সৃষ্টি হওয়ায় বেসরকারী খাতের উপর আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮—৮০) ১৬% এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১১% বিনিয়োগ বরাদ্দের তুলনায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারী খাতে ৩৫ শতাংশের উর্ধে বিনিয়োগ বরাদ্দের মধ্য দিয়েই এর প্রতিফলন ঘটে।

২.৪৮ অর্থনীতিকে আরো বাজারমুখীকরণ এবং বেসরকারী খাতে বৃহত্তর নির্ভরশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকারী নীতিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় যা নিম্নরূপ:

(১) ১৯৮২ সালের জুন মাসে একটি নূতন শিল্প নীতি ঘোষণা করা হয়। নূতন শিল্প নীতির প্রধান বিশেষত্বগুলি হচ্ছে (ক) পাট ও বস্ত্র কারখানাগুলির বিজাতীয়করণ (১৯৮৫ সালের জুন মাসের মধ্যে ৯৫৭৮টি তাঁতসহ ৩৩টি পাট কারখানা এবং ৪'৯৭ লক্ষ স্থাপিত টাকু এবং ৪৭৭১টি তাঁতসহ ২৭টি বস্ত্র কারখানা বেসরকারী খাতে ফেরত দেয়া হয়, (খ) মুক্ত তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ এবং (গ) প্রশাসনিক স্তর কমানো সহ বিনিয়োগ অনুমোদন এবং ঋণ বিতরণ পদ্ধতি সহজতর এবং বিকেন্দ্রীকরণ।

(২) নূতন শিল্পনীতি বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগ উন্নয়ন ও রক্ষণ আইন ১৯৮০ বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগকে সরাসরিভাবে বা যৌথভাবে বিশেষ করে চট্টগ্রাম রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় উৎসাহিত করার জন্য প্রচলন করা হয়।

(৩) পরিকল্পনাকালে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কতকগুলি পরিবর্তন সাধিত হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে বেসরকারী খাতে ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানী, সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীর জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং পত্তন দিবার জন্য শিল্প উন্নয়ন পত্তন কোম্পানী এবং সৌদি বাংলাদেশ শিল্প ও কৃষি কোম্পানী স্থাপন।

২.৪৯। বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য রাজস্ব ও অন্যান্য প্রেরণার সময় সময় পর্যালোচনা এবং নীতি-মালা প্রণয়নের জন্য একটি শিল্প উন্নয়ন জাতীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

২.৫৩। নীতির ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়তে থাকে যদিও পরিমাণের দিক থেকে তা খুব একটা বেশী ছিল না। বেসরকারী বিনিয়োগ পরিকল্পনাকালে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের ১৭৮৬ কোটি টাকার স্থলে প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৮৭১ কোটি টাকায় উন্নীত হয় (সারণী-২.৯)। বিনিয়োগ-এর খাতওয়ারী কাঠামোতে কৃষি খাত প্রাধান্য পায়; শিল্প খাতে বিনিয়োগ দুটি উন্নয়ন অর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠানের ঋণ বাতিল করার জন্য ব্যাহত হয় যদিও নীতি ক্ষেত্রে অনেক উদারতা প্রদর্শন করা হয়। গত দশকে বেসরকারী বিনিয়োগ (বাজার অন্তর্ভুক্ত) মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে। তা, ১৯৭৯/৮০ সালের জাতীয় আয়ের ৪.৪% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৫.৭ শতাংশে উন্নীত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রতিষ্ঠানিক ঋণ বিতরণ ৪৭৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় বা প্রাক্কলিত বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের ৬৯%, বাকী ৩১ শতাংশের অর্থসংস্থান উদ্যোক্তাদের নিজেদের পুঁজি বা ইকুইটির মাধ্যমে হয় (সারণী-২.১০)।

সারণী ২.৯

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেসরকারী বিনিয়োগ

(১৯৮০—৮৫)

(কোটি টাকায়)

খাত	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫	মোট (১৯৮০—৮৫)
(১) কৃষি	২০০	৭৭৭	২,৪৬৫
(২) শিল্প	১৭০	২১১	১,১২৪
(৩) ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ণ ..	১৬৪	৪৪৯	১,২৫২
(৪) পরিবহন	১১৫	২৩৯	৯২৫
(৫) বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবা ..	১৫০	৩০১	১,১০৫
মোট : ..			
(ক) চলতি মূল্যে	৭৯৯	১,৯৭৭	৬,৮৭১
(খ) ১৯৭৯/৮০ সালের স্থির মূল্যে	৭৯৯	১,১৩৯	৪,৯৬৯

টীকা : ১৯৭৯/৮০ ভিত্তি সালের পাইকারী মূল্য সূচক দ্বারা মূল্যমান হ্রাসকৃত।

সারণী ২'১০

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেসরকারী বিনিয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ

(১৯৮০—৮৫)

(কোটি টাকায়)

বছর			বেসরকারী বিনিয়োগ	ঋণ বিতরণ	ঋণ বিনিয়োগের শতাংশরূপে
১৯৮০/৮১	..	..	৯৯৬	৬২০	৬২
১৯৮১/৮২	..	..	১,০৪৭	৬০৫	৫৮
১৯৮২/৮৩	..	..	১,১৬৭	৮৫০	৭৩
১৯৮৩/৮৪	..	..	১,৬৮৪	১,২৮৭	৭৬
১৯৮৪/৮৫	..	..	১,৯৭৭	১,৪০৮	৭১
মোট (১৯৮০—৮৫)		..	৬,৮৭১	৪,৭৭০	৬৯

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন প্রশাসন

২.৫১। পরিকল্পনার কৃতকার্যতা বহুলাংশে এর বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে যা পরিকল্পনার কাঠামো গঠনকারী প্রকল্প থেকে উদ্দেশ্য, কৌশল এবং কর্মসূচী প্রতিফলিত নীতিমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রশস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শুরু। একটি প্রকল্প থেকে যা প্রত্যাশা করা হয়েছিল তা পেতে হলে, সাবিক ও খাত পর্যায়ে নীতিমালার বাস্তবায়ন দক্ষতার সংগে প্রকল্প বাস্তবায়নের মতই প্রয়োজন। কেননা এসব নীতিমালাই প্রকল্প সম্পন্ন হবার পর যে অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে অভিপ্রেত ফল প্রদান করবে তা স্থির করে। প্রকৃতপক্ষে একটি প্রকল্প হচ্ছে একটি পুঞ্জীভূত জল যা ভবিষ্যতে প্রবাহিত হয়। এই জমা প্রবাহের পৃথকতাই একটি প্রকল্পকে জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় করে তোলে যা পরিবর্তনশীল পরিবেশের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সত্যিকারভাবে তার পরিকল্পনা কালকে ছাড়িয়ে যায়। এই চিন্তাধারা থেকেই প্রকল্প সম্পন্ন হবার পর সঠিক ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং এর অভাবে একটি প্রকল্প অনুর্বর এবং তার বাস্তবায়ন অর্থহীন হতে পারে। অনেক উদাহরণই রয়েছে যেখানে প্রকল্প সম্পন্ন হবার পর ফলপ্রসূ হয়নি। এই প্রশস্ত ধারনায় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন তার প্রণয়নের চেয়েও অনেক জটিল বিশেষ করে যখন একটি পরিকল্পনা তার ভিত্তি ও প্রান্তিক বছরের অবস্থাসমূহের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পর অর্থনীতির উন্নয়নের গতিধারা এবং এর পরিবেশের পর্যালোচনার সংগে খুব কমই সম্পর্ক বজায় রাখে। বস্তুতঃ যদি কাল ও অবস্থার সংশয় ঘটে তাহলে পরিকল্পনা প্রণয়ন তার সাধারণ বাস্তবায়নের চেয়ে অতি কম সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সহজেই সম্পন্ন করা যেতে পারে, কেননা বাস্তবায়নকে বাস্তবধর্মী জগতের সংগে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয় যা কাল ও ভৌগোলিক বিভিন্নতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

২.৫২। উপরোল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। প্রথমতঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনা কাল বিশ্বের অতি দুস্থ অর্থনীতি অবস্থার সংগে মিশে যায় যখন বাণিজ্য, মূল্য ও নীতিতে পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনার গতি পল্লী উন্নয়নে ধাবিত হয় কিন্তু কেন্দ্রীয় উন্নয়ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থানীয় চাহিদা কার্যকরীভাবে মেটাতে অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং পরিকল্পনার প্রথম কয়েক বছরে এবং তার আগেও স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে পল্লী উন্নয়নের চাহিদা মেটানোর জন্য কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার, বিকল্প পদ্ধতিসহ স্বনির্ভর বাংলাদেশ, খাল খনন, স্থানীয় কমিটির উপর ভিত্তি করে খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচী, গ্রামীণ ব্যাংক, স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী এবং সর্বোপরি দুই পর্যায়ে সমবায় ইত্যাদি এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল; তাদের মধ্যে কিছু কিছু শেষ পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায়। এই পন্থাসমূহ দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত হয়। এগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ও ব্যক্তিস্বমুখী অথবা কাঠামোগতভাবে স্থানীয় পর্যায়ে পদক্ষেপে ব্যাপ্তিশীলতার অভাব ছিল। কিন্তু যেহেতু এগুলি সাধারণভাবে সংকটময় পরিবেশে অগ্রিমের উপর নির্ভরশীল ছিল, তাদের কৃতকার্যতা অসংগতভাবে উন্নয়নের চেয়ে টিকিয়ে থাকার জন্য ঋণ পরিশোধের মাপকাঠিতে বিচার্য ছিল।

২.৫৩। স্থানীয় পর্যায়ের বাইরে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের প্রতি পরিবর্তনশীল নীতিসহ লোক প্রশাসনের ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। লোক প্রশাসন ও তার অধীনস্থ সংস্থাসমূহের পুনর্গঠনের জন্য উপর্যুপরি প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে যাতে করে উন্নয়নের চাহিদা বায় যৌক্তিক উপায়ে মোকাবেলা করা যায়। পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্রে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পকে ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে রূপান্তরিত করা হয় যার সাহায্যকল্পে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সংগঠন রয়েছে। কিন্তু ১৯৮২ সালের সুদূর প্রসারী প্রশাসনিক পুনর্গঠনের আগে জাতীয় পর্যায়ে লোক প্রশাসনে আনুষ্ঠানিক পরিবর্তনসমূহের সংগে স্থানীয় পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন যোগসূত্র ছিলনা যার জন্য কেন্দ্র বহির্ভাগের মধ্যে বিভেদ ছিল একটা স্থায়ী অবস্থা। ১৯৮২ সালের ব্যাপক পরিবর্তন লোক প্রশাসনকে উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে এবং স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর উপর ক্ষমতাসহ উপজেলা পরিষদ (স্থানীয় পরিষদ) স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়। ১৯৮২ সালের পরিবর্তন কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে ঢেলে সাজায় যাতে করে বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকরী হয় এবং উপজেলা পর্যায়ে ক্ষমতার পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে। যেহেতু ১৯৮২ সালের পরিবর্তন আকৃতিতে বহুমুখী ও সুদূর প্রসারী, উন্নয়ন চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর মৌলিক উপকরণগুলির কিছু আলোচনা প্রয়োজন যা নিম্নের অনুচ্ছেদগুলিতে দেয়া হল।

প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্গঠন

২.৫৪। উন্নয়নের দিক থেকে সরকারের গঠন ও কার্য্যকলাপকে যুক্তিযুক্ত করার জন্য ১৯৮২ সালে যে বিশেষ কমিটি স্থাপন করা হয় তার সুপারিশ ছিল এই যে, সচিবালয় সরকারের মূল কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে নীতি প্রণয়ন এবং পরিকল্পনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, এবং নীতি বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার দায়িত্ব স্থানীয় সক্রিয় সংস্থাগুলির উপর ন্যাস্ত হবে। এতে করে একটি এড-হক স্বল্প মেয়াদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে চিন্তাধারায় প্রাথমিক পরিবর্তন সাধিত করায় বিভিন্ন শিক্ষার সংগে সংহতি রেখে চাকুরী কাঠামো পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন দেখা দেয়, যাতে করে সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে পেশাগত দক্ষতা বাড়িয়ে তোলা যায়। ব্যবস্থাপনা নীতির উন্নয়ন সাধন করা ছিল দ্বিতীয় প্রয়োজন/দরকারী জিনিষ। এই লক্ষ্যে কতকগুলি প্রয়োজন উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় এবং চারটি লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে একটি লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (PATC) রূপান্তরিত করা হয় যাতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরকে সন্নিবেশিত করে প্রশাসনের গতিশীল আকৃতি নিশ্চিত করা যায়। প্রশিক্ষণ নীতিকে প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্য্যালোচনা করার জন্য একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল স্থাপন করা হয় যাতে শিক্ষা ব্যবস্থা, লোক প্রশাসন এবং উন্নয়নের মধ্যে সমঝোতা নিশ্চিত করা যায়।

তৃতীয় উপকরণ ছিল একটি ব্যবস্থাপনার রূপরেখা যাতে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব নিরূপণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য সরবরাহ রীতি উদ্ভব করা যেতে পারে। সুতরাং নূতন সংস্থাগত কাঠামো কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বিন্যস্ত করে এবং ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সংস্থায় মূল তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কমপিউটার চালু করা হয়।

সরকারী খাতে ক্ষতিপূরণ নীতি

২.৫৫। সরকারী খাতে নিম্নপর্যায়ে দক্ষতার মূলে একটি বহুল সমর্থিত কারণ ছিল এই যে তাদের চাকুরী আয়ের ক্রয় ক্ষমতার ক্রমাবনতি ঘটছে। সুতরাং প্রশাসনিক কাঠামোকে বিন্যাস করা ছাড়াও ১৯৮৪ সালে সরকারী খাতে ক্ষতিপূরণ নীতি পর্যালোচনা করা হয় এবং সরকারী খাতের কর্মচারীবৃন্দের ক্রয় ক্ষমতা সরকারী খাতে বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে পুনর্জীবিত করা হয়। যেহেতু এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী খাতের দক্ষতার উন্নতিসাধন, এর প্রভাব পরিকল্পিত উন্নয়নের উপর বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা দিক থেকে এবং এর কার্যকারিতার ব্যয় এবং সময় প্রতিদানের দিক থেকে পর্যালোচনার প্রয়োজন, বিশেষ করে যেখানে এটা উন্নয়ন থেকে সম্পদ অন্য দিকে পরিচালিত করে, যা ইতিপূর্বেই দেশীয় সম্পদ সংস্থান আলোচনা করার সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও স্বীকার্য যে সরকারী খাতের উপর এর প্রভাব ভবিষ্যতের মূল্য ও জীবনযাত্রা মানের পর্যালোচনার উপর নির্ভর করবে। যদি মূল্য ভাতা সমন্বয়কে ছাড়িয়ে যায় তাহলে এর যৌক্তিকতা শেষ পর্যন্ত ধ্বসে পড়বে। সুতরাং স্থিতিশীল নীতির মাধ্যমে চাকুরী আয়কে রক্ষা করার প্রয়োজন অন্যথায় মূল্য ও ভাতার মধ্যে প্রতিযোগিতা আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়াবে। ক্ষতিসাধন সম্পর্কে দ্বিতীয় বস্তু হল আনুষংগিক ভাতা যা সরকারী খাতের কর্মচারীদের দেয়া হয়েছে। এর বেশীর ভাগ সামগ্রীর মধ্যে দিয়ে প্রদত্ত হয়। যেহেতু এগুলি প্রকৃত সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার বুঝায়, তাদের বাজারিভুক্তকরনের (Monetization) মধ্য দিয়ে এ ধরণের সম্পদের দক্ষ বরাদ্দ নিশ্চিত করা যায়।

সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতা

২.৫৬। অধীনস্থ কর্পোরেশন এবং তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে কেননা তারা জনসেবা এবং কিছু সংখ্যক প্রধান শিল্প পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এগুলি স্বাধীনতা অর্জনের আগে এবং পরে স্থাপিত হয় এবং যদিও সরকারী নীতিমালা পরিবর্তনের সংগে সংগে তাদের কার্যাবলী সীমিত হয়ে আসছে। কিন্তু তাদের প্রাধান্য এখনও উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ দশকে অধীনস্থ কর্পোরেশনগুলিকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ফলে চলতি প্রতিষ্ঠানগুলির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তন ঘটে। পাবলিক ষ্টাটুটরি কর্পোরেশনের পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ অনুসারে তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়। দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ১৫৫টি কর্পোরেশনের মধ্যে ১৩টি উঠিয়ে দেয়া হয়, ৩০টি একত্রিত করে ১২টি করা হয় এবং ২১টি পুনর্বিন্যাস করা হয়। অধিকন্তু সরকারী ব্যবস্থাপনার উপর চাপ হ্রাসের জন্য এবং নূতন শিল্পনীতি অনুসরণে কিছু সংখ্যক সরকারী মিল ও কারখানা বেসরকারী খাতে হস্তান্তরিত বা বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। এটা সরকারের স্বল্প ব্যবস্থাপনা দক্ষতাকে বাঁচিয়ে অল্প সংখ্যক সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিক দক্ষতা নিয়োজিত করায় সহায়তা করবে। সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক কার্যাবলী তদারকের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ শাখা স্থাপন করা হয়। যাহোক দেশীয় সম্পদ সংস্থানের আওতায় আলোচনাটি স্মরণ করা যেতে পারে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে বৈদেশিক এবং দেশীয় অর্থনৈতিক অবস্থা অধিক সংখ্যক কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থাকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করে যদিও বাজারের বর্দ্ধিত ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেশনগুলির মূলধনের কাঠামো সংগতি করে নিম্ন গতিতে আনা হয় এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়।

প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ

২.৫৭। ১৯৮২ সালের পরিবর্তনে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণের ব্যাপারটি গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা গ্রামীণ উন্নয়ন এবং উন্নয়নের ফলাফলের সুষম বন্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও অভিপ্রেত লক্ষ্য অর্জন করার জন্য এতে প্রশাসনিক যন্ত্রের অভাব ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আগের প্রচেষ্টাসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে কেন্দ্রে বা স্থানীয় পর্যায়ে ঘনীভূত হওয়াতে তাদের মিশ্রণের তেমন কোন সুযোগই ছিলনা কেননা প্রকৃতিতে ছিল ভিন্নতা—একটি ছিল রীতিসম্মত, আর একটি ছিল এর বিপরীত ধর্মী। ১৯৮২ সালের পরিবর্তনের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং উপজেলা পরিষদ স্থাপন এই দুই পর্যায়ের কার্যাকলাপকে কাছাকাছি এনে জাতীয় দৃষ্টিভংগীতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতি নিশ্চিত করা হয়। উন্নয়ন কার্যাক্রমে স্থানীয় জনসাধারণের যোগদান এবং স্থানীয় নেতৃত্বগ্রহণ উন্নত করার লক্ষ্যে কতকগুলি উন্নয়ন সংক্রান্তবিষয় স্থানীয় পরিষদে স্থানান্তরিত করা হয় যার অর্থসংকুলান করা হয় কেন্দ্রীয় মঞ্জুরী থেকে। স্থানীয় সরকারকে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য রাজ ক্ষমতা দেয়া হয়। যাতে উন্নয়ন কার্যক্রম জাতীয় উন্নয়নের সার্বিক অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে সেটা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকারের মঞ্জুরী বরাদ্দের জন্য পছন্দের সুযোগ প্রদান করে। উন্নয়ন কার্যাক্রমের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে একটি তদারকি প্রথা চালু করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের আওতায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ছাড়াও স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের কতকগুলি কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

২.৫৮। এছাড়াও পল্লী এলাকার দ্রুততর উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যাক্রম রয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে উপজেলার সঙ্গে নিকটবর্তী পাকা রাস্তার সাহায্যে অন্যান্য এলাকার সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং উপজেলা সদর দপ্তরের উন্নতি। ১৯৮২ সাল থেকে প্রথম কার্যাক্রমের জন্য খরচ হয় ৩৭১ কোটি টাকা (উপজেলা মঞ্জুরী) এবং দ্বিতীয় কার্যক্রমের আওতায় খরচ হয় ৫২৫ কোটি টাকা।

২.৫৯। নূতন সংস্থা হিসাবে উপজেলা প্রশাসনের উন্নয়নের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে- তা মূল্যায়নের সময় এখনও আসেনি। কিন্তু অন্যান্য দেশসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে স্থানীয় সরকারই স্থানীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। যা'হোক এটা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করবে। উপজেলা পরিষদ বৃহত্তরভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত যদিও প্রথম পর্যায়ে এই প্রতিনিধিদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটবে। জনসাধারণের কাছাকাছি আসার পর জনগণ দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে তাদের পছন্দ মাফিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত করবে। প্রত্যাশিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে গ্রামীণ সমাজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন

২.৬০। সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়ন বিশেষ করে গুরুতর সম্পদ ঘাটতির প্রেক্ষাপটে সরকারের একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু সময় এবং ব্যয়ের আধিক্য বিনিয়োগের সম্ভাব্য ফলকে ব্যাহত করে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে প্রকল্প বাস্তবায়নের উন্নতির জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা নেয়া হয়। এগুলি দু' ধরণের ছিল, কিছু ব্যবস্থা দক্ষ বরাদ্দের দিকে অন্যগুলি সম্পদের ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করার জন্য নেয়া হয়। মূল্য যৌক্তিকরণ এবং অদরকারী প্রকল্পের উপাদান কমানো, স্বল্প প্রয়োজনীয় বাতিল ও স্থগিতকরণ এবং বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থের অবমুক্তির জন্য কোর প্রোগ্রামের প্রবর্তন প্রথম সেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং দ্বিতীয় সেটে ছিল মন্ত্রণালয় এবং তাদের সংস্থাগুলিকে বৃহত্তর আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, প্রকল্প পরিচালকদের উন্নয়ন ব্যয়ে স্থানীয় ও বিদেশে কেনাকাটার জন্য আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভূমি

দখলের জন্য রীতিনীতির সহজীকরণ এবং প্রকল্প প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতির অব্যাহত প্রবাহ নিশ্চিতকরণ। বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করায় একটি বিশেষ সমস্যার আশু সমাধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেটা হলো সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির আলোচনা থেকে শুরু করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেয়া হয় যেগুলি হল, প্রথমতঃ আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে সাহায্য প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা, দ্বিতীয়তঃ সাহায্য আলোচনার জন্য প্রাথমিক প্রকল্প ছকের প্রবর্তন এবং সর্বক্ষেত্রে কারিগরী সাহায্য এবং আমদানী শুল্ক পরিশোধের জন্য থোক বরাদ্দ রাখা।

২.৬১। ব্যয় যৌক্তিকতা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এ, ডি, পি-র পুনর্গঠনের সার্বিক প্রভাব প্রথম দৃষ্টিতে ১৯৮২/৮৩ সালেবাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত বহুসংখ্যক প্রকল্প বাদ দেয়ার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। প্রকল্প সংখ্যা ১৯৮০/৮১ সালের ১৫২০ থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৯৩৮টিতে কমে আসে। এই কমানোর মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন গতি ত্বরান্বিত করার জন্য অধিক পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ সম্ভব হয়। ১৯৮০/৮১ সালে যেখানে সম্পন্ন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১৬০টি ১৯৮৪/৮৫ সালে তা ৩২৭টিতে উন্নীত হয়। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা এ, ডি, পিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংখ্যার সংগে তুলনা করা হলে এ, ডি, পি-র পুনর্গঠন ও যৌক্তিকতা বেশ আশাব্যাঞ্জক বলে প্রমাণিত হবে। ১৯৮০/৮১ সালে কেবলমাত্র ১১% প্রকল্প সমাপ্ত হয়, ১৯৮৪/৮৫ সালে এই হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের উপর এ, ডি, পি-র প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অধিকন্তু এটা তুলে ধরেছে যে সম্পদের স্বল্পতা প্রকল্পের মন্থর বাস্তবায়নের একমাত্র কারণ নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়নের আর্থিক সমস্যাবহির্ভূত কারণগুলি সমাধান করতে চেষ্টা করে এবং এই পর্যায়ে বেশ সাফল্য অর্জন করে, সম্পদের স্বল্পতাহেতু কোন কোন খাতে এ, ডি, পি-এর কম ব্যবহার তেমন একটি কারণ।

২.৬২ নিম্নের সারণীতে উন্নয়নের উপকরণ হিসেবে বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচীর কার্যকলাপ দেখানো হল:

সারণী ২.১১

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচী

বৎসর		সংশোধিত এ,ডি,পি-র আকার (কোটি টাকায়)।	প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকায়)।	হাতে নেয়া প্রকল্পের সংখ্যা*	সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা।
১৯৭৯/৮০	..	২,৩৩০	২,১৮৮	৯,৪০৬	৩৫৯
১৯৮০/৮১	..	২,৩৬৯	২,৪৬৬	১,৫২০	১৬০
১৯৮১/৮২	..	২,৭১৫	২,৭০৬	১,৬৭৫	১৩৩
১৯৮২/৮৩	..	৩,১২৬	২,৬৯০	১,১৭৮	১৭৬
১৯৮৩/৮৪	..	৩,৫৮৫	৩,১২৭	৯৯২	২৪৫
১৯৮৪/৮৫	..	৩,৪৯৮	৩,২৩২	৯৩৮	৩২৩

*কারিগর' সাহায্য প্রকল্প ও নিজস্ব তহবিল হতে বাস্তবায়িত প্রকল্পসহ।

খাতওয়ারী উন্নয়ন

২.৬৩। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুখবন্ধ হিসাবে খাতওয়ারী উন্নয়ন প্রাসংগিক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন খাতের কেবলমাত্র বিশেষ উন্নয়নের দিকগুলি নিম্নের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হল।

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন

২.৬৪। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এইসব ক্ষেত্রে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়। প্রথমঃ ১৯৮৪/৮৫ সালে খাদ্য উৎপাদনে ২০'৭ মিলিয়ন টনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য মধ্য মেয়াদী খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা (MTFPP) গ্রহণ করা হয়। সম্পদের স্বল্পতা হেতু এই লক্ষ্য মাত্রা কমিয়ে ১৭'৫ মিলিয়ন টনে ধার্য্যকরা হয়। এই কর্মসূচীর প্রধান দিক ছিল দ্রুত ফলদায়ক ক্ষুদ্রাকারের জলসেচ প্রকল্পসমূহের উন্নতিবিধান, সার বিতরণের সম্প্রসারণ, অধিক ফলনশীল এবং স্থানীয় উন্নতমানের বীজের ব্যবহার, কৃষি ঋণের সম্প্রসারণ ইত্যাদি, উপকরণ কর্মসূচীতে ১৯৮৪/৮৫ সালে সরকারের মাধ্যমে ১'৬ মিলিয়ন টন সার এবং ২০'৫ হাজার মন অধিক ফলনশীল ধান ও গম বীজ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা সন্নিবেশিত ছিল। খাদ্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার ১'৭ মিলিয়ন টন পিছিয়ে থাকে। যদিও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ১৯৭৯/৮০ সালের ১৩'৪ মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তা ১৫'৮ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়। খাদ্যোৎপাদনে বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩'৫%। কতকগুলি উপকরণ এই ঘাটতিতে সহায়তা করে। পরিকল্পনা মেয়াদে খুব ঘন ঘন বন্যা ও অনাবৃষ্টির জন্য ফসলের বিস্তর ক্ষতি সাধিত হয়। জলসেচের সুযোগ সুবিধার অভাবে শীত মৌসুমে চাষাবাদ জোরদারকরণের মাধ্যমে আংশিকভাবে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া হয়। সেচের আওতায় জমির পরিমাণ কেবলমাত্র ৬'১২ মিলিয়ন একরে পৌঁছে। পরিকল্পনায় ৬০,০০০ লো-লিফট পাম্প, ২,৫০,০০০ অগভীর নলকূপ, ৪,৫০,০০০ হস্তচালিত নলকূপ এবং ১৮,০০০ গভীর নলকূপ বসানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়; কিন্তু ১৯৮৪/৮৫ সালে এদের প্রকৃত সংখ্যা যথাক্রমে ৪৮,০০০, ১,৫৪,০০০, ৩,০০,০০০ এবং ১৭,০০০-তে দাঁড়ায়। সার বিতরণেও গুরুতর ঘাটতি দেখা দেয়। ১৯৮৪/৮৫ সালে সারের বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬ লাখ টন যেখানে প্রকৃত বিতরণ ১২'৬ লাখ টনে দাঁড়ায়। এই সকল ঘাটতি কতকগুলি বিষয় যথা আবহাওয়ার কারণে পানির উৎসসমূহের ক্ষতিগ্রস্ততা, উপকরণের উপর ভর্তুকি হ্রাস, ব্যক্তিমালিকানা নীতি এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা ইত্যাদির ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু প্রভাবেরই ফল হিসাবে দেখা দেয়। এসকল কারণের জন্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন আগেরমত কেবলমাত্র লক্ষ্যমাত্রাই থেকে যায় যদিও এই দিকে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

২.৬৫। কৃষিক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল সুনির্দিষ্ট খাদ্যনীতি গ্রহণ যা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজারের স্থিতিশীলতার জন্য মূল্য সমর্থনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ১৯৮০/৮১ সালে যখন শস্যোৎপাদন বেড়ে যায় তখন কৃষকের শস্যের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করার জন্য সরকার ১'১ মিলিয়ন খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করে। এর পরও মূল্য সমর্থন নীতি অনুসরণ করে একে একটি সহকারী ভূমিকা পালন করতে হয়। কারণ ঘন ঘন শস্যের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শস্যের বাজার মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। খাদ্য নীতির আর একটি বিশেষ দিক ছিল সরকারের খাদ্য বিতরণে অগ্রাধিকারভুক্ত গোষ্ঠি এবং বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থার অংশ কমিয়ে নিঃস্বদের প্রতি অধিকতর নজর দেয়া। তাদের ভাগ ১৯৭৯/৮০ সালের ৫৮% থেকে কমে ১৯৮৩/৮৪ সালে ৪৬% দাঁড়ায়। এর সংগে সংগে রেশনের মূল্য বৃদ্ধি (চাউলের মূল্য ৯১'২% বৃদ্ধি) কৃষকদের অনুকূলে বাজারে খাদ্যের চাহিদা জোরদার করতে সহায়তা করে।

২.৬৬। পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়। উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর নজর রেখে বেশ কিছু সংখ্যক স্থানভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয় এবং সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পকে (IRDP) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে উন্নীত করে এর কার্য্যকলাপ কৃষক সমবায়

সমিতি (KSS) থেকে বিত্তহীন সমবায় সমিতি (BSS) এবং মহিলা সমবায় সমিতি (MSS) পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে স্থানভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন কার্য্যকলাপ গ্রামাঞ্চলের ৩৮৩টি উপজেলায় বিস্তৃতি লাভ করে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সমগ্র দেশ থেকে ২.৬ মিলিয়ন সদস্যসহ ৬২,০০০ সংখ্যক সমবায় কৃষক সমিতির আওতায় নিয়ে আসে। এছাড়াও ৭,৭০০টি বিত্তহীন সমবায় সমিতি এবং ৫,৭৬০টি মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করা হয়।

২.৬৭। উন্নয়নের চতুর্থ পর্য্যায়ের বিকাশ ছিল প্রতিষ্ঠানিক উৎস থেকে কৃষি ঋণের প্রাপ্তি। কৃষিঋণ ১৯৭৯/৮০ সালের ২৭২ কোটি টাকা থেকে বাৎসরিক ৩৩.৫% বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১,১৫০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। এই বৃদ্ধি সত্বেও প্রতিষ্ঠানিক ঋণ ও কৃষিজাত দ্রব্যের মোট মূল্যের আনুপাতিক হার ছিল ৭.৬%। অনুপাত অত্যন্ত কম থাকায় কম সৌভাগ্যবান ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণের জন্য ঐতিহ্যবাহী উৎসের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। তুলনামূলকভাবে কম হলেও দ্রুত সম্প্রসারণ ঋণ আদায়ের হারে অবনতি ঘটায়। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে ঋণের ভিত্তিকে চালু রাখার জন্য ঋণ আদায়ের হারে উন্নতিসাধন করার প্রয়োজন রয়েছে।

২.৬৮। সর্বশেষে এটা স্বীকার করতে হয় যে, বেশ কিছু সংখ্যক শস্য উৎপাদন কর্মসূচীতে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এগুলির মধ্যে অর্থকরী শস্য পাট দুঃখজনক ফল প্রদর্শন করে। পাট উৎপাদন কমে আসার দরুন ১৯৭৯/৮০ সালের আনুমানিক ৬ মিলিয়ন বেল থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪.৬ মিলিয়ন বেলে দাঁড়ায় যদিও পরিকল্পনাকালে পাট উৎপাদনে তেমন কোন পরিবর্তন করা হয়নি। ১৯৮৪ সালের এই স্বল্প উৎপাদনের মূলে ছিল পাট জমিগুলির স্বাভাবিক সময়ের আগেই বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়া। পাটের উৎপাদন কম হওয়ায় এর গুরুতর প্রতিক্রিয়া হয় পাটের রপ্তানী এবং দেশীয় পাট কলগুলির উপর। পাট রপ্তানী ১৯৮৪/৮৫ সালে সবচেয়ে কম স্তরে (১৪ লাখ বেলে) দাঁড়ায়; এর ফলে বিশ্বে পাটের মূল্যে গতি পরিলক্ষিত হলেও তা পাটের বিশ্ববাণিজ্যকেও বিঘ্নিত করে। অন্যদিকে দেশের পাটের উচ্চ মূল্য শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করে যা পাটকলগুলি উন্নততর দেশগুলিতে মন্দাভাব বিদ্যমান থাকায় বৈদেশিক ক্রেতাদেরও কাছে চাপাতে পারেনি; এর ফলে ১৯৮৪/৮৫ সালে পাট কলগুলি সরকারী খাতে চালু রাখার প্রচেষ্টায় বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় (১৪৩.৫ কোটি টাকা)। পাটখাতে বলার মত কেবলমাত্র শক্তিশালী বিষয় হলো পাটের আওতায় জমির পরিমাণ পুরাতন নিবিড় পাট চাষ প্রকল্পভুক্ত এলাকার কাছাকাছি স্থির রাখা। যেহেতু এই অটল অবস্থা পাটের মূল্য চাউলের মূল্যের তুলনায় কম উৎসাহব্যঞ্জক বাজারের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে সেহেতু এটা খুব স্বাভাবিক যে ১৯৮৪/৮৫ সালের পাটের উচ্চ মূল্য পাট একরের আপাতঃ-স্থিরতাকে বিঘ্নিত করবে। নীচের সারণীতে প্রধান প্রধান কৃষি দ্রব্যের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত উৎপাদন দেখানো হল:

সারণী ২.১২

প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত উৎপাদন

কৃষিজাত দ্রব্য	একক	১৯৭৯/৮০ সালে প্রকৃত উৎপাদন	১৯৮৪/৮৫	
			লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন
(১) খাদ্য শস্য	লক্ষ টন	১৩৩.৫	১৭৫.০	১৫৮.৩
(২) পাট	লক্ষ বেল	৫৯.৬	৬০.০	৪৬.০
(৩) চা	মিলিয়ন পাউণ্ড	৮০.৭	৯৫.০	৯৬.৮
(৪) ইক্ষু	লক্ষ টন	৬৫.৭	৭৭.৬	৭০.০
(৫) তুলা	'০০০' বেল	৬.০	৫৬.০	১২.০
(৬) তামাক	'০০০' টন	৩৮.৯	৫৭.৭	৫৪.০
(৭) মৎস্য	লক্ষ মেট্রিক টন	৬.৫	১০.০	৭.৭

শিল্প

২'৬৯। শিল্পখাতে তিনটি বিশেষ তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ ১৯৭৫ সালে পৃথক পৃথক যে সব ব্যবস্থা নেয়া হয় তা শেষ পর্যন্ত ১৯৮২ সালের জুন মাসে নূতন শিল্পনীতি ঘোষনায় পর্যবসিত হয়। এই নূতন শিল্পনীতি সরকারী খাতে সংরক্ষিত তালিকা কমিয়ে আনার মাধ্যমে বেসরকারী খাতের সুযোগ বৃদ্ধি করে। এই নীতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে কিছু সংখ্যক পাট ও বস্ত্র মিল আগের মূল স্থানীয় মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এই নীতির মাধ্যমে বেসরকারী বিনিয়োগে ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে ১৯৮১/৮২ সালে ৮৬৩ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১,১৩৯ কোটি টাকায় বৃদ্ধিতে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় যদিও বেসরকারী বিনিয়োগ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (BSB) এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (BSRS) কর্তৃক ঋণ বন্ধ করার ফলে ব্যাহত হয়। পরিকল্পনার এই পর্যায়ে তৈরী পোষাক ও শক্তিচালিত তাঁত শিল্পে বিনিয়োগ তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। শিল্প খাতে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য তৎপরতা ছিল জিয়া ইউরিয়া সার কারখানা চালু করা যার ফলে ইউরিয়া উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুনেরও বেশী হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই দুইটি তৎপরতার প্রেক্ষাপটে শিল্পখাত দেশী ও বৈদেশিক চাহিদার দিক থেকে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয় যার ফলে প্রবৃদ্ধির হার (৪'৮%) কমে আসে, অব্যবহৃত ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। বস্ত্র ও সার শিল্প ব্যতীত শ্রমের দক্ষতা ১৯৭৯/৮০ সালের স্তরের ৮০ শতাংশে পৌছে। সাধারনভাবে ইস্পাত ও চিনি শিল্প ব্যতিরেকে প্রধান প্রধান শিল্পগুলিতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২০ থেকে ৩০% অনার্জিত থাকে, ইস্পাত ও চিনি শিল্পে ঘাটতির পরিমাণ ছিল আরো বেশী। বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা পণ্যের হ্রাসকৃত চাহিদার ফলে ব্যাহত হয় যার ফলে সরকারী খাতে মূলধন পুর্ণগঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কিন্তু বেসরকারী খাতে মূলধন পরিশোধের সময়সীমা ব্যাপক লঙ্ঘন শিল্পে অর্থ সংস্থানের ব্যাপারে উন্নয়ন অর্থ সংস্থান প্রতিষ্ঠানগুলিকে (DFIS) অস্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে আসে। নিম্নের সারণীতে বিশেষ বিশেষ শিল্প ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উৎপাদন দেখানো হল:

সারণী ২'১৩

প্রধান প্রধান শিল্পজাত পণ্যের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত উৎপাদন

শিল্পজাত পণ্য	একক	১৯৭৯/৮০ সালে প্রকৃত উৎপাদন	১৯৮৪/৮৫	
			লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন
(১) পাট শিল্প ..	'000' টন	৫২৫'০	৬৫০'০	৫৬১'০
(২) বস্ত্র শিল্প (কেবল সুতা) ..	মিলিয়ন কেজি	৪৩'২	৮৩'২	৫৯'৪
(৩) সার	'000' মেট্রিক টন	৪৪২'০	১০৩৭'০	৮০৬'০
(৪) সিমেন্ট	ঐ	৩৪৩'০	৪৫০'০	২৪০'০
(৫) কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট ..	ঐ	৭১'৯	৯৩'০	৯০'০
(৬) চিনি	ঐ	৯৩'২	২০০'০	৮৮'০
(৭) ইস্পাত ইনগট ..	ঐ	১৩৩'০	২২৫'০	১০১'০

পরিকল্পনা বিভাগ গ্রন্থাগার
সংযোজন সংখ্যা 10623
C-5

বিদ্যুৎ ও গ্যাস

২'৭০। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জ্বালানী খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। চলতি মূল্যে এই খাতে পরিকল্পনায় ৩০২১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকৃত ব্যয় হয় ৩০৬১ কোটি টাকা (বিদ্যুৎ খাতে ২১৩০ কোটি টাকা এবং গ্যাসে ৯৩১ কোটি টাকা)। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে উন্নয়ন তৎপরতার মধ্যে ছিল পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃসংযোগের সাহায্যে পূর্ব-পশ্চিম গ্রীড লাইনের জাতীয় গ্রীডে সমন্বয় সাধন করে কমমূল্যে গ্যাসভিত্তিক জ্বালানী পূর্ব এলাকা থেকে পশ্চিম এলাকায় স্থানান্তর এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরশীলতায় উন্নতি সাধন করা। অর্থনীতিতে পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃসংযোগের একমাত্র প্রভাব ছিল পশ্চিম অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানী হিসাবে তৈলের ব্যবহার হ্রাস। যা হোক বিদ্যুৎ খাত তার অন্তর্নিহিত দীর্ঘ সময় ও বড় ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজনীয়তার বৈশিষ্টের জন্য সম্পদের গুরুতর সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। সুতরাং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কতকগুলি প্রকল্প শুরু করা হলেও সেগুলি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যুৎ বোর্ড আর্থিক অসুবিধার কারণে বিনিয়োগের কিছু অংশ নিজস্ব আয় থেকে সংকুলান করতে না পারায় সম্পদ সমস্যা আরো বৃদ্ধি পায়। বোর্ডের আর্থিক ভিত্তি পরিকল্পনাকালে উচ্চ হারে সিষ্টেম লসের জন্য (১৯৮৪/৮৫ সালে ৩৭'৫%) হ্রাস পেতে থাকে। এসব প্রতিকূলতা সত্বেও এই ব্যবস্থার যথেষ্ট সম্প্রসারণ হয় যা নিম্নের সারণীতে দেখানো হল:

সারণী ২'১৪

বিদ্যুৎ খাতের লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি

প্রধান খাত	একক	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪/৮৫ লক্ষ্যমাত্রা	১৯৮৪/৮৫ প্রকৃত
(১) উৎপাদন ক্ষমতা ..	মেগাওয়াট	৬২৪	১৩৪২	১০১৮
(২) উৎপাদন	জি ডব্লিউ এইচ	২,৩৫৩	৪,৫০৭	৪,৫৪৫
(৩) বিতরণ লাইন (৩৩ কে ভি লাইনসহ) ..	'০০০' কিলো মিটার	১৯'৯	৫১'৪	৪২'৮
(৪) জ্বালানী বিক্রয় ..	জি ডব্লিউ এইচ	১,৪০৬	৩,৪৭২	২,৮৪০
(৫) গ্রাহক সংখ্যা	'০০০'	৫২২	৮৪৭	৮১০
(৬) বিদ্যুতায়িত গ্রাম ..	সংখ্যা	২,১৮১	২৫,১৮১	৭,৮৮৮

২'৭১। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আমদানীকৃত জ্বালানীর পরিবর্তে গ্যাসের ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদেশিক লেন-দেনের উপর উচ্চ মূল্য সম্বলিত জ্বালানী আমদানী ব্যয়ের চাপ কমানোর লক্ষ্যে জ্বালানী খাতের উন্নয়নকে চাবিকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয়। নীতির অনুসরণে দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথমতঃ চট্টগ্রামে দেশের প্রধান শিল্প এলাকায় গ্যাস সরবরাহের প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডকে ডেমরায় তিতাস-ঢাকা সিষ্টেম এর সংগে যুক্ত করার মাধ্যমে দেশের প্রধান দু'টি গ্যাস ফিল্ডকে এক গ্রীডে সমন্বিত করা হয়। তৃতীয়তঃ উৎপাদনকারী কূপের

সংখ্যা ১৯৭৯/৮০ সালের ৯টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২১টিতে দাঁড়ায়। এছাড়াও ৬টি অনুসন্ধানকারী কূপ খনন করা হয় যার মধ্যে ৪টি গ্যাস মওজুত অবস্থায় পাওয়া যায়। কার্যরত কূপের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সঞ্চালন ও বিতরণ সম্প্রসারিত হওয়ায় গ্যাসের সরবরাহ ১৯৭৯/৮০ সালের ৪৪,৫০০ MMCF থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৯৪,৬০০ MMCF-এ উন্নীত হয়। এর মাধ্যমে প্রাথমিক বাণিজ্যিক জ্বালানীতে গ্যাসের অংশ ১৯৭৯/৮০ সালের ৩৬·৫% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৫৬·৩ শতাংশে উন্নীত হয় এবং আমদানীকৃত জ্বালানীর অংশ ৫৩·২% থেকে একই সময়ে ৩৬·৬%-এ নেমে আসে।

পরিবহণ ও যোগাযোগ

২·৭২। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন তৎপরতার মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক উপজেলাকে নিকটবর্তী পাকা রাস্তার সংগে (উপকূলীয় এলাকা ব্যতিরেকে) সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উপজেলাসমূহকে জাতীয় সড়ক ব্যবস্থার সংগে একীকরণ। একই সংগে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করে উপ-জেলা-গুলোকে জাতীয় ডায়েলিং ব্যবস্থার সংগে সংযোগ স্থাপন করা হয়। এ দুটি সুদুরপ্রসারী উন্নয়ন ছাড়াও এই সময়ে কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেতুর প্রকৌশলিক সমীক্ষা প্রস্তুত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বুড়িগংগা সেতুর দ্বারা নদীর দক্ষিণ পাড়ের সংগে ঢাকার সংযোগ স্থাপন, মেঘনা সেতু এবং ঢাকা চট্টগ্রাম রাজপথের উপর মেঘনা গোমতী সেতু। সরকার দেশীয় অর্থনৈতিক এলাকাকে দ্বিধাবিভক্তকারী যমুনা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। এবং এর জন্য যমুনা মালটিপারপাস ব্রীজ কর্তৃপক্ষ স্থাপন করা হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে ১৯৭৯/৮০ সালের ৪১১২ কিলোমিটার থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪৮৩০ কিলোমিটার পাকা রাস্তার সম্প্রসারণ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যান্য এলাকার আন্তর্জাতিক ডায়েলিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, পরিবহণকারী জাহাজ চলাচলের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি বিধান, মংলা বন্দরে শহর এলাকা স্থাপন, বাংলাদেশ রেলওয়ে ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের সংখ্যা ১৯৮০ সালের ১৯২টি থেকে ১৯৮৫ সালে ২৮৯-এ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

২·৭৩। ইঞ্জিনের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলের অতিরিক্ত পরিবহণ বৃদ্ধি করা হলেও সাধারণভাবে ক্ষমতা ব্যবহারের দিক থেকে রেলওয়ের কর্ম দক্ষতার অবনতি ঘটে। ব্রডগেজ লাইনে ব্যবহৃত প্রতি ইঞ্জিনের ক্ষমতা প্রতি দিনে ১৯৮০ সালের ২৮৫ কিলোমিটার থেকে কমে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৯৩ কিলোমিটারে দাঁড়ায় এবং মিটার গেজ লাইনে তা ১৯২ থেকে ১৬১ কিলোমিটারে নেমে আসে। ব্রডগেজ লাইনে প্রতি ওয়াগনের টন কিলোমিটার ক্ষমতা প্রতি দিনে ১৯৮০ সালের ১৮৩থেকে ১৯৮৫ সালে ১৬১ তে এবং মিটার গেজ লাইনে ১৫০ থেকে ১২২-এ নেমে আসে কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ব্রডগেজ ও মিটার গেজ লাইনে যাত্রীবাহী গাড়ীর যাত্রী কিলোমিটারে যথাক্রমে ১৯৫থেকে ২২২ এবং ১৫৪ থেকে ১৭৪-এ উন্নীত হয়। মাল পরিবহণ ৩·১৮ মিলিয়ন টন থেকে ২·৮২ মিলিয়ন টনে হ্রাস পেলেও যাত্রী পরিবহণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৮·৫ মিলিয়ন থেকে ১৩২·৫ মিলিয়নে দাঁড়ায়। এ সময় রেলওয়ের পরিচালনা ব্যয়ের অনুপাত বৃদ্ধি এর সার্বিক আর্থিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে যা ১৯৭৯/৮০ সালের ১০৪·৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১২১·৭ শতাংশে দাঁড়ায়; ফলে রেলওয়ের ক্ষতি ১৯৭৯/৮০ সালের ৪·১ কোটি টাকা থেকে পরিকল্পনাকালে ৯২·১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। এসময় সড়ক পরিবহণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন প্রকারের ট্রাকের সংখ্যা ১৬,১১৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭,২৭০-এ উন্নীত হবার ফলে রেল পরিবহণে ক্ষতি সাধিত হয়। আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণে যাত্রী পরিবহণ বৃদ্ধি পায়। সাধারণভাবে ট্রাফিকের মোডাল ইসপ্লিট যাত্রী ও মাল উভয় ক্ষেত্রেই সড়কের অনুকূলে ছিল। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কতকগুলি জাহাজ অকেজো হয়ে পড়ায় সর্বমোট ডেড্-ওয়েট-টন (DWT) ১৯৭৯/৮০ সালের ৩·৭৮ লক্ষ টন থেকে ৩·৪৪ লক্ষ টনে নেমে আসে; যদিও বেসরকারী খাতে গুরুত্ব আরোপ করায় ডেড্-ওয়েট-টন ক্ষমতা ১০,০০০ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮০,০০০ হাজার টনে দাঁড়ায়। মাল পরিবহণ টনে হ্রাস পাওয়ায় সামুদ্রিক মাল পরিবহণে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজের অবদান ১৯৭৯/৮০ সালের ১৭% থেকে কমে ১৫ শতাংশে দাঁড়ায়।

ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ণ

২'৭৪। ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ণ খাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা সরকারী ও বেসরকারী খাতে বাসস্থান এবং পানি সরবরাহের উন্নতিবিধানের উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করে। সরকারী খাতে বিভিন্ন শহর কেন্দ্রে ৪৭৩১টি বাসস্থান এবং ১১৬০টি কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের সহায়তায় উপজেলা পর্যায়ে ১৪৫টি ডরমিটরী নির্মাণ করা হয়। বেসরকারী খাতে সরকার 'সীড ফাণ্ড' এর মাধ্যমে ছোট ছোট শহরে বাসস্থানের জমি প্রস্তুত করে বেসরকারী মালিকদের কাছে তা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সরকার প্রকৃত পক্ষে ৫৪০০টি প্লট প্রস্তুত এবং বিক্রয় করে। এছাড়াও গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা (HBFC) গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ প্রদান করে। উপজেলা পর্যায়ে গৃহ নির্মাণের জন্য কম সুদে ঋণ প্রদান করা হয়। বেসরকারী খাতে গৃহ নির্মাণের জন্য ১২৫২ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে বলে হিসাব করা হয়েছে।

২'৭৪ক। পানি সরবরাহ কর্মসূচী গ্রামীণ এলাকা থেকে মেট্রোপলিটান এলাকার সকল জনবসতিতে বিস্তার লাভ করে। পল্লী এলাকাসমূহে প্রতি ১৫০ জন জনসাধারণের জন্য একটি নলকূপ বসানোর লক্ষ্যমাত্রার স্থলে প্রতি ১৩৮ জনের জন্য ১টি নলকূপ প্রকৃত পক্ষে বসানো সম্ভব হয়। কলের পানি সরবরাহ ক্ষমতা ঢাকা ও চট্টগ্রামে এবং ৫৬টি জেলা সদরে (লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৪টি) সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়।

শিক্ষা

২'৭৫। দ্বিতীয় পরিকল্পনার দু'টি শিক্ষা কর্মসূচী সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার লাভ করে: সেগুলি হল সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও জনশিক্ষা। তবে এই উভয়ক্ষেত্রেই খুব কম অগ্রগতি সাধিত হয়। পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক শিক্ষা তালিকাভুক্তি আরও ৪৭ লক্ষে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কেবলমাত্র ৬ লক্ষ অতিরিক্ত শিশুকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা সম্ভব হয়; যদিও প্রাথমিক শিক্ষা খাতে পরিকল্পনার বরাদ্দ ৩৩১'৭ কোটি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ ২২৭'৬ কোটি টাকার স্থলে প্রকৃত পক্ষে ব্যয় হয় ২১০'৭ কোটি টাকা। জন শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রগতি ছিল আরো মন্থর। এই কর্মসূচী ১০ থেকে ৪৫ বয়স সীমার মধ্যে ৪০০ লক্ষ জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করার কথা ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র ৭ লক্ষ জনসাধারণকে এর আওতায় আনা সম্ভব হয়। এই কর্মসূচী ধারণাগত এবং প্রতিষ্ঠানগত অসুবিধার মধ্য দিয়ে চলছিল এবং ১৯৮২ সালে একটি মূল্যায়নের পর এই কর্মসূচী সত্যিকার অর্থে বাদ দেয়া হয় এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে তা নামমাত্রভাবে উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা নিম্ন ধাপ থেকে তৃতীয় পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষায় ক্রমবর্ধমান সম্পদ সরিয়ে আনার প্রবণতাকে বিপরীতমুখী করার প্রচেষ্টা চালায়। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে ভর্তির জন্য ছাত্রদের চাপ খুব প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা খাতে অগ্রগতি ছিল নিম্নরূপ:

সারণী ২'১৫

শিক্ষাখাতে লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

প্রধান ধাপসমূহ	একক	১৯৭৯/৮০ প্রকৃত	১৯৮৪/৮৫ লক্ষ্যমাত্রা	১৯৮৪/৮৫ প্রকৃত
(১) প্রাথমিক শিক্ষা তালিকাভুক্তি	লক্ষ ছাত্র	৮৩	১৩০	৮৯'২
(২) মাধ্যমিক শিক্ষা তালিকাভুক্তি	লক্ষ ছাত্র	২০	২৫	২৪'৮
(৩) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা তালিকাভুক্তি	হাজার ছাত্র	৩০	৩৪	৩৮'৩
(৪) গণশিক্ষা তালিকাভুক্তি	লক্ষ ছাত্র	..	৪০০	৭'০

স্বাস্থ্য

২.৭৬। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকার "২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য স্বাস্থ্য" এই লক্ষ্য গ্রহণ করে। পরিকল্পনার প্রারম্ভে কেবলমাত্র জনসাধারণের ৩০% প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য রক্ষা সেবার আওতায় আনা হয়েছিল। যদিও কিছু সংক্রামক ও সাংঘাতিক ব্যাধির সমূলে উৎপাটন (যেমন গুটি বসন্ত) বা সন্তোষজনকভাবে রোধ করা হয়েছিল (যেমন কলেরা)। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পল্লী এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তদানুসারে ৩৪১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র (লক্ষ্যমাত্রা ৩৬৫) চালু করা হয়। ১,২৭৫টি গ্রামীণ ডিসপেন্সারীকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণ কেন্দ্রে উন্নীত করা হয় এবং ১,০৫৪টি নুতন কেন্দ্র গ্রামীণ জনসাধারণকে স্বাস্থ্যমূলক সেবা প্রদানের জন্য নির্মাণ করা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে হাসপাতালের বিছানা সংখ্যা ১৪,৪৪৫ থেকে ২৫,৩৮১ টিতে উন্নীত করার উপর জোর দেয়া হয়। যাহোক পরিকল্পনাকালে এই সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। "সকলের জন্য স্বাস্থ্য" এই উদ্দেশ্য অর্জনের আওতায় সংক্রামন মুক্তকরণ এবং মৌলিক ঔষুধের সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাধি রোধ করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ঔষধের সরবরাহকে সুলভ করার উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালে একটি ঔষধ নীতি গ্রহণ করা হয়। সরকার হাসপাতালগুলিতে ঔষধ সরবরাহ করার জন্য সরকারী খাতে ঔষধ প্রস্তুতির জন্য কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেয়। ওরাল রিহাইড্রেসন প্যাকেট, ডিপথেরিয়ার টিকা, টিটেনাস টক্সাইড, ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড ইত্যাদির সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয় কিন্তু সংক্রামন থেকে মুক্তকরণ কর্মসূচী উদ্দিষ্ট বয়স সীমার অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের মধ্যে কেবলমাত্র ২ শতাংশে পৌছায়। জনশক্তির ঘাটতির দিক থেকে এই খাত অসুবিধার সম্মুখীন হয়। গ্রাজুয়েট ডাক্তারদের সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা ১৭,০০০ থেকে এক হাজার নীচে থাকে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সদের সংখ্যায় ৬,৮৬৪ জনের লক্ষ্যমাত্রায় ৩৬৪ জনের ঘাটতি থেকে যায়। ৩,৬০০ জন মেডিকাল সহকারীকে ১৮টি প্রশিক্ষণ স্কুলে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং ২৮,০০০ পল্লী চিকিৎসককে পল্লী এলাকার প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য উপজেলা হেল্থ কমপ্লেকসে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা

২.৭৭। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর মাধ্যমেই জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার, জন্ম নিরোধের বিদ্যমানহার (CPR) এবং নীট জন্মহার (NRR) প্রভৃতির উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নিরূপনের প্রয়াস নেয়া হয়। পরিকল্পনা ১৯৮৪/৮৫ সালে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হারকে ১˙৮ শতাংশে এবং স্থূল জন্মহারকে (CBR) ৩˙২ শতাংশে কমিয়ে এবং জন্ম নিরোধের বিদ্যমান হারকে (CPR) ৩৭˙৫ শতাংশে বাড়িয়ে ১৯৯০ সালে নীট জন্মহার = ১ (NRR = 1) এ পৌছানোর ব্যবস্থা নেয়। এসকল ক্ষেত্রে প্রকৃত সাফল্য অর্জন লক্ষ্যমাত্রার নীচে ছিল। ১৯৮৪/৮৫ সালে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২˙৪%, স্থূল জন্মহার ৩˙৯% এবং জন্ম নিরোধের বিদ্যমান হার ১৯৭৯/৮০ সালের ১৪ শতাংশের স্থলে ২৫ শতাংশে দাড়ায়। পল্লী এলাকার মাঠপর্যায়ের কর্মী ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ এবং নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণের দিকে তাকালে দেখা যায় যে এক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক ছিলনা। এটা স্বীকার্য্য যে পরিবার পরিকল্পনা মূলতঃ গ্রামীণ সমাজে ঐতিহ্যবাহী জনসাধারণের মনোভাব ও কৃষ্টির সংগে জড়িত; সুতরাং জনসংখ্যা কর্মসূচীর প্রভাব নির্ণয়ের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী ধারনা নেয়া প্রয়োজন। দেখা যায় যে ১৯৬০ সাল থেকে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ২˙৭ শতাংশ থেকে ২˙৪ শতাংশে নেমে এসেছে, সমস্যার ব্যাপকতার তুলনায় যা যথেষ্ট নয়।

সমাজ কল্যাণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ণ

২.৭৮। উন্নয়ন ফলাফলের সুষম বন্টন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি পরিকল্পনাই অনুসরণ করে আসছে। এর একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমাজের প্রত্যেকটি সদস্যের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং এর পন্থাই হল প্রত্যেকের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সুতরাং যথারীতি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে

এর বৃদ্ধি ছাড়াও কেবলমাত্র যারা ইতিমধ্যেই কর্মরত শুধু তাদের জন্য নয় বরঞ্চ যারা কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজছে বা যারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যোগদানে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত তাদেরও প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিশু, যুবক ও মহিলাদের এক বিরাট অংশ এই দুই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। সরকারী কতকগুলি সংস্থা যথা সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক, যুব উন্নয়ন, জনশক্তি ও শ্রম এবং বেসরকারী খাতে কতকগুলি সংস্থার দ্বারা এর প্রয়োজনীয়তা মেটানো হচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী খাতে কর্মে নিয়োজিতদের প্রশিক্ষণের চাহিদা কতকগুলি সরকারী এবং আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পুরণ করা হচ্ছে। ভূমিহীন, স্কুল পরিত্যাগকারী, এতিম, দুস্থ মহিলা, অন্ধ, মানসিক বা দৈহিক বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত শিশুদের মত সমাজে দৈহিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বাধা প্রাপ্ত সদস্যদের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে এবং তাদেরকে উৎপাদনক্ষম ও স্ব-নির্ভর করার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। কার্য্যকলাপগুলি গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় বিস্তৃত। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে একটি গ্রাম্য কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয় যেখানে অসুবিধাগ্রস্ত গোষ্ঠি যেমন স্কুল পরিত্যাগকারী, ভূমিহীন এবং মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়। ১০০টি উপজেলায় এই কর্মসূচী হাতে নেয়া হয় এবং ১৯৬টি কমিউনিটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পুরাতন মহকুমা পর্যায়ে ৭০টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই সব কার্য্যকলাপের আওতাধীন ছিল প্রায় ৪ লক্ষ লোক। মহিলা জনগোষ্ঠির দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয় যেহেতু তারা সনাতনী সমাজে এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মহিলাদের গুরুত্ব মহিলাবিষয়ক নামে একটি ভিন্ন মন্ত্রণালয় স্থাপনের মধ্যদিয়ে স্বীকার করা হয়। মহিলা জনগোষ্ঠির উন্নয়ন কার্যক্রমে বৃহত্তর উপায়ে যোগদানে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে তাদের শিক্ষার অভাব। পুরুষের শিক্ষার হার ২৬ শতাংশের স্থলে মহিলাদের শিক্ষার হার কেবলমাত্র ১৩.২ শতাংশ; সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মহিলা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এই লক্ষ্যে কতকগুলি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এইসব কার্য্যকলাপের মধ্যে প্রত্যেক জেলা সদরে একটি করে মেয়েদের জন্য স্কুল ও কলেজ স্থাপন, ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি, ২০০ কমিউনিটি স্কুলে বৃত্তিমূলক ও অ-বিধিবৎ শিক্ষার আয়োজন, প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটে মহিলা শিক্ষকদের থাকার জন্য ৫০ জনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন হোষ্টেল স্থাপন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা এটা প্রতীয়মান হয় যে শিক্ষা এবং উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছাড়া লোকসংখ্যার সমস্যা সুচারুরূপে সমাধান করা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য খাতে পল্লী অঞ্চলে ১২২৫ টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে মাতৃসদন সেবা বিস্তার করা হয়। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যতীত মহিলাদের জন্য বিশেষ করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর বিশেষ নজর দেয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২০৪টি দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র এবং ৩৮টি ইউনিয়ন উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে তাঁত বুনন এবং ঘড়ি ও রেডিও মেরামতের উপর দুটি বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচী শুরু করা হয়। যথারীতি কর্মসংস্থানের অভাব থেকে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যাবলী যুব সম্প্রদায়ের উপর চাপ ও পীড়ন সৃষ্টি করায় যুব উন্নয়নের জন্য কতকগুলি কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালন, টেলিযোগাযোগ, সচিবের কর্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ এসব কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু উন্নয়ন হলো বৈষয়িক এবং সংস্কৃতি ভিত্তির উৎকর্ষতা, সেহেতু খেলা-ধুলা, চারুশিল্প, নাটক, গ্রন্থাগার প্রভৃতি উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা হয়। জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা থানা পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা হয়। গণ মাধ্যমের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এবং বেতার ব্যবস্থা এখন জনগোষ্ঠির ৯০ শতাংশে ব্যাপ্তিলাভ করেছে। সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্য্যক্রমের প্রয়োজনীয়তায় সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উপর প্রশিক্ষণের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী নামে একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থাপন করা হয়। উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণের জন্য এখন পর্যন্ত প্রচলিত তিনটি জন প্রশাসন ইনষ্টিটিউটকে একত্রীকরণ করে জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (PATC) রূপান্তরিত করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে জনপ্রশাসনের একটি ব্যাপক দৃষ্টিভংগী প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে জনপ্রশাসনের একত্রিকরণকে যা এতদিন পার্শ্বভিমুখী অবস্থায় চালু ছিল তা উন্নত করে স্থাপন করে।

খাতওয়ারী বরাদ্দ ও অর্জন

২.৭৯। দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতের প্রবৃদ্ধি নানাবিধ কারণে ব্যাহত হয়—আবহাওয়া কৃষি খাতের এবং চাহিদাহ্রাস শিল্পখাতের অগ্রগতিতে বাধা দেয়। কিন্ত যে সব প্রতিকূলতা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল সেগুলো হল সম্পদের স্বল্পতা এবং প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। এই উভয় সমস্যা সাধারণভাবে পর্বেই পৃথক পৃথক অবস্থায় আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু সম্পদের সীমাবদ্ধতা যা বিভিন্ন খাতকে সরাসরিভাবে ব্যাহত করেছে তা উপস্থাপন করা হল। নীচের সারণীতে এটা প্রতিফলিত হয়েছে:

পরিকল্পনা ... গ্রন্থা...

সারণী ২.১৬

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী খাতে বরাদ্দ এবং অর্জন

(চলতি মূল্যে) [কোটি টাকায়]

খাত	বরাদ্দ		অর্জন	
	পরিমাণ	মোট বরাদ্দের %	পরিমাণ	মোট অর্জনের %
১। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ ..	৫,৫৫২	৩৪.৬	৪,১৪৯	২৯.৮
(ক) কৃষি ..	২,১৪৯	১৩.৪	১,৭৭৬	১২.৮
(খ) সেচ ..	২,৭০২	১৬.৮	১,৯১১	১৩.৭
(গ) গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন	৭০১	৪.৪	৪৬২	৩.৩
২। শিল্প	২,০৪২	১২.৭	১,২৫৪	৯.০
৩। বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ..	৩,০২১	১৮.৮	৩,০৬১	২২.০
৪। ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন ..	৮২০	৫.১	৭৪৬	৫.৩
৫। পরিবহন	১৮১৯	১১.৩	১,৭৭৪	১২.৭
৬। যোগাযোগ	৩৪১	২.১	৩০৮	২.২
৭। শিক্ষা ও ধর্মীয় বিষয়াদী ..	৭০৭	৪.৪	৫১১	৩.৭
৮। স্বাস্থ্য ..	৪১৩	২.৬	৩৭১	২.৭
৯। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা	৩৬৮	২.৩	৩৪৬	২.৫
১০। স্কাইসোয়াম (SCYSWAM) ..	২৮০	১.৭	২৩১	১.৭
১১। জনশক্তি ও শ্রম ..	৮৮	০.৬	৯০	০.৬
১২। জন প্রশাসন	৫৫	০.৩	৪৮	০.৩
১৩। এস টি আর (STR) ..	১২৯	০.৮	১১০	০.৮
১৪। উপজেলা অবকাঠামো ও উন্নয়ন সাহায্য এবং অন্যান্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা, পৌরসভা ইত্যাদি)	৪২৫	২.৭	৯৩০	৬.৭
মোট :	১৬,০৬০	১০০	১৩,৯২৯	১০০

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পরিকল্পনার সমষ্টিগত অর্থনৈতিক রূপরেখা

উন্নয়ন পর্যালোচনা

পরিকল্পিত উন্নয়নের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। স্বাধীনতাউত্তরকালের তিনটি উন্নয়ন পরিকল্পনার সবকয়টিতেই এটি ছিল মৌলিক বিষয়। এসব পরিকল্পনায় গ্রামীণ উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয়েছিল যাতে পরিকল্পিত উন্নয়নের সুফল পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী সর্বাধিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতা পূর্বকালের পরিকল্পনাগুলো গ্রামীণ সমাজকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র শিল্পায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল। স্বাধীনতাত্তোরকালে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ক্রমবর্ধমান হারে আর্থ-সামাজিক অবহেলিত জনগোষ্ঠী কেন্দ্রীক ছিলো। জনগণের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা ও সর্বনিম্ন মৌলিক প্রয়োজনসমূহ মেটানোই এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল।

২। কিন্তু পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্রমাগত প্রচেষ্টা অর্থনীতিতে অদৃশ্য কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়েছে। উপর্যুপরি বন্যা ও খরা, বিশেষতঃ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যা কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে ক্রমাগত বিপন্ন করেছে। প্রধান খাত কৃষি আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল বিধায় অর্থনীতি নড়বড়ে অবস্থায় থেকে যায়। অপরদিকে, স্বাধীনতালাভের সময় থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্যও ক্রমাগতহারে বিরূপ প্রভাব দেখা দেয়, এসব কারণে ক্রমবর্ধমান হারের জনসংখ্যার তুলনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে মন্দা দেখা দেয় এবং গ্রামীণ জনগণের আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। গ্রামীণ গৃহস্থালির মধ্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ২২৭৩ কিলো ক্যালরীরও কম ক্যালোরী গ্রহণকারী জনসংখ্যার হার অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পায়। অব্যাহত দারিদ্রের পাশাপাশি বেকারত্ব, অপুষ্টি, অশিক্ষা ও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এদেশে জটিল সমস্যা হিসাবে থেকে যায়।

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

৩। বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দারিদ্র বিমোচন তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসেবে অব্যাহত থাকবে। কিন্তু দারিদ্রের মাত্রা ও জটিলতা এ সম্পর্কে একটা দীর্ঘ মেয়াদী ভাবনার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। অধিকতর দারিদ্র ও বেকারত্ব, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপুষ্টি, অশিক্ষা—এই সমস্যাগুলো এতই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে এর সবগুলোই সম্পদের সীমাবদ্ধতা, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ও সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে একটি জাতীয় পরিকল্পনায় এদের আপেক্ষিক অগ্রাধিকার বৃহত্তর ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিতে একই সাথে মোকাবেলা করা প্রয়োজন। এটা স্বীকৃত যে প্রতিটি সমস্যার ধরনও ভিন্ন; কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে যেগুলো উত্তরাধিকারগতভাবে বর্ধিষ্ণু ধরনের এবং এসব সমস্যার প্রতি যত কম মনযোগ দেয়া হয় ততবেশী জটিলতায় এগুলো পুঞ্জীভূত হয় যেমন, জনসংখ্যা। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনায় দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিতে উন্নয়নকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং উদ্দেশ্যসমূহকে সেভাবে বিন্যস্ত করা হয়।

৪। পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

(১) জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হ্রাস করা।

(২) উৎপাদনক্ষম কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ।

(৩) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।

(৪) দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রযুক্তিগত ভিত্তি উন্নয়ন।

(৫) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা।

(৬) জনগণের সর্বনিম্ন মৌলিক প্রয়োজন মেটানো।

(৭) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চাঙ্গা করা।

(৮) স্ব-নির্ভরতা ত্বরান্বিত করা।

লক্ষ্য ও কৌশলাদি

৫। যেহেতু পরিকল্পিত উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন এবং সকল পরিকল্পিত উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিকল্পিত উন্নয়নের এই লক্ষ্য থেকে উৎসারিত সেহেতু এগুলোকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন ভাবা যায় না। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রতিটি উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সঠিক ও যুগপৎ গুরুত্ব প্রদান নিশ্চিত করতে হয়েছে। অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রতিটি বিষয়ের একটি সর্বনিম্ন সাফল্য অর্জনের নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন হবে। তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এর কৌশলসমূহের মধ্যে নিহিত। এখানে জোর দেওয়া প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে বিভিন্ন পরিকল্পনাসমূহের পার্থক্য এগুলোর উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে নিহিত নয়, বরং এই সমস্ত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের নিমিত্তে গৃহীত কৌশলাদির মধ্যে তা নিহিত।

৬। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে কৌশলসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

৬.১ **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণঃ** জনসংখ্যার আকার এবং এর প্রবৃদ্ধি উভয়ই দারিদ্রের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ জনসংখ্যার দ্রুত প্রবৃদ্ধি মানে নির্ভরশীলতার উচ্চতর হার, ভোগের উচ্চতর হার ও সঞ্চয়ের নিম্নহার যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারকে বিঘ্নিত করে। প্রকৃতিগতভাবে গতিশীল দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বিতীয় ফল হচ্ছে এই যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা কর্ম-সংস্থানের খোঁজে শ্রম বাজারে প্রবেশ করবে এবং তখন তাদের আত্মীকরণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হবে। এভাবে বেকারত্ব সমস্যার আরো অবনতি ঘটবে। গতিশীল এই সম্পর্কের কারণে দারিদ্র ও বেকারত্ব সমস্যা মোকাবেলায় যে কোন প্রচেষ্টা সফলতার জন্য একটি কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনায় তাই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সম্প্রসারণ করে পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি প্রায় ২.৪% থেকে কমিয়ে ২.০% এ এবং পরিকল্পনার সমাপ্তি বছরে ১.৮% এ প্রাক্কলিত করা হয়। মাঠ পর্যায়ে সেবাসমূহ বিশেষত মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাদি জোরদার করার উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। সে যাই হোক জনসংখ্যা সমস্যার ব্যাপারে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মতো স্থানীয় নেতৃবর্গকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীসমূহে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবশ্যই গ্রহীতা প্রান্তে সামাজিক চেতনাবোধ বাড়াতে হবে।

৬.২ **কর্মসংস্থান কৌশলাদি:** তৃতীয় পরিকল্পনায় দারিদ্র বিমোচনে সার্বিক প্রচেষ্টা হচ্ছে জন সাধারণের জন্য উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যাতে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর মতো সম্পদ ও আয় ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এই লক্ষ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় দেশের দুটো প্রাথমিক সম্পদ যথা ভূমি ও শ্রমের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। পরিকল্পিত উন্নয়নের মুখ্য চালিকা শক্তি হবে প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এদের উৎপাদনশীলতার মান উন্নীত করা। সনাতন কৃষি ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই এদিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু মাত্র এক-চতুর্থাংশ কৃষি জমি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির আওতাধীন এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষিতে আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উন্নততর প্রযুক্তি জানা থাকলে গ্রামীণ অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য যা অনুপস্থিত তা হচ্ছে কৃষির পরে দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সনাতন শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। বাংলাদেশের বিরাজমান শিল্প কাঠামোতে আধুনিক

শিল্পে উন্নত প্রযুক্তি এবং কুটির শিল্পে সনাতন প্রযুক্তির মধ্যে কেন্দ্রাভিমুখী প্রবনতা রয়েছে। দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যের আলোকে তৃতীয় পরিকল্পনায় বিদ্যমান গ্রামীণ প্রযুক্তি সেকেলে বলে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং নিত্যনতুন কৃষি প্রযুক্তি দ্রুত আয়ত্তে আনার প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি তৃতীয় পরিকল্পনায় কুটির ও গ্রামীণ শিল্পে প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন জোর দেয়া হয়েছে। কুটির শিল্পে প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন ব্যতীত বেকারত্বের প্রবৃদ্ধি কমানো সম্ভব হবেনা; যে বেকারত্ব পল্লী এলাকায় সেকেলে কুটির শিল্প সমস্যাকে আরো স্ফীত করবে। অপরদিকে, আধুনিক শিল্প পুঁজিঘন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং সেহেতু সীমিত সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে মাত্র। উৎপাদনশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকেও এগুলো থেকে অনেক কিছু আশা করার আছে। সম্পদের স্বল্পতা ও উপযুক্ত কারিগরী প্রযুক্তির অভাবে বড়, মাঝারি ও কুটির শিল্পের মাঝে যা দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত তা হচ্ছে একটি গতিশীল ক্ষুদ্র শিল্পখাত। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই শূণ্যতা পূরণের জন্য প্রধানত কুটির শিল্পের মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি গতিশীল গ্রামীণ শিল্পখাত সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এরফলে প্রতি ইউনিট পুঁজি অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং শ্রম পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করবে। শুধুমাত্র বিশেষ প্রযুক্তি ও অধিক উৎপাদনের মাধ্যমে ব্যয় সংকোচের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতার দ্বৈত উদ্দেশ্যের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আধুনিক বৃহৎ শিল্প স্থাপন করা হবে, যদি ইউরিয়া সারের মত এই ধরনের বৃহৎ শিল্পের অর্থনীতির বাকী অংশের সাথে ঘনিষ্ট সংযোগ থাকে। প্রযুক্তিগত সংযোগ ছাড়াও কর্মসংস্থানের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের দ্বারাও এ জাতীয় শিল্পের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা উচিৎ। তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের সম্ভাব্যতা চিহ্নিতকরণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য কতিপয় সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এ সবের আওতায় রয়েছে শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস, পশুপালন ও বনসম্পদ এবং গ্রামীণ শিল্প যা কর্মসংস্থানমুখী উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নে ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

৬.৩ **শিক্ষার উন্নয়ন :** উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান পরিকল্পিত উদ্দেশ্য হওয়ার এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ওপর এর নির্ভরশীলতা রয়েছে বিধায় শিক্ষা ও দক্ষতা সৃষ্টি হবে দারিদ্র বিমোচন উদ্দেশ্য অর্জনের চাবিকাঠি। তৃতীয় পরিকল্পনায় তাই শিক্ষার উন্নয়নে বড় রকমের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এটা অনুভূত হয়েছে যে, উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বাড়ানো সম্ভব হলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে উন্নয়ন ও চলতি ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। শিক্ষা এবং শ্রম বাজারের মধ্যে বর্তমান ভারসাম্যহীনতা অতিক্রম করতে হলে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে যতশীঘ্র সম্ভব একটা জনশক্তি পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৬.৪ **খাদ্য, পুষ্টি ও মৌলিক চাহিদা :** এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে খাদ্য ও মৌলিক চাহিদাসমূহের সাধারন মানুষের প্রবেশাধিকার নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিশ্চিত করা যায়। সুতরাং উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণের সাথে সাথে মৌলিক চাহিদার বিশেষতঃ খাদ্যশস্য, মাছ, দুধ, ভোজ্য তৈল, সস্তা বস্ত্র, খাবার পানি, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সেবার উৎপাদন ও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদন ১৯৮৯/৯০ সালে ২০৭ লাখ টনে বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়। অবশ্য এটা স্বীকার করা হয় যে, উৎপাদন প্রবৃদ্ধি শুধুমাত্র কল্যাণমূলক কর্মসূচীর জন্য একটি সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান করতে পারে। তাই দারিদ্রের জটিল প্রকৃতি ও দেশে বিরাজমান বিপুল আকারের অপুষ্টি এবং পরিকল্পনাকালে বেকারত্বের মাত্রা প্রভূতভাবে হ্রাস অসম্ভব বিধায় মধ্যমেয়াদী কতিপয় কল্যাণমূলক কর্মসূচী যেমন কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ও দুঃস্থদের জন্য খাদ্যসরবরাহ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন হবে। এটা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রামীণ গৃহস্থালীর তিন-চতুর্থাংশ জীবন ধারণের জন্য বিবেচিত সর্বনিম্ন খাদ্যমানের চেয়েও কম ভোগ করে এবং ৩১১ লাখ শ্রম শক্তির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী বেকার। তৃতীয় পরিকল্পনার মতো একটি মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনাকালে জনগণের মৌলিক প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর সুযোগ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দানকারী পর্যায়ে মাথাপিছু আয়কে উন্নীত করা সম্ভব নয়। কতিপয় **মৌলিক চাহিদার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নীচে দেয়া হলো :**

সারণী ১

মৌলিক চাহিদাসমূহের সরবরাহ (উৎপাদন)

মৌলিক চাহিদার দ্রব্যাদি	১৯৮৪/৮৫ (প্রকৃত)	১৯৮৯/৯০ (লক্ষ্যমাত্রা)
১। খাদ্যশস্য (লক্ষ মেট্রিক টন)	১৬১.২	২০৭.০
২। মৎস্য (লক্ষ মেট্রিক টন)	৭.৭	১০.০
৩। ডাল (লক্ষ টন)	২.০	৩.০
৪। কাপড় (মিলিয়ন মিটার)	৭৭১.০	১২১৫.০
৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি (লক্ষ ছাত্র)	৮৬.২	১১৬.৩
৬। হাসপাতালের শয্যা (হাজার শয্যা)	২৭.৬	৪০.৭
৭। গ্রামীণ পানি সরবরাহ (হাজার হস্তচালিত নলকূপ)*	৬১৮.৮	৭৭২.৮
৮। বিদ্যুতায়িত গ্রাম (হাজার গ্রাম)	৭.৯	২২.১

*অগভীর, গভীর ও ডীপসেট হস্তচালিত নলকূপসহ।

৬.৫ **কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি ঃ** প্রদত্ত সার্বিক কৌশলের আলোকে পরিকল্পনাকালে প্রধানতঃ শ্রম শক্তির উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান ও ভূমির উৎপাদনমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি বাড়বে বলে আশা করা যায়। সত্য যদিও প্রবৃদ্ধির পথে জটিল প্রতিবন্ধক হবে তবুও বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার উৎপাদনমূলক ব্যবহার এবং সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু বরাদ্দে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ৫.৪% পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করতে পারবে। এটা উল্লেখ করা হতে পারে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উপর্যুপরি খরা হওয়ায় বেশ কয়েকবার শস্যহানি ঘটিলেও অর্থনীতিতে ৩.৮% প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হয়েছিলো। অবশ্য আবহাওয়ার প্রভাব সর্বনিম্ন পর্যায়ে হ্রাস এবং আরো প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অতীতের তুলনায় আরো প্রকট হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় পুঁজি-উৎপাদন অনুপাত ৪ ধরা হয়। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নের উপর পরিকল্পিতভাবে গুরুত্ব প্রদান করে অর্থনীতিতে পুঁজি ও প্রযুক্তিগত ভিত্তির গভীরতা কমানো হবে, যেখানে বৃহৎ/মাঝারী শিল্পের তুলনায় অধিক নিম্নহারে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনে উন্নতি এবং বর্তমান ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব।

৬.৬ **স্ব-নির্ভরতা ও সম্পদ সংগ্রহ ঃ** পরিকল্পনায় বৈদেশিক সম্পদ অন্তঃপ্রবাহের প্রবৃদ্ধির হার (৩.১%) দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় (৩.৩%) কিছুটা কম ধরা হয়। প্রকল্প সাহায্যের আকারে ইতিমধ্যেই পাইপ লাইনে বেশ সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে যা তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রকল্প সাহায্য ব্যবহার পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে যা প্রয়োজন তা হচ্ছেঃ (১) প্রথমতঃ, সাহায্যের প্রকৃতিতে পণ্য সাহায্যের অনুকূলে একটি পরিবর্তন চাওয়া এবং

(২) দ্বিতীয়তঃ, আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে সম্পূরক তহবিল যোগানের জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করা। ৩৮,৬০০ কোটি টাকার (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে) পরিকল্পনার অর্থ যোগান দিতে নীট বৈদেশিক সম্পদ অন্তঃপ্রবাহ ২১,০২৮ কোটি টাকা হিসাব করা হয়েছে এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদ ১৭,৫৭২ কোটি টাকায় উঠানো যাবে। স্বনির্ভরতার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে লেনদেন ভারসাম্য অতিক্রমের জন্য একটি বহুমুখী শিল্পায়ন প্রক্রিয়া উৎসাহিত করা।

পরিকল্পনার আকার ও বরাদ্দ

৭। ৩৮,৬০০ কোটি টাকার পরিকল্পনার আকারের সাথে দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

সারণী ২

তৃতীয় পরিকল্পনার বরাদ্দের সাথে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বরাদ্দের তুলনা

(কোটি টাকায়)

	দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকৃত (চলতি মূল্যে)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকৃত (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)	তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)
(ক) সরকারী খাত	১৩,৯২৯	১৭,৯৪৪	২৫,০০০
(খ) বেসরকারী খাত	৬,৮৭১	৮,৬৩২	১৩,৬০০
মোট : ..	২০,৮০০	২৬,৫৭৬	৩৮,৬০০

তৃতীয় পরিকল্পনার সার্বিক আকার দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দের চাইতে ৪৫.২% বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারী খাতের অবদান দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্জিত ৩৩.০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫.২% হবে বলে ধরা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ মোটামুটি ধারণাকৃত, প্রকৃত বিনিয়োগ নির্ভর করবে বিনিয়োগ পরিবেশ, সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নীতিমালা, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আবহাওয়া এবং সর্বোপরি বেসরকারী খাতের উদ্যোগের উপর। পরিকল্পনায় মুদ্রা ও কর নীতির মত পলিসি প্যারামিটার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেখানে কাংখিত ফল লাভের জন্য একটি নীতি কৌশল থেকে অন্যনীতি কৌশল ব্যবহার করা যায়। সুতরাং নীতিমালা থেকে অনুকূল সাড়া পাওয়া গেলে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তৃতীয় পরিকল্পনায় সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নীতিমালা সুচারুরূপে পরিচালিত হবে যাতে নতুন শিল্পনীতির মাধ্যমে বেসরকারী খাতকে উন্নয়নের একটি গতিশীল অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

পরিকল্পনার অর্থ যোগান

৮। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতার যে তীব্রতা অনুভূত হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনার আকার ৪৫.২% বৃদ্ধি করতে গিয়ে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টা জোরদার করা প্রয়োজন হবে, যদিও পরিকল্পনার আকারে এ ধরনের বৃদ্ধি দ্রুত বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির বিপরীতে বিদ্যমান নিম্নপর্যায়ের মাথাপিছু বিনিয়োগ একটি নাম মাত্র বৃদ্ধি বুঝায়। মাথা পিছু বিনিয়োগ ক্রমবর্ধমান-ভাবে বাড়াতে না পারলে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন ও শ্রমের উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন অর্জিত হবে না এবং অর্থনীতি দারিদ্র চক্রের আবর্তে আবদ্ধ থেকেই যাবে। আভ্যন্তরীণ সম্পদের অংশ ৪৫.৫% হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে যা প্রায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমপর্যায়ের, কিন্তু চূড়ান্ত অর্থে অধিকতর পরিমাণে আভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রয়োজন হবে। আভ্যন্তরীণ সম্পদের বর্ধিত প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী সঞ্চয় উভয়ের দিকেই জোর দেয়া হয়েছে। শেষোক্তটি হবে ব্যাপক ভিত্তিক গৃহস্থালী সঞ্চয় নির্ভর। সম্পদ পরিস্থিতি আভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং লেনদেন ভারসাম্য ও বৈদেশিক সম্পদ অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিতভাবে এবং বেসরকারী বিনিয়োগ অধ্যায়ে আংশিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নীচের সারণীতে পরিকল্পনার অর্থ যোগানোর উৎস ভিত্তিক চিত্র দেয়া হয়েছে:

সারণী ৩

পরিকল্পনার অর্থ যোগান

(১৯৮৫—৯০)

(কোটি টাকায়)

উৎস	পরিমাণ
(ক) আভ্যন্তরীণ অর্থ যোগান:	
(১) সরকারী সঞ্চয়	৫,৯৬০
(২) বেসরকারী সঞ্চয়	১১,৬১২
	১৭,৫৭২
(খ) নীট বৈদেশিক সাহায্য	২১,০২৮
মোট:	৩৮,৬০০

সম্পদ সংগ্রহের কৌশল

৯। অতীতের উন্নয়ন প্রচেষ্টা আভ্যন্তরীণ সম্পদের ঘাটতিতে বারবার বিঘ্নিত হয়েছে; এমন কি এই ঘাটতির ফলে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার পর্যন্ত সীমিত হয়েছে কারণ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান রপ্তানী-আমদানী ব্যবধানকে ছাড়িয়ে গেছে। কাজেই বাংলাদেশকে সাহায্য নির্ভর প্রকল্পের স্থানীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে অধিকতর পুনর্ভরণযোগ্য (Reimbursable) প্রকল্প সাহায্য চাইতে হচ্ছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এরূপ প্রয়োজন অব্যাহত থাকলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্য আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ কার্যকর প্রচেষ্টার সফলতার উপর নির্ভর করবে। এই প্রয়োজনের আলোকে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের কার্যকর কৌশল অবলম্বনের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয় অধ্যায়ে

আলোচিত হয়েছে যে, এই উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত কৌশলসমূহের মধ্যে রয়েছে সরকারী ও বেসরকারী সঞ্চয় বৃদ্ধি, জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সরকারী ভোগে কৃচ্ছতা ও ভর্তুকী সর্বনিম্ন পর্যায়ে হ্রাস, কর প্রশাসনের মানোন্নয়ন ও কর কাঠামোর যুক্তিযুক্তকরণ। কর ব্যবস্থাকে রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর প্রচণ্ড নির্ভরশীল না করে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর অধিকতর নির্ভরশীল করার জন্য শেষোক্ত কৌশলটি অনুসৃত হবে। আর্থিক ও মুদ্রা ব্যবস্থা উভয়ই গৃহস্থালী সঞ্চয় বৃদ্ধিতে উৎসাহদানের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ সম্পদ ভিত্তি সম্প্রসারণ এবং তা অর্থ বাজারের আওতায় আনার জন্য পরিচালিত হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেসরকারী খাতের ভূমিকা ও বাজার সম্প্রসারণের সাথে সাথে কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আর্থিক ও মুদ্রা ব্যবস্থার মাধ্যমে এসব ধারাকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করা হবে যাতে ১৭,৫৭২ কোটি টাকার আভ্যন্তরীণ সম্পদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয় যার দুই-তৃতীয়াংশ বেসরকারী সঞ্চয় থেকে আসবে। আর্থিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর-জিডিপি অনুপাত ১৯৮৪/৮৫ সালের ৮.২% থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ৯.৪% এ উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং কর রাজস্ব বছরে ৮.৫% হারে বাড়িয়ে ২,৮৪৭ কোটি টাকা থেকে ৪,২৭১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হবে। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জিডিপির শতকরা হিসেবে ১৯৮৪/৮৫ সালের ৪.২% থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ৭.০% এ বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় সঞ্চয় হার ৭.০% থেকে ৯.৩% এ পৌঁছবে।

লেনদেন ভারসাম্য কৌশল

১০। বিশ্ববাণিজ্য ও সাহায্য সমস্যার কারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি নাজুক থেকেই যায়। অতএব পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অর্জনে একটি প্রধান কৌশল হবে লেনদেন ভারসাম্যের ব্যবধানকে প্রাপ্তব্য বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে সীমিত রাখা। এই কৌশলের ফলে রপ্তানী সম্প্রসারিত হবে যাতে অধিকতর আমদানীর অনুমতি দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ শিল্পের কাঁচামাল, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং আকাঙ্খীয় উন্নয়ন উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করা যায় এবং দেশে যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদিত হয় না এমন ভোগ্যপণ্য আমদানীর মাধ্যমে মৌলিক চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়। তদনুসারে আশা করা হচ্ছে যে, রপ্তানি বার্ষিক ৪.৬% হারে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালের ২,৪৪২ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ৩,০৫৭ কোটি টাকায় উন্নীত হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানি প্রকৃত অর্থে ৪.৯% হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া, প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৪/৮৫ সালে রপ্তানি ভিত্তি ছিল ১৯৭৯/৮০ সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ অধিক। এটাও স্বীকার্য যে উন্নত দেশসমূহের মন্থর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশী রপ্তানীর শ্লথ প্রবৃদ্ধি। অপ্রচলিত পণ্য সামগ্রীর রপ্তানি সম্প্রসারণ, নতুন নতুন রপ্তানি উন্মুক্ত করার জন্য অনুসন্ধানও শিল্পসমূহকে আরো রপ্তানিমুখীকরণের জোরদার প্রচেষ্টার অর্থনৈতিক নীতিমালা নেয়া হলেও রপ্তানিতে পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা ও চামড়ার মতো প্রচলিত পণ্যের আধিক্য অব্যাহত থাকবে। স্থানীয় পণ্যের আপেক্ষিক সুবিধাদির যথাযোগ্য ব্যবহারের জন্য শিল্প ও বাণিজ্য নীতিতে প্রয়োজনীয় নবরূপ দেয়া হবে।

১১। ৪.৬% বার্ষিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হারের বিপরীতে আমদানি বছরে ২.৮% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৭,০২০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৮,০৭৬ কোটি টাকায় উঠবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আমদানি প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৪.৫%। অর্থাৎ বাণিজ্য ঘাটতি ১৯৮৪/৮৫ সালের ৪,৬৯৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৮৯/৯০ সালে ৫,৪৪৭ কোটি টাকায় দাঁড়াবে এবং চলতি-হিসাব ঘাটতি ৩,৬৫০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪,১৯৯ কোটি টাকায় উঠবে (বিনিময় হার ডলার প্রতি ২৬ টাকা)। বাণিজ্য ঘাটতির অংশ বিশেষ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের দ্বারা মেটানো হবে যা বার্ষিক ৩.৮% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১,০৪০ কোটি টাকা থেকে ১,২৪৮ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাদবাকী ঘাটতি মেটানো হবে সাহায্য, ঋণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ দ্বারা যা ১৯৮৪/৮৫ সালের ৪,৩০৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৮৯/৯০ সালে ৪,৬০৭ কোটি টাকা হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ৪.৬% হারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির তুলনায় ২.৮%

হারে আমদানি প্রবৃদ্ধি ও ৩.১% হারে বৈদেশিক সাহায্যের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে; যা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ছিল যথাক্রমে ৪.৯%, ৪.৫% ও ৩.৩%। এই প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধির ফলে অর্থনীতির অধিকতর স্বনির্ভর হবে।

১২। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আমদানি কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খাদ্য আমদানি হ্রাস পাবে এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্য আমদানি অধিকতর বিকল্প আভ্যন্তরীণ পণ্য উৎপাদনের জন্য শ্লথ গতিতে (৩.৯%) বৃদ্ধি পাবে। মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি বার্ষিক ৭% হারে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে যাতে কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহ নিশ্চয়তার মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ক্ষমতা ব্যবহারের ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হয় এবং মূলধন পণ্য আমদানি বার্ষিক ৩.৪% হারে বৃদ্ধি পাবে।

১৩। লেনদেন ভারসাম্যের কৌশলসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হবে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্য অর্জন। এখানে সমস্যাটিকে দু'ভাবে মোকাবেলা করার প্রয়োজন হবে। যেমন বিভিন্ন পণ্য আমদানিতে বরাদ্দ এবং বছর ভেদে এর বরাদ্দ। রপ্তানি বাণিজ্য পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর বিপুলভাবে নির্ভরশীল হবার দুর্বলতার জন্য এমন প্রয়োজনের উৎপত্তি ঘটে। কারণ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের সরবরাহ ও চাহিদা উভয়ই বছর ভেদে ব্যাপক ওঠানামা করে। প্রধান রপ্তানি পণ্যের ওঠানামার কারণে লেনদেন ভারসাম্য কৌশলে এধরনের আঘাতের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে তা অন্যান্য খাতে যেমন আমদানি এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য শিল্পে বিরূপ প্রভাব ফেলতে না পারে। যে সমস্ত বছরে পাট ও পাটজাত দ্রব্য বেশী রপ্তানি হয় সে সব বছরে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে এমন নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন যাতে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ গড়ে উঠে এবং যে বছরে রপ্তানি আয় কম হয় সে বছরে এরূপ রিজার্ভ থেকে অর্থ নিয়ে শিল্পের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য আমদানি প্রবাহ নিশ্চিত রাখা যায়। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা খাদ্য খাতের অনিশ্চয়তার জন্য বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনার যৌক্তিকতা হিসেবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অনুসৃত পরিবর্তনশীল বিনিময় হার নীতি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন হবে যাতে প্রতিযোগী আমদানিসমূহের মধ্যে দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রার সুষ্ঠু বরাদ্দ নিশ্চিত করা যায় এবং রপ্তানি আয় ও প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বৃদ্ধি উৎসাহিত করা যায়।

১৪। অর্থনীতিতে সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধির আলোকে আমদানি ও রপ্তানি এবং তাদের কাঠামো প্রাক্কলিত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৫.৪% প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রান্তিক বছরে জিডিপি (১৯৮৪/৮৫ সালের স্থির উপকরণ মূল্যে) ১৯৮৪/৮৫ সালের ৩২,৮৩৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২,৭১০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। উপকরণ মূল্যে জিডিপির গঠন নিম্নের সারণীতে দেখানো হল:

সারণী ৪

জিডিপির গঠন

(১৯৮৪/৮৫ সালের স্থির মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

খাতসমূহ	১৯৮৪/৮৫		১৯৮৯/৯০		বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)
	জিডিপি	জিডিপির অংশ (%)	জিডিপি	জিডিপির অংশ (%)	
১। কৃষি	১৬,৫৩৮	৫০.৪	২০,০৫২	৪৬.৯	৪.০
২। শিল্প	৩,১২৫	৯.৫	৫,০৬১	১১.৯	১০.১
৩। গ্যাস ও বিদ্যুৎ ..	২৩৮	০.৭	৩৭৬	০.৯	৯.৬

সারণী ৪ (ক্রমশঃ)

(কোটি টাকায়)

খাতসমূহ	১৯৮৪/৮৫ জিডিপি	১৯৮৪/৮৫ জিডিপির অংশ (%)	১৯৮৯/৯০ জিডিপি	১৯৮৯/৯০ জিডিপির অংশ (%)	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)
৪। নির্মাণ	৭৬১	২.৩	৯৬৫	২.৩	৪.৯
৫। পরিবহণ ও যোগাযোগ ..	১,৭২২	৫.২	২,৪০৭	৫.৬	৬.৯
৬। বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবা-মূলক।	৭,৩১৯	২২.৪	৯,৯৭৫	২৩.৩	৬.৪
৭ গৃহায়ন সেবাসমূহ ..	৯৮৬	৩.০	১,১৮২	২.৮	৩.৭
৮। সরকারী সেবাসমূহ ..	২,১৪৫	৬.৫	২,৬৯০	৬.৩	৪.৬
মোট: ..	৩২,৮৩৪	১০০	৪২,৭১০	১০০	৫.৪
(১) আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জিডিপি'র % হিসেবে	৪.২		৭.০		
(২) বিনিয়োগ জিডিপি'র % হিসেবে	১৭.৩		১৯.০		
(৩) কর/জিডিপি অনুপাত (%)	৮.২		৯.৪		

সারণী ৪ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জিডিপি কাঠামোতে ১৯৮৪/৮৫ সালের তুলনায় ১৯৮৯/৯০ সালে কিছু পরিবর্তন আসবে; কিন্তু তবু জিডিপিতে কৃষিখাতের প্রাধান্য থাকবে। এটা তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৯৮৯/৯০ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে এবং জনগণের বসতবাড়ীর কাছাকাছি স্বল্পতম খরচে নতুন কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াসে গৃহীত কৃষিমুখী কৌশল অনুসরণ করে। যদিও শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি জিডিপির প্রবৃদ্ধির প্রায় দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পাবে তবু জিডিপিতে এই খাতের অবদান ১৯৮৪/৮৫ সালের ৯.৫% থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে মাত্র সামান্য বেড়ে ১১.৯% হবে। অবশ্য পরিকল্পনাকালে অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে বিদ্যমান ভারী শিল্পের ভিত্তি আরো ব্যবহার এবং এগুলোর সম্প্রসারণের নিমিত্তে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হবে। যেহেতু কৃষিতে শ্রম শক্তির আত্মীকরণ ক্ষমতা জমির সীমাবদ্ধতার কারণে ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাবে, শিল্প খাতকে তাই শ্রম শক্তির কর্মসংস্থানের জন্য আরো দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ধাতব ও যন্ত্র শিল্পের ভিত্তির উন্নয়ন করা না গেলে এই প্রবৃদ্ধি সম্ভব হবেনা।

খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা

১৫। প্রধান প্রধান খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা নীচের সারণীতে দেয়া হলো :

সারণী ৫

প্রধান খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা

খাত	একক	১৯৮৪/৮৫ (প্রকৃত)	১৯৮৯/৯০ (লক্ষ্যমাত্রা)
কৃষি			
১। খাদ্য শস্য	মিলিয়ন মেট্রিক টন	১৬.১	২০.৭
(ক) চাল	ঐ	১৪.৬	১৮.০
(খ) গম	ঐ	১.৫	২.৬
(গ) অন্যান্য	ঐ	..	০.১
২। পাট	মিলিয়ন বেল	৪.৬	৬.০
৩। চা	মিলিয়ন পাউণ্ড	৯৬.৮	১১৫.০
৪। ইক্ষু	লক্ষ টন	৭০.০	৮২.০
৫। ডাল	ঐ	২.০	৩.০
৬। তৈলবীজ	ঐ	২.০	৩.৫
৭। আলু	ঐ	১১.০	১৭.০
৮। মাছ	'০০০' টন	৭৭৪.৮	১,০০০
শিল্প			
১। পাটজাত বস্ত্র	'০০০' টন	৫৬১	৬৫০
২। তুলাজাত বস্ত্র			
(ক) সূতা	মিলিয়ন কেজি	৫৭.৪	৯৫.০
(খ) কাপড়	মিলিয়ন মিটার	৭৭১	১২১৫
৩। সার	'০০০' মেট্রিক টন	৮০৬	২১৫০
৪। কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট	ঐ	৯০	১০৫
৫। চিনি	ঐ	৮৮	২২৫
৬। সিমেন্ট	ঐ	২৪০	৮৫০
৭। মৌলিক ধাতু (ষ্টীল)	ঐ	১০১	২৩০
জ্বালানী			
১। বিদ্যুৎ			
(ক) উৎপাদন	GWH	৪৫৪৫	৮৯৯
(খ) বিক্রয়	GWH	২৮৪০	৭১৪৬

সারণী-৫ (ক্রমশঃ)

খাত		একক	১৯৮৪/৮৫ (প্রকৃত)	১৯৮৯/৯০ (লক্ষ্যমাত্রা)]
২। গ্যাস				
(ক) উৎপাদন ..	..	MMCFD	৪৫০	৭৫০
(খ) গ্রাহক সংখ্যা ..	..	'০০০' সংখ্যক	২৪০	৪০০
(গ) উন্নয়ন কূপ ..	..	সংখ্যা	২১	৩৮
পরিবহণ ও যোগাযোগ				
১। ইট বিছানো রাস্তা ..	..	কিলোমিটার	৪৮৩০	৬১১৮
ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন				
১। গ্রামীণ পানি সরবরাহ ..	..	'০০০' হস্তচালিত নলকূপ	৬১৮.৮	৭৯২.৮
শিক্ষা				
১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি	..	লক্ষ ছাত্র	৮৯.২	১১৩
২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি	..	ঐ	২৪.৮	২৭.৫
৩। মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি	..	ঐ	৪.৩	৪.৪
৪। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি	..	'০০০' ছাত্র	৩৫.০	৩৮.৬
৫। কারিগরী শিক্ষার্থী ভর্তি ..	..	ঐ	২০.৪	২২.০
৬। বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থী ভর্তি .. (কমিউনিটি স্কুল শিক্ষার্থীসহ)	..	ঐ	৫৫৪	৭৫৬
৭। মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ভর্তি ..	..	ঐ	৩১৯	৩৫০
স্বাস্থ্য				
১। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা	..	'০০০' সংখ্যা	২৭.৬	৪০.৭
২। ডাক্তারের সংখ্যা ..	..	ঐ	১৬.০	২২.৫
৩। নার্সের সংখ্যা ..	..	ঐ	৬.৫	১০.২
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ				
১। জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ..	..	শতকরা	২.৪	১.৮
২। গর্ভনিরোধক ব্যবহার হার ..	..	ঐ	২৫	৪০

আয়, ভোগ ও বন্টন

১৬। তৃতীয় পরিকল্পনার সাবিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বছরে ৫.৪% হারে বাড়বে বলে ধরা হয়েছে। পরিকল্পনার ব্যয় সংকুলানের জন্য আভ্যন্তরীণ সম্পদের চাহিদার প্রেক্ষিতে দ্রব্য ও সেবার ভোগ বছরে ৪.৮% হারে বাড়বে বলে হিসেব করা হয়েছে। ভোগের এ হার বর্তমান জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির দ্বিগুণ। যেহেতু পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হয়েছে, তাই সঞ্চয় প্রয়োজনীয়তার প্রবৃদ্ধির হারের উপরে ধার্য্যকৃত সাবিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হার জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করবে। ফলে মাথাপিছু ভোগ বছরে ২.৬% হারে বাড়বে অর্থাৎ পরিকল্পনা শেষে এটা ১৩.৬% বেশী হবে।

১৭। বর্তমান ৩৫১১ টাকার (১৩৫ ডলার) মাথাপিছু সাবিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রেক্ষিতে ইহা স্বীকৃত যে, পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির হার এটাকে পরিকল্পনার শেষ বছরে ৪১১৯ টাকায় (১৫৮ ডলার) উন্নীত করবে; যা আয় বন্টনে উন্নতিকল্পে যে প্রারম্ভিক আয়ের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক কম হবে। কাজেই, পরিকল্পনাকালে প্রারম্ভিক আয়ের তুলনায় আর কম থাকার নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার উপর অধিকতর জোর দেয়া হবে যাতে উন্নয়নের সুফল দরিদ্রের কাছে পৌঁছে।

১৮। স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন নিঃসন্দেহে উন্নয়ন কর্মসূচীতে জনগণের অংশগ্রহণে এবং এরূপ কর্মসূচীতে তাদের অনুভূত প্রয়োজনীয়তার প্রতিফলন ঘটাতে সাহায্য করবে। কিন্তু যেহেতু দারিদ্র বিমোচন একটা জাতীয় ব্যাপার তাই জনসংখ্যার বিভিন্ন শাখার ওপর উন্নয়নের ফলাফল ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। এ প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় সমষ্টিগত কাঠামোর প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে সোশাল এ্যাকাউন্টিং ম্যাট্রিক্সকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ম্যাট্রিক্সে ১০টি আর্থ-সামাজিক দল অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে আটটি পল্লী এলাকায় এবং দুটি শহর এলাকায়। এ সমস্ত দলের আর্থ-সামাজিক চরিত্রে ভূমিস্বত্ব এবং রীতি ও রীতিবহির্ভূত কর্মসংস্থানের প্রকৃতি এবং আয় ও ভোগে তাদের অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশকে শহর ও পল্লী এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছে। ৫,০০০ লোকের কম অধ্যুষিত জনপদকে পল্লী এলাকা বলে ধরা হয়েছে। কোন এলাকার দরিদ্রতম ৪০% জনসংখ্যাকে রীতি বহির্ভূত সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৯। এই দশটি আর্থ-সামাজিক দল হচ্ছে: (১) ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, (২) ক্ষুদ্র কৃষক (০.০-১.৫ একর জমি), (৩) মধ্যম কৃষক: মালিক-প্রজা (১.৫-৫.০ একর), (৪) মধ্যম কৃষক: মালিক-কৃষক (১.৫-৫.০ একর), (৫) বৃহৎ কৃষক (৫.০--১০.০ একর), (৬) অত্যন্ত বৃহৎ কৃষক (১০ একরের ওপরে), (৭) পল্লীর রীতি বহির্ভুত দল (কর্মসংস্থান দলের গরীব ৬০%), (৮) পল্লীর রীতিসম্মত দল (কর্মসংস্থান দলের ধনী ৪০%), (৯) শহরের রীতি বহির্ভুত দল (কর্মসংস্থান দলের গরীব ৬০%) এবং (১০) শহরের রীতিসম্মত দল (কর্মসংস্থান দলের ধনী ৪০%)।

২০। দারিদ্র বিমোচনের বিস্তৃত উদ্দেশ্যের আওতায় প্রত্যেক দলের ঈপ্সিত অর্থনৈতিক মান নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনাকালে জাতীয় সরকার কতিপয় অর্থনৈতিক হাতিয়ার গ্রহণ করেন। বিনিয়োগ কর্মসূচী, কর ও মূল্য নীতি এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তৃতীয় পরি-কল্পনাকালে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক দলের ওপর এগুলোর ফলাফল ঘনিষ্টভাবে মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করা হবে। যেহেতু সমষ্টিগত কাঠামো সমন্বিত মডেলে এক বছর পর পর সিমুলেশান করার ব্যবস্থা রয়েছে তাই এধরনের মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। কিন্তু যেহেতু এ ধরনের মডেলে গুণগত ও সময়োপযোগী উপাত্তের বিরাট চাহিদা রয়েছে তাই পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালী ও উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রধান প্রধান খাতওয়ারী ইস্যু ও কৌশলাদি

২১। তৃতীয় পরিকল্পনার বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার সাফল্য শুধুমাত্র বিনিয়োগের ওপরই নির্ভর করবে না, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, সরকারী ও বেসরকারী খাতের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা এবং সঠিক কৌশল ও সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োগেরও ওপর তা নির্ভরশীল। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদসমূহে কেবলমাত্র প্রধান প্রধান খাতওয়ারী ইস্যু ও কৌশলাদি সংক্ষেপে আলোচিত হচ্ছে, এগুলোর পরিপূর্ণ আলোচনা নিজ নিজ খাতওয়ারী অধ্যায়ে করা হবে।

২১.১। **খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতাঃ** প্রতিদিন মাথাপিছু ১৬ আউন্স খাদ্য ভোগ এবং ১৯৮৯/৯০ সালে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যের নিরাপত্তা ভাণ্ডার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ২০৭ লক্ষ টন ধার্য করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে খাদ্যের উৎপাদন বার্ষিক ৫.১% হারে বাড়াতে হবে যেখানে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়ায় উৎপাদনের অর্জিত হার ছিল ৩.৫%। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কৌশল হবে উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক সেচ-সার-বীজ প্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করা। এ কৌশলে কৃষিকার্যকে বোরো ও গম চাষের উপর কেন্দ্রীভূত করার দরকার হবে। কারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে বর্ধিত উৎপাদনে বোরো ও গমের অবদান সর্বাধিক ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ২৬ লক্ষ টনের ওপর; এর ২৩.৮ লক্ষ টন এসেছে বোরো ও গম থেকে। জমির প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক-ভৌগলিক অবস্থা শীতকালে সম্প্রসারিত উৎপাদনের উপযুক্ত হলেও সংশ্লিষ্ট দুটি সমস্যার সমাধান দরকার। প্রথম সমস্যা হচ্ছে ভূমির উপরিভাগ ও ভূগর্ভস্থ পানি কাজে লাগিয়ে শীতকালীন চাষের জন্য পানি সম্পদ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা। বর্ষাকালে বন্যা ও নিষ্কাশন সমস্যা এবং শীতকালে কম প্রবাহ দ্বারা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত অত্যন্ত জটিল পানি ব্যবস্থায় এ কৌশল পানি সংরক্ষণকে বর্ধিত উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে সংকটময় নির্ণায়ক করে তুলেছে। মৌসুমী জলবায়ুর অনিশ্চয়তার অবস্থা বিবেচনা করে কৃষি ও খাদ্য খাতের স্থির প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার লক্ষ্যে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য একটা সুষ্ঠু কৌশল ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দ্বিতীয় সমস্যা বর্ষাকালে ভিজা শস্য হিসেবে বাজারে ওঠা বোরো ধান গুদামজাত করণের সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই পৃষ্ঠপোষকতা কর্মসূচীর সম্প্রসারণ হিসেবে সরকারী ধান সংগ্রহ ব্যবস্থা তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশ্য হাসিলের খাতিরে ধান শুকানোর সহগামী সমস্যা অবশ্যই সমাধান করবে।

২১.২। **অপ্রধান শস্যের উন্নয়নঃ** প্রধান শস্য (ধান, পাট, ইক্ষু) এবং অপ্রধান শস্য (ডাল, তৈলবীজ, তুলা ইত্যাদি) বাজারের সুবিধার প্রেক্ষিতে কৃষকের পছন্দের ভিত্তিতে পরস্পরের প্রতিযোগী হিসেবে কাজ করে। পাট ও ধানের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক সর্বজনবিদিত, কিন্তু প্রধান ও অপ্রধান শস্যের এ সম্পর্ক খাদ্যোৎপাদনের স্বার্থে সাধারনতঃ নজরে পড়ে না। কিন্তু সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে খাদ্য শস্যের আবাদ শীতকালেও সম্প্রসারিত হওয়ায় ডাল ও তৈলবীজের মত গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান শস্যের ক্ষেত্রে সংঘাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ সেচ ব্যবস্থার ফলে এ সমস্ত শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত জমি খাদ্য শস্য আবাদের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান শস্যের আবাদ প্রান্তিক জমিতে স্থানান্তরিত হচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে এগুলোর উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। কাজেই খামার ব্যবস্থা গবেষণা প্রবর্তনের জন্য কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ কৌশল সমূহকে অবশ্যই একক শস্য উৎপাদনের দৃষ্টিভংগী পরিত্যাগ করে বহুমুখী শস্য উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সীমিত জমি ও পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং উন্নত পানি ব্যবস্থায় শস্য উৎপাদনে বার্ষিক অস্থিরতা হ্রাসের জন্য একটি সুষ্ঠু শস্য উৎপাদন নীতি প্রণয়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। কৃষিজাত উৎপাদনের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান প্রধান কৌশলসমূহের অন্যতম।

২১.৩। **পশুপালন উন্নয়নঃ** বাংলাদেশের এলাকা ও সংখ্যার দিক দিয়ে পশুসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী, তবু এখানে লাংগল টানা পশুসংখ্যা ও দুধের দীর্ঘকালের স্বল্পতা রয়েছে। কাজেই তৃতীয় পরিকল্পনায় এদুটি সমস্যার সমাধান করতে হবে। ভূমিহীনদের কর্মসংস্থানের জন্য পশুপালন খামারকে

বিশেষ খামার ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হবে এবং লাংগলটানা পশুশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য প্রজনন, চিকিৎসা ও পশুখাদ্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

২১.৪। **মৎস্য উন্নয়নঃ** ১৯৭০ দশকে মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার পর দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে লক্ষ্যমাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি থাকলেও উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল। সম্প্রতিকালে উন্নয়ন কর্মসূচীতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় সুযোগ থেকে বঞ্চিত দলের সংগঠনের মাধ্যমে পুকুরে মৎস্য চাষ উন্নয়নের ওপর অধিকতর জোর দেয়া হয়েছে।

২১.৫। **পাটনীতিঃ** দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাট ও চাউলের আনুপাতিক মূল্যের অসুবিধা হওয়ার দরুন পাট উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এটা পরিকল্পনার শেষ বছর পর্যন্ত চলে। কিন্তু ঐ বছরই উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাওয়ায় এ ধারার পরিবর্তন ঘটে এবং ১৯৭৮/৭৯ এবং ১৯৭৯/৮০ সালে ভাল ফসল হয়। পাট উৎপাদনের জমি বর্তমানে প্রধানতঃ পুরাতন নিবিড় পাট চাষ স্কীমের আওতাধীন এলাকায় সীমিত রয়েছে। প্রায় ১৫ লক্ষ একরের স্থিতিশীল এলাকার পাট চাষের প্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যে সমস্ত প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধান করতে হবে সেগুলো হচ্ছে (১) দেশীয় বাজারে চাউল এবং বিশ্ববাজারে অন্যান্য তন্তুর সাথে প্রতিযোগীতার প্রেক্ষিতে কম খরচে উচ্চ ফলনের জন্য পাটবীজের উন্নয়ন এবং (২) আবহাওয়া জনিত কারণে উৎপাদনে ওঠানামার প্রেক্ষিতে দেশীয় বাজারে স্থিতিশীলতা আনয়ন। শেষোক্ত নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্ববাজারে কাঁচা পাটের সরবরাহ এবং দেশীয় বাজারে কৃষক ও মিলসমুহের জন্য স্থিতিশীল দাম নিশ্চিত করা।

২১.৬। **বস্ত্রশিল্প নীতিঃ** তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বেসরকারী খাতের উন্নয়নের জন্য বস্ত্র শিল্পকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে, কাজেই পরিকল্পিত ভাবী সম্প্রসারণ সবই বেসরকারী খাতে হবে। কিন্তু এরূপ সম্প্রসারণের সময় দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। এর একটা সমস্যা তুলা সরবরাহ এবং অন্যটা তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত। এ খাতের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে তাঁতের সংখ্যা ৫০% বাড়ানো এবং সুতা উৎপাদন প্রায় সমহারে বাড়ানো। এর অর্থ হচ্ছে তুলার চাহিদা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যাবে যা প্রধানতঃ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে। তুলা আমদানী ১৯৮৪/৮৫ সালে ২৩৬ হাজার বেলের স্থলে ১৯৮৯/৯০ সালে ৪১৫ হাজার বেল হবে বলে ধরা হয়েছে এবং আমদানী ব্যয়ও ২০৫ কোটি টাকা হতে ৩৬০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে (১ ডলার = ২৬ টাকা)। এর ফলে লেনদেন ভারসাম্যের ওপর চাপ অবশ্য বাড়বে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্বীকার করতে হবে যে, বস্ত্রশিল্প বিভিন্ন দেশের শিল্প উন্নয়নে অগ্রণী ভুমিকা পালন করলেও এটা রপ্তানীমুখীও বটে। বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতার আলোকে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বস্ত্রসহ অন্যান্য বস্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী বিভিন্নমুখী করার জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে তাঁতশিল্পের স্বার্থ রক্ষার্থে বয়ন কারখানাগুলোকে তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য বিদেশে তাদের মালের বাজার অনুসন্ধান করতে হবে। অপর পক্ষে সাধারন মানুষ ও তাঁতীদের স্বার্থে উৎপাদনশীলতা এবং তাঁত শিল্পজাত দ্রব্যের মান উন্নীত করতে হবে। এ দুটো ব্যাপারেই তাঁতশিল্পের অন্তর্নিহিত সমস্যা রয়েছে যা এর পতনে অবদান রেখেছে। এর শ্রমিকের মজুরী অদক্ষ খামার শ্রমিকের মজুরী অপেক্ষা অনেক কম যার জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে এ শিল্প আকর্ষনীয় নয়। তাই তাঁতপ্রযুক্তির সাথে সাথে এর উৎপাদিত দ্রব্যেরও উন্নয়ন করার বিরাট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২১.৭। **বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ তফশিলঃ** শিল্পখাতে তৃতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিল্প বিনিয়োগ তফশিলকে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় নয় বরং পরামর্শদানের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে এ তফশীলকে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে এবং নমনীয় করতে হবে যেন এতে বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের পছন্দ প্রতিফলিত হয়। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র

শিল্পের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য দুটি ওরুণীনকেই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য বৃহৎ ও মধ্যম শিল্প তরুণীন হতে ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য ও প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে শিল্পকে সংরক্ষণ করতে হবে। বেসরকারী খাতের বিনিয়োগের অগ্রগতির মাঝে মাঝে পর্যালোচনা এবং ঘনিষ্ঠ মনিটরিং এর মাধ্যমে বিনিয়োগে কোন অক্ষমতা থাকলে তা পরিহার করতে হবে।

২১.৮। **জ্বালানী সম্পদের উন্নয়ন:** আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে জ্বালানী সম্পদ খাতের উন্নয়নকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। গ্যাস এবং আমদানী-কৃত জ্বালানীর বিকল্পগুলোর উন্নয়নের মাধ্যমে তৃতীয় পরিকল্পনারও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। এ ব্যাপারে গত পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে এর অংশ ১৯৮৯/৯০ সালে ৬৮.২% এ উন্নীত করা। গ্যাস সেক্টরে গ্যাস ফিল্ডের উন্নয়ন, ড্রিলিং এবং উত্তোলনে বিশেষ করে পশ্চিম জোনের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে। উৎপাদন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তৈল এবং গ্যাস উত্তোলনে বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকে আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। পল্লী সমাজের সনাতন জ্বালানীর চাহিদা মেটানোর জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচীর সাথে সাথে কমিউনিটি বন এবং যুক্ত বন উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হবে। যেহেতু গ্যাস ও জ্বালানী খাতের উন্নয়ন অত্যন্ত মূলধনমুখী, তাই জ্বালানী খাতের সার্বিক পরিচালনা আর্থিক বিবেচনা ভিত্তিক হওয়া উচিৎ। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গ্যাস ও বিদ্যুৎ এর যথোপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ এবং বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লস হ্রাসই প্রধান বিষয় হবে।

২১.৯। **পরিবহণ ও যোগাযোগ:** এখানে বিশেষ করে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যে প্রধান সমস্যার সমাধান করা দরকার সেটা হচ্ছে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ভৌত সুবিধাদির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়টি। রেলওয়ের লোকসান হ্রাস করতে হলে রেল সংস্থার যথোপযুক্ত সমন্বয় সাধন--এর সাথে এর পরিচালনা দক্ষতা বাড়াতে হবে। রাজস্ব বাজেট অপ্রতুল বরাদ্দের কারণে সড়ক ও মহাসড়কের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে একটা মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসংগে এটা স্বীকার্য যে উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত স্তর। কিন্তু সম্প্রতি পরিচালনাগত দুর্বলতার কারণে এগুলো মারাত্মক সম্পদ সমস্যায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এর পরিণতি হচ্ছে লোকসান বা অপ্রতুল রাজস্ব আয় এবং অপ্রতুল রক্ষণাবেক্ষণ এই সবের কারণে স্বাভাবিকভাবেই দক্ষতা ও সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং এগুলোর প্রতিস্থাপনের খরচ উন্নয়ন বাজেট থেকে মেটানো অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে উন্নয়ন বাজেটের একটা বিরাট অংশ ক্ষমতা সম্প্র-সারণের পরিবর্তে বর্তমান সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় হচ্ছে যা অর্থনীতিতে কোন অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি করছে না। কাজেই এ খাতে এবং অন্যান্য খাতেও ভৌত সুবিধাদির রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের ওপর উচ্চতর অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২১.১০। **ভৌত পরিকল্পনা এবং গৃহায়ন:** বাংলাদেশ স্বল্প জমির দেশ হিসেবে জমির অপরিকল্পিত ব্যবহার এবং কৃষিজমির অপচয় সমর্থন করতে পারে না। এ সত্ত্বেও শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে মূল্যবান কৃষি জমির ওপর বসতি গড়ে উঠেছে। গ্রামাঞ্চলে তেমন না হলেও শহর এলাকায় প্রতিবন্ধকতার কারণে এ সমস্যা সুস্পষ্ট। এর অর্থ এ নয় যে জমির ওপর ক্রমবর্ধমান চাপের কারণে গ্রামাঞ্চলে সমস্যাটি শহরের চেয়ে কম। কাজেই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের জন্য জমির ব্যবহারের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া উচিৎ। উপজেলা কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা গ্রামাঞ্চলে জমির সুষ্ঠু ব্যবহারের সূচনা করবে। প্রকৃত পক্ষে উপজেলা কেন্দ্রগুলো পল্লী এলাকায় সুসংবদ্ধ বসতি স্থাপনে একটা উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সার্ভিসের মত আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ এ ধরনের বসতি উন্নয়ন শহরমুখী জনস্রোত হ্রাসে এবং শহরের ঘনবসতি ও বস্তি সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে একটি জাতীয় ভূমি ব্যবহার এবং বসতি পরিকল্পনার প্রস্তুতির ব্যাপারে যতশীঘ্র সম্ভব মনযোগ দেয়া উচিৎ।

২১.১১। **শিক্ষা ঃ** দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং গণশিক্ষা কর্মসূচী বেশ আগ্রহের সাথে শুরু হলেও উভয়ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল মন্থর। যেহেতু উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচনে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা সৃষ্টি প্রধান উপকরণ হিসেবে পরিগণিত হবে তাই দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যার ওপর জোর দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো শিক্ষা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ। আশা করা যাচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের কর্তৃত্ব কার্যকরভাবে স্থানীয় সরকারের ওপর অর্পন করে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনা একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচনা করবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার যে দুটি প্রধান সমস্যা অবশ্যই কার্যকরভাবে সমাধান করতে হবে তা হচ্ছে ভর্তি সংখ্যার নিম্নহার এবং মাঝ পথে স্কুল ছেড়ে যাওয়ার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার উচ্চ হার। পল্লী অঞ্চলে দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের দ্বারা এ সমস্যাগুলো সম্ভবতঃ প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু এ হারগুলো উন্নয়নের জন্য একটা অধিকতর সরাসরি পদক্ষেপের প্রয়োজন। এতে ক্ষুদ্রতর এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থানভিত্তিক বন্টনের নিয়মে পরিবর্তনের দরকার হতে পারে। বর্তমানে প্রতি দুই কিলোমিটারে একটি স্কুল স্থাপনের নিয়ম চালু রয়েছে; যেখানে ভারতে এক কিলোমিটারে একটি করে স্কুল রয়েছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী হলেও এর ভূপ্রাকৃতিক অবস্থা বছরের অধিকাংশ সময়ই যোগাযোগের প্রতিকূল। স্কুলের কাছাকাছি অবস্থান বাড়ী ও স্কুলের মধ্যে দূরত্বই শুধু কমবেনা, স্কুল ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটির ঘনিষ্টতর অংশগ্রহণও নিশ্চিত করবে এবং শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ককেও উন্নত করবে।

২১.১২। **স্বাস্থ্য ঃ** ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য এ সার্বিক উদ্দেশ্যে জীবানু বিমুক্তি কর্মসূচীসহ স্বাস্থ্য কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য হবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সার্ভিস। এ নীতি কার্যকর করার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হচ্ছে। এ ছাড়াও সকলের জন্য স্বাস্থ্য-এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর অধিকতর জোর দেয়া দরকার। এ দুটি বিষয় হচ্ছে পরিবেশগত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এবং পুষ্টি শিক্ষা, কারণ কেবলমাত্র এগুলোর মাধ্যমেই গ্রহণকারী হিসেবে গৃহস্থালি ও কমিউনিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে।

২১.১৩। **জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা ঃ** পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যার সার্ভিসের বিতরণ ব্যবস্থার দক্ষতা উন্নয়ন করা ছাড়াও কমিউনিটির সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। যদিও প্রাপ্ত জনসংখ্যা সংক্রান্ত উপাত্ত অনুযায়ী জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেতে দেখা যাচ্ছে, তবুও বিভিন্ন জনসংখ্যা লক্ষ্যমাত্রায় উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গর্ভনিরোধক ব্যবহার হারের (CPR) লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৭.৫%, অথচ পরিকল্পনা শেষে প্রকৃত সাফল্য হয়েছিল ২৫%। NRR-1 এই লক্ষ্যমাত্রাও স্বাধীনতার পর হতে ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ সমস্তই পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার অভাব প্রকাশ করে। কাজেই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পরিবার পরিকল্পনাকে কেবলমাত্র বিবাহিত দম্পতির সমস্যা হিসেবে না দেখে পরিবার পরিকল্পনায় কমিউনিটির অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়া উচিত।

ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়ন

২২। উপকূলীয় অঞ্চল প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের শিকার হয়। ফলে অনেক জীবন অকালে ঝরে যায় এবং মানুষ অপরিসীম দুঃখকষ্টে পতিত হয়। তাই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে কর্মসূচী গ্রহণের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হবে। ১৯৭০ ও ১৯৮৫ সালে আকস্মিক বিপর্যয় উপকূলীয় অঞ্চলকে আঘাত হেনেছিল। বার বার এ ধরনের বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে জাতীয় পরিকল্পনার কাঠামোর আওতায় একটা বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের দরকার রয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হবে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ওপর এরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব যথাসম্ভব হ্রাস করা। এ ব্যাপারে

তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত কৌশলাদি হচ্ছেঃ (ক) ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে পারে এমন অঞ্চল হতে জনসাধারণকে সরিয়ে নেয়ার জন্য কমিউনিটি ও সরকারী এজেন্সিসমূহে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ, (খ) একটি দক্ষ সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, (গ) ঘূর্ণিঝড়ের সময় অধিকতর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা, (ঘ) বনায়ন ও বেড়ী বাঁধের মত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বশেষ (ঙ) মানুষ যাতে ঘূর্ণিঝড় সহ্য করতে পারে তজ্জন্য উপকূলীয় সম্পদের উন্নয়ন। এসমস্ত কৌশলের ওপর ভিত্তি করে ঘূর্ণিঝড় পুর্নবাসন কর্মসূচীর প্রস্তুতিমূলক কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উন্নয়ন সাধন করা হবে সেগুলো হচ্ছে বেড়ী বাঁধ, বনায়ন ও মৎস চাষ, যোগাযোগ, রাস্তাঘাট ও উপকূলীয় পরিবহণ এবং স্কুল স্বাস্থ্য সুবিধাদি।

পরিকল্পিত ব্যয়ের খাতওয়ারী বরাদ্দ

২৩। তৃতীয় পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পিত ব্যয়ের খাতওয়ারী বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে যা সারণী ৬-এ দেখানো হল।

সারণী ৬

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে খাতওয়ারী বরাদ্দ
(১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

	খাত	সরকারী খাত	বেসরকারী খাত	মোট
১।	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন	৭,০৬০	৪,৪০০	১১,৪৬০
২।	শিল্প ও খনিজ সম্পদ	২,৬০০	৩,২০০	৫,৮০০
৩।	জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৫,৬৭৫	৫০০	৬,১৭৫
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩,০২৫	১,৫০০	৪,৫২৫
	(ক) পরিবহণ	২,৬৩৭	১,৫০০	৪,১৩৭
	(খ) যোগাযোগ	৩৮৮	..	৩৮৮
৫।	ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন ও পানি সরবরাহ ..	৫৫০	৩,৬৫০	৪,২০০
৬।	শিক্ষা ও ধর্ম	১,২২০	১৫০	১,৩৭০
৭।	স্বাস্থ্য	৫৫০	৫০	৬০০
৮।	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা ..	৮৭০	৭০	৯৪০
৯।	ক্রীড়া, সংস্কৃতি, যুব, সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক এবং গণমাধ্যম	৩০৭	১৫*	৩২২
	(ক) সমাজ কল্যাণ	৭৫	..	৭৫
	(খ) মহিলা বিষয়ক	৫০	..	৫০
	(গ) যুবউন্নয়ন	১৭	..	১৭
	(ঘ) গণমাধ্যম	৫০	..	৫০
	(ঙ) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন	৫১	..	৫১
	(চ) ক্রীড়া উন্নয়ন	৬৪	..	৬৪
১০।	বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা (STR) ..	৬০	..	৬০
১১।	জনশক্তি ও শ্রম	৯৩	..	৯৩
১২।	লোক প্রশাসন	৬৫	..	৬৫
১৩।	থোক বরাদ্দ	২,৯২৫	..	২,৯২৫
	(ক) জেলা ও উপজেলা অবকাঠামো ..	১,০০০	..	১,০০০
	(খ) উপজেলা পরিষদসমূহকে উন্নয়ন সহায়তা ..	১,২৫০	..	১,২৫০
	(গ) পৌরসভাগুলিকে উন্নয়ন সহায়তা ..	৯২	..	৯২
	(ঘ) বিশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিকল্পনা ..	২১৩	..	২১৩
	(ঙ) আবগারী শুল্ক ও বিক্রয় কর (CDST) ..	১২০	..	১২০
	(চ) বার্ষিক কারিগরী সহায়তা কর্মসূচী (ATAP) ..	২৫০	..	২৫০
১৪।	অন্যান্য খাতসমূহ	..	৬৫	৬৫
	মোট ..	২৫,০০০	১৩,৬০০	৩৮,৬০০

টীকাঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে খরচকৃত অর্থ, তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল এবং অন্যান্য তথ্যাদিসহ তৃতীয় পরিকল্পনার প্রকল্প তালিকা "Blue Book of the Third Five Year Plan" নামক একটা পৃথক দলিলে প্রকাশ করা হবে।

*৯ নম্বর সেক্টরের সব সাবসেক্টরের জন্য ইহা প্রযোজ্য।

উন্নয়ন বরাদ্দের বার্ষিক বিন্যাস

২৪। পরিকল্পনার শুরু থেকে যদিও আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে, তবুও আভ্যন্তরীণ সম্পদ সমস্যা দ্রুত দূরীভূত হবার নয়। প্রকৃতপক্ষে, এসব ব্যবস্থা গতিময়তা পেতে সময় লাগবে এবং বছরের পর বছর প্রাপ্য সম্পদের আকারের ওপর এগুলোর ক্রমপুঞ্জিভূত প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যাবে। প্রাথমিক বছরগুলোতে সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং সরকারী খাতে সম্পদ বৃদ্ধির সমস্যা বিবেচনা করে উন্নয়ন বরাদ্দের বার্ষিক বিন্যাস নিম্নরূপ পরিকল্পিত হয়েছে :

সারণী ৭

উন্নয়ন বরাদ্দের বার্ষিক বিন্যাস (১৯৮৫—৯০)
(১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

বছর	মোট	সরকারী	বেসরকারী
১৯৮৪/৮৫	৬,২০৯	৩,২৩২	১,৯৭৭
১৯৮৫/৮৬	৬,৩৮৫	৩,৮২৫	২,৫৬০
১৯৮৬/৮৭	৭,০১০	৪,৩৬০	২,৬৫০
১৯৮৭/৮৮	৭,৬৮৬	৪,৯৭০	২,৭১৬
১৯৮৮/৮৯	৮,৪১৯	৫,৬১০	২,৮০৯
১৯৮৯/৯০	৯,১০০	৬,২৩৫	২,৮৬৫
মোট :	৩৮,৬০০	২৫,০০০	১৩,৬০০

জেলা ও উপজেলা অবকাঠামো : খাতওয়ারী বরাদ্দ

২৫। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জেলা ও উপজেলা অবকাঠামোর জন্য রক্ষিত থোক বরাদ্দ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে বিতরণ কালে প্রশাসনিক পুনর্গঠণ সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (NICAR) সময়ে সময়ে জেলা ও উপজেলা শহরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নে উদ্ভূত প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করে ছিলো। এই বন্টনকালে কোন পূর্ব নির্ধারিত খাতওয়ারী হিস্যা অনুধাবন

করা হয়নি, অবশ্য NICAR কর্তৃক বণ্টিত অতীতের ধারাকে ভিত্তি করে জেলা ও উপজেলা অবকাঠামোর জন্য রক্ষিত থোক ১,০০০ কোটি টাকার একটি সম্ভাব্য খাতওয়ারী বরাদ্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

সারণী ৮

জেলা ও উপজেলা অবকাঠামোর জন্য খাতওয়ারী বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

খাত	বরাদ্দ
(১) পরিবহণ .. (উপজেলা সড়কসমূহ)	২৪৩
(২) যোগাযোগ	৫২
(৩) ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন (অফিস ও আবাসিক ভবনাদি নির্মাণ)	৫৯২
(৪) পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (স্থানীয় সরকার বিভাগকে UTDC এবং পানি সরবরাহের জন্য)	১০৫
(৫) লোক প্রশাসন	৮
মোট :	১,০০০

উপজেলা পরিষদসমূহে উন্নয়ন সহায়তা : খাতওয়ারী বরাদ্দ

২৬। উপজেলা পরিষদসমূহের জন্য তৈরী গাইড লাইনের ওপর ভিত্তি করে উপজেলার জন্য ১,২৫০ কোটি টাকার উন্নয়ন সহায়তার একটি ধারনাকৃত খাতওয়ারী বরাদ্দের চিত্র নিম্নে দেয়া হলো:

সারণী ৯

উপজেলা পরিষদসমূহে উন্নয়ন সহায়তার খাতওয়ারী বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

খাত	বরাদ্দ
(১) কৃষি ও সেচ	২৫০
(২) পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (সড়ক নির্মাণ, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে পল্লীপূর্ত কর্মসূচী, হাট ও বাজার উন্নয়ন)	৫৫০
(৩) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১০০
(৪) শিক্ষা	১১২
(৫) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ	১৭৬
(৬) ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ	৬২
মোট :	১,২৫০

বিশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিকল্পনাঃ খাতওয়ারী বরাদ্দ

২৭। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য ১৯৮৪/৮৫ সালে সরকার একটি বিশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু করেছেন। জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের সম্পূরক হিসেবে ২৬৪.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ের এই পরিকল্পনাটি অব্যাহত থাকবে। পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যসমূহ হচ্ছেঃ

(১) কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকায় বস্তুগত অগ্রগতি দ্রুততর করার পরিবেশ সৃষ্টি;

(২) এলাকার সমন্বিত উন্নয়নের জন্য পরিবহণ ও যোগাযোগের উন্নয়ন; এবং

(৩) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধাবলীর উন্নততর করণ।

মোট ২৬৪.৪১ কোটি টাকার মধ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ৫০.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল এবং ২১১.০০ কোটি টাকা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার বরাদ্দ প্রধান প্রধান খাত অনুসারে নীচে দেয়া হলোঃ

সারণী ১০

বিশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিকল্পনার খাতওয়ারী বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

খাত	বরাদ্দ
(১) কৃষি (ফসল, বন, মৎস্য ও পশুপালন)	৪৮.৬৩
(২) শিল্প (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প)	৩.৩৪
(৩) বিদ্যুৎ (১৬টি উপজেলায় বিতরণ কর্মসূচী)	৩১.৩৯
(৪) পরিবহণ (সড়ক এবং উপজেলা সংযোগকারী সড়ক)	১০২.২৪
(৫) যোগাযোগ	৭.০০
(৬) ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন (পানি সরবরাহ ও পর্যটন)	১২.১৬
(৭) শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং মহাবিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন)	৫.৬১
(৮) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স)	২.৬৩
মোটঃ	২১১.০০

তৃতীয় অধ্যায়

আভ্যন্তরীণ সম্পদসমূহ

আভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ থেকে সম্পদসংগ্রহ তৃতীয় পরিকল্পনার বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ক্ষেত্রে চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করবে। বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশিত প্রবণতা অনুযায়ী বলা যায়, পরিকল্পনার বর্তমান আকারের প্রেক্ষাপটে প্রায় অর্ধেক বরাদ্দ আভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা মেটানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে। গোটা পরিকল্পনার ৩৮,৬০০ কোটি টাকার মধ্যে ২১,০২৮ কোটি টাকা বহিঃসূত্র হতে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে; বাকী ১৭,৫৭২ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ থেকে সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। এ থেকে বোঝা যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যেখানে প্রকৃতপক্ষে মোট বরাদ্দের ৪৩·৬% আভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল, সেখানে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আভ্যন্তরীণ উৎসসমূহের অবদান থাকবে ৪৫·৫%। যদিও আভ্যন্তরীণ ও বহিঃসূত্র হতে সংগৃহীত অর্থের আনুপাতিক অবদান হিসেবে একে একটা প্রান্তিক অগ্রগতি মাত্র বলা যায়, তবুও বিশেষ করে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টার প্রবনতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে গোটা পরিকল্পনাকালে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। সেজন্যই এই পরিকল্পনার কৌশল হবে অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সঞ্চয় তৎপরতা অব্যাহত রাখা এবং সরকারী খাতের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের অংশ যথাযথভাবে নিশ্চিত করা। একই সংগে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে সরকারী খাতের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ে যেন ঘাটতি দেখা না দেয় এবং এই সম্পদ যেন অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহৃত না হয়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনাকালে সম্পদ সংগ্রহে সাফল্যের সিংহভাগ নির্ভর করবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত প্রকৃত নীতিমালার উপর। পরিকল্পনাকালে সরকারী খাতে ৫,৯৬০ কোটি টাকা সঞ্চয় ও ট্রান্সফার এবং বেসরকারী খাতে ১১,৬১২ কোটি টাকা নীট সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আভ্যন্তরীণ সম্পদের মধ্যে সরকারী খাতের মাধ্যমে এক-তৃতীয়াংশ এবং বেসরকারী খাতের মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ সংগ্রহ করতে হবে।

সম্পদ সংগ্রহের অতীত কার্যাবলী

২। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ থেকে সম্পদ সংগ্রহের ভবিষ্যৎ যথাযথভাবে নিরূপন করতে গেলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উপরোক্ত ক্ষেত্রে উদ্ভূত সংকটকে বিশেষ করে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কর প্রাপ্তি, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অর্থসংস্থান, চলতি ব্যয় এবং ভর্তুকি ইত্যাদিকে প্রেক্ষাপট হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশে কর ও মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (ট্যাক্স/জিডিপি) অনুপাত এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেও সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। কর ও জিডিপি-র অনুপাত ১৯৭২/৭৩ সালে ছিল ৪·২% যা প্রথম পরিকল্পনাকালের শেষে ৭·৫% এবং ১৯৭৯/৮০ সালে ৮·০ শতাংশে উন্নীত হয়। সরকারী খাতের প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কর ও জিডিপি-র অনুপাত ৯·৫% রাখার লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়। ১৯৮০/৮১ সালে প্রকৃতপক্ষে কর ও জিডিপির অনুপাত দাঁড়ায় ৮·৭%। পরবর্তীকালে কর খাতে কনসেশন পদ্ধতি প্রবর্তনের পর অতিরিক্ত কর প্রাপ্তির প্রচেষ্টা কিছুটা মন্দীভূত হলে এ অনুপাত নীচের দিকে নেমে যায়। যা হোক এটাও মনে রাখতে হবে যে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৃহত্তর ভূমিকা পালনার্থে বেসরকারী খাতের উপর নমনীয় ও কনসেশনভিত্তিক কর পদ্ধতি আরোপ করা হলেও পরিকল্পনাকালের প্রান্তিক বছরে কর ও জিডিপির অনুপাত ৮·২ শতাংশে উন্নীত হয়। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, কর পদ্ধতিতে অন্তর্নিহিত কিছুসংখ্যক কাঠামোগত অনমনীয়তা রয়েছে যা নিম্নমাত্রার কর ও জিডিপি অনুপাতের

জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী। আমাদের দেশে করভিত্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ, করের স্থিতিস্থাপকতা নিম্নমানের এবং কর প্রশাসন দুর্বল। কৃষি এবং খাদ্যোৎপাদনের বিষয়টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হবার পর কর ও জিডিপির অনুপাত আরো নেমে আসে, কারণ এসমস্ত খাতে করারোপ করা হয় স্বল্পমাত্রায়, কর প্রশাসনের দিক দিয়ে তা খুবই জটিল এবং এখাতের উৎপাদন বেশীরভাগই ভোগ করে ফেলা হয়। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করের অবদান ১৯৭২/৭৩ সালের ১৬% থেকে সামান্য বেড়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গড়ে ২০ শতাংশে উন্নীত হলেও অনেক স্বল্প আয় সম্পন্ন দেশের তুলনায় এ হার খুবই কম। প্রত্যক্ষ কর ও জিডিপির অনুপাত মাত্র ১.৬%। জাতীয় আয় কমবেশী সমহারে বন্টিত হলে আয়কর জিডিপির প্রবৃদ্ধি হারে বিশেষ অবদান রাখে, কিন্তু গোটা কর রাজস্ব-এর অবদানও মাত্র ১৪%। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ধাপভিত্তিক ভূমি রাজস্ব পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয় (এর আগে ছিল একটি সমতল হার পদ্ধতি এবং উচুঁ মাত্রায় রেয়াত সম্পন্ন)। বর্তমান ভূমি রেকর্ড পদ্ধতি, এবং তার ফলে উদ্ভূত কর প্রশাসনিক জটিলতার কারণে তাও কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে থাকে। তৃতীয়তঃ পরোক্ষ কর মোট কর রাজস্ব প্রাপ্তিতে প্রায় ৮০% অবদান রাখে, যা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল (আমদানী শুল্ক এবং আমদানীকৃত পণ্যের উপর বিক্রয় করের আকারে)। ১৯৮০—৮৫ সময়ে এজাতীয় কর মোট কর প্রাপ্তিতে অবদান রাখে ৫৪% এবং মোট পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে তা ছিল ৬৮% যেখানে ১৯৭২/৭৩ সালে তা ছিল যথাক্রমে ৪১% ও ৪৯%। অন্যদিকে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর কর পদ্ধতির অতিরিক্ত নির্ভরতা হলো পক্ষান্তরে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কারণ বৈদেশিক সাহায্য আমদানী বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ অর্থের যোগান দেয়। ফলে গোটা কর পদ্ধতিই প্রকারান্তরে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক সাহায্য পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এ ছাড়া বৈদেশিক রপ্তানী বাণিজ্যে প্রাথমিক পণ্য ও শিল্পোৎপাদিত পণ্যের উপর নির্ভরশীলতার ফলেও কর পদ্ধতি আরেক দফা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, কারণ আমাদের বৈদেশিক রপ্তানী বাণিজ্য কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল এবং এ সমস্ত পণ্যের চাহিদা ও মূল্য আবার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে থাকে।

৩। সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং গণ-উপযোগীতামূলক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সন্তোষজনক মাত্রার অনেক পেছনে থাকে। উৎপাদনমুখী শিল্পকারখানাসমূহের উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে ১৯৭৮/৭৯ সালে ৩০৩টি সরকারী খাতের শিল্প কারখানার স্থাবর সম্পত্তির আর্থিক মূল্য ছিল ৫৭৪ কোটি টাকা, যা একই বছরে দেশে মোট শিল্পখাতের স্থাবর সম্পত্তির শতকরা ৭৮ ভাগ। বিভিন্নমুখী কারণে এসমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশের আর্থিক তৎপরতা ছিল সাধারণভাবে নিম্নমানের। এর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা, বাজারে পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তন অনুসারে এগুলোর মূল্য নির্ধারণে ক্ষমতার অভাব, প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ব্যয় সচেতনতা এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ববোধের অভাব, দক্ষ জনশক্তির অপ্রতুলতা, বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন, অর্থনৈতিক অনিয়ম ইত্যাদি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উৎপাদন সংকটের আরেকটি বড় কারণ হলো বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার ক্রমহ্রাস। এর ফলশ্রুতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির শিকার হয় এবং সরকারের কাছ থেকে নগদ ভর্তুকি বা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ থেকে টাকা ঋণ নিয়ে এগুলো টিকে থাকে। ১৯৮৩/৮৪ সালে সমাপ্ত মোট ১১ বছরের মধ্যে সরকারী খাতের ৬টি শিল্পভিত্তিক কর্পোরেশন (BJMC, BTMC, BSFIC, BCIC, BSEC, এবং BFIDC) ৬ বছরে ৪০১.১০ কোটি টাকা ক্ষতির শিকার হয় যেখানে ৫ বছরে সেগুলো নীট মুনাফা করে ৩৩৪.৪০ কোটি টাকা। কোন কোন বছরে এগুলোতে বিক্রয়লব্ধ আয়ের অনুপাতে মুনাফা ছিল শূন্য এবং কোন সময়েই তা ৫.৩ শতাংশের সীমা অতিক্রম করতে পারেনি যার ফলে এ মুনাফা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ বা তার বিকল্প ব্যবহারের মধ্যে ভারসাম্য বলতে কিছু ছিল না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বুক ভ্যালু হিসাব না করে এসমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের

নবায়ন করতে গেলে যে খরচ পড়তো তাতে অপচয় হিসেব করলে এ ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াতো আরো বেশী এবং মুনাফার পরিমাণ আসতো কমে। ১৯৭০ সালের পর থেকে এসমস্ত সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠান-গুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ ধরনের প্রচেষ্টা হিসেবে যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ছিল প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনায় অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান, নমনীয় মূল্য নির্ধারণ নীতি, রুগ্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের যোগান, পূর্বে সরকারী ব্যবস্থাপনার অধীনে আনীত অদক্ষ এবং অলাভজনক সুতী বস্ত্রকল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে পুঁজি প্রত্যাহার, ব্যবস্থাপনা ক্যাডার ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের প্রচলন, ব্যবস্থাপনার উপাদান হিসেবে **MIS** পদ্ধতির প্রবর্তন এবং বেতন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে শ্রমজীবী শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা পুনর্বহাল ইত্যাদি। এসমস্ত পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে সরকারী খাতের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতির সূচনা ঘটে। প্রকৃতপক্ষে বেশ কয়েক ক্ষেত্রে চমকপ্রদ উন্নয়নের সূচনা ঘটতে দেখা যায়। প্রথমতঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনার ৫ বছরের মধ্যে তিন বছর সেগুলো সম্মিলিতভাবে মুনাফা অর্জন করে। এর আগের পাঁচ বছরে এমনটি হয়েছিল মাত্র এক বছর। দ্বিতীয়তঃ ক্রমাগত মুনাফা অর্জন করে চলেছে এমন কর্পোরেশনের সংখ্যা পূর্ববর্তী ৫ বছর মেয়াদ কালে ছিল ২টি এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের প্রথমার্ধে ছিল ৩টি। তৃতীয়তঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের শেষার্ধে এ ধরণের কর্পো-রেশনের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৪ টিতে।

৪। ১৯৭২/৭৩ সাল থেকে একটি জাতীয় সরকারী পরিচালনার দ্রুত বর্ধনশীল প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরকারের চলতি ব্যয়ের পরিমাণ অব্যাহতভাবে বেড়ে চলছিলো, কিন্তু ১৩ বছরে তিনটি পরিকল্পনা-কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আয়ের প্রবৃদ্ধিতে কোন স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়নি। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা কালে আয়ের প্রবৃদ্ধি প্রথম পরিকল্পনাকালের ২৬.৪% থেকে ১৪.৬% নেমে আসলেও দ্বিতীয় পরি-কল্পনাকালে আবার তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০.৫% এ উন্নীত হয়। এসময়ে কর রাজস্ব সংগ্রহে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১৪.৩%। রাজস্ব ব্যয়ে এই প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য সরকারী সঞ্চয়ের মাত্রা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৃদ্ধি পায় মাত্র ০.৪%।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর্যালোচনা

৫। ক্রমবর্ধমান হারে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। কর কাঠামোর যুক্তিসংগতকরণ, অনুন্নয়ন ব্যয়ে কৃচ্ছতা অবলম্বন, ভোগ হ্রাস এবং উৎপাদনে ভর্তুকি হ্রাস, সরকারী সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর অর্থ-নৈতিক তৎপরতার উন্নয়ন সাধন, বেসরকারী সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে চাংগা করে তোলা, মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নমনীয়করণ ইত্যাদিসহ কর সংগ্রহ প্রচেষ্টাকে জোরদার করে এ উদ্দেশ্য পুরণের চেষ্টা চালানো হয়। পরিকল্পনার মোট ১৭,২০০ কোটি টাকার মধ্যে আভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ থেকে ৮,১৩২ কোটি টাকা এবং ৭,০৯১ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্যসহ বহিঃসূত্র হতে ১০,৯৪৭ কোটি টাকা সংগ্রহের জন্য পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে সঞ্চয় ও জিডিপি-র অনুপাত ১৯৭৯/৮০ সালের ৪.৩% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৭.৪ শতাংশে এবং একই সময়ে কর ও জিডিপি-র অনুপাত ৮.০% থেকে ৯.৫ শতাংশে বৃদ্ধি করারও প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

৬। পরিকল্পনাকালে সরকারী খাতে উন্নয়ন বরাদ্দের ১১,১০০ কোটি টাকার মধ্যে (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে) আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৪,৯০৪ কোটি টাকা (৪৪.২%) এবং বাকী ৬,১৯৬ কোটি টাকা বহিঃসাহায্যের মাধ্যমে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়। চলতি মূল্যে সরকারী খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৬,০৬০ কোটি টাকা।

৭। বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক অপ্রত্যাশিত প্রতিকূলতা এবং জনপ্রশাসন খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ভারের দরুণ পরিকল্পনাকালে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রত্যাশা পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। পরিকল্পনা গ্রহণের অব্যবহিত পরেই দীর্ঘায়িত বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেশের বৈদেশিক লেন-দেন ভারসাম্যকেও বিপর্যস্ত করে তোলে। বৈদেশিক সাহায্য অন্তঃপ্রবাহের কার্যতঃ স্থবিরতা এবং রপ্তানী বাণিজ্যে ক্ষীণ প্রবৃদ্ধি আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত কর সংগ্রহ প্রক্রিয়াও ব্যাহত করে। পক্ষান্তরে এর ফলে কিছু সংখ্যক সমন্বয়কারী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যা আমদানীকৃত এবং আভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত উভয় বরণের পণ্যের উপর চাহিদা কমিয়ে দেয়। সর্বোপরি, ঘন ঘন প্রতিকূল আবহাওয়া কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে খাদ্যোৎপাদন দারুনভাবে ব্যাহত করে যার ফলে আভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর চাহিদা আরো কমে যায় এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে খাদ্য আমদানীতে বিপুল পরিমাণে নগদ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়ে যাওয়ায় করপ্রাপ্ত আমদানীযোগ্য পণ্যের আমদানী হ্রাস পায়। এভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য পরিস্থিতি এবং এর পাশাপাশি ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশের অর্থনীতির উপর এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার নীচে নামিয়ে দেয় এমনকি অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার আগের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অর্জিত প্রবৃদ্ধির হারের চাইতেও নীচে নেমে যায়। এর ফলে সরকারের কর সংগ্রহমূলক তৎপরতা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় ও আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে চলে। অন্যদিকে ১৯৮২ সালের জুন মাসে প্রণীত নয়া শিল্পনীতি বেসরকারী বিনিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এতে কর পদ্ধতি যথেষ্ট নমনীয় রাখায় সরকারী কর রাজস্ব সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় তার অনিবার্য বিরূপ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত কারণের ক্রমপুঞ্জিত ফলাফল হিসেবে সরকারের কর রাজস্ব সংগ্রহ পরিস্থিতি অত্যন্ত ক্ষীণ গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং কর ও জিডিপি-র অনুপাত সামান্য মাত্র বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯/৮০ সালের ৮.০% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৮.২ শতাংশে উন্নীত হয়। পরিকল্পনাকালে এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯.৫%। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনার প্রথম বছর কর ও জিডিপি-র অনুপাত ৮·৭ শতাংশে বৃদ্ধি পাবার পর ১৯৮১/৮২ সাল হতে ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে এবং ১৯৮৩/৮৪ সালে তা ১৯৭৯/৮০ সালের পর্যায়ে (৮·০%) নেমে আসে। এসমস্ত সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদিত দ্রব্য ও সার্ভিসের কতিপয় ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি করে কর ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং বাজেট ভর্তুকি মোকাবেলা করা হয়। রেশনে চালের মূল্য প্রায় দ্বিগুণেরও বেশী, গমের মূল্য ৭৬%, ইউরিয়া সারের মূল্য ১২৭% এবং রেলভাড়া দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী বাড়ানো হয়। তবে এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে সরকারী খাতের কর্পোরেশনগুলোর মুনাফার উপর খুব সামান্যই প্রভাব পড়ে। পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে তা থেকে কর বহির্ভূত মোট রাজস্বের ৩৭% সংগৃহীত হয়। এর পরেও পরিকল্পনাকালে ১৬,৫৪০ কোটি টাকার রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ২,৪২৩ কোটি টাকা বা ১৪·৬% পিছিয়ে থাকে। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি, বেতন বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে পরিকল্পনাকালে ১০,২৭৮ কোটি টাকার রাজস্ব ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪·৪% ছাড়িয়ে যায়। এভাবে কর সংগ্রহে ঘাটতি ও বর্ধিত ব্যয়ের যৌথ প্রক্রিয়ায় সরকারী সঞ্চয় (রাজস্ব উদ্বৃত্ত) ৬,২৬২ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার স্থলে প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ায় ৩,৩৮৫ কোটি টাকায় বা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৫৪%।

রাজস্ব সংগ্রহের প্রবণতা

৮। পরিকল্পনাকালে রাজস্ব সংগ্রহ (চলতি মূল্যে) সারণী ১-এ দেখানো হয়েছে। ১৩,৬৭১ কোটি টাকার কর রাজস্ব ও ২,৮৬৯ কোটি টাকার কর বহির্ভূত রাজস্বসহ মোট ১৬,৫৪০ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার স্থলে প্রকৃত প্রাপ্তি দাঁড়ায় ১৪,১১৭ কোটি টাকায়। কর রাজস্বের প্রকৃত প্রাপ্তি (চলতি মূল্যে) ছিল ১১,১৫৪ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১৮% পিছনে। এতে ১৯৭৯/৮০ সালের তুলনায় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৪·৩%। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বার্ষিক গড়ে মুদ্রাস্ফীতির হার (CPI) ছিল ১১·৮%। এর ফলে কর রাজস্ব সংগ্রহে প্রকৃত বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২·৫%।

সারণী ১

সরকারী খাতের সম্পদ পরিস্থিতি
(চলতি মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫ (সংশোধিত হিসাব)	মোট সম্পদ (১৯৮০-৮৫) (প্রকৃত)	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)	মোট সম্পদ (১৯৮০-৮৫) লক্ষ্যমাত্রা
১। কর প্রাপ্তি	১,৪৬০	১,৮২১	১,৯৭৯	২,১৩৫	২,৩৭২	২,৮৪৭	১১,১৫৪	১৪.৩	১৩,৬৭১
২। কর বহির্ভূত প্রাপ্তি ..	৩১১	৫৫৫	৫০৩	৪৯০	৫৮৭	৮২৮	২,৯৬৩	২১.৬	২,৮৬৯
৩। মোট রাজস্ব	১,৭৭১	২,৩৭৬	২,৪৮২	২,৬২৫	২,৯৫৯	৩,৬৭৫	১৪,১১৭	১৫.৮	১৬,৫৪০
৪। রাজস্ব ব্যয়	১,২৩৬	১,৪৪৭	১,৭৮৯	১,৯৪৭	২,৪২১	৩,১২৮	১০,৭৩২	২০.৫	১০,২৭৮
৫। রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৫৩৫	৯২৯	৬৯৩	৬৭৮	৫৩৮	৫৪৭	৩,৩৮৫	০.৪	৬,২৬২
৬। জীবন যাত্রার ব্যয়সূচক (মধ্যবিত্ত শ্রেণী) (১৯৭৩/৭৪ – ১০০)	২২৩.৫৫	২৪৪.৯৭	২৯৬.৫০	৩২৫.৯৫	৩৫৭.৪৭	৩৯৬.৫৮	..	১১.৮	..
৭। কর/জিডিপি অনুপাত (%) ..	৮.০	৮.৭	৮.৫	৮.০	৭.৮	৮.২	..	..	৯.৫

৯। **আমদানী শুল্ক :** আমদানী বাণিজ্যে মন্দাগতি আমদানী কর সংগ্রহ পরিস্থিতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্যদ্রব্যের মোট আমদানী ১৯৭৯/৮০ সালের ২৩৬·৬ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২৭০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়। মাঝখানে ১৯৮২/৮৩ সালে তা নেমে এসেছিল ২৩১ কোটি ডলারে। এই অবস্থা আমদানী কর খাতে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের উপর খুব সামান্যই প্রভাব রেখেছে কারণ এসময় প্রধানতঃ আমদানী করা হয়েছে খাদ্য যা করারোপযোগ্য নয়। করারোপযোগ্য আমদানীর পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালের ১৩৮·৯ কোটি ডলার থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৭১·২ কোটি ডলারে উন্নীত হয়, ১৯৮২/৮৩ সালে যা নেমে এসেছিল ১২২·৮ কোটি ডলারে। পরিকল্পনাকালে সামগ্রিকভাবে করারোপযোগ্য আমদানীর বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৪·৩% যেখানে সামগ্রিকভাবে আমদানী বেড়েছে ২·৭%। করারোপযোগ্য আমদানী বৃদ্ধির ধীর গতি এবং পাশাপাশি যন্ত্রপাতি আমদানীর মত ক্ষেত্র বিশেষে কর-নমনীয়তা ও কর কাঠামোর যুক্তিসংগতকরণের ফলে আমদানী কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ সময়ে বছরপ্রতি গড়ে ১০·৯% হারে আভ্যন্তরীণ মুদ্রা টাকার অবমূল্যায়ন ঘটে। ১৯৭৯/৮০ সালে এক ডলারের সমান ছিল ১৫·৫ টাকা যা ১৯৮৪/৮৫ সালে দাঁড়ায় ২৬ টাকায়। যেহেতু পরিকল্পনাকালে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটে শতকরা ৬৭·৭ ভাগ এবং করারোপযোগ্য আমদানীতে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পায় এর অর্ধেকেরও কম (২৩%) সেহেতু আমদানী খাতে রাজস্ব আদায়ের মূল উৎসই ছিল টাকার অবমূল্যায়ন। পরিকল্পনাকালে বাণিজ্যিক সামগ্রী আমদানী, করারোপযোগ্য আমদানী এবং আমদানী খাতে কর সংগ্রহের প্রবণতা সারণী ২ এ দেখানো হল :

সারণী ২

আমদানী ও করারোপযোগ্য আমদানী
(১৯৮০—৮৫)

বছর,			মোট আমদানী (কোটি ডলার)	করারোপযোগ্য আমদানী		আমদানী কর (কোটি টাকা)	করের গড় হার (%)
				কোটি ডলার	কোটি টাকা		
১৯৭৯/৮০	..	..	২৩৬·৬	১৩৮·৯	২১৫০	৫৮৩	২৭
১৯৮০/৮১	..	..	২৫৩·৩	১৬৫·১	২৬৭৮	৭০৩	২৬
১৯৮১/৮২	..	..	২৫৭·২	১৩৭·০	২৭৪৭	৭৫৮	২৮
১৯৮২/৮৩	..	..	২৩১·০	১২২·৮	২৯১৭	৮৫০	২৯
১৯৮৩/৮৪	..	..	২৩৪·২	১৩০·০	৩২৪২	৯১৯	২৮
১৯৮৪/৮৫	..	..	২৭০·০	১৭১·২	৪৪৫২	১১৭৫	২৬

১০। **আবগারী শুল্ক :** আভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং আয়ের উপর আরোপিত করসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আবগারী শুল্ক। পরিকল্পনাকালে অকৃষিভিত্তিক উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির গতি মন্থর থাকায় আবগারী শুল্ক বাবদ আয়ও ব্যাহত হয়। শিল্পোৎপাদনের সূচক ১৯৮০/৮১ এবং ১৯৮১/৮২ যেখানে ১৪৩-এ স্থির ছিল,

যেখানে ১৯৮২/৮৩ সালে তা ১৩৬-এ নেমে আসে। পরবর্তীসময়ে এ অবস্থা থেকে উদ্ধারলাভের গতিও ছিল মন্থর। কয়েকটি প্রধান আবগারী করারোপযোগ্য শিল্পোৎপাদনের প্রবণতা সারণী ৩-এ দেখান হোল :

সারণী ৩

প্রধান প্রধান আবগারী করারোপযোগ্য শিল্পোৎপাদন প্রবণতা

(১৯৭৯/৮০ থেকে ১৯৮৪/৮৫)

পণ্য	একক	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫
১। সিগারেট	(বিলিয়ন কাঠি)	১৩·৮	১৪·৯	১৫·৮	১৪·০	১৪·৭	১৫·৫
২। বিড়ি	.. „	২০·০	২১·৬	২৪·১	২৮·২	২৮·২	৩১·৩
৩। পেট্রোলজাত দ্রব্য	(হাজার মেট্রিক টন)	১১৮১	১২০৮	১১৩৫	৯১৯	১০২০	৯৪৩
৪। গ্যাস	.. (মিলিয়ন ঘন ফুট)	৪৪,৫০০	৪৯,৯৩৬	৬৪,৭৮১	৭২,১০৪	৮৩,০৯০	৯৪,৬০০
৫। সিমেন্ট	(হাজার মেট্রিক টন)	৩৩৬	৩৪৫	৩২৬	৩০৭	২৭৩	২৪০
৬। চিনি	.. „	৯৪·৭	১৪৫·২	২০২·২	১৭৭·৭	১৫১·২	৮৮·০
৭। তুলাজাত সুতা	(লাখ পাউণ্ড)	৯৫৩	১০২০	৯৫৩	৯৯৮	১০১৯	১০৬২
৮। সূতী বস্ত্র (মিলে তৈরী)	(লাখ গজ)	৮৮৬	৮৬০	৭২৫	৬৫৪	৬৪৩	৬৮৬
৯। ষ্টীল ইনগট	(হাজার মেট্রিক টন)	১৩৮	১৩৯	১০৯	৪৭	৭৩	১০১
মোট আবগারী শুল্ক : (কোটি টাকায়)		২৮৪·৯২	৩৮৬·০৫	৪৫৩·৯০	৪৯৭·৫১	৫৯৭·৫৭	৭০৫·০০

১১। **আয়কর :** দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আয়কর রাজস্ব বার্ষিক ১৬·৫% হারে বৃদ্ধি পায়। আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা ১৯৭৯/৮০ সালের ২,৬২,০০০ থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৩,৭৫,০০০-এ পৌঁছে। পরিকল্পনাকালে আয়কর প্রশাসনের উন্নয়ন এবং আয়কর নির্ধারণ ও আদায়ের পদ্ধতি সহজীকরণ ও যুক্তি-সংগতকরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। ১৯৮১/৮২ সালে একটি স্ব-নির্ধারক আয়কর নির্ধারণ স্কীম চালু করা হয় যাতে বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় সম্পন্নরা সাধারণ আয়কর নির্ধারণ পদ্ধতির আওতার বাইরে থেকে নিজেদের দায় নিজেরাই নির্ধারণ করে নেন। পরে স্কীমের অধীনে স্বনির্ধারণ পদ্ধতিতে আয়কর নির্ধারণের জন্য আয়সীমা এক লাখ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আয়কর নির্ধারক এবং আয় করদাতা উভয়ের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯২২ সালের আয়কর আইনেও ব্যাপক সংশোধনী আনা হয়।

১২। পরিকল্পনাকালে কর ও জিডিপি-র অনুপাত কার্যতঃ স্থবির থাকে। পরিকল্পনাকালের লক্ষ্য মাত্রা ৯·৫% এবং ১৯৭৯/৮০ সালের প্রকৃত অনুপাত ৮·০ শতাংশের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে এই অনুপাত ৮·২ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। যদিও পরিকল্পনাকালের প্রথম বছর ১৯৮০/৮১ সালে ৮·৭ শতাংশে উন্নীত হয়ে তা উন্নতির স্বাক্ষর রাখে, ১৯৮১/৮২ এবং ১৯৮৩/৮৪ সালের মধ্যে আবার তা হ্রাস পায় এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে পুনরায় নেমে আসে ৮·২ শতাংশে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৩·৮% জিডিপি প্রবৃদ্ধির তুলনায় কর খাতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় মাত্র ২·৫% যার ফলে কর স্থিতিস্থাপকতা (elasticity)

একক্ষের নীচে অবস্থান করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কর স্থিতিস্থাপকতা ও করের বুয়েন্সির হার উভয়েই কমে যায় এবং তা ৪ নং সারণীতে দেখানো হল :

সারণী ৪

কর স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) ও করের বুয়েন্সি

কর	ভিত্তি	স্থিতিস্থাপকতা (elasticity)		বুয়েন্সি	
		১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৭৯/৮০	১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৮৪/৮৫	১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৭৯/৮০	১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৮৪/৮৫
(১) সবরকমের কর	চলতি বাজার দরে জিডিপি	১·২৭	১·০৪	১·৪৩	১·২২
(২) আমদানী কর	আমদানীর করারোপ-যোগ্য মূল্য	০·৯৩	০·৮১	০·৯৪	০·৮৯
(৩) বিক্রয় কর	আমদানীর কর পরিশোধিত মূল্য	১·১৬	০·৯৩	১·১৫	০·৯১
(৪) আবগারী শুল্ক	চলতি বাজার দরে জি ডি পি	০·৯১	০·৮৬	১·১২	১·২৩
(৫) আয়কর	চলতি বাজার দরে অকৃষি খাতের জিডিপি	১·১৬	০·৯২	১·২২	১·০৪

১৩। অনমনীয় করভিত্তি যেখানে করের পশ্চাদগামী প্রবৃদ্ধির পরিচায়ক, সেখানে তা কর কাঠামোর কঠোরতা এবং পাশাপাশি ক্রমপ্রসারমান খাতগুলো থেকে উন্নয়নের সুফল আহরণে কর প্রশাসনের অপর্যাপ্ত সাড়ার পক্ষেও সাক্ষ্য দেয়। পরিকল্পনাকালে নতুন কর সংগ্রহ পদ্ধতির আলোকে ১,৯১৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয় (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যমানে ১,৩৬৭ কোটি টাকা)। কিন্তু নয়া পদক্ষেপ নেয়ার পর প্রকৃত প্রাপ্তি দাঁড়ায় ১,২৯০ কোটি টাকায়। এ সমস্ত নয়া পদক্ষেপের মধ্যে ছিল করারোপ-যোগ্য আমদানীর উপর উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ, সমতল হারের (ফ্লাট রেট) পরিবর্তে ভূমি করের ক্ষেত্রে ধাপভিত্তিক কর কাঠামো প্রবর্তন করে ভূমি কর পদ্ধতির নবায়ন, গুটিকয়েক ক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্যাসের উপর উচ্চহারে আবগারী হার আরোপ, নতুন নতুন আইটেমের উপর আবগারী হারের সম্প্রসারণ ও টার্ণ ওভার ট্যাক্স, বিদেশ ভ্রমণ কর, দোকান কর প্রভৃতি ধরণের নতুন কিছু সংখ্যক করের প্রচলন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নয়া ভূমি করের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সমস্যার কারণে কর প্রাপ্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

১৪। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কর কাঠামোতে শুধুমাত্র একটি প্রান্তিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। মোট সংগৃহীত করের অনুপাতে প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে তা একটি প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা এবং সুবিচার বিস্তারের ক্ষেত্রে উন্নয়নের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেও সেক্ষেত্রে পরিবর্তনের মাত্রা ছিল সামান্যই। মোট সংগৃহীত করের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অনুপাত প্রথম পরিকল্পনাকালের শেষে ১৮% এবং ১৯৭৯/৮০ সালের ১৭% থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২০ শতাংশে উন্নীত হয়। মোট সংগৃহীত করের অনুপাতে আয়করের পরিমাণও ১২% থেকে ১৪ শতাংশে উন্নীত হয় কিন্তু পরিকল্পনাকালে ভূমি করের অবদান মাত্র ১ শতাংশে সীমিত থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত কর সামান্য হ্রাস পেলেও মোট কর প্রাপ্তিতে এর প্রাধান্য অব্যাহত আছে যা বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা প্রতিফলিত করে এবং সাথে সাথে তা বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য পরিস্থিতির অনিশ্চিত উত্থান-পতনের সংগে সংশ্লিষ্ট। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালান হয়। ফলে কাষ্টমস ডিউটি ও বিক্রয়করের অবদান

১৯৭৯/৮০ সালের ৬১·০% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৫৩·২ শতাংশে নেমে আসে যেখানে আভ্যন্তরীণ পণ্য ও সার্ভিসের ক্ষেত্রে একইসময়ে তা ২২·১% থেকে বেড়ে ২৫·৫ শতাংশে উন্নীত হয়। পরিকল্পনাকালে কর রাজস্বের উপাদান এবং প্রধান প্রধান করের প্রবৃদ্ধি হার ৫নং সারণীতে দেখানো হল:

সারণী ৫

কর রাজস্বের উপাদান

(১৯৮০—৮৫)

(কোটি টাকায়)

কর	১৯৭৯/৮০		১৯৮০/৮১		১৯৮১/৮২		১৯৮২/৮৩		১৯৮৩/৮৪		১৯৮৪/৮৫ (সংশোধিত)		মোট (১৯৮০—৮৫)		বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)
	কর	শতকরা হার	কর	শতকরা হার	কর	শতকরা হার	কর	শতকরা হার	কর	শতকরা হার	কর	শতকরা হার	কর	শতকরা হার	
১। পরোক্ষ কর	১,২০৭	৮৩	১,৪৯৮	৮২	১,৫৭৫	৮০	১,৬৮১	৭৯	১,৮৯৮	৮০	২,২৬৪	৮০	৮,৯১৬	৮০	১৩·৪
যার মধ্যে:															
কাস্টমস	৬২৫	৪৩	৭৪৮	৪১	৭৮৩	৪০	৮৭০	৪১	৯৩৪	৩৯	১,১২০	৩৯	৪,৪৫৫	৪০	১২·৪
আবগারী ..	২৮৫	২০	৩৮৬	২১	৪৫৪	২৩	৪৯৮	২৩	৫৯৮	২৫	৭০৫	২৫	২,৬৪১	২৪	১৯·৮
বিক্রয় কর ..	২৮৪	২০	৩৫২	১৯	৩২৫	১৬	২৯৮	১৪	৩৫০	১৫	৪১০	১৪	১,৭১৫	১৬	৭·৬
২। প্রত্যক্ষ কর	২৫৩	১৭	৩২৩	১৮	৪০৪	২০	৪৫৪	২১	৪৭৪	২০	৫৮৩	২০	২,২৩৮	২০	১৮·২
যার মধ্যে:															
আয়কর ..	১৮২	১২	২২৭	১২	২৮০	১৪	৩২৬	১৫	৩৩৯	১৪	৩৯০	১৪	১,৫৬২	১৪	১৬·৫
ভূমি উন্নয়ন	১৯	১	২০	১	২০	১	২০	১	৩০	১	৪০	১	১৩০	১	১৬·১
মোট: ..	১,৪৬০	১০০	১,৮২১	১০০	১,৯৭৯	১০০	২,১৩৫	১০০	২,৩৭২	১০০	২,৮৪৭	১০০	১১,১৫৪	১০০	১৪·৩

১৫। পরিকল্পনাকালে কর প্রশাসন উন্নয়নের দিকে উল্লেখযোগ্য মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পৃথক একটি বিভাগ হিসেবে উন্নীত করা হয়। কর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদার করা হয় এবং আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানিক সহায়তায় বিশেষ উন্নয়ন সাধন করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, কর নির্ধারণ এবং সংগ্রহ পদ্ধতির সহজীকরণ করা হয় এবং আয়কর আইনকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে সংশোধন করা হয়।

কর বহির্ভূত রাজস্ব

১৬। পরিকল্পনাকালে কর বহির্ভূত রাজস্বের সংগ্রহ আশাব্যঞ্জক হারে বৃদ্ধি পায় ও বার্ষিক ২১.৬% হারে বেড়ে তা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে। পরিকল্পনাকালে কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২,৮৬৯ কোটি টাকা (চলতি মূল্যে); লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৯৪ কোটি টাকা বেড়ে পরিকল্পনাকালে এ খাতে প্রকৃত সংগ্রহ দাঁড়ায় ২,৯৬৩ কোটি টাকায়। কেবলমাত্র সুদখাত ব্যতীত এ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রধান খাতই অবদান রাখে। পরিকল্পনাকালে সুদখাতে ৫৮০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত প্রাপ্তি গিয়ে দাঁড়ায় ৪৭৫ কোটি টাকায়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সরকারী খাতের সেক্টর কর্পোরেশন এবং এজেন্সীসমূহের কাছ থেকে সুদ প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল প্রত্যাশার চাইতে অনেক কম কারণ আর্থিক সংকটের দরুণ অনেক প্রতিষ্ঠানই পরিশোধ তফসিল বজায় রাখতে পারেনি। বরং এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ঋণ ও ইকুইটির অনুপাত যথাযথ স্তরে সন্নিবেশিত রাখার লক্ষ্যে নতুন মূলধন সরবরাহ করে অধিকাংশ কর্পোরেশনের মূলধন কাঠামো যুক্তিসঙ্গতভাবে পুনর্গঠন করা হয়। পরিকল্পনাকালে সরকারী খাতের সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং আর্থিক তৎপরতায় উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে বেশ কিছুসংখ্যক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৯/৮০ সাল থেকে সরকারী খাতের কিছু সংখ্যক সেক্টর কর্পোরেশন কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য ও সেবারমূল্য বাড়ানো হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল পেট্রোলজাত দ্রব্য, সার, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, সিমেন্ট, চিনি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং রেলওয়েসহ আরো কতিপয় সেবাখাত। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ১০% পর্যন্ত বাড়ানোর উপরও সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীনতা দেয়া হয়। সমস্ত পাটকল ও বস্ত্রকলের প্রায় অর্ধেকের পুঁজি প্রত্যাহার করে সেগুলো পূর্বতন বাংলাদেশী মালিকদের কাছে প্রত্যার্পণ করা হয়। বেশ কয়েকটি রুগ্ন বস্ত্রকলও এভাবে প্রত্যার্পণ করা হলে সরকারী খাতের ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের ক্ষেত্রে সম্পদের উপর থেকে চাপ কমে যায়। ঋণ-ইকুইটি অনুপাতের পুনর্গঠনের পাশাপাশি ঋণ পরিশোধমূলক দেয় ও পুনর্দেয় পদ্ধতিরও সহজীকরণ করা হয়। এ সমস্ত পদক্ষেপ যথেষ্ট ইতিবাচক ফল প্রদর্শন করতে শুরু করে এবং বেশ কয়েকটি সরকারী খাতের সেক্টর কর্পোরেশন নীট পরিচালনগত উদ্বৃত্ত আয় করতে থাকে। যাহোক্ এ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল প্রতিষ্ঠানসমূহের বুক ভ্যালু অনুসারে স্থায়ী সম্পত্তির মূল্যমানের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এবং মূলধন ভোগ এড়াবার জন্য পুনর্বাসন ব্যয় হিসেব করে প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্য নির্ধারণ করলে আনুপাতিক হিসেবে এই অবদান প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়াবে। ভবিষ্যতে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা উন্নত করার লক্ষ্যে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাতে বিনিয়োগকৃত মূলধনের সংগে এগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটা আনুপাতিক সামঞ্জস্য থাকে।

১৯৭৯/৮০ সাল থেকে সরকারী খাতের কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক তৎপরতা সারণী ৬-এ দেখানো হল:

সারণী ৬

সরকারী খাতের প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তৎপরতা (ক)
(১৯৮০—৮৫)

(কোটি টাকায়)

বছর	নীট মুনাফা (খ)	মোট বিক্রয়লব্ধ আয়	মুনাফা/বিক্রয়ের অনুপাত (%)
১৯৭৯/৮০	৮৭·৬	১৬৬১·৭	৫·৩
১৯৮০/৮১	৫৮·৬	১৯৩১·১	৩·০
১৯৮১/৮২	(—)৯০·৪	১৯৫৬·০	(—)৪·৬
১৯৮২/৮৩	৯১·২	১৭৭২·৮	৫·১
১৯৮৩/৮৪ (সংশোধিত) ..	৭১·৭	২২৪৪·৫	৩·২
১৯৮৪/৮৫ (বাজেট হিসাবে) ..	৮৯·৩	২৪৩৭·৯	৩·৭

(ক) প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে BJMC, BTMC, BSFIC, BSEC, BCIC & BFIDC
(খ) কর-পূর্ব মুনাফা বা লোকসান।

১৭। সরকারী খাতের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান ছিল প্রত্যাশার চাইতে বেশী। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং বিশেষ ধরণের ব্যাংকগুলোর মোট অবদান ছিল ৫৮৪ কোটি টাকা। পরিকল্পনায় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪৮৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ অবদান ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ৫১৪ কোটি টাকা। বর্ধিত পরিমাণে রিফাইন্যানসিং এবং আভ্যন্তরীণ মুদ্রার অব্যাহত অবমূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক মুদ্রার লেন-দেন ছিল ব্যাংকসমূহের উদ্বৃত্তের প্রধান কারণ।

১৮। সম্পদের দিক দিয়ে এ ধরণের ইতিবাচক উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও পরিকল্পনাকালে অধিকাংশ সরকারী সেবাখাতের অগ্রগতি প্রত্যাশার তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকে। গোটা পরিকল্পনাকালে রেলওয়ে ছিল ঘাটতির সম্মুখীন। রেলওয়ের মোট আয় বছরে ১২.৮ % হারে বৃদ্ধি পেলেও পরিচালনা ব্যয় তার চাইতে দ্রুতগতিতে ১৫.৮% হারে বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত ব্যয় পূরণের জন্য রেলভাড়া প্রতি যাত্রী মাইলে ১৯৭৯/৮০ সালের ০.১০ টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪০% বাড়িয়ে ০.১৪ টাকায় এবং মাল পরিবহনের ভাড়া প্রতি টন মাইলে ০.৮১ টাকা থেকে ৯৩.৮% বাড়িয়ে ১.৫৭ টাকায় উন্নীত করা হয়। পরিকল্পনাকালে রেলওয়ের মোট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৮৩.৭৫ কোটি টাকা। পরিকল্পনাকালে ডাক মাশুল বাড়িয়ে দ্বিগুণ করায় ডাক বিভাগের ঘাটতি ছিল প্রাক্কলিত হিসেবের তুলনায় কম। ১৯৮৪/৮৫ সালে আভ্যন্তরীণ চিঠিপত্রের ডাক মাশুল ০.৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১.০০ টাকায় এবং ইউরোপের জন্য বৈদেশিক ডাক মাশুল (এরোগ্রাম) ২.৭৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫.৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়। সেবাখাতের মধ্যে কেবলমাত্র টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বিভাগই মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়। পরিকল্পনাকালে টি এন্ড টি বিভাগের নীট উদ্বৃত্ত ১৯৭৯/৮০ সালের ১০.১৮ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৯.৩% হারে বেড়ে ২৪.৬৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। টেলিফোন নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং এর মাশুল ও হার বৃদ্ধির ফলেই এই উন্নীত হয়। এ সময় কল-প্রতি টেলিফোন মাশুল ০.৫০ টাকা থেকে ১.০০ টাকায় বাড়ানো হয়।

চলতি ব্যয়

১৯। পরিকল্পনাকালে অনুধাবন করা হয় যে, সরকারী খাতের সঞ্চয় অর্থনীতির উন্নয়নের সমান্তরাল হারে বাড়াতে গেলে চলতি ব্যয় (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে) অনধিক বার্ষিক ৪.২% হারে বৃদ্ধি পাবে। যাহোক, ব্যয় সংকোচনের জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও রাজস্ব ব্যয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে যায়। পরিকল্পনাকালে মোট রাজস্ব ব্যয় চলতি মূল্যে ২০.৫% হারে বৃদ্ধি পায়। এটা শুধু পরিকল্পনাকালে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ১৫.৫% অতিক্রমই করে যায়না, পাশাপাশি রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধিও (১৫.৮%) অতিক্রম করে যায়। পরিকল্পনাকালে ব্যয়বৃদ্ধির হার সংকোচনের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল সরকারী খাতে বিশেষ করে নিম্ন পর্যায়ে নতুন কর্মসংস্থান রহিত করা, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের পুনর্গঠন ও তাদের সংখ্যা হ্রাস করা এবং পরিবহন ও টেলিফোন ব্যবহার ও আতিথেয়তা কৃচ্ছতা আরোপ। পরিকল্পনাকালে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার চাইতে চলতি ব্যয় বৃদ্ধির মূল কারণ ছিল খাদ্যখাতে ভর্তুকি। এসময়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে খাদ্য খাতে ভর্তুকি ক্রমশঃ সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমিয়ে এনে কেবলমাত্র টার্গেট গ্রুপ-এর মধ্যে তা সীমিত রাখা হবে। পরিকল্পনাকালে রাজস্ব বাজেটে মোট ভর্তুকি প্রাক্কলিত ৫৩১ কোটি টাকার স্থলে প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ায় ৯৭০ কোটি টাকায়। অন্যান্য যে সমস্ত কারণে চলতি ব্যয় বৃদ্ধি পায় সেগুলো হলো সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, স্থানীয় পর্যায়ে নতুন প্রশাসনিক ইউনিট স্থাপন এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনার জন্য ব্যয় ইত্যাদি। পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন খাতে চলতি ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা সারণী ৭-এ দেখানো হল:

সারণী ৭

চলতি ব্যয়
(১৯৮০—৮৫)

(কোটি টাকায়)

খাত		১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫ (সংশোধিত হিসাব)	মোট (১৯৮০—৮৫)
১। সাধারণ সেবা খাতসমূহ		৫১২.৯৬	৬০০.৩৬	৬৬৯.৫০	৮৭২.৪২	৯৮২.৯১	১১৪২.৯৬	৪,২৬৮.১৫
২। অর্থনৈতিক সেবা খাতসমূহ		২১৬.৭৪	৩১৫.১২	৩৬০.০৩	১৯৪.০৭	৩৮৮.১৩	৪৭৬.৪৮	১,৭৩৩.৮৩
৩। সামাজিক সেবা খাতসমূহ		২৬৩.৮৮	৩২১.২৪	৩৯৬.৪৪	৪৫৩.১১	৬০০.৩৭	৯২১.৯১	২,৬৯৩.০৭
৪। দায় পরিশোধ	..	৬৯.৫২	৯৯.০৫	১৮০.৫৩	২২৮.৪৪	২৩৭.৪১	৩১৮.৩০	১,০৬৩.৭৩
৫। ভর্তুকি	..	১৭২.৮৪	১১১.০৬	১৮২.৯৩	১৯৯.১৭	২১১.৮৬	২৬৪.৮৫	৯৬৯.৮৭
(ক) খাদ্য	..	(১৬৫.৪০)	(১০৯.৩৮)	(১৮২.০৩)	(১৯৩.০০)	(১৬০.০০)	(২৫০.০০)	(৮৯৪.৪১)
(খ) অন্যান্য	..	(৭.৪৪)	(১.৬৮)	(০.৯০)	(৬.১৭)	(৫১.৮৬)	(১৪.৮৫)	(৭৫.৪৬)
মোট :	..	১,২৩৫.৯৪	১,৪৪৬.৮৩	১,৭৮৯.৪৩	১,৯৪৭.২১	২,৪২০.৬৮	৩,১২৭.৮০*	১০,৭৩১.৯৫*

*৩.৩০ কোটি টাকা আনুষংগিক খরচসহ।

গ্রন্থাগার

২০। পরিকল্পনাকালে রাজস্ব খাতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ১০,২৭৮ কোটি টাকা; কিন্তু প্রকৃত ব্যয় দাঁড়ায় ১০,৭৩২ কোটি টাকায়, যা লক্ষ্যমাত্রা হতে ৪৫৪ কোটি টাকা বেশী। অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছিল মাত্র ৪·৪% যেখানে রাজস্ব ঘাটতি ছিল ১৪·৬% (২,৪২৩ কোটি টাকা)। তবে এই রাজস্ব ঘাটতি সরকারী সঞ্চয়ের উপর বেশ বড় ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

২১। পরিকল্পনাকালে উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয়সমূহের ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালের মোট চলতি ব্যয়ের ৫৬·৬% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৬০·১ শতাংশে বৃদ্ধি পেলেও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সমূহের ব্যয় একই সময়ে ৪৩·৪% থেকে ১৯·৪ শতাংশে হ্রাস পায়। এসময়ে উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয়সমূহের চলতি ব্যয় ২২·৫% হারে এবং অ-উন্নয়ন মন্ত্রণালয়সমূহের ক্ষেত্রে তা ১৯·৪% হারে বৃদ্ধি পায়।

রাজস্ব উদ্‌বৃত্ত

২২। পরিকল্পনাকালে রাজস্ব উদ্বৃত্ত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে পিছিয়ে থাকে। এসময়ে রাজস্ব উদ্বৃত্ত হিসেব করা হয়েছিল ৬,২৬২ কোটি টাকা, যেখানে প্রকৃত উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৩,৩৮৫ কোটি টাকায়। এক্ষেত্রে প্রধান ঘাটতি ছিল কর রাজস্ব, প্রায় ১৮%। কর বহির্ভূত রাজস্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ঘাটতি কিছুটা পূরণ হয় এবং প্রকৃত ঘাটতি ১৪·৬ শতাংশে নেমে আসে। এসময় চলতি ব্যয় উদ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার চাইতে ৪·৪% এগিয়ে থাকে।

মূলধন খাত

২৩। সঞ্চয়পত্র, ডাকঘর সঞ্চয়, ব্যাংক ডিপোজিট, ডাক জীবন বীমা, বণ্ডসমূহ, সরকারী কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল ও বিভিন্ন সরকারী তহবিলে নানা রকম ডিপোজিটের সমন্বয়ে মূলধন খাত গঠিত হয়। পরিকল্পনাকালে মোট মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে ৪৫১ কোটি টাকা এবং চলতি মূল্যে ৬২১ কোটি টাকা, কিন্তু প্রকৃত সংগ্রহ ছিল চলতি মূল্যে ৪৯২ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চাইতে ২১% কম। পরিকল্পনাকালে সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় স্কীম থেকে ২৭৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করার কথা থাকলেও প্রকৃত প্রাপ্তি দাঁড়ায় ২০৪ কোটি টাকা। এভাবে মূলধন ও সঞ্চয় হিসাবে মোট ঘাটতি দাঁড়ায় ১২৯ কোটি টাকা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

আভ্যন্তরীণ সম্পদের অভিক্ষেপ

২৪। তৃতীয় পরিকল্পনার মোট ৩৮,৬০০ কোটি টাকার অর্থ বরাদ্দের মধ্যে ১৭,৫৭২ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে এবং ২১,০২৮ কোটি টাকা নীট বৈদেশিক মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ থেকে মেটানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এভাবে উন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ৪৫·৫% আভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে যোগান দেয়া হবে যা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের প্রকৃত স্তর থেকে সামান্য বেশী। উন্নয়ন খাতের জন্য সম্পদ সংগ্রহের অব্যাহত সংকটের প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের প্রকৃত ব্যয়ের চেয়ে এ পরিকল্পনার আকার ২২·৭% অধিক রাখার দরুণ আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

সারণী ৮-এ পরিকল্পনার অর্থ বরাদ্দ, সরকারী ও বেসরকারী খাতের মধ্যে বন্টন এবং মোটামুটিভাবে অর্থ সংস্থানের ধারা দেখানো হল :

সারণী ৮

তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান

(১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)

(কোটি টাকার)

অর্থ সংস্থান	মোট	সরকারী	বেসরকারী
পরিকল্পনার আকার	**৩৮,৬০০**	**২৫,০০০**	**১৩,৬০০**
আভ্যন্তরীণ	১৭,৫৭২	৫,৯৬০	১১,৬১২
বহিঃসূত্র	২১,০২৮	১৯,০৪০	১,৯৮৮

২৫। সারণীতে দেখা যাচ্ছে, সরকারী খাতে ১৯,০৪০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহৃত হবে বলে আশা করা যায় এবং বাকী ব্যয় সংকুলানের জন্য ৫,৯৬০ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বেসরকারী খাতে মোট ১৩,৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সংকুলানের জন্য ১,৯৮৮ কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস থেকে এবং ১১,৬১২ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে যোগান দেয়া হবে।

সরকারী খাতে অর্থ সংস্থান

২৬। সরকারী খাতের ব্যয় মেটানোর জন্য প্রস্তাবিত অর্থ সংস্থান সারণী ৯-এ দেখানো হল :

সারণী ৯

সরকারী খাতে অর্থ সংস্থান

(১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

উৎস	টাকার পরিমাণ
(১) বহিঃসম্পদসমূহ	১৯,০৪০
(২) আভ্যন্তরীণ সম্পদসমূহ	৫,৯৬০
(ক) মোট চলতি রাজস্ব	২১,৮৩৩
কর রাজস্ব (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)	১৭,৮৪৫
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৩,৯৮৮
(খ) চলতি ব্যয়	১৬,৮৫০
(গ) চলতি রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৪,৯৮৩
(ঘ) মূলধন প্রাপ্তি	৯৭৭
মোট : ..	২৫,০০০

২৭। পরিকল্পনাকালে ১৯৮৪/৮৫ সালে প্রচলিত কর ও অন্যান্য হারের ভিত্তিতে মোট ৪,৯৮৩ কোটি টাকা রাজস্ব উদ্বৃত্ত হিসাব করা হয়। এর অন্তর্নিহিত ধারণা হচ্ছে এই যে, পরিকল্পনাকালে মোট কর রাজস্ব বার্ষিক ৮.৫% হারে এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব বার্ষিক ৮% হারে বৃদ্ধি পাবে এবং চলতি ব্যয় প্রকৃত অর্থে বছরে ৩% হারে বাড়বে। ফলে নিকট অতীতের তুলনায় পরিকল্পনাকালে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরো কঠোরতর পদক্ষেপ এবং রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে অব্যাহত কৃচ্ছ্রতার পথ অবলম্বন করা হবে বলে ধরে নেয়া হচ্ছে। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য যে সমস্ত পন্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে সেগুলো হলো : (১) বাণিজ্যিক পণ্য আমদানি ক্ষেত্রে বার্ষিক ২.৮% হারে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধির (করারোপযোগ্য আমদানি পণ্যের মূল্য প্রবৃদ্ধি ৬.৩% হিসেবে) এবং চা ও চামড়ার রপ্তানি-ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে কাষ্টমস শুল্ক আদায় বার্ষিক ৭.০% হারে বৃদ্ধি পাবে; (২) করারোপযোগ্য আমদানি পণ্যের উপর আরোপিত বিক্রয় কর বার্ষিক ৯.২% হারে বাড়বে যা হবে কাষ্টমস রাজস্ব খাতে অর্জিত প্রবৃদ্ধির চাইতে সামান্য বেশী; (৩) বিভিন্ন খাত ভিত্তিক কর্মসূচী অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠান-সমূহের উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যের ভিত্তিতে সেগুলোর উপর আরোপিত আবগারী শুল্ক সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে এবং (৪) অ-কৃষিখাতে যোজিত মূল্যের ভিত্তিতে আয়কর বছর প্রতি ৭.৪% হারে বৃদ্ধি পাবে।

২৮। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কর রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সারণী ১০-এ দেখানো হলো :

সারণী ১০

কর রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা

(১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্য ও হারে)

(কোটি টাকায়)

কর	১৯৮৪/৮৫ (সংশোধিত হিসাব)	১৯৮৯/৯০ (লক্ষ্যমাত্রা)	মোট (১৯৮৫-৯০)
১। কাষ্টমস শুল্ক	১,১২০	১,৫৬৪	৬,৭১৮
২। বিক্রয় কর	৪১০	৬৩৬	২,৬৪০
৩। আবগারী শুল্ক	৭০৫	১,১৪২	৪,৬৮৬
৪। আয়কর	৩৯০	৫৫৮	২,৩৪৭
৫। ভূমি উন্নয়ন কর	৪০	৭৮	২৫০
৬। অন্যান্য	১৮২	২৯৩	১,২০৪
মোট : ..	২,৮৪৭	৪,২৭১	১৭,৮৪৫

২৯। কর বহির্ভূত রাজস্ব বার্ষিক ৮% হারে বেড়ে ৬৩০ কোটি টাকা* থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ৯২৫ কোটি টাকায় উন্নীত হবে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। এটা মনে করা হচ্ছে যে, কর বহির্ভূত রাজস্বের ব্যাপারে সরকারী খাতের আর্থিক ও আর্থিক নয় এমন উভয় বর্গের প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। রেলওয়ে ও ডাকবিভাগ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যথেষ্ট লোকসানের সম্মুখীন হয়েছিল। দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এগুলো লোকসানের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

৩০। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই দেশে চলতি ব্যয়ের পরিমাণ অব্যাহত গতিতে বেড়ে চলেছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকাল আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান লক্ষ্য হলো চলতি ব্যয়ের এই উর্দ্ধগতি রোধ করা। প্রশাসনের দক্ষ কর্মপ্রক্রিয়া পরিচালনা এবং অনর্থক ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করা হবে সরকারী ব্যয় নীতির প্রাথমিক লক্ষ্য। হিসেব করা হয়েছে যে, পরিকল্পনাকালে চলতি ব্যয় স্থির মূল্যে বছর প্রতি ৩% হারে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালের ২,৯৩০ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ৩,৩৮৫ কোটি টাকায় উন্নীত হবে। চলতি ব্যয়ের এই হার বজায় রাখতে হলে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা, সামাজিক সার্ভিসসমূহ, দায় পরিশোধ এবং প্রতিরক্ষাখাতসহ লোক প্রশাসনের খাতে ব্যয় অপরিহার্য ন্যূনতম স্তরে কমিয়ে আনতে হবে। সরকারী সম্পত্তি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এতদিন পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া হয়নি; এখন থেকে এগুলোর জন্য ব্যয় বরাদ্দ বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা হবে। বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত হবার পর সেগুলো চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারী খাতে রাজস্ব ব্যয় নামমাত্র বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে পরিকল্পনাকালের প্রথমদিকে পর্যায়ক্রমে জনগণের মধ্যে খাদ্যশস্য বন্টনে ভর্তুকী তুলে নেয়া হবে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে একবার স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হলে সরকারের দায়িত্ব তখন হবে কেবলমাত্র খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে সরবরাহ ঠিক রাখা। তবে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণের প্রক্রিয়া চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা থেকে যাবে এবং বিশেষ প্রকল্পের অধীনে তা অব্যাহত রাখা হবে। বিদ্যমান গণখাদ্য বিতরণ পদ্ধতি পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে সুপারিশ রাখার জন্য একটি কমিটি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে।

কৌশলাদি ও নীতিমালা

৩১। পরিকল্পিত হারে আভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রয়োজনীয় সমাবেশ ঘটানোর জন্য কর প্রশাসনকে দক্ষ ও কার্যকরী করে তোলা, সরকারী উপযোগ ও সরকারী খাতের পণ্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি, যে সমস্ত প্রকল্প হতে ফল পেতে সন্দেহ রয়েছে এ ধরণের নিম্ন অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা এবং জনগণের ভোগ সীমিত রাখার প্রবল মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। সামগ্রিক নীতি কাঠামো এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে হবে। খাদ্য সংগ্রহে অর্থ যোগানদান ব্যতিরেকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ ন্যূনতম করার লক্ষ্যে কাংখিত কৌশল প্রণীত হবে।

৩২। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে বর্তমান কর/জিডিপি-র অনুপাত এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেও নিম্নতম। পরিকল্পনাকালে কর/জিডিপি'র অনুপাত ১৯৮৪/৮৫ সালের ৮˙২% থেকে পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে ৯˙৪% দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। কর রাজস্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আরো পণ্য পরোক্ষ করের আওতায় আনার জন্য কর ভিত্তিকে প্রসারিত করার উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। কর প্রথায় পরোক্ষ করের প্রাধান্য অব্যাহত থাকবে তবে এক্ষেত্রে বিদ্যমান অসমতা হ্রাস করার জন্য প্রত্যক্ষ করের অংশ বাড়ানোর ব্যাপারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

---

*১ নং সারণীতে কর বহির্ভূত রাজস্বের আওতায় রেলওয়ে রাজস্বকে গ্রোস হিসাবে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার অভিক্ষেপে নীট হিসাবে দেখানো হয়েছে।

৩৩। দক্ষ আমদানি বিকল্পের উপর সম্প্রতি গুরুত্ব দেয়ায় আমদানি ও সংশ্লিষ্ট কর ব্যবস্থা সংরক্ষণবাদী উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত করা হবে এবং এর ফলে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও আয়ের উপর আরও নির্ভরতা ন্যস্ত করা হবে। চলতি বাণিজ্য ও শিল্পনীতি সমীক্ষা (TIP) এক্ষেত্রে যথাযথ নীতি কাঠামো তৈরী করতে সহায়ক হবে। যারা বেশী আয় করেন তাদের কাছ থেকে আরো বেশী রাজস্ব সংগ্রহ করে কর ভিত্তিকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করা হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি খাতে অব্যাহত গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধিত মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের একটা বড় অংশ আসবে কৃষি খাত থেকে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই আয়ের একটি বিরাট অংশ করের আওতায় আনার জন্য এবং সেই সাথে কর ব্যবস্থাকে আরো সুষম করে তোলার জন্য 'সম্ভাব্য আয়ের' ভিত্তিতে কৃষি করের উপর অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক, কেননা বর্তমান কর নিরূপণ পদ্ধতি অর্থাৎ সাধারণ আয়ের সাথে কৃষি আয়ের একত্রীকরণ কৃষি আয় থেকে কার্যকরভাবে কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিদ্যমান ভূমি উন্নয়ন করের আওতায় অধিক জমির উপর কর হারের সংশোধনও এই কর আদায়ের ক্ষেত্রে সুফল আনতে পারে। আয়করের উপর বিভিন্ন সুবিধা, কর মওকুফ ও বিশেষ কর হ্রাস আয় করের কার্যকর ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এসব সুবিধা সম্পর্কে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, বিনিয়োগের জন্য উৎসাহদান হিসেবে এসব সুবিধা নিস্ফল বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং এগুলি প্রত্যাহার করা হলে উল্লেখযোগ্য হারে সুফল পাওয়া যাবে। তবে এর জন্য আরো বেশী কার্যকর সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে বিকল্প ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে হবে।

৩৪। বর্তমান কর প্রশাসনে যথেষ্ট শৈথিল্য এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অবৈধ পন্থা বিদ্যমান। কর তদন্ত কমিশন এ ব্যাপারে ১৯৭৯ সালে ব্যাপক পরীক্ষা চালায় ও বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কমিশনের এসব সুপারিশমালা বাস্তবায়নের ফলে কর প্রশাসনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিশেষ করে কর প্রশাসনের আধুনিকীকরণের মাধ্যমে আরো উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন করের নিরূপণ ও সংগ্রহ পদ্ধতির আরো সহজতর করা হবে এবং কর প্রশাসক ও করদাতার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা হবে। প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ উন্নত ও জোরদার করা হবে।

৩৫। সরকারী খাতের সংস্থাগুলোকে তাদের মুনাফার ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে রাজস্ব বাজেটে অবদান রাখতে বলা হবে। পুঁজি প্রত্যাহার কর্মসূচী সরকারী সংস্থাগুলোকে তাদের অনেক অদক্ষ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভার থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে দক্ষ সংগঠনগুলো তাদের সংগে রয়ে গেছে। কাজেই পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বাড়ানোর ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য এসব সংস্থার কাছে আরো বেশী দাবী করা হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলে, আর যেগুলো সামাজিক দিক বিবেচনা করে পরিচালিত হয় এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা আবশ্যক। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আদায়ের ন্যূনতম মাত্রা ধার্য্য করে দিতে হবে এবং অন্যান্যগুলোর কাছ থেকে অন্ততঃ একটা ব্রেক ইভেন (Break even) আদায় প্রত্যাশা করা হবে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বাধিক অবদান পাবার নিমিত্তে কতকগুলো সমন্বিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যার মধ্যে রয়েছে সর্বাধিক ক্ষমতার ব্যবহার, সামগ্রীর সময়োপযোগী সরবরাহ,, বিঘ্নহীন বিদ্যুৎ সরবরাহ, নমনীয় মূল্যনীতি, উন্নততর ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং হিসাবপত্রের কঠোর ব্যবস্থা অনুসরণ, ইত্যাদি।

বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংস্থান

৩৬। বেসরকারী খাত আগের তুলনায় বৃহত্তর ভূমিকা পালন করবে বলে এ পরিকল্পনা প্রত্যাশা করে। বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ ও সঞ্চয় উভয় লক্ষ্যমাত্রাই পরিকল্পনাকালে আগের চাইতে উচ্চস্তরে ধরা হয়েছে। পরিকল্পনায় বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের জন্য ১৩,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)। এই খাতের অতীত তৎপরতা থেকে ধারণা করা যায় যে, যুক্তিসংগত

রাজস্ব ও আর্থিক নীতির আওতাধীনে এই খাত উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে। প্রথম পরিকল্পনাধীনে ১৯৭২/৭৩ সালের মূল্যে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ করা হয় ৪৩৯ কোটি টাকা, যাতে বার্ষিক গড়পড়তা বিনিয়োগ দাঁড়ায় ৮৭ কোটি টাকা; এই বিনিয়োগ (১৯৭২/৭৩ সালের মূল্যে) দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় বৃদ্ধি পায় ২১০ কোটি টাকায় এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৫৪ কোটি টাকায়। ১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে শেষোক্ত অংকটি ছিল ১৭২৫ কোটি টাকার সমান। ১৯৮২ সালের নূতন শিল্পনীতি শিল্পখাতে বেসরকারী উদ্যোগের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। অন্যান্য খাত যথা: কৃষি, গৃহ নির্মাণ ও পরিবহণে বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহদান অব্যাহত থাকবে। এই বিনিয়োগের একটি অংশ বিশেষ অর্থাৎ ১,৯৮৮ কোটি টাকা বিদেশ থেকে আসবে বলে আশা করা যায়। বিশেষ ধরণের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ সরবরাহ বাড়ানো হবে; অন্যদিকে এ ধরনের নীতি পদ্ধতির মাধ্যমে যথা সুদের হার, বীমা ব্যবসার প্রসারণ, মিউচুয়াল ফাণ্ড জাতীয় নতুন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাদি (Portfolio) প্রবর্তন এবং সঞ্চয় পদ্ধতি জোরদারকরণ প্রভৃতি দ্বারা গৃহস্থালী সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে।

মুদ্রা ও মূল্যের ব্যবস্থাপনা

৩৭। দারিদ্র দূরীকরণ এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের সাফল্য মূলতঃ পণ্য ও সেবার প্রকৃত খাতের সাথে সাথে অর্থ খাতের উন্নয়নের উপরই নির্ভরশীল; কেননা মুদ্রা সরবরাহ পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু না হলে মূল্যে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় যা শ্রমিক জনগোষ্ঠিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা সেদিক থেকে একটি দিকনির্দেশ। গড়পড়তা বার্ষিক ১১.১% মুদ্রাস্ফীতির কারণে (চট্টগ্রামের শিল্প শ্রমিকদের জন্য নিরূপিত জীবন যাত্রার ব্যয় সূচকের ভিত্তিতে) প্রকৃত মজুরী বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল মাত্র ৩.২%, যেখানে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ৩.৮%। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার আয় বিতরণ শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিকূলে যায়। ১৯৮৩/৮৪ এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে মজুরীর পুনর্বিন্যাস করে লোকসান প্রতিহত না করা হলে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যেতে পারতো। এটা সরকারী খাতের কর্মচারীদের বেলায়ও সত্য, কেননা দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ দিকে তাদের বেতন স্কেল উর্দ্ধমুখী সংশোধন করা হয়। পরিকল্পনার দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয় যে, সরকারী কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার দরুন সরকারী খাতের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ব্যাহত হয়েছিল। দক্ষতা ও শৃংখলা ক্ষেত্রে ঘাটতি ছাড়াও অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে এক মারাত্মক ধস সৃষ্টি করে ফলে উন্নয়ন দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদন বিমুখতায় পর্যবসিত হয়। নিম্ন পর্যায়ের আয়ে অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি হার প্রকৃতপক্ষে ভোগকে উৎসাহিত করে ও সঞ্চয়ের মাত্রা নামিয়ে দেয়।

৩৮। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল বার্ষিক ১১.৮% (ঢাকার মধ্যবিত্ত আয়ের পরিবারের ভোগ্যপণ্য সূচকের ভিত্তিতে) যেখানে পূর্ববর্তী পাঁচ বছর মেয়াদে (১৯৭৫—৮০) এ হার ছিল ৬.৩%। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্য পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বিপর্যস্ত হয়। মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতিকে বাড়িয়ে আনলেও প্রথম পরিকল্পনার দ্বিতীয়ার্ধে আর্থিক প্রবাহ প্রবর্তন করা হয় যা মুদ্রা শৃংখলার পরিপন্থী। এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করতে খুব বেগ পেতে হয়নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ ১৯.৫% হারে বৃদ্ধি পায়, যেখানে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৮%; পূর্ববর্তী মেয়াদে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১৭.৫% ও ৫.২%। মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহের গতি ছিল দ্রুততর। পরিকল্পনার শেষ বছরগুলোতে মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য উদ্বেগও দেখা যায় এবং পরোক্ষ চাপ সৃষ্টির জন্য কিছু বিধিও আরোপ করা হয়, যাতে মুদ্রা ও মূল্য নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে। এসব বিধির মধ্যে দুটো হল ইতিবাচক সুদের হার আরোপ এবং প্রকৃত মুদ্রা বিনিময় হার প্রবর্তন যাতে মুদ্রার সুদের হার বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতির সাথে সাথে মুদ্রামানের অবমূল্যায়ন ঘটে। ১৯৮২/৮৩ সাল থেকে সাধারণ

ঋণের জন্য দেয় মুদ্রার সুদের হার মুদ্রাস্ফীতির হারের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। এই অবস্থায় ঋণের জন্য মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় ও স্বল্প উৎপাদনশীল বিনিয়োগে নিরুৎসাহ দেখা দেয়। অত্যাধিক মুদ্রাস্ফীতি রপ্তানী বোনাসে বিপর্যয় ঘটায়; যা মুদ্রার অবমূল্যায়ন থেকেই সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মুদ্রামানে ৬৮% এর-ও বেশী অবমূল্যায়ন ঘটা সত্বেও রপ্তানির ক্ষেত্রে পারিতোষিক (ইনসেনটিভ) ছিল অনেক কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৭৯/৮০ এবং ১৯৮৩/৮৪ সালের মধ্যে টাকার আক্ষরিক মানে ৬১% অবমূল্যায়ন ঘটায়—ডলার প্রতি বিনিময় হার ১৫·৫ টাকা থেকে ২৪·৯ টাকায় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মূল্য ও বাণিজ্যের প্রভাব হিসাবে রাখলে প্রকৃত অবমূল্যায়নের হার ছিল মাত্র ২১%; ডলার প্রতি বিনিময় হার ১৩ টাকা থেকে ১৫·৭ টাকায় বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রকৃত বিনিময় হারের অবমূল্যায়ন ছিল আক্ষরিক হারের চাইতে অনেক কম। মুদ্রাস্ফীতি আয়-বিতরণ ও কল্যাণ এবং সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও রপ্তানিকে প্রভাবিত করে যা আভ্যন্তরীণভাবে দারিদ্র ও বহিঃক্ষেত্রে লেনদেনের ভারসাম্য সমস্যার প্রেক্ষাপটে মুদ্রা ও মূল্য ব্যবস্থাপনাকে তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে চিহ্নিত করে তোলে।

৩৯। **মুদ্রা সম্প্রসারণ:** কাজেই তৃতীয় পরিকল্পনায়, পণ্য খাতে উন্নয়নের সাথে সাথে মুদ্রা খাতের ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন হবে। দারিদ্র মোচন এবং দরিদ্র জনসাধারণের প্রকৃত আয় বাড়ানোর লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মূল্য স্থিতিশীলতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বর্ধিষ্ণু অর্থনীতিতে মুদ্রা চাহিদা বাড়বে। এ ধরণের চাহিদা তৃতীয় পরিকল্পনায় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির অভিক্ষেপের চেয়েও দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পাবে। প্রথমতঃ কৃষি উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্বদানের কারণে মুদ্রাখাত সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের চেয়ে দ্রুতগতিতে প্রসারিত হবে, দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত সম্পদ অন্তঃ প্রবাহ বর্ধিত হারে মুদ্রা লেনদেন নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মুদ্রা খাতে দ্রুততর সম্প্রসারণের ফলে অর্থনীতিতে বেশ কিছু অন্তরায় বিদ্যমান থাকবে। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে মূল্য লক্ষ্যই ব্যাহত না হয়। গত দশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে মুদ্রা সম্প্রসারণের হার বার্ষিক ১৭·৫% অতিক্রম করতে না দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে মুদ্রাস্ফীতির হার ১০% নীচে থাকে।

৪০। **ব্যাংকিং খাতের ভূমিকা:** মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতিকে আয়ত্বে রাখতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আর্থিক সঞ্চয় সমাবেশের মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হার ৪·২% থেকে ৭·০% বৃদ্ধি পাবে বলে হিসাব করা হয়েছে। এছাড়াও এধরণের সঞ্চয় ব্যাপকভাবে পল্লীখাতে পুঞ্জীভূত হবে, কাজেই গ্রামাঞ্চলের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করা হবে। এ ব্যাপারে ক্ষুদ্রাকৃতির সঞ্চয়কে সন্নিবেশিত করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের বিশেষ ভূমিকা থাকবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যাংক আমানত (মেয়াদী ও তলবী) বার্ষিক ২৭% হারে বেড়ে ২,৭১০·৬ কোটি টাকা থেকে ৯,০৭২·১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ৫ বছর মেয়াদ কালে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯·৯%। এই প্রবৃদ্ধির ফলে মুদ্রাখাতে অগ্রগতি সাধন এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধে উৎপাদনশীল খাতগুলোতে অর্থ সম্পদ নিয়োজিত করার ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বৃহত্তর ভূমিকা রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতিকে খর্ব করার জন্য শুধুমাত্র ইতিবাচক ধারণা দেয়ার জন্যই নয়, বরং ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্যই তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য মুদ্রা খাতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় তাদের ভূমিকা সংহত করতে একটি কার্যকর সুদ হার নীতি প্রণয়ন করা দরকার। এ ধরণের সুদ হার নীতিকে প্রকৃত ও মুদ্রা উভয় খাতের বিবর্তনের সাথে সাথে অব্যাহতভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

গ্রন্থাগার

চতুর্থ অধ্যায়

বৈদেশিক লেন-দেন ভারসাম্য এবং বহিঃসম্পদ

অন্যান্য বহু উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান এবং আমদানী-রপ্তানী ব্যবধান, এই উভয় সমস্যাই রয়েছে। একটি নতুন জাতির উন্নয়ন চাহিদার কারণে স্বাধীনতার পর উভয় ব্যবধানই আরো বেড়েছে। কৃষি পণ্যের প্রাধান্যের কারণে দেশের রপ্তানী ভিত্তি ছিল সংকুচিত। ১৯৭৯/৮০ সালে ৭২ কোটি ১০ লক্ষ ডলারের রপ্তানিমূল্যের প্রায় ৪০ শতাংশই অর্জিত হয়েছে প্রাথমিক পণ্য এবং পাট, চামড়া, মৎস্য ও সব্‌জিজাতীয় আধা-প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানী করে। রপ্তানী আয়ের তিন-চতুর্থাংশ অর্জিত হয়েছে পাট ও পাটজাত পণ্যের মাধ্যমে। এই তথ্যটির মধ্য দিয়ে আমাদের রপ্তানী খাতের সাংঘাতিক একপেশে কাঠামোটি ফুটে ওঠে। অন্যদিকে আমদানী খাতে রয়েছে কাটছাঁট করে কমানো সম্ভব নয় এমন সব অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। ১৯৭৯/৮০ সালে আমদানী বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে খাদ্যশস্য (৬২˙৩০ কোটি ডলার), ভোজ্য তৈল ও তৈলবীজ (৭˙৬০ কোটি ডলার), তুলা ও সূতা (৬˙৮০ কোটি ডলার) এবং বাকী অর্ধেক অংশের মোট ২৩৬˙৬০ কোটি ডলারের আমদানী পণ্যের মধ্যে ছিল পেট্রোলিয়াম (৩৮˙৪০ কোটি ডলার), সার (১৩˙৪০ কোটি ডলার), সিমেন্ট (৩˙৬০ কোটি ডলার) ও মূলধন পণ্যের (৪৭˙৫০ কোটি ডলার) মতো অত্যাবশ্যকীয় উন্নয়ন সামগ্রীসমূহ। রপ্তানী প্রবৃদ্ধি মন্থর হবার কারণে রপ্তানী খাতের কাঠামোতেও বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। কৃষিপণ্য এবং বিশেষ করে পাট ও পাটজাত পণ্যের আধিপত্যও অব্যাহত থাকে। এর ফলে বাহ্যিক কারণগুলোর দ্বারা রপ্তানী খুব বেশী প্রভাবিত থেকে যায়। যেমন আবহাওয়া পাট ও চা উৎপাদন প্রায়ই ব্যাহত করে ও পাটজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক চাহিদা প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উল্লেখিত উভয় কারণের জন্যেই রপ্তানী স্তর ও কাঠামো দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে মন্থর রপ্তানী প্রবৃদ্ধির কারণে আমদানী ক্রমবর্ধমান হারে বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৯৭৯/৮০ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল আমদানী মূল্যের মাত্র ৩০ শতাংশ। আমদানী খাতে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার বাড়াতে হয়েছে বলে রপ্তানী ও আমদানী অনুপাত ১৯৭৩/৭৪ সালের ৪০ শতাংশ থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে ৩০ শতাংশে নেমে আসে এবং ব্যবধান প্রায় তিন গুণ বেড়ে ১৯৭৩/৭৪ সালের ৫৫˙৫০ কোটি ডলার থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে মোটামুটি হিসেবে ১৬৪˙৫০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়।

২। বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান দূর করার জন্য রপ্তানী-আমদানী ব্যবধান একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের অধিকাংশ সময়েই সাহায্য আসার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার কারণে দেশের আমদানী চাহিদা পূরণে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক সাহায্য (প্রাপ্তি) মাত্র ৯˙৮০ কোটি ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯/৮০ সালের ১২২˙৩০ কোটি ডলার থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৩২˙১০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়। একটি বিকাশমান অর্থনীতির জন্য আমদানী প্রবৃদ্ধির উপর এর কঠোর প্রতিক্রিয়া সৌভাগ্যক্রমে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের সাহায্যে কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছিল। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালের ২১˙০ কোটি ডলার থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪০˙০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়। আমদানী ২৩৬˙৬০ কোটি ডলার থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২৭০˙০ কোটি ডলার বৃদ্ধি পেতে এই অর্থ বিশেষভাবে সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর্যালোচনা

লেন-দেনের ভারসাম্য পরিস্থিতি

৩। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লেন-দেন ভারসাম্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল রপ্তানীর প্রবৃদ্ধি, আমদানীর বিকল্প ও বিদেশে কর্মসংস্থানের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে রপ্তানী-আমদানী ব্যবধানকে পূর্ব অনুমেয় বৈদেশিক সাহায্য স্তরের আওতার মধ্যে রাখা। কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম দিককার বছরগুলোতে বিশ্ববাণিজ্য ও সাহায্য পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটায় পরিকল্পনাকালে রপ্তানীর ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮'৭% এবং আমদানীর ক্ষেত্রে ০'৩% এর একটি নগণ্য লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়। মোট বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি ধরা হয়েছিল ৬০৯'৪০ কোটি ডলার।

৪। পরিকল্পনাকালে ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যমানে বাণিজ্যিক আমদানী ও রপ্তানীর মোট মূল্য ধরা হয়েছিল যথাক্রমে ১৭,৮০২ কোটি (১১৪৮'৫০ কোটি ডলার) ও ৭,৪২৫ কোটি টাকা (৪৭৯'০০ কোটি ডলার)। অদৃশ্য আয় ও লেনদেনের সমন্বয় সাধনের পর, রপ্তানী-আমদানী ব্যবধান পূরণ করার জন্য মোট ১০,৯১৯ কোটি টাকার (৭০৪'৪০ কোটি ডলার) নিট মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ ধরা হয়।

৫। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের আমদানী, রপ্তানী ও নীট বৈদেশিক পুঁজির লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাক্কলিত প্রকৃত অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র নীচের সারণীতে দেয়া হলো :

সারণী ১

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বহির্দেশীয় খাতের লক্ষমাত্রা ও প্রকৃত অবস্থা

(১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে)

বিষয়	লক্ষ্য মাত্রা		প্রকৃত	
	কোটি টাকা	কোটি ডলার	কোটি টাকা	কোটি ডলার
১। **আমদানি ব্যয়**	**২০,৩৭৭**	**১,৩১৪'৬**	**২১,৭৪০**	**১,৪০২'৫**
পণ্য (সি আই এফ)	১৭,৮০২	১,১৪৮'৫	১৯,২৭০	১,২৪৩'২
অদৃশ্য	২,৫৭৫	১৬৬'১	২ ৪৭০	১৫৯'৩
২। **রপ্তানি আয়**	**৯,৪৫৮**	**৬১০'২**	**৯,২৩০**	**৫৯৫'৫**
পণ্য (এফ ও বি)	৭,৪২৫	৪৭৯'০	৬,৮১০	৪৩৯'৪
অদৃশ্য	২,০৩৩	১৩১'২	২,৪২০	১৫৬'১
৩। **মূলধন আগমন**	**১০,৯১৯**	**৭০৪'৪**	**১২,৫১০**	**৮০৭'০**

রপ্তানি প্রবৃদ্ধি

৬। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বার্ষিক ৮'৭ শতাংশ রপ্তানী প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল চক্রবৃদ্ধি হারে ৪'৯ শতাংশ। ১০৯'৫০ কোটি ডলারের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার স্থলে রপ্তানী বেড়েছে ১৯৭৯/৮০ সালের ৭২'১০ কোটি ডলার থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৯১'৭০ কোটি ডলার, ফলে পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৬'৩%। তবে রপ্তানী ক্ষেত্রে এক বছর থেকে অন্য বছর পার্থক্যের কারণে ৪৭৯ কোটি ডলারের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার স্থলে পরিকল্পনাকালে মোট রপ্তানী আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩৯'৪০ কোটি ডলার। এর ফলে সার্বিক ঘাটতির হার দাঁড়িয়েছে ৮'৩ শতাংশ।

৭। বিশ্ব অর্থনীতিতে অব্যাহত মন্দা, শিল্পোন্নত দেশসমূহের ক্রমবর্ধমান সংরক্ষণবাদ এবং আভ্যন্তরীণ সরবরাহ সমস্যাজনিত কারণেও রপ্তানী ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। মূলতঃ ঘাটতি হয়েছে কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যের ক্ষেত্রে। এগুলোর সমন্বিত মূল্য ১৯৭৯/৮০ সালের ৫৩ কোটি ডলার থেকে কমে ১৯৮৪/৮৫

সালে ৫১ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে এই খাতে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ ছিল ৬৬·৬০ কোটি ডলার। কাঁচাপাটের রপ্তানি মূল্য ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই লক্ষ্যমাত্রার নীচে থেকে যায়। ১৯৮৪/৮৫ সালে কাঁচা পাট রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ১৯·৭ লাখ বেল থেকে বাড়িয়ে ২১ লাখ বেল ধরা হয়েছিল। কিন্তু কাঁচা পাট উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণে সে বছর রপ্তানি ১৪ লাখ বেলে নেমে আসে। রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫·৩০ কোটি ডলার। সেস্থলে প্রকৃত রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০·২০ কোটি ডলার। পাটজাত পণ্য রপ্তানি বাণিজ্যেও ঘাটতি ছিল মারাত্মক। সেক্ষেত্রে ৫১·৩০ কোটি ডলারের রপ্তানী আয়ের লক্ষ্যমাত্রায় ১০·৫০ কোটি ডলার ঘাটতি থেকে যায়। অন্যদিকে পরিমাণের দিক থেকে ৫·৯ লাখ টন লক্ষ্যমাত্রায় ঘাটতির পরিমাণ হয় ১·১ লাখ টন। হিমায়িত খাবার ও তৈরী পোষাক থেকে প্রাপ্ত রপ্তানি আয়ের পরিমাণ তাদের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

৮। প্রাথমিক পণ্যের স্থলে তৈরী পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে যোজিত আয় বাড়ানোর পর পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপ করা হলেও বাস্তবে বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। মোট রপ্তানী বাণিজ্যে তৈরী পণ্যের অংশ ১৯৭৯/৮০ সালের ৬৯·২% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৬৬·১% নেমে আসে। পরিকল্পনাকালে তৈরী পণ্যের বাণিজ্য মূল্যের দিক থেকে বৃদ্ধি পেলেও তার প্রবৃদ্ধির হার প্রাথমিক পণ্যের পিছনে পড়ে যায়। প্রাথমিক পণ্য রপ্তানীতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭% এ উন্নীত হয়, অন্যদিকে তৈরী পণ্যের ক্ষেত্রে এই হার ছিল মাত্র ৪%। মোট রপ্তানী বাণিজ্যে তৈরী পণ্যের অংশ বৃদ্ধি পায় একই সময়ে ৩০·৮% থেকে ৩৩·৯%।

৯। ভিত্তি বছরের তুলনায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত বাণিজ্যিক রপ্তানির চিত্র নীচের সারণীতে দেওয়া হলো :

সারণী ২

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাণিজ্যিক রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অবস্থা

(১৯৭৯/৮০ এফ, ও, বি মূল্যে)

(মিলিয়ন ডলার)

	পণ্য	একক	১৯৭৯/৮০		১৯৮৪/৮৫ লক্ষ্যমাত্রা		১৯৮৪/৮৫ প্রকৃত	
			পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১।	কাঁচা পাট ..	লাখ বেল	১৯·৬৮	১৪৩	২১	১৫৩	১৪·০৮	১০২
২।	পাটজাত পণ্য ..	'০০০' টন	৪৫৬	৩৮৭	৫৯০	৫১৩	৪৮০	৪০৮
৩।	চা	মিলিয়ন কেজি	২৩·৮৮	৩৩	৩৫·৩৮	৪৯	২৫·৮৫	৩৫
৪।	চামড়া	মিলিয়ন এসএফটি	৮২·৮৬	৬৫	..	১১৫	৮০·৮৭	৬৪
৫।	হিমায়িত খাদ্য ..	মিলিয়ন পাঁউণ্ড	১১·৮৯	৩৭	..	৯৩	৪৩·৯৪	১৩৭
৬।	ফল, শাকসব্জী ও মসলা	..	..	২	..	৯	..	৬
৭।	ন্যাপথা ও ফার্নেস তৈল	..	..	২৩	..	৩৫	..	২৬
৮।	কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট	..	..	১১	..	১৭	..	৮
৯।	তৈরী পোষাক ..	..	..	১	..	৪৫	..	১১০
১০।	হস্তশিল্প সামগ্রী ..	..	..	৩	..	৬	..	২
১১।	অন্যান্য	..	..	১৬	..	৬০	..	১৯
		মোট : ..	..	৭২১	..	১,০৯৫	..	৯১৭

আমদানি প্রবৃদ্ধি

১০। স্বল্প পুঁজির কোন উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে আমদানির খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। খাদ্য ঘাটতিসহ বহু প্রাকৃতিক সম্পদ ঘাটতির কারণে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ। সুতরাং পরিকল্পনায় আমদানি দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়, কিন্তু প্রথম দু'বছরে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ যা ধরা হয়েছিল তা না আসায় আমদানির লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করে পুনঃ সংশোধন করা হয়। আনুমানিক হিসেবে প্রকৃত আমদানি মূল্যের পরিমাণ ছিল ১৯,২৭০ কোটি টাকা বা ১,২৪৩'২০ কোটি ডলার (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্য অনুসারে)। এই অর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ১৭,৮০২ কোটি টাকার (১,১৪৮'৫০ কোটি ডলার) চেয়ে ৮'২ শতাংশ বেশী। বর্তমান মূল্যেও মোট আমদানির মূল্য ৮'৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১,২৪৫'৭০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। মূল্যের দিক থেকে চলতি ও স্থির উভয় দর অনুসারেই আমদানির যে বৃদ্ধি হয়েছে তা প্রধানতঃ খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য আমদানি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী হওয়ার কারণে। বার্ষিক ০'৩ শতাংশ আমদানি বাড়ানোর যে নগণ্য প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনায় আশা করা হয়েছিল সেখানে প্রকৃত হিসেবে বার্ষিক গড়পড়তা ৪'৫ শতাংশ হারে আমদানি বৃদ্ধি থেকেও উপরোক্ত কথাটি প্রমাণিত হয়।

১১। প্রধানতঃ অব্যাহত খাদ্য আমদানির কারণে আমদানি কাঠামোর এই তাৎপর্যবহ পরিবর্তন ঘটেছে। পরিকল্পনাকালে আবহাওয়াগত কারণে খাদ্যোৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় প্রান্তিক বছরের মধ্যে খাদ্যশস্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের প্রকৃত আমদানি ৮৮ লাখ টনে উন্নীত হয়। এই পরিমাণ পরিকল্পনাকালের ৬৪ লাখ টনের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৮ শতাংশের মতো বেশী। অব্যাহত খরা এবং উপর্যুপরি বন্যার কারণে আউশ, আমন ও বোরো শস্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়। একারণে উল্লেখিত বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। বিপর্যয় এড়ানো, খাদ্য বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং যুক্তিসংগত নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য আমদানিরও প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ১৯৮৪/৮৫ সালের খাদ্য আমদানি পরিমাণগত দিক থেকে প্রায় ১৯৭৯/৮০ সালের পর্যায়েই থেকে যায়। পরিকল্পনার ভিত্তি ও প্রান্তিক উভয় বছরেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুণ এরূপ হয়েছে।

১২। পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল গড়ে বার্ষিক ৫'৫% হারে খাদ্য বহির্ভূত আমদানি বাড়ানো। খাদ্য বহির্ভূত আমদানির অর্জিত প্রবৃদ্ধি ছিল আক্ষরিক হিসেবে ৪'৭% এবং প্রকৃত ৬'৩%। তবে খাদ্য বহির্ভূত আমদানির মোটমূল্য ভিত্তি বছরের চেয়ে প্রান্তিক বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশী ছিল। গত কয়েক বছরে প্রকল্প সাহায্য প্রকৃত ও আক্ষরিক উভয় হিসেবেই বেড়েছে এবং মূলধন পণ্য আমদানিও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। চিনির মত কিছু গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় এবং এর ফলে এসব পণ্য ওয়েজআর্ণার স্কীমের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে আমদানি করার কারণে প্রধানতঃ ভোগ্যপণ্যের আমদানি তার লক্ষ্যমাত্রার স্তর অতিক্রম করে যায়। শিল্পখাতে ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় মাধ্যমিক পণ্য আমদানিও লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে যায়। খাদ্য বহির্ভূত মোট আমদানির মধ্যে মাধ্যমিক পণ্য, মূলধন পণ্য ও ভোগ্যপণ্য আমদানির শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ৫২%, ৩০% ও ১৮% যা পরিকল্পনায় ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ৫১%, ৩১% ও ১৮% এর খুবই কাছাকাছি। প্রকল্প সাহায্যের ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান অগ্রাধিকারসহ সম্পদের অপ্রতুলতার দরুণ আমদানি কাঠামোর পরিবর্তন সাধনের কারণে খাদ্য বহির্ভূত মোট আমদানির ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পণ্য ও ভোগ্যপণ্যের আনুপাতিক হার হ্রাস পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে যথাক্রমে ৫২% ও ১৯% এ দাঁড়ায়। ১৯৭৯/৮০ সালে এই হার ছিল ৫৩% ও ২০%। অন্যদিকে উৎপাদনমূলক বিনিয়োগ পর্যায়ে কিছু উন্নতি হওয়ায় এই সময়ে মূলধন পণ্য আমদানি ২৭% থেকে বেড়ে ২৯% হয়। খাদ্যশস্য, ভোজ্যতেল, তুলা, সিমেন্ট ইত্যাদি পণ্যের আমদানি বিকল্প ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অগ্রগতি খুবই কম হলেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের দ্বারা আমদানিকৃত

তরল জ্বালানীর দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্য বিশেষভাবে অর্জিত হয়েছে। পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ব্যবহার ১৯৭৯/৮০ সালের ১৫·৭০ লাখ টন থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৩·৯০ লাখ টনে নেমে আসে। বিনিয়োগ তৎপরতা মন্থর হয়ে আসার ফলে সার, ভোজ্যতেল, সুতা ও বস্ত্র ছাড়া অন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের আমদানি তাদের লক্ষ্যমাত্রার স্তরের অনেক নীচে থেকে যায়। বিনিয়োগ তৎপরতার মন্থরতা এবং সেই সংগে বন্যা ও খরার কারণে কৃষি আয়ের লোকসান পণ্য আমদানির চাহিদা দুর্বল করে দেয়।

১৩। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক পণ্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অবস্থার সাথে ভিত্তি বছরের তুলনামূলক চিত্র নীচের সারণীতে দেখানো হলো :

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
পরিসংখ্যান ভবন ...

সারণী ৩

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাণিজ্যিক পণ্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অবস্থা
(১৯৭৯/৮০ সি,আই, এফ মূল্যে)

(মূল্য কোটি ডলারে)

পণ্য	একক	১৯৭৯/৮০		১৯৮৪/৮৫			
				লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। খাদ্যশস্য ..	লাখ টন	২৮	৬২·৩	৬	১২·৫	২৬	৫৮·১
২। ভোজ্যতেল ..	'০০০'টন	৭৮	৩·৯	১১৫	১০·৩	১১৬	১২·৮
৩। তৈলবীজ ..	'০০০'টন	২৪	০·৮	৩৮	১·৪	২৮	১·০
৪। পেট্রোলজাত সামগ্রী	,,	৪৭৪	১২·৮	৪৬০	১২·৪	৬৩৪	১৭·২
৫। অপরিশোধিত পেট্রোল	,,	১২৭৭	২৫·৬	১,৪০০	২৮·১	৯৮৫	১৯·৭
৬। তুলা (প্রধান তত্তসহ)	'০০০'বেল	১৮২	৫·৭	৪১৫	১৩·৩	২৪৬	৭·৭
৭। তুলা ও সিনথেটিক সুতা	লাখ পাউণ্ড	৭২	১·১	১১০	২·৪	৫৬০	৮·৭
৮। টেক্সটাইল ..	..	..	৩·৪	...	৩·১	..	৪·৬
৯। সার ..	'০০০'টন	৫৭৬	১৩·৪	৪২০	৯·৭	৬৬৬	১৫·৫
১০। সিমেন্ট ..	'০০০'টন	৪৮৬	৩·৬	৯০০	৬·৭	৭১১	৫·৩
১১। মূলধন পণ্য ..	..	..	৪৭·৫	..	৭৯·৪	..	৬৬·৫
১২। অন্যান্য ..	..	..	৫১·৬	..	৬১·২	..	৭৮·৭
	মোট	..	২,৩৬·৬	..	২,৩৯·৯	..	২,৯৫·০

বাণিজ্যিক হার

১৪। পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরে পণ্য বাণিজ্যিক হারের ক্ষেত্রে দ্রুত অবনতি ঘটে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর দীর্ঘস্থায়ী মন্দার প্রেক্ষাপটে দুর্বল আন্তর্জাতিক চাহিদার কারণে কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানী উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যাওয়াই হচেছ পণ্য বাণিজ্যিক হারের অবনতির প্রধান কারণ। চামড়া ও হিমায়িত খাদ্যের মতো অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্য এবং কাগজ ও নিউজপ্রিন্টের মতো কিছু শিল্প পণ্যের বাজার-দরও পড়ে যায়। সার্বিক রপ্তানীর সূচক মূল্য ৫.২% হ্রাস পেয়েছে এবং এর সাথে গড় আমদানী মূল্যে (প্রধানতঃ তেলের দর বৃদ্ধির কারণে) ১২.৫% বৃদ্ধি মিলে পরিকল্পনাকালে বাণিজ্যিক হারে আরো অবনতি ঘটেছে। বাণিজ্য হার ১৯৮০/৮১ ও ১৯৮১/৮২ সালে দ্রুত অবনতি ঘটায় বাণিজ্য হার প্রায় ৪০% কমে যায় এবং ১৯৮২/৮৩ সালে পরিস্থিতির মোড় পরিবর্তিত হয়। বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে ১৯৮৪/৮৫ সালের শেষ নাগাদ পরিস্থিতি বেশ অনুকূলে চলে আসে।

১৫। ১৯৭৯/৮০ থেকে বাংলাদেশের আমদানী ও রফতানী মূল্যসূচক এবং বাণিজ্যিক হার নীচের সারণীতে দেখানো হলো :

সারণী ৪

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক হার
(১৯৭২/৭৩=১০০)

বছর			আমদানি মূল্যসূচক	রপ্তানি মূল্য সূচক	বাণিজ্যিক হার
১৯৭৯/৮০	..	..	৩০০.২ (২৭.২)	২১১.৩ (১৬.০)	৭০.৪
১৯৮০/৮১	..	..	৩৫২.৬ (১৭.৫)	১৮১.২ (—১৪.২)	৫১.৪
১৯৮১/৮২	..	..	৩৬৮.১ (৪.৪)	১৫৫.৫ (—১৪.২)	৪২.২
১৯৮২/৮৩	..	..	৩৪৯.৫ (—৫.১)	১৬৩.১ (৪.৯)	৪৬.৭
১৯৮৩/৮৪	..	..	৩৩৯.৩ (—২.৯)	১৯৩.২ (১৮.৫)	৫৬.৯
১৯৮৪/৮৫ (প্রাক্কলিত)	..	..	৩৩৯.১ (—০.০৬)	২২৪.৮ (১৬.৪)	৬৬.৩

টীকা: (১) বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা বার্ষিক শতকরা পরিবর্তনের নির্দেশক

(২) মূল্যসূচকের হিসেবে ১৯৮৪/৮৫ সালের পরিমাণ-মূল্য ধরা হয়েছে।

গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ

১৬। পরিকল্পনার মেয়াদকালের শেষ নাগাদ প্রবাসী শ্রমিকের মোট সংখ্যা ৩'৪ লাখ এবং তাদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ প্রকৃত হিসেবে ২৩৩ কোটি ডলার হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল। প্রকৃত শ্রমিক সংখ্যা ও তাদের রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ লাখ এবং ২৩৮'৩০ কোটি ডলার (চলতি মূল্যে)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রবাসী শ্রমিকদের সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রায় ১২% ঘাটতি রয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম অর্ধাংশের রেমিট্যান্স এর হার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং প্রধানতঃ বিদেশ গমনের উচ্চ হারের কারণে ১৯৮২/৮৩ সালে রেমিট্যান্স সর্বোচ্চ ৫৯'৮০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়। কিন্তু তখন থেকেই তেলের দর ও তেল উৎপাদন পড়ে যাওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে উন্নয়ন তৎপরতা মন্থর হয়ে আসে এবং এর ফলে শ্রমিকদের বিদেশ গমন ও সেই সংগে 'রেমিট্যান্স' কমতে শুরু করে।

১৭। মধ্যপ্রাচ্যে উন্নয়ন তৎপরতা মন্থর হয়ে আসায় প্রবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তাদের চাহিদা দক্ষ শ্রমিকদের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়। বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পাশাপাশি 'রেমিট্যান্স' প্রবাহ নীচের সারণীতে দেখানো হলো ঃ

সারণী ৫

বিদেশ গমন এবং শ্রমিকদের 'রেমিট্যান্স'

বছর	প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ('০০০)	রেমিট্যান্স (কোটি ডলার)
১৯৮০	৩১	৩৩'৯
১৯৮১	৫৬	৩৮'২
১৯৮২	৬৩	৫৩'১
১৯৮৩	৫৯	৬৪'২
১৯৮৪	৫৭	৪৯'৯
১৯৮৫ (জানুয়ারী-জুন)	৩৬	২২'১

বিনিময় হার এবং বাণিজ্যের ওপর এর প্রতিক্রিয়া

১৮। রপ্তানি বাড়ানো এবং আমদানি ও দায়-পরিশোধ তার আয়ত্তে রাখার জন্যে একটি বাস্তবভিত্তিক বিনিময় হার নীতি বজায় রাখা প্রয়োজন। এই লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ তার প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারদের মুদ্রার তুলনায় টাকার মূল্যমান নির্ধারণ করে ১৯৭৯ এর মাঝামাঝি থেকে একটি নমনীয় বিনিময় হার নীতি অনুসরণ করে আসছে। বিনিময় হারের ক্ষেত্রে পাউণ্ড-ষ্টার্লিংয়ের মানের সাপেক্ষে টাকার মান নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু আপেক্ষিক বাণিজ্য গুরুত্ব ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লেনদেনের ধারা অনুযায়ী ১৯৮৩ সালের গোড়া থেকেই ডলারকে টাকার মান নির্ধারণের চাবিকাঠি হিসাবে ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলে ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার দেশসমূহের মুদ্রার মানের হ্রাস বৃদ্ধির সাথে বিনিময় হারের একটি মোটামুটি পর্যায়ক্রমিক সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

এই সমন্বয় সাধন পদ্ধতি গ্রহণের ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে টাকার বিনিময় মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে পড়ে যায়। ১৯৭৯/৮০ সালের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে ডলারের সাথে টাকার বিনিময় মূল্য প্রায় ৬৮·৪ শতাংশ পড়ে যায়। ১৯৭৯/৮০ সালে টাকা-ডলার বিনিময় হার ছিল ১৫·৫০ টাকা; ১৯৮৪/৮৫ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ২৬·০০ টাকায় দাঁড়ায়।

১৯। টাকার মূল্যমানে ৬৮·৪% অবনতির পাশাপাশি প্রকৃত হিসেবে রপ্তানি পরিকল্পনা লক্ষ্য-১৮·৭ শতাংশের স্থলে বেড়েছে ৪·৯ শতাংশ। টাকার বিনিময় মূল্যের অবনতি রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়, যদিও তিনটি প্রধান কারণের দরুন ব্যাপকভাবে তা সম্ভব হয়নি। প্রথমতঃ উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক মন্দার কারণে চাহিদা সংকোচন। দ্বিতীয়তঃ মন্থর বিনিয়োগের কারণে অর্থনীতির নিম্ন পর্যায়ে বাণিজ্যের অনুকূলে উৎপাদন কাঠামোর সমন্বয় সাধন সহজসাধ্য ছিল না। তৃতীয়তঃ পরিকল্পনাকালে মোটামুটি হিসেবে টাকার মান ৬৮·৪% পড়ে গেলেও রপ্তানির ওপর মুদ্রামানের এই অবনতির প্রতিক্রিয়া আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতির কারণে অংশতঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ধারণা করা হচ্ছে, আক্ষরিক হিসেবে ১৯৮৩/৮৪ সালে বিনিময় হার ডলার প্রতি ২৪·৯ টাকা থাকলেও মূল্য হ্রাসকৃত ও বাণিজ্য গুরুত্ব প্রয়োগে প্রকৃত বিনিময় হার ছিল মাত্র ১৫·৭ টাকা। সুতরাং এই সময়ে আক্ষরিক বিনিময় হারের অবনতি যখন ছিল ৬১% তখন অবনতির প্রকৃত হার ছিল মাত্র ২১%। সীমিত উদ্যোগ ও সেই সংগে কর সুবিধার কারণে অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি সংগঠিত খাতসমূহের রপ্তানির তুলনায় অধিকতর নমনীয় হয়ে উঠে এবং মূল্য ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই লাভজনক হয়। অন্যদিকে টাকার মূল্য পড়ে যাওয়ার ফলে আমদানি ব্যয়বহুল হয়ে যায় এবং এটি আমদানির চাহিদাকে দুর্বল করে ফেলে। স্বীকার করতে হবে যে, বিনিয়োগ সম্পদকেও বর্ধিত হারে উৎপাদনের দিকে পরিচালিত না করলে শুধুমাত্র মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস করে অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি আরো সম্প্রসারিত করা যেতে পারেনা। চিংড়ি রপ্তানি ঠিক এ ধরনের একটি দৃষ্টান্ত। আরো উল্লেখ্য যে, বিশ্ব বাজারে একটি ক্ষুদ্র হিস্যার অধিকারী হয়ে বাংলাদেশ মূলতঃ একটি মূল্য গ্রহণকারী দেশে পরিণত হয়েছে এবং এ কারণে রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তার প্রচেষ্টার সাফল্য বহুলাংশে মান ও দামের দিক থেকে তার উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতা ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। একটি মূল্য গ্রহণকারী দেশের জন্যে অন্য দিকটি হলো আমদানির মূল্য। টাকার অবমূল্যায়ন বাণিজ্য বিনিময় হারের প্রতিকূল অবস্থার একটি অন্যতম কারণ এবং এর ফলে রপ্তানির তুলনায় আমদানি খরচ বেড়ে গেছে।

বৈদেশিক সাহায্য

২০। পরিকল্পনায় চলতি মূল্যে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৬৮৯·৭০ কোটি ডলার, কিন্তু প্রকৃত প্রাপ্তির পরিমাণ হলো ৬১৫·৩০ কোটি ডলার। এর ফলে আক্ষরিক হিসেবে বৈদেশিক সাহায্যে প্রায় ১০·৮% ঘাটতি থেকে যায়। কিন্তু আমদানি মূল্যে পরিবর্তনের কারণে পরিকল্পনায় প্রত্যাশিত ৬০৯·৪০ কোটি ডলারের স্থলে ১৯৭৯/৮০-র মূল্য অনুসারে বৈদেশিক সাহায্য ৬২৬·৩০ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। পরিকল্পনায় খাদ্য, পণ্য ও প্রকল্প খাতে সাহায্য পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল যথাক্রমে ১০৬·৪০ কোটি ডলার, ২৪০·৯০ কোটি ডলার, ৩৪২·৪০ কোটি ডলার; সেক্ষেত্রে মোট প্রাপ্তির মধ্যে খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ১২০·২০ কোটি ডলার, পণ্য সাহায্যের পরিমাণ ২১২·৯০ কোটি ডলার এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ২৮২·২০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে (সকল পরিসংখ্যান চলতি মূল্য অনুসারে)। পণ্য ও প্রকল্প সাহায্য খাতে প্রকৃত প্রাপ্তি তাদের লক্ষ্যমাত্রার যথাক্রমে প্রায় ১২% ও ১৮% নীচে থাকে। কিন্তু শস্য উৎপাদন ব্যাহত হবার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলার কারণে অধিকতর খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হওয়ায় খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছাড়িয়ে যায়। তবে মোট খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির শতকরা হারের দিক থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে এই হার যেখানে ছিল ৩০·৬%, ১৯৮৪/৮৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে ১৮·৬%-এ নেমে এসেছে। কিন্তু একই সময়ে প্রকল্প সাহায্যের ক্ষেত্রে এই হার ৩৮·৪% থেকে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে ৪৯·২% এবং পণ্য

সাহায্যের ক্ষেত্রে ৩০·৯% থেকে বেড়ে ৩২·২%-এ উন্নীত হয়েছে। অতএব প্রকল্প সাহায্য বৃদ্ধির দ্বারা বহুলাংশে খাদ্য সাহায্য হ্রাসের ক্ষতিপূরণ হয়েছে। এটি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রকল্প গ্রহণের সমস্যার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এবং প্রকল্প সাহায্য পাইপ লাইন নির্মাণে কাজে লেগেছে। সাহায্যের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় পুনঃভরনযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের দরুন কেবল আংশিকমাত্র লাভ হয়েছে। মোট প্রকল্প সাহায্যের মধ্যে ১৯৮৪/৮৫ সালে এই পুনঃভরনযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৬·৫% (১৭·২০ কোটি ডলার)।

২১। পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশে বৈদেশিক সহায়তার পাইপ লাইন, প্রতিশ্রুতি ও প্রাপ্তি নীচের সারণীতে দেখানো হলো :

সারণী ৬

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও প্রাপ্তি

(চলতি ডলার মূল্যে)

(মিলিয়ন ডলারে)

বছর	খাদ্য সাহায্য	পণ্য সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	মোট
১৯৭৯/৮০				
উদ্বোধনী পাইপ লাইন	১৫৪·৭	৪৯১·৯	১,৮৭৪·৬	২,৫২১·২
নতুন প্রতিশ্রুতি	২৭০·০	২৮৫·৩	৫৯৭·৯	১,১৫৩·২
মোট প্রাপ্তব্য	৪২৪·৭	৭৭৭·২	২,৪৭২·৫	৩,৬৭৪·৪
মোট প্রাপ্তি	৩৭৪·৭	৩৭৮·৫	৪৬৯·৯	১,২২৩·১
১৯৮০/৮১				
উদ্বোধনী পাইপ-লাইন	৫০·০	৩৯৮·৭	২,০০২·৬	২,৪৫১·৩
নতুন প্রতিশ্রুতি	২০২·৯	৩৫৪·৯	১,০০১·৫	১,৫৫৯·৩
মোট প্রাপ্তব্য	২৫২·৯	৭৫৩·৬	৩,০০৪·১	৪,০১০·৬
মোট প্রাপ্তি	১৯৪·১	৩৯২·৫	৫৫৯·৯	১,১৪৬·৫
১৯৮১/৮২				
উদ্বোধনী পাইপ-লাইন	৫৮·৮	৩৬১·১	২,৪৪৪·২	২,৮৬৪·১
নতুন প্রতিশ্রুতি	২২০·৬	৫১৩·০	১,১৮৯·৩	১,৯২২·৯
মোট প্রাপ্তব্য	২৭৯·৪	৮৭৪·১	৩,৬৩৩·৫	৪,৭৮৭·০
মোট প্রাপ্তি	২৩০·৫	৪১৯·৮	৫৮৯·৩	১,২৩৯·৬

সারণী ৬—(ক্রমশঃ)

(মিলিয়ন ডলারে)

বছর			খাদ্য সাহায্য	পণ্য সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	মোট
১৯৮২/৮৩						
উদ্বোধনী পাইপ-লাইন	..	..	৪৮.৯	৪৫৪.৩	৩,০৪৪.২	৩,৫৪৭.৪
নতুন প্রতিশ্রুতি	..	..	২৪৮.৩	৪৭৪.৪	৭৯৯.৮	১,৫২২.৫
মোট প্রাপ্তব্য ..	..	..	২৯৭.২	৯২৮.৭	৩,৮৪৪.০	৫,০৬৯.৯
মোট প্রাপ্তি	..	..	২৫৫.৫	৪৫২.০	৪৬৯.৯	১,১৭৭.৪
১৯৮৩/৮৪						
উদ্বোধনী পাইপ-লাইন	..	..	৪১.৭	৪৭৬.৭	৩,৩৭৪.১	৩,৮৯২.৫
নতুন প্রতিশ্রুতি	..	..	২৮৫.২	৫২৮.২	৮৮১.৭	১,৬৯৫.১
মোট প্রাপ্তব্য ..	..	..	৩২৬.৯	১,০০৪.৯	৪,২৫৫.৮	৫,৫৮৭.৬
মোট প্রাপ্তি	..	..	২৭৬.৪	৪৩৯.২	৫৫২.৮	১,২৬৮.৪
১৯৮৪/৮৫						
উদ্বোধনী পাইপ-লাইন	..	..	৫০.৫	৫৬৫.৭	৩,৭০৩.০	৪,৩১৯.২
নতুন প্রতিশ্রুতি	..	..	৩৮০.৭	২৪৯.৯	১,৩৪২.৩	১,৯৭২.৪
মোট প্রাপ্তব্য [1] ..	..	..	৪৩০.৭	৮১৫.৬	৫,০৪৫.৩	৬,২৯১.৬
মোট প্রাপ্তি	..	..	২৪৬.০	৪২৫.০	৬৫০.০	১,৩২১.০
১৯৮০—৮৫						
উদ্বোধনী পাইপ-লাইন	..	..	২৪৯.৯	২,২৫৬.৫	১৪,৫৬৮.১	১৭,০৭৪.৫
নতুন প্রতিশ্রুতি	..	..	১,৩৩৭.২	২,১২০.৪	৫,২১৪.৬	৮,৬৭২.২
মোট প্রাপ্তব্য ..	..	..	১,৫৮৭.১	৪,৩৭৬.৯	১৯,৭৮২.৭	২৫,৭৪৬.৭
মোট প্রাপ্তি	..	..	১,২০২.০	২,১২৯.০	২,৮২২.০	৬,১৫৩.০

টীকা: ১৯৮৪/৮৫-এর হিসাব সাময়িক

ঋণ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব

২২। প্রাথমিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ প্রধানতঃ মঞ্জুরী এবং সুবিধাজনক ঋণের আকারে বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু সময়ের প্রবাহে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাহায্যের বৃহত্তর অনুপাত ঋণে জুড়ে আছে। ১৯৮৫-এর ৩০শে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রায় ৬৪৪ কোটি ডলার ঋণ লাভ করেছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৬২ কোটি ৬০ লাখ ডলার পরিশোধ করেছে এবং প্রায় ৫৪ কোটি ৬০ লাখ ডলার ঋণ মওকুফ পেয়েছে। এতে ১৯৮৫-এর ৩০শে জুন বাংলাদেশের বকেয়া ঋণের দায় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫২৬ কোটি ৮০ লাখ ডলার। যদিও চূড়ান্ত মূল্যে অথবা জাতীয় আয়ের তুলনায় ঋণ দায়ের এই পরিমাণ বড় বলে মনে হয় না, তবু এটা দেশের স্বল্প রপ্তানি আয়ের উপর এক বিরাট বোঝা হয়ে আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের ঋণ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব এবং রপ্তানি আয়ের সংগে এর অনুপাত নীচের সারণীতে দেখানো হলো :

সারণী ৭

বাংলাদেশের ঋণ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব
(১৯৮০—৮৫)

(মিলিয়ন ডলারে)

বছর			সুদ	আসল	মোট	মোট রপ্তানি আয়	ঋণ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব মোট রপ্তানি আয়ের % হিসাবে।
১৯৭৯/৮০	..	..	৪৩'৩	৫০'৩	৯৩'৬	৭২৯'০	১৩'০
১৯৮০/৮১	..	..	৪১'৭	৪৯'৬	৯১'৩	৭১১'০	১২'৮
১৯৮১/৮২	..	..	৪৭'২	৩৯'৭	৮৬'৯	৬২৬'০	১৩'৯
১৯৮২/৮৩	..	..	৪৮'৯	৭৩'৮	১২২'৬	৬৮০'৩	১৮'০
১৯৮৩/৮৪	..	..	৬৪'০	১০৪'২	১৬৮'২	৭৮৬'৩	২১'৪
১৯৮৪/৮৫ (প্রাক্কলিত)	..	..	৭২'২	১২৪'৬	১৯৬'৯	৯৩৯'০	২১'০

টীকা: আইএমএফ সুবিধাদি বাদে।

২৩। আক্ষরিক অর্থে ৫'৫% রপ্তানি আয় বৃদ্ধির বিপরীতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ঋণ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব বেড়েছে গড়ে বার্ষিক ১৬% হারে। এতে করে আন্তর্জাতিক ঋণ পরিশোধের কারণে দেশের ক্ষমতার উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। পুরানো ঋণসমূহ পরিশোধের সময় আসলে এ চাপ তীব্র আকার ধারণ করবে। ১৯৭৩/৭৪ সালে ১ কোটি ৭৫ লাখ ডলারের একটি ছোট অংক দিয়ে পরিশোধের পালা শুরু হয়। ১৯৭৯/৮০ সালে তা ৯ কোটি ৩৬ লাখ ডলারে এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে তা ১৯ কোটি ৬৯ লাখ ডলারে বৃদ্ধি পায়। রপ্তানী আয় ও ঋণ পরিশোধের অনুপাত ১৯৭৯/৮০ সালের ১৩% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২১% এ বৃদ্ধি পায়। ঋণ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব দ্রুত বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সাহায্য ক্রমবর্ধমান-ভাবে ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

লেন-দেন ভারসাম্যের কৌশলাদি

২৪। লেন-দেনে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবধান এবং অদূর ভবিষ্যতে বৈদেশিক সাহায্য উন্নয়নের সীমিত সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে লেন-দেন ভারসাম্য পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এমনসব কৌশলাদি অব্যাহত রাখতে হবে যাতে পরিকল্পনা কালে যে পরিমাণ সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে এই ব্যবধান সীমিত রাখা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ (প্রাপ্তি) ১৯৭৯/৮০-এর ১২২ কোটি ৩০ লাখ ডলার থেকে প্রকৃত অর্থে ১৯৮৪/৮৫-তে ১৪৩ কোটি ৯০ লাখ ডলারে দাঁড়ায়। এতে বার্ষিক বৃদ্ধির হার হচ্ছে ৩.৩%। যদিও এসময়ে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ছিল অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় সাহায্যের জন্য নিম্নতর বৃদ্ধির হার (৩.১%) ধরা হয়েছে। দেশের অর্থনীতির উপর বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে প্রদত্ত চিত্রের তুলনায় এটা রক্ষণশীল হিসাব। মৌলিক আমদানির জন্য দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় সাহায্যের এই প্রদত্ত চিত্রের প্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলসমূহের মধ্যে থাকবে রপ্তানি বৃদ্ধির গতি বাড়ানো, প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তিতে আমদানির আরও বিকল্প সৃষ্টির সুযোগের সদ্ব্যবহার এবং বিদেশে চাকুরী ও দেশে অর্থ প্রেরণের ব্যাপারে উৎসাহ দান। রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু সময়ের জন্য প্রাথমিক পণ্যের প্রাধান্য অব্যাহত থাকবে। কারণ উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির অংশ বৃদ্ধিকল্পে যে কোন উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য একটি প্রারম্ভিক প্রস্তুতিকালের প্রয়োজন হবে। অবশ্য রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ জোনের ভিতরে ও বাইরে কতিপয় রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিটের কাজ শেষ হবার পর মোট রপ্তানিতে উৎপাদিত সামগ্রীর অংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। চট্টগ্রামে বিদ্যমান একটি ছাড়াও ঢাকা এবং খুলনা বিমানবন্দরের আশেপাশে আরও দু'টি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ জোন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বিবেচিত দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন কাঠামোর আওতায় রপ্তানি উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের কর্মসূচীসমূহ হাতে নেয়ার পাশাপাশি হিমায়িত মৎস্য, সব্জী, তৈরী পোষাক, চামড়া, পাট, পাটজাতসামগ্রী এবং চা-এর মত প্রচলিত ও অপ্রচলিত উভয় ধরণের সামগ্রীর বিদ্যমান রপ্তানির সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদের তৎপরতা জোরদার করা হবে। অপ্রচলিত সামগ্রীর মধ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তৈরী পোষাক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এই শিল্পের সাথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শ্রমিক নির্ভর উৎপাদন প্রক্রিয়া জড়িত এবং কতিপয় শ্রেণীর তৈরী পোষাকের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও এই শিল্পের প্রসার ঘটানো প্রয়োজন হবে। বৈদেশিক বাজারের চাহিদা পূরণকল্পে এর রপ্তানি সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পরিকল্পনার সময়কালে উৎপাদিত সামগ্রীর উন্নতিসাধন; বহুমুখীকরন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সম্প্রসারণ তৎপরতা হাতে নেয়া হবে। একই সংগে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হতে উন্নতমানের বস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে তৈরী পোষাক শিল্পে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। বস্ত্র রপ্তানির জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শুধুমাত্র সূতি বস্ত্র শিল্পের আমদানিকৃত তুলার খরচের অংশ মেটাতেই যে এর প্রয়োজন তা নয়, বরং বাইরের দিকে তাকানো ছাড়া এই শিল্প তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারবেনা। এই সত্যের জন্যই তা করতে হবে। উৎপাদন পরিকল্পনার মাধ্যমে সব্জী, হস্তশিল্প এবং বিশেষ ধরণের পোষাকের মত অন্যান্য অপ্রচলিত সামগ্রীর বিদ্যমান রপ্তানির সম্ভাবনা মাঝারি মেয়াদে কাজে লাগান হবে। শিল্প বিষয়ক কর্মসূচীও শ্রম নির্ভরশীল উৎপাদন এবং ইউরিয়ার মত প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক সামগ্রী কেন্দ্রীক হবে, যেখানে বাংলাদেশের তুলনামূলকভাবে সুবিধা রয়েছে।

২৫। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানি উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য সুবিধাজনক অবস্থানে শিল্পের জন্য জমি, পরিবহন ও শিপিং, বন্দর এবং গুদাম সুবিধাদির মত প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন হবে। সুবিধাজনক ঋণ, এক্সপোর্ট পারফরমেন্স বেনিফিট (এক্স পি বি), শুল্ক ফিরিয়ে দেয়া

ইত্যাদির আকারে বিদ্যমান রপ্তানি উৎসাহদান কাঠামো শীঘ্রই সমাপ্য টি আই পি সমীক্ষার তথ্যাবলীর ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে দেখা হবে এবং প্রয়োজনবোধে বেসরকারী খাতের বৃহত্তর ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি রেখে তার পুনর্বিন্যাস করা হবে। সম্ভাবনাময় প্রার্থীদের ব্যবসা ও হস্তশিল্পে কারিগরি প্রশিক্ষণ দান, নিয়োগবিধি ও চুক্তি সহজকরণ এবং টাকা পাঠানোর সুবিধাদির উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে বিদেশে বাংলাদেশী কর্মজীবীদের দেশে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে উন্নতি বিধান করা হবে, যা দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিচ্ছে। নমনীয় বিনিময় হার নীতি যা টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে সঞ্জীবনীর কাজ করেছে, তৃতীয় পরিকল্পনা কালেও অব্যাহত থাকবে। কিন্তু, এর পরও রপ্তানি নির্ভর করে আমাদের বাণিজ্যিক অংশীদারদের উপর এবং বাংলাদেশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজারসমূহে তার রপ্তানির জন্য সবচেয়ে অনুকূল জাতি হিসাবে যে সুবিধা পায় তার উপর এটা গুরুত্বরভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশ তাই শুধু যে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে বাণিজ্য উন্নয়ন উৎসাহিত করার নীতি অনুসরণ করবে তা নয়, বরং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেও তা করবে এবং এই লক্ষ্যে আংকটাড, সার্ক এবং এসকাপের মত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ফোরামে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে।

২৬। রপ্তানি কেবলমাত্র আমদানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় মিটায় বিধায় উপরের বর্ণনা মোতাবেক রপ্তানি উন্নয়ন দেশের লেন-দেন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে চাপ সহজ করার ব্যাপারে যথেষ্ট হবেনা; তাই, রপ্তানি উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি আমদানি সীমিত রাখার চেষ্টা করতে হবে যাতে আমদানি-রপ্তানির ব্যবধান সহের সীমা ছাড়িয়ে না যায়। এর জন্য আমদানির বিকল্প উদ্ভাবনের কর্মসূচী এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানি সীমিত করার নীতি গ্রহণ করতে হবে। খাদ্য, পিওএল, ইউরিয়া সার ও সুতীবস্ত্রের মত প্রতিস্থাপনযোগ্য আমদানির আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে আমদানির বিকল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। খাদ্যশস্য, ভোজ্যতেল, তুলা, তুলাজাত সামগ্রী, সিমেন্ট, ঔষধপত্র, ধাতব ও ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রীর মত পণ্যের আমদানি প্রতিস্থাপন করে কৃষি ও শিল্প উভয় খাতে এখনও আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার সময়কালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন পরিকল্পনার একটি প্রধান লক্ষ্য এবং খাদ্য আমদানি শুধুমাত্র খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ও কল্যাণকর কাজের নিমিত্তে দুঃস্থ মাতাদের জন্য খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে। প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তিতে বেড়ে উঠার সুযোগ রয়েছে এমন আভ্যন্তরীণ শিল্পকে প্রাথমিক অবস্থায় অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করা হবে। কোন্ কোন্ শিল্পে দেশ তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে টিআইপি সমীক্ষা তা ঠিক করতে সাহায্য করবে এবং আভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজারের জন্য এসব শিল্পের বিকাশ ঘটানো হবে।

২৭। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বৈদেশিক সাহায্য আত্মীকরণ এর জন্য আমদানি প্রয়োজন। সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান মোকাবেলার জন্য পরিকল্পনায় ৩.১% বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধি ধরা হয়েছে। জাতীয় আয়ের শতকরা হিসাবে বিনিয়োগ ১৯৮৪/৮৫ সালের ১৭.৩% হতে ১৯৮৯/৯০ সালে ১৯.০% এ এবং সঞ্চয় ১৯৮৪/৮৫ সালের ৭.০% হতে ১৯৮৯/৯০ সালে ৯.৩% এ বাড়বে বলে ধরা হয়েছে। ১৯৮৪/৮৫-তে আমদানির প্রায় ৪৩% এর অর্থ যোগানো হয়েছিল সাহায্য, তথা পুনঃভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য থেকে। লেন-দেন ভারসাম্যে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবধান পুষিয়ে নিতে বাংলাদেশকে অব্যাহতভাবে বৈদেশিক সূত্র থেকে বর্ধিত হারে স্থাবর সম্পদ হস্তান্তরের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। প্রবৃদ্ধির ঈপ্সিত হার অর্জন করতে হলে বিদেশ থেকে ২১,৬১৯ কোটি টাকা (৮৩১.৫০ কোটি ডলার) সাহায্য পেতে হবে যা পুনঃভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য বাদে হবে ১৯,১৩৬ কোটি টাকা (৭৩৬ কোটি ডলার)। এটা মোট ৪৪,২২৬ কোটি টাকার (১,৭০১ কোটি ডলার) আমদানির ৪৩.৩%।

২৮। পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক খাতের জন্য পরিশোধ ও প্রাপ্তির ভিত্তিতে ধার্য্য সম্পদসমূহ নীচের সারণীতে সংহত আকারে দেখানো হলো :

সারণী ৮

বৈদেশিক সম্পদের লক্ষ্যমাত্রা

(১৯৮৫—৯০)

শ্রেণী	লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৫—৯০)	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন ডলার
(ক) পরিশোধ	৪৫,৯৮৯	১৭,৬৮৮
১। আমদানি (পণ্য)	৩৮,১৬০	১৪,৬৭৭
২। অদৃশ্য	৬,০৬৬	২,৩৩৩
৩। ঋণ পরিশোধ	১,৭৬৩	৬৭৮
(খ) প্রাপ্তি	৪৩,২০৭	১৬,৬১৮
১। রপ্তানি (পণ্য)	১৩,৯৯৮	৫,৩৮৪
২। অদৃশ্য	৪,৫৬৬	১,৭৫৬
৩। রেমিট্যান্স (নীট)	৫,৮০৬	২,২৩৩
৪। বৈদেশিক সাহায্য (মোট)	১৮,৮৩৭	৭,২৪৫

নোট: এক ডলার = ২৬ টাকা

আমদানির লক্ষ্যমাত্রা

২৯। পরিকল্পনাকালে মোট বাণিজ্যিক আমদানির পরিমাণ ১৯৮৪/৮৫ সালের ২,৭০০ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ৩,১০৬ মিলিয়ন ডলারে অথবা ৭,০২০ কোটি টাকা থেকে ৮,০৭৬ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে ধরা হয়েছে। পরিকল্পনার সময়কালে মোট বাণিজ্যিক আমদানি প্রাক্কলিত হয়েছে ৩৮,১৬০ কোটি টাকা (১৪,৬৭৭ মিলিয়ন ডলার), অর্থাৎ বার্ষিক বৃদ্ধি ২.৮%। খাদ্যশস্যের আমদানি ১,৩১৮ কোটি টাকার (৫০৭ মিলিয়ন ডলার) স্তর থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ৬৭৬ কোটি টাকার (২৬০ মিলিয়ন ডলার) নেমে আসবে বলে ধরা হয়েছে। এতে খাদ্য আমদানির অংশ মোট আমদানির ১৯৮৪/৮৫ সালের ১৮.৮% থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ৮.৪% এ নেমে যাবে। খাদ্য আমদানির এই নিম্নগতি তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পর্যাপ্ত পরিমাণে অন্তর্বর্তী সামগ্রী আমদানি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। সামগ্রিক আমদানি ২.৮% হারে বাড়ার পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সামগ্রী আমদানি বাড়বে ৭% হারে এবং খাদ্যসহ মোট ভোগ্যপণ্যে আমদানি ১৯৮৪/৮৫ সালের ৩১.৫% থেকে ২২.৪% এ নেমে আসবে। পরিকল্পনায় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য বিনিয়োগ সামগ্রীর উৎপাদনের জন্য স্থানীয় ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়েছে বিধায়, অন্তর্বর্তী সামগ্রীর চেয়ে মূলধন সামগ্রীর আমদানির তুলনামূলকভাবে মন্থর বৃদ্ধি (৩.৫%) ধরা হয়েছে, তবে তা সাহায্য অন্তপ্রবাহের ৩% বৃদ্ধির উপরে থাকবে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সাহায্যের গঠনকে পণ্য সাহায্যের অনুকূলে পরিবর্তিত করতে হবে যাতে প্রকল্প সাহায্যে স্থানীয় উৎপাদনকে অংশীভূত করা যায়।

৩০। নিম্নোক্ত সারণীতে প্রধান প্রধান পণ্যের বাণিজ্যিক আমদানির চিত্রটি তুলে ধরা হল :

সারণী ৯

প্রধান প্রধান সামগ্রির বাণিজ্যিক আমদানির লক্ষ্যমাত্রা

(১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)

(মূল্য কোটি টাকায়)

সামগ্রী		ইউনিট	১৯৮৪/৮৫		১৯৮৯/৯০	
			পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। খাদ্যশস্য	..	লাখ টন	২৬	১,৩১৮	১৫	৬৭৯
(চাল)	..	(লাখ টন) ..	(৭)	(৪৫৮)	..	..
(গম)		(লাখ টন)	(১৯)	(৮৬০)	(১৫)	(৬৭৯)
২। ভোজ্যতেল		'000' টন	১৩৬	২৬৮	১১৫	২৩১
৩। তৈলবীজ	..	'000' টন	২৮	২৩	১০০	৮৪
৪। পেট্রোলিয়াম সামগ্রী		'000' টন	৬৩৪	৩৯৫	৬০০	৩৭৪
৫। অশোধিত পেট্রোলিয়াম		'000' টন	৯৮৫	৫৮৮	১,০০০	৫৯৭
৬। তুলা	..	'000' বেল	২৩৬	২০৫	৪১৫	৩৬০
৭। ষ্টেপল আঁশ	..	'000' বেল	১০	৮	১০	৮
৮। তন্তু	..	মিলিয়ন পাউন্ড	৫৬	১৫৩	৩০	৮২
৯। বস্ত্র	..	..	..	১১৭	..	১২০
১০। সার	..	'000' টন	৬৬৬	৩৫৬	১,০৪৪	৫৫৮
১১। সিমেন্ট	..	'000' টন	৭১১	৮৩	৮৯০	১০৪
১২। মূলধন সামগ্রী	..	..	..	১,৬০২	..	১,৮৮৯
১৩। অন্যান্য	..	..	..	১,৯০৪	..	২,৯৯০
মোট :			..	৭,০২০	..	৮,০৭৬

৩১। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি লক্ষ্যমাত্রা ও তাদের অনুমিত ভিত্তি নিম্নে আলোচিত হল:

(১) **খাদ্যশস্য:** তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বছরের মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন ২০৭ লাখ টন স্বয়ম্ভরতা পর্যায়ে পৌঁছানোর হিসাব ধরা হয়েছে। জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ও প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের মোট ব্যবহার ১৯৮৯/৯০ সালে ১৮৬ লাখ টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায় যা নীট সংগ্রহের সমান। কাজেই স্বাভাবিক অবস্থায় কোন খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজন নাই। কিন্তু খাদ্য পরিকল্পনার দুটো দিক রয়েছে : প্রথমতঃ জরুরী অবস্থার জন্য নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা এবং দ্বিতীয়তঃ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ও দুঃস্থ মাতাদের জন্য খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা। কাজেই এই প্রয়োজনগুলো মিটানোর জন্য খাদ্যশস্য আমদানি করতে হবে। ১৯৮৪/৮৫ সালে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণে খাদ্য আমদানি এবং অব্যাহত ঋণের বোঝার দরুন নগদ মজুদের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের আরো আমদানি অসম্ভব। কাজেই কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও দুঃস্থ মাতাদের জন্য খাদ্য কর্মসূচী অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে খাদ্য সাহায্য গ্রহণ করা হবে। পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের মোট আমদানি ৮১ লাখ টন ধরা হয়েছে, ১৯৮৯/৯০ সালে খাদ্যশস্য আমদানি ১৯৮৪/৮৫ সালের ২৬ লাখ টন থেকে ১৫ লাখ টনে নেমে আসবে।

(২) **সার:** গত কয়েক বছরে রাসায়নিক সারের ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার আওতায় ১৯৮৪/৮৫ সালের তুলনায় রাসায়নিক সারের প্রকৃত ব্যবহার ১,২৬০ হাজার টন থেকে প্রায় ১,৮৫০ হাজার টন ধরা হয়েছে। ইউরিয়া ও অন্যান্য সারের সময়োপযোগী ও পর্যাপ্ত সরবরাহ ও বিতরণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মজুত বেড়েছে। বাংলাদেশ ইউরিয়ায় স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদেও তা অব্যাহত রাখা হবে। কাজেই সার আমদানি শুধুমাত্র টিএসপি ও এমপি-র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। সারের আমদানি চাহিদা ১৯৮৯/৯০ সালে ১,০৪৪ হাজার টন ধরা হয়েছে যা ১৯৮৪/৮৫ সালে ছিল ৬৬৬ হাজার টন।

(৩) **তুলা ও বস্ত্র:** পরিকল্পনা মেয়াদে শিল্প কর্মসূচীতে কাপড় উৎপাদন ১৯৮৪/৮৫ সালের ৭৭.১ কোটি মিটার থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ১২১.৫ কোটি মিটার ধরা হয়েছে। বস্ত্র শিল্প প্রধানতঃ আমদানিকৃত তুলা ও সামান্য পরিমাণে আমদানিকৃত সুতার উপর নির্ভর করে। খাদ্য শস্যের প্রতিযোগিতার দরুন তুলা উৎপাদনের জন্য অতীতের বিভিন্ন পদক্ষেপ সফল হয়নি। তুলা চাষ সম্প্রসারণের জন্যে যদিও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে, তবুও সম্প্রসারিত মিলের মোট চাহিদার তুলনায় তা কিছুই নয়। কাজেই তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যাপক আকারে তুলা আমদানি অব্যাহত থাকবে। ১৯৮৪/৮৫ সালের ২৪৩ হাজার বেলের তুলনায় ১৯৮৯/৯০ সালে প্রায় ৪২৫ হাজার বেল তুলা ও সুতার জন্য নম্বা আঁশ আমদানি করা হবে।

(৪) **অশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী:** উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে বাণিজ্যিক জ্বালানীর জন্য চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়বে। বর্তমানে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী বাণিজ্যিক চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ পূরণ করে, কিন্তু আমদানিকৃত জ্বালানীর উপর থেকে নির্ভরতা হ্রাস করার জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে এগুলোর চাহিদা পুরণের নীতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে। গ্যাসের ভিত্তিতে ব্যাপকহারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে এবং সেচ ও শিল্পে ডিজেলের স্থলে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহার করা হবে এবং রান্নাবান্না ও আলো জ্বালানোর কাজে কেরোসিনের স্থলে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহার করা হবে। বিভিন্ন খাতে বিভিন্নমুখী জ্বালানী চাহিদার প্রকৃতি পূর্ণ দৃষ্টি রেখেই আমদানি বিকল্পের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনার

এই নীতির ভিত্তিতেই পিওএল-এর আমদানি চাহিদার হিসাব করা হয়েছে। পরিকল্পনা মেয়াদে পিওএল আমদানি বাড়বেনা, তবে স্থানীয় শোধনাগারগুলোতে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য অশোধিত তেল আমদানির ব্যাপারে এ নীতির সামান্য পরিবর্তন ঘটবে। ১৯৮৪/৮৫ সালের ১৬˙২ লাখ টনের তুলনায় ১৯৮৯/৯০ সালে পেট্রোলিয়াম ব্যবহার প্রায় ১৬ লাখ টনে স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করা যায়, অর্থাৎ পেট্রোলিয়াম ব্যবহার সামান্য হ্রাস পাবে।

(৫) **সিমেন্টঃ** মজুদসহ সিমেন্টের চাহিদা ১৯৮৯/৯০ সালে ১,৭৪০ হাজার টনে বৃদ্ধির হিসাব করা হয়েছে। ১৯৮৯/৯০ সালে এই চাহিদার মধ্যে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৮৫০ হাজার টন হবে বলে আশা করা যায় এবং আমদানি ব্যবধান থাকে ৮৯০ হাজার টন। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, সরবরাহ ঘাটতি ও নির্মাণ তৎপরতাকে ব্যাহত করার পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য দু'মাসের চাহিদার সমপরিমাণ মজুদ গড়ে তোলা দরকার। একথা বিবেচনায় রেখেই ১৯৮৪/৮৫ সালের ৭১১ হাজার টনের তুলনায় ১৯৮৯/৯০ সালে ৮৯০ হাজার টন সিমেন্ট আমদানি করা হবে।

(৬) **মূলধন পণ্যঃ** আভ্যন্তরীণ চাহিদার অভাব, আমদানির প্রতিযোগিতা এবং কাঁচামালের স্বল্প সরবরাহের দরুণ ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকার কারণে মূলধন পণ্যের উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্য ক্ষুদ্র ভিত্তি রয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে দেশের মধ্যে যথাসম্ভব যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন পণ্য তৈরীর জন্য পুরো সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হবে। যে সব ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো হল মেশিন টুলস, ডিজেল ইঞ্জিন ও পাম্প, বৈদ্যুতিক ও অ-বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং মেশিনপত্র, পরিবহণ ও গুদাম সরঞ্জাম এবং যান ও জাহাজ; কাজেই এই ব্যাপক তালিকার মধ্যে আমদানি হবে সীমিত, অর্থাৎ যেখানে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতা নেই সেখানেই শুধু আমদানি করা হবে। প্রকল্প সাহায্যের আওতায় কাঁচামাল বা আংশপ্রক্রিয়াজাত করা পণ্যের আমদানি এ ধরনের মেশিনপত্র ও সরঞ্জাম আমদানিতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে যাতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা যায়। মূলধন পণ্যের আমদানির পরিমাণ ১৯৮৪/৮৫ সালের ১,৬০২ কোটির টাকার তুলনায় ১৯৮৯/৯০ সালে ১,৮৭৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)।

(৭) **অন্যান্য কাঁচা মালঃ** এই তালিকার মধ্যে রয়েছে ব্যাপক ধরনের শিল্প কাঁচামাল যেমন পিগ আয়রণ, স্ক্রাপ, অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের ধাতু, রং ও রাসায়নিক, ক্লিংকার, কয়লা ও কোক, ঔষধ শিল্পের জন্য কাঁচামাল, তালো, রাবার, ফসফেট ইত্যাদি। দেশে বিদ্যমান ও নতুন শিল্পে বিশেষ করে সরকারী খাতে ব্যবহারের জন্য এসব কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। পরিকল্পনা মেয়াদে এসব কাঁচামালের কোন উল্লেখযোগ্য আমদানি বিকল্প নেই।

(৮) **অন্যান্য ভোগ্যপণ্যঃ** এই তালিকার মধ্যে রয়েছে দুগ্ধখাদ্য, ঔষধপত্র, মশলা, পানীয়, রাবার সামগ্রী, বই ও সাময়িকী প্রভৃতি। পরিকল্পনা মেয়াদে এসব সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাবে বলে হিসাব করা হয়েছে; একই সময়ে এসব আইটেমের মোট চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণের জন্য আভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রসারণের পরিকল্পনা করা হয়েছে, কাজেই এগুলোর আমদানি চাহিদা নিম্ন পর্যায়ে রাখা হয়েছে।

রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা

৩২। রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ ১৯৮৪/৮৫ সালের ২,৪৪২ কোটি টাকা (৯৩˙৯ কোটি ডলার) থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ৩,০৫৭ কোটি টাকা (১১৭˙৬ কোটি ডলার) দেখানো হয়েছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৪˙৯% প্রবৃদ্ধির তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৪˙৬%।

তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রচলিত রপ্তানি ১৯৮৪/৮৫ সালের ১,৫৮৩ কোটি টাকা (৬০'৯ কোটি ডলার) থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ১,৭৩৮ কোটি টাকায় (৬৬'৮ কোটি ডলার) বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে যার বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১'৯ শতাংশ। অন্যদিকে অপ্রচলিত রপ্তানি ১৯৮৯/৯০ সালে ১,৩১৯ কোটি টাকায় (৫০'৭ কোটি ডলার) গিয়ে পৌঁছবে, ১৯৮৪/৮৫ সালে যার পরিমাণ ছিল ৮৫৯ কোটি টাকা (৩৩'৫ কোটি ডলার) বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রচলিত রপ্তানি ০'৬ শতাংশ কমেছে, পক্ষান্তরে অপ্রচলিত রপ্তানি ১৮'৭ শতাংশ বেড়েছে। পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে আয় শ্লথ গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১'৬ শতাংশ। ১৯৮৪/৮৫ সালে ভিত্তি সম্প্রসারণ এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অধিক তৈরী পোষাক রপ্তানী যা উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল, এবং আমদানিকারক দেশগুলোর আরোপিত বিধিনিষেধ ইত্যাদির কারণে তৃতীয় পরিকল্পনায় অপ্রচলিত রপ্তানির প্রবৃদ্ধি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অর্জিত প্রকৃত সাফল্যের চেয়ে কম ধরা হয়েছে। অন্যান্য অপ্রচলিত রপ্তানি যথা নিউজপ্রিন্ট, বৈদ্যুতিক ও প্রকৌশল সামগ্রী, সব্জী ইত্যাদি তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে মোট রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। তৈরী পোষাক রপ্তানি মূল্যের দিক থেকে অত্যন্ত রক্ষণশীল ভিত্তিতে ধরা হয়েছে যা ১৯৮৪/৮৫ সালে ছিল ৩০১ কোটি টাকা (১১'৬ কোটি ডলার) আর ১৯৮৯/৯০ সালের জন্য ধরা হয়েছে ৫০১ কোটি টাকা (১৯'৩ কোটি ডলার)। তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে পোষাক শিল্প থেকে নির্ধারিত আয় অর্জনের জন্য আমদানিকারক দেশগুলোর সাথে কোটা প্রত্যাহার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হবে। অপরদিকে উৎপাদিত পণ্যের বিভিন্নমুখী ব্যবহার ও মানোন্নয়নের ব্যাপারেও প্রচেষ্টা চালানো হবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পোষাক শিল্পকে স্থানীয় বস্ত্র মিল ও তাঁতের সাথে জড়িত করার মাধ্যমে নীট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বাড়ানোর উপরই গুরুত্ব দেয়া হবে।

৩৩। তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে প্রধান প্রধান পণ্য দ্বারা রপ্তানি আয়ের বিষয়টি পরবর্তী উপ-অনুচ্ছেদগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণীতে রপ্তানির চিত্রটি তুলে ধরা হল :

সারণী ১০

বাণিজ্যিক রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা

(১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)

(কোটি টাকায় মূল্য)

	পণ্য	একক	১৯৮৪/৮৫		১৯৮৯/৯০	
			পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১।	কাঁচা পাট ..	লাখ বেল	১৪'০	৩৯০	১৭'০	৪০৩
২।	পাটজাত পণ্য ..	লাখ টন	৪'৮	১,০৩৭	৫'৯	১,১৪৩
৩।	চা ..	মিলিয়ন কেজি	২৫'৯	১৫৬	৩৪'০	১৯২
৪।	চামড়া ..	..	..	১৭৮	..	৩২৫
৫।	মাছ, চিংড়ি ও ব্যাংগের পা।	'০০০' টন	২০'০	২২৫	৩১'৪	৩২০
৬।	সব্জী	'০০০' টন	২'৬	১০	৩'৯	১৫
৭।	তামাক ও পান ..	..	..	৭	..	৭
৮।	পোষাক ..	লাখ পিস	৭৫০	৩০১	১,২৫০	৫০১
৯।	নিউজপ্রিন্ট ও কাগজ	'০০০' টন	২০'৫	২৭	২৫'০	৩২
১০।	অন্যান্য ..	..	..	১১১	..	১১৯
		মোট :	..	২,৪৪২	..	৩,০৫৭

নোট :(১) ডলার = টাকা ২৬, (২) ভিত্তিমূল্য ১৯৮৪/৮৫ সালে স্বল্প উৎপাদন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার দরুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পাটজাত পণ্যের ভিত্তিমূল্যে কিছু রদবদল করা হয়েছে।

(১) **কাঁচাপাটঃ** দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে পাট উৎপাদন প্রান্তিক বছর পর্যন্ত মূল্য প্রতিকূলতাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, উৎপাদন এতটা হ্রাস পায় যে, পাটের বাজার তা জরুরী ভিত্তিতে পুনরুদ্ধার করে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানি ও মূল্যে যে কোন বড় ধরনের ওঠানামা এড়ানোর লক্ষ্যে পরিকল্পনা মেয়াদে বছরে পাট উৎপাদন কর্মসূচী ৬০ লাখ বেলে স্থিতিশীল রাখার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। ধারণা করা হচ্ছে যে, IJCS এর আওতাধীনে পুরোনো ১৫ লাখ একর জমিতে ৬০ লাখ বেল পাট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব, যদি কৃষকদের হাতের কাছে সময়মত উপাদান উপকরণ পৌঁছানো যায় এবং বীজের মান আরো উন্নত করা সম্ভব হয়। যথাযথ মূল্য ব্যবস্থা এবং মানোন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৬০ লাখ বেল ধরে আভ্যন্তরীণ কলকারখানায় ব্যবহার করার পরে কাঁচাপাটের রপ্তানি ১৯৮৯/৯০ সালে ১৭ লাখ বেল নির্ধারণ করা হয়েছে।

(২) **পাটজাত পণ্যঃ** ১৯৭২/৭৩ সাল থেকেই পাটজাত পণ্যের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ তার হিস্যা ৪.২ লাখ টন থেকে ৫ লাখ টনের বেশী পণ্যে উন্নীত করেছে। ১৯৮১/৮২ সালে সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল ৫.৫ লাখ টন, এর পরেই তেলের মূল্য হ্রাস এবং মন্দা, বিশ্ব অর্থনীতিতে কৃত্রিম আঁশের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিযোগিতা এবং কাঁচা পাটের চড়া দামের কারণে রপ্তানি হ্রাস পেয়ে ৪.৮ লাখ টনে দাঁড়ায়। কাজেই পাটজাত পণ্য রপ্তানির পুনরুজ্জীবন, বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন, পাট উৎপাদনে গতিশীলতা এবং পাটজাত পণ্য ও কৃত্রিম আঁশের বিকল্পের মধ্যে মূল্যের প্রতিযোগিতার উপরই নির্ভর করে। পাটজাত পণ্যের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা ব্যয় হ্রাস, দক্ষতা এবং খামার ও মিল পর্যায়ে মানোন্নয়ন ও কাঁচা পাটের নিশ্চিত সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়িয়ে, বাংলাদেশ অনেক লাভবান হতে পারে। রপ্তানি বাজার ও পণ্যের ব্যাপকতা অর্জনের লক্ষ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটাই হবে কর্মসূচীর মূলনীতি। পাটজাত পণ্যের চাহিদা, সম্ভাবনা এবং উৎপাদন কর্মসূচীর ভিত্তিতে ১৯৮৯/৯০ সালে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৫.৯ লাখ টনে নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৩) **চাঃ** অতীতের চা রপ্তানি ক্ষেত্রে অপ্রতুলতার কারণ হিসেবে ব্যাপকভাবে সরবরাহ অব্যবস্থা ও অপ্রতুল বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। লণ্ডনে বাংলাদেশ চা কেন্দ্র স্থাপন, চা চাষ ও পুনঃচাষের মাধ্যমে বাগানসমূহের পুনর্বাসন, উৎপাদন কর্মসূচীকে ব্যাপকতর করা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা '৭০ দশকের শেষ দিক থেকে নেয়ার ফলে ১৯৮৯/৯০ সালে চা উৎপাদন ৫২.১৬ মিলিয়ন কেজি হবে বলে আশা করা যায়। ১৯৮৪/৮৫ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৩.৯১ মিলিয়ন কেজি। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর পরেও ১৯৮৯/৯০ সালে রপ্তানির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩৪ মিলিয়ন কেজি। পক্ষান্তরে ১৯৮৪/৮৫ সালে রপ্তানি পরিমাণ ছিল ২৫.৯ মিলিয়ন কেজি। রপ্তানি মূল্য ১৯৮৯/৯০ সালে দাঁড়াবে ১৯২ কোটি টাকা অপরদিকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ছিল ১৫৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশ চা বোর্ড রপ্তানি বাজারে প্যাকেট করা চা, ব্যাগ চা ও গুঁড়ো চা সরবরাহ ব্যাপকতর করা এবং নতুন বাজার সৃষ্টি করার জন্য বাজারজাতকরণ ও উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

(৪) **মাছ, চিংড়ি ও ব্যাঙের পাঃ** বিদেশী বাজারে বাংলাদেশের চিংড়ি বিশেষ করে মিঠা পানির চিংড়ির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। অতীতে চিংড়ি রপ্তানিতে বাঞ্ছিত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ঘাটতির প্রধান কারণ হল সামগ্রিকভাবে সরবরাহ ক্ষেত্রে বিঘ্ন, সুষ্ঠু মান নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং ভরা মৌসুমে প্যাকিং ও চালান দেয়ার অপ্রতুল ব্যবস্থা ইত্যাদি। সাধারণভাবে অব্যাহত গতিতে চিংড়ির আবাসস্থল নিংড়ে নেয়া ও দূষিত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার দরুন সংহতি ও সমন্বয় বিহীনভাবে খাদ্য খাতের বিকাশ মৎস্য চাষ প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে। তা সত্বেও উপকূল-দূরবর্তী ও সমুদ্রে মৎস্য শিকারের সম্ভাবনাকে এখনো পুরোপুরি কাজে লাগাতে বাকী। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মৎস্য সম্পদ কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় মৎস্য চাষ, বর্তমান ট্রলার বহর ও যন্ত্রচালিত নৌকাবহরকে রপ্তানির জন্য সামুদ্রিক মৎস্য

শিকার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দক্ষতার সাথে কাজে লাগানো এবং মাছ নামানো, মজুদকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন। প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সরকারের নীতি কাঠামোর মধ্যে থেকে মাছ ও জলজ সম্পদ রপ্তানি ক্ষেত্রে বেসরকারী খাত প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। চিংড়ি, ব্যাংগের পা ও সামুদ্রিক মাছ রপ্তানি ১৯৮৪/৮৫ সালের ২০ হাজার টন থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ৩৭.৪ হাজার টনে বৃদ্ধি ধরা হয়েছে। ১৯৮৪/৮৫ সালে প্রকৃত রপ্তানি আয় ২২৫ কোটি টাকার স্থলে ১৯৮৯/৯০ সালে এই আয় ৩২০ কোটি টাকা হবে বলে আশা করা যায়।

(৫) **চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য:** বাংলাদেশ উচ্চমানের ছাগচর্ম উৎপাদন করে থাকে, সৌখিন আপার ও গ্লোভ লেদার তৈরীর জন্য এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। অনুরূপভাবে, বিশ্ববাজারে গোচর্মেরও প্রচুর চাহিদা রয়েছে, মানগত দিক থেকে ইউরোপের বিহটাকৃতির বাছুরচর্মের সাথে সেগুলো তুলনীয়। ওয়েটব্লু চামড়ার মানোন্নয়ন এবং বেশী দামের আইটেম যথা ক্রাস্ট, ফিনিশড লেদার ও চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদনের উন্নয়ন করে আয় বাড়িয়ে এই উপখাতের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্মসূচী নেয়া হবে। ১৯৮৯/৯০ সালে চামড়া থেকে রপ্তানি আয় ৩২৫ কোটি টাকা হবে বলে আশা করা যায়, অপরদিকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৭৮ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছিল। রপ্তানি আয় সম্প্রসারণ করার ব্যাপারে বেশী দামের ট্যান করা চামড়া অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। তবে এক্ষেত্রে উন্নত ধরণের পশু জবাই প্রক্রিয়া, চামড়া ছাড়ানো ও চামড়াকে রোগমুক্ত করার ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। বিশ্ববাজারের দ্রুত পরিবর্তনশীল ধারার সাথে সংগতি রাখার জন্য উচু দরের আধুনিক চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান প্রদান করতে সক্ষম বিদেশী অংশীদারদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তাকে উৎসাহিত করা হবে। ইতিমধ্যেই বেসরকারী খাতে কিছু কিছু সহযোগিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

(৬) **তৈরী পোষাক:** ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ করে শেষ বছরগুলোতে তৈরী পোষাক রপ্তানি তুংগে উঠে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমদানিকারক দেশগুলোর কাছ থেকে বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার দরুণ পোষাক রপ্তানি আকস্মিকভাবে চাপের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এধরণের বিধিনিষেধ শিথিল হলে এবং অবাধ বাণিজ্যের স্বার্থে ক্রমে ক্রমে প্রত্যাহৃত হবে বলে আশা করা যায়। পোষাক রপ্তানিক্ষেত্রে এখনো অনেক অব্যবহৃত সম্ভাবনা রয়ে গেছে, উৎপাদনকে বিভিন্নমুখী করে সেগুলো কাজে লাগাতে হবে। মানোন্নয়ন ও স্থানীয় কাপড়ের ব্যবহারের মাধ্যমে এখনো এর আয় বাড়ানো সম্ভব। পোষাক কারখানায় রপ্তানি হাউস প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও যাচাই করে দেখা হবে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি হিসাবে রেখেই পোষাক রপ্তানি ১৯৮৪/৮৫ সালের ৭৫০ লাখ খণ্ড থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে খুব কম করে হিসাব করেও ১,২৫০ লাখ ধরা হয়েছে; এই হিসাব অনুযায়ী পোষাক রপ্তানি ১৯৮৪/৮৫ সালের ৩০১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯/৯০ সালে ৫০১ কোটি টাকায় দাঁড়াবে যা হবে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানী আয়।

(৭) **অন্যান্য পণ্য:** অন্যান্য পণ্যের মধ্যে কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, তামাক, পান, শাকসব্জী, হস্তশিল্প ইত্যাদির রপ্তানি মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিতই থাকবে বলা চলে, এসব পণ্যের রপ্তানী ১৯৮৪/৮৫ সালের ১৫৫ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৩ কোটি টাকা হবে। বিশ্ববাজারে এগুলোর বেশ চাহিদা রয়েছে, কিন্তু উৎপাদনের উন্নয়ন, যথাযথ মাননিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠুমান বজায় রাখা এবং বাজারজাতকরণ প্রচেষ্টার অভাবে সরবরাহ ব্যাহত হয়ে থাকে। সুনির্দিষ্ট আভাস পাওয়া গেছে যে, মধ্য-পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহ বিশেষ করে সৌদি আরব ও উপসাগরীয় দেশসমূহ বাংলাদেশী ফলমূল ও শাকসব্জী রপ্তানির সম্ভাবনা সম্পর্কে আগ্রহী। বাংলাদেশী রপ্তানীকারকরা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যদি সমন্বিত

ও সংহত প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, বিদেশী ক্রেতাদের সাথে সরবরাহ সংযোগ স্থাপন করে ও সরবরাহ তফসিল, গুণগত দিক রক্ষা করে চলে তবে এসব অপ্রচলিত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় প্রত্যাশিত পরিমাণের চেয়েও বেশী হতে পারে।

অদৃশ্য বৈদেশিক আয় ও ব্যয়

৩৪। বাংলাদেশ বিমান ও শিপিং কর্পোরেশন থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয়, বিদেশী এয়ারলাইনস ও শিপিং লাইনস এ জ্বালানী সরবরাহ থেকে আয়, বাংলাদেশ বন্দরে বিদেশী জাহাজ ভিড়ানো বাবদ আয়, বাংলাদেশে বিদেশী মিশনগুলোর ব্যয় প্রভৃতি উৎস থেকে অদৃশ্য প্রাপ্তি ১৯৮৯/৯০ সালে ৯৮১ কোটি টাকা (৩৭৭ মিলিয়ন ডলার) ধরা হয়েছে, পক্ষান্তরে ১৯৮৪/৮৫ সালে তা ছিল ৮০৬ কোটি টাকা (৩১০ মিলিয়ন ডলার)। অন্যদিকে এসব খাতে পরিশোধের পরিমাণ ১৯৮৯/৯০ সালে ১,৪১০ কোটি টাকা (৫৪২ মিলিয়ন ডলার) ধরা হয়েছে, যা ১৯৮৪/৮৫ সালে ছিল ৯২৬ কোটি টাকা (৩৫৬ মিলিয়ন ডলার)। অদৃশ্য অর্থ পরিশোধ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিমান ও শিপিং কর্পোরেশনের বর্ধিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় ও বিদেশী ঋণের জন্য দেয় সুদ প্রধান উপাদান। অদৃশ্য প্রাপ্তির চেয়ে অদৃশ্য অর্থ পরিশোধ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকায় ১৯৮৯/৯০ সালে নীট অদৃশ্য অর্থ পরিশোধের পরিমাণ হবে ৪২৯ কোটি টাকা; ১৯৮৪/৮৫ সালে তা ছিল ১২০ কোটি টাকা।

ব্যক্তিগত আয় স্বদেশে প্রেরণ

৩৫। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকদের দ্বারা দেশে অর্থ প্রেরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লেন-দেন ভারসাম্য পরিস্থিতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণ। এই উৎস থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ১৯৮২/৮৩ সালে ৫৯৮ মিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়, অতঃপর হ্রাস পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪০০ মিলিয়ন ডলারে এসে পৌঁছায়, কেননা তখন মধ্যপ্রাচ্যে অর্থনৈতিক বিকাশে শ্লথগতি লক্ষ্য করা যায়। এই উৎস থেকে বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রা আয় দুই ধরণের উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়। আমদানী বাণিজ্য সহজতর করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে এবং অবাধ বৈদেশিক মুদ্রা বাজার আংশিকভাবে পরিচালনা করতেও সুযোগ সৃষ্টি করে। এই লক্ষ্যে প্রেরিত অর্থের প্রবাহ ও ব্যবহার ডব্লিউইএস এবং আইপি বাজার নামে পরিচিত মাধ্যমিক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের সাথে যুক্ত। এই অর্থ প্রবাহের ভবিষ্যৎ অন্যান্য উপাদানের মধ্যে বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের রপ্তানি প্রবাহ, তাদের দক্ষতা এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগ সুযোগের উপর নির্ভর করে। তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোতে উন্নয়ন তৎপরতায় শ্লথগতির দরুণ শ্রমিকদের বিদেশযাত্রা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু একই সময়ে প্রবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। দক্ষ ও আধাদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি প্রবাহের পরিমাণ বেড়েছে, অন্যদিকে অদক্ষ শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তবে অর্থ প্রাপ্তির দিক থেকে সামগ্রীকভাবে শ্রমিকদের বহির্গমন হ্রাসের ক্ষতি পুষিয়ে গেছে। বিদেশে সম্ভাব্য কর্মসংস্থান, বাজার জরীপ ও বাজার উন্নয়নে সমন্বিত ও সংহত প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়েছে। তেলের বিশ্ব বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা করলে ধারণা করা যায় না যে, ১৯৮৫ সাল থেকেই বহির্গমনের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্ন ধারা লক্ষ্য করা গেলেও শ্রমিকদের বহির্গমন ও অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হবে। ১৯৮৯/৯০ সালে এই খাতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ১,২৪৮ কোটি টাকা হবে বলে আশা করা যায়, ১৯৮৪/৮৫ সালে-এর পরিমাণ ছিল ১,০৪০ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮% হবে।

লেন-দেন ভারসাম্য পরিস্থিতি

৩৬। আমদানি ও রপ্তানি ভিত্তিতে নির্ধারিত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫—৯০) লেন-দেন ভারসাম্য নীচের সারণীতে দেখানো হলো:

সারণী ১১

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লেন-দেন ভারসাম্যের লক্ষ্যমাত্রা
(১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)

(মিলিয়ন ডলার)

পর্যায়সমূহ	১৯৮৪/৮৫	১৯৮৯/৯০	মোট (১৯৮৫—৯০)
১। আমদানী ব্যয়	—৩,০৫৬	—৩,৬৪৮	—১৭,০১০
(ক) পণ্য (সিআইএফ)	—২,৭০০	—৩,১০৬	—১৪,৬৭৭
(খ) অদৃশ্য	—৩৫৬	—৫৪২	—২,৩৩৩
২। রপ্তানি আয়	১,২৪৯	১,৫৫৩	৭,১৪০
(ক) পণ্য (এফওবি)	৯৩৯	১,১৭৬	৫,৩৮৪
(খ) অদৃশ্য	৩১০	৩৭৭	১,৭৫৬
৩। বাণিজ্য ব্যবধানের ভারসাম্য	—১,৮০৭	—২,০৯৫	—৯,৮৭০
৪। বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ (নীট)	৪০০	৪৮০	২,২৩৩
চলতি হিসাবে ব্যবধান	—১,৪০৭	—১,৬১৫	—৭,৬৩৭
৫। এম এল টি ঋণ পরিশোধ	—১০৭	—১৫৭	—৬৭৮
৬। লেন-দেন ভারসাম্যের ব্যবধান	—১,৫১৪	—১,৭৭২	—৮,৩১৫
৭। নগদ মজুদে পরিবর্তন	—১৪১	..	..
৮। নীট বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবধান	—১,৬৫৫	—১,৭৭২	—৮,৩১৫
৯। সাহায্য অন্তঃপ্রবাহ (গ্রস)	১,৩২৯	১,৫৪০	৭,২৪৫
(ক) খাদ্য সাহায্য	২৪৬	২৬০	১,২৪০
(খ) পণ্য সাহায্য	৪২৫	৫৮০	২,৬৯৫
(গ) প্রকল্প সাহায্য	৬৫০	৭০০	৩,৩১০
১০। অর্থ সংস্থানের অন্যান্য উৎসসমূহ	৩৩৪	২৩২	১,০৭০

টীকা: ১৯৮৪/৮৫ সালের হিসাব সাময়িক।

উপরের সারণীতে দেখা যায় যে, বাণিজ্য ব্যবধান ১৯৮৪/৮৫ সালের ১,৮০৭ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ২,০৯৫ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে। ফলে বাণিজ্য ব্যবধান বার্ষিক ৩% হারে বৃদ্ধি পাবে যা জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির থেকে নিম্নতর। জাতীয় আয়ের শতকরা হিসাবে বাণিজ্য ব্যবধান ১৯৮৪/৮৫ সালের ১৪.৩ শতাংশের তুলনায় ১৯৮৯/৯০ সালে ১২.৮ শতাংশে নেমে আসবে। এর কারণ হলো জিডিপি (৫.৪%) ও রপ্তানির (৪.৬%) দ্রুততর প্রবৃদ্ধি এবং পক্ষান্তরে আমদানি প্রবৃদ্ধিতে নিম্নগতি (২.৮%)। নীট রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা উচ্চস্তরে সন্নিবেশ করায় চলতি হিসাবে ব্যবধান সামান্য নিম্নগতিতে বাড়বে (২.৮%)। এসত্ত্বেও জাতীয় আয়ের শতকরা হিসাবে তা ১৯৮৪/৮৫ সালের ১১.২% এর তুলনায় ১৯৮৯/৯০ সালে ৯.৮% হারে বৃদ্ধি পাবে। এতে প্রতিকূল চলতি হিসাব ভারসাম্য পরিকল্পনাকালে ১৪.৮% হারে বৃদ্ধি পাবে।

বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ

৩৭। পরিকল্পনাকালে বিদেশী মূলধনের অন্তঃপ্রবাহের মাধ্যমে বাণিজ্য ও রেমিটেন্সের মধ্যকার বিদেশী মুদ্রার প্রাপ্তি ও ব্যয়ের প্রাক্কলিত ব্যবধান পূরণের প্রত্যাশা করা হয়েছে। মোট তিনটি উৎসের সাহায্যে এই ব্যবধান পূরণ করা হয়। সেগুলো হলো সরকারী ঋণ ও সাহায্য, আই এম এফ কর্তৃক লেন-দেন ভারসাম্য বিধায়ক সহায়তা এবং বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ। পরিকল্পনাকালে বিদেশী সাহায্যের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৩.১% হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে যেখানে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৩%। এই সময়ে বিদেশী মুদ্রার ব্যবধান মেটানোর লক্ষ্যে গ্রস হিসেবে ১৯৮৪/৮৫ সালের ১৩২১ মিলিয়ন ডলারের স্থলে ১৯৮৯/৯০ সালে বিদেশী সাহায্যের প্রাপ্তি ১৫৪০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে বলে হিসেব করা হয়েছে। বিদ্যমান সাহায্য পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় বিদেশী সাহায্য প্রাপ্তির প্রবৃদ্ধি হার হবে কিছুটা কম। তবে উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন সাপেক্ষে এই সাহায্য পরিস্থিতিও উন্নততর হবে। প্রকৃতপক্ষে সাহায্য পরিস্থিতি দারুণভাবে মন্দাক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৮২/৮৩ সালে তা কিছুটা সামলিয়ে উঠা সম্ভব হয় এবং ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ এর ভবিষ্যৎ অনেকটা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে। ইতিমধ্যেই যে সমস্ত সাহায্যের অংগীকার পাওয়া গেছে সেগুলোর প্রাপ্তি অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করে হিসাবকৃত ধীরগতির সাহায্য প্রবৃদ্ধির ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া হবে এবং এতে করে প্রকৃত অর্থে পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্তি বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতার উন্নতি, স্থানীয় তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সংগ্রহ পদ্ধতি সরলীকরণের উপর সাহায্য প্রাপ্তির এই গতিবৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করবে। তবে এটা বহুলাংশে পণ্য সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির উপরও নির্ভরশীল; কারণ তা প্রকল্পের স্থানীয় ব্যয় মেটানোর লক্ষ্যে কাউন্টার পার্ট তহবিল ও প্রকল্প সাহায্যের পুনঃভরণ উপাদান সৃষ্টি করবে। সেজন্যই পরিকল্পনাকালে বিশেষ করে খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির মন্দাগতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে পণ্য সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে সাহায্য পরিস্থিতি উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। প্রকল্প সাহায্যকে অর্থনীতির জন্য উৎপাদনশীল করে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্প সাহায্যের আওতাধীনে পণ্যের স্থানীয় সংগ্রহকেও বিশেষভাবে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৩৭.১। **খাদ্য সাহায্যঃ** আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৮৯/৯০ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে ২০.৭ মিলিয়ন টনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য খাদ্যোৎপাদন বাড়ানো অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। তবে কৃষি উৎপাদনের অনিশ্চয়তা এবং বর্তমানে কিছুটা কম হলেও কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ পরিবার ও ভূমিহীনদের ভরণপোষণের প্রক্রিয়া

পরিকল্পনাকালে অব্যাহত রেখে উপরোক্ত কর্মসূচীকে যথাযথভাবে সহযোগিতা দানের জন্য খাদ্যের একটি নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা হবে। এছাড়াও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক পুষ্টি ঘাটতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে খাদ্যের বিশেষ ভূমিকার প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে খাদ্য সাহায্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। বিভিন্ন রকমের অর্থনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে খাদ্য সাহায্য বিতরণ করে তা থেকে বিক্রয়লব্ধ অর্থ নানা রকমের কৃষি ও পানি প্রশাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্যের একটি অংশ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্রয় করে তা কালভার্টের মত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজনীয় শ্রম বহির্ভূত খাতে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। খাদ্য সাহায্যের এসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য পরিকল্পনাকালে খাদ্য সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারটি কিছুটা কম রক্ষণশীলভাবে প্রাক্কলন করে ২৬০ মিলিয়ন ডলারে স্থির করা হয়েছে এবং আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হিসাবে এটাই প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হবে।

৩৭.২। **পণ্য সাহায্যঃ** বৃহত্তর অর্থে বাংলাদেশের জন্য পণ্য সাহায্য হলো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ধরনের সাহায্য; কারণ তা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অব্যাহত সরবরাহ এবং উন্নয়ন বাজেটের সহায়ক হিসাবে স্থানীয় মুদ্রার তহবিল গঠনে সাহায্য করে। যেহেতু বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ সীমিত, সেইহেতু অতীতেও খাদ্য ও প্রকল্প সাহায্যের তুলনায় পণ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল স্বভাবতই বেশী। আমদানি নীতি উদারীকরণেও তা বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তুলা, ভোজ্য তেল, গুঁড়া দুধ, পিগ আয়রণ ও বিলেট, সার, ক্লিংকার, সিমেন্ট, সোডা অ্যাশ, রং ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ডিজেল, ভেষজ শিল্পের জন্য কাঁচামাল, পাট ও বস্ত্রকলের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ, প্রকৌশল শিল্প, বিদ্যুৎ ও পরিবহণ খাতের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ এবং কাঁচামালের মত বিপুল সংখ্যক দ্রব্য পণ্য সাহায্যের মাধ্যমে আমদানি করে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী শিল্পের উৎপাদনের ঊর্ধ্বগতি বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে; অন্যথায় তা সম্ভব ছিলনা। পণ্য সাহায্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক ও বহুমুখী উভয় সূত্র থেকে উদার পণ্য সাহায্য পেয়েছে। অবশ্য দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাহায্যের ধরণ বিভিন্ন পন্থায় পণ্য সাহায্যের বিপরীতে ক্ষতিকরভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমতঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পণ্য সাহায্যের অংশ ১৯৭০-এর দশকের স্তর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে নীচে ছিল। ১৯৭৩/৭৪ সালে ২৩.৫% এর স্তর থেকে তা প্রায় ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৮/৭৯ তে ৪৬.৮%-এ দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৭৯/৮০-তে তা ৩৩.৯%-এর স্তরে নেমে আসে। শুধু অনুপাতের দিক থেকেই এটা নেমে আসেনি, বরং পরিমাণের দিক থেকেও তা ১৯৭৮/৭৯ এর ৪৮৩ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৭৯/৮০-তে ৩৭৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ১৯৭৯/৮০ থেকে সাহায্য ব্যবস্থাপনায় এর অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটতে থাকে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তা সমুদয় সাহায্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়। কিন্তু তখনও তা ১৯৭৮/৭৯-এর নিরংকুশ স্তরের নীচে থাকে। পণ্য সাহায্যের অংশীদারিত্বের এই নিম্নগতির প্রধান কারণ ছিল ১৯৭৬/৭৭-এর ৪০.৮% থেকে মোট সাহায্যের অনুপাত হিসেবে ১৯৮০/৮১-তে সর্বনিম্ন স্তরে এর প্রতিশ্রুতির অধোগতি। পরবর্তীতে কেবলমাত্র ধীরগতির উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অধোগতির অপর কারণ ছিল সাহায্যের বিলম্বিত প্রতিশ্রুতি। অধিকন্তু ১৯৮০-এর বছরগুলোতে বোধগম্যভাবে তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে পণ্য সাহায্য ক্রমবর্ধমানভাবে দাতাদের আভ্যন্তরীণ বাজারে আবদ্ধ হয়ে যেতে থাকে। এই অধোগতির প্রভাব ছিল গুরুতর, কারণ পণ্যসাহায্য স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য পাল্টা তহবিল সৃষ্টি করে। পণ্য সাহায্যের খর্ব অংশীদারিত্ব ও তাই প্রকল্প সাহায্য অধিগতকরণ সমস্যায় অবদান যুগিয়েছে। পণ্য সাহায্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে এটা আশা করা যায় যে পণ্য সাহায্যের স্তর শুধু উন্নীতই হবে না, বরং এটা বন্ধনমুক্তও হবে। আরও একটা ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে, আর তা হচ্ছে সময়মত এর প্রাপ্যতা; কারণ চলতি উৎপাদনের সাথে এটা প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট। ১৯৮৯/৯০-এর জন্য খর্ব পণ্য সাহায্যের আন্তঃপ্রবাহ ৫৮০ মিলিয়ন ডলার।

৩৭.৩। **প্রকল্প সাহায্যঃ** অর্থনীতির অব্যাহত প্রবৃদ্ধির জন্য প্রকল্প সাহায্যের উচ্চতর অধিগতকরণ অত্যাবশ্যক। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে আভ্যন্তরীণ সূত্র ও কাউন্টার পার্ট তহবিল-এই উভয় ক্ষেত্র হতে স্থানীয় সম্পদের ঘাটতির কারণে এর অধিগতকরণ ব্যাহত হয়েছে। প্রকল্প সাহায্যের প্রধান ব্যবহারকারী হচ্ছে সরকারী খাতের উন্নয়ন কর্মসূচী যা প্রকল্প সাহায্যের চার-পঞ্চমাংশের উপরে ব্যবহার করে, এবং এখানে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে স্থানীয় সম্পদের সংকট অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠে। ১৯৮০/৮১ সালে প্রকল্প সাহায্যের প্রাপ্তি পাইপ-লাইনের ২৬.৫% এর স্তর থেকে শুরু করে ১৯৮৩/৮৪ সালে ১৫.১% এ নেমে আসে; বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের ইতিহাসে এটা ছিল সর্বনিম্ন স্তর। অবশ্য ১৯৭৬/৭৭ সালেও একবার এ স্তর নেমে গিয়ে ১৬.৩% এ দাঁড়িয়েছিল। পণ্য সাহায্য ও সাহায্য প্রাপ্তিতে এর হিস্যা এবং সরকারী সঞ্চয়ের স্তর দ্বারা এটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭৬/৭৭ ও ১৯৮৩/৮৪ এই উভয় বছরে পণ্য সাহায্যের প্রাপ্তির স্তর পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় কম ছিল। প্রকল্প সাহায্যের পাইপ-লাইন ক্রমাগত-ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৩,৭০৩ মিলিয়ন ডলারের স্তরে পৌঁছে এবং প্রাপ্তি ছিল প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন ডলার, যদিও ১৯৮৩/৮৪ (৫৫২ মিলিয়ন ডলার) এর স্তরের চেয়ে এই উন্নতি সন্তোষজনক দেখায় না। আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংকোচনের পটভূমিতে এই ব্যাপক পাইপ-লাইনের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ প্রকল্প সাহায্য প্রতিশ্রুতির বাছাই করা ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। পাইপ-লাইনের দ্রুত সরবরাহ প্রধান লক্ষ্য হতে হবে। পুরাতন ও নূতন উভয় প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার নির্ভর করবে পণ্য সাহায্যের ক্রমবর্ধমান হিস্যা এবং পুনঃভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য এবং সরকারী সঞ্চয়ের সুসংহত করার উপর। এটার উপরও জোর দিতে হবে যে, যেহেতু সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে, স্থানীয় সম্পদ এমনভাবে বরাদ্দ করতে হবে যাতে প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহারও বৃদ্ধি পায়। শুধুমাত্র সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে এ জন্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ এবং সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যাতে সমঝোতা করতে না হয় তা নিশ্চিত করতে সাহায্যের জন্য নতুন প্রকল্প বাছাই জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হতে হবে। সাহায্য প্রস্তাবের আগে প্রকল্প প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েই কেবল এই নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। সাহায্য প্রতিশ্রুতির বৈচিত্রও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এতে প্রাপ্তির পদ্ধতি গ্রহীতা সংস্থার সমস্যাকে জটিল করে তোলে। সাহায্য পদ্ধতি দাতা এবং গ্রহীতা উভয় দেশের আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা স্থিরকৃত হয় বিধায় বোধ হয় একটি একই রকম পদ্ধতি অর্জন অসম্ভব হবে। তবুও কিছু সরলীকরণের চেষ্টা করা উচিৎ। প্রকল্প সাহায্যের প্রাপ্তি ১৯৮৪/৮৫ সালের ৬৫০ মিলিয়ন ডলারের স্তর থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ৭০০ মিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে। সরকারী সাহায্য ছাড়া এটা আশা করা হচ্ছে যে, প্রত্যক্ষ বেসরকারী বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং সেই সংগে অন্যান্য ধরনের বৈদেশিক মুদ্রার অর্থ যোগান বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের বর্ধিত সুযোগের কারণে ত্বরান্বিত হবে।

৮। তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের প্রাক্কলিত প্রতিশ্রুতি ও অবমুক্তি নীচে দেখানো হল :

সারণী ১২

বৈদেশিক সাহায্যের প্রাক্কলিত প্রতিশ্রুতি ও অবমুক্তি(১৯৮৫—৯০)

(১৯৮৪/৮৫ সালের স্থির দামে)

(মিলিয়ন ডলার)

বছর সাহায্যের শ্রেণী		উন্মোচনী পাইপ-লাইন	নতুন প্রতিশ্রুতি	মোট প্রাপ্তব্য	অবমুক্তি
১৯৮৪/৮৫					
খাদ্য সাহায্য ..	..	৫০	৩৮০	৪৩০	২৪৬
পণ্য সাহায্য ..	..	৫৬৬	২৫০	৮১৬	৪২৫
প্রকল্প সাহায্য ..	..	৩,৭০৩	১,৩৪২	৫,০৪৫	৬৫০
মোট :	..	৪,৩১৯	১,৯৭২	৬,২৯১	১,৩২১
১৯৮৯/৯০					
খাদ্য সাহায্য ..	..	৩৩	২৬২	২৯৫	২৬০
পণ্য সাহায্য ..	..	৪৬৮	৮৫০	১,৩১৮	৫৮০
প্রকল্প সাহায্য ..	..	৫,৯৬৮	১,৮৩৬	৭,৮০৪	৭০০
মোট:	..	৬,৪৬৯	২,৯৪৮	৯,৪১৭	১,৫৪০
১৯৮৫—৯০					
খাদ্য সাহায্য ..	..	৪০২	১,১৯০	১,৫৯২	১,২৪০
পণ্য সাহায্য ..	..	১,৮০২	৩,২৪৫	৫,০৪৭	২,৬৯৫
প্রকল্প সাহায্য ..	..	২৪,৪২৬	৭,০৭৮	৩১,৫০৪	৩,৩১০
মোট :	..	২৬,৬৩০	১১,৫১৩	৩৮,১৪৩	৭,২৪৫

বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি ও লেন-দেন ভারসাম্য

৩৯। আমদানি-রপ্তানি নীতিতে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ ও অগ্রাধিকারসমূহ প্রতিফলিত হওয়া উচিত এবং সীমিত সম্পদের আরও দক্ষ ব্যবহার উৎসাহিত হওয়া উচিৎ। একটি উদার আমদানি নীতি অনুসরণের মাধ্যমে এই উভয় লক্ষ্য অধিকতর ভালভাবে পূরণ হয় যা বাজারকে দুষ্প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদ বরাদ্দের সুযোগ দেবে। বেসরকারী খাতের উন্নয়নের নীতির সাথে এটা সংগতিপূর্ণ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আমদানি উদার করার নীতি অব্যাহত থাকবে। এই ব্যাপক নীতিমালার মধ্যে আমদানি ও সেই সংগে রপ্তানি সমস্যার লেন-দেন ভারসাম্য সমস্যা কমিয়ে আনার চূড়ান্ত লক্ষ্য সামনে রেখে সমাধান করতে হবে এবং বিনিময় হার ও মূল্যের মাধ্যমে এমনভাবে তা করতে হবে যাতে অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিরুৎসাহিত হয় এবং রপ্তানি উৎসাহ পায়। এসবের প্রেক্ষিতে এই সাহায্য ঐ সমস্ত কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়োজিত হবে যা স্থানীয় ভাবে পাওয়া যায় না। এভাবে বিদ্যমান শিল্প সুবিধাদির পূর্ণতর ব্যবহার করা যাবে, স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্রী ও আমদানির মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা দূর হবে, শিল্প খাতে অদক্ষতার সংরক্ষণ এড়িয়ে যেতে ও সর্বোপরি অবস্থার উন্নতি ঘটাতে যাতে স্থানীয় সামগ্রীর জন্য রপ্তানি বাজার আভ্যন্তরীণ বাজারের মত আকর্ষণীয় হয়ে উঠে, যাতে আমদানি-রপ্তানির ব্যবধান প্রাপ্ত সাহায্যের সীমার মধ্যে থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে সংরক্ষণ মূল্য, রপ্তানি তৎপরতা সুবিধা, শুল্ক ফিরে পাওয়া, রপ্তানির জন্য সুদের সুবিধাজনক হার এবং বিনিময় হারের মত নীতিসমূহ ঘনিষ্টভাবে লক্ষ্য করা এবং লেন-দেন ভারসাম্য অবস্থার উপর এসবের প্রভাবের নিরিখে পর্যালোচনা করতে হবে। যেহেতু রপ্তানি প্রধানতঃ অব্যাহতভাবে প্রাথমিক পণ্য ও প্রক্রিয়াজাত সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল থাকবে, এটা স্বীকার করতে হবে যে তাদের উৎপাদন ও সেই সংগে চাহিদার উঠানামার জন্য লেন-দেন ভারসাম্য পরিস্থিতি অব্যাহতভাবে ভঙ্গুর অবস্থায় থাকবে। তাই বৈদেশিক সাহায্যের অসাম্যতার নিরিখে রপ্তানি আয়ের উঠানামার প্রেক্ষিতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনার উপর লেন-দেন ভারসাম্য ব্যবস্থাপনা গুরুতরভাবে নির্ভরশীল থাকবে। আমদানিকে রপ্তানির সাথে উঠানামা করতে দিয়ে এবং পরে এধরণের উঠানামাকে অর্থনীতির অন্যান্য খাতে সংক্রামিত হতে দেয়ার চেয়ে অর্থনীতির আমদানি চাহিদার গুরুতর স্তরকে সন্তুষ্ট করার উপর আলোকপাত করা উচিৎ।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মসংস্থান, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি

বেকারত্ব ও আংশিক বেকারত্ব বাংলাদেশের অর্থনীতির দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। শ্রম শক্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেকার রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং এভাবে এর অপচয় ঘটছে। উন্নয়নের এই প্রাথমিক সম্পদের ব্যাপক অপচয়ের মূল কারণগুলো হচ্ছে কৃষি জমির উপর উচ্চ চাপ, বিনিয়োগের নিম্নস্তর এবং জন-সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। অপ্রতুল ভূমির উপর এই চাপের ফলে ভূমিহীনের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে এবং এতে অধিক থেকে অধিকতর হারে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে অসাম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তি নিয়ে ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কৃষির সীমাবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োজনীয় পর্যায়ে অকৃষিজাত কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধিদ্বারা পরিপূরণ হয়নি। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির আবার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অভাবে কৃষিতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। যদিও আধুনিক সেচ, বীজ, সার, প্রযুক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে শ্রম নির্ভর তবুও বর্তমানে মাত্র এক-চতুর্থাংশ জমি সেচের আওতায় এসেছে। দ্বিগুণ এবং তিনগুণ শস্য বপনের জন্য নতুন এলাকাকে সেচের আওতায় আনার মাধ্যমেই শুধু নয়, বরং কৃষি উৎপন্নের উপর সর্বোত্তম প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাপক চাষাবাদের মধ্য দিয়ে ও জৈব রাসায়নিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ কৃষিজ কর্মসংস্থান বাড়াতে পারে। কৃষিতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাব জমিতে বর্ধিত শ্রম শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

২। জমি সীমিত বিধায়, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণে স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা হচ্ছে বিনিয়োগ। এর অভাবে জনগণ দারিদ্র স্তরের কাছাকাছি জীবন-যাপন করতে, অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের উপর নির্ভরশীল হতে এবং অদক্ষ কৃষি শ্রমিকদের চেয়েও কম বেতন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তুলনামূলক প্রেক্ষিতে এ স্তর খামার ও খামার বহির্ভূত কর্মসংস্থানের উপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। প্রথমতঃ নিম্ন অকৃষিজ মজুরী কৃষিজ মজুরীকে দমিয়ে রাখে এবং এভাবে নতুন কৃষি প্রযুক্তির অগ্রগতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দ্বিতীয়তঃ নিম্ন অকৃষিজ পারিশ্রমিক কুটির শিল্পে অবক্ষয়ের সৃষ্টি করেছে এবং শিল্পের সাথে জড়িত লোকজন শেষ পর্যন্ত পেশা ছেড়ে দিচ্ছে। এর সম্মিলিত প্রভাবে শ্রমজীবি জনসংখ্যার অস্তিত্ব নিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। তাই, জনগণের দারিদ্র্যকে মৌলিকভাবে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ এই যমজ সমস্যা-রূপে দেখা হয়ঃ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিম্নস্তরের বিনিয়োগ ও নিম্নস্তরের প্রযুক্তির ফলে আরও নিম্নস্তরে থাকে। শহরাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান পরিস্থিতি-এর চেয়ে উন্নত নয়, কারণ এ ধরণের কর্মসংস্থান প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সমস্যারই রূপান্তর।

৩। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব যে অংগাংগিভাবে জড়িত তা কোন নতুন সচেতনতা নয়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য কমানো এবং আয় বিতরণে উন্নতি ঘটানোর হাতিয়ার হিসেবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের উপর জোর দেয়া হয়। কিন্তু এর হতাশাব্যঞ্জক বিনিয়োগ কর্মসূচীর ফলে ৩০ লাখ শ্রম-বছর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। অথচঃ পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৪ লাখ শ্রম বছরের। প্রথম পরিকল্পনার সময়কালে শ্রমশক্তির প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায়ও কর্মসংস্থানের ঘাটতি ছিল। এতে বেকার সমস্যার আরও অবনতি ঘটে। অন্তর্বর্তীকালীন চরিত্র এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো শেষ করার উপর জোর দেয়ার ফলে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না যদিও নতুন কর্মসংস্থান সম্পর্কে পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১৮ লাখ শ্রম বছরের। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার তৎপরতা একত্র করলে দেখা যায় যে ১৯৭৯/৮০ সালের শেষে বেকারত্ব পরিস্থিতির ১৯৭২/৭৩ সালের চেয়ে অবনতি ঘটে।

৪। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৮০/৮১ থেকে ১৯৮৪/৮৫—এর মধ্যে ৩৭ লাখ চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির উপর জোর দেয়া হয়। কিন্তু ৩২ লাখ প্রাক্কলিত নতুন কর্মসংস্থান বেকারত্ব পরিস্থিতির আরও অবনতির ইংগিত বহন করে। কর্মসংস্থান ভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীর অধিকাংশই শুরু করতে দেরী হয়েছে এবং ফলে যথেষ্ট সময় পার হয়ে গেছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির তৎপরতায় জোর দেয়ার ঘাটতির ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ছিল দুর্বল। ফলে মৌসুম পার হয়ে গেলে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীই ছিল গ্রামীণ কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস।

জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ

৫। ১৯৮১-এর আদমশুমারীতে জনসংখ্যার পরিমাণ ৮ কোটি ৯৯ লাখ দেখানো হয়েছে। গত দু'দশকে তা ৭৭% শতাংশের চেয়েও বেশী বেড়েছে। নারী-পুরুষ ও বয়স-কাঠামো এবং গ্রামীণ ও শহরে জনসংখ্যার জন্মমৃত্যুর ধরণের ভিত্তিতে ১৯৮৪/৮৫-এর মাঝামাঝি নাগাদ জনসংখ্যা প্রাক্কলিত হয়েছে ৯ কোটি ৯২ লাখ। ফলে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব দাঁড়ায় ১,৮০৮ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার গত দুই দশকে জনসংখ্যার যে বয়স-কাঠামোর সৃষ্টি করে তাতে জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশের বয়স ১৫-বছরের নীচে এবং নির্ভরশীলতার অনুপাতে উচ্চ পর্যায়ে দাঁড়ায়। বেকারত্বের বিদ্যমান উচ্চস্তরের বিপরীতে এর অর্থ হচ্ছে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে গিয়ে ভোগের উচ্চ হার সৃষ্টি হয়েছে। পারিবারিক প্রয়োজনের উপর এই চাপ বেকারত্বের আরও অবনতি ঘটায়, কারণ এর ফলে গরীব পরিবারের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরা শ্রম বাজারে প্রবেশ করে। পুরুষদের অংশগ্রহণের উচ্চ হারের মধ্যে এটা প্রতিফলিত। ১৯৮১-এর আদমশুমারী মোতাবেক ১০ এবং তারচেয়ে বেশী বয়সের সার্বিক অংশগ্রহণের হার ছিল পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৩.৯% এবং ৪.৩%। ১৯৬১ সালে তা ছিল ৮৭.৬% এবং ১০.৮%। ১৯৬১-এর আদমশুমারীতে মহিলাদের উচ্চতর অংশগ্রহণের হারের কারণ হচ্ছে সেসময় গৃহ বধূদেরকেও কর্মরতা মহিলা হিসেবে গণনা করা হয়েছিল। পুরুষদের অংশগ্রহণের নিম্নগতি নির্দেশ করে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হারের কারণে নির্ভরশীলতার অনুপাত বাড়ছে। নারী শিক্ষার উপর জোর দেয়া, মহিলাদের জন্য চাকুরী সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি ব্যাপক সংখ্যায় গ্রামীণ খানার আর্থিক অবস্থার অবনতির ফলে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বাড়তে পারে। কয়েকটি সরকারী ও সরকার বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান মহিলাদের কর্মসংস্থান বাড়াচ্ছে। তাই পরিবর্তনশীল বয়স-কাঠামো এবং মহিলাদের কর্মসংস্থানের সরকারী নীতির প্রতিফলন ঘটিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে দ্রুততর গতিতে মোট শ্রমশক্তি বাড়তে পারে। ১০ বছরের বেশী বয়সের মোট শ্রমশক্তির পরিমাণ আগামী ৫ বছরের জন্য ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৮০ সালের জনশক্তি জরিপ মোতাবেক জনসংখ্যার ৩১% এরও বেশী বেসামরিক শ্রমশক্তি; এই অনুপাতের ভিত্তিতে শ্রমশক্তি ১৯৮৫-এর মাঝামাঝি ৩১০.০ লাখ থেকে ১৯৯০ সাল-এর মাঝামাঝি নাগাদ ৩৫০.০ লাখ বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ শ্রমশক্তি ৪০ লাখ বাড়বে। এর সাথে বিদ্যমান বেকারত্ব, যা ৭০ লাখের মত বলে প্রাক্কলিত হয়েছে, যোগ হয়ে চাকুরী সন্ধানী মোট লোকের সংখ্যা দাঁড়াবে ১১০ লাখ। এক অথবা দুইটি পরিকল্পনা কালে এ বিরাট সংখ্যাকে কর্মসংস্থান দিতে হবে। দীর্ঘ-মেয়াদী উন্নয়ন কাঠামোর আওতায় বেকারত্ব ক্রমে কমিয়ে আনার প্রতি কর্মসংস্থান নীতিতে জোর দিতে হবে।

বেকারত্বের কাঠামো

৬। বেকারত্ব সমস্যার মাত্রা জানাই যথেষ্ট নয়। সীমিত ভূ-সম্পদের উপর ভীড় জমিয়ে ৯০ শতাংশ মানুষ পল্লী এলাকায় বাস করে বিধায় এর সমাধানকল্পে প্রথমে এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সমস্যা আবশ্যিকভাবেই গ্রামীণ চরিত্রের। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সেখানেও বেকারত্ব বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান গ্রামীণ বেকারত্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বর্তমানের কলাকৌশল নিয়ে কৃষি ব্যবস্থা এককভাবে এই ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারে না। এর অর্থ এটাও দাঁড়ায় যে,

কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ ও বাড়তি শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করার মত দ্রুত সম্প্রসারিত হতে পারেনি। গ্রামীণ উন্নয়ন বিশেষ করে কুটির শিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়ে এর মোকাবেলা করতে হবে, যদিও প্রান্তিক কৃষকেরাই শুধু খামার বহির্ভূত তৎপরতায় কর্মসংস্থান গ্রহণে আগ্রহী। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতা বৃদ্ধি এবং এর ভৌগলিক ও ঋতুর সম্প্রসারণের মধ্যে অবনতিশীল কর্মসংস্থান পরিস্থিতি প্রতিফলিত। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে খাদ্যোৎপাদন জন সংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে দেড়গুণ বেড়েছে এবং এর পরও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেড়েছে। এতে গ্রামীণ বেকারত্ব সমস্যার ব্যাপকতাবে ইংগিত পাওয়া যায়। গ্রামীণ বেকারত্ব সমস্যাকে মৌসুমী ঋতু হিসাবে দেখা হয় এবং শীতকালে তা প্রকট থাকে। তাই কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীকে স্বল্প-মেয়াদী কর্মসংস্থান কর্মসূচীরূপে দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর বিস্তৃতি পল্লী এলাকায় নিছক ঋতুভিত্তিক না হয়ে বেকারত্বের আরও দীর্ঘ-মেয়াদি লক্ষণ প্রকাশ করছে। মৌসুমের বাইরেও বিস্তৃত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা রয়েছে। কারণ এই কাজের ধরণই এমন যে তা বছরব্যাপী বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে পুরোপুরি সহায়তা করতে পারে না। এটা স্বীকার করা ভাল যে স্থায়ী অবকাঠামো উন্নয়নে এই কর্মসূচীর ক্রমবর্ধমান ব্যবহার স্বল্প-মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ বিলীন করছে, যদিও দীর্ঘ-মেয়াদি উন্নয়নের সুফলের নিরিখে এই গুরুত্ব আরোপ যুক্তিসংগত। এই পরিবর্তনের বিকল্প হচ্ছে পরোক্ষ কর্মসংস্থান, কারণ এধরণের উন্নয়ন স্বল্প-মেয়াদি কর্মসংস্থানের বিরুদ্ধে কাজ করবে।

৭। যেহেতু গ্রামীণ জনগণের মুল পেশা কৃষিকাজ, তাই দীর্ঘ-মেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগ ভুমি বিতরণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। কারণ গ্রামীণ খামার উদ্বৃত্ত কর্মসংস্থান নির্ভর করে উদ্বৃত্ত জমির উপর। এই নির্ভরশীলতার চুড়ান্ত আকার হচ্ছে ভুমিহীন গোষ্ঠি, যারা খন্ডকালীন ভাড়াটে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা আংশিকভাবে নিজেদের জমিতে এবং আংশিকভাবে ভাড়াটে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ১৯৭৭ সালে মোট ভাড়াটে কৃষি শ্রমশক্তির মধ্যে ৭২.২% ছিল খন্ডকালীন শ্রমিক এবং মাত্র ৮.৯ শতাংশ ছিল স্থায়ী শ্রমিক; তাদের মধ্যে ১৮.৯% ছিল অস্থায়ী শ্রমিক। ৬২.৬% লাখ জোতজমি খামার ছিল, অথচ স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল (ভাড়াটে) ১৬.৭ লাখ। এতে কৃষি কর্মসংস্থানে সীমাবদ্ধতার ইংগিত পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ১৯৭৭ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র খামারের তুলনায় বড় খামারগুলো কৃষি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট খণ্ডকালীন শ্রমিকদের উপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল। বস্তুত-পক্ষে আকারের সাথে এ ধরণের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাই বাড়তি জমি গ্রামীণ কর্মসংস্থানের কাঠামো নির্ধারণ করে। ১৯৬০ এবং ১৯৭৭ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র জোতজমির অবক্ষয় তাই গ্রামীণ বেকারত্ব সমস্যা আরো বাড়িয়ে তোলে।

৮। গ্রামীণ বেকারত্ব সমস্যার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যাপকহারে স্কুলগামী বয়সের শিশুদের ব্যবহার। ১৯৮০ ও ১৯৮৪ সালের মধ্যবর্তী জনশক্তি জরিপ মোতাবেক পুরুষ জনসংখ্যার ১২ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৩৩% থেকে ৩৯.৭% এ বেড়েছে। মহিলাদের মধ্যে এই বৃদ্ধির হার দ্রুততর। ১৯৮০ সালের ৩.৯% থেকে ১৯৮৪ সালে তা ৮.৫% এ দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই অবিসংবাদিতভাবে একটা ক্ষতিকর তথ্য। কিন্তু যে তথ্য বেশী মারাত্মক তা হচ্ছে ১৫ থেকে ৬৪ বছরের কর্মক্ষম গোষ্টির ১৯৮০ এবং ১৯৮৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে অংশগ্রহণ হারের সাধারণ অবক্ষয়। এতে প্রমাণিত হয় যে সক্ষম শ্রমশক্তি অধিক মাত্রায় কর্মসংস্থানের সুযোগ হারাচ্ছে। ১৯৭৪ এবং ১৯৮১ সালের মধ্যবর্তী আদমশুমারীতেও উপরোক্ত গতিধারা পরিলক্ষিত হয়। সামাজিকভাবে কম গ্রহণযোগ্য হলেও এটা সত্য যে ১৯৮৩/৮৪ সালে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী ১০ লাখের বেশী শ্রমিক ছিল। এর ছয় ভাগের এক ভাগের বয়স ছিল ৫ থেকে ৯ বছরের মধ্যে। মোট ২৮৭ লাখ কর্মসংস্থানের ১২.৯% ছিল শিশু শ্রমিক। এই সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে, স্কুলগামী বয়সের শিশুরা এখন আগের চেয়ে বেশী কাজ করছে এবং সক্ষম শ্রমশক্তি কম কাজ করছে। অপরদিকে আদমশুমারী মোতাবেক

অর্থনৈতিক নির্ভরতার অনুপাত ১৯৬০ এর ২.২৬ হতে ১৯৮১ সালে ২.৪৭ এ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় এবং জনশক্তির জরিপ মোতাবেক তা ১৯৮০ সালে ২.২২ থেকে ১৯৮৪ সালে ২.৩৪ তে দাঁড়ায়।

৯। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী মোতাবেক মহিলা জনসংখ্যা যা মোট জনসংখ্যার ৪৮.৪% পারিবারিক কাজ ছাড়া শ্রমশক্তির মাত্র ৫.৮% জুড়ে আছে এবং চাকুরীর মাত্র ৫.৫% তাদের দখলে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে গ্রামীন সম্প্রদায়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, তবে নারী শিক্ষার অভাব যা সাংস্কৃতিক ধরণকে স্থায়ী করার মাধ্যমে মহিলা জনসংখ্যার কম অংশগ্রহণে অবদান যুগিয়েছে। কিন্তু সাক্ষরতার হারের তুলনায়ও এই অংশগ্রহণের হার অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নীচু। নারী সাক্ষরতার হার ১৯৬১ এর ৮.৬% থেকে ১৯৮১ তে ১৩.২% এ বেড়েছে। কিন্তু এই সময়কালে কাজে অংশগ্রহণের হার ৫.১ শতাংশে অপরিবর্তিত থেকে যায়। নারী শিক্ষার অগ্রগতি সত্ত্বেও এভাবে মহিলাদের চাকুরীর ব্যাপারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব অব্যাহত থাকে। এই চিত্রের অপর দিক হচ্ছে কর্মসংস্থানের সুযোগের দুর্বল পরিস্থিতিতে পুরুষ শ্রমশক্তি অব্যাহতভাবে কর্মসংস্থানের বাজার দখল করে রাখে। এমনকি যদিও নারী সাক্ষরতার হার (৮.৬%) পুরুষ সাক্ষরতার হারের (২৬%) তুলনায় ১৯৬১ সালে ছিল এক-তৃতীয়াংশ এবং ১৯৮১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে অর্ধেকে দাঁড়ায় (২৬% এর বিপরীতে ১৩.২%); মহিলা জনসংখ্যার তুলনামূলক অংশগ্রহণের হার কিন্তু অপরিবর্তিত থাকে। এর সমান্তরালভাবে শহরাঞ্চলে শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে মহিলা সাক্ষরতার এবং মহিলা অংশগ্রহণ হারের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। এর ভিন্নতর কারণ হচ্ছে কোন সাংস্কৃতিক সমস্যা নয়, চাকুরীর বাজার এবং শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা। অপরপক্ষে এই ভারসাম্যহীনতা সে সব চাকুরীতে শিক্ষিতদের নিম্ন কর্মসংস্থান ঘটায়, যেখানে স্বল্প শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন। গ্রামীণ শ্রম-বাজারের প্রতিবিম্বের মত শহরাঞ্চলের শ্রম বাজারেও বেকারত্ব ও আংশিক বেকারত্বের যৌথ সমস্যা দেখা যায়।

দারিদ্র্য ও বেকারত্ব

১০। তৃতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য দূরীকরণ। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৪ এর মধ্যে দারিদ্র্য সীমার নীচের জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ থেকে বেড়ে চার পঞ্চমাংশের উপরে হয়েছে। চরম দারিদ্র্যের অনুপাতও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্ধারিত ন্যূনতম ক্যালরীর চেয়েও কম ক্যালরীর-খাদ্য গ্রহণকারী গৃহস্থালীর অনুপাত ১৯৭৫/৭৬ এর ৫৯ শতাংশ থেকে ১৯৮১/৮২ তে ৭৬ (২২৭৩কে ক্যাল) শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যোৎপাদন এবং খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ক্যালরী গ্রহণের এই নিম্নগতির সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতির ফলে এ সচেতনা দেখা দিয়েছে যে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির সমান্তরালভাবে সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সুবিধার ব্যবস্থা করতে হলে কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি প্রয়োজন। বিদ্যমান অবস্থা হচ্ছে এর উল্টো দিক। ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বাধীনতার পর থেকে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের আয় কমেছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রকৃত পক্ষে ১৯৬৩/৬৪ এর স্তরের তুলনায় ১৯৮৩/৮৪ এর কৃষি বেতন মাত্র ৬৪%। কুটির শিল্পের মত খামার বহির্ভুত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও খারাপ। সেখানে দৈনিক গড় বেতন অদক্ষ কৃষি শ্রমিকের চেয়ে অনেক কম। খামার বহির্ভুত তৎপরতাকে পারিবারিক শ্রমের সম্প্রসারণ হিসেবে দেখা হয় বিধায় সেক্ষেত্রে নারী ও শিশু শ্রমিকের হার বাড়ছে। এমনকি প্রাথমিক স্কুলসমূহে কম ভর্তি এবং পড়া ছেড়ে দেবার উচ্চ হার গ্রামীন দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ ফল। আয়ের নিম্নস্তর, দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি পরস্পরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অবলম্বনের অভাব পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছে। পরিকল্পনায় দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচীতে তাই উৎপাদনভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর এমনভাবে জোর দেয়া উচিত যাতে পারিবারিক আয় এমন এক স্তরে উন্নীত হয়, যা দিয়ে দারিদ্র্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুষ্টচক্র ভাংগাতে সহায়ক হতে পারে। পরিকল্পনার সময়কালে যা করতে চাওয়া হবে তা শুধু কর্মসংস্থানে সামান্য সম্প্রসারণ নয়, বরং সার্বিক উৎপাদন স্তরের একটি পরিবর্তন।

কর্মসংস্থানের সুযোগ

১১। **ফসল উৎপাদনে শ্রমিক অধিগতকরণঃ** বাংলাদেশের দুটি মূল সম্পদ হচ্ছে ভূমি এবং শ্রমিক। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা কম। ধানের মত গুরুত্বপূর্ণ ফসলের ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের প্রায় এক- তৃতীয়াংশ এবং ইন্দোনেশিয়ার অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী। ভূমির স্বল্প-তার কারণে খাদ্য চাহিদা মিটানোর জন্য ব্যাপক ভাবে নিবিড় চাষাবাদ ছাড়া বাংলাদেশের সামনে বিকল্প কোন পন্থা নেই। এ ব্যাপারে প্রযুক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পানি, সার প্রযুক্তি যে কেবল শ্রমঘন তাই নয়, বরং ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাধ্যমে এককালীন খাদ্য ফলন এবং ক্ষুদে শস্যকে উদ্বৃত্তে রূপান্তরের মত কৃষি বিষয়ক তৎপরতায়ও গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ প্রভাব ফেলে। অপরপক্ষে শ্রম উৎপাদনশীলতা খামার বহির্ভূত আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতেই যে কোন মানের তুলনায় অত্যন্ত নীচু। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৯/৮০এর গ্রামীণ শিল্প জরিপ মোতাবেক চাউল কলে প্রতিশ্রম-দিবসের আয় ছিল ৬'৭২ টাকা মাত্র অথচ অদক্ষ কৃষি বেতন ছিল ১২'৪৬ টাকা এবং হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে তা ছিল ১১'৬৬ টাকা। কতিপয় উন্নয়ন কর্মসূচীর পাশাপাশি পর্যালোচনাও অদক্ষ কৃষি বেতনের তুলনায় খামার বহির্ভূত বেতনের নিম্নহারের ইংগিত দেয়। সংগঠিত উৎপাদনকারী খাতে উৎপাদনশীলতা কেবল নীচুই নয়, সাম্প্রতিক বছর গুলোতে তা ব্যাহতও হয়েছে। মূলধনের মোট উৎপাদনক্ষমতা ১৯৭৩/৭৪ এর ১'১১ থেকে ১৯৮৩/৮৪ তে ০'৯৮ এ নেমে এসেছে এবং শ্রম অংশীদারীর ১৯৭৩/৭৪ এবং ১৯৮১/৮২ এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশেরও বেশী কমে গেছে। বাজার সংকোচনের মত বাহ্যিক পরিস্থিতি এই অবক্ষয়ের জন্যে আংশিকভাবে দায়ী, কিন্তু একথা অস্বীকার করারও উপায় নেই যে শ্রম উৎপাদন-ক্ষমতাও কম। এই অসন্তোষজনক অবস্থার জন্য দুটি মৌলিক কারণ দায়ী। প্রথমতঃ দক্ষ শ্রম শক্তির অভাব রয়েছে, বিশেষ করে জনসংখ্যার সাধারণ অশিক্ষার প্রেক্ষাপটে দক্ষ জনশক্তির সরবরাহ কম এবং দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থা যা সাধারণ শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত । দ্বিতীয়তঃ বিনিয়োগের স্তর হচ্ছে নিচু। জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের উপর বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষা মোতাবেক বাংলাদেশে বৃদ্ধিমূলক মূলধন শ্রমের অনুপাত ভারত ও শ্রীলংকার এক তৃতীয়াংশের চেয়ে সামান্য বেশী এবং পাকিস্তানের দুই পঞ্চমাংশেরও কম। কুটির শিল্পে শ্রমিক প্রতি বিনিয়োগের অবস্থা আরও খারাপ, শ্রমিক প্রতি গড় বিনিয়োগ ৩,০০০ টাকা মাত্র। অথচ জাতীয় গড় তার চেয়ে ১২ গুণ বেশী। সম্প্রতি শিল্পখাত কুটির ও বৃহৎশিল্পের দ্বৈতনীতিতে ভুগছে; ফলে ত্রিমুখী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আধুনিক শিল্পে উচ্চ বিনিয়োগ সত্ত্বেও দক্ষ শ্রম শক্তির অভাবে শ্রম উৎপাদনশীলতা তাদের প্রযুক্তিতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। স্বল্প উৎপাদনশীলতা ও দ্বৈতনীতির এই পটভূমিতে বাংলাদেশের দুই প্রধান সম্পদ তথা ভূমি ও শ্রম এর সার্থক ব্যবহারের ভিত্তি গঠিত হবে দক্ষ সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে। প্রযুক্তি হবে এর বাহন এবং বিনিয়োগ হবে চালিকাশক্তি।

১২। কৃষির প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা ছাড়া স্বল্পকালীন সময়ে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস ঘটানো সম্ভব নয়। জিডিপি-র অর্ধেক এবং কর্মসংস্থানের প্রায় এক তৃতীয়াংশ যে এর সাথে জড়িত শুধু এ কারণেই নয়। ভূমির প্রতি জনগণের গভীর মমত্বের জন্যও একথা প্রযোজ্য। কৃষি কার্যের বর্তমান অবস্থা এবং এর উন্নয়নের সম্ভাব্যতায় অতিরিক্ত শ্রম শক্তি অধিগত করার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য নতুন বীজ, সার, সেচ প্রযুক্তির ব্যবহার উচ্চ ফলন বাড়াবে এবং শ্রমিকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে। প্রযুক্তির সম্প্রসারণের ফলে কর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি আশা করা যায়। বর্তমানে মোট ফসলী জমির মাত্র এক চতুর্থাংশ নতুন প্রযুক্তির আওতায় এসেছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে ১৯৮৯/৯০ সালে এই অংশীদারিত্ব ৪০% এর ওপরে বৃদ্ধি পাবে এবং খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে ২৮'৬%। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এই বৃদ্ধি ঘটবে বিধায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ ১৪'৩% বাড়বে বলে হিসেব করা হয়েছে। কৃষি কর্মসংস্থানের অর্ধেকেরও বেশী খাদ্যোৎপাদনে নিয়োজিত যার সংখ্যা ১৯৮১ সালের আদমশুমারী মোতাবেক ১৫৪ লাখ এবং ১৯৮৩/৮৪ এর

জনশক্তি জরিপ মোতাবেক ১৬৪ লাখ। পরবর্তী সংখ্যা এবং সে বছরের খাদ্যোৎপাদনকে ভিত্তি চিহ্ন হিসেবে ধরে খাদ্যোৎপাদনে শ্রমশক্তির পরিমাণ ১৯৮৩/৮৪ এর ৮২ লাখ হতে ১৯৮৯/৯০ এ ৯৫ লাখে বৃদ্ধি পাবে; অর্থাৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী তৃতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যোৎপাদন ১৩ লাখেরও বেশী চাকুরী সৃষ্টি করবে।

১৩। বর্গাপ্রথা এবং খামারের আকৃতির পরিবর্তন, প্রযুক্তির বিস্তার এবং ফসল পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে কৃষিতে বাড়তি শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত করার হার দ্রুততর করার সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই প্রযুক্তিতে ভূমি মালিকানার প্রতি ঝোঁক এবং ভাগ-চাষের প্রতি বিরূপ মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। দুই কৃষি শুমারীর (১৯৬০ এবং ১৯৭৭) মধ্যবর্তী সময়ে ভাগ-চাষের নিম্নগতি—১৯৬০ সালের ১৮.২% থেকে ১৯৭৭ সালে ১৬.৮% পরিলক্ষিত হয়। ১ একরের কম এবং ৭.৫ একরের বেশী জমির মালিকানার ক্ষেত্রে একই অবস্থা দেখা যায়। অপরদিকে ১ হতে ২.৫ একর এবং ২.৫ একর হতে ৭.৫ একর পর্যন্ত জমির মালিকানার পরিমাণ যথাক্রমে ২৫% এবং ৮% বেড়েছে। ১৯৮২ এর পরীক্ষামূলক কৃষি শুমারীতে ০.৫ হতে ২.৫ একরের মধ্যে ক্ষুদ্র জমির মালিকানায় আরও ঘনীভূতরূপ পরিলক্ষিত হয়। তাদের অংশীদারিত্ব ১৯৭৭ এর ১৯% হতে ২৯% বেড়েছে। সেইসংগে ২.৫ হতে ৭.৫ একরের মধ্যবর্তী এবং ৭.৫ একরের বেশী জমির মালিকানার অংশীদারিত্ব যথাক্রমে ৪৯% হতে ৪৭% এবং ৩২% হতে ২৪% এ নেমে এসেছে। ক্ষুদ্র খামারের অনুকূলে খামার মালিকানা কাঠামোর এই পরিবর্তন যদি অব্যাহত থাকে তবে অবশ্যই তা শ্রমশক্তি কৃষিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কারণ ক্ষুদ্র খামারসমূহ প্রধানতঃ পারিবারিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল। তাই বড় খামারের তুলনায় এখানে শ্রমের ব্যাপকতর ব্যবহার ঘটে এবং তা বাড়তি শ্রমেরও উৎস।

১৪। কৃষিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ব্যবহৃত হবার পক্ষে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হচ্ছে এই যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীরা নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে অধিকতর উৎসাহী। মাইক্রো স্তরের কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, তাদের ফসলের ঘনত্ব নিবিড়তর উচ্চফলনশীল জাতের বীজের অধীনে অধিকতর আবাদী জমি রয়েছে এবং একর প্রতি সার ব্যবহারের পরিমাণও বেশী। এটা হতে পারে যে, জমি মালিকানা কাঠামোর পরিলক্ষিত পরিবর্তন নতুন প্রযুক্তির প্রতি ক্ষুদ্র খামারের অধিকতর সাড়ারই ফল।

খামার বহির্ভূত কর্মসংস্থান

১৫। এমনকি ফসল উৎপাদনে শ্রম শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনাসমূহের পূর্ণাংগ বিকাশের পরও বিপুল সংখ্যক বাড়তি শ্রমিক থেকে যাবে, যাদের জন্য খামারবহির্ভূত খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজন। এই কারণে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য আধুনিক শিল্পে ব্যর্থতার জন্য মৎস্য ও পশুপালন, গ্রামীণ অবকাঠামো এবং গ্রামীণ শিল্পের মত ফসল বহির্ভূক্ত খাতে পল্লী এলাকায় খামার বহির্ভূত কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর ক্রমবর্ধমান হারে জোর দেয়া হচ্ছে। গত দশকে আধুনিক শিল্পে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি ছিল অত্যন্ত সীমিত। সরকারী খাতের বিনিয়োগ প্রধানতঃ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নির্ধারিত ছিল এবং সরকারী খাতে সৃষ্ট অধিকাংশ ক্ষমতাই ছিল মূলধন কেন্দ্রিক। আধুনিক শিল্পে মাত্র ৫০০,০০০ (শ্রম শক্তির ২% এরও কম) জন লোক নিযুক্ত রয়েছে এবং শ্রমশক্তির কোন উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবহার করতে গেলে বিপুল পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন হবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান পরিস্থিতির ক্রমাবনতি এবং আধুনিক শিল্পের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কারণে স্বাধীনতার পর গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী জনস্রোতের পাশাপাশি শহরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বেশ দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা এবং চাকুরীর দ্বারা স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। শহরে জনসংখ্যার অনুমিত বৃদ্ধি মোতাবেক শহরের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত আরও সম্প্রসারিত হবে। রাস্তার পার্শ্বে কারখানার মত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কিছু কিছু উদ্যোগ ছোট ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ, কাঁচামাল এবং উন্নত প্রযুক্তির ঘাটতি রয়েছে। যথাযথ সেবা ও সহায়তা পেলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখতে পারে।

১৬। তৃতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য প্রধান গুরুত্ব দেয়া হবে গ্রামীণ শিল্পের বিকাশের ওপর। কুটির শিল্পের মধ্যে ইতিমধ্যেই গ্রামীণ শিল্পের এক ব্যাপক ভিত্তি রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১৫ লাখ লোক অথবা শ্রমশক্তির প্রায় ৭% গ্রামীণ শিল্পের সংগে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু একটি পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে এই শিল্প সমূহের বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতি শহরাঞ্চলে চাহিদা অথবা ক্ষুদ্র সচ্ছল গ্রামীণ জনগণের উৎপাদন ও ভোগের চাহিদার কোনটাই মেটাতে পারে না। তারা পল্লী এলাকার বিপুলসংখ্যক গ্রামীণ খানার চাহিদা মেটায়। ফলে সাধারণ দারিদ্র্যজনিত অবস্থার মধ্যে একটা নির্ভরশীল সম্পর্ক গড়ে উঠে। গ্রামীণ খানার বহির্ভূত খাত স্বল্প আয়ের এক চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে বলে মনে হয় যা স্বল্প চাহিদা, স্বল্প মাত্রায় বিনিয়োগ এবং নিচু স্তরের প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। দরিদ্রখানার উপর ভর করে গ্রামীণ শিল্পের গতিশীল প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই কৃষি এবং শিল্পকে আওতার মধ্যে নিয়ে একটা ব্যাপক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রয়োজন হবে যা পণ্যের সরবরাহ ও চাহিদার মাধ্যমে পরস্পরকে শক্তি যোগাবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন যে কুটির শিল্পের মত একটা বিলুপ্ত-প্রায় খানার বহির্ভূক্ত খাত শ্রমিক এবং ভোগ্যপণ্যের বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে যা কৃষি উন্নয়নে শুধু বোঝাই বাড়াচ্ছে।

১৭। গ্রামে প্রস্তুত পণ্য সামগ্রীর বাজার ও শ্রমিকের সম্ভাব্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির যুক্তি-গ্রাহ্য পন্থা হচ্ছে গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ। প্রধানতঃ স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কাঁচা এবং দেশজ সম্পদের ওপর ভিত্তি করে এ গুলো গড়ে উঠায় উৎসাহ দিতে হবে যাতে এগুলোর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুবিধা আহরণ করা যায়। অন্য কথায়, কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর চারিদিকে এই গ্রামীণ শিল্প পরিব্যাপ্ত করে তুলতে হবে। কৃষি সহায়ক ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং প্রধানতঃ গ্রামীণ চাহিদা নিবৃত্ত করার উপযোগী ভোগ্যপণ্য শিল্পের ওপর জোর দিয়ে তা দুটি সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করবে। গ্রামীণ উন্নয়নের প্রথম দশা তৎপরতা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে হলে পল্লী এলাকায় ভোগ্যপণ্য ও সার্ভিস শিল্পসমূহের উন্নয়নের ওপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে বর্ধিত গ্রামীণ আয় প্রধানতঃ পল্লী এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের পেছনে ব্যয় হয়। কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ, পল্লী বিদ্যুতায়ন, জনশক্তি প্রশিক্ষণ এবং ঋণ ও বাজার সুবিধাদিরও উন্নয়ন প্রয়োজন।

১৮। গ্রামীণ শিল্প অন্য কিছুর পরিবর্তে চরিত্রগতভাবে শ্রমিকমুখী হওয়া উচিৎ। অবশ্য সংখ্যার সাথে সাথে কর্মসংস্থানের উৎপাদনশীলতার দিকটিও হিসেবে ধরতে হবে যাতে শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর মত তাদের জন্য পর্যাপ্ত বেতন স্তর বহাল রাখা যায়। তাই গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নকল্পে কৃষির সাথে সাথে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিতে হবে। উন্নত প্রযুক্তি গ্রামীণ অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে ও অংশে উৎপাদিত সামগ্রীর মানোন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং ব্যয় ও মূল্য কমিয়ে তা বৃহত্তর বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। উচ্চ উৎপাদনশীলতা ও আয় বিশেষ করে স্কুলগামী বয়স গোষ্ঠির পারিবারিক শ্রমে অংশগ্রহণের হার কমাতে পারে। এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে ৫—১৪ বছর বয়স গোষ্ঠির ৩৭ লাখ কর্মরত শিশু রয়েছে। তাই দরিদ্র পরিবারসমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও স্কুলের পরিবেশেরও উন্নতি ঘটাতে হবে।

অবকাঠামো উন্নয়ন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান:

১৯। গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য নিবিড় শ্রম পদ্ধতি ব্যবহার করে সড়ক ও দালান কোঠার অবকাঠামোসমূহের উন্নয়ন প্রয়োজন, যা সৃষ্ট সম্পদ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ স্বল্প মেয়াদী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে যে সব সুযোগ সৃষ্ট করা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অস্থায়ী ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এই কর্মসূচীর অধীনে বছরে প্রায় ৮০ হতে ১০০ লাখ জনশক্তি দিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হবে।

২০। গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণে সরাসরি নিয়োগক্ষম জন সংখ্যার ওপর এসব কর্মসূচী প্রভাব ফেলবে বলে তাদের দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া উচিৎ হবে না। উৎপাদন ও আয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ওপর এ সমস্ত কর্মসূচীর দীর্ঘ-মেয়াদী কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নির্ভর করবে। তাই গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করার জন্য গ্রামীণ অবকাঠামোকে যথাযথ ভাবে পরিকল্পিত, সুনির্মিত এবং পর্যাপ্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

২১। উন্নয়নের প্রেক্ষিতে সুসংহত দৃষ্টিভংগীর অভাব ছাড়াও অসন্তোষজনক পরিকল্পনা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং নক্সা সংগঠন ও বাস্তবায়নে অপূর্ণতার কারণে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী (FWP) এবং গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচী (RWP) ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অবশ্য গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচীর সাম্প্রতিক পুনর্গঠন, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন সেল প্রতিষ্ঠা এবং মন্ত্রণালয়সমূহে ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি, সেই সাথে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে উপজেলা স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষমতার ব্যবস্থা এসব কর্মসূচীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন উভয় লক্ষ্য অর্জনে দক্ষতার উন্নতি ঘটাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থান

২২। দারিদ্র্য দূরীকরণের সংগ্রামে গ্রামীণ খামার বহির্ভূত কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপকারী একটি উন্নয়ন কৌশলের সাফল্য নির্ভর করে একটি দেশের লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি বাছাই ও উন্নতি সাধন করার ওপর প্রযুক্তির সঠিক বাছাই ও প্রয়োগের সাথে প্রয়োজনীয় সংযোগের অনুপস্থিতিতে দেখা গেছে যে বাংলাদেশে ব্যবহৃত অনেক প্রযুক্তি কর্মসংস্থানের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এখানে প্রযুক্তিগত দ্বৈতভাব রয়েছে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে তা আধুনিক পরিশোধিত প্রযুক্তিই হোক আর ঐতিহ্যবাহী উচ্চ শ্রমচাহিদাসৃষ্টি কারী প্রযুক্তিই হোক। শেষোক্ত ধরণের প্রযুক্তিকে উদাহরণ হিসেবে ধরলে ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ৪৬০০ লাখ কর্মদিবসের ব্যবস্থা করে। ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের ৮০ শতাংশেরও বেশী কর্মদিবস আসে চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে যা ভূমিহীন মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয়ের প্রধান উৎস। অবশ্য যন্ত্রশক্তির দ্রুত বৃদ্ধি বছরে ৩৫ থেকে ৫০ লাখ দিবস হারে এই ঐতিহ্যবাহী কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট করছে। অপরদিকে এধরণের কাজের বেতন অদক্ষ খামার শ্রমিকদের চেয়েও কম। তাই চাহিদার দিক থেকে দেখলে এ ধরণের কাজ গ্রামীণ উন্নয়নে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। কারণ নিম্ন আয়ের ফাঁদ বলে কথিত নিম্ন আয়ের দুষ্ট চক্রে তারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই ফাঁদ ভাংগার জন্য গ্রামীণ প্রযুক্তির অবশ্যই উন্নয়ন প্রয়োজন। অধিকন্তু অধিকতর অগ্রসর খাতের সাথে সম্পদভিত্তিক ও দক্ষ পশ্চাৎ ও সম্মুখবর্তী যোগসূত্র উন্নয়নের জন্য ভারসাম্যতা এড়াতে যথাযথ প্রযুক্তি বাছাই এর ক্ষেত্রে আরও সতর্ক ও যুক্তিসংগত দৃষ্টি ভংগী অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ বিদ্যমান প্রযুক্তিগত দ্বৈতভাব তাদের পণ্যের বাজারের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকর পশ্চাৎ ও সম্মুখবর্তী যোগসূত্র উন্নয়ন সাধন করতে পারে না। পল্লী এলাকায় লাগসই প্রযুক্তির ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত শহরে উৎপাদিত অথবা আমদানীকৃত পণ্যের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাতে হবে। এতে সেখানকার সম্পদ অন্যত্র চলে যাবে এবং আত্মনির্ভরশীল গ্রামীণ উন্নয়নের সুযোগও হ্রাস পাবে।

২৩। গ্রামীণ প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন অত্যাবশ্যক এবং এতে অতিরিক্ততার ভয় রয়েছে, বিধায় প্রযুক্তি পছন্দ বাছাইয়ের কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রযুক্তিকে অবশ্যই মানুষ ও বাজারের নিরিখে বিচার করতে হবে। মানুষের সাথে সম্পর্কের বিচারে প্রযুক্তির উন্নয়ন অবশ্যই স্থানীয় চাহিদা, মানব সংস্কৃতি ও আচরনের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে যাতে তা মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি না করে। মুখ্যতঃ উন্নয়ন এমন হওয়া উচিৎ যাতে তা শ্রম বিচ্যুতির পরিবর্তে শ্রম অন্তর্ভুক্তকারক

হয়, একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রগন্ডীতে নয়, স্থানীয় উন্নয়নের ব্যাপকতর পরিবিতে এর প্রভাব যাতে উপযুক্ত লোকজনের দৃষ্টি গোচর হয়। তাই গ্রামীণ প্রযুক্তির উন্নয়নকল্পে দক্ষতা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে উৎপাদন বাড়াতে মানুষ এবং যন্ত্র কে কার্যকরভাবে সংযুক্ত করা যায়। এটাও স্বীকার করতে হবে যে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী নতুন প্রযুক্তি এর উৎপাদিত সামগ্রীকে উৎপাদকদের ব্যবহারের জন্য সীমাবদ্ধ না রেখে সাধারণের ভোগের জন্য সামাজিক পণ্যে পরিনত করে। এ কারণে নতুন প্রযুক্তির চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। তাই দক্ষতা সৃষ্টি প্রশিক্ষণের আওতায় কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা এই উভয় দক্ষতাকে আনতে হবে।

২৪। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির অভাব থেকে প্রধানত: বিদ্যমান অযথার্থ প্রযুক্তির গোড়াপত্তন ঘটেছে। দ্বিতীয়ত: বিদ্যমান শ্রেণীবদ্ধ অর্থনৈতিক নীতি ব্যবস্থার ফলে পরস্পরের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে; কারণ এর অধিকাংশই গ্রহণ করা হয়েছে প্রযুক্তি বাছাই এর ওপর তাদের প্রভাবের যথাযথ মূল্যায়ন ছাড়াই। উপহার পাওয়া ঘোড়ার মত আমদানিকৃত বর্তমান প্রযুক্তিসমূহকে প্রত্যক্ষ ভাবে ভর্তুকী দিতে হচ্ছে। অপরদিকে স্থানীয় প্রযুক্তি তাদের উন্নয়নের অভাবে পরিকল্পিত উন্নয়নের বিপরীতে যুগের অনুপযোগী অবসন্নতায় ভুগছে। এমনকি যেখানে অবাধ বাছাই করা গেছে সেক্ষেত্রেও মূলধনের অযথার্থ মূল্য নির্ধারণ যেমন নিম্ন সুদের হার এবং নিম্ন ট্যারিফ শ্রমঘন প্রযুক্তির পরিবর্তে মূলধনঘন প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করেছে।

২৫। উপরোল্লিখিত সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত বিষয়সম্বলিত সুসংহত দৃষ্টিভংগী প্রয়োজন:

(১) প্রযুক্তি নীতি ও কর্মসংস্থাননীতির মধ্যকার যোগসূত্র সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ এবং এগুলোকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে রূপান্তর ;

(২) প্রযুক্তি বাছাই এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিরিখে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তথ্য আহরণ শক্তিশালী করা ; এবং

(৩) প্রযুক্তি নির্ধারণ, উন্নয়ন, বিতরণ এবং মূল্যায়নের নিরিখে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা উন্নয়ন।

এগুলোর জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন ধরণের পদক্ষেপ।

প্রযুক্তি নির্ধারণ, আত্মীকরণ এবং প্রসারণ:

২৬। যথাযথ প্রযুক্তির সফল সম্প্রসারণের জন্য অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ প্রয়োজন যার মাধ্যমে বিশেষ করে গ্রামীণ খাতে অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি চিহ্নিত করা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী তৎপরতা অনুযায়ী কাজ করা যায়। পল্লী এলাকায় যথাযথ প্রযুক্তির তৎপরতা ও সম্প্রসারণে সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনসমূহের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, এতে রয়েছে বিস্তর বাধা যা আরও দক্ষ প্রক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে অতিক্রম করতে হবে। এসমস্ত বাধার মধ্যে রয়েছে:

(১) গ্রামীণ অর্থনীতির চাহিদা নিরূপণে এবং এধরণের চাহিদা মোকাবেলায় প্রযুক্তিগত সমাধানের জন্য কাজ করতে বিদ্যমান গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইচ্ছা অথবা ক্ষমতার অভাব।

(২) গ্রামীণ অর্থনীতির প্রযুক্তিগত চাহিদার প্রেক্ষাপটে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহের তত্ত্বাবধানকারী সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব,

(৩) আনুষ্ঠানিক গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে সহযোগিতার অভাব,

(৪) ক্ষেত্রের অবস্থা অনুযায়ী প্রযুক্তি আত্তীকরণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংবাদ আদান প্রদানের অভাব,

(৫) প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কাজে পর্যাপ্ত গুরুত্বদানের অভাব, এবং

(৬) যথাযথ দক্ষতা, প্রশিক্ষণ সুবিধাদি ও পরবর্তী কার্যক্রমের অভাব।

২৭। প্রযুক্তি ও জনসম্পদের সুষম উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি এই উভয় নিরিখেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত মনোনয়ন চিহ্নিত করা প্রয়োজন হবে এবং প্রযুক্তি ও দক্ষতার যথাযথ রেখাচিত্র সংমিশ্রণের লক্ষ্যে এবং জনশক্তি ও অন্যান্য সম্পদের অবস্থার পেক্ষাপটে এগুলির সম্ভাব্য নিরূপণ দরকার। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পরিকল্পিত উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য বিধায় পরিকল্পিত উপায়ে উভয় রেখাচিত্রেরই পরিবর্তন সাধন করা হবে।

২৮। একটি প্রযুক্তি নীতি প্রণয়নের প্রচেষ্টা অবশ্য সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। যদিও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ (এস টি ডি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীনতার পর পরই এধরণের একটি নীতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাউন্সিল (এন সি এস টি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা পুর্ণব্যক্ত হয়েছে তথাপি জাতীয় প্রযুক্তি নীতি ও পরিকল্পনার অনুপস্থিতি শুধু যে অতীত প্রচেষ্টার কার্যকারিতাকে নষ্ট করেছে তাই নয়, বরং অসামঞ্জস্যপুর্ণ উন্নয়নেরও সৃষ্টি করেছে। তাই ১৯৮০ এর জুলাইতে এন সি এস টি পুনর্গঠিত হয় এবং তাকে গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কাজের সমন্বয় সাধন ও দিক নির্দেশনা দান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য একটি ব্যাপক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন সহ কতিপয় গুরুদায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু জাতীয় নীতির সাথে সংগতিপুর্ণ একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি এখনও প্রণীত হয়নি। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রয়োজনে যথাযথ প্রযুক্তি উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউট কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এখনও দ্রুত উন্নয়নের অপেক্ষায় রয়েছে। সকল সংকটজনক এলাকায় যথাযথ প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য জরুরী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হলে একাধিক সংখ্যক টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতার রেখাচিত্র প্রণয়নে মধ্যবর্তী প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন খাতে দেশজ প্রযুক্তির তালিকা প্রণয়ন। প্রত্যেকটি প্রকল্প আভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যয় মূল সংযোজনা (value added) চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি ও আত্মনির্ভরশীলতার নিরিখে যথাযথভাবে পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করা উচিৎ। সংকটজনক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দী প্রযুক্তিসমূহ বাছাই করার জন্য একটি জাতীয় টেকনো-ইকোনমিক ইনষ্টিটিউট স্থাপনের প্রশ্নটি পরিকল্পনার প্রাথমিক বিবেচনায় আনা উচিৎ।

২৯। কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী নীতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি উন্নয়ন সম্প্রসারণের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো প্রয়োজন। যদিও বিপুল সংখ্যক সংস্থাসমূহ ইতিমধ্যেই জড়িত রয়েছে তথাপি স্থানীয় ও জাতীয় উভয় স্তরে কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা স্তরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের সুবিধাদি সৃষ্টি ও প্রযুক্তি বিস্তারের ব্যবস্থা সমাজের দুর্বল গোষ্ঠীকে এসমস্ত প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসবে যা ঐতিহ্যবাহী কর্মতৎপরতায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে এবং আয় ও ভোগ্য পণ্য চাহিদা প্রবৃদ্ধির সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মতৎপরতায় সাহায্য করবে। উপজেলার মধ্যে পাওয়া যায়না এমন প্রয়োজনীয় কারিগরী বিশেষ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের স্থান নির্ধারণ ও ব্যবস্থাকরণে সহায়তাসহ, এবং ঋণ, কাঁচামাল ও বাজারজাতকরণের নিরিখে সহায়তা সার্ভিসের ব্যবস্থা করাসহ, মানবিক ও বস্তুগত সম্পদের প্রাপ্যতা, প্রযুক্তিগত চাহিদা এবং বাজারের প্রকৃতি ও আকৃতি চিহ্নিত করার ব্যাপারে উপজেলা স্তরে সামাজিক কারিগরী অর্থনৈতিক জরীপ চালাতে স্থানীয়/উপজেলা স্তরের তৎপরতাকে জাতীয় স্তরে সহায়তা করা উচিৎ।

কর্মসংস্থান নীতি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

৩০। একটি কর্মসংস্থান ও জনশক্তি নীতির জন্য অবশ্য একটি গবেষণা ও উন্নয়ন নীতি সংগতি পূর্ণ। বাংলাদেশে বিপুল জনশক্তি রয়েছে যা মানবিক মূলধনরূপে উৎপাদনমুখী সম্পদে রূপান্তরিত করা যায়। জনসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নির্ভর করে একদিকে একটা সম্ভাবনাপূর্ণ কর্মসংস্থান কৌশলের উপর যা ব্যাপক বেকার জনগোষ্ঠি এবং আধাবেকারদের উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে চায় এবং অপরদিকে একটি জনশক্তি নীতির ভিত্তিতে শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের কারিগরী ক্ষমতা বাড়াতে চায়। কিন্তু জনগণের এক বিপুল অংশ অতি সাধারন জীবন ধারনের অবস্থায় সীমিত জ্ঞান নিয়ে বসবাস করে। তারা গরীব বিধায় অশিক্ষিতও। তাই তাদের উৎপাদনশীলতাও কম। শিক্ষার অব্যাহত নিম্নহারের মধ্যে প্রতিফলিত হয়; যে অতীতে মানব সম্পদ উন্নয়নকে পুরোপুরি অবহেলা করা হয়েছে। ১৯৬১ হতে ১৯৮১ তে শিক্ষার হার ১৭% থেকে ১৯.৭% এ বেড়েছে। জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ এবং শ্রম শক্তির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সম্পদ বরাদ্দে নিম্ন অগ্রাধিকার এবং শিক্ষা সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতার আরো নিম্নস্তর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যায় এ সমস্যাকে জট পাকিয়ে তুলেছে। সরকারী উন্নয়ন কর্মসূচীতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের খাতে বরাদ্দ প্রথম পরিকল্পনার ৫.৪% থেকে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩.৫% এ কমে যায়। যদিও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত পুর্নদীপ্ত সচেতনতা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ৪.১% এ উন্নীত করতে সাহায্য করে তথাপি তাও সম্পদ স্বল্পতার একটা প্রধান শিকার। অবশ্য এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সম্পদ ব্যবহারের উপর অধিকতর জোর দেয়া হয় এবং শিক্ষায় বর্তমান ব্যয় ১৯৭৯/৮০ এর ১৭৬.৮ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ তে ৪৯২.৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি ২০% এর পাশাপাশি শিক্ষার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২৩%। তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়ন ও রাজস্ব উভয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর উপর জোর দেয়া হয়েছে। শিক্ষা উন্নয়নের বরাদ্দ দ্বিতীয় পরিকল্পনার ৪.১% থেকে ৪.৬% এ বাড়ানো হয়েছে এবং শিক্ষার বর্তমান ব্যয় ৬% হারে বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয়েছে।

৩১। বিভিন্ন খাতে বিপুল সংখ্যক সংস্থা কর্তৃক আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রচেষ্টার বহুত্ব সত্ত্বেও কর্মসংস্থান পরিস্থিতির অবনতির প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এটা বোধগম্য হয়েছে যে, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে একটা সমন্বিত দৃষ্টিভংগীর প্রয়োজন। বেকারত্ব পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণের পর জাতীয় দৃষ্টিমূল হিসেবে একটি কর্মসংস্থান তথ্য আহরণ পর্যা-লোচনা ও নীতি নির্ধারণী ইউনিট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে স্বীকৃত হয়েছে। ইউনিটের প্রয়োজনীয়তাকে বাড়িয়ে বলার কোন অবকাশ নাই এ কারণে যে, চরিত্রগতভাবে কর্মসংস্থান বহুখাতমূলক এবং তাই সার্বিক অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবেই একে মোকাবেলা করতে হবে। বেকারত্বের সমস্যা এত ব্যাপক যে, এর গোটা চিত্র পেতে হলে এর আংশিক বর্ণনাকেও খণ্ডিত করতে হয়। ইউনিটটিকে যত শীঘ্র সম্ভব চালু করতে হবে যাতে একটি জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি অচিরেই প্রণয়ন করা যায়। পরিকল্পনা কমিশন একটি জনশক্তি পরিকল্পনা তৈরী করেছে যা একদিকে একটি কর্মসংস্থান নীতি এবং অন্য দিকে বাস্তবভিত্তিক একটি প্রযুক্তি নীতি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় উপাদান যোগাবে।

৩২। মানব সম্পদের উন্নয়ন অবশ্যই উৎপাদনশীল খামার বহির্ভূত তৎপরতায় তাদের অংশ গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে অসুবিধাজনক অবস্থানে স্থিত সামাজিক গোষ্ঠির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা উচিৎ। দুটি প্রধান গোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণ চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করা হবে, (ক) গ্রামীণ গরীবদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এবং (খ) সরকারী এবং স্থানীয়ভাবে নিয়োজিত কর্মকর্তা এবং গ্রামীণ জনগণের সুবিধা বিধানকারী ও উদ্বুদ্ধকারীদেরকে, যারা প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সহায়তা সার্ভিস দানের কাজে জড়িত থাকবে তাদের সাক্ষরতা ও হিসেব প্রশিক্ষণের উপর দক্ষতার পূর্বশর্ত হিসেবে বিশেষ নজর দিতে হবে। সরকারের নূতন বিকেন্দ্রীকরণ কৌশল একটি নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করবে যার মধ্যে নিম্নতম স্তরে প্রশিক্ষণ চাহিদা চিহ্নিত করা হবে এবং যথাযথ দক্ষতা সৃষ্টি হবে।

৩৩। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরণের সংস্থাসমূহ গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থান সুবিধাদির উন্নয়নে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রচেষ্টার সাথে জড়িত। শিল্পখাত এবং বৈজ্ঞানিক কর্মসংস্থানের জন্য আধাদক্ষ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিতে ৬ থেকে ২৪ মাস ব্যাপী কোর্স বিশিষ্ট ৫৪টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (ভিটিআই) এবং ৭টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) রয়েছে। বেকার গ্রামীণ পুরুষ ও মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য কমিউনিটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যদিও এ সমস্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পল্লী এলাকার চাহিদার সাথে সংগতীপূর্ণ, সেখানে পাঁচ থেকে আট বছর পর্যন্ত স্কুলে পড়ার প্রয়োজনীয়তা থাকায় অধিকাংশ গ্রামীণ জনসংখ্যা দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী থেকে বাদ পড়ে যায়।

৩৪। প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের উভয়বিধ নতুন কাঠামোয় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার (বিসিক) একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। বর্তমানে এই সংস্থা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত গ্রামীণ পারিবারিক শিল্প উন্নয়ন ও সহায়তাদান এবং এর মক্কেলদের ঋণদান, সাভিসদান ও পেশাগত প্রশিক্ষণ দানের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। অবশ্য পল্লী এলাকায় এর আওতা সীমিত। যথেষ্ট যোগ্য প্রশিক্ষকের অভাবও একে আবদ্ধ করে রেখেছে। অনেক ক্ষেত্রে যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে তারা বেতন ভিত্তিক চাকুরী অথবা স্বীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়নি। কর্মসংস্থান সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ ও মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গ্রামীণ সমাজ সেবা (আর এস এস) কর্মসূচীর দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং উৎপাদন তথা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঋণদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীল কাজ তুলনামূলক ভাবে সফল হয়েছে। অবশ্য প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম এবং যথেষ্ট পরিমাণ মাঠকর্মী ও প্রশিক্ষকের অভাবে এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ আটকে আছে। উপজেলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রে (ইউটিডিসি) প্রশিক্ষণদান অপর্যাপ্তভাবে পরিকল্পিত। উপস্থিতির হার কম এবং কেন্দ্রসমূহ সম্পদহীন দরিদ্রদের প্রয়োজনাভিমুখী নয় এবং গ্রামে তাদের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে না।

৩৫। এছাড়াও ১০০-র বেশী বিদেশী ও স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন পন্থায় গরীবদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নিয়োজিত। অধিকাংশ এন জি ও ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ শুরু করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবশ্য তাদের অনেকগুলো গ্রামের গরীবদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির তৎপরতার উপর জোর দিয়েছে যাতে তারা স্ব-উপার্জনক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। ভূমিহীন গরীবদের উন্নয়নমুখী পন্থায় সুযোগ দানের ব্যাপারে তারা উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে। যদিও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান খামার বহির্ভূত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নিয়োজিত, তারা এখনও গ্রামের গরীবদের সমন্বিত প্যাকেজ সার্ভিস ও তথ্য প্রদানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা শুরু করেনি। গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প (জিবিপি) এবং বাংলাদেশ পল্লী অগ্রগতি কমিটির (ব্র্যাক) তৎপরতাসমূহ উদ্বুদ্ধকরণ কাজ চালানোর উপযোগী সাক্ষরতা, গোষ্ঠী গঠন এবং সহজ ঋণ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি সাধন করেছে। কিন্তু প্রযুক্তির দিকটা তেমন ব্যাপক নজরে আনা হয়নি বিধায় এ সমস্ত তৎপরতার উৎপাদন শীলতায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের কোন সুযোগ নেই।

গ্রামীণ আত্ম-কর্মসংস্থান : একটি নতুন দৃষ্টিভংগী

৩৬। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরণের কর্মসূচীই এ পর্যন্ত জনসংখ্যার মাত্র এক ভগ্নাংশের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে। বছরে অনুমিত ১০ লাখ বর্ধিত শ্রমশক্তির একটা ক্ষুদ্র অংশের জন্য আনুষ্ঠানিক বেতন ভিত্তিক কর্মসংস্থান সম্ভব নয় বিধায়, গ্রামীণখামার বহির্ভূত আত্ম কর্মসংস্থানের উন্নয়ন প্রয়োজন। এ ধরণের অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুবিধাদি সক্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হচ্ছে :

(১) লক্ষ্য নির্ধারিত জনসংখ্যাকে ক্ষুদ্র উৎপাদনমুখী গোষ্ঠীতে বাছাই, উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা ;

(২) লক্ষ্য নির্ধারিত জনসংখ্যা গোষ্ঠীকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, প্রযুক্তি ও চিহ্নিত বৃত্তি ঋণ এবং পরামর্শ দ্বারা সুসজ্জিত করা ; এবং

(৩) বিভিন্ন এলাকার বিনিয়োগ সম্ভাবনার উপর প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও তথ্যের মত যথাযথ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা।

৩৭। এই দৃষ্টিভংগী তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রণীত খামার বহির্ভূত কর্মসংস্থানের জন্য জরুরী পরিকল্পনার অন্যতম উপাদান। বিদ্যমান একাধিক সরকারী ও বেসরকারী কর্মসূচীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ব্যাপারে দৃষ্টিভংগী গ্রহণের বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের অস্তিত্বের সুযোগ নিয়ে নতুন দৃষ্টিভংগীতে ১৯৮৫/৮৬ থেকে উপজেলা স্তরে কিছু সংখ্যক কর্মসংস্থান সম্পদ কেন্দ্র (ই আর সি) প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়া হয়েছে। এই কেন্দ্র দারিদ্র্য দূরীকরণে লক্ষ্য নির্ধারিত গোষ্ঠিগুলোর উৎপাদনমুখী তৎপরতা সংক্রান্ত সকল উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুরূপে কাজ করবে। এই কেন্দ্র গোষ্ঠি গঠন, কাজ চালানোর মত সাক্ষরতা, ঋণ বাজার সংক্রান্ত তথ্য, দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং লক্ষ্য-নির্ধারিত গোষ্ঠির জন্য নতুন প্রযুক্তির উন্নয়নে নিয়োজিত থাকবে।

৩৮। দুই ধরনের দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতে এই কৌশল নেয়া হয়েছে। প্রথম ধাপের মধ্যে রয়েছে গোষ্ঠী গঠন, কাজ চালানোর মত সাক্ষরতা এবং একটি ঋণ কর্মসূচী যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্ধারিত গোষ্ঠির আয় বৃদ্ধি এবং এর জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান যার মাধ্যমে মৎস্য চাষ ও হাঁস মুরগীর খামার করার ঐতিহ্যবাহী কার্যকলাপ সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই ধাপে অব্যাহত কাজ চালানোর মত সাক্ষরতা কর্মসূচীর মাধ্যমে লক্ষ্য নির্ধারিত গোষ্ঠিকে অপ্রচলিত তৎপরতা শুরু এবং নতুন দক্ষতা ও প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। দ্বিতীয় ধাপের মধ্যে থাকবে সম্ভবনাময় নতুন তৎপরতা এবং প্রযুক্তি ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ চিহ্নিত করা যাতে উন্নতস্তরের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্যনির্ধারিত গোষ্ঠি এসব তৎপরতা চালাতে সক্ষম হয়। এই কৌশল গ্রহণকারী প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে সরকারী সংস্থাসমূহের ন্যুনতম সরাসরি অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে এবং স্বাধীনভাবে তৎপর স্বায়ত্বশাসিত ই আর সির হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। বিশেষজ্ঞ সহায়তাকারী হিসেবে ই আর সি লক্ষ্য নির্ধারিত গোষ্ঠী গুলোর চাহিদা চিহ্নিত করবে এবং বিশেষ করে প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা বিধানের দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ঋণের সুযোগ ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ সহ সরকারী ও আর্থিক সার্ভিসসমূহের আওতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা

৩৯। কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থান এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত কৌশলসমূহ পরিকল্পিত বিনিয়োগ কর্মসূচীর সংযোগে শ্রম বাজারে ৪০ লাখ লোকের অন্তর্ভুক্তির বিপরীতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৫১ লাখ চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে হিসেব করা হয়েছে। এখানে পুনরায় জোর দেয়া উচিৎ যে পূর্ববর্তী সংখ্যা বর্তমানে অংশগ্রহণ হারের ভিত্তিতে এসেছে। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের উপর অধিকতর জোর দেয়ার ফলে এই হার কমার সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকন্তু, অধিকতর সফল শিক্ষা কর্মসূচী গ্রামীণ খানার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে এবং এভাবে শ্রমবাজারে চাপ কমাতে পারে। পুনরুক্তি করা যায়, ১৯৮৩/৮৪ তে বাংলাদেশে ৩৭ লাখ শিশু শ্রমিক ছিল। তাই এটা আশা করা যায় যে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ নাগাদ বেকারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

৪০। এখানে উল্লেখ করা যথাযথ হবে যে, সকল পরিসংখ্যানের মধ্যে কর্মসংস্থান পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা সবচেয়ে কঠিন এবং তাই কম বিশ্বাসযোগ্য। প্রধান কারণ এই যে অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থান সংগঠিত খাতের চেয়ে অনেক বেশী এবং শ্রম বাজারে ক্রমবর্ধমান চাপ ভাসমান জনসংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে। এসব অসুবিধার ফলে কর্মসংস্থান ও আংশিক কর্মসংস্থান উপাত্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। একটি নির্দিষ্ট সময় হিসেবে শুমারী এবং জরিপে বেকারত্ব অত্যন্ত নিম্ন স্তরে দেখা যায়। সর্বশেষ আদমশুমারী (১৯৮১) বেকারত্বের হার ২.৩% দেখানো হয়েছে এবং ১৯৮৩/৮৪ এর জনশক্তি জরীপে তা দেখানো হয়েছে ২.৫%। ১৯৬১ এবং ১৯৭৪ এর শুমারী এবং ১৯৮৩ ও ১৯৮১ এর জরীপের চেয়ে এগুলো খুব পৃথক নয়। ১৯৮৪/৮৫ এর প্রাককলিত কর্মসংস্থান ছিল ১৯২.৯ লাখ শ্রম বছর যা এসেছে তৃতীয় পরিকল্পনার

তৈরী সোস্যাল একাউন্টিং মেট্রিক্স (এস এ এম) এর খাত সমূহ এবং আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠিসমূহ থেকে। অংশগ্রহনের হার ৩১% ধরে ১৯৮৫ এর মাঝামাঝি সময়ের ১০০৫ লাখ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বেসামরিক শ্রমশক্তি দাঁড়াবে ৩১১ লাখ। এতে বেকারত্বের হার দাঁড়ায় ৩৮%। এ ব্যাপারে অবশ্য মতৈক্য রয়েছে যে প্রছন্ন বেকারত্ব সহ বেকারত্বের হার হবে এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি। কথা হচ্ছে যেহেতু তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানকে দারিদ্র্য দুরীকরনের একমাত্র সম্ভাব্য পথ বলে ধরা হয়েছে, তাই কার্যকর কর্মসংস্থান ও জনশক্তি নীতি প্রণয়নে কর্মসংস্থান পরিসংখ্যান শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

৪১। বিভিন্ন খাতভিত্তিক তৎপরতার ৫১ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পিত বিভাগ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নীচে দেখানো হলো :

সারণী ৩

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা

(লক্ষ শ্রম-বছর))

খাত		১৯৮৪/৮৫ (স্থিতাবস্থা)	১৯৮৯/৯০ (লক্ষ্যমাত্রা)	স্থিতাবস্থার উপর বৃদ্ধি
১। কৃষি	..	১১৬.৪	১৫০.৬	৩৪.২
২। শিল্প	..	১৯.০	২৪.৩	৫.৩
৩। সরকারী সেবামূলক কার্যকলাপ	..	১৬.৯	১৮.৭	১.৮
৪। নির্মাণ	..	৫.৯	৭.৩	১.৪
৫। সরকারী সার্ভিসেস	..	২০.০	২৫.২	৫.২
৬। ব্যবসা ও অন্যান্য	..	১৪.৭	১৭.৭	৩.০
মোট :		১৯২.৯	২৪৩.৮	৫০.৯

এটা উল্লেখ করতে হয় যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষিখাতে সম্প্রসারিত তৎপরতা হতে ৬৭.২% অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হবে, যা পরিকল্পনায় কৃষির উপর বিশেষ করে খাদ্যোৎপাদনের উপর জোরদানের ফলে সম্ভব হবে। পরিকল্পনাকালে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কতিপয় উন্নয়ন আশা করা যায় বিধায় জি ডি পির জন্য ধার্য ৫.৪% প্রবৃদ্ধির হারের বিপরীতে মোট কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বার্ষিক ৪.৮% হারে।

গ্রন্থাগার

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উন্নয়ন প্রশাসন

বেসরকারী ও সরকারী উভয় খাতে ব্যবস্থাপনা কর্মীদের সামর্থ্য পরিকল্পনার সাফল্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় তিনটি সুস্পষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্তর রয়েছে। পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য এই স্তরগুলোকে পরিষ্কার বোঝা দরকার। প্রথমটি হচ্ছে, দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদার আলোকে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন। বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা, সত্যিকার নীতিকৌশল গড়ে তোলা এবং বিরাজমান অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন এগুলো নিয়েই ব্যবস্থাপনা সমস্যার প্রথম স্তর এবং এগুলোর ওপরই পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। ভ্রান্ত ধারণা কিংবা ব্যবস্থাপত্রের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার ব্যর্থতা অবধারিত। পরিকল্পনা প্রশাসনের এই স্তরটি সম্ভবতঃ সবচেয়ে কঠিন স্তর। কারণ, এই পরিসরে যা ধারণা করা হয় কিংবা যে ব্যবস্থাপত্র নির্দেশ করা হয় তা সমাজের জনসমষ্টির কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। প্রশাসনের এই পর্যায়ে সমস্যা বা সংকট নির্ভর করবে সমাজ ব্যবস্থা কতখানি নিয়ন্ত্রিত ও স্বাধীন, বাস্তব অবস্থার আলোকে সমাজের প্রত্যাশা মূল্যবোধের প্রচলিত আদর্শের আলোকে ঐ মূল্যবোধের জড়তা ও গতিশীলতার পরিস্থিতি, কালভেদে সমাজের পক্ষপাত এবং সর্বোপরি, বাহ্যিক অবস্থা ইত্যাদির উপর। উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে একটা অর্থনীতির পরিকল্পনা প্রশাসনে বেশ কিছু অনুমান বা প্রাক ধারনা করে নিতে হবে, পরিবর্তনশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর বেশ কিছু পূর্বাভাস ও কিছু সুসংশোধিত সিদ্ধান্ত দিতে হবে। পরিকল্পনা প্রশাসনের প্রথম স্তরে পরিকল্পনা প্রণয়নে এই তিন উপাদান কতখানি তুলনামূলক শক্তি নিয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছে তার ওপর পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে। পরিকল্পনা প্রশাসনের শক্তি হচ্ছে একদিকে অনুমিত শর্তসমূহের বাস্তবতা ও পূর্বাভাসের দক্ষতা অন্যদিকে পরিবর্তনশীল বিশ্বে সংশোধিত সিদ্ধান্তসমূহের পরিসরের সমানুপাতিক। একথাও গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রণীত পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজে ইপ্সিত পরিবর্তন আনতে হলে ঐ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশোধিত সিদ্ধান্তের আকারে কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণারোপ আবশ্যক যাতে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার একটা মৌলিক চরিত্র প্রতিফলিত হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বস্তুতঃ পরিকল্পনা প্রণয়নের এই বৈশিষ্ট্যই একটি পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য উন্নয়ন প্রশাসনের প্রথম পর্যায়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। পরিকল্পনা প্রশাসনের এই স্তর বা পর্যায় অবশ্য কার্যতঃ সবচেয়ে কম গুরুত্ব লাভ করছে। চিরাচরিত ঐতিহ্য ও জটিলতা এর আংশিক কারণ। তবে পরিকল্পনার ফলাফলজনিত হতাশাই প্রধান কারণ। তবে সে যাই হোক (১) জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি ও তজ্জনিত কারণে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ, এর ফলশ্রুতিতে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ, লোক প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ ও উন্নয়ন তৎপরতায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণের ওপর আরও বেশী গুরুত্বারোপ, (২) বেসরকারী খাতের ওপর অধিকতর আস্থা যার অর্থ সার্বিক অর্থনীতির গতিধারার ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ আরোপের পরিবর্তে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির মত সমষ্টিগত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর উপর অধিকতর নির্ভরশীলতা এবং (৩) বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নানা পরিবর্তনের ফল হিসেবে এই স্তর বা পর্যায়ের গুরুত্ব বিরাট রকমে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন কার্যক্রমকে বাস্তবায়নযোগ্য করে তোলার জন্য উৎপাদন কার্যক্রমের সহকারী বা উপযুক্ত করে নীতি প্রণয়নের গুরুত্ব সবিশেষ প্রধান হয়ে উঠেছে।

২। অর্থনীতির পরিকল্পিত প্রশাসনের দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তব একটি পরিকল্পনার বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই পর্যায়টিই সম্প্রতি পরিকল্পনা প্রণেতা ও উন্নয়ন প্রশাসকদের সবচেয়ে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এর কারণও খুব স্পষ্ট। এর কারণ হল এটি পরিকল্পনার নির্মাণ ইউনিট অর্থাৎ প্রকল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা থেকে উপভোগ প্রত্যক্ষ গোচর হয়। কিন্তু কতকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়িত হবার পর যথেষ্ট উপভোগ প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার কারণে স্পষ্টতঃ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত বিষয় নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। একটি নির্মাণ ইউনিট হিসেবে প্রকল্পের গুরুত্ব রয়েছে কেননা প্রকল্প কাঠামোরই একটি উপাদান।

দুর্বল হয় কিংবা ঐ কাঠামোর সংগে যদি নির্মাণ ইউনিটের কোন সম্পর্ক না থাকে কিংবা অবশিষ্ট কাঠামোর সংগে যদি এটি যথাযথ সম্পর্কযুক্ত না হয়, তাহলে এর কার্যকারিতা ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। পরিকল্পনার মূল কাঠামোর কোন দুর্বলতার জন্য যতটুকু, নির্মাণ ইউনিটের বলিষ্ঠতার অভাবের জন্যও প্রকল্প পর্যায়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ততটুকু সমস্যা দেখা দেয়। বস্তুতঃপক্ষে, সম্পদের অতি-প্রাক্কলনের কারণেই প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্যা দেখা দেয় ও একই কারণে লভ্য সম্পদের ভিত্তিতে খুব বেশী সংখ্যক প্রকল্পের কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই সম্পদ সীমাবদ্ধতার সমস্যার পড়ে। ফলে, বহুসংখ্যক প্রকল্প একটি পরিকল্পনা থেকে অন্য পরিকল্পনায় স্থানান্তর করতে হয়। এর ফলে প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়; প্রকল্পগুলো থেকে উপকার প্রাপ্তি বিলম্বিত হয়। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন প্রকল্পের কাজ চালানোর ব্যাপারটিও অর্থহীন হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সম্পদ সংকটের কারণে গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার জন্য ৪৫২ টি প্রকল্প বাদ দেয়া হয়।

৩। একথা জোর দিয়ে উল্লেখ করা দরকার যে, নির্মাণ কাঠামোর কোন ইউনিট শুধুমাত্র সম্পদের ওপর দাবীর মাধ্যমে ও অর্থনীতিতে উপযোগের সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতির সুবাদে নয় বরং প্রকল্প পরিকল্পনার সাফল্যের মূলে নিহিত নীতির মাধ্যমেও সামগ্রিক নির্মাণ কাঠামোর সংগে সম্পর্কিত। উপযুক্ত নীতির বুনিয়াদ না থাকলে একটি প্রকল্প যতই দক্ষতার সংগে বাস্তবায়িত করা হোক না কেন, প্রকল্পটি উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হতে পারে। রাজস্বগত অনিয়ম বিশৃংখলা ও আমদানি পণ্যের প্রতিযোগিতা এক্ষেত্রে আলোচনার দাবী রাখে। প্রকল্পসমূহ ও নীতিমালার মধ্যে এই সম্পর্ক পরম্পরাই সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তৃতীয় পর্যায়। সম্পদ লভ্যতা ছাড়াও প্রশিক্ষিত কর্মীবর্গ, প্রশাসনিক নিয়ম বিধি আইন ব্যবস্থার (অর্থাৎ ভূমির হুকুম দখল) অভাব এবং সর্বোপরি জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালার সংশ্লিষ্টতাজনিত বহিঃপরিস্থিতির মত বিভিন্ন কারণেও একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হতে পারে। একটি পরিকল্পনাকে বদলাতে না দিয়ে বরং ঘটমান পরিস্থিতিগুলোর মোকাবেলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন স্তরেই সেগুলোকে বিবেচনায় রাখতে হয়।

৪। আগেই বলা হয়েছে, উন্নয়ন প্রশাসনের তৃতীয় পর্যায় হলো মূলতঃ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ব্যবস্থাপনা। নির্মাণ কাঠামোর ইউনিটের আলোকে ঐ ধরণের প্রকল্পকে ফলদায়ক বা উৎপাদনশীল করে তোলার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ। এদিক থেকে, একটি পরিকল্পনা ঐ পরিকল্পনায় একটি প্রকল্পের জন্য সৃষ্ট স্বকীয় সময় কাঠামো প্রকৃত অর্থে পেরিয়ে যায় ও ভবিষ্যৎ উপযোগের বিবেচনায় তা ঐ পরিকল্পনা মেয়াদ ছাড়িয়ে সম্প্রসারিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যই পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে একটা নিরবচ্ছিন্নতা দেয়। এ বিষয়টি পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর গুরুত্ব সবচেয়ে কম উপলব্ধি করা হয়ে থাকে। কারণ পরিকল্পনার সাফল্যের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে সাধারণতঃ পরিকল্পনার শেষ বছরের লক্ষ্যমাত্রাগুলোর আলোকে, পরিকল্পনাটির সকল সমাপ্তির পর অর্থনীতির ক্ষেত্রে কি ঘটে তা দিয়ে নয়। কোন পরিকল্পনার এ ধরণের দৃষ্টিভংগীতে মূল্যায়ন একটি নির্দিষ্ট সময়ের উপকরণ প্রয়োগ (point input) ও নির্দিষ্ট সময়ে ফল প্রাপ্তি (point output) ভিত্তিতে অর্থনীতির মূল্যায়নের সমতুল্য; যদিও প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ শর্তের কারণে একটি পরিকল্পনার ভবিষ্যতের উৎপাদনের জন্য বর্তমানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনা সাফল্য যাচাইয়ের সংকীর্ণ ব্যবস্থা প্রচলিত যা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রিকতারই দুর্ভাগ্যজনক ফলশ্রুতি। উন্নয়নের এ ধরণের মূল্যায়ন স্ববৈপরীত্য নবায়ন অযোগ্য সম্পদের অতি আহরণের মাধ্যমে মর্মান্তিকভাবে বাস্তব হয়ে উঠতে পারে যদি একটি পরিকল্পনা মেয়াদেই ঐ ধরণের সম্পদ (যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস) ফুরিয়ে গিয়ে প্রবৃদ্ধি সম্পূর্ণতঃ বন্ধ হয়ে যায়, এ থেকে উন্নয়নের দীর্ঘ পরিসর ভিত্তিক পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি মাঝারী মেয়াদের পরিকল্পনাকে (অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) অর্থনৈতিক সম্পদগুলোর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে কার্যতঃ একটি দীর্ঘ-মেয়াদী (প্রেক্ষিত) পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা

উচিত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশী করে গুরুত্বপূণ এ কারণে যে, দেশটি যেসব সমস্যায় জর্জরিত সেগুলোর কোন স্বল্প-মেয়াদী সমাধান নেই। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও সর্বোপরি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির মত সমস্যার পাহাড় দীর্ঘদিন ধরে এত বিপুল আকারে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে যে, এক অর্থে সেগুলো এখন সামাজিক চালচলনের সংগে মিশেগেছে। সমস্যার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে, কেবলমাত্র একটা দীর্ঘ-মেয়াদে ক্রমাগত প্রয়াসের মাধ্যমেই এগুলোর মোকাবেলা সম্ভব। এই কারণেও উন্নয়ন প্রক্রিয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বিধায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে দীর্ঘ-মেয়াদী উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে একটি পর্যায় হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রশাসনের স্বল্প মেয়াদী অস্থায়ী সংকটের ব্যবস্থাপনার চেয়ে দীর্ঘ-মেয়াদী সমস্যাগুলোতে মনোনিবেশ করতে হবে।

৫। তিন পর্যায়ের উন্নয়ন প্রশাসন কেবলমাত্র সময়ের মেয়াদের পরিসরে স্বাভাবিকরূপে ধারা বিন্যাসে পরস্পরের সংগে সম্পর্কিতই নয় বরং ঐ সম্পর্ক ক্রিয়াশীলও বটে। এই ত্রি-মাত্রিক সম্পর্ক উন্নয়ন প্রশাসনে পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত কর্ম সম্পাদনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল করে তোলে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটি একক ব্যবস্থার অংগ উপাদান হিসেবে সেগুলোকে দাঁড় করায়। এ কারণে, এই ব্যবস্থার দক্ষতা যতখানি ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর নির্ভরশীল ঠিক এক একটি প্রতিষ্ঠানের স্বকীয় শক্তিও ততখানি গুরুত্বপূর্ণ।

৬। পদ্ধতি হিসেবে সরকারী খাতেও উন্নয়ন প্রশাসনকে অনুরূপভাবে সরকারের সামগ্রিক সত্তা হিসেবে দেখতে হবে। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, সরকারের অংগীকার নিষ্ঠার উপর একটি পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভরশীল। এ ধরণের দৃষ্টিভংগী বা বক্তব্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের দায়িত্বের ধারণাটি সাম্প্রতিক। আগে সনাতন ধারণায় সরকারের প্রধানতঃ নৈতিক ও কল্যাণমূলক ভূমিকার কথাই কেবল চিন্তা করা হত। এই পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রশাসনকে সাধারণ প্রশাসন থেকে আলাদা করে দেখা অস্বাভাবিক নয় যদিও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সরকারের বড় দায়িত্ব এবং সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন না কোন ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন সরকারের নৈতিক শক্তিকে বৈষয়িক বল যোগায়। সাধারণ প্রশাসন থেকে উন্নয়ন প্রশাসনকে কোন রকম বিচ্ছিন্ন করলে তা অনুৎপাদনশীল, এমন কি ক্ষতিকারক হতে পারে। এ জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লোক প্রশাসনকে সামগ্রিক ভাবে দেখা হয়েছে।

প্রশাসন উন্নয়ন

৭। স্বাধীনতার পর থেকে লোক প্রশাসনের উন্নয়ন তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের সময় পরিধি হচ্ছে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সাল। এই পর্যায়ে প্রশাসন পদ্ধতির দ্রুত বিকাশ ঘটে। তিনটি প্রধান বিষয় বা শক্তি এই পর্যায়ে উন্নয়নের গতিধারা নির্ধারণ করে। প্রথমতঃ এযাবৎ প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল প্রাদেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা। নতুন রাষ্ট্রের অনিবার্য প্রয়োজনে এই প্রশাসনকে একটি জাতীয় সরকারের প্রশাসনে রূপান্তরিত করতে হয় ও এই প্রশাসনের বিভিন্ন ধরণের অপরিহার্য তৎপরতা ব্যাপক আকারে সম্প্রসারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ দেশের অর্থনীতির নবতর প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলারও প্রয়োজন দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ পরাধীনতামুক্ত জনসমষ্টির আশা আকাংখা মেটানোর লক্ষ্যে দ্রুততর উন্নয়নের জন্য উল্লিখিত দুটি যুক্তি ছাড়িয়েও বড় হয়ে দেখা দেয় একটি জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়োজন। এ সবের মিলিত ফলশ্রুতিতে ১৯৭২ সালে সরকারের মন্ত্রণালয়-গুলোর সংখ্যা ২৭ এবং শিল্প কর্পোরেশনগুলোর সংখ্যা ৩ থেকে ৯ এ বৃদ্ধি পায়। শিল্প কর্পোরেশন-গুলোর এ ধরণের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে প্রধানতঃ প্রাদেশিক শিল্পোন্নয়ন সংস্থার বিভক্তির মাধ্যমে। সরকারী বা রাষ্ট্রীয় খাতের এই সম্প্রসারণে প্রশাসনের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উপর এক বড় রকমের প্রভাব পড়ে। অতীতে লোক প্রশাসন গড়ে উঠেছিল প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার ঐতিহ্যে। সেই লোক প্রশাসন ব্যবস্থাকে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতার জন্য সরকারের পেশাদারী নৈপুণ্যের চাহিদা তথা জাতীয় সরকারের প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে আসতে হয়।

৮। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু ১৯৭৫ সালে। এই পর্যায়ের তৎপরতাগুলো প্রধানতঃ দ্রুত সম্প্রসারিত প্রশাসনিক কাঠামোর কার্যকারিতার উন্নয়নের সংগে সম্পর্কিত ছিল। অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ উদার ও বেসরকারী খাতের ভূমিকার সম্প্রসারণের পর এই পর্যায়ের তৎপরতা শুরু হয় এবং লোক প্রশাসনের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বেশ অনেকগুলো তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রধানতঃ সরকার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অবর্তমানে নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছিলেন এমন কিছু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয়া হয় যাতে সরকারী খাতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের বোঝা লাঘব হয়। এর ফলে সীমিত ব্যবস্থাপনা সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ কর্পোরেশন ও মন্ত্রণালয়গুলোকে নিজ নিজ কাজের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত ও পুনর্বিন্যস্ত করা সম্ভব হয়। মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ২৪-এ এবং সরকারী কর্পোরেশনগুলোর সংখ্যা ১৫৫ থেকে ১০৯-এ কমানো হয়। তৃতীয়তঃ এই মেয়াদের (১৯৭৫-৮২) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রয়াস ছিল সরকারী কর্ম সার্ভিসে পেশাদারী নৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্য পেশাদারী ভিত্তিতে সরকারী খাতে সরকারী কর্ম সার্ভিসের কাঠামোর পুনর্গঠন; এই উদ্যোগের আওতায় সকল সরকারী কর্ম সার্ভিসকে ২৮টি ক্যাডার সার্ভিসে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। শেষে, অনুপূরকমূলক ব্যবস্থা হিসেবে একক সার্ভিসগুলোতে জনশক্তি প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় ও নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়।

৯। তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা ১৯৮১ সালের পর। এ সময় লোক প্রশাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রয়াস চলে। লোক প্রশাসনে এ সময় সংস্কার সাধিত হয়। এই সুদূর প্রসারী প্রশাসন সংস্কারের আওতায় প্রশাসনকে উপজেলা (পুরানো থানা) পর্যায় অবধি বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় এবং স্থানীয় উন্নয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্থানীয় উন্নয়নের সংগে সংশ্লিষ্ট কিংবা জনগণের জন্য সুবিবেচনক জাতীয় সরকারের এমন কতকগুলো কাজের দায়িত্ব উপজেলা প্রশাসন পর্যায়ে স্থানান্তরিত করা হয়। উন্নয়নমূলক ও সাধারণ প্রশাসনিক পর্যায়ের উভয় প্রকারের কাজের দায়িত্বই উল্লিখিত স্থানান্তরিত দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর দায়িত্ব উপজেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। প্রধানতঃ নির্বাচিত সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত যাতে স্থানীয় জনগণের আশা আকাংখা এবং তাদের অনুভূত চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পর্যায়ের তৎপরতা পরিচালিত হয়। প্রশাসনিক সংস্কারের এই স্থানীয়করণের প্রবণতা ছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রশাসনেও কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনের মৌল দর্শন ছিল যে, মন্ত্রণালয়ের মূল কাজ হচ্ছে, পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন এবং ঐ নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব হচ্ছে ক্ষেত্র পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর (অর্থাৎ পরিদপ্তর ও সংস্থাগুলোর) এবং কর্মসম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষমতা প্রদানের মূল নীতিগুলো প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ে ঘোষিত এক নতুন শিল্পনীতির আওতায় বেসরকারী খাতের ভূমিকার যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটে ও তারই ফলে সরকারী খাতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বেসরকারী খাতে স্থানান্তরিত হয়। অন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে, এই সময় সরকারী কর্মচারীদের ক্রয় ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এক নতুন ক্ষতিপূরণ (বেতন ও মজুরী) নীতি গৃহীত হয়। কেননা স্বাধীনতার পর থেকে একনাগাড়ে মুদ্রাস্ফীতির কারণে তাদের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছিল। লোক প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা এক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এক উন্নত লোক প্রশাসনের পটভূমিকায় সূচীত হয়।

১০। প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়ন প্রশাসনকে বলিষ্ঠতর করে তোলার সংগে সংগে সার্বিক অর্থনৈতিক নীতির সংস্কারমূলক ব্যবস্থাদির কাজও শুরু হয়। এসব ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৫ সালে শুরু হয়। একনাগাড়ে সম্পদ সংকট ও বেসরকারী খাতে সরকারী নীতির পরিবর্তনের ফলে সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি-সমূহের ক্ষেত্রে পর পর কয়েক দফা রদবদল ঘটে। এর ফলে অর্থনীতি ক্রমবর্ধমান হারে বিপনন অর্থনীতির দিকে মোড় নিতে থাকে; সেই সংগে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের মাত্রাও কমতে থাকে। সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি সংস্কারগুলোর আওতায় সরকারী কর্পোরেশনগুলোর মূল্য নির্ধারণের বর্ধিত স্বাধীনতা এবং অত্যাবশ্যকীয়

পণ্যসামগ্রীর উপর কম মূল্য নিয়ন্ত্রণ; বিভিন্ন প্রণোদনার বিতরণে বেসরকারী খাতে ক্রমবর্ধমান অংশীদারীত্ব; দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা বাজারের (আই পি) আওতায় নমনীয় মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণ এবং আমদানী উদারীকরণ এবং ঋণ ও রাজস্ব ক্ষেত্রে শৃংখলা বিধান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এ সকল ব্যবস্থায় একক প্রতিক্রিয়ায় সরকারের ভূমিকা অর্থনীতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বদলে সার্বিক অর্থনৈতিক নীতিমূলক ব্যবস্থাদির ওপর আরও বেশী নির্ভরশীলতা বেড়েছে। এভাবে সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মূল বিধিগুলো স্বাধীনতার গোড়ার দিকের বছরগুলোর চেয়ে একান্তভাবে বদলে যায়। ৭০ এর দশকের প্রথম ভাগের বছরগুলোতে অর্থনীতির চরিত্র বৈশিষ্ট্য ছিল একাভিসারী কিন্তু পরে তা তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে বিপ্রাভিসারী পদ্ধতি ভিত্তিক হয়ে ওঠে যে পদ্ধতির আওতায় সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও মৌলিক শিল্প ক্ষেত্রে সরকার ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের ভূমিকা এভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয় পরিকল্পনা প্রশাসনের আরও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনীতির এই বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এসব পরিবর্তনের ফলে অর্থনীতিকে আর্থসামাজিক লক্ষ্যসমূহের দিকে পরিচালনার জন্য অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণের চেয়ে লোক প্রশাসনের গোটা প্রেক্ষিতকে আমূল সংস্কারের অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দেবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে

১১। ইতিমধ্যেই ক্রিয়াশীল উন্নয়নের দ্বি-শক্তি তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রশাসনের ভবিষ্যৎ বিকাশের নির্দেশনা নির্ধারণ করে দিয়েছে। প্রথমতঃ প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ এবং বেসরকারী খাতের ভূমিকার সম্প্রসারণ। এগুলো একত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বহু কেন্দ্রের অস্তিত্ব নির্দেশ করে। অর্থাৎ, জাতীয় সরকার, উপজেলা পরিষদ ও বেসরকারী খাতের মত বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বেসরকারী খাতে সরাসরি হস্তক্ষেপ আরও কম হবে বলে এই বহু কেন্দ্রীক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়া জোরদার হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় পরিকল্পনার সম্পদ সংকট প্রশমনের সম্ভাবনা না থাকায়, পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আগামীতে আরও বেশী মনোনিবেশ করতে হবে। তৃতীয়তঃ সিদ্ধান্ত প্রণয়নের বহু কেন্দ্রের যৌক্তিক চাহিদার কারণে, বিশেষ করে, বেসরকারী ও সরকারী খাতের আপেক্ষিক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে, এই পরিকল্পনা মেয়াদে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের চেয়ে সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি সমূহকেই অনেক বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে হবে। একারণে, তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রশাসনিক উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি ব্যবস্থাপনা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মত তিনটি মৌলিক ক্ষেত্রও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি ব্যবস্থাপনা

১২। প্রশাসনিক পুনর্গঠনের জন্য ১৯৮২ সালে গঠিত বিশেষ কমিটি নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়গুলোকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের মত অধিকতর জরুরী সমস্যার বেলায়, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে খুব বেশী উন্নতি হয়নি। এক্ষেত্রে, কেবল মাত্র দুটি বুনিয়াদী পর্যায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে; প্রথমতঃ উর্ধতন কর্মকর্তাদের কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ নির্ধারিত করে দেয়ার জন্য ব্যবস্থাপনা নির্দেশক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়তঃ কোন কোন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সুবিধেসহ ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা। ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনশক্তি প্রশিক্ষণের বিষয় ব্যাপকভাবে অনুসৃত হলেও অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর গতিধারা থেকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণে দুর্বলতা এখনও ধরতে পারা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সার্বিক অর্থনৈতিক নীতিগুলোতে রদবদল হলেও, এর আওতায় প্রধানতঃ পরস্পর সম্পর্কহীন কতকগুলো বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। ফলে, অর্থনীতির চাহিদার সংগে সেগুলোর সুষ্ঠু সংগতির অভাব ছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নীতিগুলোতে অসংগতির বহু দৃষ্টান্ত ছিল আর সে কারণে ঐসব খাতের

লক্ষ্যগুলো দারুণভাবে ব্যাহত হয়। নীতির ক্ষেত্রেই ঐ সংঘাত দেখা দেয় প্রধানতঃ দুটি কারণে, প্রথমতঃ অতীতের সকল সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন খাতে এবং পরস্পরের সংগে সম্পর্কবিহীন-ভাবে কার্যকর করা হয় যদিও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই একটা সর্বাংগীন ও সুসংগতিপূর্ণ বাণিজ্য ও শিল্প-নীতি উন্নয়নের জন্য একটি সমীক্ষা হাতে নেয়া হয়েছিল। আশা করা হচ্ছে, ১৯৮৫ সালের শেষ নাগাদ বাণিজ্য ও শিল্প নীতি (TIP) সমীক্ষার বিভিন্ন বিশ্লেষণমূলক অংশগুলো একটা সার্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অংশীভূত করা হবে।

১৩। এ ধরণের পরিকল্পনা নীতির প্রধান কারণ হচ্ছে যে অতীতের পরিকল্পনাগুলোতে কারীগরী কাঠামোর আওতায় পরিকল্পিত উদ্দেশ্যাবলীর সমর্থনে কোনরকম স্পষ্ট নীতিমালা উদ্ভাবন করা হয়নি। যখন যেমন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সেই অনুযায়ী তখন নীতি গড়ে তোলার বিষয়টি ছেড়ে দেয়ার জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন লক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রায়ই আপোষ করতে হয়েছে। এই ধরণের ক্রমবিকাশমূলক প্রক্রিয়ার প্রধান দুর্বলতা এই যে এ থেকে সুসংগতি পূর্ণ নীতিমালা বেরিয়ে আসবে এমন নিশ্চয়তা থাকে না, তাছাড়া, একটা তুলনামূলকভাবে মুক্ত অর্থনীতিকে এ ধরণের নীতিগুলো যেমন অনুপযোগী হতে পারে তেমনি এগুলোর জন্য মূল্যও দিতে হতে পারে অনেক বেশী।

১৪। সাম্প্রতিককালের উদ্ভূত এসব বিষয়ের কথা বিবেচনায় রেখে তৃতীয় পরিকল্পনায় এমন এক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিকল্পনা করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক কাঠামোগুলোর চাইতে অনেক বেশী বাজারমুখী। পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক কাঠামোগুলো প্রধানতঃ উৎপাদন ও বিনিয়োগের উপর জোর দিয়েছিল। এই পরিকল্পনা কাঠামোতে স্পষ্টতঃ বেশ কয়েকটি সার্বিক অর্থনৈতিক ও খাত-ওয়ারী নীতি অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে; যার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা প্রভাবিত করার ব্যাপারে সরকার পছন্দমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া, এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য দারিদ্র উপশম বিধায় দেশের সমস্ত গৃহস্থালীকে ১০টি আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠিতে বিভক্ত করে প্রতি গোষ্টির উপর বিনিয়োগ ও সরকারী নীতিমালার প্রভাব মূল্যায়নের জন্য একটি সামাজিক হিসাবনিকাশ ব্যবস্থা বা Social Accounting Matrix গড়ে তোলা হয়েছে। একারণে, তৃতীয় পরিকল্পনা উৎপাদন ও বিনিয়োগ ভিত্তিক গতানুগতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারা থেকে নীতি পরিকল্পনার দিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সরে গেছে যাতে করে উৎপাদন পরিকল্পনা বাঞ্ছিত সামাজিক পরিবেশে বাস্তবরূপ নিতে পারে। এতে করে পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলীর লক্ষ্য ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একসেট পরস্পর সুসংগতিপূর্ণ স্থিতিস্থাপক নীতিমালা প্রণয়নে সুবিধা হবে।

১৫। প্রস্তব এই কাঠামোর আওতায় প্রশাসনের ভবিষ্যত উন্নয়ন কল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে নীতি প্রণেতা হিসেবে, পরিসংখ্যান সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্য ফিডব্যাকের জন্য এবং পরিকল্পনা কমিশনকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি নিশ্চিতকরণের জন্য এক ত্রিমুখী সম্পর্ক জোরদার করার প্রয়াসে মনোনিবেশ করতে হবে। লাইন মন্ত্রণালয়গুলো ও পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে নীতিমালায় সুসমন্বয়ের নিশ্চয়তাবিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ কোন দু'টি নীতি তাদের ক্রিয়ার বিবেচনায় একে অপরের বিকল্প হতে পারে না। তাছাড়া, একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নীতি চরিত্রগত দিক থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। খাতভিত্তিক নীতি-গুলো একাধিক খাতের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। সেজন্য একটা সার্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় সেগুলোর আন্তঃখাত সম্পর্ক মূল্যায়নের প্রয়োজন হবে। অন্যদিকে, এও স্বীকার্য যে, বাস্তব তথ্যাদির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে কোন নীতিই সুষ্ঠু ও নিখুঁত হতে পারে না, আর তাই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো ও পরিকল্পনা কমিশনকে আস্থাযোগ্য উপাত্তসমূহের সময়ানুগ সরবরাহের জন্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর বলিষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়-ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অনেকটা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অতীতের তুলনায় আরও অনেক বেশী অনিশ্চয়-তার পরিমণ্ডলে সরে গেছে। এজন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নের সুবিধার জন্য মন্ত্রণালয়গুলোর বিশ্লেষণ

সামর্থ্য জোরদার করতে হবে, সামর্থ্যের এই উন্নয়ন বা শক্তি বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ গবেষণা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পর্যন্ত সর্বত্র সাধিত হতে হবে যা গোটা অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতির সাধনী হিসেবে কাজ করবে। এসব চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যে সব পরিকল্পনা সেলের অস্তিত্ব রয়েছে নীতি সমস্যাবলীর সার্থক মোকাবেলার জন্য সেগুলোতে উৎকর্ষগত পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হবে। এতে বর্তমান প্রকল্প প্রস্তুতি ও কার্যক্রম প্রণয়ন তৎপরতাও জোরদার হবে।

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

১৬। সম্পদের অভাব বিশেষ করে দেশজ সম্পদের অভাব অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ইতিহাসে এই নাজুক পরিস্থিতির চিত্র অত্যন্ত সুপরিস্ফুট; কেননা, সম্পদের অভাবে উভয় পরিকল্পনার আকারে বড় রকমের ছাঁটাই করতে হয়। সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে সব প্রয়াস চলছে তাতে সম্পদ সমাবেশ ও ব্যবহার উভয় দিকই অন্তর্ভুক্ত। আভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে দু'টি ভিন্ন নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে। বেসরকারী খাতের আওতায় রাজস্ব ও মুদ্রা সংক্রান্ত উৎসাহদানমূলক ব্যবস্থাদি ও সঞ্চয় সার্টিফিকেট ইস্যুর মত নতুন আর্থিক ব্যবস্থার সুবিধা রয়েছে। আর সরকারী খাতে ভুর্তুকির পরিমাণ হ্রাস, মূল্যে সামঞ্জস্য বিধান ও রাজস্বগত ব্যবস্থাদির বিধান চালু রয়েছে। কিন্তু এসব ব্যবস্থার সার্বিক ফলাফল বা জাতীয় সঞ্চয় হারে পরিলক্ষিত হয়েছে তা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যের চেয়ে কম, পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ১১.২ শতাংশের তুলনায় মাত্র ৭%। নানা বহিঃর্গত পরিস্থিতি সঞ্চয় বিকাশকে ব্যাহত করেছে ঠিকই কিন্তু সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রয়াস সম্ভাব্য পূর্ণ মাত্রায় চলেছে কি না কিংবা ঐ প্রয়াস পরিপূর্ণভাবে ফলপ্রসু হয়েছে কি না তা বলা কঠিন। সরকারী খাতে, প্রশাসনিক নানা প্রশ্নে এই প্রয়াসে আপোষ করা হয়েছে, যেমন আপোষ করা হয়েছে ভূমি করের ক্ষেত্রে। আবার, বেসরকারী খাতের বেয়াতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে রাজস্ব নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর ফলে কর/জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাত ১৯৭৯/৮০ সালের ৮ শতাংশের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ৯.৫ শতাংশের পরিবর্তে মাত্র ৮.২% বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার দ্বিতীয়ার্ধে সরকারী খাতে ভর্তুকি হ্রাসসহ পণ্য ও সেবার মূল্যের রদবদলের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। এতদসত্ত্বেও সরকারী খাতের রাজস্ব ১৯৭৯/৮০ সালে জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) ৯.৭% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১০.৬% বৃদ্ধি পায়।

১৭। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে, প্রশ্নাতীতভাবে ১৭,৫৭২ কোটি টাকার সমমূল্যের আভ্যন্তরীণ সম্পদের চাহিদা মেটানোর জন্য সম্পদ সমাবেশের প্রয়াস জোরদার করার প্রয়োজন হবে। এই প্রয়াসের আওতায় বীমা কোম্পানীগুলোসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঞ্চয় বৃদ্ধির অভিযানে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, একেত্রে বেশ কিছু সন্তোষজনক অগ্রগতি হয় অর্থাৎ এ সময় বেসরকারী মালিকানায় কয়েকটি ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ আবার চালু করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা আমলেও এই ধারা অব্যাহত রাখা দরকার।

১৮। বিভিন্নমুখী উদ্দেশ্যাবলীর কারণে, সরকারী খাতে সম্পদ সমাবেশের প্রয়াস বরাবরের মত সীমিত পর্যায়েই রয়েছে। একদিকে সরকারী খাতে পণ্য ও সার্ভিসের (অর্থাৎ বিদ্যুৎ, সড়ক, শিক্ষা, ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি) সম্প্রসারণের চাহিদা বজায় রয়েছে এবং অন্যদিকে কল্যাণমূলক চাহিদা ও বেসরকারী খাতে উৎসাহ দেয়ার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। তবে কল্যাণমূলক তৎপরতার সম্প্রসারণ ও বেসরকারী খাতের উন্নয়নের মৌলিক শর্তাবলী হিসেবে একথা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া দীর্ঘকাল ধরে কল্যাণমূলক নীতি বজায় রাখা সম্ভব নয় এবং সড়ক বা বিদ্যুতের মত সরকারী খাতের পণ্য ও সেবার উন্নয়ন ছাড়া বেসরকারী খাতের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ সম্ভব নয়। তাই, দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক

বিকাশে সরকারী সম্পদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই কারণেই আভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের কাজে নিয়োজিত এবং সরকারী খাতে পণ্য ও সার্ভিস উন্নয়নে ন্যস্ত সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নয়ন প্রশাসনে যথাযথ গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন হবে।

১৯। সরকারী খাতে সম্পদ সমাবেশের দায়িত্বটি সরকার ও সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ন্যস্ত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এক্ষেত্রে প্রধান সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন ধরণের কর ও শুল্ক সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় কর তদন্ত কমিশনের (১৯৭৬—৭৮) সুপারিশমালা অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন। জাতীয় অর্থনীতির চাহিদার সংগে সংগতি রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজ সংগঠনকে আরও উপযোগী করে তুলতে হবে যার জন্য আভ্যন্তরীণ উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্যে কর কাঠামোর রদবদল এবং আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির অপেক্ষাকৃত উৎপাদনশীল এলাকাগুলোতে বোর্ডের প্রশাসনিক সম্পদের অধিকতর নিয়োজনের প্রয়োজন। এগুলোর কারণেই অবশ্য করারোপের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার জন্য রাজস্ব সংক্রান্ত গবেষণায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন যার ফলে কর সংক্রান্ত তথ্য পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব হবে। লভ্য সম্পদের গণ্ডির মধ্যে সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্যও শেষোক্ত ধরণের উন্নতি সাধন আবশ্যক।

২০। তৃতীয় পরিকল্পনায় সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে কেননা, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও প্রয়োগের উপর অর্থনীতির বিকাশ নির্ভরশীল। সরকারী সম্পদকে জাতীয় সম্পদের অংশ ধরলে সরকারী খাতে সুদক্ষ ব্যবহারের লক্ষ্যে, কর ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদের যে কোন স্থানান্তর নিঃসন্দেহে অধিকতর যুক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এস্থলে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার সমস্যা দেখা দেয় কেননা, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভ্রান্ত হলে তা আর শোধরাবার কোন উপায় থাকে না, যদিও কিছু ক্ষতি স্বীকার করে তা বিপরীতমুখী করা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার নানা অভিজ্ঞতায় এই সমস্যার বিস্তারিত সাক্ষাত মেলে। একটি পরিকল্পনার নির্মাণ উপকরণ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত বাছাই ঐ পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ের শুরুতে বিষয়টি ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। অতীতে সরকারী খাতে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তসমূহের ব্যর্থতা ও আয়ের নিম্ন বা নেতিবাচক হার কিংবা বেসরকারী খাতে অনুরূপ ব্যর্থতাজনিত কারণে ঋণ প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অচল হয়ে পড়া ইত্যাদির পরি-প্রেক্ষিতে এই পর্যায়ের উন্নয়ন প্রশাসনকে কেবলমাত্র ব্যয় পরিকল্পনার পরিবর্তে পরিকল্পিত উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করা দরকার হবে। একথা স্বীকৃত যে, আর্থিক ক্রান্তিকালের এই চলমান দুনিয়ায় সাম্প্রতিক কয়েক বছরে বিনিয়োগমূলক সিদ্ধান্ত অনেক বেশী জটিল হয়ে পড়েছে, বিষয়টির গুরুত্বও বাড়ছে আগেকার গতানুগতিক দিনগুলোর চেয়ে বেশী। আগেকার যে কোন সময়ের চেয়ে অর্থনীতি আরও বেশী বিপন্নমুখী হয়ে উঠায় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত ও বাজারের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বাজারকে প্রভাবিত করার জন্য যে কোন নিয়ম মাফিক তারতম্য করার ক্ষেত্রেও উপযুক্ত নীতিমালা দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত ও নীতি সিদ্ধান্ত উভয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই বাজার সংক্রান্ত তথ্য, বিশ্লেষণ ও গবেষণার প্রতি আরও বেশী করে মনোনিবেশ করতে হবে।

প্রকল্প পরিকল্পনা ও প্রসেসিং

২১। বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের বেলায় প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নই দুর্বলতম বিষয়। কিছু উন্নতি সত্ত্বেও, প্রকল্প পরিকল্পনায় চিরাচরিত নিয়মেই অনেক বেশী সময় লাগছে। এমন অবস্থায়, প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত হয়েছে এমন দেখতে পাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। একটি পরিকল্পনার নির্মাণ কাঠামোর উপাদানের প্রকৃতির উপর দুটি অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া হয়। প্রথমতঃ ঋণ গ্রহীতা ও দাতা উভয়ের গ্রহণযোগ্য শর্তগুলো সাধারণতঃ এক হয় না; আর সে কারণেই বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের মাঝে জাতীয় স্বার্থের পূর্ণ প্রতিফলন নাও থাকতে পারে। জাতীয় প্রয়োজনের আলোকেই সাহায্য

সহায়তা পাওয়া উচিত কথাটার তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য যত বেশী বেশী উচ্চারিত হোক না কেন কদাচিত তা বাস্তবে রূপ নেয়। পূর্বাহ্নে গৃহীত বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণীত হলেও এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত সঠিক হলেও জাতীয় দৃষ্টিভংগীর বিচারে প্রকল্পের পরিকল্পনা ও ব্যয় সঠিক নাও হতে পারে। অতীতে এ ধরণের অনেক অভিজ্ঞতার খোঁজ খুব সহজেই পাওয়া যায় ও একারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। ফলে প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রসেসিং পদ্ধতি নতুন করে ঢেলে সাজাতে হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় যদিও কমেছে তবু বর্তমান পরিস্থিতিও পুরোপুরিভাবে সন্তোষজনক বলে মনে হয় না। কারণ, পরিকল্পিত উদ্দেশ্যাবলীর দিক থেকে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতিগুলো এখনও অনুন্নত রয়ে গেছে। আজকাল যেভাবে প্রকল্প তৈরী করা হয় তাতে প্রযুক্তি নির্বাচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক পর্যায়ে লাভালাভের মত মৌলিক বিষয়গুলো পুংখানুপুংখরূপে বিবেচিত হয় না। ফলে এমন প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয় যে প্রকল্পে প্রযুক্তি যে কেবল সম্পদ লভ্যতার দিক থেকেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাই নয়, কার্য সম্পাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লভ্য কারিগরি নৈপুণ্যের সংগেও তা খাপ খায় না; কর্মসংস্থান ও ন্যায়ানুগতার উদ্দেশ্যাবলীর সংগেও তা থাকে সংগতিহীন। সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিপনন অর্থনীতির পরিবর্তে বিভিন্ন প্রাক বিবেচনা বা নিয়ম মাফিক বিবেচনার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রায় সকল প্রকল্পেই প্রযুক্তি, ব্যয় ফলপ্রসূতা, পরিচালনা ও সর্বোপরি সামাজিক ফল লাভের ক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা দেয়। বর্তমান দুনিয়ায় সম্পদের সীমাবদ্ধতা বেড়ে চলেছে। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের জন্য এই পরিস্থিতি আদৌ বাঞ্ছিত হতে পারে না। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রদত্ত উদ্দেশ্যাবলীর প্রেক্ষিতে প্রকল্প তৈরীর ক্ষেত্রে উন্নতি বিধানের বেশ কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে: প্রথমতঃ বিস্তারিত খুঁটিনাটির পরিবর্তে প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান, আয় বন্টন, বিনিয়োগ ও লাভযোগ্যতার মত জরুরী বিষয়গুলোকেই প্রকল্প তৈরীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে, দ্বিতীয়তঃ জাতীয় সুবিধা ও অগ্রাধিকারকে প্রতিফলিত করার জন্য বিষয়মুখী বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়নের স্বকীয় সামর্থ গড়তে হবে, এবং পরিশেষে সহায়তা বা ঋণ কোন প্রকল্পকে গ্রাস করার আগেভাগেই প্রকল্পের প্রস্তুতি নিতে হবে। নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বকীয় সামর্থ গড়ে তোলার জন্য একথা ভাল করে উপলব্ধি করা দরকার যে, একচেটিয়া ব্যবস্থা সাধারণতঃ অদক্ষ, জ্ঞানের একচেটিয়াপনা আরও জঘন্য, আর যখন সব জিনিষ বদ্ধ সংস্কারের শিকার হয় তখন জ্ঞানের দুর্ভোগ আরও বেড়ে যায়। নিজ পরিমণ্ডলে সামর্থ গড়ার বিষয়টি দেশীয় তথা জাতীয় বিশেষজ্ঞদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নিয়োজনে কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ওপরও নির্ভর করার প্রয়োজন হবে তবে তা স্থানীয় পারদর্শিতা বা জ্ঞান ভাণ্ডারের বিকল্প হিসেবে নয় বরং ঐ পারদর্শিতা বা জ্ঞানের সমৃদ্ধির জন্য তা হওয়া উচিত। এছাড়া, একান্ত অনিবার্য ক্ষেত্রে, কোন সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ জরুরী হলে, সরকারের ভেতর ও বাইরে থেকে জাতীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটির কাজ হবে ন্যস্ত দায়িত্বের শর্তাবলী প্রণয়ন থেকে সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন গ্রহণ পর্যন্ত গোটা পর্যায়ে ঐ সমীক্ষা বিষয়াবলী ঘনিষ্ট পর্যবেক্ষণ করা। বর্তমানে প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়নে দ্বিতীয় অনুমান নিরূপণের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে তা পরিহার করা যাবে। ফলে অনাবশ্যক বিলম্ব থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। এ প্রসংগে একটা জাতীয় পর্যায়ে কারিগরী অর্থনৈতিক কনসাল্টিং ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার বিষয়ও বিশেষ গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং ঐ প্রতিষ্ঠান যাতে জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে বাইরেও ভূমিকা পালন করতে পারে সেরকম পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। এতে জাতীয় চাহিদার দিক থেকে সুসংগতির সংগে বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থনৈতিক ও কারিগরী সম্ভাব্যতার চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ নিশ্চিত হবে।

২২। পূর্বাহ্নে বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের পর প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়নের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তৃতীয় পরিকল্পনায় 'নির্ভরযোগ্য' প্রকল্পের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। এই অবস্থা ক্রমশঃ বেড়ে ওঠা প্রকল্প সাহায্যের পরিপ্রেক্ষিতে আপাততঃ দৃষ্টিতে বিরোধী হলেও সত্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে পাইপ-লাইনে যে প্রকল্প সাহায্য জমা আছে তার পরিমাণ হল ৪,৩৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বছরে যে পরিমাণ

অর্থ বিনিবন্টন করা হয় ঐ পরিমাণ তার ৭ থেকে ৮ গুণ। এজন্য এটাকে সাহায্য ক্লান্তি হিসেবে দেখা যেতে পারে। প্রশ্নাতীতভাবে একথা বলা যায়, যে পাইপ-লাইন-এর তুলনায় বাৎসরিক বিনিবন্টনের স্তর বেশ নীচু। ১৯৭৯/৮০ সালে পাইপ-লাইন ও সম্পদের বিনি-বন্টনের অনুপাত ছিল ৪-এর কিছু বেশী। ঐ বছরের পর স্থানীয় সম্পদের অপর্যাপ্ততার কারণে বিনিবন্টন ব্যাহত হয়। আর এ অবস্থা নিরসনের জন্য আভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের ও প্রকল্প সাহায্যের আওতায় স্থানীয় পর্যায়ের ব্যয় অংশগুলো অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস চলে। কারণ, সঞ্চয়-বিনি-য়োগের মধ্যেকার ব্যবধান আমদানি-রপ্তানীর মধ্যেকার ব্যবধানের চেয়ে অর্থনীতিকে বেশী করে সংকটাপন্ন করতে থাকে। এইসব প্রবাহের বিকল্পই হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত সহায়তা বা ঋণ সাহায্য দানের নতুন অংগীকার। গুরুত্বের সংগে একথা উল্লেখ করা দরকার যে, পাইপ-লাইন এর সাহায্য-সহায়তা বর্তমান প্রকল্পগুলোর জন্য ইতিমধ্যে অংগীকৃত এবং সাহায্য-সহায়তা-এর পরেও কাজে লাগাতে হলে নতুন নতুন প্রকল্পের প্রয়োজন পড়বে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এজন্য প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে যে শুধুমাত্র জাতীয় অগ্রাধিকার ফুটিয়ে তোলার জন্য গুণগত উৎকর্ষেরই দরকার হবে তাই নয় বরং নতুন সাহায্য-সহায়তা আকৃষ্ট করার জন্য ঐ উৎকর্ষগত উন্নতি আরও দ্রুততর হতে হবে। সাহায্য অভ্যন্তর ভাগে প্রবাহিত হওয়ার আগেই প্রকল্প পরিকল্পনার কাজ হাতে নিয়ে উল্লিখিত উভয় চাহিদাই মেটানো যেতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য তাই নির্দেশনা হচ্ছে সাহায্য-সহায়তা পিয়াসী প্রকল্প না হয়ে প্রকল্পকেই সাহায্য-সহায়তার অনুসন্ধান করা উচিৎ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন

২৩। পাইপ-লাইনে জমে ওঠা প্রকল্প সাহায্য-সহায়তা হচ্ছে প্রকল্পসমূহের শ্লথ বাস্ত-বায়নের পরিষ্কার লক্ষণ। স্থানীয় সম্পদের সামগ্রিক সংকট ছাড়াও, সাহায্য-সহায়তার অংগীকার ও প্রকল্পের পরিস্থিতি (সাহায্যদানের অংগীকারের আগে) এবং সরেজমিনের অবস্থা পরবর্তী কার্যক্রম প্রণয়নের মধ্যে উল্টো সম্পর্ক থেকে শুরু করে অন্য বহু বিষয় অতীতে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ক্ষুণ্ণ করেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রকল্প সাহায্যের বিনিবন্টনের ক্ষীয়মান অনুপাতে অসন্তুষ্টির কারণে ঐ পরিকল্পনার দ্বিতীয়ার্ধে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সকল পর্যায়গুলোর প্রকল্প বাস্তবায়নই সরকারের সর্বাধিক মনোযোগ লাভ করে এবং এর উন্নতির জন্য নিরলস প্রয়াস চালানো হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমে (এডিপি) প্রকল্পসমূহের সংখ্যা হ্রাস এবং সম্পদের অপ্রত্যাশিত ঘাটতির ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক হিসেবে প্রকল্পগুলোকে কোর ও নন-কোর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্তিকরণ; তহবিল-ছাড় পদ্ধতিসমূহ সহজিকরণ ও ব্যয় করার অধিকার অর্পণ; আমদানি শুল্ক ও বিক্রয়কর পদ্ধতির উন্নয়ন; আইনের শাসনের আওতায় জমির হুকুম দখল পদ্ধতি সুষ্ঠুকরণ ইত্যাদিও এসব প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দৃশ্যতঃ দেখা যায় সম্পদ প্রাপ্তির কঠোর শর্তাবলী আরোপিত থাকলে তাতে প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু উন্নতির সুফল ফলতে দেখা গেছে। ১৯৭০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকল্প সমাপ্তির বার্ষিক হার ১৪০ থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২০৮-এ বৃদ্ধি পায়। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই উন্নতির হার প্রতি বছর এক থাকেনি বরং অনেকটা উঠা-নামা উন্নয়ন-এ থেকে লক্ষ্য করা গেছে। কারিগরী সাহায্য প্রকল্প (TAP) এবং সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে বাস্তবায়িত প্রকল্পসহ মোট প্রায় ১০৩৭টি প্রকল্প দ্বিতীয় পরিকল্পনা আমলে সম্পূর্ণ হয় এবং এগুলোর মধ্যে ৩২৩টি ১৯৮৪/৮৫ সালে সমাপ্ত হয়। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালেও এ ধরনের প্রান্তিক বছরে পুঞ্জিভবন (bunching) লক্ষ্য করা গেছে। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে সম্পূর্ণ মোট ৪৭৩টি প্রকল্পের মধ্যে প্রান্তিক বছরে (১৯৭৯/৮০) সম্পন্ন হয়েছিল ৩৫৭টি। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের এধরণের পুঞ্জায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়মিত উন্নতির অভাবেরই পরিচায়ক এবং প্রান্তিক বছরের এই তাড়াহুড়ো প্রকল্প বাস্ত-বায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত চেতনার অভাব প্রতিফলিত করে।

গ্রন্থাগার

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

২৪। প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীর গতির অর্থ হল বিলম্বিত সুযোগ-সুবিধা আর কার্যপরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে কোন রকম শৈথিল্য দেখা দিলে তাতে অর্জনযোগ্য সুবিধা অনেকখানি বিসর্জন দিতে হয়। আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংকটের কারণে কার্যতঃ স্বল্পমেয়াদী উন্নয়নের চেয়ে কার্যপরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবশ্য এতে শেষ অবধি উন্নয়নের ক্ষেত্রে চাপ পড়ায় আভ্যন্তরীণ সম্পদের সরবরাহ আরও কমে গেছে। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যাটি সাধারণতঃ সরকারী খাতের অনেকটা সহজাত বিষয়। কার্যপরিচালনার পরিকল্পনার অভাব এবং সেই সাথে অতিমাত্রায় কমে আসা বিপণন পরিসরের প্রেক্ষাপটে উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হওয়ার কারণে, বহু সরকারী কর্পোরেশন ও প্রতিষ্ঠান তাদের নগদ সম্পদ পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয় এবং সেই কারণে সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ঐসব সম্পদ ও পুনঃসংস্থাপন করা হয়। মূলধন ক্ষয় ও মূলধন পুনঃসংস্থাপন যেহেতু যুগপৎ নয় সেহেতু পরিকল্পিত বিনিয়োগকে সব সময় গ্রস বিনিয়োগ ধরা হয়। তাই বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পদের পুনঃসংস্থাপন স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যা অসন্তোষজনক তা হচ্ছে এই যে, ঐ পুনঃসংস্থাপনের সকল ক্ষেত্রেই অবচয় তহবিল থেকে অর্থ যোগানো হয় না। মূলধন পুনঃসংস্থাপন কার্যক্রমের নেপথ্যে এই মূলধন ক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কর্পোরেশনগুলোর রেখে দেয়া উপার্জন থেকে ঐ মূলধন পুনঃসংস্থাপনের সংস্থান করা হবে। দুটো কারণে সরকারী কোষাগারে কর্পোরেশনগুলোর প্রদত্ত জমার পরিমাণ কখনও ঐ পুনঃসংস্থাপনের মোট ব্যয়ের সমান হয়নি, এর একটা কারণ হচ্ছে ঐতিহাসিক ব্যয় ভিত্তিতে অবচয় তহবিলের ব্যবস্থা রাখা এবং অপর কারণ হচ্ছে অবচয় তহবিল ও রেখে দেয়া উপার্জন থেকে প্রাথমিক ঋণ পরিশোধ করা। এর ফলে কম আয়ের পরিস্থিতিতে কর্পোরেশনগুলোর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারী খাতে এদিকটি আরও নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেননা, কোন না কোন কারণে দেখা যায় সামাজিক সম্পদ (অবকাঠামোসমূহ) পক্ষপাতমূলকভাবে উৎপাদনশীল সম্পদগুলোকে অনুসরণ করছে। রাস্তা, বিদ্যালয়, সরকারী ভবন ও বাঁধ ইত্যাদির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কারণ উন্নয়ন বাজেটে অবদান যোগাতে গিয়ে রাজস্ব বাজেটের উপর যথেষ্ট চাপ পড়ে। কিন্তু এভাবে সম্পদ সংকোচনের ফলে রক্ষণাবেক্ষণও এমনভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ে যে, সংশ্লিষ্ট সম্পদ ক্রমানুয়ে এমন দুর্দশাগ্রস্ত হয় যে সেগুলো শেষ পর্যন্ত উন্নয়ন কার্যক্রমে পুনঃসংস্থাপন তালিকায় গিয়ে স্থান পায়। এমনি করে ঐ সম্পদগুলোর জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় দাবী না করে উন্নয়ন কার্যক্রমে যা কিছু অবদান যোগানো হয় তা কার্যতঃ সম্পদসমূহের পুনঃসংস্থাপন শুষে নেয়। সম্ভবতঃ এ কারণে, অর্থনীতির ক্ষতি আরও বেড়ে যায় কেননা, সম্পদসমূহের অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের কারণে ঐ সম্পদগুলো থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধের পরিমাণও হ্রাস পায়। এতে করে উন্নয়ন বাজেট ক্রমবর্ধমান হারে একটা পুনঃসংস্থাপন বাজেট হয়ে ওঠে যার ফলাফল বেশ গুরুতর। এ কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কার্যপরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হবে না এমন নতুন সম্পদ সৃষ্টির চেয়ে যে সম্পদ আছে সেগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা এবং যে উন্নয়ন বাজেটে জমে ওঠা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের পরিবর্তে সত্যিকারের উন্নয়ন প্রয়াস প্রতিফলিত হয় সেই উন্নয়ন বাজেটই হবে অর্থপূর্ণ। উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সম্পর্কে যদিও একটা যৌক্তিক ভিত্তি আছে, তবুও পুনঃ সংস্থাপনের তুলনায় সম্পদ সৃষ্টির মৌলিক নীতি হচ্ছে ঐ সম্পদের উৎপাদনশীল প্রয়োগ এবং সম্পদের ঐ প্রয়োগের ব্যয় একক বা সমষ্টিগতভাবে আরোপ। কাজেই রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমকে ব্যয় নির্বাহের দিক হতে স্বনির্ভর হতে হবে এবং এটা সার্ভিসের মূল্য নির্ধারণ ও কর কার্যের মাধ্যমেও করা যেতে পারে।

প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ

২৫। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে লোক প্রশাসনে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে উপজেলা স্তর অবধি প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ। আগে উপজেলাগুলো থানা নামে পরিচিত ছিল। গ্রামীণ জনসাধারণের কাছে সরকারী সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য এই বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে পল্লী উপজেলাগুলোর সংখ্যাও বাড়ানো হয় যাতে করে জনসাধারণ সহজে প্রশাসনের সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি উন্নয়ন প্রক্রিয়ারও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে উন্নয়নকেও সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এই পরিষদ নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য বর্গের দ্বারা গঠিত। স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর ব্যাপারে এই পরিষদ কর্তৃত্ব প্রাপ্ত যাতে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো সর্বনিম্ন পর্যায়ে পরিকল্পিত হতে পারে ও সেগুলোতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটে। এই অনুসারে, উন্নয়নের অনেকগুলো বিষয় উপজেলা স্তরে স্থানান্তরিত করা হয়, যুগপৎ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো থেকে উপজেলা স্তরের ক্ষেত্রকর্মীদেরকে উপজেলা পরিষদে প্রেষণে পাঠানো হয়। সেই সংগে সকল উপজেলার জন্য বাজেট বরাদ্দ ও একই রকম প্রশাসনিক সমর্থন দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় সরকার উপজেলা কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম যথাযথ পরিচালনার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ভবন, সড়ক ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার মত মৌল অবকাঠামোগুলোর উন্নয়নের কাজ হাতে নেন। প্রশাসনিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি(NICAR)বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামোর উন্নয়ন কাজের জন্য তহবিল বরাদ্দ করে। এছাড়া, সরকার উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়ার জন্য পরিষদগুলোকে সহায়তা অনুদানও দিয়েছেন। এক্ষেত্রে যে নির্দেশনা রয়েছে তার দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ এক, বিভিন্ন তৎপরতা খাতে উন্নয়ন ব্যয়ের তারতম্যের পরিসর এবং দুই, বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন উপজেলাকে তহবিল বরাদ্দের শর্তাবলী। গোড়ার দিকের বছরগুলোতে বরাদ্দ সকল উপজেলার জন্য একই হারে দেয়া হলেও ভবিষ্যত বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলাগুলোর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হবে। উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ক্ষেত্র পর্যায়ে নিয়োজিত ডেপুটি কমিশনার এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, মন্ত্রণালয়ে পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন সেল উন্নয়ন ব্যয় পর্যবেক্ষণ করবেন। ঐ উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো জাতীয় পরিকল্পনা প্রেক্ষিতের সংগে সংগতিপূর্ণ থাকছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রণীত উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন। পরিশেষে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-সমূহের পূর্ণ সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মাঝে মাঝে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট উপজেলাগুলো সফর করবেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় সরকার ভৌত অবকাঠামোসমূহ-উন্নয়নে ৫২৫.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় করেন এবং উন্নয়ন কাজে সহায়তা অনুদান হিসেবে পরিষদগুলোকে ৩৭০.৯৩ কোটি টাকা প্রদান করেন। এছাড়াও ১৯৮৩/৮৪ সালে উপজেলা পরিষদগুলোর মাধ্যমে ৮.৪৫ লাখ টন খাদ্যশস্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রমের আওতায় উন্নয়ন তৎপরতা পরিচালিত হয় যাহার মোট মূল্য ৩১০.৮৩ কোটি টাকা। সরকার কিছু কিছু কর আদায়ের জন্য স্থানীয় পরিষদকে ক্ষমতা দিয়েছেন।

২৬। তৃতীয় পরিকল্পনায় উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামোর আরও উন্নয়নের জন্য ১০০০ কোটি টাকা ও পরিষদগুলোর উন্নয়ন তৎপরতার জন্য ১২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও, কাজের বিনিময়ে খাদ্যকর্মসূচীর আওতায় আনুমানিক ২৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বরাদ্দের সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার স্থানীয় পরিষদগুলোর মাধ্যমে কিছু জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সব কার্যক্রম ঐ সব পরিষদে পরিচালিত হবে যে সব পরিষদে উল্লিখিত কার্যক্রম-গুলোর স্বকীয় স্থানীয় উপাদান রয়েছে। উল্লেখ করা দরকার যে, এই কার্যক্রমও ক্রমবর্ধমানহারে উন্নয়নমুখী হয়ে উঠেছে। উপজেলা স্তরে এই ধরণের তৎপরতা বৃদ্ধির যে কতকগুলো ভালো দিক আছে তাতে সন্দেহ নেই। সেগুলো সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের সংগে সংশ্লিষ্ট। এগুলো হচ্ছে উপজেলা স্তরের

কর্মীদের কারিগরি যোগ্যতার উন্নয়ন ও প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় স্তরে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি সমর্থন দান; সার্বিক পর্যায়ে উপজেলা পরিসংখ্যানের উন্নয়ন এবং ঐ পরিসংখ্যানের নিরবচ্ছিন্ন সাম্প্রতিকীকরণ; স্থানীয় উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত না করেই উন্নয়ন ব্যয় পর্যবেক্ষণ; স্থানীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্রিয়া বিশ্লেষণ এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশনায় পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাজেট কৌশল ও ভূমিকা এবং সর্বোপরি উদ্বুদ্ধকরন ও জনগণের অংশ গ্রহণ। পরিসংখ্যান ব্যুরো উৎপাদন ও আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে উপজেলা পর্যায়ের পরিসংখ্যান গড়ে তুলছে; তবু সমাজের অগ্রগতির সংগে সংগে সেগুলোরও সর্ব সাম্প্রতিকীকরণের প্রয়োজন হবে। অবশ্য দারিদ্রের উপশম তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হওয়ায়, উল্লিখিত পরিসংখ্যান প্রধানতঃ সার্বিক পর্যায়ের পরিসংখ্যান অর্থাৎ কর্মসংস্থান, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ও পরিবার পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ ও বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ইত্যাদিতে কেন্দ্রীভূত থাকবে।

২৭। একটা সনাতন গতানুগতিক সমাজে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন সহজ প্রক্রিয়া নয়। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা প্রাথমিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে মাত্র এবং এগুলো প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ঐসব এলাকায় যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে পল্লী অর্থনীতির বিরাজমান পরিস্থিতির তুলনায় তা কিছুই নয়। তাছাড়া এধরণের উন্নয়ন তৎপরতা শুরু হয়েছে মাত্র অল্পকাল আগে। এই এত অল্প সময়ের মধ্যেই বেশী কিছু প্রত্যাশাও করা যাবে না। একথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, স্থানীয় সরকারকে এক্ষেত্রে ঐতিহ্য গড়ে তুলতে হবে। পোষক-পষিত ধারার এই সমাজে বিষয়টির বাস্তবায়ন কঠিন। একথাও বোঝা দরকার পল্লী সমাজে কোন বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনও সম্ভব নয়। উপজেলা পরিষদের মুখোমুখী উপজেলা প্রশাসনের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা অবশ্য সুনিশ্চিত ভাবেই ঐ সামাজিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়েছে। এজন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে তারা সমাজে পরিবর্তন আনার প্রশ্নে তাদের পথ বেছে নিতে এই ঐতিহাসিক সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে হলে উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা সকলকে এমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়নের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে যাতে জনগণ পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সপ্তম অধ্যায়

বেসরকারী খাতের উন্নয়ন

বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের পর্যালোচনা

১৯৭৫ সাল হতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতের ভূমিকার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম জাতীয় সরকারের নীতি বেসরকারী বিনিয়োগের সুযোগকে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র শিল্পসমূহে সীমাবদ্ধ রেখেছিল, কিন্তু পরিস্থিতির প্রয়োজনে জাতীয়করণ নীতি জারিকরা ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ২৭নং অধ্যাদেশের ব্যাপক কাঠামোর আওতায় বেসরকারী খাতকে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য বিনিয়োগ সিলিং ২৫ লাখ টাকা থেকে ৩ কোটি টাকায় (১৯৭৪-এর জুলাইতে) এবং ১৯৭৫ সালে ১০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। দশক শেষ হবার আগেই বিনিয়োগ সিলিং পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হয়, জাতীয়করণ নীতি প্রথমে স্থগিত ও পরে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাহার করা হয় এবং বেসরকারী খাতের জন্য বিনিয়োগের নতুন নতুন ক্ষেত্র খুলে দেয়া হয়। অপরদিকে, সরকারী খাতের অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পদের উপর উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহের ক্রমবর্ধমান চাপের ফলে, স্বাধীনতার পর চালু রাখার জন্য সরকার কর্তৃক হাতে নেয়া বহু ছোট প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রমবর্ধমান হারে পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। যদিও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে সাড়া দিয়ে ক্রমানুয়ে এই পরিবর্তনগুলো সাধিত হয়েছে, তবুও এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে জাতীয় সচেতনতার একটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রবণতা এ তথ্যের মধ্যে পরিষ্কার প্রতিফলিত হয় যে, ক্রমানুসারে পরিকল্পনাসমূহে বেসরকারী খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় (১৯৭৩—৭৮) বেসরকারী খাতের জন্য বরাদ্দ ছিল ১১%, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে (১৯৭৮—৮০) তা ১৬% শতাংশে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার অধীনে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫.৫% শতাংশে দাঁড়ায়। ক্রমানুসারে পরিকল্পনাসমূহে যে সম্প্রসারিত ভূমিকা পালনের আহবান জানানো হয়, বেসরকারী খাতও তাতে সক্রিয়ভাবে সাড়া দেয়। প্রথম পরিকল্পনায় বেসরকারী বিনিয়োগ ছিল পরিকল্পনায় বরাদ্দকৃত ৫০১ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৭২/৭৩-এর পাইকারী দরের মূল্যে ৪৩৬ কোটি টাকা (বর্তমান মূল্যে ৮৮৭ কোটি টাকা), অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে কঠোর মুদ্রা ও আর্থিক পদক্ষেপ নেয়া সত্বেও পরিকল্পনার লক্ষ্যের ৮৪.৭% অর্জিত হয়েছিল। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে ৬০১ কোটি টাকা বরাদ্দের তুলনায় প্রকৃত অর্থে ৯৫৭ কোটি টাকা (১৯৭৭/৭৮-এর পাইকারী দাম অনুযায়ী) কাজে লাগানো হয়েছে। বেসরকারী খাত কর্তৃক বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশী বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার অধীনে বেসরকারী খাতের পরিকল্পিত বিনিয়োগের অংশ দ্বিগুণের ও বেশী বেড়ে ১৬% থেকে একটি বৃহত্তর আকারের পরিকল্পনার ৩৫.৫%-এ দাঁড়ায়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার ৩০০ কোটি টাকার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার অধীনে গড়ে বার্ষিক বেসরকারী বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ৯০০ কোটি টাকা (১৯৭৭/৭৮-এর পাইকারী মূল্য অনুযায়ী)। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অধীনে বেসরকারী বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা তিনগুণ বৃদ্ধি সত্বেও ৬,১০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রার ৮১.৫% অর্জিত হইয়াছে; মোট বেসরকারী বিনিয়োগ ৪৯৬৯ কোটি টাকায় হিসাব করা হয়েছে।

২। পর পর তিনটি পরিকল্পনায় বেসরকারী খাতের বিনিয়োগের তুলনামূলক অবস্থান নীচের সারণীতে দেয়া হলো :

সারণী ১

বেসরকারী বিনিয়োগের তুলনামূলক অবস্থান

[কোটি টাকায়]

		প্রথম পরিকল্পনা (১৯৭৩—৭৮)	দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮—৮০)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৮০—৮৫)
(১) পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ (ভিত্তি বছরের মুল্যে)	..	৫০৩	৬০০	৬,১০০
(২) প্রকৃত বিনিয়োগ (১৯৭২/৭৩ সালের মুল্যে)	..	৪৩৬	৪২০	১,৭৭২
(৩) গড়বার্ষিক বিনিয়োগ (১৯৭২/৭৩ সালের মুল্যে)	..	৮৭	২১০	৩৫৪

৩। সারণীতে দেখা যায় যে, অর্থনীতির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্রমবর্ধমান হারে উদার করার পাশাপাশি বেসরকারী বিনিয়োগ সুযোগের সম্প্রসারণের ফলে এক পরিকল্পনা থেকে অন্যটিতে বেসরকারী বিনিয়োগে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। একাধারে কৃষি ও শিল্পে সরকারী নীতির সংস্কার চালানো হয়। সত্তুর দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের হাত থেকে কীটনাশক বিতরণের ভার তুলে নেয়ার পর কৃষি নীতির সংস্কার শুরু হয় এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে সারের খুচরা ব্যবসা বেসরকারী বিতরণের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেসরকারী খাতকে সেচ সরঞ্জাম সরবরাহের সাথে যুক্ত করা হয়। এমনকি খাদ্যের মত গুরুত্বপুর্ণ সামগ্রীর ক্ষেত্রেও মজুদ বিরোধী আইন স্থগিত রেখে এবং সরকারী মজুদ থেকে ব্যবসায়ীদের কাছে খোলা বাজারে চাল বিক্রী করে বেসরকারী ব্যবসাকে উৎসাহিত করা হয়। এই সবকিছু আধুনিক ব্যবস্থাদির সম্প্রসারিত ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিখাতের উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৪। শিল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নীতি সংস্কার ঘটে ১৯৮২-এর জুনে, যখন সরকার একটি নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে। নতুন নীতিতে (এনআইপি) রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাট ও বস্ত্র মিলগুলো তাদের স্থানীয় মালিকদের কাছে ফেরত দানের ব্যবস্থা করা হয়। আগেকার যে কোন ব্যবস্থার তুলনায় এটা ছিল এক বিরাট পদক্ষেপ। এ ছাড়াও এন আই পিতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ, আনবিক শক্তি, টেলিযোগাযোগ, বিমান পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ এবং যান্ত্রিক বনায়ন, এই ছয়টি ক্ষেত্র ছাড়া সকল শিল্পে বেসরকারী বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়। উক্ত ৬টি ক্ষেত্র সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। তেরটি খাতকে সংযুক্ত তালিকায় রাখা হয়, যেখানে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরণের বিনিয়োগের অনুমতি দেয়া হয়। বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন এবং ঋণ অনুমোদনের মধ্যবর্তী সময়-সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়ে বেসরকারী বিনিয়োগ প্রস্তাবের সুবিধা এবং ঋণ প্রদান পদ্ধতি সহজতর করে দেয়া হয়। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে আঞ্চলিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে বিনিয়োগ ও ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষমতা আঞ্চলিক অফিসসমূহে বিকেন্দ্রীত করা হয়। সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রশাসনিক স্তর কমানোর লক্ষ্যে শিল্প প্রকল্পসমূহ প্রসেসিং করার জন্য 'ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস' কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

৫। এন আই পি প্রবর্তিত হবার পরবর্তীতে বেসরকারী খাতকে চাংগা করার জন্য বিরাট সংখ্যক পাট ও সুতীবস্ত্র মিল বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। ১৯৮৫-এর জুন নাগাদ ৯৫৭৮ টি তাঁতসহ ৩৩টি পাটকল এবং ৪.৯৭ লাখ প্রতিষ্ঠিত টাকু ও ৪৭৭১টি তাঁতসহ ২৭টি সুতীবস্ত্র মিল বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয় (সাবেক মালিককে ফেরত দেয়া হয় অথবা নিলামে বিক্রী করে দেয়া হয়)। ক্ষমতা ব্যবহারে এতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

৬। বেসরকারী খাতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার প্রয়োজনে এই নীতিগত পরিবর্তনসমূহ যুক্তিসংগত কারণেই বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগে সম্প্রসারিত হয়। বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে উন্নতি বিধান এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে সরাসরি অথবা স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের সাথে যৌথভাবে বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য ১৯৮০ সালের বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগ (উন্নয়ন ও নিরাপত্তাবিধান) আইন প্রণীত হয়। এই আইন অ-বাণিজ্যিক ঝুঁকির ব্যাপারে নিরাপত্তা, লাভ স্থানান্তর এবং জাতীয়করণের ক্ষেত্রে মূলধন ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছে।

৭। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য উদার শর্ত ও উৎসাহদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ ৫ বছরের জন্য কর মওকুফ এবং আমদানী শুল্কের হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই পাবে।

৮। বেসরকারী বিনিয়োগকে চাংগা করার জন্যে আর্থিক ও রাজস্বজনিত প্রেরণা সম্প্রসারিতভাবে প্রদান করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে ১৯৭০ এর দ্বিতীয়ার্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়, যখন যন্ত্রপাতির আমদানী শুল্ক এবং কর মওকুফের সময়সীমা—উন্নত এলাকা, উন্নয়নশীল এলাকা এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত উন্নয়নশীল এলাকা—এই তিন আঞ্চলিক শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে পৃথক করা হয়। যন্ত্রপাতির আমদানী শুল্ক সাধারণ হার ১৫% এর তুলনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত উন্নয়নশীল এলাকার জন্য ২.৫% এবং উন্নয়নশীল এলাকার জন্য ৫% ধার্য করা হয়েছে। এনআইপি'তে এই শ্রেণীবিন্যাস স্বল্পোন্নত এলাকা এবং উন্নত এলাকা এই দু'ভাগে কমিয়ে এনে ২.৫% এবং ১৫% দুটি হারে ধার্য করা হয়েছে। এর ফলে সুবিধাদির অপচয় কমে আসবে বলে আশা করা যায়। দ্বিতীয়তঃ কর মওকুফ স্বল্পোন্নত এলাকার জন্য ৯ বছর এবং উন্নত এলাকার জন্য ৫ বছর রাখা হয়েছে। তৃতীয়তঃ বিনিময় হারের উঠানামার ঝুঁকির বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণকে রক্ষার জন্য এবং বিনিময় হার উঠানামার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বোঝা থেকে ইতিমধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ গ্রহণকারীদের রক্ষার জন্য বিনিময় হার উঠানামার বোঝা গ্রহণ স্কীম (E F A S) ১৯৮৩-এর জুলাইতে প্রবর্তিত হয় এবং ২.৫% বীমা প্রিমিয়াম নির্ধারিত হয়। রপ্তানি ঋণের সুদ ছাটাই (১৯৮৩র জুলাই থেকে ৯%) এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রয়োজনের জন্য কার্যকর মূলধনের ৯০% ব্যবস্থা করা, রপ্তানির জন্য ধারণাগত শুল্ক ফেরতদানের প্রবর্তন, শুল্ক ফেরতদানের বিপরীতে ৯০ দিনের সুদমুক্ত ব্যাংক ঋণ, রপ্তানির উপর আয়কর হ্রাস, ইত্যাদি অন্যান্য আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৯। বেসরকারী খাতকে সমর্থন দেয়ার জন্য বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন করা হয়। প্রথমতঃ বেসরকারী খাতকে ১০০% স্থানীয় মালিকানায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ ধরণের তিনটি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং একটি বীমা কোম্পানী (ন্যাশনাল লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও যৌথ উদ্যোগের ভিত্তিতে দু'টি শিল্প উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ গুলো হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্রমোশন এণ্ড ডেভেলাপমেন্ট কোম্পানী (I P D C), যার সাথে সংযুক্ত রয়েছে বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা, যুক্তরাজ্যের কমনওয়েলথ উন্নয়ন করপোরেশন, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের জার্মান ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী (DEG) এবং সুইজারল্যাণ্ডের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্রমোশন সার্ভিস এই চারটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অর্থ প্রতিষ্ঠান এবং সৌদী

বাংলাদেশ শিল্প ও কৃষি কোম্পানী। সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদেরকে মূলধন সরন্জাম লীজ দেয়ার মাধ্যমে মূলধন সরন্জাম সংগ্রহে অর্থ যোগানোর জন্য একটি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানী (৪০% বৈদেশিক শেয়ারসহ/প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাদি এগিয়ে চলছে।

১০। নীতিবিষয়ক পরিবেশে এ সমস্ত উন্নতির ফলে সারণী-২ এর বর্ণনা মোতাবেক বেসরকারী বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের ধরণের ব্যাপারে কৃষির প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। আগেকার সময়ের এক দশমাংশ অংশের তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিখাতে বেসরকারী বিনিয়োগ এক তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়। এর মাধ্যমেই কৃষির উপর বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদনের উপর দ্বিতীয় পরিকল্পনার গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়। কৃষিখাতে লব্ধি্ত বিনিয়োগের একটি প্রধান উৎস ছিল কৃষি ঋণ যা ১৯৭৯/৮০ সালে ২৬৯ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১০০০ কোটি টাকার উর্দ্ধে উন্নীত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেসরকারী বিনিয়োগের অন্য এক তৃতীয়াংশ দালান, বাড়ীঘর ও দোকানপাট নির্মাণে ব্যবহৃত হয় যদিও এর অংশ কিছুটা হ্রাস পায়। বেসরকারী বিনিয়োগের এক ষষ্ঠাংশ শিল্প খাতে ব্যবহৃত হয় যা পূর্ববর্তী পরিকল্পনায় এক পঞ্চমাংশের বেশী ছিল যদিও স্বাভাবিক অর্থে বাৎসরিক বিনিয়োগ দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় বেড়ে দ্বিগুণ এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চেয়ে পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেসরকারী বিনিয়োগের খাতওয়ারী বন্টন ২নং সারণীতে দেখানো হলো :

সারণী-২

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রাক্কলিত বেসরকারী বিনিয়োগ (১৯৮০—৮৫)

[কোটি টাকায়]

খাতসমূহ	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট ১৯৮০/৮৫	মোট এর শতকরা
(১) কৃষি ..	২০০	২৫৭	৩১৫	৪৩৫	৬৮২	৭৭৭	২৪৬৬	৩৬%
(২) শিল্প ..	১৭০	২১০	২২৬	২২৩	২৫৪	২১১	১১২৪	১৬%
(৩) ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহনির্মাণ	১৬৪	১৮৮	১২৪	১৪৪	৩৪৭	৪৪৯	১২৫২	১৮%
(৪) পরিবহন ..	১১৫	১৬৮	১৯৩	১৫৫	১৭০	২৩৯	৯২৫	১৪%
(৫) বাণিজ্য ও অন্যান্য সার্ভিস	১৫০	১৭৩	১৯০	২১০	২৩১	৩০১	১১০৫	১৬%
মোটঃ								
(ক) চলতি মূল্যে ..	৭৯৯	৯৯৬	১০৪৭	১১৬৭	১৬৮৪	১৯৭৭	৬৮৭২	১০০%
(খ) ১৯৭৯/৮০ এর স্থির মূল্যে	৭৯৯	৯২৪	৮৬৩	৯১১	১১৩২	১১৩৯	৪৯৬৯	..

টীকাঃ ১৯৭৯/৮০ এর পাইকারী মূল্য সূচক দ্বারা মুদ্রামান হ্রাস করা হয়েছে।

১১। পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের (সারণী ৩) ৮৮২ কোটি টাকা থেকে ১৯৮০-৮৫ মেয়াদে বেসরকারী শিল্পে বিনিয়োগের অনুমোদন ৩,৩৮৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়, প্রকৃত শিল্প বিনিয়োগ অবশ্য ছিল অনুমোদনের মাত্র এক তৃতীয়াংশ, ১১২৪ কোটি টাকা। ১৭৬৯ কোটি টাকার পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে তা ছিল ৩৬.৫% কম, যদিও আগেকার ৫ বছরের চেয়ে তা ছিল আড়াই গুণ বেশী। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বি এস বি) এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বি এস আর এস) নামের এই দুটি অর্থ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পুরানো ঋণ পরিশোধজনিত সমস্যার ফলে মারাত্মক চালু তহবিল সমস্যায় ভুগছিল বিধায় এবং পাশাপাশি পরিকল্পনার শেষ বছরে বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিল্প ঋণ সরবরাহ কমিয়ে দেয়ার ফলে বেসরকারী খাতে শিল্প বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুরুত্বপূর্ণ নীতি উন্নয়ন সত্ত্বেও ১৯৭৩—৮০ মেয়াদের ১৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগের তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মাত্র ২৯৯ কোটি টাকার বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগ অনুমোদন করা হয়।

সারণী ৩

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৮০—৮৫) বেসরকারী খাতে শিল্প বিনিয়োগ অনুমোদন

[কোটি টাকায়]

বছর		অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	অনুমোদনের পরিমাণ	বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ অনুমোদন	বেসরকারী খাতকে শিল্প ঋণ বিতরণ
১৯৮০/৮১	..	১৭৪০	৬৬৮	৩৬	১৫৩
১৯৮১/৮২	..	৬০৭	২৮৮	১৩	১০৬
১৯৮২/৮৩	..	৬৩৬	৩৭৪	১০৬	১৩৭
১৯৮৩/৮৪	..	২৫০৩	১১১৮	১১৮	১৩৫
১৯৮৪/৮৫	..	৫৫০৫*	৯৩৮	২৬	১১৪
মোট (১৯৮০—৮৫):		১০,৯৯১	৩৩৮৬	২৯৯	৬৪৫

*২২৮০ ইউনিট কুটির শিল্পসহ

শিল্পখাতে অর্থের সমস্যা

১২। শিল্প খাতের ক্রমবর্ধমান উদারকরণ ও বেসরকারীকরণের সাথে সাথে সবচেয়ে যোগ্য ক্ষেত্রসমূহে আর্থিক সম্পদ প্রবাহিত করতে আর্থিক সংস্থাসমূহের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বেসরকারী খাতের শিল্পে অর্থযোগান দেয়ার জন্য মেয়াদী ঋণ প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বি এস বি) এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বি এস আর এস) কর্তৃক প্রদত্ত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রশিল্পসমূহে শিল্প ঋণ দিতে শুরু করেছে। যদিও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রধানতঃ কার্যকরী মূলধন ঋণ দেয়ার কাজেই জড়িত। ঋণ অপরিশোধিত থাকার কারণে স্বাধীনতার সময় থেকে বিএসবি এবং বিএসআরএস মারাত্মক তার

পরিশোধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শুরুর সময়ে বিএসবি এবং বিএসআরএস- এর মেয়াদউত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪১.৬ কোটি টাকা ও ৭৪.৯ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে এই পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ২১৯.৮ কোটি টাকা ও ৩২৫.০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অধিকাংশ মেয়াদউত্তীর্ণ ঋণই বেসরকারী খাতের কাছ থেকে পাওনা, বিএসবির ক্ষেত্রে তা ২১২.০ কোটি টাকা এবং বিএসআরএস এর ক্ষেত্রে তা ২৮৩.৩ কোটি টাকা। বিএসবি'র নগদ পরিশোধের হারে ধারাবাহিক অধোগতি দেখা যায়; ১৯৮০/৮১ সালে তা ছিল ২৮% এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৪%; পক্ষান্তরে বিএসআরএস এর ক্ষেত্রে ১৯৮০/৮১ সালে ছিল ১০% এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে ৫% এরও কম। শিল্পঋণ ব্যতিরেকে বেসরকারী খাতের উন্নয়ন ঘটতে পারে না, অতীত ঋণ পরিশোধ না হবার ফলে অর্থ লগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বেসরকারী খাতের উন্নয়নে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় এ খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধা হয়ে থাকবে।

১৩। শিল্পঋণের বর্তমান অবস্থার জন্য কতকগুলো কারণ দায়ী। প্রথমতঃ স্বাধীনতার সময় থেকে সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বেসরকারী খাতের উপর দুর্বল প্রভাব ফেলেছে। সরকারী খাতের সাথে যদি তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে বেসরকারী খাতের আর্থিক অবস্থাও সুখকর ছিল না, কারণ প্রায় সব সরকারী সংস্থাই লোকসানে চলছিল। ১৯৭৪/৭৫ থেকে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত শিল্প খাতের ৬টি সংস্থা ১৯৭৯/৮০ সাল বাদে প্রতিবছরই সম্মিলিতভাবে লোকসান দিয়েছে। কেবলমাত্র দুটি সংস্থা, চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা এবং ইস্পাত ও প্রকৌশলী সংস্থা বার্ষিক ভিত্তিতে মুনাফা অর্জন করেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১৯৮৪/৮৫ সালে তারা একত্রে এতবেশী লোকসান দেয় যে, অতীতের সব মুনাফা ডুবে যায়। এটা স্বীকার করা ভাল যে স্বাধীনতার পর থেকে ঘরে বাইরে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক বহির্ভূত পরিবেশও সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং আর্থিক শৃংখলার সাধারণ অবক্ষয়ে অবদান যুগিয়েছে এবং নিম্নমানের বিনিয়োগ খাতকে সমৃদ্ধ হবার সুযোগ করে দিয়েছে। একথা বললে বেশী বলা হবে না যে, যখন সরকার জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে বেসরকারী খাতের ভূমিকা সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন, তখন ব্যক্তিগত পছন্দ সঠিক হয়নি। এ তথ্য থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে যায় যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেসরকারী খাতে বিএসবি'র ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ বেড়ে ৮৭.৭% শতাংশে উত্তীর্ণ হয়, বি এস, আর এস এর ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৭২.৬%। সংক্ষেপে, মেয়াদউত্তীর্ণ ঋণের সমস্যা সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আর্থিক শৃংখলার অভাবেরই ফল।

১৪। উন্নয়ন অর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠানগুলোর (ডি এফ আই) ঋণ তৎপরতার উন্নতি ঘটাতে এবং সেই সংগে সুষ্ঠু ব্যাংকিং নীতিমালার ভিত্তিতে সেগুলো পরিচালনার যোগ্য করে তুলতে তহবিলের পুনর্ঘূর্ণন উন্নত করার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত বর্ষে একাধিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল বিনিময় হার উঠানামার জন্য অতীত ঋণের সমতাকরণ, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের নগদ পরিশোধের ক্ষেত্রে পরিমাণ কমানো, শাস্তিমূলক সুদ প্রত্যাহার এবং সুদের উপর রেয়াতদান। নেতিবাচক দিকেও কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল, যথা—খেলাপকারী ঋণ গ্রহীতাদের ব্যাংক হতে কার্যকরী মূলধন সুবিধাদি দান বন্ধ রাখা এবং আমদানী লাইসেন্স স্থগিত রাখা। অন্যদিকে, তাদের তৎপরতায় শৃংখলা আনার জন্য দুটি ডিএফআই-কে কাজকর্মের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হয়। সেই মোতাবেক, পুনর্বিন্যস্ত বিএসবি প্রাথমিক ঋণ দাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে এবং পুনর্বিন্যস্ত বি এস আর এস এর বর্তমান পোর্টফোলিওতে তার তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখবে, যাতে ক্রমানুয়ে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিনত হওয়া যায় যা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা সার্ভিস সরবরাহ করবে এবং শিল্পের প্রসার, গবেষণা ও পরামর্শ সার্ভিসে মনোনিবেশ করবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বেসরকারী বিনিয়োগ

১৫। গত দশকে অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বেসরকারী খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সাধারণ আর্থ-সামাজিক পরিবেশের দুর্বল প্রভাবের কথা মনে রেখে এখনও এটা অনুভূত হয় যে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করার রয়েছে। ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে যে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি থেকে প্রধানতঃ বেসরকারী খাতের সমস্যা চিহ্নিত করা যায়। এর কাজ কর্মের উন্নয়ন নির্ভর করছে পরিবেশগত উন্নয়নের উপর এবং তাই সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর। তৃতীয় পরিকল্পনায় যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে অর্থনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ নিম্নতর পর্যায়ে নিয়ে আসা, যাতে করে অর্থনীতি বহির্ভূত বিবেচনার পরিবর্তে যোগ্যতার ভিত্তিতে সীমিত আর্থিক ও উদ্যোগ বিষয়ক সম্পদসমূহ বণ্টন করা যায়। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্রমাগত হ্রাসের ফলে এবং বাজার অর্থনীতির দিকে যাত্রা শুরুর ফলে অর্থনীতি ইতিমধ্যে সে লক্ষ্যে ধাবিত হচ্ছে। একদিকে বেসরকারী খাতের ভূমিকা সম্প্রসারিত করে এবং অন্যদিকে সার্বিক অর্থনৈতিক নীতিমালা সংস্কারের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান হারে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে অর্থনীতি বহির্ভূত বিকল্প হিসাবে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ চালু করে তৃতীয় পরিকল্পনায় এ প্রক্রিয়া জোরদার করা হবে। এভাবে পরিকল্পনায় সামাজিক ও বেসরকারী লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে আগের চেয়ে বেশী মাত্রায় নীতি পরিকল্পনার আস্থা স্থাপনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। ১৯৮৫-৯০ সময়কালে যে হাতিয়ারের উপর এটা জোর দেবে তা হচ্ছে আর্থিক এবং রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি মালা।

১৬। তৃতীয় পরিকল্পনায় বেসরকারী খাতের জন্য ১৩,৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ বরাদ্দ করা হয়েছে যা পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দের প্রায় ৩৫.২%। এটা একটা নির্দেশক বিনিয়োগ বরাদ্দ এবং যদি তেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তবে তৃতীয় পরিকল্পনায় বেসরকারী খাতের অধিকতর অংশ গ্রহণের জন্য জায়গা খোলা রাখতে নমনীয় ব্যবস্থা থাকবে। এই বরাদ্দের মাধ্যমে পরিকল্পনায় স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে বিনিয়োগের পরিবেশ, সার্বিক অর্থনৈতিক নীতিমালা, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং সর্বোপরি বেসরকারী খাতে উদ্যোগের উপর প্রকৃত বিনিয়োগ নির্ভর করবে। এন আই পি'র অধীনে বেসরকারী বিনিয়োগের সুযোগসমূহ ইতিমধ্যেই সম্প্রসারিত হয়েছে এবং বেসরকারী বিনিয়োগকে চাংগা করতে উদার উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং ইকুইটি অংশ গ্রহণ সহ যৌথ উদ্যোগের জন্য আরো ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেসরকারী বিনিয়োগের লক্ষ্য অর্জন করতে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবহন এবং টেলিযোগাযোগের মত মৌলিক সহায়তা সার্ভিস দিয়ে সরকার প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে। বেসরকারী খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যও সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। অপর দিকে এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে সমাজের আস্থা অর্জন করা বেসরকারী খাতের জন্য অত্যাবশ্যক, যদিও এ লক্ষ্যসমূহ সমাজের সাথে সমভাবে সম্প্রসারিত হতে হবে তেমন কোন কথা নেই। কারণ শেষ পর্যন্ত জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নই বেসরকারী ও সরকারী খাতের লক্ষ্য। কিন্তু সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণেতাদের দায়িত্ব হচ্ছে দুই খাতের লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা।

১৭। সারণী ৪ এ প্রধান-খাতওয়ারী বরাদ্দসমূহ দেখান হলো। বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের প্রায় ৩৩% কৃষিতে, ২৪% শিল্পে, ২৭% ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহ নির্মাণে, ১১% পরিবহনে এবং বাদবাকী অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সারণী ৪

প্রাক্কলিত বেসরকারী বিনিয়োগ ১৯৮৫—৯০

[কোটি টাকায়]

খাত		বিনিয়োগ	বিনিয়োগ শতাংশে
১।	কৃষি	৪৪০০	৩২.৪
২।	শিল্প	৩২০০	২৩.৫
৩।	জ্বালানী উন্নয়ন	৫০০	৩.৭
৪।	ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন এবং বাণিজ্যিক নির্মাণ	৩৬৫০	২৬.৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫০০	১১.০
৬।	শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও অন্যান্য সার্ভিস	৩৫০	২.৬
	মোট :	১৩,৬০০	১০০.০

১৮। কৃষিঃ গত দশকে কৃষি উপকরণ বিতরণ ও সেচ ব্যবস্থায় বেসরকারীকরণ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই প্রক্রিয়া আরো জোরদার হবে। পরিকল্পনাকালে কৃষিতে সেচ সরঞ্জাম, ড্রাফট পাওয়ার, ভূমি উন্নয়ন, পানি কাঠামো নির্মাণ, খামার বাড়ী ও মৎস চাষ উন্নয়নের ক্ষেত্রে-বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৪০০ কোটি টাকা অথবা মোট অনুমিত বিনিয়োগের এক তৃতীয়াংশ বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন নির্ভর করবে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা করার উপর, কারণ অধিকাংশ কৃষকের সম্পদ অল্প।

১৮.১। উচ্চতর ঋণ কর্মসূচী এবং বিতরণ পদ্ধতিতে উন্নয়ন সাধনের ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে কৃষি ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। ১৯৭৯/৮০ সালের ২৬৯ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে তা ১১৩১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায় যদিও তা কৃষি উৎপাদনের মোট মূল্যের মাত্র ৭.৪% এবং বিভিন্ন অর্থ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেয় ঋণ ও আগামের ১৩%। শিল্পের মত এখানেও বকেয়া ঋণের সমস্যা রয়েছে যা ১৯৮০/৮১ সালের ৩৬৮ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালের শেষে ১৭১৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ক্ষেত্রে বকেয়া বেড়েছে ৬২ কোটি থেকে ৫০৬ কোটি টাকা। খামার ঋণের এই বিপুল বকেয়া ভবিষ্যতের ঋণ কর্মসূচীর পথে ঋণ ভিত্তির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি ঋণ বিতরণের দ্রুত বৃদ্ধি আদায়ের স্তরকে খারাপ পর্যায়ে নামিয়ে আনে। বকেয়া ঋণ পরিশোধের হার ১৯৮০/৮১ সালের ৩৬% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২১%-এ নেমে যায়।

এটা অংশতঃ এর অদক্ষ ব্যবহার এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে, কিন্তু প্রধানতঃ খরা ও বন্যার কারণে কৃষকদের ক্রমাগত ফসল হানির কারণে ঘটেছে। কৃষি ঋণের উচু ঝুঁকি এবং কম পরিশোধের কারণে ঋণ দাতা সংস্থাসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ক্ষেত্রে অর্থ পুর্ন যোগানের উপর বেশী মাত্রায় নির্ভর করতে হয়। সামগ্রিকভাবে কৃষি উন্নয়নের চূড়ান্ত স্বার্থে ঋণ পরিশোধের পরিমাণকে সন্তোষজনক স্তরে উন্নীত করতে হবে। পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে ব্যাপক তদারকীর মাধ্যমে ঋণ প্রশাসনকে সচল করতে হবে, ঋণের সার্বক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং নীচের স্তরে ঋণের অদক্ষ প্রশাসনের মধ্যে নিহিত বাধ্যতামূলক ধারার পরিবর্তে ঋণকে অধিকমাত্রায় বাজার মুখী করতে হবে। বকেয়া ঋণ আদায়ের উন্নয়ন ঘটাতে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারী ঋণ এবং নিশ্চয়তার মাধ্যমে ঝুঁকি গ্রহণের ফলে কৃষি ঋণের গোটা প্রক্রিয়াটা বাণিজ্যিক ঋণের পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠানিক ঋণের অবক্ষয় কার্যতঃ বিশৃঙ্খলীন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় সুষ্ঠুভাবে তার মোকাবেলা করতে হবে। কৃষি ঋণের ব্যাপারে কাছে থেকে তদারকী এবং নিয়ন্ত্রণ ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের চাহিদা মেটাতে খুলনা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিভাগে একটি করে আরো তিনটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি ব্যাংক স্থাপন করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে রাজশাহী বিভাগে ১৯৮৫/৮৬ সালে একটি নুতন কৃষি ব্যাংক স্থাপিত হবে।

১৯। **শিল্প** : যেহেতু সরকারী খাতের ভুমিকা ছয়টি মৌলিক শ্রেণীর শিল্পে সীমাবদ্ধ, তাই দেশের শিল্প উন্নয়ন বেসরকারী খাতের উপর নির্ভর করবে। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খাতের ২৬০০ কোটি টাকার বিপরীতে বেসরকারী খাতের জন্য অধিকমাত্রায় ৩২০০ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে। শিল্প বিনিয়োগ নিয়ম মাফিক ব্যবস্থার পরিবর্তে রাজস্ব এবং অন্যান্য উৎসাহদানের নীতির মাধ্যমে বাড়ানো হবে। সেই মোতাবেক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে শিল্প বিনিয়োগ তফসিলকে সম্ভাব্য উদ্যোক্তা ও ঋণদাতা সংস্থাসমূহের ব্যাপক তথ্য নির্দেশিকা রূপে ব্যবহার করা হবে। এই কর্মসূচীগুলো বৃহত্তর ও ক্ষুদ্র শিল্পের যথাযথ যোগসূত্র স্থাপনেও কার্যকর ভুমিকা পালন করবে। শিল্প বিনিয়োগ তফসিলের (আই, আই, এস) মধ্যে শিল্পসমূহের একটি নেতিবাচক তালিকাও থাকবে যা বেসরকারী বিনিয়োগের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের লক্ষ্য পুরণের জন্য কৃষি ভিত্তিক গ্রামীণ শিল্প এবং ভোগ্য পণ্য শিল্প স্থাপনের উপর জোর দেয়া হবে।

১৯.১। শিল্প সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসহ অগ্রসর এলাকাসমূহে নুতন প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র সৃষ্টি করা হবে। এ সব শিল্প গড়ে তোলা হবে উদার কর রেয়াতের মাধ্যমে এবং যন্ত্রপাতি কেনার জন্য তাঁদেরকে সহজতরভাবে ঋণ দেয়া হবে। সাম্প্রতিক প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রেক্ষিতে শিল্পের বিস্তার ঘটানোর জন্য নুতন জেলাসমূহে শিল্প প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র সৃষ্টি করা হবে। এছাড়াও স্বল্পোন্নত এলাকার জন্য একটি পৃথক আই আই এস তৈরীর বিষয়ও বিবেচনা করা হবে এবং এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত শিল্পসমূহ অন্য এলাকার জন্য অনুমতি পাবেনা। বিদ্যমান উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের কার্যকর প্রতিষ্ঠানিক সহায়তা দেয়ার জন্য পুনর্গঠিত হবে এবং উদ্যোক্তাদের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদী অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করতে উন্নয়ন অর্থ প্রতিষ্ঠান (ডি এফ আই) গুলোকে শক্তিশালী করা হবে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা এর বিভিন্ন তহবিল সংগ্রহ কৌশলের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে শিল্প ঋণ সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করবে। একটি ইকুইটি অংশ গ্রহণ তহবিল স্থাপনের প্রশ্নটি আগেই ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। শিল্প খাতের সংস্থাগুলোকে যৌথ উদ্যোগের অধীনে বেসরকারী বিনিয়োগকেও উৎসাহিত করতে হবে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বাজারজাতকরণ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা এবং হ্যাণ্ডলুম বোর্ডকে গ্রুপ মার্কেটিং হাউস অথবা বাজার সমবায় সংগঠিত করতে হবে। সর্বশেষে বেসরকারী খাতে স্থিতিশীলতা ও শিল্পের শান্তি বজায় রাখতে শ্রমনীতিমালায় শ্রমিক ব্যবস্থাপনায় সুসম্পর্ক নিশ্চিত করতে হবে এবং ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রক্ষাকারী গোষ্ঠি হিসাবে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২০। পরিবহন ও যোগাযোগ: দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গাড়ীর সংখ্যার হিসাবে যন্ত্র চালিত গাড়ী চলাচলের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের অংশ ১৯৭৯/৮০ সালের ৭৯% থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৮৭%তে দাঁড়ায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবহন উন্নয়ন বেসরকারী খাতের হাতে অব্যাহত থাকবে। সরকারী খাতের ভূমিকা অবকাঠামো উন্নয়ন ও তার রক্ষণাবেক্ষণে সীমাবদ্ধ থাকবে। জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রেও বেসরকারী খাতকে অধিকতর ভূমিকা পালন করতে দেয়া হবে। এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং অতীত তৎপরতার প্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবহন উন্নয়নের বেসরকারী খাতের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং গ্রামীণ উন্নয়নের উপর জোর দেয়ার ফলে ভবিষ্যতে পরিবহনের বিরাট চাহিদা সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়। পরিবহন ব্যবস্থা বিস্তারের ফলে যন্ত্রচালিত গাড়ীর অংশ বিশেষ ও খুচরা যন্ত্রাংশ এবং তিন চাকা বিশিষ্ট গাড়ীর স্থানীয় নির্মাণ ক্ষমতা উন্নয়ন করতে হবে। এটা স্বীকৃত যে এই খাতের উন্নয়ন অনেক লোককে চালক হিসেবে কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা করবে এবং সড়ক ঝুঁকির বিরুদ্ধে এক ধরণের বীমা হিসেবে সমবায় উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হবে।

২১। ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ণ: খাদ্য ও বস্ত্রের মত গৃহায়ণও একটি মৌলিক চাহিদা। সম্পদের ঘাটতি এবং ব্যাপক গৃহ নির্মাণ সমস্যার প্রেক্ষিতে এটা প্রশ্নাতীত যে, সরকার এই ক্ষেত্রে ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে মাত্র। ব্যাপক জনগোষ্ঠির কথা বাদ দিলেও শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারীদের বেলায় কথাটি প্রযোজ্য। এই তথ্য থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে সরকারী খাতের মোট গৃহ চাহিদার মাত্র প্রায় এক দশমাংশ সরকারী খাত কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। তাই সরকারের উচিৎ এজন্যে প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে জনগণ নিজেদের ঘর নিজেরাই নিজস্ব সম্পদের দ্বারা নির্মাণ করতে পারে।

২১.১। তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহায়নে বেসরকারী খাতের বাড়তি ভূমিকার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে ৩৬৫০ কোটি টাকার বেসরকারী বিনিয়োগ আশা করা হচ্ছে। পরিকল্পিত উপায়ে এই প্রত্যাশিত বিনিয়োগ অর্জনের জন্য অবশ্য শহরাঞ্চলে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জমি এবং সরকারী উপযোগ সুবিধাদির আয়োজন আবশ্যক। পল্লী অঞ্চলে স্বল্প ব্যয়ে গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা রাখার সাথে সাথে দুষ্প্রাপ্য ভূসম্পদের ওপর স্বল্পতম স্থান জুড়ে বসতবাড়ীর নির্মাণের ব্যাপারে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নতুন বসত কেন্দ্র হিসাবে উপজেলাসমূহের পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। ব্যক্তিগত বাড়ীঘর নির্মাণের সুবিধার্থে সস্তায় গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থার (এইচ বি এফ সি) ঋণ যুক্তিসংগত করতে হবে যাতে করে অ্যাপার্টমেন্ট এবং ভাড়া প্রদান করে পরে কেনার জন্য নির্মাণ করা যায়। এতে করে গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থার ঋণ ভাড়ার জন্য বাড়ী নির্মাণের পরিবর্তে অধিক সংখ্যক ইচ্ছুক ক্রেতার নিকট পৌঁছাবে। একই উদ্দেশ্যে সহজশর্তে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যক্তির চাইতে গোষ্ঠি বা সমবায়সমূহের জন্য ব্যবস্থা রাখা হবে এবং সেই সাথে ধারাবাহিক মনিটরিং ও কার্যকর আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বেসরকারী নির্মাতাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য নবনির্মিত বাসস্থান ইউনিটের জন্য আয়কর রেয়াতসহ বিরাজমান আর্থিক সুবিধাদির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে এবং নির্মাণ সামগ্রীর আমদানী শিথিলতার মাধ্যমে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

২২। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও অন্যান্য সেবাসমূহ: পরিকল্পনা মেয়াদকালে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও অন্যান্য সেবাসমূহের ভৌত সুবিধাদির জন্য ৩৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সুবিধাদির যেমন পলিক্লিনিক, এক্সরে ক্লিনিক, প্যাথলজীক্যাল ল্যাবরেটরী, নার্সিং হাউজ ইত্যাদির জন্য ৫০ কোটি টাকা, এনজিও (NGO) ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৭০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনাদির উন্নয়নের জন্য রয়েছে ১৫০ কোটি টাকা।

গ্রন্থাগার

অষ্টম অধ্যায়

উপজেলা উন্নয়ন

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমবর্ধমান নগরায়ন সত্ত্বেও বাংলাদেশ বহুলাংশে একটি গ্রামীণ রাষ্ট্র। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৮৫%ভাগ বাস করে ৬৮,০০০ টি গ্রামে। ফলে আবাদযোগ্য জমির উপর চাপ অত্যন্ত বেশী এবং পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে। স্বাধীনতার সময় থেকে গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতি ক্রমবর্ধমান নজর দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু অতিসাম্প্রতিক কালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রধানতঃ হাতে নেয়া হতো জাতীয় পর্যায়ে এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় দ্বারা ঘনিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত সরকারী এজেন্সীসমূহ ও বেসরকারী খাত ছিল উন্নয়ন কর্মসূচী ও প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের প্রধান বাহন। জাতীয় পরিকল্পনায় অনুভূত স্থানীয় উন্নয়নে সরকারী এজেন্সীসমূহ জড়িতকরণ এবং স্থানীয় উন্নয়নের প্রয়োজন অর্জনে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ছিল ন্যূনতম। ফলশ্রুতিতে জাতীয় পরিকল্পনার উদ্যোগে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং গ্রামসমূহকে উল্লেখযোগ্যভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হতো। এ পর্যন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীসমূহে গ্রামীণ উন্নয়ন এবং ভূমিহীন ও গ্রামের গরীবদের জন্য কর্মসংস্থান লক্ষ্য হিসাবে অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ভৌত সুবিধাদি, সম্পদ ও সরকারী সেবামূলক কার্যাবলাপে গ্রামীণ জনগণের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী এবং এনজিও (NGO) তৎপরতার কতকক্ষেত্রে এ সব সমস্যার মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু অপর্যাপ্ত ব্যাপকতা, সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং সর্বোপরি জাতীয় পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণের আকাংখার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম সুসংগঠিত, প্রশাসনিকভাবে দক্ষ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের অনুপস্থিতির ফলে এ সব প্রচেষ্টা গ্রামীণ দারিদ্র ও বিদ্যমান বেকারত্ব পরিস্থিতির মত ব্যাপক সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে মাত্র সীমিত অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে। অন্য কথায়, অতীতে গ্রামীণ উন্নয়নের পথে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং উন্নয়ন প্রশাসনে অপেক্ষাকৃতভাবে কেন্দ্রীভূত চরিত্রই ছিল প্রধান অন্তরায়। তাই, গ্রামীণ উন্নয়নকে জাতীয় পরিকল্পনার পাদপীঠে নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে এক ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কার চালানো হয়। এর মধ্যে ছিল মন্ত্রণালয়সমূহের পুনর্বিন্যাস, উপজেলা (অতীতের থানা) স্তরে প্রশাসনিক কাজকর্মের বিকেন্দ্রীকরণ এবং উপজেলা পরিষদ নামে প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। কতিপয় এলাকার প্রশাসনিক দক্ষতা এবং আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে ভৌগোলিক সীমানার পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে নতুন উপজেলাসমূহ পুনর্গঠিত হয়েছে। বর্ধিত কাজকর্মের দায়িত্বের সাথে খাপ খাওয়াতে উপজেলা প্রশাসনকে শক্তিশালী ও উন্নীত করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক উন্নয়ন কাজকর্ম এবং তাদের ব্যবস্থাপনা উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। এটাও স্থির করা হয়েছে যে জাতীয়ভাবে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বিভক্ত করা সম্ভব এমন অংশসমূহও উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। উপজেলা পরিষদের আওতার মধ্যে উন্নয়ন তৎপরতার ব্যাপারে প্রকল্প গ্রহণ এবং সেগুলো বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব উপজেলা পরিষদের থাকবে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের এই নীতি বাস্তবায়ন এবং উপজেলা ও জেলা স্তরে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কর্মসূচীর জন্য প্রশাসনিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) নামে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এভাবে উপজেলাসমূহকে (সংখ্যায় ৪৬০, সবগুলোই পৌর সীমানার বাইরে অবস্থিত) সরকারের বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়ন প্রশাসনের হাতিয়ার এবং প্রধান মাধ্যমরূপে বাছাই করা হয়েছে।

২। প্রশাসনিকভাবে কার্যকর এবং আর্থিকভাবে দক্ষ ও সক্ষম স্থানীয় সরকাররূপে উপজেলা পরিষদের কাজকর্মকে সহায়তা করার জন্য অধিকাংশ উন্নয়ন পরিদপ্তর থেকে কর্মকর্তাদের উপজেলা পরিষদে নিয়োজিত করা হয়েছে। উপজেলা স্তরে এসব পরিদপ্তরের কাজকর্মসমূহ এখন উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এসমস্ত কর্মকর্তারা এখন নিজ নিজ উপজেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী নির্বাচিত চেয়ার-

ম্যানের অধীনে কাজ করছেন। এদের মধ্যে আছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের মুখ্য চীফ অফিসাররূপে কাজ করেন, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা অর্থ ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং সকল জাতি গঠন পরিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ। উপজেলা পরিষদে অতিরিক্ত লোকজনের সমর্থন যোগানো ছাড়াও জাতীয় সরকার অফিস এবং আবাসিক ভবন, সড়ক যোগসূত্র, পানি সরবরাহ, বিদ্যুতায়ন, টেলিফোন সংযোগ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মত মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণ করছেন। জাতীয় সরকার ও উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন দায়দায়িত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার জন্য এটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে যেখানে জাতীয় সরকার কতিপয় কাজকর্ম হাতে রেখেছে সেখানে স্থানীয়ভিত্তিক সকল উন্নয়ন তৎপরতা চালানোর দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হবে।

৩। এভাবে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় স্তরে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এবং জাতীয় স্তরের প্রকল্প ও কর্মসূচীসমূহের বিভক্তিযোগ্য অংশসমূহের বাস্তবায়নের দায়িত্বও তাদের উপর বর্তেছে। যুক্তিসংগত মাত্রায় তাদের নিজস্ব উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নেয়ার জন্য উপজেলা পরিষদসমূহের পর্যাপ্ত উন্নয়ন তহবিলের প্রয়োজন পড়বে। উপজেলা পরিষদসমূহের বিদ্যমান কর ভিত্তি সীমিত বিধায় প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় সরকারকে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহের জন্য প্রচুর অর্থ যোগান দিতে হবে। বর্তমানে নিম্নোক্তভাবে উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিল গঠিত:

(১) এডিপির মাধ্যমে জাতীয় সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সাহায্য তহবিল।

(২) উপজেলা পরিষদের উদ্বৃত্ত রাজস্ব।

(৩) স্থানীয় চাঁদা।

(৪) উন্নয়ন কাজকর্ম হাতে নেয়ার জন্য অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তহবিল (জাতীয় স্তরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বিভক্তিযোগ্য অংশ বাস্তবায়নের জন্য প্রাপ্ত তহবিল ছাড়া)।

যদিও বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর (AUDP) অর্থ যোগানের জন্য চারটি সূত্রের উল্লেখ উপরে করা হয়েছে, (২) এবং (৩) নং সূত্র এখনও অত্যন্ত ক্ষীণ। জাতীয় সরকার তাই উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহের অর্থ যোগানোর জন্য উপজেলা পরিষদসমূহকে ১৯৮৩/৮৪ সালে ১৭১ কোটি টাকা এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে ২০০ কোটি টাকা মিলিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ দু'বছরে মোট ৩৭১ কোটি টাকা উপজেলা পরিষদসমূহকে উন্নয়ন মঞ্জুরীর আকারে দিয়েছে। এ ছাড়াও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জেলা এবং উপজেলা সদরসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ৫২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এবং সম্ভবতঃ এর পরেও এধরণের সাহায্য অব্যাহত রাখতে হবে।

উপজেলা পরিষদের জন্য দিক নির্দেশনা

৪। জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের আওতায় উপজেলা উন্নয়ন তহবিল যাতে উৎপাদনমুখীভাবে ও দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা কমিশন উপজেলা পরিষদসমূহের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রকাশ করেছে। এ সমস্ত দিক নির্দেশনার পরিপূরক হিসাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক কাজ-কর্মবিষয়ক সার্কুলারও জারী করা হয়েছে। এ সমস্ত দিকনির্দেশনায় দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মতই সাধারণভাবে জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা ও অগ্রাধিকারসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। দিকনির্দেশনার মধ্যে রয়েছে প্রত্যেকটি উপজেলাকে কিভাবে উন্নয়ন মঞ্জুরী বরাদ্দ করা হবে, বিভিন্ন আর্থিক খাতে কিভাবে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অর্থ বরাদ্দ করা হবে এবং উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে এবং সেইসাথে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রণয়ন,

প্রসেসিং, বাস্তবায়ন ও তথ্য সংগ্রহের কার্যপদ্ধতি। এই সমস্ত দিকনির্দেশনা কার্যত: উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ উন্নয়ন তৎপরতার ভিত্তি নিয়ম স্থাপিত করেছে। উপজেলাসমূহের বিভিন্নতার উপযোগী করতে এসব দিকনির্দেশনা পর্যাপ্ত পরিমাণে নমনীয় রাখা হয়েছে। সময়ের আবর্তনে এই পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতার আলোকে সময়ে সময়ে এসব দিকনির্দেশনার পরিবর্তন ঘটাতে হতে পারে। নিম্নের অনুচ্ছেদসমূহে উপজেলা দিকনির্দেশনাসমূহের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

৪.১। উপজেলা পরিষদসমূহকে গ্রামীণ পূর্তকর্মসূচী, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, ব্যাপক শীতকালীন চাষাবাদ, স্থানীয় মৎস্য চাষের উন্নয়ন, ইত্যাদির মত জাতীয় প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা, নক্সা করা ও বাস্তবায়নের যোগ্য বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে কিছু উন্নয়ন কর্মসূচী যা এখন জাতীয় সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে, ইতিমধ্যে উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে অথবা করা হচ্ছে। উপজেলা পরিষদকে এসব ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মঞ্জুরীর আকারে পরিকল্পনার থোক বরাদ্দ থেকে উন্নয়ন তৎপরতা হাতে নিতে হবে।

৪.২। উপজেলা দ্বারা কার্যকর করা যায় জাতীয় প্রকল্পসমূহের এমন সব বিভাজ্য অংশগুলো, যা এখন জাতীয় সরকারের দ্বারা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দসহ উপজেলা পরিষদের কাছে স্থানান্তর করা হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক বিভাজ্য অংশসমূহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা কমিশনের খাত বিভাগসমূহের পরামর্শক্রমে এ সমস্ত প্রকল্প এবং সেগুলোর বিভাজ্য অংশসমূহের হস্তান্তরের ধরণও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে নির্ধারিত করতে হবে।

৪.৩। নিম্নলিখিত ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ৪৬০টি উপজেলা পরিষদের মধ্যে এডিপির মাধ্যমে জাতীয় সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সাহায্য তহবিল বরাদ্দ করা হবে:

(১) জনসংখ্যা	৪০%
(২) এলাকা	২০%
(৩) পশ্চাদপদতার পরিধি	২০%
(৪) উন্নয়ন তৎপরতায় কৃতিত্ব	২০%

৪.৪। উপজেলা পরিষদগুলোকে পঞ্চবার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে এবং প্রত্যেক অর্থ বছরের জন্য তাদেরকে বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীও (এইউডিপি) তৈরী করতে হবে। দিকনির্দেশনার অধীনে এইউডিপির বিভিন্ন উন্নয়ন তৎপরতার জন্য তহবিলের ন্যূনতম ও সর্বাধিক খাতওয়ারী বরাদ্দের একটা নির্দেশক নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হয়েছে:

	ন্যূনতম অংশ	সর্বাধিক অংশ
(১) কৃষি, সেচ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২০.০%	৩৫.০%
(২) পরিবহন, যোগাযোগ, পূর্তনির্মাণ ও ভৌত পরিকল্পনা	২৭.৫%	৪৭.৫%
(৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং অন্যান্য উন্নয়ন তৎপরতা।	২২.৫%	৪৭.৫%

৪'৫। উন্নয়ন মঞ্জুরী বরাদ্দের সময় উপজেলা পরিষদসমূহ এমন উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ হাতে নেয়ার কথা বিবেচনা করবে যা জাতীয় স্তরে গৃহীত কর্মসূচীসমূহের সংযোজক অথবা পরিপূরক হবে। এ ধরণের পদক্ষেপ আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় ও জাতীয় স্তরে উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে জোরদার করবে।

৪'৬। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আবর্তক ব্যয় তাদের রাজস্ব বাজেট থেকে মেটানো হবে। তবে বাস্তবায়নের সময়কালে এ ধরনের আবর্তক ব্যয় প্রকল্প ব্যয়েরও অংশ হয়ে যেতে পারে। প্রকল্প ও কাজসমূহ শেষ হবার পর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ খবর রাখতে হবে। তাই, কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রকল্প শেষ হবার পর এর যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

৪'৭। জাতীয় সরকারের আওতাধীন কোন কর্মসূচী অথবা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচীর কোন ব্যয়ভার মেটানোর জন্য উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন সাহায্য তহবিল ব্যবহৃত হবে না। কোন কর্মসূচী, প্রকল্প অথবা প্রতিষ্ঠান একই সংগে যাতে জাতীয় সরকার ও উপজেলা পরিষদ উভয়ের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ না করে উপজেলা পরিষদ সেটা নিশ্চিত করবে।

৪'৮। উপজেলা পরিষদ নিজেরাই নিজেদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুমোদন দাতা কর্তৃপক্ষ হবে। সাধারণভাবে পরিষদকে সর্বসম্মতভাবে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে (ভোটের মাধ্যমে) প্রকল্প অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাগণ এই আলোচনায় অংশ নিতে এবং কারিগরি উপদেশ দিতে পারবেন। তবে ভোটে অংশ নিতে পারবেন না। এইডিপি-র অন্তর্ভুক্ত এবং নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তৈরী করা না হলে উপজেলা পরিষদ কোন প্রকল্প বিবেচনা করবে না।

৫। সরকার কর্তৃক উপজেলা পরিষদসমূহকে উপরে বর্ণিত প্রশাসনিক ও আর্থিক সমর্থন ছাড়াও জাতীয় সংগঠন ও সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সমর্থন সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদগুলোকে কারিগরি জ্ঞান দ্বারা সাহায্য করার জন্য পর্যাপ্ত যোগ্য কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোকজন নিয়ে একটি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) গঠন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, এতে স্থানীয় প্রকল্পসমূহের ইঞ্জিনিয়ারিং নক্সা যথাযথ হবে এবং ভৌত কাজকর্মের মান যুক্তিসংগত হবে। এর ফলে জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তিও স্থানান্তরিত হবে।

৬। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক উন্নয়ন সাহায্য তহবিলের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এর জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে একটি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনার দিকে লক্ষ্য রেখে উপজেলা পরিষদসমূহের উন্নয়ন ব্যয় তদারক করার দায়িত্ব জেলা প্রশাসকদের হাতে দেয়া হয়েছে।

৭। জাতীয় সরকার কর্তৃক উপজেলা পরিষদকে প্রদত্ত উন্নয়ন সাহায্য মঞ্জুরী আসছে এডিপি-র অর্থ যোগানের জন্য মোট প্রাপ্ত টাকা সম্পদ থেকে; তাই এ কথা প্রযোজ্য যে, অন্যথায় যে সম্পদ বিভিন্ন আর্থিক খাতে বরাদ্দ করা হতো তা বাতিল করে সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি সমর্থনের জন্য উপজেলাসমূহকে দেয়া হয়েছে। যেহেতু ৪নং অনুচ্ছেদের বর্ণনা অনুযায়ী দিকনির্দেশনা মোতাবেক উপজেলা পরিষদগুলো ব্যাপক আর্থিক খাতের উপর অর্থ ব্যয় করছে (তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে বছরে প্রায় ২০০ কোটি টাকা হারে) কার্যতঃ তা এডিপির মাধ্যমে খাতওয়ারী বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। একই সংগে জাতীয় সরকার কর্তৃক উপজেলা পরিষদসমূহে প্রদত্ত এসব সাহায্য সঠিকভাবে এডিপি বাস্তবায়নে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার সম্ভাবনা নাই। কার্যতঃ এটা হবে পল্লী এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্রতর প্রকল্পগুলোর পক্ষে খাতওয়ারী বিনিয়োগের লক্ষ্য পরিবর্তন, যা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত হতে পারবে।

অর্থ বরাদ্দ

৮। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় জেলা ও উপজেলা সদরে অফিস ও আবাসিক ভবন, সড়ক, জনহিতকর কার্যকলাপ ইত্যাদির মত অত্যাবশ্যক ভৌত সুবিধাদি নির্মাণের জন্য ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ভৌত সুবিধাদি প্রধানতঃ গণপূর্ত বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, টি এণ্ড টি বোর্ড এবং গণস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পরিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপজেলা সদরে বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামোর জন্য বার্ষিক বরাদ্দ প্রশাসনিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) নির্ধারণ করে। এ ছাড়াও উপজেলা পরিষদসমূহের উন্নয়ন মঞ্জুরীর জন্য ১,২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৯। উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে উন্নয়ন ও প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ একটি স্থানীয় সরকারের মধ্য দিয়ে পল্লী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সরকারের নতুন নীতির বহিঃপ্রকাশ। উপজেলা পরিষদ শক্তি সঞ্চয় করলে তা স্থানীয় স্তরের সমস্যাসমূহ দ্রুত ও দক্ষতার সাথে নিষ্পত্তি করতে পারবে এবং জাতীয় অর্থনীতির সাথে সমন্বিতভাবে স্থানীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে অবদান যোগাবে। উপজেলা সদরগুলোকে দেশের ভবিষ্যৎ শহরাঞ্চলরূপে দেখা হচ্ছে। যা উদ্বৃত্ত গ্রামীণ জনসংখ্যাকে ধারণ করে গ্রাম থেকে শহরমুখি জনস্রোত উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে এবং শহরের ভীড়জনিত সমস্যার সুরাহা করবে। কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক মেশিনারী বিকেন্দ্রীকরণের হাতিয়ার হিসাবে উপজেলা ব্যবস্থা চালু করা হলে নিম্নস্তরের প্রতিষ্ঠান হিসাবে তা গড়ে উঠবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আরও আশা করা হচ্ছে যে, সরকার প্রদত্ত প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সহায়তাসহ উপজেলা পদ্ধতির প্রবর্তন স্থানীয় জনগণের মধ্যে উন্নয়ন সচেতনতা গড়ে তুলবে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করবে।

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দ্বিতীয় পর্ব

খাতওয়ারী অধ্যায়সমূহ

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নবম অধ্যায়

খাদ্য, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন

পরিচ্ছেদ ১ঃ খাদ্য ও কৃষি

ষাট-এর দশকের গোড়ার দিকে সার্বিক জাতীয় আয়ে কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর রয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর পল্লী অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দাদের জন্য উন্নয়নের সুফল নিশ্চিত করার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিল্প ছাড়াও খাদ্য, কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপহেতু এই প্রবণতা বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর উন্নয়নের ধারা প্রভাবিত হয়, নতুন বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মোচিত হয়ে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও চাকুরী খাতের দ্রুত প্রসার ঘটে। সার্বিক জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অংশ কার্যতঃ অক্ষুন্ন থাকলেও কৃষিখাতের অংশ ১৯৭২/৭৩ এ ৬১·১% থেকে উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়ে ১৯৭৯/৮০-এ ৫৪·৯% এ হ্রাস পায় এবং সার্ভিস খাতের বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে (১৯৭৩/৭৪ এর মূল্যমানে)। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রগতির কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে খাদ্য ও কৃষিসহ পল্লী উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৭৯/৮০ এর মূল্যমানে) ১৯৮৪/৮৫'তে কৃষির অংশ ৫১·৬% থেকে ৫০·৮% এ নামমাত্র হ্রাস পাবে বলে ধরা হয়েছিল। বন্যা ও খরার ফলে উপর্যুপরি শস্যহানির কারণে পরিকল্পনাকালে কৃষির প্রবৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়। এসময় খাদ্যশস্য উৎপাদনে ৫·৬% প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার স্থলে প্রকৃত পক্ষে ৩·৫% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। এসময় সার্বিক মোট আয়ে প্রবৃদ্ধির হার (৩·৮%) কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হারের চাইতে সামান্যই বেড়েছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষিখাতের অবদান সামান্য হ্রাস পেয়ে ৫১·২% এ দাঁড়িয়েছে।

অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা

খাদ্যোৎপাদন ঃ

১·২। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ছিল অতীতের তথা দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কৌশল ষাটের দশকের গোড়া থেকে শুরু করে; তারপর উপর্যুপরি সব পরিকল্পনায় বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। অতীতের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেচ, সার ও উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়ে 'মধ্যমেয়াদী খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা (এম, টি, এফ, পি, পি)' নামে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। গতানুগতিক কৃষি পদ্ধতি ও আবহাওয়ার উপর অত্যধিক নির্ভরশীল বলে অনুন্নত প্রযুক্তিকে অনেকদিন থেকে কৃষির হতাশাব্যঞ্জক অগ্রগতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই কৃষিতে সাফল্য অর্জনের জন্য আধুনিক উপকরণ (যথা—সেচ, রাসায়নিক সার ও উচ্চ ফলনশীল বীজ) সমন্বিত নতুন প্যাকেজ প্রযুক্তি গ্রহণের কথা প্রাথমিকভাবে বিবেচিত হয়। বস্তুতঃ গত দু'দশক ধরে সরকার সেচ, সার ও উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। তবে এই প্রযুক্তির প্রসারে গতির মন্থরতার দরুণ অগ্রগতি প্রায়শঃই বিঘ্নিত হয়েছে। সেচের আওতাধীন আবাদি জমির পরিমাণ ১৯৭০/৭১ সালে ৯·১% থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে ১০·৫%-এ বৃদ্ধির ফলে গড় বার্ষিক বিস্তৃতির হার ছিল প্রায় ৬%। গত দশকে রাসায়নিক সারের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে ১৯৭০/৭১ সালে একর প্রতি ৯·৮ কিঃ গ্রাঃ থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে একর প্রতি ২৬·৬৭ কিঃ গ্রাঃ-এ বৃদ্ধি পেলেও তা সমপর্যায়ভুক্ত অন্যান্য দেশের ভূমি ও জনশক্তি অনুপাতের প্রায় এক দশমাংশ ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেচের আওতাধীন জমি ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ দ্বিগুণ করে যথাক্রমে ১৯৭৯/৮০ সালে ৩·৫ মিলিয়ন একর থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৭·২ মিলিয়ন একরে এবং ৮·৩৮ লক্ষ টন থেকে ১৬ লক্ষ টনে উন্নীত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে পরিকল্পনার আকার সংকোচনের ফলে মধ্যমেয়াদী খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হলেও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াসে ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচীর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে ১৯৭৯/৮০ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন ১৩·৪ মিলিয়ন টনের স্থলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এর লক্ষ্যমাত্রা ১৭·৫ মিলিয়ন টনে নির্ধারণ করা হয়।

১'৩। উপর্যুপরি বন্যা ও খরার ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যোৎপাদন কর্মসূচী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বছরে (১৯৮৪/৮৫) খাদ্যশস্যের উৎপাদন আনুমানিক ১৫'৮ মিলিয়ন টনে হিসেব করা হয়েছে যা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। বোরো ছাড়া খাদ্যশস্য উৎপাদনের ঘাটতি অন্য সব ক্ষেত্রেই স্পষ্ট; বোরোর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১৩% ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় অনুভূত প্রধান খাদ্যশস্যের আপেক্ষিক প্রবৃদ্ধির সমস্যা ও সম্ভাবনা সরাসরি তৃতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন কলাকৌশলের উপর বর্তায়। নীচের সারণিতে পরিকল্পনাকালে শস্যওয়ারী অগ্রগতি দেখা হল:

সারণি ১

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা এবং অনুমিত উৎপাদন

খাদ্যশস্য	উৎপাদন (মিলিয়ন টনে) ১৯৭৯/৮০	দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা (মিলিয়ন টনে)	বছর প্রতি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (%)	১৯৮৪/৮৫র উৎপাদন		বছর প্রতি প্রবৃদ্ধি অর্জন (%)
				মিলিয়ন লং টনে	মিলিয়ন মেট্রিক টনে	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১) আউশ	২'৮১	৩'৮৯	৬'৭	২'৭৪	২'৭৮	—
(২) আমন	৭'৩০	৮'৩৫	২'৭	৭'৮০	৭'৯৩	১'৪
(৩) বোরো	২'৪৩	৩'৪০	৬'৯	৩'৮৫	৩'৯১	৯'৬
মোট চাউল	১২'৫৪	১৫'৬৪	৪'৫	১৪'৩৯	১৪'৬২	২'৮
(৪) গম	০'৮১	১'৮৬	১৮'১	১'৪৪	১'৪৬	১২'২
মোট (খাদ্যশস্য)	১৩'৩৫	১৭'৫০	৫'৬	১৫'৮৩	১৬'০৮	৩'৫

টীকা: কলাম ২ ও ৩ এর সংখ্যাগুলো লংটনে

লক্ষ্য করা গেছে, খারিফ শস্যের চেয়ে রবিশস্যের বৃদ্ধি অনেক দ্রুততর। পৃথক মৌসুমের ফসল বিধায় পরিমাণগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ দু'টি শস্যের উৎপাদনে দু'ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। খারিফ শস্যের প্রধান সমস্যা পানি নিকাশন, তাই এসব শস্য প্রায়ই বন্যার শিকার হয়। বপন ও ফসল কাটা মৌসুমে খরা এসব শস্যের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। অন্যদিকে রবিশস্যের সমস্যা হচ্ছে সেচ। তাই এসব শস্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা সমস্যা দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খারিফ শস্য ঘন ঘন বন্যার সম্মুখীন হয়েছে। এর ব্যাপকতা কখনও কম কখনও বেশী ছিল। ফলে কৃষকদেরকে রবি বোরো ও গম চাষের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা ষাট-এর দশকের শেষ ভাগে রবিশস্য চাষ থেকে বৃষ্টি নির্ভর কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপের পরিবর্তিত কৌশল সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে। ১৯৭৫/৭৬ সাল পর্যন্ত রবিশস্য উৎপাদনে স্থবিরতা, পরবর্তীকালে মন্থর প্রবৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খারিফ ফসলের অনুকূলে অগ্রাধিকার আরোপ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মধ্যে এর প্রতিফলন ঘটে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা থেকে পরোক্ষভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য ব্যয়বহুল যান্ত্রিক পানি নিকাশন কর্মসূচী ব্যতীত খারিফ ফসলের সম্প্রসারণ সম্ভব নয়; কিন্তু এর লাভালাভের দিকটি কেবল যখন তখন বন্যার উপরই নির্ভর করছে না খরার উপরও নির্ভরশীল; কারণ, চাষাবাদের আগে বা পরে খরার দরুন উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে যা ১৯৮১/৮২ সালে ঘটেছিল। প্রকৃতির প্রতিকূলতা এড়িয়ে পরিকল্পিত বোরো ফসলের উৎপাদন দ্রুততর বৃদ্ধির প্রয়াসে

উদ্ভাবিত বিকল্প কৌশল হল শীতকালীন ফসলের জন্য সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। এই কৌশলের কার্যকারিতা নির্ভর করে ভূ-উপরি/ভূ-গর্ভস্থ পানি যথেষ্ট কিনা তার উপর। গতানুগতিক সমাজের অনুকরণ সুলভ বৈশিষ্ট্য, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অভাব এবং একই এলাকায় অধিক সংখ্যক নলকূপগুলোর ঘনিষ্ঠ অবস্থানহেতু কোন কোন এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে।

১'৪। ঘন ঘন শস্যহানি সত্ত্বেও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যোৎপাদন শতকরা বার্ষিক ৩'৫ হার বৃদ্ধি পেয়েছে; এই হার পূর্ববর্তী দশকে অর্জিত হারের কিছুটা কাছাকাছি। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার ৫ বছরে বর্ধিত উৎপাদন ছিল ৭০ দশকের উৎপাদন বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী। ১৯৬৯/৭০ ও ১৯৭৯/৮০ সালের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ১'৪ মিলিয়ন টন; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২'৫ মিলিয়ন টন। শেষোক্ত এই বৃদ্ধির ৮০% এসেছে শীতকালীন খাদ্যশস্য থেকে। নতুন প্রযুক্তি ভিত্তি সম্প্রসারণ আশানুরূপ না হলেও যতটুকু হয়েছে তা এই বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। পরিকল্পনাকালে তিন বছর আবহাওয়া পরিক্রমা স্বাভাবিক থাকলে উৎপাদন অনেক বেশী হত এবং এখাতের প্রকৃত সম্ভাবনা প্রতিফলিত হতো। তথাপি দ্বিতীয় পরিকল্পনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে, আজও প্রকৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীলতার কারণে কৃষির ভিত্তি নাজুক রয়ে গেছে। সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালের ৩৫ লাখ একরের স্থলে ১৯৮৪/৮৫ সালে মাত্র ৬১'২ লাখ একরে দাঁড়িয়েছে। এর আয়তন মোট ৩'৩ কোটি একর আবাদি জমির মাত্র এক ষষ্ঠাংশ। অন্যকথায়, প্রায় ২'৭০ কোটি একর জমির আবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল। খারিফ মৌসুমে এই নির্ভরশীলতা অত্যধিক ও ভয়াবহ। অথচ এই মৌসুমেই খাদ্যশস্যের দুই তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হয়। খারিফ চাষের অধীন প্রায় ১'৫০ কোটি একরের মধ্যে ৫ লাখ একরের কম জমি সেচের আওতাধীন রয়েছে এবং এর মাত্র এক পঞ্চমাংশে পানি নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধাদি ভোগ করে। এই প্রেক্ষাপটে খাদ্যোৎপাদন ত্বরান্বিত করতে হলে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত দু'টি বিকল্প পানি ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার গুরুত্ব নিহিত।

অন্যান্য শস্য

১'৫। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাট ও ইক্ষুর মত অন্যান্য প্রধান শস্যও বন্যা ও খরার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রধান অর্থকরী ফসল কাঁচা পাটের উৎপাদনে ব্যাপক হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। ১৯৭৯/৮০ সালে ৬০ লাখ বেল উৎপাদন পর্যায়ে পরিকল্পনা শুরু হয় এবং খাদ্যোৎপাদনে অগ্রাধিকার ও বিশ্ব বাজারে মন্দার কারণে পরিকল্পনাকালে এর উৎপাদন বৃদ্ধির কোন লক্ষ্য রাখা হয়নি। কিন্তু ১৯৮৪/৮৫ সালে বন্যায় ক্ষতির কারণে উৎপাদন কমে ৪৬ লাখ বেলে নেমে আসে। আগের বছরগুলোর বন্যার মত ১৯৮৪/৮৫ সালের বন্যায় অন্যান্য অনেক ফসলেরও ক্ষতি হয় এবং এর ফলে ন্যূনতম পানি নিষ্কাশন সুবিধাদি বিস্তারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১·৬। পরিকল্পনাকালে (১৯৭৩—৮৫) প্রধান প্রধান শস্যের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন নীচের সারণিতে দেয়া হল :

সারণি ২

পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন

ক্রমিক সংখ্যা	ফসল	একক	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত উৎপাদন		
			১৯৭৭/৭৮	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫	১৯৭৭/৭৮	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫
১।	খাদ্যশস্য	(লাখটনে)	১৫৪·৪০	১৪০·৮০	১৭৫·০০	১৩১·০০	১৩৩·৪৮	১৫৮·৩২
	চাউল	,,	১৫০·৮০	১৩৯·৫০	১৫৬·৪০	১২৭·৬০	১২৫·৩৯	১৪৩·৯১
	গম	,,	৩·৬০	৪·৩০	১৮·৬০	৩·৪০	৮·০৯	১৪·৪১
২।	পাট	(লাখ বেলে)	৯১·০০	৭৫·০০	৬৩·০০	৫৩·৬০	৫৯·৬৩	৪৬·০০
৩।	আখ	(লাখ টনে)	৭৪·২৩	...	৭৭·৮৩	৬৬·৭০	৬৫·৭১	৭০·০০
৪।	তুলা	('০০০' বেলে)	৬৩·০০	৬০·০০	৫৬·০০	৫·০০	৬·০০	১২·০০
৫।	চা	(মিলিয়ন পাউণ্ডে)	...	৮২·০০	৯৫·০০	৮১·০০	৮১·০০	৯৬·৮০
৬।	আলু	(লাখ টনে)	১১·০০	১১·৩৯	১৩·৬৩	৮·৫০	৯·০৩	১৩·০০
৭।	ডাল	(লাখ টনে)	৩·৫০	৩·০০	৩·০০	২·৩১	২·১৪	২·০০
৮।	তেলবীজ	(লাখ টনে)	৪·০০	২·৪৯	৩·৬০	২·৬১	২·৪৬	২·০০

উপরের সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ঘন ঘন বন্যা ও খরা সত্বেও পৃথক পৃথক শস্যের ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্যের মধ্যে তেমন তারতম্য ঘটেনি। পাট ছাড়া সার্বিক উৎপাদন তৎপরতাকে তেমন খারাপ বলা যায় না। পাট উৎপাদন ১৯৭৯/৮০ সালের পর্যায় থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা ও উৎপাদন ঘন ঘন উঠানামা সত্বেও অর্থনীতির সার্বিক প্রবৃদ্ধির (৩·৮%) চেয়ে কৃষি খাতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (৩.৫%) সামান্যই কম ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক, দ্বি-বার্ষিক ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৫·৫%, ১·০% ও ৩·৫%। স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির বিশৃঙ্খলার জন্য প্রথম পরিকল্পনার স্থিতাবস্থা সংশোধন করা হলেও আগের পরিকল্পনাগুলোর চেয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্য উৎপাদনে পরিমাণগত বৃদ্ধি ছিল যথেষ্ট।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগ

১'৭। কৃষি খাত বহুলাংশে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হওয়াতে আবহাওয়ার ঝুঁকির বিরুদ্ধে স্থিতিশীলতা গড়ে তোলা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ, সার ও অধিক ফলনশীল জাতের বীজ সম্বলিত আধুনিক প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণে বিনিয়োগের উপর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলোর চাইতে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ১৭,২০০ কোটি টাকার মধ্যে ৬,০৫৯ কোটি টাকা এই খাতে (বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ব্যবস্থাপনা এবং পল্লী উন্নয়নসহ) বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই অংক ছিল মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ৩৫'২%। সরকারী খাতের মোট ১১,১০০ কোটি টাকার মধ্যে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৩,৮০২ কোটি টাকা যা সরকারী খাতে মোট বরাদ্দের ৩৪'৩%। খামার পর্যায়ে নতুন প্রযুক্তির সমর্থনে বিশেষ করে ক্ষুদ্র সেচ সরঞ্জাম ও সার সরবরাহ করার প্রয়াসে বেসরকারী খাতে কৃষি ঋণের দ্রুত সম্প্রসারণ ছিল পরিকল্পনার বিশেষ লক্ষ্য। আগের পরিকল্পনাগুলোর চাইতে কৃষি খাতে বরাদ্দ ছিল তুলনামূলকভাবে বেশী যা নীচে (সারণি—৩) দেয়া হল:

সারণি ৩

কৃষিখাতে সরকারী উন্নয়ন বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

পরিকল্পনা	পরিকল্পিত বরাদ্দ	অনুমিত ব্যয়
প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৩৫৩'৫	১১০২'৫ (৩১'২%)
দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	৯৪৮'০	১০৫২'৬ (২৮'৯%)
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৬০৫৯'০	৪১৭২'৪ (২৯'৯%)

টীকা : বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যাগুলো সংশোধিত এডিপির মাধ্যমে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা হার

১'৮। দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিনিয়োগ কৌশলে আধুনিক প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের উপর গুরুত্ব দেয়ায় যথেষ্ট সাফল্য অর্জিত হয়। এসময় অধিকাংশ শস্যের উৎপাদনে স্বল্প তারতম্য থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কৌশল অবলম্বনের ফলে আগের পরিকল্পনাগুলোর তুলনায় সেচ ও সারের ব্যবহারে যথেষ্ট দ্রুত বিকাশ ঘটে। এসময় সেচের আওতাধীন জমি ও সার ব্যবহার বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৭৯'২% এবং ৫১'৬%। বিক্রয়কৃত অগভীর নলকূপের সংখ্যা ২৪,১৫৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১,৫৪,০০০টিতে এবং গভীর নলকূপের সংখ্যা ৬৭৯টি থেকে ১০,৩৮৪টিতে দাঁড়ায়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে হস্তচালিত নলকূপ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। হস্তচালিত নলকূপ ১,১০,০০০টি থেকে দাঁড়ায় ৩,০০,০০০টিতে। সার বিতরণের পরিমাণ ৮'৩৮ লাখ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২'৬০ লাখ টনে।

উৎপাদন স্থিতিশীলতা ও আন্তঃ শস্য সম্পর্ক

১'৯। একথা স্বীকার করতে হবে যে, প্রযুক্তির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও সার্বিকভাবে আবহাওয়ার উপর অব্যাহত নির্ভরশীলতার কারণে আলু ছাড়া প্রধান প্রধান শস্যের উৎপাদনে বছর ভেদে উল্লেখযোগ্য হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। ধান (খোরাকি শস্য) ও পাটের (প্রধান অর্থকরী ফসল) ক্ষেত্রে এই হ্রাসবৃদ্ধি কেবল এ দুটো শস্যকেই নয়, সামগ্রিকভাবে গোটা শস্য খাতকে অস্থিতিশীল করার কারণ হিসেবে কাজ করেছে। ধান ও পাটের মধ্যে মূল্য ও একর প্রতি উৎপাদনের আন্তঃ ক্রিয়া সম্পর্ক সুবিদিত। তবে দুটো শস্যের আপেক্ষিক মূল্যের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া কেবল কৃষকের জমি বরাদ্দ সংক্রান্ত পছন্দের মধ্যেই সীমিত থাকে না। অন্যান্য শস্য যেগুলো খারিফ ও রবি মৌসুমে জমি বরাদ্দের দিক থেকে ধান ও পাটের

সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রতিযোগিতা করে সেগুলো এসময়ে বিশেষ প্রাধান্য পায়। উদাহরণ-স্বরূপ, পাটের ভাল মূল্য পাওয়ার পর, কৃষকেরা অন্যান্য রবি শস্যের জমিকে বোরো ধান/গম চাষের জমিতে পরিণত করতে পারে এবং পরবর্তীকালে পাটের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটতে পারে। মূল্য অথবা মূল্য বহির্ভূত (আবহাওয়া) কারণগুলোর ফলে সৃষ্ট বাইরের যোগাযোগ এভাবে গোটা কৃষিখাতের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কৃষকের জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শস্যগুলোর মধ্যকার এই সম্পর্কের প্রেক্ষিতে প্রধান দুটি শস্য হিসেবে ধান ও পাটের সম্পর্কের স্থিতিশীলতা শস্যখাতের ধারাবাহী অংশের স্থায়ী প্রবৃদ্ধিরও চাবিকাঠি। আবহাওয়ার যোগাযোগ শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা বিশেষ করে পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক সুষম কর্মকৌশল গ্রহণের মাধ্যমেই কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যেতে পারে। আবহাওয়া সংক্রান্ত জটিলতা ছাড়াও বিশ্ব বাজারে পাট/পাটজাত পণ্যের চাহিদা থেকে উদ্ভূত মূল্য সংক্রান্ত জটিলতার ফলে অন্য ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের বিপর্যয় আন্তঃশিল্প সম্পর্ককে প্রভাবিত করে বলে শিল্প খাতের আওতায় এটি আলোচিত হয়েছে। মূল্য সমর্থন নীতির যে কোন কাঠামোতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এ দুটো উপাদানের মধ্যে একটি পার্থক্যকেও স্বীকার করে নেয়া হয়। একটি হচ্ছে, আবহাওয়াজনিত অস্থিতিশীলতা উৎপাদন ও মূল্যের মধ্যে একটি পরস্পর বিরোধী সম্পর্ক সৃষ্টি করে যা উৎপাদন স্থিতিশীল না করে মূল্য সমর্থন নীতির কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। সেচের প্রসার আবহাওয়ার খামখেয়ালী প্রতিক্রিয়া হ্রাস করবে এবং উৎপাদনের স্থিতিশীলতার জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবে। কিন্তু কৃষি ব্যবস্থা যেখানে এখনও শস্য ভিত্তিক হওয়ার চাইতে অবস্থান ভিত্তিক, সেখানে বিভিন্ন শস্য চাষে জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী আন্তঃ-শস্য সম্পর্ক নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত নীতিগত সমর্থনের প্রয়োজন হবে। সম্ভাবনাপূর্ণ শস্যের দিক থেকে জমির সর্বোচ্চ সুবিধাজনক বরাদ্দ বিষয়ক একটি সমীক্ষা রয়েছে। এটি মূল্য নীতির মাধ্যমে খামার পর্যায়ে অনুসৃত হবে। এ দুটো সমাধান প্রকৌশলগত (সেচ) ও অর্থনৈতিক (মূল্য সংকেতে) নিয়ে নীচে আলোচনা করা হলো।

১'১০। **মূল্যনীতি :** সেচ সুবিধা ও সারের বর্ধিত ব্যবহারের মাধ্যমে ঋণ সুবিধাসহ নিবিড় চাষাবাদের সুফল নির্ভর করে উপকরণ ও উৎপাদন মূল্য নীতিমালার উপর। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অধিকতর আভ্যন্তরীণ সম্পদ অনুসন্ধানের ফলে বর্ধিত উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষকদের উৎসাহ দেয়ার জন্য প্রধানতঃ উপকরণ ভর্তুকির চাইতে উৎপাদন মূল্য সমর্থনের উপর জোর দিয়ে এই নীতিমালার তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়। তবে ধানের মূল্য বৃদ্ধির চাইতে সারের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তুলনামূলকভাবে বেশী। সারের চাহিদার উপর এর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্যান্য প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। প্রথমতঃ এর প্রভাব হবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বেশী পড়বে খোরাকি ফসল উৎপাদনকারী কৃষকদের উপর যারা প্রধানতঃ পারিবারিক ভোগের প্রয়োজনে খাদ্যশস্য উৎপাদন করে এবং যাদের বাজারজাত করার মতো ফসল উদ্বৃত্ত থাকে না। বড় কৃষকদের চাইতে তাদের মধ্যে ঝুঁকি এড়িয়ে চলার প্রবণতাও বেশী। বিভিন্ন খাদ্যশস্য চাষের মৌসুমে বিভিন্ন আকারের কৃষক কর্তৃক সার ব্যবহারের উপর ১৯৭৯/৮০ সালে মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক ভিত্তিক সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যেসব স্বচ্ছল চাষীর জমি ৫ একরের বেশী তারা ৫ একরের কম জমির মালিক কৃষকদের চাইতে সার ও প্রযুক্তি বেশী ব্যবহার করছে। তবে ৫ একরের কম জমির মালিকরা উচ্চ হারে সার ব্যবহার করছে এবং এর ফলে তাদের আয় ও মূল্য স্থিতিস্থাপকতা বেড়ে যাচ্ছে। এখান থেকে প্রতিভাত হয় যে সারের মূল্য বেড়ে গেলে ধনী চাষীদের তুলনায় গরীব চাষীদের মধ্যে সারের চাহিদা অতি দ্রুত ও অধিক মাত্রায় হ্রাস পাবে। অন্যান্য যেসব দেশে জমি ও মানুষের আনুপাতিক হার বাংলাদেশের কাছাকাছি হওয়া সত্বেও অতি উচ্চ উৎপাদন হার অর্জিত হয়ে আসছে সেসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ধানের মূল্যের চাইতে সারের মূল্য ইতিমধ্যেই বেশী। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের একটি যৌথ সমীক্ষা অনুসারে ১৯৭৯/৮০ সালে এই অনুপাত বাংলাদেশে ছিলো ১'৬ যা দক্ষিণ কোরিয়ায় ছিল ০'৭, জাপানে ০'৫, ইন্দোনেশিয়ায় ১'৬ এবং শ্রীলংকায় ১'৭। তখন থেকে এই অনুপাত বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়ে ২.১তে দাঁড়িয়েছে।

১'১১। উপকরণ (সার) ভর্তুকির বিকল্প হিসেবে উৎপাদনে মূল্য সমর্থন নিশ্চিত করাই হচ্ছে মূল্য নীতি স্থানান্তকরণের দ্বিতীয় সমস্যা। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ খামারের মধ্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে। এছাড়াও বন্যা ও খরা উৎপাদন ব্যাহত করলে মূল্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তখন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল অবস্থায় একটি অর্থনৈতিক নীতি হিসেবে উৎপাদনের উপর মূল্য সমর্থনের প্রভাব প্রশ্ন সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরস্পর বিরোধী নীতির কারণে উপকরণ থেকে উৎপাদনে গুরুত্ব স্থানান্তরের ব্যাপারটি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। অধিকতর মূল্য সমর্থনের দ্বারা সার ভর্তুকীর প্রতিকল্প খাদ্যের বাজার চাহিদার উপর প্রভাব ফেলবে। উৎপাদন মূল্য অবশ্যই বেড়ে যাবে; এর ফলে সরকারকে আরো বেশী খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং সরকারের খাদ্য বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে। একদিকে ভর্তুকি হ্রাসের ফলে আভ্যন্তরীণ সম্পদের সাশ্রয় হলেও অন্যদিকে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূল্য সমর্থন দিয়ে খাদ্যের সংগ্রহ মূল্য বাড়াতে হলে তা খাদ্য বাজেটে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। দৃশ্যতঃ সম্পদের এ ধরনের ব্যবহারের প্রশ্ন কোন বিতর্ক নেই। কারণ খাদ্যোৎপাদনও উন্নয়নের একটি অংশ। তবে উচ্চ খাদ্য মূল্য খাদ্য বিভাগকে বিক্রয় সমস্যায় ফেলতে পারে। যে কারণে খাদ্য বাজেট বেড়ে যায় (যেমন দাম বেড়ে গেলে চাহিদা কমে যাওয়ায় বাজেটও বেড়ে যাবে) সে কারণগুলো মোকাবেলা করতে গিয়ে খাদ্যোৎপাদন থেকে শুরু করে, খাদ্য সংগ্রহ ও ভোগ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়েই ভর্তুকী দেয়ার প্রয়োজন হয়। অন্য কথায়, মূল্য নীতি পরিবর্তনের ফলে সার ভর্তুকী আসলে ভোগ ভর্তুকীতে রূপান্তরিত হবে। সুতরাং সম্পদ সমাবেশের ব্যাপারে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় (আইএফপিআরআই—বিআইডিএস) সমস্যাটিকে যে ভাবে দেখা হয়েছে তার আওতা ছাড়িয়ে বৃহত্তর দৃষ্টিভংগী নিয়ে বিচার করা প্রয়োজন।

১'১২। **সেচ দক্ষতা ঃ** খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টায় সেচ, পানি নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ প্রধানতঃ ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। কতিপয় জটিল কারণে ভৌত সুবিধাদির ব্যবহার কম হয়েছে। যেমন জমিতে পানি নিষ্কাশনের অপর্যাপ্ততা অথবা সুবিধা গ্রহণকারীদের (যেমন কৃষক) মধ্যে সচেতনতার অভাবে সেগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হয়নি। কিছুটা সমস্যার বিভিন্নতার কারণে এবং অংশত সংগঠনগুলোর বহুমুখীনতার ফলে যথাযথ সম্পদ বরাদ্দ প্রক্রিয়া ব্যহত হয়েছে। সব কিছু পানি সম্পদের উপর কেন্দ্রীভূত করা হলেও ভর্তুকীর ভিন্ন ভিন্ন হারের কারণে পানি ব্যবহারের, নানা ধরনের ভিন্নমুখী যন্ত্রপাতি বিভিন্ন কর্মসূচীর অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচী, বিশেষ করে অগভীর ও গভীর নলকূপ পাশাপাশি স্থাপনের কারণে কোন কোন জেলায় ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের ব্যবহারে কিছুটা আতিশয্যও ঘটেছে। পানি উঠানো সহজতর হওয়ার কারণে খামার চাষীদের মধ্যে অগভীর নলকূপের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সেচের আওতাধীন গড় এলাকা ১৯৭৯/৮০ এর পর্যায়ের নীচে রয়েছে। অন্যদিকে গভীর নলকূপের আওতাধীন এলাকা ১৯৭৯/৮০'র পর্যায়ের চাইতে বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও এর আওতাধীন এলাকা এখনো আর্থিক উপযোগিতা সীমার চাইতে নীচে অবস্থান করছে। এই বিরোধ এড়ানোর জন্য পরিকল্পনার শেষ দুই বছর নলকূপ বসানোর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এবং এর ফলে অগভীর নলকূপ সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে ভাটা পড়ে।

১.১৩। সেচ কর্মসূচীর উল্লেখিত সমস্যাগুলো ছাড়াও পানি ব্যবস্থাপনাকে এখনও উৎপাদনের উপর এর প্রভাবের দিক থেকে বিচার করে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হয়নি। ৭০ শতাংশের মতো সেচের জমি খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই জমির দুই তৃতীয়াংশই আবার বোরো ধান উৎপাদনযোগ্য এলাকা যার ফলন আমন ফসলের প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৭৯/৮০ এবং ১৯৮৪/৮৫'র মধ্যে বোরো ধানের আওতাধীন সেচ জমির পরিমাণ ২৪.৭ লাখ একর থেকে ২১.৪৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ লাখ একরে দাঁড়ায়। এই সময় বোরো ধানের উৎপাদন ৫৮% বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.৩০ লাখ টন থেকে ৩৮.৫০ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। এই বৃদ্ধি জমির পরিমাণ বৃদ্ধির অনুপাতে বেশী। দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে বোরোর ফলন বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও আমনের ক্ষেত্রে তা ছিল স্থির। অধিক ফলন-শীল বিভিন্ন বীজ ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই তারতম্য দেখা গিয়েছে। বোনা আমন ধানের

অধিক ফলনশীল বীজ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে স্থানীয় উন্নত ও অধিক ফলনশীল আমন বীজের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সারে কাজ হয় বোরোর চাইতে কম। আমনের ফলন এবং আমন চাষের আওতাধীন অধিক ফলনশীল এলাকার মন্থর অগ্রগতিতে এটিই প্রতিফলিত হচ্ছে। আমন শস্যের ফলনে পানি নিকাশন ও বন্যারোধক ব্যবস্থা খুবই সামান্য লাভবান হয়েছে। এর ফলে আমনের জমিও ফলনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রান্তিক বৃদ্ধি ঘটেছে। অতএব পানি খাতে বরাদ্দকৃত সম্পদের যে বিরাট অংশ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন কর্মসূচীতে ব্যয় করা হয়েছে তার লাভালাভ উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে খতিয়ে দেখতে হবে।

১.১৪। তিনটি খাদ্যশস্যের প্রত্যেকটির চাষাবাদে উচ্চ ফলনশীল জাতের ব্যবহৃত জমির আনুপাতিক হিসাব নীচের সারণিতে দেখানো হল:

সারণি ৪

বিভিন্ন ধরনের ধান চাষাবাদে উচ্চ ফলনশীলের অধীন জমির % হিসাব

বছর	আউশ	আমন	বোরো
১৯৭৯/৮০	১৩.৩	১৪.৬	৬৩.০
১৯৮০/৮১	১৫.৭	১৫.৯	৬৪.৪
১৯৮১/৮২	১৫.০	১৫.৯	৬৮.৯
১৯৮২/৮৩	১৫.১	১৭.৯	৭৫.৪
১৯৮৩/৮৪	১৫.৯	১৭.৭	৭৬.১
১৯৮৪/৮৫	১৫.৯	১৮.৯	৭৮.৯

আমন শস্যের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ বোরো শস্যের জমির চারগুণ হলেও ১৯৮৪/৮৫'তে অধিক ফলনশীল আমন ও বোরোর আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬.৬৯ ও ৩০.০০ লাখ একর। অন্যান্য মৌসুমের চাইতে বোরো মৌসুমে অধিক ফলনশীল জাতের চাষাধীন জমির প্রবৃদ্ধির হার অনেক দ্রুততর হয়েছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বর্ধিত খাদ্যোৎপাদনের ৮৫%এসেছে রবিশস্য থেকে। শীতকালীন আবাদের সীমাবদ্ধতার জন্যে এটাই স্বাভাবিক, কারণ পানি নিকাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের চাইতে সেচ ব্যবস্থা কম ব্যয় সাপেক্ষ এবং আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনার উপরও কম নির্ভরশীল। সুতরাং সার্বিক উৎপাদন ও ফলনের উপর তাদের প্রভাব বিচার করলে পানি ব্যবস্থাপনা কর্ম-কৌশল সম্পর্কে একটি বিকল্প চিন্তা করা এবং প্রধানতঃ শীতকালে সেচ জমির দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য একে পুনর্বিন্যাস করার পক্ষে জোরালো যুক্তি রয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়ায় ভূ-উপরিভাগের এবং ভূগর্ভস্থ পানি কমে আসবে বিধায় অধিকতর উচ্চ মূল্যে পানি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়বে।

১.১৫। **ঝুঁকি ও শস্যবীমা:** প্রযুক্তি বিস্তারের পথে দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে প্রাকৃতিক ঝুঁকি, কৃষক জনগোষ্ঠির উপর যার ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব রয়েছে। ব্যাংকিং খাতের কাছে ক্রমবর্ধমান গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততা কেবল একটি হিমশৈলের অগ্রভাগ মাত্র। ১৯৮৩/৮৪'তে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৮%। কৃষি ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ঋণের পরিমাণ দ্রুত সম্প্রসারণের পরও সার্বিক জাতীয় উৎপাদন-এর অবদান ছিল প্রায় ৭%। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি ব্যাপকভাবে মাত্রাতিরিক্ত সুদের অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উপর নির্ভরশীল থেকে যাচ্ছে। আর্থিক খাতের সমীক্ষায় (১৯৮৩) দেখা গেছে যে গ্রামীণ ঋণ দানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকিং পদ্ধতি, সম্ভবতঃ বাণিজ্যিক বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ বলে অসংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং গ্রামীণ ব্যাংক শাখাগুলোতে জমার পরিমাণ গ্রামীণ খাতে প্রদত্ত অগ্রিমের পরিমাণ ছাড়িয়ে যায়। ফলে

বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রামীণ শাখাগুলো উদ্বৃত্ত গ্রামীণ সম্পদ শহরভিত্তিক খাতে স্থানান্তরে সহায়তা করে অনেক কম ঝুঁকিতে সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে এক বিপরীত প্রবাহের সৃষ্টি করে। উচ্চ ঝুঁকির এই বিকল্প, কম ঝুঁকির স্থানীয় পর্যায়ে ঋণ এবং কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত ঋণ কৃষি ও শিল্পখাতে ঋণদান কাজে গাফ-লতির আংশিক ব্যাখ্যা দিতে পারে। কিন্তু এটা এই সত্যকে বাতিল করে দেয় না যে, উপর্যুপরি বন্যা ও খরা গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণশক্তি দুর্বল করে দিয়েছে। নতুন প্রযুক্তিতে আরো বেশী অর্থ উপকরণের প্রয়োজন বলে তাতে কৃষকদের আর্থিক ঝুঁকি আরও বাড়ছে। এর ফলে ঋণ কর্মসূচীর পাশাপাশি একটি কার্যকর শস্যবীমা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকরণ জরুরী হয়ে পড়েছে। ১৯৭৭-এ সাধা-রণ বীমা স্বেচ্ছায় এক পরীক্ষামূলক শস্যবীমা পরিকল্পনা চালু করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি। এতে ধান, পাট, ইক্ষু ও গমের মতো প্রধান প্রধান শস্যের ক্ষেত্রে বীমা সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এর আওতা এখনও খুবই সীমিত। কয়েক হাজার একর জমি এবং হাজার খানেক কৃষকের বেশী এর আওতায় আসেনি। এই পর্যায়ে ঝুঁকির বিস্তার এত সীমিত যে পরিকল্পনাটি শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত অব্যাহত লোকসান দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন ফললাভ করতে পারেনি। বীমা হচ্ছে এমন একটি ধারণা যা অধিক সংখ্যক লোকের অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিশ্লেষণ হতে প্রতীয়মান হয় যে, আওতাধীন এলাকা ন্যূনতম ৫০,০০০ একরে না পৌঁছলে শস্যবীমা পদ্ধতি মুনাফাজনক হতে পারে না। অতএব, প্রযুক্তি ও ঋণের ভবিষ্যতের স্বার্থে এক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এতে প্রিমিয়ামের স্তর, বিভিন্ন নীতিগত বিকল্প, আন্তঃসংস্থাসমন্বয় এবং উদ্বুদ্ধকরণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বর্তমান প্রিমিয়ামের হার আরো কমিয়ে দিয়ে কৃষকদেরকে বিপুল সংখ্যায় শস্যবীমা পলিসি গ্রহণে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এক বছরের নির্দিষ্ট শস্যবীমা পলি-সির স্থলে বহু বছর ও বহু শস্য কিংবা এমনকি এলাকাওয়ারী পলিসির সম্ভাবনাও বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। শস্যবীমা বহু দেশে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের জন্য এটি বাধ্যতা-মূলক করা যেতে পারে। পদ্ধতিটির পুনরুজ্জীবনের জন্য একটি নতুন প্রস্তাবও রয়েছে, যা কেবল কৃষি ঋণের স্বার্থে নয় বরং প্রযুক্তির স্বার্থেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে দ্রুত একটি সিদ্ধান্ত দাবী করে। যদিও শস্য উৎপাদন ব্যাহত হলে বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায় বলে নতুন উপকরণের চাহিদা বাড়ে, তবু স্বীকার করতেই হবে যে প্রযুক্তির স্থিতিশীল সম্প্রসারণের ভিত্তি হিসেবে এটি খুবই ব্যয় বহুল একটি প্রক্রিয়া।

১.১৬। **খাদ্যনীতি ঃ** খাদ্য ও কৃষি উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা বিধান। খাদ্যোৎপাদন এই নিরাপত্তার অনেকগুলো দিকের একটি দিক মাত্র, কিন্তু এর শেষ হচ্ছে ভোগ। অতএব খাদ্য নিরাপত্তার অন্য দিকটি হচ্ছে সকল পরিবারে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। ঐতিহাসিক ভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণাকে বারবার শস্য হানি এবং দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য সংকট নিরসনে ত্রাণ ও রেশনিং ব্যবস্থা এবং খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপত্তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। উৎপাদন ও ভোগের এই দ্বৈততা ১৯৭০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। ঐ সময় বাধ্যতামূলক সংগ্রহ বাজার ভিত্তিক বিনিময়ের মাধ্যমে স্বেচ্ছাভিত্তিক সংগ্রহকে পথ ছেড়ে দেয় এবং উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে সরকারী খাদ্য বিতরণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরুর দিকে উৎসাহব্যঞ্জক মূল্যে খাদ্য সংগ্রহের সরকারী নীতি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটি নিয়ামক হিসাবে বিবেচিত হয়। একই সাথে যুক্তিসংগতভাবে রেশন মূল্য বাড়িয়ে রেশনিং ব্যবস্থা ও বাজারের মধ্য-কার মূল্য ব্যবধান কমানো হয়। এভাবে খাদ্যের উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে পি. এফ. ডি. এস-এর ভূমিকা একটি নেতিবাচক (লেভি/বাধ্যতামূলক সংগ্রহ) ভূমিকা থেকে সত্তরের নিস্ক্রিয় ভূমিকায় (স্বেচ্ছামূলক বিনি-ময়) এবং পরবর্তীতে এক ইতিবাচক ভূমিকায় (উৎসাহব্যঞ্জক মূল্যে সংগ্রহ/খোলা বাজার তৎপরতা) পরি-বর্তিত হয়। উৎপাদনের দিক থেকে দেখতে গেলে এটি কৃষকদেরকে মূল্যের নিশ্চয়তা দেয়, এবং আরো খাদ্যোৎপাদনে উৎসাহিত করে। ভোগের দিক থেকে, খাদ্য বিতরণে এটি রেশন মূল্য ও বাজার মূল্যের ব্যবধান কমিয়ে রেশনিং কাঠামোর তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে বিধিবদ্ধ রেশনিং (এস. আর) ও অগ্রাধিকার গ্রুপের (পি. জি.'র) হিস্যা ১৯৭৯/৮০ সালের ৫৮% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪৬%-এ

নেমে আসে এবং দুঃস্থদের মধ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও সংশোধিত রেশনিং –এ এখন বেশী খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে। এক দিক থেকে দেখলে পি.এফ.ডি.এস এখন প্রবলভাবে বাজারমুখী। খোলা বাজারে বিক্রি (ও.এম.এস) প্রসারের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। খোলা বাজারের বিক্রিতে পি.এফ.ডি.এস ও বাজারের মধ্যেকার মূল্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার সুযোগ থাকে কারণ বাজার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখেই ও. এম. এস. মূল্য স্থির করা হয়।

১.১৭। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যের সংগ্রহ মূল্য, সরবরাহ মূল্য ও বাজার মূল্যের গতিবিধি নীচের সারণিতে দেখানো হল:

সারণি ৫

সংগ্রহ মূল্য, সরবরাহ মূল্য এবং খুচরা বাজার মূল্যের গতিবিধি

(মণ প্রতি টাকা)

	চালের মূল্য			গমের মূল্য		
বৎসর	সংগ্রহ মূল্য	সরবরাহ মূল্য	বাজার মূল্য	সংগ্রহ মূল্য	সরবরাহ মূল্য	বাজার মূল্য
১৯৭৯/৮০	১৭০.০	১২০.০	২৪৮.৭	১১০.০	৯০.০	১১১.৬
১৯৮০/৮১	১৭৫.০	১৪০.০	২১৪.২	১১৫.০	১১০.০	১২৪.০
১৯৮১/৮২	১৯০.০	১৭৫.০	২১২.৪	১২৪.০	১২৪.০	১৫১.৬
১৯৮২/৮৩	২১০.০	১৯৫.০	২৯০.০	১৩৫.০	১৩৪.০	১৮২.২
১৯৮৩/৮৪	২২৫.০	২১৫.০	৩১১.৬	১৪৪.০	১৪৫.০	১৭৫.৬
১৯৮৪/৮৫	২৪৮.০	২৬৮.০	৩৭৯.০	১৬২.০	১৭০.০	১৯০.০

টীকা: প্রতিবছরের ডিসেম্বর মাসের মূল্য হচ্ছে সরবরাহ মূল্য; মাঝারিজাতের চালের মূল্য হচ্ছে বাজার মূল্য এবং ১৯৮৪/৮৫–র বাজার মূল্য হচ্ছে ৫ মাসের গড় মূল্য।

উপরের সারণি থেকে এটা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, সংগ্রহ মূল্য ও সরবরাহ মূল্যের ব্যবধানই শুধু দূর হয়নি, সরবরাহ মূল্য সংগ্রহ মূল্যের চেয়ে বেশি হওয়ার তাদের সম্পর্কেও আবর্তন ঘটেছে। উপর্যুপরি শস্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণে বাজার মূল্য দ্রুত বেড়ে পি.এফ.ডি.এস এর দ্রুত বাজারমুখী প্রবণতায় বাধার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাজার মূল্য এবং সরবরাহ মূল্যের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে। এ ধরনের বাজারমুখীতা গরীব পরিবার ও বেকারদের মতো অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধাভোগী গোষ্ঠিগুলোর স্বার্থে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকায় পি.এফ.ডি.এস. এর কাঠামোকেও পরিবর্তন করতে হয়েছে।

খাদ্যনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে খাদ্য সমস্যা কেবল উৎপাদনেরই সমস্যা নয়, বিতরণের সমস্যাও বটে। স্বাভাবিক বাজার পদ্ধতির মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন নিঃশেষ করা যায় না বলেই সংগ্রহ কর্মসূচীর প্রয়োজন। তা না হলে পুষ্টির প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র এবং বেকারত্বের ব্যাপকতাহেতু কার্যকর চাহিদা বর্ধিষ্ণু উৎপাদনকে সমুন্নত রাখতে পারে না। তাই অর্থনৈতিক দিক থেকে অসচ্ছল শ্রেণীভুক্ত লোকদের স্বার্থে পি এফ ডি এস-এর বাজারমুখো ব্যবস্থাপনায় ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার দরকার হবে। এ ধরনের জরুরী সামাজিক প্রয়োজন মিটাবার জন্যেই এদের অনুকূলে খাদ্য বিতরণ কাঠামো পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে ১৯৭৯/৮০ ও ১৯৮৪/৮৫ সালের মধ্যে পি এফ ডি এস-এর বিতরণকৃত খাদ্যের পরিমাণ যখন কমেছে তখন বিতরণকৃত খাদ্যে অসচ্ছল শ্রেণীর শতকরা হিস্যাই শুধু বাড়ানো হয়নি, পরিমাণও বেড়েছে। নীচের সারণিতে বিষয়টি দেখানো হলো :

সারণি ৬

সরকারী খাতে খাদ্য বিতরণ

(হাজার টন)

বৎসর	বিধিবদ্ধ ও অগ্রাধিকার গ্রুপের রেশনিং	অন্যান্য	মোট
১৯৭৯/৮০	১,৩৯৯	১,০০৩	২,৪০২
১৯৮০/৮১	৯৪৩	৫৭৯	১,৫২২
১৯৮১/৮২	৯৬৩	১,০৭৩	২,০৩৬
১৯৮২/৮৩	৯৫৪	৯৮১	১,৯৩৫
১৯৮৩/৮৪	৯৩৪	১,১১৮	২,০৫২
১৯৮৪/৮৫	৮৫৭	১,৭৫৮	২,৬১৫

টীকা :—১৯৮০/৮১ সালে বাম্পার ফসল উৎপাদনের প্রেক্ষিতে এই সালে অন্যান্য খাতে (ত্রাণ ও সংশোধিত উভয় রেশনিং-৫) খাদ্য বিতরণ কমে যায়।

১.১৮। উপর্যুপরি উৎপাদন ব্যাহত হওয়াতে ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ঘাটতির ফলে উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার মুখে, বিতরণ কাঠামোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে সরকারকে অধিকতর খাদ্য সাহায্যের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্য আমদানি অব্যাহত রাখতে হয়। ১৯৮৩/৮৪তে বাণিজ্যিক আমদানির পরিমাণ ছিল ৫.৬৯ লাখ টন। ১৯৮৪/৮৫'তে তা আরো বেড়ে ১২.৪৬ লাখ টনে উন্নীত হয়। অন্যান্য খাত থেকে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মুদ্রা উভয় ধরনের সম্পদ সরিয়ে এনে খাদ্য আমদানি খাতে লাগানো হলেও এর ফলে লেনদেনের ভারসাম্যে অধিকতর চাপ পড়ে এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াও ব্যাহত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উৎপাদন থেকে ভোগ পর্যন্ত খাদ্য খাতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা খাদ্য খাতের আচরণের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। তবে ১৯৮৩/৮৪ এবং ১৯৮৪/৮৫'তে যে উপায়ে খাদ্য সংকটের মোকাবেলা করা হয়েছে অদূর ভবিষ্যতে তা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ বৈদেশিক মুদ্রার মজুত উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে এবং ওয়েজ আর্নারদের পাঠানো টাকাকড়িও হ্রাস পেয়েছে। তাই পানি সম্পদের আরো কার্যকর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠে কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় যা পরবর্তীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১৯। বর্ষার খামখেয়ালী আচরণের কারণে প্রকৃতির বিরুদ্ধে এ ধরনের কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজসাধ্য নয়। কিছুটা পথ ছাড়া কর্মকৌশল হিসেবে পি এফ ডি এস-এর অধীনে একটি নিরাপত্তা খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা হয় যাতে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তা কাজে লাগিয়ে অসুবিধা কাটিয়ে উঠা যায়। জরুরী খাদ্য সাহায্য লাভের ব্যবস্থা কিংবা বাণিজ্যিকভিত্তিতে খাদ্য ক্রয় করা কিছুটা সময়সাপেক্ষ বিধায় ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে পিএফডিএস-এর কাংখিত লক্ষ্য ছিল একটি যুক্তিসংগত পর্যায়ে মজুদ রক্ষা করা। ১৫ লাখ টনের খাদ্য মজুদকে দীর্ঘদিন ধরে একটি কাংখিত লক্ষ্য মাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তবে এ পর্যন্ত মজুদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী ১২ লাখ টনে উঠে ১৯৮০/৮১তে। এ বছর বাম্পার ফলনের দরুণ পিএফডিএস আভ্যন্তরীণভাবে ১০ লাখ টনেরও বেশী খাদ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে একমাত্র আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই একটি দৃঢ়ভিত্তিক মজুদ স্তর গড়ে তোলা যেতে পারে। যাই হোক, আপদকালীন সময়ের জন্য খাদ্যের নিরাপত্তা মজুদ নিরূপণ করতে গিয়ে অধিক পরিমাণে মজুদকৃত শস্যের ক্রয়, গুদামজাতকরণ, অপচয়ের ঝুঁকি ইত্যাদিতে নিয়ন্ত্রিত ব্যয়ের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। যেহেতু খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ ব্যবস্থা প্রকৃতির খেয়ালের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, সেহেতু ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক খাদ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়।

১.২০। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পিএফডিএস-এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেখা গেছে, খাদ্য ভর্তুকী দেয়ার ফলে এই পদ্ধতিকে নিদারুণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সংগ্রহ ও সরবরাহ মূল্য পরস্পরকে অতিক্রম করায় এবং সরবরাহ ও বাজারমূল্যের মধ্যেকার ব্যবধান হ্রাস পাওয়ায় খাদ্য ভর্তুকী ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৯/৮০ সালের ১৬৫ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে নগদ খাদ্য ভর্তুকীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৯ কোটি টাকায় এবং সরকারী মূল্যের স্থলে খাদ্যের অর্থনৈতিক মূল্য ধরে এক হিসেবে দেখা যায়, একই সময়ে অর্থনৈতিক ভর্তুকী ৩২৮ কোটি টাকা থেকে কমে ১৭৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। খাদ্যের এ ধরনের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণে আরেকটি হিসেবে দেখা গেছে, ১৯৮৩/৮৪ সালে খাদ্যশস্যের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক মূল্য ছিল আমদানি অর্থনৈতিক মূল্যের ১০%-র বেশী ; অথচ ১৯৭৯/৮০ সালে তা ছিল ২% কম। এর অর্থ হল চালের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অর্থনৈতিক খরচ বিশ্ববাজারে খাদ্যমূল্যের চাইতে দ্রুততর হারে বেড়েছে। এর কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে অনেক কৃষি উপকরণের উপর থেকে ভর্তুকী হ্রাসের কারণে ঐসব উপকরণের মূল্য আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতির চাইতে উচ্চহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংগ্রহ মূল্য, বাজারমূল্য এবং পিএফডিএস-এর সরবরাহ মূল্য বৃদ্ধি করে এই অবস্থার ভারসাম্য বিধানের চেষ্টা করা হয়। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, উৎপন্ন খাদ্যশস্যের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক মূল্য এবং উপকরণ মূল্য ছিল পরস্পরের সংগে সংগতিবিহীন। অন্য-দিকে দেখা যায়, গমের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক মূল্য এখন পর্যন্ত এর আমদানিরঅর্থনৈতিক মূল্যের চাইতে নিম্নস্তরে অবস্থান করছে এবং এটিই গম চাষাবাদ সম্প্রসারণের অতিরিক্ত গুরুত্বদানের পক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তি।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ

১.২১। জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে :

(১) **খাদ্যশস্যের সরবরাহ :** প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশের জনগণের প্রধান জীবিকা হলো কৃষি। কারণ এই কৃষিই তাদের খাদ্য, আমিষ, চর্বি, তৈল, তন্তু, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, জ্বালানী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের নিশ্চয়তা দেয়। ১৯৮৯/৯০ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা

হয়েছে এবং ঐ বছর নাগাদ দেশে ২ কোটি ৭ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। আমিষ-খাদ্য (যেমন : মাছ ও ডাল), তৈল বীজ, শাক-সব্জী, আলু, ইক্ষু, দুধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত সামগ্রী ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। বাণিজ্যিক জ্বালানীর দাম বেশী হলে কম্যুনিটি বন উন্নয়নের মাধ্যমে জ্বালানী কাঠের উৎপাদন বাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলের জ্বালানীর অভাব পূরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটাও স্বীকৃত সত্য যে, গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মাণ সামগ্রীর প্রধান উৎস কৃষি। তাই বন উন্নয়নের মাধ্যমে বাঁশ এবং অন্যান্য বন সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(২) **কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ :** দেশের দুই-তৃতীয়াংশ সক্রিয় শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান কৃষি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। শ্রম প্রধান কারিগরি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে পানি, বীজ, সার সম্বলিত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করে কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বর্তমানের চাইতে বাড়ানো সম্ভব। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ বর্তমানের ৬১.২০ লাখ একর থেকে ৫৭% বাড়িয়ে ৯৬.৪০ লাখ একরে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এই সেচ সম্প্রসারণের ফলে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। হিসেব করে দেখা গেছে, সার্বিকভাবে কৃষি খাতের পরিকল্পিত সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রায় ৪০% অতিরিক্ত শ্রমজীবীর কর্মসংস্থান হবে, এর ফলে উৎপাদনও বাড়বে।

(৩) **লেনদেন ভারসাম্য উন্নয়ন :** খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে প্রাকৃতিক দুর্যোগহেতু বিভিন্ন সময়ে ফসল হানির ফলে খাদ্য আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়জনিত চাপ যথেষ্ট কমবে বলে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি কর্মসূচীতে আমদানি বিকল্প এবং রপ্তানিযোগ্য ফসলের উৎপাদন আরও বাড়ানো হবে। এর মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীতে রয়েছে তৈলবীজ, ডাল, মসলা, ইক্ষু ও তুলা এবং শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে মাছ, শাকসব্জী, তামাক এবং চামড়া।

(৪) **জমির ব্যবহার ও সংরক্ষণ :** বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ দুটি জাতীয় সম্পদের মধ্যে জমি একটি; অন্যটি হলো শ্রম। পরিমাণগতভাবে ভূমি অমর হলেও এটা স্বীকৃত সত্য যে, ভূমির অপব্যবহার এর উৎকর্ষতা ভয়ংকররূপে হ্রাস করে দেশের জনগণের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারে। আদিকাল থেকেই বাংলাদেশে কৃষিজীবী মানুষের বসবাস। এদিক থেকে বিচার করলে, অতীতের তুলনায় বর্তমানে এদেশের সীমিত ভূসম্পদ ব্যবহারে অধিকতর যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। একদিকে দেশের অভ্যন্তরে বনবাদাড় উজাড় হচ্ছে, অন্যদিকে জনসংখ্যার চাপে জমি এক ফসলী হচ্ছে এবং পতিত জমির আয়তন কমে যাচ্ছে। এসব কারণে কেবল জমির উর্বরতাই হ্রাস পাচ্ছে না, ক্ষয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসব মূল্যবান সম্পদের সমৃদ্ধিসাধন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে (১) এক ফসলী জমিগুলোকে বহুফসলী জমিতে রূপান্তরিত করা হবে, (২) শীতকালীন চাষাবাদ সম্প্রসারণ করা হবে, (৩) পতিত জমি পুনরুদ্ধার করা হবে, (৪) পশুখাদ্য এবং শিম জাতীয় শস্যের চাষ বৃদ্ধি করা হবে, (৫) রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে, (৬) বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য বিধান করা হবে এবং (৭) উপকূলীয় জমি পুনরুদ্ধার এবং বনায়ন ও পরিকল্পিত বসতি স্থাপনের মাধ্যমে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(৫) **কৃষিজ উৎপাদনের স্থিরতা বিধান ঃ** চিরায়ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খেয়ালী আবহাওয়ার বশবর্তী হয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণ উঠানামা করতে দেখা যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ধান এবং পাটের উৎপাদন নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর ফলে কৃষি উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হারে ব্যাপক তারতম্য ঘটে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৮৪/৮৫ সালে দেশে পাটের উৎপাদন ছিল ১৯৭৯/৮০ সালের চাইতে কম। কৃষিপণ্যের বাজার দরে হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে চাষীরা বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদে জমি বণ্টন করে থাকেন বিধায় আলোচ্য দু'টি প্রধান ফসলের যে কোন একটির উৎপাদনে অস্থিরতা কেবল পরস্পরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, অন্যান্য ফসলের উৎপাদনেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আবহাওয়ার উপর কৃষির অত্যধিক নির্ভরশীলতা কৃষি উৎপাদনে অস্থিরতার প্রধান কারণ। কেবলমাত্র পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার উন্নতি বিধান এবং সেচকৃত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করেই এই নির্ভরশীলতা কমানো যেতে পারে। তাই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একদিকে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে, অন্যদিকে শীতকালীন চাষাবাদের সুবিধার্থে গুরুত্ব সহকারে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এটাও সত্য যে যেখানে আবহাওয়ার উপর অত্যাধিক নির্ভরশীলতার দরুণ কৃষিপণ্যের মূল্যের সাথে সাথে উৎপাদনও উঠানামা করে, সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসে কেবল মূল্য সমর্থন নীতি প্রয়োগ খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না। বরং আবহাওয়ার উপর কৃষিজ উৎপাদনের নির্ভরশীলতা যত কমবে উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে মূল্য সমর্থন নীতি তত বেশী কার্যকর হবে। সেজন্যই সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পাশাপাশি বহুফসলী চাষ এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মূল্যনীতিও অনুসরণ করা হবে।

(৬) **উচ্চ ফলনশীল বীজের জন্মভিত্তি সম্প্রসারণ ঃ** তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান শস্যের যেমন— ধান, গম ও সরিষার জন্মভিত্তি সম্প্রসারণের দিকে লক্ষ্য রেখে কৃষি গবেষণা পরিচালনা করা হবে। এছাড়া সাধারণভাবে বাংলাদেশের পরিবেশ এবং বিশেষভাবে জমির অবস্থার উপযোগী নতুন জৈব-রসায়ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। উন্নয়নের জন্য এসব গবেষণা অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে ল্যাবরেটরি ভিত্তিক গবেষণার চাইতে অবস্থান ভিত্তিক গবেষণা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চাইতে ফিল্ড ষ্টেশন স্থাপনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

মূল্যনীতি ও ভর্তুকী

১.২২। সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান গতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ ও কৃষিজ উৎপাদনের মূল্যনীতি পরিচালিত হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রকট অর্থ সংকটের মুখে ভর্তুকী হ্রাস করার প্রয়াসে কৃষি উৎপাদনের মূল্যনীতির তুলনায় কৃষি উপকরণের মূল্যনীতি প্রয়োগের দিকেই জোরালো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ১৯৭৯/৮০ সালে সার ভর্তুকী যেখানে ৪৩% ছিল, ১৯৮৪/৮৫ সালে তা ১৫% এরও নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে। একই সময়ে সারের ব্যবহার ৮.৩৮ লাখ টন থেকে বেড়ে ১২.৬০ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে বটে, কিন্তু সার ভর্তুকী ১২০.৪৫ কোটি টাকা থেকে ৮১.১৬ কোটি টাকায় নেমে গেছে। সেচ যন্ত্রের উপর প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ভর্তুকীও দারুণভাবে কমানো হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন অগভীর নলকূপ ও হস্তচালিত নলকূপের উপর ভর্তুকী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গোটা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সম্পদের অপ্রতুলতার প্রেক্ষিতে উপকরণ মূল্যের এইসব পরিবর্তন সত্ত্বেও খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন পরিশোধন মূল্যে প্রধানতঃ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বস্তুতঃ পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে হতাশার প্রেক্ষিতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ

অর্থকরী ফসল পাটের ক্ষেত্রে এই নীতি পরিত্যাগ করা হয়। অন্যান্য ফসলের মধ্যে যেগুলোকে পরিপোষণ মূল্য দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো ইক্ষু, তুলা এবং তামাক। কৃষি উপকরণের পরিপোষণ মূল্য হ্রাসের সাথে সাথে কৃষিজ উৎপাদনের পরিপোষণ মূল্য প্রবর্তনের প্রয়োজন হবে। এতে কৃষিজ উৎপাদনের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও কৃষি উপকরণের সদ্ব্যবহার হবে। উৎপাদন ও তার মওজুদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে মূল্য পরিপোষণ নীতির দু'টি অংশের প্রয়োগে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। কৃষিজ উৎপাদনের বিপুল মজুদ গড়ে তোলার প্রবণতা পরিহার করতে হবে। তবে তৈলবীজের মত অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য এবং পাটের মত প্রধান বাণিজ্যিক ফসলের মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে দুর্দিনের জন্য মজুদ (বাম্পার ষ্টক) গড়ে তোলার নীতি অনুসৃত হবে।

বেসরকারী খাতের ভূমিকা

১.২৩। কৃষি বাংলাদেশের জনগণের প্রধান জীবিকা। কৃষিতে ত্বরিৎপ্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত রূপান্তরের উপর গুরুত্ব আরোপ করার পর থেকে নতুন প্রযুক্তি ও তার উপকরণ কৃষকদের কাছে সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে সরকারী খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৭০ সালের শেষভাগে কীটনাশক বিতরণ শুরু করার পর থেকে বেসরকারী খাতের ভূমিকাও ক্রমশঃ বাড়ছে। সারের খুচরা বিক্রয় ব্যবস্থা বর্তমানের বেসরকারী খাতের সার ডিলারদের নিয়ন্ত্রণে এবং বাজারে চাহিদার অনুপাতেই সারের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সেচযন্ত্রের মধ্যে অগভীর নলকূপ বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও বাজারে বেসরকারী খাতের প্রাধান্য স্পষ্ট। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেও এই নিয়ম অব্যাহত থাকবে, তবে কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণের উপর এর প্রসার বহুলাংশে নির্ভর করবে। অন্যান্য সমস্যার মধ্যে যেগুলোর প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবে সেগুলো হলো : (১) কৃষিযন্ত্রের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে এবং (২) দেশে বর্তমান সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ তৈরী করে পরিকল্পনাকালে এগুলোর সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যন্ত্রাংশের পণ্য নামের (ব্রাণ্ড নেম) সংখ্যা সীমিত রাখার প্রয়াস চালাতে হবে।

কৃষিঋণ নীতি

১.২৪। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যন্ত্রপাতি, হালের বলদ ও কাঠামোর জন্যে বেসরকারী খাতে মোট ৪,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। এই বিনিয়োগের এক বৃহদাংশ অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। বিনিয়োগে অর্থ সংস্থানের সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উৎপাদন ঋণও বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি ঋণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রসারিত হতে দেখা গেছে। ১৯৭৯/৮০ সালের ২৬৮'৯ কোটি টাকার স্থলে ১৯৮৪/৮৫ সালে কৃষি ঋণ ১,১৩১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। এতদসত্ত্বেও এ অংক হলো সর্বোচ্চ কৃষি উৎপাদন মূল্যের মাত্র ৪.৮% এবং বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত মোট অগ্রিম ও ঋণের মাত্র ১৩%! এটা স্বাভাবিক যে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিক কৃষি উপকরণের ব্যবহার আগের তুলনায় দ্রুতহারে বাড়বে এবং তখন স্বল্পমেয়াদী উৎপাদনে কৃষি ঋণের ব্যাপক চাহিদাও পরিলক্ষিত হবে। এ চাহিদা মোট ৮,০০০ কোটি টাকারও বেশী হতে পারে।

১.২৫। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষি ঋণ সম্প্রসারণ করতে গিয়ে প্রথমেই যে সংকটের মুখোমুখি হতে হয় তা হলো প্রদত্ত ঋণ পুনরাবর্তন করার সমস্যা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি ঋণ আদায়ের হার ছিল নিতান্তই কম। ১৯৮০/৮১ সালে যে আদায়ের পরিমাণ ছিল ৪৮.৯%, তা ১৯৮৩/৮৪ সালে এসে ৪১.৮%-এ ঠেকেছে। সম্ভবতঃ কৃষিঋণের ব্যাপক সম্প্রসারণের আংশিক কারণ হচ্ছে প্রদত্ত ঋণের অসদ ব্যবহার ও অপচয় যা থেকে এহেন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তবে এর প্রধান কারণ হলো বন্যা ও খরার ফলে কৃষকের ব্যাপক ফসলহানি। ১৯৮১/৮২ সালে কৃষি উৎপাদন প্রচণ্ড মার খাবার পর ১৯৮২/৮৩ সালে ঋণ আদায়ের মাত্রা ১৪.৯%-এ নেমে আসে। এখান থেকেই

উপরোক্ত উক্তির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়। পরবর্তীকালে কৃষি ঋণের পরিমাণ দ্রুত সম্প্রসারণ করা হলেও এই অবস্থা কম বেশী অপরিবর্তিত থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বন্যা ও খরার উপর্যুপরি ছোবল কৃষকদের উৎসাহ উদ্দীপনা হরণ করে নেয়। নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত শক্তির শিকার হয়ে অতীত ব্যর্থতার কারণে কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় ঋণ দানে নিস্পৃহ থাকলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। এবং কৃষি উৎপাদনের অব্যাহত সম্প্রসারনের মাধ্যমে তাদের শক্তি বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশের সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বিপন্ন হবে এবং ৬০ লাখেরও বেশী কৃষিনির্ভর পরিবার এক নিদারুণ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবে।

১.২৬। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দেশের ঋণ-প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা বিশেষ প্রয়োজন। এর ফলে ধানের অপচয় রোধ হবে। যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ঋণের দক্ষতা বাড়বে এবং সর্বোপরি ঋণ বাজারে বাধ্যবাধকতার চাইতে ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতা বাড়বে। বলা বাহুল্য এসবই অদক্ষ ঋণ প্রশাসনের কুফল। ঋণ প্রশাসন ব্যাহত হলে ব্যাংকগুলো ঋণের টাকার উৎপাদনমুখী ব্যবহারের দিকে নজর না দিয়ে শুধুমাত্র পুনরাদায় পরিস্থিতি বিবেচনা করে সহজে কম ঝুঁকিতে বাধ্যতা-মূলক ঋণদানে প্রবৃত্ত হবে। ফলে গ্রামীণ ব্যাংকগুলোতে সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকের শহরকেন্দ্রিক শাখাগুলোতে স্থানান্তরিত করে ঋণ বন্টন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে। এইভাবে কৃষি ঋণের গোটা পদ্ধতিটাই বাণিজ্যিক ঋণের বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অন্যান্য ঋণের মতোই জামানতের মাধ্যমে তার ঝুঁকি পূরণ করা হয়। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিয়ে ব্যাপক কারচুপির প্রবণতা প্রায় সার্বজনীন এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে তা কঠোর হস্তে প্রতিহত করা হবে।

ফসল বহুমুখীকরণ কর্মসূচী

১.২৭। নিবিড় চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করে ফসল বহুমুখীকরণের জন্য যে সব পদক্ষেপ নেয়া হবে সেগুলো হলো:

(ক) বর্তমানে উৎপাদিত ফসলের একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে;

(খ) অধিক লাভজনক জাতের বীজ দিয়ে বর্তমানে ব্যবহৃত বীজগুলো প্রতিস্থাপন করতে হবে; সম্ভব হলে এর জন্য স্থানীয়ভাবে উন্নীত বীজ ব্যবহার অথবা এমন শস্যের চাষ চালু করতে হবে যাতে কম খরচে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত হয়; এবং

(গ) বছরে একই জমিতে বিভিন্নজাতের শস্য উৎপাদন করতে হবে।

১.২৮। নিকটতম ভবিষ্যতে যে সমস্ত শস্যে বর্তমানে যথারীতি প্রযুক্তি বিশেষ করে অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো উৎপাদনের মাধ্যমেই উৎপাদনের বহুমুখীকরণ সম্ভবপর। এক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে চাষযোগ্য ফসল যেমন সরিষা, গ্রীষ্মকালীন ডাল এবং ভুট্টা ইত্যাদি উন্নতকরণের অনুকূল অবস্থা বিরাজ করছে। কৃষি আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হওয়ায় এবং নতুন ধরনের বীজ কৃষকরাও গ্রহণযোগ্য মনে করছে বলে এ সমস্ত শস্যোৎপাদনে কিছুটা আশাব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে। স্থিতিশীল স্থানীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান প্রযুক্তি ব্যবহার করেও আদা, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ প্রভৃতি শস্যের স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন সম্ভবপর।

১.২৯। মাঝামাঝি ধরনের যে সমস্ত শস্যের মধ্যমেয়াদী বহুমুখীকরণ সম্ভব সেগুলো হলো মিষ্টি আলু, চিনাবাদাম, রবি ডাল, তুলা এবং জোয়ার-বাজরা ইত্যাদি। এ সমস্ত শস্যের উৎপাদন বহুমুখীকরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে সন্নিবেশ করা যেতে পারে। এ ধরনের শস্য উৎপাদনে যে সমস্ত ক্ষেত্রে অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহার করে কৃষিভিত্তিকভাবে এগুলো অধিক উৎপাদনশীল এবং মুনাফাজনক বলে মনে হচ্ছে সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া যায়। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মসলা, গুটিকয়েক রবি ও খারিফ মৌসুমের ফসলেরও দীর্ঘমেয়াদী বহুমুখীকরণে সম্ভাবনার ইংগিত রয়েছে।

১.৩০। কতক শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত রাখা এবং আরো কয়েকটির উৎপাদনে নিম্নমুখী প্রবণতা রোধের জন্য মূল্য সমর্থন ছাড়াও পূর্বে আলোচিত কয়েকটি নীতি অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। খাদ্যশস্যের উপর অধিকহারে নজর দেয়ার ফলে ডাল, তৈলবীজ, ভুট্টা ও শাকসব্জী ইত্যাদি উৎপাদনে ইতিপূর্বে এগুলোর উপর গবেষক ও কৃষিকর্মীদের পক্ষ থেকে যথাযথ নজর দেয়া হয়নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে এ কারণে এগুলো সংকটেরও মুখোমুখি হয়েছে। বিদ্যমান শস্য বহুমুখীকরণ পরিকল্পনাকে সামনে রেখে মাঝারি ধরনের সম্ভাবনাপূর্ণ ফসলগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বিদ্যমান সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করা একটি প্রধান পূর্বশর্ত এবং এর মাধ্যমেই শস্যনীতি সমর্থনকে শস্য বহুমুখীকরণ কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নেয়া যায়।

শস্যোৎপাদন কর্মসূচী

১.৩১। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিখাতের প্রধান লক্ষ্য হলো খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। এ লক্ষ্যমাত্রা সফল করে তৃতীয় পরিকল্পনাকালের প্রান্তিক বছরে (১৯৮৯/৯০) মোট ২.০৭ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে। ১৯৮৪/৮৫ সালের ১.৬১ কোটি টন খাদ্যোৎপাদনের স্থিতাবস্থা থেকে প্রতি বছর ৫.২% হারে উৎপাদন বাড়াতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকে উদ্দেশ্য হিসাবে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু উন্নয়ন তহবিলের অভাব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৫ বছরের মধ্যে ৪ বছরেই খাদ্য এবং অন্যান্য কৃষিদ্রব্য উৎপাদন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সংকটের শিকার হয়েছে। ১৯৮৪ সালে প্রায় ১৫ লাখ টনের মতো খাদ্যশস্য বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরিকল্পনা শেষে খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ১৭ লাখ টন পিছিয়ে থাকে। খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে এই উপর্যুপরি দুর্যোগ বিবেচনা করলে ১৯৬৯/৭০ সালের ১.০৮ কোটি টন খাদ্যোৎপাদন বছরে ২% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১.৬১ কোটি টন খাদ্যোৎপাদনকে একটা সাফল্য বলেই ধরে নেয়া যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৫% যা একটা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতারই উদাহরণ। খাদ্যশস্য উৎপাদন উল্লেখিত ধারায় প্রবৃদ্ধি অর্জনের পরও জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিতে সাধারণভাবে অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বিধায় এবং বিশেষভাবে আর্থ-সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির জন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান করতে গিয়ে এসময় খাদ্যশস্যের আমদানির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকে। নীট সরকারী মজুদ অনুসারে মাথাপিছু দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালের ১৫.৫ আউন্স থেকে ১৬ আউন্সে উন্নীত হয় এবং এই মাত্রায় খাদ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের প্রয়াসকে সামনে রেখেই তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এটা মেনে নিতে হবে যে, স্বাধীনতার পর থেকে খাদ্যশস্যের একর প্রতি উৎপাদন যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করলেও এখনও এই হার খুব নীচুতে অবস্থান করছে। ১৯৬৯/৭০ সালের একর প্রতি চালের উৎপাদনে ১২.৬২ মণ থেকে বর্তমানে ১৫.৫৫ মণে উন্নীত হলেও এই হার এখনও চাল উৎপাদনকারী বহু দেশের একর প্রতি উৎপাদন মাত্রার চাইতে অনেক কম। দুটি কারণে একর প্রতি শস্যোৎপাদনের হার সীমিত রয়েছে। প্রথমতঃ বিদ্যমান কৃষি-আবহাওয়া ও ভূপ্রকৃতি, দ্বিতীয়তঃ আনুপাতিকভাবে কম প্রযুক্তির ব্যবহার। গভীর পানির আমন ফসল উৎপাদন হার এখনও প্রত্যাশিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি এবং রোপা আমন ফসল এখনও বন্যা ও খরার কারণে মার খেয়ে চলেছে। আগেই বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আমন উৎপাদনে খুব কম সাফল্যই অর্জিত হয়েছে। এজন্য খরিফ মৌসুম থেকে রবি মৌসুমে ধান চাষের স্থানান্তর সাধনের যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, সেচ ব্যবস্থায় পর্যাপ্ততার অভাবে তাও সীমিত হয়ে পড়েছে। এতদসত্ত্বেও শীতকালীন আমন চাষ দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই সাফল্যের জন্য বহুলাংশে দাবিদার। মৌসুমী আবহাওয়ার প্রতিকূল আচরণের মুখে খাদ্যোৎপাদন নিশ্চিত করতে গিয়ে অনিয়ন্ত্রিত পানি সম্পদ ব্যবহারের ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় শীত মৌসুমে অধিকতর হারে খাদ্যোৎপাদন সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেহেতু অধিকাংশ অ-প্রধান শস্যও এই একই মৌসুমে ফলে, সেহেতু তৈলবীজ এবং ডালের মত অ-প্রধান শস্যোৎপাদন সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার সাথে সমন্বয়সাধন করেই শীতকালীন বোরো ও গম চাষ সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

১.৩২। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে খাদ্যোৎপাদন কর্মসূচীর বন্টন নীচের সারণিতে দেখানো হলো। সারণির পর এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে:

সারণি ৭

খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৫--৯০)

(উৎপাদন লাখ টনে / আয়তন লাখ একরে)

খাদ্যশস্য	স্থিতাবস্থা ১৯৮৪/৮৫		লক্ষ্যমাত্রা ১৯৮৯/৯০		বার্ষিক উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার
	জমির আয়তন	উৎপাদন	জমির আয়তন	উৎপাদন	
১। চাউল:					
আউশ	৭২.৬	২৭.৮	৭২.০	৩৪.২	৪.২৩%
আমন	১৪১.১	৭৯.৩	১৪৪.০	৯১.৮	২.৯৭%
বোরো	৩৮.০	৩৯.১	৪৮.০	৫৪.০	৬.৬৯%
উপমোট (চাউল):	২৫১.৭	১৪৬.২	২৬৪.০	১৮০.০	৪.২৯%
২। গম	১৩.৭	১৪.৬	২৪.০	২৬.০	১২.২৩%
৩। মোটাদানার শস্য	১.০	০.৩০	০.৬	১.০	২৭.০০%
মোট খাদ্যশস্য:	২৬৬.৪	১৬১.১	২৮৮.৬	২০৭.০	৫.২০%

খাদ্যশস্য উৎপাদন

(১) আউশ: ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত আউশ ধান উৎপাদনের এলাকা ৭২.৪ লাখ এবং ৭২.৬ লাখ একরের মধ্যে সীমিত ছিল. অধিক ফলনশীল আউশ ধান উৎপাদনের এলাকা ১৯৭২/৭৩ সালের ১.৬৪ লাখ একর থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১১.৫২ লাখ একরে উন্নীত হয়। আউশ ধানের উৎপাদন ২২.৭৩ লাখ টন থেকে বছরে ২.১ শতাংশ হারে বেড়ে ২৭.৮৩ লাখ টনে উন্নীত হয়। ১৯৮৪/৮৫ সালে বন্যার ফলে আউশ ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর উৎপাদন ৩২ লাখ টন থেকে ২৭.৮০ লাখ টনে নেমে আসে। একর প্রতি অধিক ফলনশীল আউশ ধানের ফলনও এসময় ২৭.৭০ মণ থেকে ২০.১ মণে নেমে আসে। আউশ ধানের উৎপাদন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আবহাওয়ার প্রতিকূলতাই হলো সবচাইতে বড় সমস্যা। বন্যানিয়ন্ত্রণ ও সেচ কর্মসূচী বিবেচনায় রেখে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৪.২ লাখ টন অধিক ফলনশীল (সেচকৃত) আউশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে যা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সর্বোচ্চ উৎপাদনের চাইতে ৬.৩% এবং পাঁচ বছরের গড় উৎপাদনের চাইতে ১০.৭% বেশী।

গ্রন্থ

(২) **আমন :** আমন উৎপাদনের এলাকা মোট ধান উৎপাদনের এলাকায় ৫৬% এবং ফসলের উৎপাদন মোট বার্ষিক উৎপাদনের ৫৫%। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, বিগত দশ বছরে অধিক ফলনশীল আমন ধানের চাষাধীন এলাকা এবং উৎপাদন খুব একটা বাড়েনি। ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৪১.১ লাখ একর জমিতে মোট ৭৯.৩১ লাখ টন আমন ফসল উৎপাদিত হয়। ১৯৮৯/৯০ সালে এই উৎপাদন বছরে ২.৯৭% হারে বৃদ্ধি করে ১৪৪.০ লাখ একর জমিতে মোট ৯১.৮ লাখ টন আমন ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এর মধ্যে অধিক ফলনশীল আমন উৎপাদিত হবে ৩০ লাখ টন। সম্পূরক সেচ ও অন্যান্য সুবিধা বিস্তার করে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

(৩) **বোনা আমন :** দেশের মোট ধানী জমির মধ্যে ১২% এলাকায় বোনা আমনের চাষ হয় এবং মোট চাউলের ৮.৪% এ ধান থেকে সংগৃহীত হয়। বোনা আমন ধানের একর প্রতি উৎপাদন কম। প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার কারণে এ ফসল প্রায়ই বিপর্যয়ের শিকার হয়। অকাল খরা, অকাল বর্ষা, বন্যার পানির আকস্মিক বৃদ্ধি সবই এ ফসল উৎপাদনের প্রতিকূলে। এছাড়াও এগুলো প্রায়ই নানা-প্রকার কীটপতংগ ও রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে এবং এর বিরুদ্ধে উদ্ভিদ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা নেহায়েতই কঠিন কাজ। এ ধানের অধিক ফলনশীল জাতের কোন বীজ এখনও উদ্ভাবিত হয়নি। তবে উন্নতধানের বিশেষ জাতের বীজ দিয়ে প্রচলিত বীজের পরিবর্তে চাষ করে উৎপাদন কিছুটা বাড়ানো সম্ভব। এ ফসলের উৎপাদন বাড়াতে গেলে যে সমস্ত বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন সেগুলো হলো (১) উন্নত ইন্টার-কালচারাল চাষ, (২) যথাযথ উদ্ভিদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং (৩) যথাযথ দেশী উন্নত ধরনের বীজ নির্বাচিত করা।

(৪) **বোরো :** বোরো ধানের চাষাধীন এলাকা ১৯৭২/৭৩ সালের ২৪.৩৪ লাখ একর থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৩৮.০ লাখ একরে উন্নীত হয় এবং এ ধানের উৎপাদন একই সময়ে ২০.৭০ লাখ টন থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৯.১০ লাখ টনে। অধিক ফলনশীল বোরো চাষাধীন এলাকা নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে ১০.৮৮ লাখ একর থেকে ৩০ লাখ একরে বাড়ানো হয় এবং এ সময় একর প্রতি উৎপাদনও ২৩.২ মণ থেকে ২৭.২ মণে উন্নীত হয়। ফলে এর মোট উৎপাদন ১৩.৪০ লাখ টন থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩.৯৪ লাখ টনে। বোরো চাষের যথাযথ সম্প্রসারণ তৃতীয় পরিকল্পনার খাদ্যোৎপাদনের সাফল্য অর্জনে বিশেষ অবদান রাখবে। এসময় ৪৮ লাখ একর জমিতে মোট ৫৪ লাখ টন বোরো ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে; এর মধ্যে একর প্রতি এক টন হিসেবে মোট ৩৮ লাখ একর জমিতে অধিক ফলনশীল বোরো উৎপাদন করা হবে। বিদ্যমান সেচ ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এবং অতিরিক্ত সুবিধাদি বিস্তার করে একর প্রতি আরো বেশী ফসল উৎপাদনেরও চেষ্টা চালানো হবে।

(৫) **গম :** ১৯৮৪/৮৫ সালে গমের মোট উৎপাদন ১৪.৬৪ লাখ টনে বৃদ্ধি পায়; গম উৎপাদনে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং এটি আরো সম্প্রসারণের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। এই প্রবণতা অব্যাহত রাখার জন্য বীজ, সেচ পানি এবং চারা সংরক্ষণ ব্যবস্থাদি ইত্যাদি উপকরণ অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে এবং তার জন্য উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদানেরও নিশ্চয়তা দিতে হবে। বিশ্ববাজার থেকে গম আমদানির মূল্যের তুলনামূলক বিচারে বাংলাদেশ অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করছে। ২৪.০ লাখ একর জমিতে ২৬.০ লাখ টন গম উৎপাদনের একটি লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে যা ১৪.৬৪ লাখ টনের স্থিতাবস্থার তুলনায় ৭৮.১% বেশী।

(৬) **মোটাদানার শস্য :** ভুট্টা, যব, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদির মতো মোটাদানার শস্য এখন প্রধান খাদ্য হিসেবে ততটা জনপ্রিয় নয়। তবে পানি সম্পদের ব্যবহার এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ সমস্ত শস্য চাষাধীন এলাকা দ্রুত কমছে। ১৯৬৯/৭০ সালের ২.৭৬ লাখ একর থেকে ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে তা ১৯৭৯/৮০ সালে ১.৮৭ লাখ একর এবং ১৯৮১/৮২

সালে ১.৭৭ লাখ একরে নেমে এসেছে। একই সময়ে এগুলোর উৎপাদন ৮৫ হাজার টন থেকে নেমে এসেছে ৫০ হাজার টনে। এই শস্যগুলো প্রান্তিক পর্যায়ের অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিগুলোতে জন্মায় এবং এর জন্য বিনিয়োগও প্রয়োজন হয় কম। শিল্পের কাঁচামাল, বিকল্প খাদ্য এবং গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে এগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে উন্নত বীজ ও আধুনিক চাষাবাদের মাধ্যমে বিশেষ করে ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা হবে।

পাট

১.৩৩। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে চাল উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এর বিপরীত-ক্রমে পাটের উৎপাদন ছিল হতাশাব্যঞ্জক। স্বাধীনতার পর থেকে পাটের চাষাধীন এলাকা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৬৯/৭০ সালের ২২.০ লাখ একর থেকে হ্রাস পেয়ে তা ১৯৭৯/৮০ সালে ১৬.০ লাখ একরে এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৫.০ লাখ একরে নেমে আসে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাট চাষাধীন এলাকা বিশেষ করে নিবিড় চাষ প্রকল্পগুলো এই পর্যায়েই সীমিত ছিল। ১৯৭৮/৭৯ এবং ১৯৭৯/৮০ এ দুটি বছরে পাটের ফলন ভালো হওয়ায় ১৯৭৯/৮০ সালে পাটের দাম কমে আসে এবং এসময় পাট ও ধানের আনুপাতিক বিনিময় মূল্য ১.৫২ থেকে কমে ০.৮৫ এ নেমে আসে। এর ফলে পাট চাষে চাষীরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে ও ১৯৭৮/৭৯ সালের ১৮.৭ লাখ একর থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে পাট চাষাধীন এলাকা ১৫.৭ লাখ একরে এবং ১৯৮০/৮১ সালে তা ১৪.১ লাখ একরে নেমে আসে। পাট উৎপাদন দুটি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। এর একটি আভ্যন্তরীণ এবং অপরটি বহির্দেশীয়। ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাটের স্থান ধানের পরে দ্বিতীয় স্থানে নেমে আসে এবং এসময় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় পাটের প্রতি মূল্য সমর্থন ও নিবিড় চাষ দুক্ষেত্রেই মনোযোগ দেয়া হয় কম। অন্যদিকে খাদ্যে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্য ধানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুটি সমর্থনই পুরোপুরিভাবে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে পাট আরো অসুবিধার সম্মুখীন হয়। দ্বিতীয়তঃ পাটকে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় এবং বিশ্ব পরিস্থিতি মেনে নিতে হয় যা ধানের বেলায় প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিশ্ব-বাজারে মন্দা, পাট ও পাটজাতদ্রব্যের চাহিদার ক্রমহ্রাস এবং অন্যদিকে মন্দীভূত বাজারে খণিজ তেলের মূল্য ব্যাপক হ্রাস পাওয়ায় রাসায়নিক তন্তুর সঙ্গে পাটকে ঘোরতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে জমি বরাদ্দের দিক দিয়ে আভ্যন্তরীণভাবেও পাটকে ধানের সঙ্গে তুমুল প্রতিযোগিতায় নামতে হয় এবং ধানের দাম বেড়ে যাওয়ায় জমির ক্ষেত্রে পাট চাষাধীন এলাকাও কমে আসে যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা হ্রাস ও সিনথেটিকের সংগে তার প্রবল প্রতিযোগিতা ধানের সঙ্গে পাটের প্রতিযোগিতার ক্ষমতাও কমিয়ে দেয়। পাট চাষাধীন এলাকার তাই ১৪ থেকে ১৫ লাখ একরে সীমিত থাকা এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একদিকে যখন পাট চাষাধীন এলাকা কমছে, অন্যদিকে তখন ধানের স্থলে পাট উৎপাদনকে আবহাওয়া এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থা এই দুটি বিষয়ের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে।

১.৩৪। যাই হোক, এই বাহ্যিক দুটি উপাদান যেমন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, অন্যদিকে তা তেমনি সমার্থকও নয়। আবহাওয়ার কারণে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা বিশ্ববাজারে পাটের সরবরাহ বিঘ্নিত করে এবং তখন বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবহাওয়ার কারণে পাটের উৎপাদন কমে গেলে চাষীরা তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য পাটের দাম বাড়িয়ে দেয়। ফলে স্বল্পমেয়াদী ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা হ্রাস পায় ও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে এই মূল্যবৃদ্ধি পাটকলগুলোর ক্ষতির কারণ হয় যা পুনরায় দীর্ঘমেয়াদীভাবে পাটচাষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে।

১.৩৫। পাটজাতদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত আভ্যন্তরীণ বিরাট শিল্পখাত এবং পাশাপাশি পাটচাষীদের ভাগ্য পাট উৎপাদনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত বলে আভ্যন্তরীণভাবে ধানের সংগে ও বহির্দেশীয়ভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে তুমুল প্রতিযোগিতা বজায় রেখেও এই সমস্যা মোকাবিলা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না এবং তা এর বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধানের ক্ষেত্র সীমিত করে দেয়। দেশের জন্য খাদ্য এবং

পাটকলগুলোর জন্য পাট সরবরাহ এই দুইয়ের মধ্যে খাদ্যের প্রাধান্য এবং আবহাওয়া এই দুটি উপাদান বিশ্ববাজারে পাট সরবরাহের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। ১৯৭২/৭৩ সালে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পাট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৮.৩০ লাখ গাঁইট যা ১৯৭৯/৮০ সালে ১৯.৭০ লাখ গাঁইটে নেমে আসে অথচ একই সময়ে পাটের উৎপাদন ছিল প্রায় সমান। ১৯৮২/৮৩ সালে আবার তা ২২.৫০ লাখ গাঁইটে উন্নীত হয়, কিন্তু ১৯৮৪/৮৫ সালে তা নেমে আসে ১৬.২ লাখ গাঁইটে। রপ্তানি বাজারে পাট সরবরাহের এই অস্থিরতা পাটজাতদ্রব্যের উৎপাদনের সংকট ঘনীভূত করেছে এবং এর ফলে বিশ্ববাজারে সিনথেটিকের অনুপ্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদার মন্দা এবং পাটজাতদ্রব্যের রপ্তানি মূল্য কমে যাওয়া সত্ত্বেও রপ্তানি আয়ের মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে গিয়ে ১৯৭৯/৮০ সালের তুলনায় ১৯৮৩/৮৪ সালে পাটজাতদ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়াতে হয়েছে।

১.৩৬। পাট বর্তমানে যে সমস্যার সম্মুখীন তার যুক্তিযুক্ত সমাধান শুধু জটিলই নয়, জাতীয় অর্থনীতির জন্যও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাট চাষ এবং পাটজাতদ্রব্য উৎপাদনের সংগে ৯৫ লাখেরও বেশী কৃষক এবং শ্রমিকের ভাগ্য জড়িত এবং মোট রপ্তানি আয়ে পাটের অবদান ৫০%। মূল্য সমর্থন এবং উৎপাদন স্কীমগুলো প্রত্যাহারের পরে দেখা গেছে, আবহাওয়া, চাষীদের উদ্যোগ এবং বিশ্ববাজার এই তিনটি উপাদানের উপরই পাটচাষকে পুরোপুরী নির্ভর করতে হচ্ছে। অবশ্য আন্তর্জাতিক পাট পরিষদ মনে করে যে, উক্ত পরিষদের আওতাধীন এলাকায় পাটচাষ মূলতঃ চাষীদের উদ্যোগের উপর স্থায়ীভাবে নির্ভর করছে। তবে পাটচাষাধীন এলাকার সংকোচন এবং অনিশ্চিত আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীলতার কারণে পাটের উৎপাদন হ্রাস এবং উঠানামার একটা সম্ভাবনা রয়েই গেছে। উপরোক্ত অনিশ্চয়তার ফলে পাটের উৎপাদন কমে যাচ্ছে বলে দেশের উৎপাদিত কাঁচা পাট বাইরে রপ্তানী করা হবে না কি আভ্যন্তরীণ মিলগুলোতে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সরবরাহ হবে এ দুইয়ের মধ্যে যে কোন একটা বেছে নেয়ার তাগিদ অনুভূত হয়। যেহেতু পাটকলগুলোতে সুপ্রচুর বিনিয়োগের প্রশ্ন জড়িত সেহেতু কাঁচা পাট কম রপ্তানী করে যতবেশী সম্ভব পাটজাতদ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তাই বেশী অনুভূত হয়। ফলে উৎপাদন কম হওয়ায় কাঁচা পাট এবং পাটজাতদ্রব্যের যৌথ রপ্তানি যেখানে ১৯৭২/৭৩ সালের ৯.২১ লাখ টন থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২০.৫% হ্রাস পেয়ে ৭.৩৭ লাখ টনে নেমে এসেছে, সেখানে কাঁচা পাটের রপ্তানী ৫.০৯ লাখ টন থেকে নেমে এসেছে ২.৫৩ লাখ টনে এবং পাশাপাশি পাটজাতদ্রব্যের রপ্তানী ৪.১৮ লাখ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.৮৪ লাখ টনে। এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো, পাটজাতদ্রব্যের উৎপাদন মূল্য পাওয়া যায় ডলারে। প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তনের ফলে ১৯৮৪/৮৫ সালে চলতি মুদ্রামানে পাটজাতদ্রব্য রপ্তানী থেকে রপ্তানী আয় হয়েছে ৫১.০ কোটি ডলার যদিও ১৯৭২/৭৩ সালের আমদানী মুদ্রামানে তা ছিল ২৩.১৭ কোটি ডলারের সমান যেখানে একই বছর আয় হয়েছিল ৩১.৯০ কোটি ডলার। পাটজাতদ্রব্য রপ্তানীর অর্থনৈতিক দিক খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ নয়। যদি পাটের উৎপাদন ব্যয় অনুসারে কাঁচা পাট এবং অন্যান্য উপকরণের আনুপাতিক ব্যয়ের ভিত্তিতে (৪০:৬০) পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী মূল্য নির্ধারিত হতো তাহলে পাটজাতদ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রতি টন পাটের মূল্য ৩৪০ ডলার হওয়া উচিত ছিল যা প্রকৃতপক্ষে প্রায় ৩৯০ ডলারের সমান। পাটজাতদ্রব্যের আরোপিত রপ্তানি মূল্য এবং প্রাপ্ত প্রকৃত রপ্তানী মূল্যের ব্যবধান হিসেবে পাটজাতদ্রব্য রপ্তানীর উপরই গুরুত্ব দেয়া হয় যা পাট উৎপাদকদের জন্য নিরুৎসাহব্যঞ্জক। অন্যদিকে পাটজাতদ্রব্যের নিম্নমুখী রপ্তানীমূল্য উৎপাদকদের পাট রপ্তানিতেই প্রলুব্ধ করে এবং এক্ষেত্রে পাটজাতদ্রব্য রপ্তানী অব্যাহত রাখলে পাটকলগুলোকে লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়।

১.৩৭। পাটের উৎপাদন কমে গেলে দেশে ও বিদেশে পাটের দুটি মূল বাজারে পাদিত পাট বণ্টনের এই প্রেক্ষাপটে পাটের চাষাধীন এলাকা কমে আসলেও এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ পাট উৎপাদনের এই মন্দাগতির সঙ্গে অনেকটা খাপ খাইয়ে নিয়েছে। রপ্তানী আয়ের দিক দিয়ে এই নীতিকে খুব একটা সুবিধাজনক বলা যায় না। পাট উৎপাদন সব সময়ই সরকারের নীতি-সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়েছে ও পাটের

পরিবর্তে ধান উৎপাদন এবং কাঁচা পাটের পরিবর্তে পাটজাতদ্রব্যের রপ্তানী এই নীতির অন্তর্ভুক্ত থেকেছে, যদিও প্রতি একরে উৎপাদিত পাটের মূল্য (একর প্রতি ৩.৫ গাঁইট) ২৫৫ ডলার (গাঁইট প্রতি ৭৩ ডলার) এবং ধানের ক্ষেত্রে তা ২২৮ ডলার (f.o.b.)। সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে শীতকালে দানাদার শস্যের চাষ পাটের সাথে এই ব্যবধান পূরণে সহায়ক হতে পারে। এর পরেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এই গুরুত্বপূর্ণ পণ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্থিতিশীল নীতি প্রয়োজন। বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকলেও যুক্তিযুক্ত একটা নীতিমালা পাট উৎপাদন এবং তা থেকে রপ্তানী আয়কে স্থিতিশীল করার পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

১.৩৮। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে পাট থেকে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা না থাকায় পাটচাষের এলাকা কমিয়ে দেয়াই হবে একজন চাষীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দু'বছর আগে থেকেই পাট চাষের এলাকা কমে আসছিলো। আনুপাতিক হিসেবে অন্যান্য ফসল থেকে বেশী আয় করার কৃষকদের প্রবণতার কারণে পরিকল্পনার পরবর্তী দুটি উপর্যুপরি বছরে এই পরিমাণ আরো হ্রাস পায়। এই সময়ে উৎপাদন কম হওয়ায় কৃষকদের ঘাটতি অনেকটা পুষিয়ে যায়। তবে এই ঘাটতি পুষিয়ে যাওয়ার গতি এত ধীরে ছিল যে এসময়েও পাট চাষাধীন এলাকা বাড়ে খুব সামান্যই। গোটা পরিকল্পনাকাল জুড়ে এই এলাকা ছিল ১৯৭৯/৮০ সালের এলাকার চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রায় ২৫% কম এবং এই সময়ে ঘন ঘন প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে পাটের ফলন ভালো না হওয়ায় আনুপাতিক মূল্যের হিসেবে পাটের বাজার থেকে এই ঘাটতি পোষানোর হার ছিল নগণ্য। এসময় পাট চাষের এলাকা এবং তার মূল্য দুটোই ছিল নিম্নস্তরে সীমিত। কিন্তু ১৯৮৪/৮৫ সালে পাট এত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, এ সময়ে বাজারে পাটের দাম দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মূল্যহারে সমগ্র পরিকল্পনাকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়। এ বছরের শেষে পাটের মজুদ ছিল বছরের ওপেনিং ষ্টকের প্রায় অর্ধেক (৮ নং সারণিতে দ্রষ্টব্য)। এ অবস্থা এবং পাটের উচ্চতর মূল্য পরিস্থিতি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাট উৎপাদনে ব্যবহৃত জমির স্থিতিশীলতা বাহ্যত বিঘ্নিত করতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই নিম্নমুখী মজুদের ফলে বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাতদ্রব্যের চাহিদা পূরণের স্বার্থে উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে।

১.৩৯। আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ পাট পরিস্থিতি স্বাধীনতাত্তোরকালে এমন একটা অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে যে কৃষি উন্নয়নে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রশ্নটি প্রধান চালিকা শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যমাত্রা হলো স্থিতিশীলভাবে বছরে ৬০ লাখ বেল পাট উৎপাদন নিশ্চিত করা। আভ্যন্তরীণভাবে কাঁচা পাটের উৎপাদন স্থিতিশীল হলে বহির্বিশ্বের কাঁচা পাট ও পাটজাতদ্রব্যের বাজারেও স্থিতিশীলতা আসতে বাধ্য। কারণ বাংলাদেশ হলো এই উভয় পণ্যের প্রধান রপ্তানিকারক। কিন্তু এই স্থিতিশীলতা বিধানের জন্য প্রধান পূর্বশর্ত হলো উন্নতজাতের পাটবীজ ব্যবহার এবং তা কৃষকদের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। পাটের উৎপাদন এখন পর্যন্ত সাবেক আই.জে.সি.এস. (I.J.C.S.) এলাকায় সীমিত এবং গত ১০ বছর যাবৎ প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও তার উৎপাদন মোটামোটি স্থিতিশীলই রয়েছে এবং আই.জে.সি.এস.-বহির্ভূত এলাকার তুলনায় এর উৎপাদন ৮০% থেকে ৯০% বেশী। যা হোক, পাট উৎপাদন প্রাকৃতিকভাবে আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল; ফলে উৎপাদনে ব্যাপক উঠানামা পরিলক্ষিত হবে। সুতরাং উন্নত চাষাবাদ এবং উন্নতমানের বীজ ব্যবহারের উপর জোর দেয়া ছাড়াও কৃষকদের পাটচাষে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিপণন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে ফলন ভালো হলেও আভ্যন্তরীণ বাজারে তা যথাযথভাবে বিক্রি করা যায়, আবার ফলন খারাপ হলেও মিল ও বহির্বিশ্বের আমদানিকারকদের কাছে এর সরবরাহ অব্যাহত রাখা যায়।

সারণি ৮

পাট চাষাধীন এলাকা, উৎপাদন, আপেক্ষিক মূল্য ও রপ্তানি

বছর	চাষাধীন এলাকা (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)	পাট-ধান-এর তুলনামূলক মূল্য	রপ্তানি (হাজার টন)	পাটের ক্লোজিং ষ্টক (হাজার টন)
১৯৭৫—৮০					
মেয়াদের গড়	১৭২২	৯৪৭	০.৮২৩	৭৮৫	—
১৯৭৯/৮০	১৮৭৪	১০৬৫	০.৩৬৮(২)	৮৪৫.৭	৭৯৫.৭
১৯৮০/৮১	১৫৬৯	৮৮৩	০.৬০৫	৮৬৪.৯	৬১১.৪
১৯৮১/৮২	১৪১২	৮৩০	০.৬২১	৮৯৫.১	৩৩০.৮
১৯৮২/৮৩	১৪২৫	৮৭২	০.৬৩৪	৯২৯.০	—
১৯৮৩/৮৪	১৪৩৫	৯১১	০.৮৩১	৮৬৩.৭	—
১৯৮৪/৮৫	১৪৮৫	৮১৭	—	৭৩৭.০	—
১৯৮০—৮৫					
মেয়াদের গড়	১৪৬৫	৮৬৭	—	৮৫৮.৯	—

টীকা :—(১) রপ্তানি পাট ও পাটজাতদ্রব্য উভয়ের সম্মিলন।
(২) ১৯৭৯/৮০ সালে আনুপাতিক মূল্য হ্রাসের একটি কারণ হলো পাটের মানের অবনতি।

অন্যান্য অপ্রধান শস্য

১.৪০। ডাল : ডাল দেশের সাধারণ মানুষের প্রোটিন লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কিন্তু মাথাপিছু ডালের ব্যবহার ১৯৬২—৬৪ সালের ২৮ গ্রাম থেকে মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়ে ১৯৭৫/৭৬ সালে ২৪ গ্রামে এবং ১৯৮১/৮২ সালে মাত্র ৮ গ্রামে নেমে আসে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে ডালের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হ্রাস এই নিম্নমুখী মাথাপিছু ডাল প্রাপ্তির প্রধান কারণ। ১৯৬৯/৭০ এবং ১৯৮১/৮২ সালের মধ্যে ডালের উৎপাদন ২৯% হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন প্রকার ডাল চাষাধীন এলাকা ১৯৬৯/৭০ সালের ৯.২ লাখ একর থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৮১/৮২ সালে ৭.৬ লাখ একরে এবং ১৯৮২/৮৩ সালে ৭.৪ লাখ একরে নেমে এসেছে। ডালের একর প্রতি উৎপাদনও প্রাক-স্বাধীনতা স্তরের নিম্নে অবস্থান করছে।

১.৪১। বাংলাদেশে অনেক জাতের ডাল পাওয়া যায়। তবে প্রধান জাতের ডাল হলো খেসারী (প্রায় এক তৃতীয়াংশ) যা গরীব জনগোষ্ঠির প্রোটিন হিসেবে পরিচিত। কিন্তু খেসারীতে রয়েছে নিউরোটক্সিন যা প্রধান খাদ্য হিসেবে নিয়মিত এবং দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহার করলে ল্যাথাৰ্জী বা অবসাদগ্রস্ততা রোগের কারণ হয়। ন্যূনতম বিনিয়োগে দেশে এই শস্য সহজেই উৎপাদন সম্ভব। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্বল্পমাত্রার (০.২%) বিওএএ (BOAA) সহ উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল খেসারী বীজ উদ্ভাবন করেছে যা নিবিড় চাষের জন্য সরবরাহ করা হবে।

১.৪২। তৃতীয় পরিকল্পনায় শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচীর অধীনে বীজ ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে ডালের উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা রোধের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ১৯৮৯/৯০ সালে সকল প্রকার ডাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩.০ লাখ টনে স্থির করা হয়েছে।

১'৪৩। **তৈলবীজ ঃ** বাংলাদেশে বিভিন্ন রকমের ভোজ্যতেলের শস্য উৎপাদিত হলেও ভোজ্যতেল এবং তৈলবীজের ক্ষেত্রে দেশ আমদানির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ১৯৮২/৮৩ সালে মাথাপিছু বার্ষিক ১'৮৩ কেজি হিসেবে দেশে ভোজ্যতেলের চাহিদা ছিল ১'৭১ লাখ টন। দেশের উৎপাদিত ২'৫২ লাখ টন তৈলবীজ থেকে এ চাহিদার মধ্যে ০'৭৬ লাখ টন যোগান দেয়া সম্ভব হয়। ১৯৮৯/৯০ সালে দেশের ১১'১০ কোটি লোকের জন্য ভোজ্যতেলের চাহিদা দাঁড়াবে ২'০২ লাখ টন। তাই ১৯৮৯/৯০ সালে সরিষা এবং সিসেম-এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩'৫০ টনে যা থেকে ১'১২ লাখ টন ভোজ্যতেল পাওয়া যাবে, ফলে ঘাটতি থাকবে ০'৯০ লাখ টন। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তুলা বীজ, ধানের তুষ, চীনা বাদাম প্রভৃতি দেশীয় বিকল্প উৎস থেকে ভোজ্যতেল উৎপাদনের কর্মসূচী নেয়া হবে। দেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের বেলে মাটিতে চীনা বাদাম চাষের উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। এই মাটিতে ফলনও বেশ ভাল হবে।

১'৪৪। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান নীতি হচ্ছে কৃষকদের অধিক ফলনশীল বীজ ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ সরবরাহসহ ব্যাপক উৎপাদন কর্মসূচী প্রণয়ন ও উন্নত বিপনন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি উৎসাহব্যঞ্জক স্থিতিশীল মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান।

১'৪৫। **মসলা ঃ** বাংলাদেশের কৃষি-আবহাওয়া সুগন্ধি মসলাসহ বিভিন্ন প্রকার মসলা চাষের উপযোগী। বাংলাদেশে মসলা আবাদে ব্যবহৃত মোট জমির শতকরা প্রায় ৯৭'৮ ভাগেই চাষ হয় মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ ও ধনিয়া এই ছয়টি প্রধান মসলা। আর এগুলোর উৎপাদন মোট মসলা উৎপাদনের ৯৮'৩% ভাগ। গত এক দশকে আদা ও হলুদের উৎপাদনে কিছুটা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা গেছে (২'৭৮% ও ১৯'০৫%), কিন্তু প্রধান মসলা মরিচ, পেঁয়াজ ও রসুনের উৎপাদন কমে গেছে। মসলা আবাদের মোট জমির পরিমাণ ১৯৬৯/৭০ সালের ৪'২১ লাখ একর থেকে ধীরে ধীরে কমে গিয়ে ১৯৮১/৮২ সালে ৩'৭২ লাখ একরে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে মসলা উৎপাদনও ৩'৭৮ লাখ টন থেকে কমে হয়েছে ২'৮৮ লাখ টন। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, উৎপাদন হ্রাসের এক-তৃতীয়াংশ ঘটেছে জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন হ্রাসের জন্য দায়ী একর প্রতি উৎপাদন হ্রাস।

১'৪৬। দেশীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে কৃষকরা স্থানীয় জাত থেকে বর্তমানে মসলার যে উৎপাদন পাচ্ছে তার থেকে উৎপাদন সম্ভাবনা অনেক বেশী। তৃতীয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত জমি ব্যবহার না করে বরং উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে পাহাড়ী জমি, বাগান, রাস্তার পাশে ও বনাঞ্চলে আন্তঃফসল চাষ পদ্ধতির আওতাধীনে মসলা চাষ। অধিক ফলনশীল জাত উন্নয়নে সুনির্বাচিত গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনায় মসলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩'২৫ লাখ টন। যেহেতু অনেক মসলাই পচনশীল তাই তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে মসলা গুদামজাত করা, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করার কর্মসূচীকে উৎসাহ দেয়া উচিত।

১'৪৭। **তুলা ঃ** বার্ষিক তুলা আমদানির পরিমাণ প্রায় ২'৫ লাখ গাঁইট। দেশের স্পিনিং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবিষ্যতে তুলার চাহিদা আরো বাড়বে। ১৯৮৪/৮৫ সালে তুলা আমদানিতে ৭ কোটি ডলার ব্যয় হয় যা রফতানী আয়ের প্রায় ৮%। বৈদেশিক মুদ্রা ও লেন-দেনের ভারসাম্যের উপর চাপ কমানোর জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিকভাবে ৩ লাখ গাঁইট তুলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ও পরে তা কমিয়ে প্রায় অর্ধ লক্ষ (০'৫৬ লাখ) গাঁইট ধার্য করা হয়। কিন্তু ১৯৮৪/৮৫ সালে প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১২ হাজার গাঁইট। তুলাচাষের জন্য উপযুক্ত কৃষি আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও সেচ নির্ভর হওয়ায় ও এর বাজার দামের নিশ্চয়তা না থাকায় তুলাচাষ ধান চাষের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। ধানের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা মনে রেখে তৃতীয় পরিকল্পনায় ১'০ লাখ গাঁইট তুলা উৎপাদনের মাঝারি লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। লেন-দেনের ভারসাম্যের উপর চাপ কমানোর জন্যে বরং সুতী বস্ত্র ও তৈরী পোষাক রপ্তানির উপর জোর দেয়া হবে।

১'৪৮। ভাল বীজ ও জমির অভাব এবং বাজারজাত করার অসুবিধার কারণে কুমিল্লা কটন চাষের জমির পরিমাণ দ্রুত কমে গেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ১৩,৮০০ গাঁইট তুলা উৎপাদনের জন্যে প্রায় ৩৫,০০০ একর পাহাড়ী জমি কুমিল্লা কটন চাষের আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১'৪৯। **আখ ঃ** অর্থকরী ফসলের মধ্যে আখের স্থান তৃতীয়। আর দেশের কৃষিভিত্তিক শিল্পের মধ্যে চিনি শিল্পের স্থান দ্বিতীয়। বাংলাদেশে আখের ফলন কম এবং এই আখ থেকে চিনিও কম পাওয়া যায়। আখের একর প্রতি গড় উৎপাদন প্রায় ১৮ টন ও এই আখ থেকে চিনি পাওয়া যায় ৮% এরও কম। তাই বর্তমানে বিভিন্ন জাতের আখের ফলন বৃদ্ধি ও আখ থেকে চিনি প্রাপ্তির পরিমাণ বাড়ানো এবং সম্প্রসারণ কর্মসূচী এই উভয় সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে এমন অল্প কয়েক প্রকার নতুন জাতের আখবীজ উদ্ভাবন করা হয়েছে। কিন্তু কেবল মান খারাপ হওয়ার জন্যে নয় বরং ধানের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে সেচের আওতাভুক্ত আখের জমি কমে যাওয়ায় উন্নত জাতের ইক্ষুবীজ ব্যবহার অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সেচের আওতাভুক্ত আখ চাষের জমির পরিমাণ ১৯৭০/৭১ সালের রেকর্ড মাত্রা ২৭'২ হাজার একর থেকে ১৯৮৩/৮৪ সালে ১৯'৬ হাজার একরে নেমে আসে। আখ চাষের মোট জমি প্রায় ৪'০০ লাখ একর এবং শতকরা হিসেবে সেচের আওতাভুক্ত আখের জমির পরিমাণ নগণ্য। এতদসত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে, ফলন বৃদ্ধি পানি ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে। আখের ফলন এখনও ১৯৬৯/৭০ সালের স্তর থেকে অনেক নীচুতে অবস্থান করছে। স্বাধীনতার পর থেকে অবস্থা একই পর্যায়ে রয়ে গেছে অর্থাৎ এই মধ্যবর্তী পরিস্থিতির কোন উন্নতিই হয়নি।

১'৫০। ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪'৫০ লাখ একর জমিতে ৭০'০০ লাখ টন আখ উৎপন্ন হয়। উন্নত জাতের সাহায্যে নিবিড় উৎপাদন কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৯৮৯/৯০ সাল নাগাদ একই পরিমাণ জমিতে ৮২'০ লাখ টন আখ উৎপাদনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

১'৫১। তামাক ঃ তামাক দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। গুরুত্বের দিক থেকে পাট ও আখের পরই এর স্থান। ১৯৭৩/৭৪ সাল থেকে তামাকের জমি ও তামাক উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে। জমির পরিমাণ ১৯৭৩/৭৪ সালের ১'১৫ লাখ একর থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১'৫০ লাখ একরে দাঁড়ায়। আর উৎপাদন ৪১,০০০ টন থেকে বেড়ে ৫৪,০০০ টনে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ একর প্রতি উৎপাদন কার্যতঃ বাড়েনি। স্থানীয় জাতের পরিবর্তে ভার্জীনিয়া জাতের তামাক চাষ করা হলেও এর উৎপাদন ১৯৭৬/৭৭ সালের সর্বোচ্চ মাত্রার (৬১ হাজার টন) নীচেই রয়ে গেছে।

১'৫২। বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদা কমে যাওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তামাক উৎপাদন বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তামাক শিল্পে উৎপাদন ৫ বছরে খুব সামান্যই বেড়েছে—প্রায় ৭%। তবে আভ্যন্তরীণ চাহিদা কমে যাওয়ায় রপ্তানিভিত্তিক নতুন বাজার উন্মুক্ত হয়েছে। আগে রপ্তানি আয় ছিল দশ লাখ ডলারের এক-দশমাংশেরও কম। ১৯৮১/৮২ সালে তা বেড়ে ১০'০ লাখ ডলার ছাড়িয়ে যায় ও ১৯৮৩/৮৪ সালে ৩০'০ লাখ ডলারে পৌঁছে। এসিভি'র পরিবর্তে একসিভি অবলম্বনের মাধ্যমে তামাক পাতা রফতানির উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

১'৫৩। তৃতীয় পরিকল্পনা কালের শেষ নাগাদ দেশে ৬০,০০০ টন তামাক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। সংরক্ষণ প্রক্রিয়া উন্নত করা হলে ও একর প্রতি উৎপাদন বাড়ানো হলে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কঠিন হবে না। নতুন জাত 'বারি তামাক' চাষ উৎসাহিত করা হবে। বিশ্ব বাজারে এই জাতের চাহিদা বেশী। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটেরও দু'টি উন্নত জাতের এসিভি রয়েছে। এগুলোর উৎপাদন ১৫% বেশি।

১'৫৪। **চা ঃ** চা হচ্ছে বাংলাদেশে আবাদভিত্তিক শিল্প, যা আখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। চা চাষাধীন জমির পরিমাণ ১১২,০০০ একর ও এই শিল্পে ১'৫০ লাখ শ্রমিক কাজ করে। রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ আসে চা থেকে। চায়ের উৎপাদন বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৯'৬৮ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে।

১৯৬৯/৭০ সালে তা ছিল ৬'৩০ কোটি পাউণ্ড ও ১৯৭৯/৮০ সালে ছিল ৮'১০ কোটি পাউণ্ড। অর্থাৎ ১৯৭৯/৮০ সাল পর্যন্ত উৎপাদন বার্ষিক ২'৯% হারে ও ১৯৮৪/৮৫ সাল পর্যন্ত ৩'৫% হারে বেড়েছে। অবশ্য জমির পরিমাণ কার্যতঃ একই থেকে গেছে। একর প্রতি উৎপাদন ১৯৬৯/৭০ সালের ৫৮৪ পাউণ্ড থেকে বেড়ে ১৯৭৯/৮০ সালে ৮২১ পাউণ্ড ও ১৯৮৪/৮৫ সালে ৮৬০ পাউণ্ডে দাঁড়ায়।

১'৫৫। চা উৎপাদন ৯'৬৮ কোটি পাউণ্ড থেকে বাড়িয়ে ১৯৮৯/৯০ সাল নাগাদ ১১'৫০ কোটি পাউণ্ডে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। চা বাগানগুলোর পুনর্বাসন ও নতুন করে চা গাছ লাগানোর একটি কর্মসূচী বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। এর ফলে ফলনের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের জড়তা কেটে যাবে। তবে চায়ের গবেষণা তৎপরতা বাড়ানোর বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রধান প্রধান চা উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশেই চায়ের ফলন সবচেয়ে কম। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষার্ধে অর্জিত উৎপাদনের সুফলকে মুনাফা হিসেবে কেটে রাখার কাজে না লাগিয়ে বরং চা বাগানগুলোর উন্নয়নের কাজে লাগানো উচিৎ। মুনাফাকে আবার পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যেই ইজারা দেয়ার মেয়াদ বাড়িয়েছেন।

১'৫৬। **আলু ঃ** আলু চাষাধীন এলাকা ১৯৬৯/৭০ সালের ২'১১ লাখ একর থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২'৭২ লাখ একরে উন্নীত হয় এবং আলুর উৎপাদন ৮'৫১ লাখ টন থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে দাঁড়ায় ১৩'০ লাখ টনে। একই সময়ে একর প্রতি আলুর উৎপাদন বেড়ে ১০৯'৭ মণ থেকে ১৩০'০ মণে উন্নীত হয়। একর প্রতি এই বৃদ্ধির পুরোটাই অর্জিত হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এবং এর আগের বছরগুলোতে উৎপাদন বরং কমে গিয়েছিল। মৌসুমী ফল এবং ধানের তুলনায় আলুর আনুপাতিক মূল্য কমে যাওয়ার পরেও আশ্চর্যজনকভাবে কেবলমাত্র ১৯৮২/৮৩ সাল ছাড়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যান্য বছরগুলোতে আলুর চাষ ও উৎপাদনে সম্প্রসারণের হার অব্যাহত থাকে ও এর চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর আরও সম্প্রসারণ মূলতঃ দুটি বাধার সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমতঃ আলু সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়তঃ রোগমুক্ত বীজ সরবরাহের অপর্যাপ্ততা। আলুর বিক্রয় ব্যবস্থার নিশ্চিত করার জন্য এর চাষ বহুমুখীকরণ এবং হিমাগারগুলোর ধারণ ক্ষমতাও বাড়াতে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে ৩'০ লাখ একর জমিতে ১৭'০ লাখ টন আলু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আলু চাষে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা এবং জীবাণুমুক্ত বীজ ব্যবহারের গবেষণাভিত্তিক তৎপরতা চালাতে হবে।

১'৫৭। **মিষ্টি আলু ঃ** মিষ্টি আলু একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য শস্য। বিশেষ করে আমন চাষ বিঘ্নিত হলে এটি তার গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। মিষ্টি আলু ক্যারোটিন জাতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ যা আলুর চাইতে উন্নত মানের। ১৯৭৫—৮৩ সালে মিষ্টি আলুর উৎপাদন প্রান্তিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৬'৮০ লাখ টন থেকে ৭'০২ লাখ টনে দাঁড়িয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে কতিপয় উন্নতমানের বীজের উদ্ভাবন তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মিষ্টি আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

১'৫৮। **ফল ও শাকসবজী ঃ** বাংলাদেশের মোট চাষাধীন এলাকার ৪ শতাংশ জমিতে ফলমূল, বাদাম, শাকসব্জী ইত্যাদি জন্মে। বৃক্ষজাতীয় শস্য হিসাবে ফল শুধুমাত্র ভিটামিন সরবরাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করে না, উপরন্তু কাঠ ও জ্বালানী সরবরাহ এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বিধানেও অবদান রাখে। শাকসব্জী হলো ভিটামিন-এ'র সুলভতম উৎস যার অভাবে বিশেষ করে শিশুরা অন্ধত্বে আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশের মৃত্তিকা ও আবহাওয়া অসংখ্য রকমের ফল ও শাকসব্জী উৎপাদনের উপযোগী কিন্তু প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশে ফলের উৎপাদন ক্রমশঃ কমে আসছে। মাথাপিছু বার্ষিক ফল গ্রহণের পরিমাণ ১৯৫০ সালে ছিল ৩০ কেজি যা ১৯৮৩ সালে মাত্র ১৬ কেজিতে নেমে এসেছে। একই সময়ে মাথাপিছু শাকসব্জী গ্রহণের পরিমাণ ২১ কেজি থেকে ১১ কেজিতে হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে শাকসব্জীর একর প্রতি উৎপাদন ৮'০১% হ্রাস পাওয়ায় এর মোট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ৪'৯৮%। এ অবস্থায় বাংলাদেশের ৮৫% লোক প্রোটিন ঘাটতিতে ভুগছে; ৪০% লোক পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-'এ' পাচ্ছে না এবং ৩০% লোক লৌহজাতীয় খণিজ ঘাটতির শিকার হচ্ছে। এই পরিস্থিতি রোধকল্পে

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গাছ লাগানো প্রক্রিয়া জোরদার করে, বীজ ও চারা সরবরাহ করে এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ফল ও শাকসব্জীর উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর ফলে শুধু আভ্যন্তরীণ চাহিদাই পূরণ হবে না, ভবিষ্যৎ রপ্তানীবাজার অনুসন্ধানও সহজতর হবে। ফল ও শাকসব্জী প্রধানতঃ মৌসুমী ও পচনশীল বলে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দানের মাধ্যমে এগুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা নেয়া হবে। একই সাথে কিছু সংখ্যক শাকসব্জী সারাবছর চাষের উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যেও গবেষণা কার্য হাতে নেয়া হবে। অন্যান্য দেশসমূহে এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ব্যহলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে একটি মধ্যমেয়াদী উদ্যান উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

কৃষি উপকরণ কর্মসূচী

১.৫৯। **সার** : আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় কৃষিজাত শস্যের ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার পর থেকে সারের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বাড়ছে। সার বিতরণের পরিমাণ ১৯৭৩/৭৪ সালে ছিল ৩.৮০ লাখ টন যা বছর প্রতি ১১.৫% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১২.৬০ লাখ টনে পৌঁছেছে। এর পরেও অন্যান্য যে সব দেশ ধান উৎপাদনে অনুকূল প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে তাদের তুলনায় এদেশে সারের ব্যবহার নিম্নপর্যায়ে অবস্থান করছে। ১৯৮৪/৮৫ সালে বাংলাদেশে একর প্রতি রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২১.৬ কেজি যা ১৯৮২ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় ছিল ১১৪ কেজি। বাংলাদেশে চালের স্বল্প ফলনের অন্যতম কারণ হল এই যে এদেশের মৃত্তিকায় যথাযথভাবে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় না। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশে একর প্রতি ধান উৎপাদিত হয় ৮১৫ কেজি যা দক্ষিণ কোরিয়ায় ছিল ২৪৯০ কেজি। বাংলাদেশের তুলনায় শ্রীলংকায়ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ (একর প্রতি ২৮.৭ কেজি) এবং একর প্রতি ধানের ফলন (১১৭০ কেজি) বেশী। ১৯৮৪/৮৫ সালে বাংলাদেশে বিতরণকৃত মোট ১২.৬০ লাখ টন সারের মধ্যে ইউরিয়া, টি এস পি, এম পি এবং অন্যান্য সারের অংশ ছিল যথাক্রমে ৬৬%, ২৭%, ৬% এবং ১%। এর মধ্যে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রাধান্যই বেশী তবে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশকৃত ডোজের তুলনায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়ই ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবে চারা গাছের জন্য ভারসাম্যময় পুষ্টি সরবরাহ রক্ষা এবং মৃত্তিকার পুষ্টির প্রয়োজনীয়তার সংগে এই ভারসাম্যময় সার ব্যবহারের প্রশ্নটি বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। ১৯৮১/৮২ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সার ব্যবহারের সময় ইউরিয়া ব্যবহার দুই তৃতীয়াংশ হলেও ধান কেটে নেওয়ার পর জমিতে নাইট্রোজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। এর কারণ হলো এই যে, মৃত্তিকার পুষ্টি এবং ফসল ফলানোর তুলনায় আমাদের দেশে সার্বিকভাবে সার প্রয়োগ করা হয় কম। কাজেই ভারসাম্যময় ডোজের প্রশ্নটি শুধু অনুপাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, নাইট্রোজেন সার কম বা বেশী ব্যবহারের উপরও তা নির্ভর করছে। ধান উৎপাদনে ফসফেটের তুলনায় চারগুণ বেশী নাইট্রোজেন দরকার হয় অথচ মৃত্তিকায় ফসফেটের তুলনায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ দ্বিগুণ। অথচ এদেশে কৃষকেরা নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করে তাদের সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে। একথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, নাইট্রিফিকেশনের ফলে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন সার এবং ফিক্সেশনের ফলে ফসফেট সার নষ্ট হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সার বিতরণ বাড়াতে গেলে সে-অনুসারে উৎপাদন উপকরণের মূল্যনীতি এর অনুকূলে প্রণয়ন করে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১.৬০। অধিক ফলনশীল ধান, গম এবং অন্যান্য ফসল চাষের জন্য সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণের সাথে সাথে ১৯৮৯/৯০ সালে ১৮.৮৫ লাখ টন সার বিতরণ করা হবে বলে হিসেব করা হয়েছে যা নীচের সারণিতে দেখানো হলো :

সারণি ৯

সার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

সার	একক	১৯৮৪/৮৫	১৯৮৯/৯০
ইউরিয়া	হাজারটন	৮৩২	১,২০৬
টি এস পি	,,	৩৪৬	৫৫৪
এম পি	,,	৭১	১০৫
অন্যান্য	,,	১১	২০
মোট :	,,	১,২৬০	১,৮৮৫

১'৬১। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সার বিতরণের ক্ষেত্রে বিএডিসি'র তৎপরতা একটি বাফার ষ্টক গড়ে তোলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে, খুচরা বিতরণের ভার বেসরকারী ডিলারদের হাতে ন্যস্ত করে মান নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উন্নতমানের বীজ

১'৬২। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত বীজ সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করতে গিয়ে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেগুলো হলো: (১) চাষীদের অধিক ফলনশীল উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সার্টিফিকেশন ও সরবরাহ, (২) বীজ প্রযুক্তির সংগে চাষীদের পরিচিতকরণ এবং (৩) প্রত্যেকটি চাষীকে বিশেষ করে চুক্তিভিত্তিক চাষীদের উন্নত বীজ ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান।

১'৬৩। ধান, গম, আলু, শাকসব্জী, ডাল ও তৈলবীজ ইত্যাদির উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, বর্দ্ধন এবং সরবরাহের দায়িত্ব বিএডিসি'র উপর ন্যস্ত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো অধিক ফলনশীল বীজ উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো জেনেটিক্যালী কোয়ালিফাইড বীজ উদ্ভাবন করে এবং এগুলি মূল বীজ হিসাবে বর্দ্ধন করা হয়। তারপর সেগুলো বিএডিসির নিজেদের খামারে বা চুক্তিভিত্তিক এবং নিবন্ধনকৃত উৎপাদনকারীদের মাধ্যমে আরও বর্দ্ধন করার জন্য বিএডিসি'র কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ সমস্ত বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাত এবং সংরক্ষণ করে সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে তা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিএডিসি'র বিতরণকৃত বীজ কেবলমাত্র অংশ বিশেষের চাহিদা মেটাতে পারে এবং চাষীরা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে সেগুলোর ব্যবহার সম্প্রসারিত করে। এই দ্বৈত ব্যবস্থা অপসারণ করে চাষীদের হাতে সরাসরি উন্নতমানের বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বীজ প্রযুক্তি, সেগুলোর বিপনন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ, সরবরাহ প্রভৃতি বিকেন্দ্রায়িত করে এ সমস্ত কাজ চাষীদের মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক চাষীদের মাধ্যমে যথাযথ তত্ত্বাবধানে বীজ উৎপাদনকারী জোনে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব। সেজন্যই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে চুক্তিভিত্তিক ও নিবন্ধনকৃত চাষীদের মাধ্যমে সার্টিফায়েড বীজ উৎপাদনের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে জোরদার করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১'৬৪। চাষীদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে অধিক ফলনশীল বীজের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচীগুলো গ্রহণ করা হবে:

সারণি ১০

বীজ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

শস্য	একক	স্থিতাবস্থা (১৯৮৪/৮৫)	লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৯/৯০)
ধান	হাজার টন	৩'২৮	১০'৩৩
গম	,,	১৯'৫২	২৭'৬০
আলু	,,	৩'৬১	৪'০০
পাট	,,	১'২৪	৩'০০

উদ্ভিদ সংরক্ষণ সার্ভিস

১'৬৫। বাংলাদেশের উষ্ণমণ্ডলীয় আবহাওয়া শস্যক্ষেত্রে এবং গুদামে উভয় স্থানে কীটপতংগ ও রোগবালাই বিস্তারের অনুকূলে। এর ফলে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ফসল বিনষ্ট হয়। ইউরিয়া সার ব্যবহারে চারাগাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে চারা গাছে কীট পতংগের আক্রমণের সমূহ আশংকা দেখা দেয়। আবার যে কোন উন্নতমানের বীজ দিয়ে চাষ করলে তাতে রোগ আক্রমণের আশংকা থাকে। সেজন্যই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন শস্যের চাষ ও বর্ধিত উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ তৎপরতার উপর উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, উদ্ভিদ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের কম বেশী টক্সিক এফেক্ট রয়েছে এবং তা মাছ, উপকারী কীটপতংগ ইত্যাদির ক্ষতি করতে পারে বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। সেজন্যই কীটনাশকের ব্যবহার বহুলভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। ডিডিটি, লিনডেইন, এনড্রিন, টক্সাফেন প্রভৃতি কয়েক জাতের কীটনাশক ব্যবহার আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য বাকী কীটনাশকগুলোকেও যথার্থ পর্যবেক্ষণাধীনে রাখতে হবে। এর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার অন্যথা যে কীটনাশকের ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে বেসরকারী খাতে ন্যস্ত। যেহেতু মাঠ পর্যায়ে কীটনাশক ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা দুঃসাধ্য, সেহেতু পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে বিমান থেকে কীটনাশক ছড়ানোর পদ্ধতি পোকা দমনে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। নিয়ন্ত্রণমূলক এ সমস্ত পদক্ষেপ ছাড়াও রোগপ্রতিরোধক এবং জৈবনিয়ন্ত্রিত জাতের বীজ উৎপাদনের প্রতিও যথাযথ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ

১'৬৬। কৃষি সম্প্রসারণের যুক্তিগত ব্যাখ্যা হলো নতুন প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং সংগতভাবেই আমাদের দেশে মাঠ পর্যায়ে তা অনুপস্থিত। আমাদের দেশে সম্প্রসারণ কর্মসূচী বিশেষভাবে জোরদার করা হয়েছে এবং কৃষি সম্প্রসারণের জন্য বেশ কতকগুলো সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৩টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান কৃষি সম্প্রসারণ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষ এবং কার্যকর কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সম্প্রতি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ৬টি ডাইরেক্টরেটকে একীভূত করে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ (ডি এ ই) নামক নতুন একটি সংগঠনের গোড়াপত্তন করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে ব্লক সুপারভাইজার পদে প্রায় ১০,০০০ পল্লী সম্প্রসারণ প্রতিনিধি (ভিইএ) নিয়োগ করা হয়েছে। উপরন্তু বাহ্যিক জ্ঞান এবং গবেষণাগারে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য উত্তর পশ্চিম অঞ্চল এবং বরিশাল-পটুয়াখালী সেচ প্রকল্পের মতো এলাকাভিত্তিক মাঠ প্রশিক্ষণ ও সরেজমিন পরিদর্শনের (টি এণ্ড ভি) পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণদানের জন্য পর্যাপ্ত। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন এমন এক ব্যবস্থার উদ্ভাবন যাতে কৃষিকর্মীদের এলাকা ভিত্তিক কৃষি সম্পর্কীয় জ্ঞান আরো সম্প্রসারিত হবার সুযোগ পায়। এছাড়া মাঝারি ধরনের সেচ যন্ত্র ব্যবহারের নিমিত্তে কৃষকেরা যেখানে জোটবদ্ধভাবে কাজ করছে সে সমস্ত জোটকে উপকরণ সংগ্রহ, বিপণন ও প্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরো কার্যকরভাবে সংগঠিত করতে হবে।

কৃষি গবেষণা

১'৬৭। বর্তমানে নয়টি প্রধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান কৃষি গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছে এবং তারা প্রধানতঃ এক ফসলী কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছে। পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পাট, ধান, ইক্ষু, চা প্রভৃতি শস্য নিয়ে গবেষণা করছে। কেবলমাত্র বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বহুমুখী চাষ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছে ও সবগুলো ফসল উন্নয়নের সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। একমুখী বা বহুমুখী যে কোন ফসল নিয়েই কাজ করুক না কেন গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর চেষ্টা করা উচিত যাতে

তাদের গবেষণার ফলাফল শুধু পুঁথিগত ও ল্যাবরেটরী ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে মাঠ পর্যায়েও অনুসৃত হয়। অতীতে দেখা গেছে, বেশ কিছু গবেষণার সুফল কৃষক ও মাঠ পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছেনি এবং একমাত্র বোরো ধান ছাড়া কোন গবেষণাই পর্যাপ্ত বাস্তব ফলাফল দেখাতে পারেনি। কেবলমাত্র বোরো ধানেরই ৫টি পৃথক জাতের বীজ উদ্ভাবিত হয়েছে। পাটের ক্ষেত্রে বলাকা ও দোয়েল নামের দুটি স্থানীয়ভাবে উন্নত বীজ উদ্ভাবনের পর বাজারজাত করা হলেও কৃষকেরা এখন পর্যন্ত সোনালিকা বীজের প্রতিই বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছে।

১'৬৮। প্রকৃতপক্ষে বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গবেষণা কার্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বলেই নানারকম সমস্যার উদ্ভব ঘটছে। এর ফলে শুধু সুষ্ঠু ও দক্ষ প্রশাসনিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে না, সীমিত তহবিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টন-বরাদ্দ করে গবেষণা কার্য সমন্বিতকরণেরও সমস্যা হচ্ছে। এর ফলে গবেষণার সুফলের চাইতে প্রতিষ্ঠান বিশেষের যোগ্যতা ও দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে বেশী মাথা ঘামাতে হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ ধরনের গবেষণাকর্মের নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, তথাপি কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে গবেষণাক্ষেত্রে প্রকৃত অগ্রাধিকার নিরূপণ করার সমস্যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা জুড়ে একটি খামার গবেষণা পদ্ধতি (এফ আর এস) উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে যা কৃষকদের একফসলী চাষের পরিবর্তে বহুফসলী চাষ এবং আন্তঃশস্য সম্পর্কের অর্থনীতি সম্পর্কে কৃষকদের পর্যাপ্ত সাহায্য ও জ্ঞান বিতরণ করবে।

কৃষি শিক্ষা

১'৬৯। বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার সুদীর্ঘ ইতিহাস সর্বজনবিদিত। ১৯৩৮ সালে ঢাকায় দেশের প্রথম কৃষি কলেজ স্থাপন করা হয়। এতে রয়েছে পুঁথিগত জ্ঞান ও মাঠ পর্যায়ের চর্চার সহাবস্থান। বর্তমানে দেশে বিদ্যমান কৃষি শিক্ষার অবকাঠামোমূলক ভিত্তি বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষি বিশেষজ্ঞ ও সম্প্রসারণ কর্মী তৈরী করে দেশের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট। এই শিক্ষাব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠান যেগুলো কৃষি বিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে চাকুরী-পূর্ব পেশাদার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এগুলো হলো ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি কলেজ। এছাড়াও আরো দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ধুনকী-তে অবস্থিত কৃষি কলেজ কৃষি বিজ্ঞানে স্নাতক পর্যায়ে এবং স্নাতকোত্তর কৃষি শিক্ষা ইনস্টিটিউট (আই পি এস এ) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা বিস্তার করছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো সুসংগঠিত করা হবে। । কৃষি সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা পরিদপ্তরের অধীনে সম্প্রসারণ কর্মী (ব্লক সুপারভাইজার) পর্যায়ে চাকুরী ও প্রশিক্ষণদানের জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (এ টি আই) চাকুরী -- পূর্ব ও ডিপ্লোমা পর্যায়ে কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষাদানও অব্যাহত রয়েছে। যেহেতু এই পরিদপ্তরকে পুনর্গঠিত করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংগে একীভূত করা হয়েছে সেহেতু এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকেও আরো সম্প্রসারিত করতে হবে যাতে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমাধারীরা বহুমুখী কার্য সম্পাদনে সক্ষম হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শান্তিভাংগায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করা হবে। এর জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১'৭০। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত পুঁথিগত জ্ঞান এবং মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা এই দুইয়ের মধ্যেকার দুর্বল সেতুবন্ধন হলো কৃষিবিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রধান দুর্বলতা। গবেষণার মত কৃষি শিক্ষার অবকাঠামোমূলক ভিত্তি গড়ে উঠার সংগে সংগে এই শিক্ষাকে মাঠ পর্যায় থেকে সরিয়ে এনে ক্রমশঃ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হচ্ছে। কৃষি শিক্ষাকে অবশ্যই বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে উন্নয়ন কর্মসূচীর সংগে সম্পৃক্ত করতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত পুঁথিগত জ্ঞান ও মাঠ পর্যায়ের অনুশীলনের মধ্যে শক্তিশালী সেতুবন্ধন রচনা করা হবে।

গ্রন্থা... বাংলা

কৃষি ঋণ

১'৭১। বাংলাদেশে জীবনধারণমূলক কৃষি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কৃষি ঋণ ব্যবস্থা প্রধান একটি ভূমিকা পালন করে। যে কোন ধরনের প্যাকেজ প্রযুক্তির (অধিক ফলনশীল বীজ, সার, কীটনাশক ও পানি) সাহায্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রশ্নটি উত্থাপিত হবার সংগে সংগে কৃষি খাতে বর্ধিত পরিমাণে বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়। ১৯৭৩—৮৫ সময়কালে কৃষি ঋণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯৭৩/৭৪ সালের ১৯'৭২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৭৭/৭৮ সালে ১৬০'৮০ কোটি টাকায়, ১৯৭৯/৮০ সালে ২৭২'০ কোটি টাকায় এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে ১১৩১'০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। স্বল্পমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী উভয় ধরনের ঋণ চাহিদা পূরণের জন্য এ পরিমাণ অর্থের দরকার হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উদ্দেশ্য-ওয়ারী ঋণ বিতরণের পরিমাণ নীচে দেখানো হলো :

সারণি ১১

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কৃষি ঋণ বিতরন

(কোটি টাকায়)

বৎসর	শস্য	চা	সেচযন্ত্র	অন্যান্য	মোট
১৯৮০/৮১	১১৯'০	৫৭'০	২৪'০	১৫১'০	৩৫৩'০
১৯৮১/৮২	১৩১'০	৬৭'০	৪৭'০	১৫৯'০	৪২৪'০
১৯৮২/৮৩	৩৪৯'০	৪২'০	১০৩'০	১৮৩'০	৬৭৭'০
১৯৮৩/৮৪	৫১৭'০	৩৩'০	১১৩'০	৩৪৪'০	১০০৭'০
১৯৮৪/৮৫	৬২৬'০	৩৪'০	১৪৫'০	৩২৬'০	১,১৩১'০

বিগত সময়গুলোতে বিশেষ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ঋণ দান কর্মসূচীর আলোকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উৎপাদন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কৃষি ঋণ বিতরণের একটি লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। ১৯৮৪/৮৫ সালের ১,১৩১'০ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৮৯/৯০ সালে মোট ২,৪৮৩'০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বরাদ্দ করা হবে। এর মধ্যে মোট ঋণের ৬৮% হবে স্বল্পমেয়াদী এবং বাকীটা মধ্যমেয়াদী। পরিকল্পনাকালে প্রতি বছর গড়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৭% হারে বৃদ্ধি করা হবে। এ হিসেবে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি ঋণের উদ্দেশ্য-ওয়ারী বরাদ্দ হবে নিম্নরূপ :

সারণি ১২

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচী

(কোটি টাকায়)

উদ্দেশ্য	১৯৮৪/৮৫		১৯৮৯/৯০		প্রবৃদ্ধি হার %
	টাকা	শতকরা হার	টাকা	শতকরা হার	
শস্য	৬২৬	৫৫'৪	১,৪৬৪	৫৯'০	১৮'৫
চা	৩৪	৩'০	৪০	১'৬	৩'৩
সেচ যন্ত্র	১৪৫	১২'৮	৩৪৩	১৩'৮	১৮'৮
অন্যান্য*	৩২৬	২৮'৮	৬৩৬	২৫'৬	১৪'৩
মোট :	১,১৩১	১০০'০	২,৪৮৩	১০০'০	১৭'০

*লাঙল, গবাদিপশু, মৎস্যায়ন, কৃষিভিত্তিক শিল্প ইত্যাদিসহ।

গুদামজাত সুবিধা

১'৭২। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কৃষি ক্ষেত্রে দুটি অন্তর্লীন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেগুলো হলো কৃষি উৎপাদনের মৌসুম-নির্ভরতা ও পচনশীলতা। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দুটি সমস্যাও প্রকট হয়ে উঠবে। ১৯৮৪/৮৫ সালে বোরোর অনুকূলে শস্যোৎপাদন কাঠামোতে পরিবর্তন আনার পর এই সমস্যা দারুণভাবে অনুভূত হয়েছিল। উপরোক্ত সমস্যা দুটির সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব না হলে প্রযুক্তি ও উৎপাদনের সম্প্রসারণ সংকটের সম্মুখীন হবে। এছাড়াও বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে কৃষি উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে গিয়েও সরবরাহ কেন্দ্রগুলোর কাছাকাছি স্থানে গুদামজাত ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

খাদ্যশস্য গুদামজাত সুবিধা

১'৭৩। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ গুদামগুলোতে শস্যের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ১৯'৫০ লাখ টন। খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ মজুদ এক সময়ে ছিল ১২ লাখ টন। বর্তমান হারে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য মজুদ কার্যক্রম বিশেষ কোন সমস্যার সৃষ্টি করবে না। তবে মজুদকৃত শস্যের অপচয় ও মানের ক্রমাবনতি রোধের জন্য পুরানো গুদামগুলো উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সার মজুদের গুদাম

১'৭৪। বর্তমানে বিএডিসি'র গুদামগুলোর সার ধারণ ক্ষমতা ৩'৯০ লাখ টন। সংস্থার অধীনস্থ নির্মাণাধীন গুদামগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ হলে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দিকে সারাদেশ জুড়ে সার গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা ০'৪২ লাখ টন বেড়ে ৪'৩২ লাখ টনে উন্নীত হবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গৃহীত বিবিধ নীতিমালা অনুসারে বিতরণ ব্যবস্থা বেসরকারীকরণ এবং ইউরিয়া সার উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জিত হলেও বি এ ডি সি'র গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না।

বীজ মজুদের গুদাম

১'৭৫। বর্তমানে বিএডিসি'র বিভিন্ন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের গুদামগুলোতে বীজের ধারণ ক্ষমতা ২০,০০০ টন। গম ও ধানসহ বিভিন্ন ধরনের বীজের পর্যাপ্ত গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা ও সারাদেশে কৃষকদের হাতে পর্যাপ্ত ও সময়মতো উন্নতমানের বীজ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে আরো ১৫,০০০ টন বীজ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম নির্মাণের কর্মসূচী নেয়া হবে।

কৃষি পণ্যের বিপনন

১'৭৬। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষি পণ্য বিপননের বর্তমান ব্যবস্থা অনেক বছর পূর্বেকার। বিপনন ব্যবস্থা উৎপাদন প্রযুক্তি ও বর্ধিত উৎপাদনের সংগে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হয়নি, উন্নয়নমুখী বিপনন তথ্য ও বিধি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি। ফলে কৃষকরা প্রায়ই পছন্দমত বিপননের সুবিধা পায় না। এতে বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহ চাহিদার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ সম্পর্কে ও পণ্যের বাজার সম্পর্কে তথ্য প্রচারের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকরা উপকরণের জন্য বেশী দাম দেয় ও উৎপাদিত পণ্যের কম দাম পায়। এটা কেবল উৎপাদনের অব্যাহত সম্প্রসারণেই বাধা সৃষ্টি করে না বরং এতে একটি ফসলের চাষ বাদ দিয়ে অন্য ফসল আবাদ শুরু করে, ফলে গোটা ব্যবস্থাই সামগ্রিকভাবে স্থিতিহীন হয়ে পড়ে। উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে অবশ্যই বিপনন তথ্য কাজে লাগাতে হবে।

১'৭৭। কৃষি পণ্যের বিপনন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ ছাড়াও বাজার তথ্য ও নীতি বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিপনন পদ্ধতির সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু যোগান, দাম ও উৎপাদনের উপর এসবের প্রতিক্রিয়া বিপনন অবকাঠামো তথা পরিবহন ও গুদামজাত করার মত সহগামী উন্নয়নের উপর নির্ভর করবে।

১৯৮৯/৯০ সালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

১·৭৮। নীচের সারণিতে প্রধান প্রধান ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হয়েছে:

সারণি ১৩

প্রধান ফসলসমূহের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

ফসল	একক	স্থিতাবস্থা (১৯৮৪/৮৫)	লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৯/৯০)
১। ধান	লাখ মেট্রিক টন	১৪৬·২৪	১৮০·০০
আউশ	,,	২৭·৮৩	৩৪·২০
আমন	,,	৭৯·৩১	৯১·৮০
বোরো	,,	৩৯·১০	৫৪·০০
২। গম	,,	১৪·৬৪	২৬·০০
৩। মোটাদানার শস্য	,,	০·৩৩	১·০০
মোট (খাদ্যশস্য):	,,	১৬১·২১	২০৭·০০
৪। পাট	লাখ গাঁইট	৪৫·৭৩	৬০·০০
৫। চা	লাখ পাউণ্ড	৯৬৮·০০	১১৫০·০০
৬। আখ	লাখ টন	৭০·০০	৮২·০০
৭। আলু	,,	১১·০০	১৭·০০
৮। ডাল	,,	২·০০	৩·০০
৯। তেল বীজ	,,	২·০০	৩·৫০
১০। তুলা	লাখ গাঁইট	০·১২	১·০০
১১। তামাক	হাজার টন	৫৪·০০	৬০·০০
১২। মসলা	,,	২৬৮·০০	৩২৫·০০

জমি ব্যবহার নীতি

১·৭৯। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় এলাকার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ সবচেয়ে কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ অব্যাহতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বাসস্থান, শিল্প প্রতিষ্ঠান সড়ক নির্মাণ প্রভৃতি কাজে জমির ব্যবহার ও বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে আবাদযোগ্য জমির

পরিমাণ আরো দ্রুত কমে যাচ্ছে। আবাদযোগ্য জমির এই ঘাটতি বন এলাকায় আবাদ, সম্প্রসারণ, বংগোপসাগরের দুর্যোগপ্রবণ দ্বীপগুলোতে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে আংশিকভাবে পূরণ করা হচ্ছে। বন ধ্বংসের ফলে বনাঞ্চল বিপজ্জনক পর্যায়ে (এলাকার ৮%) কমে গেছে। ফলে সমগ্র পরিবেশই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আবাদী জমির অভাব আরো বাড়বে। পরিবেশগত বিপর্যয় এড়ানোর জন্য তাই একটি সুদূর প্রসারী ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর একটি জাতীয় ভূমি ব্যবহার ও ভূবাসন সমীক্ষা তৈরী করছে। আশু ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে এই সমীক্ষার সুপারিশমালা সতর্কতার সংগে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা সদর দফতর উন্নয়ন কেবল জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নেই নয় বরং নির্বাচিত স্থানে মানুষের বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। ফলে কৃষি জমির উপর চাপ কমবে।

১'৮০। প্রাপ্ত জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা জাতীয় ভূমি নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এটা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই জমি সাময়িকভাবে পতিত ফেলে রাখতে হবে। পল্লী ও শহর এলাকায় জমির মালিকানা ক্ষেত্রে সিলিং প্রথা আরোপ করার মাধ্যমে ভূমি সংস্কার বেসরকারী খাতে এই সমস্যা লাঘবে আংশিক অবদান রাখবে। কিন্তু এতে সরকারী খাতের সমস্যা দূর হবে না। সরকারী ও বেসরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্পে ভূমি ব্যবহার কাজের ধরনের ওপর নির্ভর করবে। আর বাকী অব্যবহৃত জমি বিকল্প কাজে লাগাতে হবে অথবা ফেরত দিতে হবে।

১'৮১। কিন্তু ভূমির উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রধানতঃ কৃষি খাতের, কারণ ভূমির বেশীর ভাগ ব্যবহার এই খাতেই। উৎপন্ন দ্রব্য ও জমির পরিমাণ অনুসারে ফলনের বিচারে এই এলাকার দেশগুলোর মধ্যে জমির সবচেয়ে অনুৎপাদনমূলক ব্যবহার হয় বাংলাদেশে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৮২ সালে বাংলাদেশে একর প্রতি ধান উৎপন্ন হয় ৮১৫'৪ কেজি, শ্রীলংকায় ১,১৭০'০ কেজি ও ইন্দোনেশিয়ায় ১,৫৩০'৪ কেজি। আগেই বলা হয়েছে, আধুনিক রসায়ন প্রযুক্তির ফলে ফলন বাড়ে। এই প্রযুক্তি উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমির মান বাড়ায়। তাই কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ প্রকৃতই ভূমির মান বাড়াবে ও এর ওপর চাপ কমাবে।

১'৮২। ভূমি সংস্কার বাসস্থানের ও খামারের জমির উন্নত ব্যবহার সম্ভব করে তুলবে, সেই সংগে ফসল চাষ পুনর্বিন্যস্ত করার মাধ্যমে ভূমির আরো উন্নত ব্যবহারের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করবে। ভূমি ব্যবহার ও ফসল চাষের সর্বোত্তম বিন্যাস সম্পর্কে একটি সমীক্ষা শেষ হয়েছে। সর্বোত্তম ফসল বিন্যাস নিশ্চিত করতে তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সমীক্ষার বাস্তবতা যাচাই প্রয়োজন। তবে এ ধরনের ভূমি ব্যবহার নীতির জন্যে দাম ও খাজনা সম্পর্কিত সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নীতির সমর্থন প্রয়োজন। উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে ভূমি বরাদ্দ ও ফসল বিন্যাস বিভিন্ন রকম হতে পারে। এই সমীক্ষা অর্থনৈতিক/অর্থ সংস্থানগত মুনাফাযোগ্যতা, আভ্যন্তরীণ সম্পদ মূল্য, কর্মসংস্থান প্রভৃতি দিক বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন ফসলের বিন্যাস সাধনের একটি উন্নত পদ্ধতি বের করেছে। কোন্ ফসলগুলো সর্বোত্তম এভাবে তা বিচার করা যায় না। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার মত বিষয়কে সামনে রেখে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ ব্যাপারে কর্মসংস্থান ও প্রান্তিক মূল্যের ভিত্তিতে আয়ের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান। আর আর্থিক মুনাফাযোগ্যতার ক্ষেত্রে মূল্যনীতি পরিচালিত হবে প্রান্তিক মূল্যের ভিত্তিতে।

১·৮৩। নীচের সারণিতে বর্তমানে (১৯৮৪/৮৫) ভূমির ব্যবহার ও তৃতীয় পরিকল্পনার প্রস্তাবিত ফসল উৎপাদন কর্মসূচী এবং সমীক্ষার আওতায় এসব ফসলের স্থান দেখানো হলো :

সারণি ১৪

মৌসুম অনুযায়ী ভূমির ব্যবহার ও ফসল নির্বাচন

(কেবল প্রধান প্রধান ফসল)

(লাখ একরে)

ফসল	আইভিএ র‍্যাংকিং	কর্মসংস্থান র‍্যাংকিং	১৯৮৪/৮৫ সালের এলাকা	১৯৮৯/৯০ সালের এলাকা	কাংখিত এলাকা
ক। **খারিফ ফসল :**					
১। বিএল আউস	৪(১৩)	৪(৯)	৬·১১	৫·৭০	৪.৯৮
এইচ ওয়াইভি আউস(সেচ)	১(১১)	২(৯)	১·১৫	১·৫০	২.৪৭
২। বি এল আমন	৪(১৮)	৪(২০)	৩·০৫	৩·০০	৮.৪২
টি এল আমন	৩(১৬)	৩(১৪)	৮·৪০	৮·৪০	৬.৫৭
এইচ ওয়াই ভি আমন	২(১০)	১(৮)	২·৬৭	৩·০০	—
৩। এইচ ওয়াই ভি পাট	২(১৫)	১(২)	১·৪৯	১·৫০	১.৪১
৪। আখ	—(৫)	—(১)	০·৪১	০·৪৫	০.৪৪
খ। **রবি ফসল :**					
৫। এইচ ওয়াই ভি বোরো (সেচ)	৫(১৭)	১(৪)	৩·০০	৩·৮০	২.৩৫
৬। এইচ ওয়াই ভি গম (সেচ)	৪(১৩)	৪(১৬)	১·৬২	২·৩৫	২.৫৯
এইচ ওয়াই ভি গম	৭(২১)	৫(২১)	—	—	—
৭। এইচ ওয়াই ভি আলু	১(১)	৩(৬)	০·২৭	০·৩০	০.৪২
৮। তুলা (মধ্যম জাত)	৩(৪)	১(৭)	০·০৪	০·১৫	০.০৭
৯। সরিষা	৪(৭)	৭(১৭)	০·৭৩	০·৮০	০.৯৩
১০। মসুর	৫(১৯)	২(২৩)	০·৭৪	০·৮০	২.৯৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য (১) আই ভি এ এর অর্থ 'ইন্টারন্যাশন্যাল ভ্যালু এ্যাডেড'।

(২) বন্ধনীর মধ্যকার অংক-এর সাহায্যে সকল মৌসুমে ফসলের ক্রম বোঝানো হয়েছে।

(৩) একর সম্পর্কিত হিসেবে গম, সরিষা ও মসুর ফসলের হাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(৪) 'ভূমি ব্যবহার' সমীক্ষা হতে কাংখিত এলাকা নেয়া হয়েছে।

কর্মসূচী-ওয়ারী অর্থ বরাদ্দ

১.৮৪। তৃতীয় পরিকল্পনায় ফসল উৎপাদনের জন্য ১৪১০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে ফসল উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে পানি সম্পদ উন্নয়নে সম্পূরক বিনিয়োগ বরাদ্দ করা হয়েছে ২৭০৩ কোটি টাকা। নীচের সারণিতে বিভিন্ন ফসল খাতে কর্মসূচী-ওয়ারী অর্থ বরাদ্দ দেখানো হলো।

সারণি ১৫

সরকারী খাতে কর্মসূচী-ওয়ারী অর্থ বরাদ্দ (১৯৮৫—৯০)

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	কর্মসূচী	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৮০—৮৫) সংশোধিত এ ডি পি'র মোট বরাদ্দ।		তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৮৫—৯০) প্রস্তাবিত বরাদ্দ	
		পরিমাণ	%	পরিমাণ	%
১।	সার	৪৭৪.৩৪	৩১.৯৭	১৫০.০০	১০.৬৪
২।	বীজ	১৩৬.৩৩	৯.১৯	১৭৬.৫৯	১২.৫২
৩।	উদ্ভিদ সংরক্ষণ	৭.৪৯	০.৫০	২০.০০	১.৪২
৪।	সার গুদাম	১৭৮.৪৪	১২.০৩	৩১.১০	২.২১
৫।	খাদ্য গুদাম	২৮০.৫৩	১৮.৯১	১৪৭.৮৩	১০.৪৮
৬।	সম্প্রসারণ সার্ভিস	১৬১.৩৪	১০.৮৮	২০৫.৩৩	১৪.৫৬
৭।	কৃষি গবেষণা	১২৩.৬২	৮.৩৩	২০৯.৪৪	১৪.৮৬
৮।	কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	৩৮.৮৭	২.৫৭	১২২.৫৫	৮.৬৯
৯।	কৃষি বিপনন	২.২২	০.১৫	৩.০০	০.২১
১০।	কৃষি তথ্য	১.৮৮	০.১২	১.৫০	০.১১
১১।	কৃষি শুমারী	৪.৪২	০.৩০	৫.০০	০.৩৫
১২।	অন্যান্য (টিএপিপি সহ)	৭৪.৮৮	৫.০৫	৮৭.৬৬	৬.২২
১৩।	উপজেলা/এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	—	—	২৫০.০০	১৭.৭৩
	মোট (ফসল) :	১৪৮৩.৫৬	১০০.০০	১৪১০.০০	১০০.০০

উল্লেখ্য, তৃতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি নাগাদ সারে ভর্তুকি দেয়ার ব্যবস্থা বাতিলের উদ্দেশ্যে এ-ক্ষেত্রে ভর্তুকির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশেরও বেশ হ্রাস করা হবে। সারে ভর্তুকি ছাড়াও, তৃতীয় পরিকল্পনায় কিছু কর্মসূচীর আকার হ্রাস করা হবে। কারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এগুলোর পর্যাপ্ত উন্নয়ন হয়েছে। যেমন, সার ও খাদ্য গুদাম। এসব কর্মসূচীর জন্য খরচ হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয়ের ৬৩ শতাংশ। এর ফলে তৃতীয় পরিকল্পনায় ভর্তুকিসহ শস্যখাতের উন্নয়ন বরাদ্দ কমে আসবে।

পরিচ্ছেদ ২ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ

ফসলের স্বল্প উৎপাদনের প্রেক্ষিতে এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জরুরী প্রয়োজনে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে, বর্ষা ও শীত মৌসুমে পানি প্রবাহের জটিল ও দ্বৈত শাসনে বাংলাদেশ সেচ ব্যবস্থাকে প্রসারিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বর্ষাকালে সবগুলো নদীর সম্মিলিত মোট বার্ষিক পানি প্রবাহের পরিমাণ প্রায় ৫০ লাখ কিউসেক, শুকনো মৌসুমে যার পরিমাণ আড়াই লাখ কিউসেকে এসে দাঁড়ায়। পানি বাংলাদেশের কৃষির জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে মারাত্মক ধরনের বন্যায় বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকা সত্ত্বেও, নীট আবাদি জমি ২ কোটি ২৫ লাখ একরের দুই তৃতীয়াংশ বর্ষা মৌসুমে (খারিফ মৌসুম) আবাদ করা হয়। অন্যদিকে ৪০% জমি শীতের মাসগুলোতে আবাদ করা হয়। ২ কোটি ৫৬ লক্ষাধিক একর জমিতে বন্যার প্রকোপ নিম্নরূপ:

সারণি ২.১

বন্যার শাসন

বন্যার গভীরতা	এলাকা (লাখ একর)
এক ফুটের নীচে	৯২.৫০
১ থেকে ৩ ফুট	৮৯.৫৭
৩ থেকে ৬ ফুট	৪১.৯৪
৬ থেকে ১০ ফুট	২৬.৪৫
১০ ফুটের উপরে	৫.৮৩
মোট:	২৫৬.৩১

কাজেই পানি সম্পদ উন্নয়ন একদিকে বর্ষা মৌসুমের ফসলকে অত্যাধিক পানি প্রবাহ ও জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা করার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা অবলম্বন করে অন্যদিকে শীতকালীন আবাদ প্রসারিত করার লক্ষ্যে সেচ সুবিধার ব্যবস্থা করে পানির এই দ্বৈত শাসনকে মোকাবেলা করছে।

২.২। সাম্প্রতিক বছরগুলো পর্যন্ত ছোট আকারের সেচ সুবিধার ওপর যখন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছিল, তখন পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বহুলাংশে ছিল সরকারী খাতের সংস্থা বিডব্লিউডিবি ও বিএডিসির। বিডব্লিউডিবি'র প্রধান কাজই হল বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন। অন্যদিকে বিএডিসির প্রধান ভূমিকা হল ছোট আকারের সেচ সুবিধা দান। বাংলাদেশ ব্যাংকের মত সরকারী খাতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঋণদান ব্যবস্থার মাধ্যমে বেসরকারী খাতে ক্ষুদ্রাকৃতির সেচের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিএডিসির ভূমিকা হ্রাস পেতে শুরু করেছে।

অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা

২.৩। **প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩—৭৮):** প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ নাগাদ ২৮.৭৫ লাখ একর জমি সেচের এবং ৪৫.০০ লাখ একর জমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের আওতায় নিয়ে আসা হয়। এই দুই ক্ষেত্রেই অগ্রগতি পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ৫০.৩৮ লাখ এবং ৫১.৪০ লাখ এর তুলনায় অত্যন্ত কম। ১৯৭২/৭৩ সালে ২৩.১৩ লাখ একর জমি সেচ এবং ৩০ লাখ একর জমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের আওতায় আনা হয়। সেচের আওতাধীন ২৮.৭৫ লাখ একর জমির মধ্যে ১৯৭৭/৭৮ সালে গ্র্যাভিটি প্রবাহের আওতায় ছিল ১.৬০ লাখ একর, হস্তচালিত নলকূপ, গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপ দ্বারা ছোট আকারের সেচ চালানো হয় ১৮.১৫ লাখ একরে (বিএডিসি

১৭.৪৯ একর এবং বিআরডিবি ও বিকেবি ০.৬৬ লাখ একর) এবং সনাতন পদ্ধতিতে ৯.০০ লাখ একর। ৪৫ লাখ একরের এলাকা ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের আওতায়। প্রথম পরিকল্পনা মেয়াদে সমাপ্ত কতিপয় প্রধান প্রধান প্রকল্প হল জি কে পর্যায়-১, গ্রাউন্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট, ডিএনডি, ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণ বাঁধ প্রভৃতি। বিএডিসি ১৭.৪৯ লাখ একর সেচের জন্য ৩৬,৭৩০টি লো-লিফট পাম্প ৬,৬০০টি অগভীর নলকূপ ও ৭,৪৭০ টি গভীর নলকূপ পরিচালনা করেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের জন্য প্রথম পরিকল্পনা মেয়াদে ৫২৫ কোটি টাকার মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও প্রবাহ সেচের জন্য ২৪৪ কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্রাকৃতির সেচ সরঞ্জামের জন্য ২৮১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

২.৪। **দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা :** দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় সেচ আওতাধীন জমির পরিমাণ ৬.১৪ লাখ একর বেড়ে ৩৪.৮৯ লাখ একর হয়েছে। এর ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪১.১৩ লাখ একর। একই সময়ে বন্যা প্রতিরক্ষা ও পানি নিষ্কাশনের আওতাধীন এলাকার পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা ৫২.০০ লাখ একরের স্থলে প্রকৃতপক্ষে ছিল ৪৭.৯০ লাখ একর। এভাবেই দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সেচ কর্মসূচী তাৎপর্যপূর্ণভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের উপরে স্থান পায়। এর অধিকাংশই অর্জিত হয়েছে ছোট আকারের সেচ (৩.২৩ লাখ একর) থেকে; যেখানে গ্রাভিটি ফ্লো সেচের আওতায় হয়েছে মাত্র ০.১৪ লাখ একর। লো- লিফ পাম্পের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৮,৬০০, অগভীর নলকূপ বেড়ে হয়েছে ২৩,৪৬০টি, গভীর নলকূপ হয়েছে ৯,৭৯৫টি এবং হস্তচালিত নলকূপ হয়েছে ১১০,০০০টি। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ৪০০.৪৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। মোট ব্যয়ের মধ্যে বিডব্লিউডিবি ব্যয় করেছে ২১৫.৯৩ কোটি টাকা, বিএডিসি ১৭৯.৩১ কোটি টাকা এবং অন্যান্য সংস্থা ৫.২১ কোটি টাকা।

২.৫। **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা :** ১ কোটি ৭৫ লাখ টন খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেচের লক্ষ্যমাত্রা ৭২.১ লাখ একর এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের লক্ষ্যমাত্রা ৬৪.৭ লাখ একর নির্ধারণ করা হয়। এর তুলনায় স্থিতাবস্থা ছিল যথাক্রমে ৩৪.৮৯ লাখ এবং ৪৭.৯০ লাখ একর। এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর মূল কৌশলাদি ছিল বর্তমানের সুযোগ-সুবিধা থেকে সর্বাধিক উপকারিতা লাভ করা; গুরুত্বসহকারে ইতিমধ্যেই গৃহীত দ্রুত উৎপাদনশীল ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর ছোট ও মাঝারি আকারের প্রকল্প এবং বড় প্রকল্পের স্বয়ংধারক উপাদানগুলোকে সমাপ্ত করা; পানির উৎসগুলো সম্পর্কে তদন্ত, জরীপ ও পরীক্ষাকার্য পরিচালনা করা এবং সর্বোপরি, দ্রুত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বেসরকারী খাতে ছোটখাটো সেচ সরঞ্জামকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজটি অব্যাহত রাখা। ব্যাপক নীতিগত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ভর্তুকির ক্রমান্বয় হ্রাস ও পানির হার প্রবর্তন, সেচ সরঞ্জাম বিক্রি বেসরকারীকরণ ও মালিকানাস্বত্ব প্রবর্তন এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি।

২.৬। ১৯৮৪/৮৫ সালে সেচের প্রকৃত আওতাধীন এলাকার আনুমানিক পরিমাণ ছিল ৬১.২০ লাখ একর। ১৯৮৪/৮৫ সালে মোট সেচ কাজে ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভের পানির অবদান ছিল যথাক্রমে ৩০.৮৫ লাখ ও ৩০.৩৫ লাখ একর। ১৯৭৯/৮০ সালে ছিল যথাক্রমে ২৬.৪৭ ও ৮.৪২ লাখ একর। এই হিসেব থেকে ভূগর্ভস্থ পানি আহরণে যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুযোগ-সুবিধা ৬৪ লাখ একর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে, পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাও ছিল অনুরূপ (৬৪.৭০ লাখ একর), ১৯৭৯/৮০ সালে স্থিতাবস্থা ছিল ৪৭.৯০ লাখ একর।

২.৭। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের আওতাধীন এলাকার হিসেব নিম্নোক্ত সারণিতে দেয়া হল।

সারণি ২.১

সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিস্কাশন

(লাখ একর)

সেচ প্রযুক্তি/এফসিএন্ড ডি	স্থিতাবস্থা (১৯৭৯/৮০)	প্রান্তিক বছর (১৯৮৪/৮৫)	
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
১। **ভূপৃষ্ঠের পানি সেচ**	**২৬.৪৭**	**৩০.৫০**	**৩০.৮৫**
(১) গ্র্যাভিটি ফ্লো	২.০৭	৫.০০	৪.৭৫
(২) এল এল পি	১৪.৪০	১৮.০০	১৭.৬০
(৩) সনাতন	১০.০০	৭.৫০	৮.৫০
২। **ভূগর্ভস্থ পানি সেচ**	**৮.৪২**	**৪১.৬০**	**৩০.৩৫**
(১)এসটিডব্লিউ	২.২০	৩১.২৫	১৯.২৫
(২) ডিটিডব্লিউ	৫.৮৮	৯.০০	১০.০০
(৩)এইচটিডব্লিউ	০.৩৪	১.৩৫	০.৯০
(ক) মোট সেচ :	৩৪.৮৯	৭২.১০	৬১.২০
(খ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন :	৪৭.৯০	৬৪.৭০	৬৪.০০

উক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠের পানি সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের আওতাধীন এলাকা উভয়ই লক্ষ্যমাত্রার খুব কাছাকাছি, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানি সেচের আওতাধীন এলাকা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এই ঘাটতির প্রধান উৎসই হল অগভীর ও হস্তচালিত নলকূপ বা বেসরকারী খাতে সেচ সম্প্রসারণে প্রধান দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিকল্পনাকালে সেচের আওতাধীন এলাকা ৩৭.২ লাখ একরবৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে ৩০.০১ লাখ এলাকাই এই দুই পদ্ধতিতে বাড়ানো হয়েছে। এতে লক্ষ্যমাত্রার অর্ধাংশের সামান্য বেশী অর্জিত হয়েছে। কোন কোন জেলায় পরিকল্পনা শেষে অগভীর নলকূপ স্থাপন মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করেছে, কেননা গভীর নলকূপের মাধ্যমে অত্যধিক পানি উত্তোলনের ফলে পার্শ্বস্থিত অগভীর নলকূপগুলো অচল হয়ে পড়েছে। পরিকল্পনাকালে ২,৫০,০০০ টি এসটিডব্লিউ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে বসানো হয় ১,৫৪,০০০টি।

২.৮। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন ক্ষেত্রে বিডব্লিউডিবি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলো সমাপ্ত করেছে।

সারণি ২.২

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন কার্যক্রমের সাফল্য

কর্মসূচী	একক	স্থিতাবস্থা (১৯৭৯/৮০)	ক্রমপুঞ্জিত সাফল্য (১৯৮৪/৮৫)
বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	মাইল	৩,০৮৪	৩,৮১০
সেচ খাল	মাইল	১,৭০৭	২,৩৬৩
নিষ্কাশন খাল	মাইল	১,৪০৮	১,৮৫৩
হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (স্লুইস ও রেগুলেটর)	সংখ্যা	৩,৫৮৯	৪,৫২১
ক্লোজার	সংখ্যা	৯১১	৯৮৫
সেতু ও কালভার্ট	সংখ্যা	৩,২০৩	৩,৫৬৫
পাম্প হাউস	সংখ্যা	৫৮	৮৯

২.৯। **কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী (এফ এফ ডব্লিউ পি)** : কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় বিডব্লিউডিবি ১৯৭৪/৭৫ সাল থেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নির্বাচিত এলাকাসমূহে গমের মাধ্যমে মজুরী দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, নিষ্কাশন খাল, সেচ খাল ও রাস্তাসমূহের নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়নের মত প্রকল্পে নিয়োগ করে পল্লী অঞ্চলের বেকারদের সাহায্য দেয়া হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রায় ৩,৮৩৫ মাইল বেড়ীবাঁধ ও ৪,৩৭৮ মাইল খালের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

২.১০। **কতিপয় নীতিসংক্রান্ত বিষয়** : অতীত পরিকল্পনার কতিপয় নীতি সংক্রান্ত বিষয় নিম্নে আলোচিত হল :

(ক) **পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা** : স্মরণ করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান কৌশল ছিল স্বল্প মেয়াদী দ্রুত উৎপাদনশীল প্রকল্প হাতে নেয়া। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য বিডব্লিউডিবি তাদের কর্মসূচীকে আগে ভাগে বাস্তবায়ন প্রকল্প (ই. আই. পি) ক্ষেত্রে প্রসারিত করে। এসব প্রকল্পের আওতাধীন এলাকা ক্ষুদ্র (প্রায় ১ হাজার একর) হওয়ায় ক্রমেই এগুলোকে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের অভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। যারা এর দ্বারা উপকৃত, তাদের অংশগ্রহণের অভাবে ভূমি অধিগ্রহণে শুধু সমস্যাই সৃষ্টি হলনা, পরিণাম হিসেবে এসব প্রকল্প স্থানীয় সরকারের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ৮২টি প্রকল্পকে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তরের জন্য চিহ্নিত করা হয়। এদের মধ্যে ৬০টির হস্তান্তর সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয় সম্মত হয়, তবে উপজেলার কাছে প্রকৃত হস্তান্তর এখনো বাকী রয়েছে।

(খ) **পানির হার সংগ্রহ** : ছোট আকৃতির সেচ সরঞ্জামের ক্রমবর্ধমান বেসরকারীকরণ ও তাদের উপর ভর্তুকি হ্রাস বিডব্লিউডিবি প্রকল্প এলাকার কৃষকদের জন্য সুফল বয়ে এনেছে। কাজেই পানির হার চালু করা এবং প্রকল্প ব্যয়ের কিছুটা তুলে নেয়ার জন্য বি ডব্লিউ ডি বি'র ১২টি প্রকল্প ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে কার্যকর বাংলাদেশ সেচ পানি হার অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর আওতায় আনা হয়। ১৯৮৪/৮৫ সালে সেচ পানির মূল্য হিসেবে ৮ কোটি টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু প্রকৃত সংগ্রহ ছিল লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে, কেননা পানির হার আরোপ ও নিরূপণের ব্যাপারে কিছু কিছু পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়েছিল।

(গ) **সম্প্রসারণ সার্ভিসের দুর্বলতা :** বিএডিসি/বিডব্লিউডিবি'র প্রকল্পসমূহের উপকারিতা সম্প্রসারণ তৎপরতার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতির অভাবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ফলে সৃষ্ট ক্ষমতার অত্যন্ত অপ্রতুল ব্যবহার হয়েছে, সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য অপ্রতুল 'ও এণ্ড এম বাজেট' এবং পানির হারের অভাব এই সমস্যাকে তীব্র করেছে, যা প্রকল্পচালক ও ব্যবহারকারী উভয়ের স্বার্থকে ব্যাহত করেছে।

(ঘ) **ছোট আকারের সেচের সমস্যাবলী :** আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছোট আকারের সেচ সরঞ্জামের আওতাধীন সেচ এলাকার উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। সংখ্যার ঘাটতি ও কমাণ্ড এলাকা হ্রাস পাওয়ার দরুণই এই ঘাটতি হয়েছে। নিম্নের সারণিতে ১৯৮৪/৮৫ সালের জন্য সরঞ্জাম লক্ষ্যমাত্রার সংখ্যার ঘাটতি দেখানো হল :

সারণি ২·৩

ছোট আকারের সেচ সরঞ্জামের ঘাটতি

ধরন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত
(১) এল এল পি (১ কিউসেক)	৩০,০০০	২০,০০০
(২) এল এল পি (২ কিউসেক)	৩০,০০০	২৮,০০০
(৩) ডি টি ডব্লিউ	১৮,০০০	১৭,০০০
(৪) এস টি ডব্লিউ	২৫০,০০০	১৫৪,০০০
(৫) এইচ টি ডব্লিউ	৪৫০,০০০	৩০০,০০০

লক্ষ্যমাত্রার ঘাটতির জন্য দায়ী কারণগুলো হল : (১) বর্ধিত ভাড়া ও বিক্রয়মূল্য ; (২) লো লিফট পাম্পের অবাধ বিক্রির ফলে বিকল্প ব্যবহার প্রবণতা এবং ঋণের অভাবে দরিদ্র কৃষকদের ব্যবহার হ্রাস ; (৩) ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভের সহজে পানি পাওয়ার দুষ্প্রাপ্যতা ; (৪) অগভীর নলকূপের ইঞ্জিন তৈরী ও তার নমুনা ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে বিক্রি, চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীকে ব্যাহত করার দরুন এবং (৫) উপজেলা পর্যায়ে সেচ সরঞ্জাম বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিলম্ব।

২.১১। **সম্পদের ক্ষেত্রে অন্তরায় :** বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার ঘাটতির অন্যতম মৌল কারণ হল সম্পদের ক্ষেত্রে অন্তরায়। এই খাতের জন্য চলতি মূল্যে ২,৭৫২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এর মধ্যে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে বরাদ্দ করা হয় ২,১৩১ কোটি টাকা। যা থেকে প্রকৃত খরচ দাঁড়ায় ১,৯১১ কোটি টাকা। তীব্র সম্পদ ঘাটতি সত্ত্বেও দক্ষতার উন্নয়নেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেচের ক্ষেত্রে যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। সারণি ২.৪ থেকে দেখা যাবে যে, ১৯৭২/৭৩ ও ১৯৭৯/৮০ সালের মধ্যে সেচের জমির পরিমাণ ১১.৭৬ লাখ একর বেড়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পাঁচ বছর মেয়াদে ২৬.৩১ লাখ একরে সেচ সম্প্রসারিত হয়েছে।

সারণি ২.৪

সেচকৃত এলাকার প্রবৃদ্ধি

(এলাকা লাখ একরে)

কর্মসূচী	স্থিতাবস্থা (১৯৭২/৭৩)	প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাফল্য (১৯৭৭/৭৮)	প্রথম পরিকল্পনায় বার্ষিক বৃদ্ধির হার (%)	দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় সাফল্য (১৯৭৯/৮০)	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাফল্য (১৯৮৪/৮৫)	দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বার্ষিক বৃদ্ধির হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) ভূপৃষ্ঠের পানি সেচ :						
(১) গ্রাভিটি ফ্লো	১.২১	১.৬০	৫.২	২.০৭	৪.৭৫	১৮.১
(২) এল এল পি	১০.৫০	১৩.৫৫	৫.২	১৪.৪০	১৭.৬০	৪.১
	(৩০,০০০)	(৩৬,৭৩০)		(৩৮,৬০০)	(৪৮,০০০)	
(৩) সনাতন	১০.০০	৯.০০	২.১	১০.০০	৮.৫০	(–)৩.২
উপমোট (ক) :	২১.৭২	২৪.১৫	২.১	২৬.৪৭	৩০.৮৫	২.১
খ। ভূগর্ভের পানি সেচ :						
(১) ডি টি ডব্লিউ	১.২৫	৩.৩৫	২১.৮	৫.৮৮	১৩.২১	১১.৬
	(২,৯০০)	(৭,৪৫৩)		(৯,৭৪৯)	(১৭,০০০)	
(২) এস টি ডব্লিউ	০.১৬	১.০০	৪৪.৩	২.২০	১৯.২৫	৫৪.৩
	(২,০০০)	(১২,৬১৩)		(২৩,৪৬৬)	(১৫৪,০০০)	
(৩) এইচ টি ডব্লিউ	—	০.২৫	—	০.৩৪	০.৯০	২১.৫
		(৬০,০০০)		(১১০,০০০)	(৩০০,০০০)	
উপ-মোট (খ) :	১.৪১	৪.৬০	২৬.৭	৮.৪২	৩৩.৩৫	২৯.২
মোট সেচ (ক+খ) :	২৩.১৩	২৮.৭৫	৪.৪	৩৪.৮৯	৬১.২০	১১.৯
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন :	৩০.০০	৪৫.০০	৮.৪	৪৭.৯০	৬৪.০০	৬.০

নোট : বন্ধনীর অংকগুলো চালু সরঞ্জামের সংখ্যা।

পরিকল্পনা মেয়াদে সেচের এই বৃদ্ধি মাঝারি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের কর্মসূচী/প্রকল্পের স্বপক্ষে গৃহীত পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ ফসল। মোট সেচে ছোট আকারের সেচের অবদান ১৯৭৯/৮০ সালের ২২.৮২ লাখ থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪৭.৯৫ লাখে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ১১০% প্রসারিত হয়েছে।

২.১২। **ভর্তুকি নীতি ঃ** যেহেতু কৃষির প্রবৃদ্ধি উৎসাহিত করার জন্য সেচ-বীজ-সার প্রযুক্তি কৃষিখাতের উন্নয়নের চাবিকাঠি ছিল, তাই সরকার এসব নতুন উপকরণের জন্য বিপুলভাবে ভর্তুকি প্রদান করেছিল। কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্রমব্যাপ্তির ফলে এদের দাম বেড়েছে এবং ভর্তুকির হারও হ্রাস পেয়েছে। বাজেটের সম্পদ বাড়ানোর জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ভর্তুকি কমানোর নীতি অনুসরণ করা হয়। ফলে ১৯৮২/৮৩ সাল থেকেই অগভীর ও হস্তচালিত নলকূপ বিক্রির উপর থেকে ভর্তুকি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৮০/৮১ সালে ১-কিউসেক ও ২-কিউসেক লো-লিফট পাম্পের ভাড়া যথাক্রমে ৮৬৫ টাকা ও ১৩৫০ টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে যথাক্রমে ২৩০০ ও ৩৬০০ টাকায় বৃদ্ধি করে লো-লিফট পাম্প থেকে ভর্তুকির হার ৫০% থেকে ২৫% করা হয়েছে এবং গভীর নলকূপের জন্য প্রতি সেটের ভাড়া ১৯৮০/৮১ সালের ১২০০ টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৫০০০ টাকা করা হয়েছে। একই সময়ে ভর্তুকির হার কমিয়ে বেসরকারী মালিকানাকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সকল অগভীর ও গভীর নলকূপ বেসরকারী মালিকানাধীনে হস্তান্তর করা হয়েছে। ১৯৮৪/৮৫ সালের মধ্যে ৪৩,৫৬৩টি লো-লিফট পাম্প (১—কিউসেক : ১৭৯২১ ও ২—কিউসেক : ২৫৬৪২) এবং ১৯৮৪/৮৫ সালের মধ্যে বসানো ২১,৪৮৫টি গভীর নলকূপের মধ্যে ১০৩৮৪টি ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বসানো এবং ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবহৃত গভীর নলকূপ ব্যবহারে কৃষকদের অনীহা লক্ষ্য করা যায়। কেননা বসানো নলকূপ অপসারণ করা না এর গুণগত মান নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সেচ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য বেসরকারী খাতই ছিল প্রধান ভিত্তি। হিসেবে দেখা যায়, কৃষিব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংক অগভীর নলকূপের ব্যাপারে তাদের নিজ নিজ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। কৃষিব্যাংক ৪০,০০০টির লক্ষ্যমাত্রার চাইতে ৯,৩৫১টি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭,০০০টির লক্ষ্যমাত্রার চাইতে ৬,৪৬৭টি বেশী নলকূপ স্থাপন করেছে। বেসরকারী খাতের মাধ্যমে ছোট ধরনের সেচ সরঞ্জাম স্থাপন সমতার মৌলিক প্রশ্নটি তুলে ধরে ; কারণ বেসরকারী খাতে ছোট সেচ সরঞ্জামের প্রাপ্তি ঋণ সরবরাহের উপর নির্ভরশীল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫—৯০)

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

২.১৩। পানি সম্পদ উন্নয়নের প্রাথমিক লক্ষ্য হল কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত রূপান্তরের প্রক্রিয়া জোরদার করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী হল :

(১) ২ কোটি ০৭ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য সেচ সরবরাহ করা ;

(২) ফসলহানি, জানমাল ও অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতি এড়ানোর জন্য বন্যা ও লবণাক্ততা, প্লাবন প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন ;

(৩) উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা সমভাবে বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ;

(৪) সময় ও ভৌগোলিক এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে পানি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার উন্নত করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

২.১৪। প্রাপ্তব্য সমীক্ষানুযায়ী সেচের মোট সম্ভাব্য এলাকা প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ একর। অতিরিক্ত এলাকাসমূহ সেচের আওতায় আনার প্রধান বাধা হল লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং মৎস্য সম্পদ, নাব্যতা রক্ষা, খাবার পানি ও শিল্পের জন্য ব্যবহার। অন্যান্য ব্যবহারকারীদের পানি ব্যবহারে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে প্রধান প্রধান নদীগুলো হতে প্রাপ্তব্য ৭৫% প্রবাহের মধ্যে প্রায় ৪০% সেচের জন্য পাওয়া যাবে। ১৯৮৪/৮৫ সালের শেষে ৬১.২০ লাখ একর জমিতে সেচ দেয়া হয়েছে, যা সম্ভাব্য এলাকার ৫৬%। বাদবাকী ৪৮.৮০ একর এখনও সেচের আওতায় আনা হয়নি। ১৯৮৯/৯০ এর শেষনাগাদ সেচ এলাকা ৯৬.৪৪ লাখ একরে প্রসারিত করা হবে। এতে ৮৮% এলাকাকে সেচের আওতায় আনা হবে।

২.১৫। ১৯৭৪ সালের বন্যার রেকর্ড অনুযায়ী বন্যা উপদ্রুত এলাকার পরিমাণ ধরা হয়েছে প্রায় ২ কোটি ৩ লাখ একর। এটি দেশের মোট এলাকার প্রায় ৫৭%। ১৯৮৪/৮৫ সালের শেষ নাগাদ ৬৪ লাখ একর জমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের আওতায় আনা হয়েছে। এটি বন্যা উপদ্রুত এলাকার প্রায় ৩২%। ১৯৮৯/৯০ সালে বন্যা থেকে রক্ষা ও পানি নিষ্কাশনের জন্য ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮২.৫৪ লাখ একর যা বন্যা উপদ্রুত এলাকার প্রায় ৪১%।

২.১৬। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেয়া হল:

সারণি ২.৫

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্যমাত্রা

(লাখ একরে জমি)

কর্মসূচী	স্থিতাবস্থা (১৯৮৪/৮৫)		তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৯/৯০)		তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)
	সংখ্যা	এলাকা	সংখ্যা	এলাকা	
১	২	৩	৪	৫	৬
১। সেচ:					
ক। ভূপৃষ্ঠের পানি সেচ:					
(১) গ্রাভিটি ফ্লো	—	৪.৭৫	—	১৪.৯৪	২৫.৮
(২) এল এল পি	৪৮,০০০	১৭.৬০	৬০,০০০	২১.০০	২.৬
(ক) ১-কিউসেক	২০,০০০	৫.০০	৩০,০০০	৭.৫০	৮.৪
(খ) ২-কিউসেক	২৮,০০০	১২.৬০	৩০,০০০	১৩.৫০	১.৪
(৩) সনাতন ব্যবস্থা	—	৮.৫০	—	৮.০০	(—)১.২
(৪) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ছোট প্রকল্প	—	—	—	৩.৪৫	—
উপ-মোট (ক):	—	৩০.৮৫	—	৪৭.৩৯	৮.৯
খ। ভূগর্ভের পানি সেচ:					
(১) এস টি ডব্লিউ	১৫৪,০০০	১৯.২৫	২৭০,০০০	২৫.০০	৫.৪
(২) ডি টি ডব্লিউ	১৭,০০০	১০.২০	৩০,০০০	১৮.০০	১২.০০
(৩) এইচ টি ডব্লিউ	৩০০,০০০	০.৯০	৪৫০,০০০	১.৩৫	৮.৪০
উপ-মোট (খ):	—	৩০.৩৫	—	৪৪.৩৫	৭.৯
গ। কমাণ্ড এলাকা উন্নয়ন	—	—	—	৪.৭০	—
মোট (ক + খ + গ):	—	৬১.২০	—	৯৬.৪৪	৯.৫
২। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন:	—	৬৪.০০	—	৮২.৫৪	৫.২

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদি

২.১৭। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে দুই ধরনের কৌশল অনুসরণ করা হবে। নীচে সেগুলো আলোচিত হলো :

(ক) স্বল্পমেয়াদী কৌশলাদি :

(১) ইতিমধ্যেই সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকাসমূহে বর্তমান সুযোগ-সুবিধার সর্বাধিক ব্যবহার ও এলাকার উৎপাদনশীলতার উন্নয়নের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সেচ ব্যবস্থাধীন এলাকার উন্নয়ন, সুষ্ঠু পানি বিতরণ, শস্য-মাটি-পানি ব্যবস্থাপনার চলতি নিরীক্ষের উন্নয়নকে উৎসাহিত করা হবে।

(২) সকল অসমাপ্ত প্রকল্প যত দ্রুত সম্ভব সমাপ্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এজন্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে চলতি প্রকল্পগুলোকে পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ করা হবে।

(৩) নতুন প্রকল্প তৈরীর সময় স্বল্প সমাপ্তি কাল, ব্যয় ও স্বয়ংনির্ভর পানি প্রকল্পের উপর জোর দেয়া হবে; তবে শুকনো মৌসুমে ক্ষুদ্র প্রকল্পসমূহে পানি সরবরাহের নিশ্চিতে পানি সংরক্ষণের জন্য দরকারী বৃহৎ প্রকল্পগুলো এ কৌশলের বাইরে থাকবে। ফলে পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বন্যানিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও গ্রাভিটি সেচ এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলো (এস এস পি, এস টি ডব্লিউ, ডি টি ডব্লিউ) বাস্তবায়নের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পানি খাতের মহাপরিকল্পনা সমীক্ষা (সংক্ষেপে এমপিও ষ্টাডী) পানি খাতের প্রধান ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

(৪) বড় প্রকল্পগুলোকে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য স্বতন্ত্র/স্বনির্ভর ইউনিটে ভাগ করা হবে।

(৫) পানি নিষ্কাশন ও সেচ কর্মসূচীর সুবিধাভোগী হিসেবে স্থানীয় জনসাধারণকে সেগুলোর বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হবে, বিশেষ করে তাদের স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে।

(খ) দীর্ঘমেয়াদী কৌশলাদি

(১) **প্রধান প্রধান নদীর ব্যবহার :** তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বড় বড় নদী থেকে ছোট ছোট নদীর প্রবাহ বাড়ানো হবে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা প্রভৃতি নদী থেকে বৃহত্তর ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্লোটিং/বার্জ মাউন্টেড পাম্পের ব্যবহারের মাধ্যমে বড়াল, বাঙ্গালী, ধলেশ্বরী, পুরোনো ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ বাড়ানো হবে।

(২) **অববাহিকা-ওয়ারী উন্নয়ন :** পানি সম্পদের চূড়ান্ত উন্নয়নের জন্য দরকার মৌসুম ও এলাকা অনুযায়ী পানি ভারসাম্যের জন্য সংহত কাঠামোর মধ্যে ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভের পানির অববাহিকাওয়ারী উন্নয়ন। পানি উন্নয়নের জন্য মহাপরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও মোট সম্ভাব্য পানি সম্পদ বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ পানির জন্য দরকার ব্যাপক পরীক্ষা ও গবেষণা। কোন কোন নদীতে কতগুলো চালু প্রকল্প রয়েছে যেমন, আত্রাই-হুরা সাগর অববাহিকার চলন বিল, পাবনা ও বগুড়া প্রকল্প, কালীগংগা-ধলেশ্বরী অববাহিকায় ঢাকা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রকল্প, ডাকাতিয়া অববাহিকায় নোয়াখালী প্রকল্প ইত্যাদি। মেঘনা অববাহিকা ও হাওর এলাকাগুলোর উন্নয়ন এক জটিল সমস্যায় উপনীত হয়েছে, অন্যদিকে মেঘনা-সুরমা পানি প্রণালীর মধ্যের সুরমা নদী ব্যাপকভাবে পরীক্ষার দাবী রাখে। ব্যাপক কাঠামো পাওয়া গেলে পর্যায়ক্রমে উজান ও ভাটিতে এগুলোর প্রভাব নিরবচ্ছিন্নভাবে মনিটরিং করে উন্নয়নকার্য পরিচালনা সম্ভব হবে।

(৩) তিস্তা বাঁধের মত দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের কাজ অব্যাহত থাকবে এবং ব্রহ্মপুত্র ও গংগা বাঁধের সমীক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

২.১৮। **মাটি সংরক্ষণ ও বনায়ন :** যে সব নদী বন্যা জোরদার করে সেই সকল নদীর মুখে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। গতিকে স্তিমিত করা ছাড়াও পানি বিতরণ ব্যবস্থা নদীতে পলি প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করবে, যেহেতু পলি প্রবাহ নদীর গতিকে অস্থিতিশীল করে ফেলে। কর্মসূচীর বাস্তবায়নে মাটি সংরক্ষণ, প্রকৌশল, বনায়ন ও কৃষি সহ বহুমুখী এপ্রোচের প্রয়োজন হবে।

২.১৯। বনায়ন ও মাটি সংরক্ষণের সাথে সাথে পরিবেশকে অবনতি থেকে রক্ষা করার জন্য একটি পূর্ব সতর্কাবস্থা গড়ে তুলতে হবে। রাসায়নিক ধর্ম, উত্তাপ ও তাপমাত্রা, বাইরের জিনিস, পলি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে পানির নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের আকারে এই কাজটি করা যেতে পারে। তবে এটি অবশ্যই নিয়মিত ও সঠিকভাবে এবং দ্রুতগতিতে সম্পাদন করতে হবে, যাতে পাল্টা ব্যবস্থা সময়মত নেয়া যায়। বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত SPARRSO-এর সাহায্যে গ্রাউণ্ড লিংক প্ল্যাটফরম বিভিন্ন অববাহিকায় স্থাপিত করা যায়, যাতে সমন্বিত পদ্ধতিতে ভূপৃষ্ঠস্থ এবং শিলান্তরের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

২.২০। **বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি :** বাংলাদেশের জন্য বন্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা এবং মাঝে মাঝে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কাজেই বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য এবং বন্যার দুর্ভোগ লাঘব ও ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার ব্যাপারে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরিসংখ্যান সংগ্রহের যুক্তিসংগত ও বাস্তবসম্মত ভিত্তি থাকা দরকার। এমন একটি তথ্য তালিকা থাকা দরকার যার দ্বারা প্রশাসন বিভিন্ন মাত্রার বন্যা উপদ্রুত এলাকা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেন। এই প্রচেষ্টা মৌলিক উপায় ও কার্যকরভাবে বন্যা সমস্যা মোকাবেলা করার জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যকে নিম্নতম পর্যায়ে আনতে সাহায্য করবে। ১৯৮৪ সালের বন্যা পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা এবং একে মোকাবেলা করার তৎপরতা বন্যা ও অনুরূপ দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য একটা ব্যবহারিক কাঠামোর উন্নয়নের ভিত্তি হতে পারে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী :

২.২১। পূর্বেই উল্লেখিত সেচের আওতাধীন এলাকার পরিমাণ ১৯৮৯/৯০ সালের মধ্যে ১৯৮৪/৮৫ সালের স্থিতাবস্থা ৬১.২০ লাখ একর থেকে প্রায় ৯৬.৪৪ লাখ একরে বৃদ্ধি করা হবে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুযোগ-সুবিধা ৮২.৫৪ লাখ একরে প্রসারিত করা হবে। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কর্মসূচী নীচে আলোচিত হল।

২.২২। **গ্র্যাভিটি ফ্লো সেচ :** বিডব্লিউডিবি সেচের জন্য মোট ৯৬.৪৪ লাখ একরের মধ্যে ১৪.৯৪ লাখ একর গ্র্যাভিটি ফ্লো সেচের আওতায় আনার জন্য অতিরিক্ত ১০.১৯ লাখ একরে প্রসারিত করবে। ১৯৮৪/৮৫ সালে গ্র্যাভিটি ফ্লো সেচের আওতায় ছিল ৪.৭৫ লাখ একর। গ্র্যাভিটি ফ্লো সেচের সম্প্রসারণ ছাড়াও বিডব্লিউডিবিকে অতিরিক্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু অতীতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং এসব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীভূত না করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে।

২.২৩। **কর্মসূচী :** গ্র্যাভিটি ফ্লো সেচের আওতায় নিম্নলিখিত কর্মসূচী নেয়া হবে :

(১) ইউনিয়ন পরিষদ সেচের জন্য সর্বাধিক ১,০০০ একরে এবং পানি নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ২,৫০০ একরে ছোট ছোট প্রকল্পের উদ্যোগ নেবে, প্রস্তাব গ্রহণ করবে, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবে। পরিকল্পনা মেয়াদে এসব প্রকল্পের মোট সংখ্যা হবে ৪ হাজারের মত। এসব প্রকল্পের প্রকৌশলগত দিক সহ বিস্তারিত হিসেব তৈরী করবে উপজেলা প্রকৌশলী। এ ব্যাপারে কারিগরি সহযোগিতা দরকার হলে বিডব্লিউডিবি তার ব্যবস্থা করবে। উপজেলা পরিষদ ৩.৪৫ লাখ একর জমিতে সেচ করবে।

(২) প্রতিটি উপজেলায় সেচের জন্য সর্বাধিক ৫,০০০ একরের এবং পানি নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১০,০০০ একরের ছোট প্রকল্প নেয়া হবে। পরিকল্পনায় এধরনের প্রায় ৫০০টি প্রকল্পের ব্যবস্থা রয়েছে। ছোট ছোট প্রকল্পের প্রকৌশল ও কারিগরি দিক বিভিন্নভাবে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলাপ আলোচনা করে নির্ধারণ করবে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের উপর অর্পণ করা যেতে পারে।

(৩) চলতি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ছাড়াও তৃতীয় পরিকল্পনায় যেসব বড় প্রকল্প হাতে নেয়া হবে সেগুলো হলো (ক) রাজশাহী সেচ প্রকল্প, (খ) বড়াল সেচ প্রকল্প, এবং (গ) দৌলতপুর ডাকুরহদা সেচ প্রকল্প। গুরুত্বপূর্ণ চলতি প্রকল্প হল তিস্তা বাঁধ প্রকল্প।

(৪) পরিকল্পনা মেয়াদে যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরীক্ষাধীন রয়েছে সেগুলো হল ব্রহ্মপুত্র বাঁধ, ধরলা বাঁধ, দুধকুমার বাঁধ প্রকল্প এবং মেঘনা ধুহুরী পানি স্থানান্তর প্রকল্প।

(৫) গংগা ও ব্রহ্মপুত্রে অবস্থিত ড্রেজার/ভাসমান পাম্পের মাধ্যমে বর্তমান নদীগুলোতে পানি প্রবাহিত করে পানি উত্তোলন।

(৬) শীতকালে ব্যবহারের জন্য সবগুলো চ্যানেলে বর্ষার প্রবাহ সংরক্ষিত করার লক্ষ্যে সারাদেশে বড় ও ছোট পানি নিষ্কাশন স্কীমের উন্নয়ন।

(৭) নদীর ভাংগন থেকে গুরুত্বপূর্ণ শহর, গঞ্জ, বাজার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহকে রক্ষা করা।

(৮) দেশের সম্ভাব্য অবস্থানসমূহে পানি সংরক্ষণ প্রকল্প নেয়া হবে। এসব প্রকল্পের আওতায় ২ লাখ একর জমিতে সেচ দেয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

২·২৪। **এল এল পি:** ১৯৮৯/৯০ সাল নাগাদ আবাদি জমির ২১ লাখ একরে সেচ দেয়ার জন্য মোট ৬০,০০০ টি লো-লিফট পাম্প চালু করা হবে। এরমধ্যে ৩০,০০০ সেট লো-লিফট পাম্প ১-কিউসেক, ও ৩০,০০০ সেট ২-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন। অন্যদিকে ১৯৮৪/৮৫ সালে চালু ছিল ৪৮,০০০টি (১-কিউসেক: ২০,০০০ টি ও ২-কিউসেক: ২৮,০০০ টি)। ফলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অতিরিক্ত ৩.৪০ লাখ একর জমিতে সেচ দেবার জন্য অতিরিক্ত ১২,০০০ টি লো-লিফট পাম্প চালু করা হবে।।

২·২৫। **অগভীর নলকূপ:** ১৯৮৯/৯০ সাল নাগাদ ২৫ লাখ একর জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য মোট ২০০,০০০টি অগভীর নলকূপ চালু করা হবে। অন্যদিকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৯.২৫ লাখ একর জমি সেচ দেওয়ার জন্য ১৫৪,০০০টি অগভীর নলকূপ চালু করা হয়েছিল। এর অর্থ হল এই পরিকল্পনা মেয়াদে অতিরিক্ত ৪৬,০০০টি অগভীর নলকূপ চালু করা হবে। উপরন্তু ২১,০০০টি অগভীর নলকূপ পরিবর্তন করা দরকার। এতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অগভীর নলকূপের মোট চাহিদা হবে ৬৭,০০০ টি। এই কর্মসূচী বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।

২·২৬। **গভীর নলকূপ:** ১৯৮৯/৯০ সাল নাগাদ চালু নলকূপের সংখ্যা ৩০ হাজারে বাড়ানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এতে ১৮ লাখ একর জমিতে সেচ দেয়া যাবে। অন্যদিকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৭,০০০টি গভীর নলকূপ দিয়ে ১০·২০ লাখ একর জমিতে সেচ দেয়া হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে ৩,০০০টি পরিবর্তন সহ মোট ১২,০০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে। এ সংখ্যা ১৯৮৪/৮৫ সাল পর্যন্ত ইতিমধ্যেই স্থাপিত ২১,৪৮৫টি গভীর নলকূপের অতিরিক্ত। ফলে ১৯৮৯/৯০ সাল নাগাদ স্থাপিত নলকূপের সংখ্যা ৩০,৪৮৫টিতে দাঁড়াবে।

২·২৭। **হস্তচালিত নলকূপ:** তৃতীয় পরিকল্পনায় ১.৩৫ লাখ একর জমিতে সেচের জন্য ৪৫০,০০০টি হস্তচালিত নলকূপ চালু করা হবে। অন্যদিকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ০.৯০ লাখ একর সেচের জন্য ৩০০,০০০টি হস্তচালিত নলকূপ চালু ছিল। চালু হস্তচালিত নলকূপের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা ১৮০,০০০টি এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২৭০,০০০টি নলকূপ পরিচালনা করবে।

২'২৮ সনাতন পদ্ধতি : ১৯৮৯/৯০ সাল নাগাদ সনাতন পদ্ধতির সাহায্যে ৮.০০ লাখ একর আবাদি জমিতে সেচ দেয়া হবে বলে হিসেব করা হয়েছে।

২'২৯ কমান্ড এলাকা উন্নয়ন (সিএডি) : বর্তমান সেচ সুবিধার (অগভীর নলকূপ, গভীর নলকূপ ও লো-লিফট পাম্প দক্ষতা বাড়িয়ে সিএডি কর্মসূচীর মাধ্যমে ৪.৭০ লাখ একর এলাকা সেচের আওতায় আনা হবে।

অর্থ বরাদ্দ

২.৩০। পানি সম্পদ কর্মসূচীর জন্য সরকারী খাতে প্রধান দায়িত্বশীল সংস্থাগুলো হল বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন সংস্থা ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা। সরকারী খাতের সংস্থাসমূহের জন্য মোট অর্থ বরাদ্দ হল ২,৭০৩ কোটি টাকা। তাদের কর্মসূচীভিত্তিক বরাদ্দ নীচে দেয়া হল :

সারণি ২'৬

অর্থ বরাদ্দ (১৯৮৫—৯০)

(কোটি টাকায়)

সংস্থা/কর্মসূচী	অর্থ বরাদ্দ			আদায় বাদে নীট
	নন রেকারিং	রেকারিং	মোট (গ্রোস)	
১	২	৩	৪	৫
ক। বিডব্লিউডিবি :				
(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন :				
(১) প্রধান প্রকল্পসমূহ	১,৪৭৪	—	১,৪৭৪	১,৪৭৪
(২) ছোট ও মাঝারি প্রকল্প	৩৯৬	—	৩৯৬	৩৯৬
(৩) ব্লক প্রভিশন (শহর রক্ষা, নদী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি)	৩৫	—	৩৫	৩৫
(৪) অন্যান্য (ড্রেজার, এম ই ও)	৩৫	—	৩৫	৩৫
(খ) জরীপ, তদন্ত ও সমীক্ষা	১১০	—	১১০	১১০
উপ-মোট (ক) :	২,০৫০	—	২,০৫০	২,০৫০
খ। বিএডিসি :				
(১) ডিটিডব্লিউ	৫৪২	—	৫৪২	৩৬৭
(২) এসটিডব্লিউ	২১০	—	২১০	৩০
(৩) এল এল পি	৩৩৪	—	৩৩৪	২৩০
(৪) অন্যান্য	১৪	—	১৪	১৩
উপ-মোট (খ) :	১,১০০	—	১,১০০	৬৪০
(গ) অন্যান্য সংস্থা :				
বিবিধ প্রকল্প	১৩	—	১৩	১৩
মোট (ক+খ+গ) :	৩,১৬৩	—	৩,১৬৩	২,৭০৩

বেসরকারী বিনিয়োগ

২.৩১। সরকারী খাতের বরাদ্দ ছাড়াও বেসরকারী খাতে বিশেষ করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর ঋণদান ব্যবস্থার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে। কৃষি ঋণের দ্রুত প্রসারের ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। এতে ছোট আকারের সরঞ্জামে ভর্তুকি প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়াও হ্রাস পেয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মতই তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও ঋণ সম্প্রসারণে কৃষি ঋণ আদায়ের নিম্নহার বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ঋণ সম্পদের চক্রমণ নিঃসন্দেহে বিনিয়োগের জন্য শুভ লক্ষণ, কিন্তু এর ব্যর্থতা কৃষির জন্য কোন অদ্ভুত ব্যাপার নয় এবং এর সংখ্যা অনুসন্ধানের দরকার পড়ে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উপর্যুপরি বন্যা ও অনাবৃষ্টির দরুন কৃষকের ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। নিরাপত্তার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার জন্য বেগবর্ধক পন্থা না হয়ে এটা অবশ্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে একটা জুয়া খেলায় পরিণত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এ নীতিই সজ্ঞানে অনুসরণ করা হবে। কিন্তু বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পদের ঘাটতি বন্ধ করার জন্য ঋণ প্রদানের উপর জোর দেয়া হবে। পরিকল্পনা মেয়াদে স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন ঋণ বাদে কৃষি বিনিয়োগ ৪,৪০০ কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছবে বলে আশা করা যায়। এই অংকের মধ্যে সিংহভাগ বরাদ্দ করা হবে সেচ সরঞ্জামের জন্য।

নীতিগত বিষয়

২.৩২। সেচ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কতিপয় সমস্যা পরিকল্পনা মেয়াদে চিহ্নিত করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণগুলো হল:

(১) **ভর্তুকির যৌক্তিকতা :** বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায় গেছে যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের সেচ পদ্ধতির অনুসরণে প্রাপ্ত সাফল্যের হার বেশ উচু। দেখা গেছে কৃষকদের সাধারণভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্বৃত্ত থাকে। তাসত্ত্বেও তারা সেচের জন্য ব্যয়ের ভগ্নাংশ মাত্র বহন করে। এছাড়াও বিভিন্ন সেচ সরঞ্জাম ও সুযোগ সুবিধা ব্যবহারকারীদের মধ্যে চোখে পড়ার মত বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। বিএডিসির ভাড়ায় খাটানো কর্মসূচীর আওতায় সেচ সরঞ্জামের জন্য পেট্রোলিয়াম অয়েল, লুব্রিক্যান্ট ও চালকের বেতন বাবদ ব্যয়সমূহ সম্পূর্ণভাবে কৃষকরা বহন করে থাকে। কিন্তু তারা বার্ষিক মূলধন ব্যয়ের সামান্যই বহন করে থাকে। ব্যবহারকারীরা সেচের বার্ষিক মোট ব্যয়ের ৫০% থেকে ৮৫% পরিশোধ করে থাকে যা সরঞ্জামের ধরনের উপর নির্ভরশীল। বিক্রয় কর্মসূচীর আওতায় সরঞ্জামের জন্য বিএডিসির সদর দফতরের উপরি ব্যয় ও এর প্রকল্পসমূহের ব্যয় সম্পূর্ণভাবে সরকার বহন করে। সরকার লো-লিফট পাম্পের ক্ষেত্রে মূলধন ব্যয়ের ২৫% এবং গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে ৭৫% ভর্তুকি দেয়। অগভীর নলকূপের ক্ষেত্রে কোন ভর্তুকি দেয়া হয় না। বিডব্লিউ ডি বি'র আওতায় সেচ সুবিধার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা নামমাত্র অর্থ প্রদান করে। গ্র্যাভিটি সেচ প্রকল্পের জন্য পানির হার সংগ্রহ এখনও কার্যকর হয়নি। সেচের সব পদ্ধতির উপরেই ভর্তুকির বিষয়টি যুক্তিসংগত করা হবে।

(২) **সেচ সরঞ্জামের মানোন্নয়ন :** সেচকার্যে বহু ধরণের বিশেষ করে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে মজুদের হিসেব রক্ষা, বিক্রয়োত্তর রক্ষণাবেক্ষণ, চালানো এবং যন্ত্রাংশের নিয়মিত সরবরাহে সমস্যা দেখা দেয়। ইঞ্জিনের অনুপযোগী গঠন সেচ সরঞ্জামের অদক্ষ ব্যবহারকে আরো বাড়িয়ে তোলে। বর্তমানে দেশে বিভিন্ন জাতের ইঞ্জিনের দ্রুত ও দক্ষ মেরামত সুবিধার অভাব রয়েছে যারফলে সেচ মৌসুমে প্রায়ই ইঞ্জিন ভেংগে যায়। বর্তমানে বিএডিসি'র অগভীর নলকূপ ইঞ্জিনের সুবৃহৎ মজুদ রয়েছে।

এসব ইঞ্জিনের বিকল্প ব্যবহার খুঁজে বের করতে হবে। বিশেষ করে ২,২০০ আর পিএম'র চাহিদা অগভীর নলকূপের জন্য মানানসই। এর সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবহার লো-লিফট পাম্প, যন্ত্রচালিত নৌকা ইত্যাদিতে হতে পারে।

(৩) **কার্যকর সমন্বয়ের অভাব :** আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে ছোটখাট যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরবরাহপেক্ষা রয়েছে। এবং এদের কাজের সম্পূর্ণভাবে পৃথক দুটি ধারা আছে। এগুলো হলো স্থাপন-পূর্ব কাজ এবং স্থাপন-পরবর্তী কাজ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি ব্যাংক, পল্লীউন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ পরিদপ্তর ইত্যাদি সেচ কর্মসূচী বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। সেচ কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য কার্যকর ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। উপরে বর্ণিত বিক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণের উভয় পর্যায়ে নেতৃত্ব ও দায়িত্বের ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(৪) **পানি আইন ও প্রশাসন :** বাংলাদেশে প্রয়োজনের সময় পানির অভাব দেখা দেয় যা তার বিবিধ ব্যবহারকারীদের মাঝে সঠিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে সমস্যা আরো বাড়িয়ে তোলে এমনকি কৃষি ক্ষেত্রেও উত্তোলিত পানির অত্যাধিক ব্যবহার পানির স্তর পরিবর্তন করে ও লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সারাদেশের পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই ভূ-পৃষ্ঠের ওপরের ও নীচের পানি ব্যবহারের উপর যথার্থ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় ও অববাহিকা পর্যায়ে উপযুক্ত পানি আইন প্রণয়ন করতে হবে।

পরিচ্ছেদ ৩ : পশু সম্পদ উন্নয়ন

আনুমানিক হিসেবে দেশে গরু ও মহিষের সংখ্যা ২ কোটি ৩২ লাখ ২০ হাজার, ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা ১ কোটি ৭ লাখ ২০ হাজার এবং হাঁস-মুরগীর সংখ্যা ৮ কোটি ৪২ লাখ ৫০ হাজার। কৃষি ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হালচাষ ও গাড়ী টানার একমাত্র উপায় হচ্ছে গরু ও মহিষ। আর ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগী পালন হচ্ছে জীবন ধারণ উৎপন্নতার এক বাড়তি উৎস। আংশিকভাবে হালচাষের জন্য ব্যবহৃত হলেও দুগ্ধবতী গাভী বাদ দিলে এখানে ১'২০ কোটি বা ততোধিক গো-মহিষ চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে মানুষের ঘনবসতির মতই বাংলাদেশে গবাদি পশুর সংখ্যাও সর্বাধিক। যদিও জীবিকা নির্বাহে কৃষিতে খামার গৃহস্থালী পর্যায়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল তবুও এখনো ৩ একরের নীচে জমির মালিক এমন পরিবারের ৪০%-এর হাতে কোন হালটানার পশু নেই। অপর পক্ষে খাদ্য ও পশু খাদ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা এমন তীব্র হয়েছে যে লাঙ্গল টানা শক্তি হিসেবে গবাদি পশুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। দেশে গবাদি পশুর সংখ্যা অত্যধিক হলেও চাষের জন্য লভ্য পশুশক্তির পরিমাণ একর প্রতি ০'০২৮ কিলোওয়াট, যা সাধিক চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় একর প্রতি ০'১৫১ কিলোওয়াট-এর এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ কম। গবাদি পশু ছাড়া কৃষিকাজ সম্ভব নয় বলে অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্তে চাষী জনসমষ্টি ও পশু সম্পদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রবল। চাষাবাদে প্রয়োজনীয় পশুশক্তির ঘাটতি থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে গাভী দিয়েও হালচাষ ও গাড়ীটানার কাজ করানো হয়। প্রায় ৩৫ লাখ গাভী দিয়ে হালচাষ করানো হচ্ছে যা মোট বলদের সংখ্যারও বেশী। গাভী দিয়ে হালচাষ করানো দেশে দুগ্ধ ঘাটতির একটি প্রধান কারণ। দুধের বর্তমান উৎপাদন ১০ লাখ টনেরও কম বা মাথাপিছু প্রায় ০'০২ কিলোগ্রাম বা দৈনিক গাভীপিছু ০'৬৫ কিলোগ্রাম। গবাদি পশুর দুর্বল চাষ ক্ষমতার মতোই শেষোক্ত সংখ্যাটি গাভীর খুব নিম্নপরিমাণের দুগ্ধোৎপাদন নির্দেশ করে। হালচাষে গাভী ব্যবহার করা হলে তা গাভীর দুগ্ধ প্রদানের মেয়াদ ও গাভীর বাছুর প্রসবের ক্ষমতা প্রতিহত করে ও দুধের মানও নষ্ট হয়ে যায়। যদিও গাভীর দৈত্ব ব্যবহার হিসেব করলে মনে হবে যে দুধের পরিবর্তে তার কাছ থেকে পশুশক্তি পাওয়া যাচ্ছে, তথাপি বাস্তবে দুগ্ধদানের পরিবর্তে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করলে কম শক্তিই পাওয়া যায়। অন্যদিকে খাদ্যোৎপাদনের ফলে গো-খাদ্যের সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এর কিছুটা কারণ চারণ ভূমির ক্রমহ্রাস, কিন্তু মূল কারণ হলো দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট ধানের পরিবর্তে ক্ষুদ্র কাণ্ড বিশিষ্ট ধানের চাষ বৃদ্ধি।

অতীত উন্নয়নের সার্বিক চিত্র

৩'২। পশু পালন খাতের শোচনীয় অবস্থা এর বিভিন্ন উৎপাদনে প্রতিফলিত হয়েছে। আমিষের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় দুধের উৎপাদন বেড়েছে খুব সামান্যই। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যথাক্রমে এসবের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল একত্রে ১'৭৮% ও ১'৮০%। নিচের সারণিতে এই দুটি পরিকল্পনাকালে এসব পণ্যের উৎপাদনের অবস্থা দেখানো হল:

সারণি ৩'১

পশু খামারজাত পণ্যের উৎপাদন

পণ্য	প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়			দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়		
	১৯৭২/৭৩	১৯৭৭/৭৮	গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫	গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)
১। দুধ ('000' টন)	৭০১'৬৫	৭৫২'৮৭	১'৪০	৭৭১'৯০	৮২৫'০০	১'৩৮
২। মাংস ('000' টন)	১৫৯'০০	১২৯'৬০	২'৫৫	১৬৮'৬২	২১৫'০০	২'৬৯
৩। ডিম (কোটি সংখ্যায়)	৬৬'০০	৮৯'৬০	৬'৩০	১০০'৭০	১৩৫'০০	৬'০৪
('000' টন)	২৬'৪৯	৩৫'৯৬	৬'৩০	৪০'৪৩	৫৪'১৯	৬'০৪
মোট ('000' টন):	৮৮৯'১৪	৯৬৮'৪৩	১'৭৮	১,০০০'৯৫	১,০৯৪'১৯	১'৮০

দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ক্রমহ্রাসমান প্রবণতার কারণ হলো দেশী জাতের গরুর দৈহিক গড়ন তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট, পর্যাপ্ত খাদ্য ও সবুজ লতাপাতা জাতীয় পশুখাদ্যের অভাব এবং শুকনো পশু-খাদ্যের উচ্চ মূল্য।

৩'৩। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রধান প্রধান নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পশু ও হাঁস-মুরগীর মৃত্যুর হার কমানো, প্রজনন ও দৈহিক উৎপাদনের মান উন্নত করার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি। কিন্তু খাতওয়ারী কর্মসূচী-গুলো প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে যার ফলে বরাদ্দকৃত সম্পদ পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ করা হয় ১০৭'৩ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র ৫৭'৯৭ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে গবাদি পশুর মৃত্যুহার কমানোও সম্ভব হয়নি। দৈহিক উৎপাদন ক্ষমতা, পর্যাপ্ত গবেষণা ও প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাবই এর মূল কারণ। এসব কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে খুবই ধীর গতিতে।

গ্রন্থাগার ... বাংলা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

৩.৪। তৃতীয় পরিকল্পনায় পশুপালন উপ-খাতের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

(১) উন্নত পশু-চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং খাদ্য ও জোয়ালের উন্নয়ন ঘটিয়ে গরু ও মহিষ উভয়বিধ পশুশক্তির সরবরাহ বৃদ্ধি করা ;

(২) পৃথক হাজব্যাণ্ড্রী হিসেবে পশুপালন খামার সৃষ্টিতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে দুধ, মাংস, চামড়া, ডিম ইত্যাদি বিশেষ করে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ;

(৩) গবাদি পশু, ছাগল এবং হাঁসমুরগী পালনের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষক ও মহিলাদের জন্যে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলাদি

৩.৫। উপরের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করা হবে :

(১) **পশুশক্তির উন্নয়ন :** আগেই আলোচনা করা হয়েছে, বর্তমান পশুশক্তি প্রয়োজনীয় শক্তির মাত্র এক তৃতীয়াংশ। এটি সম্পূর্ণতঃ গবাদি পশুর ঘাটতির কারণে হয়নি বরং এর কারণ হলো (ক) দুর্বল স্বাস্থ্য, (খ) বৈষম্যপূর্ণ মালিকানা বৈশিষ্ট্য এবং (গ) ত্রুটিপূর্ণ জোয়াল বা চাষযন্ত্র। যেহেতু সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হলে চাষের পরিমাণও বেড়ে যাবে সেহেতু পশুশক্তির চাহিদাও যাবে বেড়ে। কাজেই খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য পশুশক্তি বৃদ্ধি করাও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে। চারণক্ষেত্র ও খাদ্যের ঘাটতি থাকায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রথমে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জীবাণু প্রতিরোধসহ রোগ নিয়ন্ত্রণের উপর এবং স্বল্পমেয়াদে পশুখাদ্যের যোগান বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এবং দীর্ঘমেয়াদে বংশগত উন্নয়নের উপর। পরিকল্পনায় একই সাথে কৃষি ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অধিকতর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি খেয়াল রাখা হবে। ঋণ সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ধরনের অন্তর্ভুক্তিকে নিশ্চিত করা গেলেই বর্তমান অসম সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হবে কিন্তু যেহেতু এতে ঋণ দানের আগে ও পরে সম্পদ হারানোর ঝুঁকি থাকে সেহেতু সম্প্রদায় পর্যায়ে ভাড়ার উদ্দেশ্যে পশুশক্তির খামার উন্নয়নের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করতে হবে। এটি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, অসম বণ্টন ব্যবস্থার কারণে বিপুল সংখ্যক চাষী ভাড়া করা পশুশক্তির উপর নির্ভর করে। পরীক্ষামূলকভাবে বি এস এস/কে এস এস-এর অধীনে এজাতীয় খামার স্থাপন করা যেতে পারে। খাওয়ানোর খরচ অপেক্ষাকৃত কম বলে এখানে মহিষকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধুমাত্র যে সব এলাকায় পশুশক্তির অত্যধিক ঘাটতি রয়েছে সে সব এলাকায় গরুর পরিমাণ বাড়াতে হবে। পরিশেষে গবাদি পশুর জোয়াল ও কৃষিযন্ত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা নিতে হবে, কারণ বর্তমান কৃষিযন্ত্রগুলো মূলতঃ পশুশক্তির অদক্ষ ব্যবহারকেই বুঝায়। জোড়া হাল ও জোয়াল ব্যবহার করলে পশুর কাঁধ থেকে খুব কম শক্তিই লাংগলে সঞ্চারিত হয় এবং সমতল ফলা বিশিষ্ট লাংগলে জোড়া হাল ব্যবহার করলে লাংগলের শক্তির অপচয় হয় কারণ এধরনের লাংগলের ফলা রেখা বরাবর সমান গভীরতা দেখাতে পারে না। ফলে একই পরিমাণে গভীর করে হাল টানতে গেলে পশুকে অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করতে হয়। সেজন্যই খাদ্য ও পশু-চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে পশুর স্বাস্থ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি হাল, জোয়াল ও লাংগলের উন্নয়নসাধনও প্রয়োজন।

(২) **দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি :** প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালে এসব দ্রব্যের মাথাপিছু উৎপাদন ক্রমাগতহারে হ্রাস পেয়েছে। দেশে প্রতি ২৮ জনে মাত্র একটি দুগ্ধবতী গবাদি পশু রয়েছে এবং তা মাথাপিছু দৈনিক মাত্র ০'০২ কেজি দুধ সরবরাহ করছে। সংখ্যা ও দুগ্ধ উভয় দিক থেকেই এই পরিমাণ খুব কম এবং বিশেষ করে গাভীকে চাষের কাজে লাগানোর ফলে এদের দুধদানের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। দুগ্ধ খামার স্থাপনের অতীত প্রচেষ্টা পশুপালনের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখতে পারেনি। বরং দেখা গেছে, সমবায়ভিত্তিক প্রতি দুগ্ধ খামারেই দুধের সরবরাহে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দ্বৈত উদ্দেশ্যে পশুশক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে ভূমিহীন জনসংখ্যা থেকে শুরু করে বিদ্যমান সমবায়গুলোর পরিধিতে কৃষক পর্যায়ে দুগ্ধবতী গবাদি পশুর সরবরাহ নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া হবে। সাধারণ পশুপালনের চাইতে পৃথক এই দুগ্ধ উৎপাদনকারী পশুপালন ব্যবস্থা দ্রুততরভাবে পশুর বংশবৃদ্ধির সহায়ক হবে, অন্যান্য দেশে লব্ধ অভিজ্ঞতা যার সাক্ষ্য দেয়।

(৩) **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** পশুপালন হচ্ছে একটি শ্রমঘন কৃষি ব্যবস্থা। যেহেতু তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সেহেতু পশুপালনের উন্নয়ন সে লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। গৃহপালিত পশু চাষাবাদে সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে পাশাপাশি দুগ্ধ খামার ও প্রচুর পরিমাণে শ্রম শক্তির জন্য কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেবে। দ্বিতীয় যে ক্ষেত্রটি বর্তমানে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে এবং যাতে ভবিষ্যতে আরও সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে তা হলো ছাগল ও ভেড়া পালন। কারণ এর মাংস ও চামড়ার চাহিদা ব্যাপক। ছাগল ও ভেড়ার বর্তমান সংখ্যা হচ্ছে ১'০৭ কোটি। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালনের পাশাপাশি পুকুর ও বাওরে মাছ চাষ করা হলে তা খুবই লাভজনক হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

৩'৬। তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্য সরবরাহ, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও মজুদ বৃদ্ধির মাধ্যমে গৃহপালিত পশু সম্পদের উন্নয়নের জন্য ২৪৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

(ক) **খাদ্য ও জাব :** অপুষ্টি ও সহজে আক্রমণযোগ্য পশু-রোগ পশুশক্তি হ্রাস ও দুগ্ধ খামারজাত দ্রব্যের নিম্ন উৎপাদনের প্রধান কারণ। ভূমির সীমাবদ্ধতার কারণে সহজে জাব সরবরাহের উন্নয়নসাধন সম্ভবপর হবে না। তাই শস্য উৎপাদনের সাথে অথবা দুটি শস্য উৎপাদনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে জাব উৎপাদনের ব্যাপারে কৃষকদের উৎসাহিত করা হবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঘাস সরবরাহ কর্মসূচীতে অধিক ফলনশীল জাতের ঘাস যেমন নেপিয়ার, প্যারাগুইন, পেংগলা, মেইজ, ইপিলিইপিল ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খাস জমি, রাস্তার ও খালের পাশের জমিতে এগুলো চাষের কর্মসূচী নিতে হবে। জেলা ও উপজেলা বীজ বিতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এসব ঘাসের বীজ ও চারা কৃষকদের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে হবে। ইউরিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে খড়ের উন্নয়নসাধন করে হজমসাধ্য গোখাদ্য হিসেবে এর ব্যবহারের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা হবে। আগেই বলা হয়েছে যে, পশুশক্তি হিসেবে গাভীর ব্যাপক ব্যবহার পশুর খাদ্যপ্রাপ্তির সমস্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে দেয়। হাঁস-মুরগীর জন্য পর্যাপ্ত খাবারের অভাবও ব্যাপক আকারের হাঁস-মুরগী খামার স্থাপনের পথে বড় একটি

বাধা। কৃষি বর্জ্য ও খাদ্যশস্যের অবশিষ্টাংশ যেমন, তুঁষ, ভুষি ব্যবহারের পাশাপাশি মৎস্যখাত সমুদ্রের পানি থেকে অভক্ষ্য মাছ সংগ্রহ করে গো ও হাঁস-মুরগীর খাদ্য ঘাটতির মোকাবিলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সে সাথে কসাইখানা থেকে সংগৃহীত উচ্ছিষ্ট যেমন, রক্ত, নাড়িভুঁড়ি, হাড় ইত্যাদি বেসরকারী পর্যায়ে সংগঠিত পশু ও হাঁস-মুরগীর খাদ্য প্রস্তুতের কারখানায় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

(খ) **রোগ নিয়ন্ত্রণ ঃ** বিভিন্ন রোগ ও সংক্রমণের কারণে পশুর মৃত্যু ও স্বাস্থ্যহানি পশু সম্পদের উন্নয়নের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি। প্রতি বছর বিভিন্ন রোগে দেশের ১০% পশু ও ৩০% হাঁস-মুরগী জাতীয় পাখি মারা যায়। ফলস্বরূপ বংশগতি উন্নয়নের মাধ্যমে পশুসম্পদ বৃদ্ধির জাতীয় প্রচেষ্টায় এক বড় অংশের প্রতিনিয়ত অপচয় ঘটছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সেজন্যই পশু খাতের উন্নয়নে রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের ওপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর মধ্যে থাকবে দুটি ঘনিষ্ঠ প্রচেষ্টা। সেগুলো হলো রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়। তন্মধ্যে মূলতঃ প্রথমটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এই পরিকল্পনায় ৫০% পশুকে রোগ প্রতিরোধের আওতায় আনা হবে এবং ৩০ কোটি ডোজ ভ্যাকসিন উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত কার্যকারিতা রক্ষার জন্য ঢাকার মহাখালিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় টিকা গবেষণাগারে উৎপাদিত বিভিন্ন রকম প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা সামগ্রী ২০টি পুরাতন জেলা সদরে বিতরণ করা হবে এবং সেগুলো সংরক্ষণের জন্য ঠাণ্ডা কক্ষের সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। এসব জায়গা থেকে ভ্যাকসিন এম্পুলগুলো নতুন জেলাগুলোতে ও ৪৬০টি উপজেলা সদরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং উপজেলাগুলোকে ভ্যাকসিনের জন্য উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাসম্পন্ন করে তোলা হবে। প্রতিটি উপজেলায় হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর প্রতিষেধক প্রদান ও নির্দিষ্ট কিছু সাধারণ রোগের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাপারে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। এর ফলে তারা প্রতিটি ইউনিয়নে যথাযথভাবে প্রতিষেধক বিতরণে সক্ষম হবে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে বর্তমানে ৩৭০টি উপজেলা হাসপাতাল/ডিসপেনসারীর সুবিধা রয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত আরো ৬৭টি ডিসপেনসারী নির্মাণ করা হবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় অনেক বেশী রোগ নিরাময় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোও প্রতিষেধক ওষুধের ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) **বংশগত উন্নয়ন ঃ** কৃত্রিম প্রজনন ও অন্যান্য স্বাভাবিক ব্যবস্থায় উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বর্তমানে আমাদের যে দেশীয় পশু রয়েছে তাদের বংশমানের উন্নয়ন করা হবে। স্বাভাবিক ব্যবস্থায় প্রত্যন্ত ও দুর্গত অঞ্চলসমূহে উন্নত প্রজননক্ষম ষাঁড় সরবরাহ করা হবে। এ সব ষাঁড়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের ওপর। প্রজনন কর্মসূচীকে জোরদার করার জন্য বর্তমানে ২০টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ও ৬৭টি উপকেন্দ্রের বাইরে অতিরিক্ত আরো ১৫টি অতিরিক্ত জেলায় কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে যাতে বর্তমানে যে ৩০০টি উপজেলা এই সুবিধা লাভ করছে তার বাইরেও কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থার আওতা সম্প্রসারিত করা যায়। তদুপরি, এই কর্মসূচীতে দুধ বহুল এলাকায় গবাদি পশুর উন্নয়নে বেশী জোর দেয়া হবে। তরলশুক্র ব্যবহারের পাশাপাশি পরীক্ষামূলকভাবে ৪টি নির্বাচিত উপজেলায় হিমায়িত ঘন শুক্র ব্যবহারে প্রচেষ্টা নেয়া হবে। গ্রাম পর্যায়ে, কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে বংশগতির উন্নয়নের কৌশল প্রসারিত করার জন্য উপজেলায়

অবস্থিত প্রতিটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের দু'জন সরকারী প্রজননকারী কৃত্রিম প্রজননের জন্য পূর্ব ব্যবস্থা মোতাবেক ইউনিয়ন পর্যায়ে সফর করবেন। বেংগল গোট ও উচ্চ বংশধারাতি সম্পন্ন রোগমুক্ত পুরুষ ছাগলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ৪টি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। সরকারী সেবা ব্যবস্থা প্রসারের মাধ্যমে বেসরকারী প্রজনন কেন্দ্রগুলোকে তাদের পুরোনো পুরুষ ছাগলগুলো বদলানোর ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হবে। অন্যান্য প্রজনন প্রচেষ্টার আওতায় আসবে মহিষ, ভেড়া ও হাঁস-মুরগী।

জনশক্তি উন্নয়ন ও গবেষণা

৩'৭। পশুসম্পদের ক্ষেত্র যেহেতু সুদূরপ্রসারী ও বিস্তৃততর হচ্ছে সেহেতু প্রজনন ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর কার্যকারিতা নির্ভর করছে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের উপর। সেলক্ষ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দক্ষ জনশক্তির উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীকে জোরদার করার প্রয়োজন হবে। প্রতি বছর প্রায় ৪৪০ জন অফিসার ও ১০০০ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীকে যথাক্রমে চাকুরীকালীন ও চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। একইভাবে ১৮,০০০ কৃষককে উন্নত পশুপালন পদ্ধতি অনুশীলন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি এল আর আই) এর নির্দিষ্ট গবেষণা কর্ম পশুসম্পদ ও হাঁস-মুরগীর উপযুক্ত প্রজননের উন্নয়ন, গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য উপযুক্ত জলজ উদ্ভিদ চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়নসাধন, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর জন্য উপযুক্ত খাদ্য ফর্মুলার উন্নয়নসাধন এবং মহামারী ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মারাত্মক ব্যাধির প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য যোগাবে।

ঋণ কর্মসূচী

৩'৮। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে গো-সম্পদের সংখ্যা প্রচুর হলেও ব্যাপক সংখ্যক ক্ষুদ্র কৃষকদের হাল চাষ করার মত কোন গো-সম্পদ নেই। কাজেই গরু বাছুর কেনার জন্য তাদের ঋণ সুযোগের আওতায় আনা হবে। এছাড়াও ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্যও হাঁসমুরগী ও দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য ঋণ সহায়তার প্রয়োজন হবে। এসব ঋণ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, গ্রামীণ ব্যাংক ও পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে।

প্রধান প্রধান উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

৩'৯। নীচের সারণিতে তৃতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হল:

সারণি ৩'২

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

পণ্য/সেবাসমূহ	১৯৮৪/৮৫ সালের উৎপাদন	১৯৮৯/৯০ সালের লক্ষ্যমাত্রা
১। দুধ ('০০০' টন)	৮২৫	৯৪০'০
২। মাংস ('০০০' টন)	২১৫	২৬৫'০
৩। ডিম (কোটি সংখ্যা)	১৩৫	২২০'০
৪। ভ্যাকসিন (কোটি মাত্রা)	৯'৩	৩০'০
৫। কৃত্রিম প্রজনন (লাখ সংখ্যা)	৪'০	৯'০
৬। উন্নত মুরগীর বাচ্চা বিতরণ করা হবে (লাখ)	২'০	১১'০

অর্থ বরাদ্দ

৩'১০। নীচের সারণিতে কর্মসূচীওয়ারী অর্থের বরাদ্দ দেখানো হল :

সারণি ৩'৩

কর্মসূচী-ওয়ারী অর্থ বরাদ্দ
(১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচীর নাম	স্থানান্তরিত প্রকল্প	নতুন প্রকল্প	মোট
১। পুষ্টি	——	১৭'৫৫	১৭'৫৫
২। সংরক্ষণ :			
(ক) প্রতিরোধ	——	৩১'০০	৩১'০০
(খ) চিকিৎসা	১৭'৪০	৩২'০০	৪৯'৪০
৩। প্রজনন :			
(ক) বড় পশু	১'৯৫	৩০'৫০	৩২'৪৫
(খ) হাঁস-মুরগী	১০'৭০	১৮'০০	২৮'৭০
(গ) ছোট পশু	——	৭'০০	৭'০০
৪। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা	৯'১০	২৩'৬০	৩২'৭০
৫। প্রতিষ্ঠান নির্মাণ	——	৪৫'০০	৪৫'০০
৬। বিবিধ	০'৭০	০'৫০	১'২০
মোট :	৩৯'৮৫	২০৫'১৫	২৪৫'০০

পরিচ্ছেদ ৪ : মৎস্য উন্নয়ন

'ভাত ও মাছ' বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যাভ্যাস এবং সাধারণ মানুষের জন্য প্রাণিজ প্রোটিনের প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ। বাংলাদেশে ব্যাপক বন্যা ও নদীবিধৌত সমতলভূমি রয়েছে। তবু গত দু'দশকে মাথাপিছু মাছের প্রাপ্তি মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬২/৬৩ সালে মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ছিল গড়ে ৩৩ গ্রাম; ১৯৭৯/৮০ সালে এই পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র ২০ গ্রামে এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে তা নামমাত্র বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২১ গ্রামে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আভ্যন্তরীণ মৎস্য প্রাপ্তির পরিমাণ ৬'৩৬ লাখ টন থেকে বেড়ে ৭'৬০ লাখ টনে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৩'৬%। এ সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২'৪% হারে। যেহেতু মাছের আয়-স্থিতিস্থাপকতা (১'২) অনেক উঁচু সেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় এই সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি মাথাপিছু মাছ প্রাপ্তির ক্রমহ্রাসমান প্রবণতাকে ঠেকাতে পারেনি।

অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৪.২। মাথাপিছু মাছ প্রাপ্তির মারাত্মক অবনতির প্রেক্ষিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উভয় ক্ষেত্রের মৎস্য সম্পদ আহরণের উপর গুরুত্ব দিয়ে ১৯৭৭/৭৮ সাল নাগাদ মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ২৬% বৃদ্ধি আশা করা হয়েছিল। এ সময় মৎস্য খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৪৮.৫ কোটি টাকা যা পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের ১.১০% ভাগ। হার্ডকোর কর্মসূচী পরিকল্পনাকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় এসময় সম্পদের অভাবে এই বরাদ্দ ৩৭ কোটি টাকায় কমিয়ে আনা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই খাতে আনুমানিক ব্যয় হয়েছে মাত্র ১৯.০ কোটি টাকা।

৪.৩। পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল মাছের উৎপাদন ১৯৬৯/৭০ সালের ৮.১ লাখ টন থেকে ১০.২ লাখ টনে বৃদ্ধি করা, কিন্তু মাছের উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে ৬.৪৩ লাখ টনে নেমে আসে। হ্রাসকৃত বিনিয়োগ, বেপরোয়া মৎস্যনিধন, মৎস্য চাষে ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও শস্য উৎপাদনে সেচ ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব সবই উক্ত খাতের এই দুর্দশার জন্য দায়ী।

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা

৪.৪। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৮.০৮ লাখ টন। পরিকল্পনা-কালের প্রান্তিক বছরে মাছ ও চিংড়ি রপ্তানির পরিমাণ ১০ হাজার টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রাও নির্দিষ্ট হয়েছিল। সে অনুসারে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৪৪ কোটি টাকা। প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ করা হয় ৩৮.৬ কোটি টাকা। ফলে উৎপাদন যা আশা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম হয়েছিল। উৎপাদন ঘাটতি ছিল ২০% অর্থাৎ উৎপাদন হয়েছিল ৬.৪৪ লাখ টন, ১৯৭৭/৭৮ সালের তুলনায় যাতে কোন অগ্রগতিই পরিলক্ষিত হয়নি। চিংড়ি ও মাছের রপ্তানি ১৯৭৭/৭৮ সালের মোটামুটি ৩ হাজার টনের তুলনায় ১৯৭৯/৮০ সালে ৮ হাজার টনে বৃদ্ধি পাওয়ায় মাছের আভ্যন্তরীণ সরবরাহ ৬.৪৩ লাখ টন থেকে কমে ১৯৭৯/৮০ সালে ৬.৩৬ লাখ টনে দাঁড়ায়। এ সময় জনসংখ্যা ৮.৩০ কোটি থেকে বেড়ে ৮.৭২ কোটিতে উন্নীত হয় এবং মৎস্য উন্নয়নের সকল সমস্যাও থাকে অব্যাহত।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৪.৫। মাছ প্রাপ্তির এই অব্যাহত নিম্নগতির প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাছ উৎপাদনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১০ লাখ টনে স্থির করা হয়। সে অনুযায়ী সরকারী খাতে অবকাঠামোর উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে জোরদার করার জন্য ১৭৪.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। সে সাথে মৎস্য সমবায়সহ বেসরকারী খাতের মাধ্যমেও কর্মসূচী গ্রহণের প্রত্যাশা করা হয় এবং এজন্য ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে বলে মনে করা হয়। পরিকল্পনাকালে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে ছিল (১) মাছের পোনা উৎপাদন, (২) সম্প্রসারণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ, (৩) মাছ ধরার নৌ-যান ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, (৪) মাছের চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ ও বিতরণের সুবিধা বিস্তার, (৫) পানির জীব এবং মাছের খাদ্য ও সারের উন্নয়ন এবং (৬) মৎস্য সম্পদের উপর গবেষণা, জরিপ ও সম্ভাব্যতা যাচাই তৎপরতা পরিচালনা।

৪.৬। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বরাদ্দকৃত মোট ১৮২.৮ কোটি টাকার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হয় ১৫৪.৩ কোটি টাকা। সারণি ৪.১ এ আরও দেখা যাবে যে এ সময়ে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ভৌত সাফল্য ছিল অত্যন্ত কম।

সারণি ৪.১

ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য (১৯৮০—৮৫)

কর্মসূচী	লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৪/৮৫)	অর্জিত সাফল্য (১৯৮৪/৮৫)
ক. মাছের উৎপাদন :	১০.০০	৭.৭৪
(১) আভ্যন্তরীণ (লাখ টন)	৮.২০	৫.৮৮
(২) সামুদ্রিক (লাখ টন)	১.৮০	১.৮৬
খ. মৎস্য চাষ (লাখ একর)	৬.৪৪	২.২১
গ. মাছের পোনা/ফিংগার লিংগস এর উৎপাদন (লাখ সংখ্যা)	৩,২০০	২,৩০০
ঘ. মাছ রপ্তানি :	২০,১০০	২০,৩৮২
(i) চিংড়ি (টন)	১৭,০০০	১২,৬৮০
(ii) ব্যাঙের পা (টন)	১,৬০০	১,৩৬৫
(iii) মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য (টন)	১,৫০০	৬,৩৩৭

উল্লেখ করা যায় যে, লক্ষ্যমাত্রা অপূর্ণ রয়ে গেলেও উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা। অবশ্য তাতে আত্মতৃপ্তি লাভ করার মত কিছু নেই, কারণ ১৯৮৪/৮৫ সালের উৎপাদন ছিল ১৯৬৯/৭০ সালের উৎপাদন ৮.১ লাখ টনের চেয়ে কম।

৪.৭। প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক উভয় কারণেই পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণগুলো হল উপযুক্ত চাষ কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, মৎস্য চাষের অপ্রতুল সম্প্রসারণ কর্মসূচী, সেচের জন্য উপবিভাগের পানি নিষ্কাশন, নদীতে বাঁধ নির্মাণ ও পানি নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো তৈরী, নদী ভরাট এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই মূল্যবান সম্পদ ব্যবহারের জন্য একটি জাতীয় নীতির অনুপস্থিতি। কেবলমাত্র পরিকল্পনার শেষ দিকে এসে মৎস্য সম্পদকে পানি খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতে থাকে। শুধু সেচ ও পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোই মৎস্য চাষের অন্তরায় নয়, বরং কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য ও শিল্প বর্জ্যও মাছের সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি ঘটিয়েছে। বাংলাদেশে মাছের অধিকাংশ প্রজাতির স্বাভাবিক খাদ্যোপযোগিতা ও পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব পরিবেশগত ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। তবে পানি ব্যবহারের সমন্বিত উদ্যোগের লক্ষ্যে প্রধানত: পানি খাত মহাপরিকল্পনা(এমপিও) ভবিষ্যতে মৎস্য চাষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

৪.৮। মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রধান উদ্দেশ্যাবলী হবে নিম্নরূপ :

(১) দেশের পুষ্টিগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও জনসাধারণের কাছে তা সহজলভ্য করা;

(২) জেলে সম্প্রদায়ের কল্যাণের লক্ষ্যে মৎস্য ও সহায়ক শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা;

(৩) নির্দিষ্ট কিছু মৎস্যজাত দ্রব্যের যেমন, চিংড়ি, বাছাইকৃত ফিনফিশ, কাটল ফিস, হাংগরের পাখনা, ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করে রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো; এবং

(৪) সাধারণ পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন।

গ্রন্থাগার ...জাতী বাংলাদেশ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

৪.৯। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সুবিধাসমূহকে কাজে লাগিয়ে এর ভিত্তি সুদৃঢ় ও সুসংহত করার উপর তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গুরুত্ব আরোপ করা হবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ১৯৮৯/৯০ সালের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাগুলো নিম্নরূপ:

(১) আভ্যন্তরীণ জলসীমা থেকে ৭.৭২ লাখ টন এবং সমুদ্র থেকে ২.২৮ লাখ টন মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করে মাছের উৎপাদন ১৯৮৪/৮৫ সালের বর্তমান পর্যায় ৭.৭৪ লাখ টন থেকে ১০ লাখ টনে বৃদ্ধি করা;

(২) প্রায় ৩০,০০০ হাজার টন চিংড়ি, ২,০০০ টন ব্যাঙের পা এবং ৬,০০০ টন মৎস্য ও মৎস্যজাত সামগ্রী রপ্তানি করা; এবং

(৩) ১৯৯০ সাল নাগাদ অতিরিক্ত ১০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

কৌশলাদি ও উন্নয়ন কর্মসূচী

৪.১০। **মুক্ত পানির মাছ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা :**

(১) আমাদের মোট মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় ৮৫% ভাগ অবদানসম্পন্ন সামুদ্রিক ও আভ্যন্তরীণ মুক্ত জলের মাছ যথাযথভাবে আহরণ এবং সংরক্ষণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে ১৯৫০ সালের মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংশোধন করা হবে। স্বাভাবিক মৎস্য মজুদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ এবং তাদের আশ্রয়স্থল নিশ্চিত করা সম্পর্কে জনগণের সহযোগিতা লাভের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইনের অধিক গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রচার করা হবে।

(২) প্রধান বাণিজ্যিক মৎস্য প্রজাতিসমূহ যেমন রুই, কাতলা, ইলিশ, মিঠা পানির বিরাটাকার চিংড়ি ও সামুদ্রিক চিংড়ি, পেনিয়াস মনোডন, পি. ইন্ডিকাস প্রভৃতির প্রজনন ও পরি-চর্যার জন্য এগুলোকে চিহ্নিত, তালিকাবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা হবে।

(৩) মে মাসের মাঝামাঝি থেকে আগষ্টের মাঝামাঝি সময়ে যখন অধিকাংশ মিঠে পানির মৎস্য প্রজাতি ডিম দেয় তখন মৎস্য সম্পদকে রক্ষা করার জন্য নদী, নালা, হাওর ও বিলের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; একইভাবে জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে সুন্দরবন ও চকরিয়া, সুন্দরবনের নদী মোহনা ও খাড়িগুলোতে কীট-জীবাণুর অনুপ্রবেশ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক চিংড়ি প্রজাতিগুলোর ডিম পাড়ার সময়ে বনাঞ্চলে কীটনাশক ছিটানো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(৪) পানির উৎসগুলোতে পর্যাপ্ত স্বাভাবিক পানি ধরে রাখার জন্য বর্ষাকালে গভীর পানির ধান ক্ষেত, রাস্তার পার্শ্বস্থিত নালাসমূহ এবং পানির অন্যান্য মৌসুমী উৎসসমূহের সংগে নদী ও খালসমূহ থেকে পানি লাভের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) পরিমাণগত দিক থেকে (১৯%) গুরুত্বপূর্ণ জাতের মাছ ইলিশের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয়া হবে। মাছের মজুদ নিশ্চিত করার জন্য মাছের সমুদ্র থেকে নদীতে প্রবেশের মৌসুমে বিভিন্ন নদীমুখে প্রচলিত মৎস্য শিকার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪'১১। **একুয়াকালচার :** পরিকল্পনাকালে একুয়াকালচারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্ল্যাংকটন, ভেজিটেশন, এবং ডেট্রিটাস খেয়ে বেঁচে থাকে এমন প্রজাতিসমূহের মৎস্য চাষের উপর আরো জোর দেয়া হবে। যে সব জলাশয়ের পানি সমতল ও মোটামুটি স্থির থাকে সেসব স্থানে রুইজাতীয় মাছের বহুমুখীকরণের উপর আরো বেশী গুরুত্ব দেয়া হবে। মৎস্য চাষের জন্য পানির নতুন নতুন এলাকা বিশেষ করে পুকুর ও বাওরে মাছের চাষ বাড়াতে হবে। হাওরে প্লাবিত বাঁধ নির্মাণ করে অতিরিক্ত চাষযোগ্য এলাকা সৃষ্টি করা হবে। মৎস্য চাষের জন্য ব্যাপক এলাকায় মৌসুমী ও বন্যার পানি অস্থায়ীভাবে ধরে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন প্রকল্পগুলোতে মৎস্য উন্নয়নের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪'১২। **মৃদু লোনা পানির মৎস্য উন্নয়ন :** লোনা পানির বর্তমান চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে ব্যাপক ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করা হবে। যেখানে সম্ভব সারা বছর প্রতি একর এলাকায় চিংড়ি ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করা হবে। তা করতে গিয়ে ধান চাষীদের স্বার্থের সাথে লোনা পানির মাছ চাষের সমন্বয় রক্ষা করা হবে।

৪'১৩। **কৃত্রিম পোনা উৎপাদন :** স্বাভাবিক পোনা সরবরাহের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য চিংড়ি ও মাছের কৃত্রিম পোনা উৎপাদনকে জোরদার করা হবে। বর্তমান পোনা উৎপাদন খামারগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য যেখানে সুযোগ আছে সেখানে নতুন পোনা পালনক্ষম পুকুর খননসহ অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক স্থানীয়ভাবে পোনা উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে। উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে উপজেলা পর্যায়ে ডিওএফ এর কারিগরি সহায়তায় কম খরচের নতুন পোনা উৎপাদন খামার প্রতিষ্ঠা করা হবে। জেলেদের মাছ শিকারের পূর্বে ছোট আকারের মাছ যাতে বড় হতে পারে সে জন্য পল্লী এলাকার আগ্রহী জেলেদের পর্যাপ্তভাবে উদ্বুদ্ধ, প্রশিক্ষিত ও সহায়তা করা হবে। পোনা উৎপাদনের জন্য ছোট আকারের খামার প্রতিষ্ঠার দিকে বেসরকারী খাতকে প্রলুব্ধ করা হবে। পোনা উৎপাদনের জন্য পোনা খামার প্রতিষ্ঠা ও পোনা বিতরণসহ একুয়াকালচার উন্নয়নে বেসরকারী খাতের যথাসম্ভব বেশী ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য সবরকমের প্রচেষ্টা চালানো হবে।

৪'১৪। **পুকুরে মৎস্য চাষের উন্নয়ন :** সারাদেশে ১'৬৩ লাখ পুকুর প্রায় ৪'০৪ লাখ একর জমি দখল করে আছে, যা আভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষের উন্নয়নের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভৌত সুবিধা। প্রচলিত নিয়ম ও বর্তমান সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এসব পুকুরের মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ একর প্রতি মাত্র ৩৬৭ পাউণ্ড। তবে নিবিড় ও প্রায় নিবিড় মৎস্যচাষ কৌশলের মাধ্যমে এগুলোর উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব। খাস পুকুর ও ব্যক্তিগত পুকুর উভয় ক্ষেত্রেই পুকুরে মাছের চাষ ব্যাপকতর করার প্রধান সমস্যা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করা হবে। এই সম্ভাবনাপূর্ণ সম্পদে ভূমিহীনদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুকুরগুলোর ব্যবস্থাপনার ভার উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হবে। কেবলমাত্র এ ধরনের সম্প্রদায়গত সচেতনতাই পরিত্যক্ত বেসরকারী পুকুরগুলোর উৎপাদনশীল ব্যবহারে সাহায্য করতে পারে। স্বীকার করতে হবে যে প্রযুক্তি ব্যবহারের বর্তমান পর্যায়ে, আজ যদি পুকুরগুলোতে সর্বাধিক পরিমাণে মাছের চাষ করা যায় তবে এ থেকেই আমাদের প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পূরণ করা সম্ভব হবে।

৪'১৫। **বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধার উন্নয়ন :** সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে মাছ পরিবহণ, বিতরণ, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের ব্যাপক উন্নয়নসাধন করা হবে। কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা হবে। জেলে সমবায়গুলোকে অগ্রাধিকার দানের মাধ্যমে নির্বাচিত কিছু জেলা সদরে পাইকারী ও খুচরা মৎস্য বাজার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মাছ বিক্রির বাজারগুলোতে সুলভ ও কার্যকর মাছ সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে মাছের অপচয় রোধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ মাছ বিশুদ্ধকরণ ও লবণজাতকরণের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

৪'১৬। **প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ ঃ** প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া আরো পুনর্গঠিত ও জোরদার করা হবে। বিদ্যমান মৎস্য খামার, নার্সারী ও অন্যান্য জাতের খামারগুলোকে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে। পরবর্তীকালে উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য চাষের সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠিত করে প্রতিটি এলাকার মৎস্য চাষের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে। মৎস্য চাষ ও মৎস্য ব্যবসায়ের সংগে পেশাগতভাবে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত ও গ্রামীণ লোকদের ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। কর্মকর্তা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উপরও যথাযথ মনোযোগ দেয়া হবে।

সম্প্রসারণ এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য টিভি, রেডিও ও সিনেমাসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করা হবে। সকল সিনেমা হলে বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত সিনেমা হলগুলোতে মাছ ও চিংড়ি চাষ, উন্নত নৌযান ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, উন্নত মাছ লবণাক্তকরণ, রৌদ্রে মাছ শুকানো পদ্ধতি, প্রাকৃতিকভাবে গঠিত মাছের আশ্রয়স্থলসমূহের সংরক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিতভাবে ৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হবে।

পূর্ণাংগ প্রযুক্তি প্যাকেজ, সহজশর্তে ঋণ সুবিধা ও উৎপাদন উপকরণসমূহ ইত্যাদির মতো সমর্থনসূচক সেবা সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা হবে।

৪'১৭। **মৎস্য গবেষণা, জরীপ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা ঃ** সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে পুরোপুরিভাবে চালু করে সমস্যামূলক ও প্রায়োগিক গবেষণা, মাছ চাষের উপর গবেষণা, মুক্ত পানি ও সামুদ্রিক মাছের অধিকতর কার্যকরী সংরক্ষণ ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন, নতুন পণ্যের উন্নয়ন ও ছোট আকারের মাছ ধরার নৌযান ও যন্ত্রপাতিগুলোর উন্নয়নকে উক্ত ইনষ্টিটিউটে গবেষণাগারের আওতায় আনা হবে।

সমুদ্র সন্নিহিত ও সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক জোনে অবস্থিত মৎস্য সম্পদের ভান্ডার অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য জরীপ অব্যাহত থাকবে। মৎস্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় মাছের নতুন চাষ এলাকা চিহ্নিতকরণের জন্য একটি সম্ভাব্যতা যাচাই সিরিজ পরিচালনা করা হবে।

৪'১৮। **একুয়াকালচার ইনষ্টিটিউশন ঃ** অত্যধিক উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকায় লোনা পানির ও মিঠা পানির মৎস্য চাষের উপর বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে। সকল মৎস্য চাষ ও মাছের পোনা উৎপাদন খামার সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন হবে পর্যাপ্ত আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বশাসন ও নমনীয়তা। বিভিন্ন রকম পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতার কারণে সৃষ্ট মৎস্য সম্পদ মহাপরিদপ্তরের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে একুয়াকালচার উন্নয়ন বোর্ডের মতো একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরীক্ষা করে দেখা হবে। বাণিজ্যিক উৎপাদনের পাশাপাশি চাষ পদ্ধতির বিস্তারিত তথ্য ও তার ফলাফল নিয়মমাফিক রেকর্ড করে রাখা হবে; যা পরবর্তীকালে সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে তথ্য যোগাবে। পোনা, খাদ্য, সার, হরমোন এম্পুল, চাষের সরঞ্জাম ইত্যাদি জাতীয় মৎস্য চাষের সকল উপাদান উপকরণ বিতরণের দায়িত্বও থাকবে বোর্ডের উপর।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন

৪'১৯। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান প্রবণতার ফলে ভূমি ও আভ্যন্তরীণ জলসীমার উপর চাপের প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মাছের উপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে। সেজন্যই আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখা, সংরক্ষণ করা ও নিয়মতান্ত্রিক আহরণের উপর জোর দেয়া হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাছ ধরার ট্রলারের চাইতে যথাযথ যন্ত্রসজ্জিত ছোট আকারের নৌযান সংগ্রহের উপর বেশী নজর দেয়া হবে। মাছ আহরণের কৌশলের প্রেক্ষিতে শ্যাওলাপূর্ণ খাঁড়ি, পোতাশ্রয় ও আধুনিক মৎস্যাধারগুলোকে মৎস্য সংরক্ষণ ও পরিবহণ সুবিধার আওতায় আনা হবে। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মৌলিক সুযোগ সুবিধাও নিশ্চিত করা হবে।

অর্থ বরাদ্দ

৪'২০। উপরোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য খাতের সরকারী কর্মসূচীর জন্য ৩৫০'০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। কর্মসূচীর খাতওয়ারী বরাদ্দ নীচের সারণিতে দেখানো হল:

সারণি ৪'২

কর্মসূচী অনুসারে অর্থ বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচীর নাম	মোট বরাদ্দ
১। জরীপ, অনুসন্ধান, সম্ভাব্যতা যাচাই ও গবেষণা	৫৫'০০
২। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	২'০০
৩। মৎস্য চাষের সম্প্রসারণ ও কমিউনিটি উন্নয়ন	৪২'০০
৪। উপকূলে মাছ স্থানান্তর, মজুদকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বণ্টন সুবিধা	১১'০০
৫। মৎস্য চাষ ও আহরণ (উৎপাদন উপকরণ ও পানির উৎসসমূহের উন্নয়নসহ)	২২০'০০
৬। থোক বরাদ্দ	২০'০০
মোট:	৩৫০'০০

সরকারী খাতের বরাদ্দ ৩৫০ কোটি টাকার পাশাপাশি এসময়ে আরো ৪০০ কোটি টাকা বেসরকারী খাতে মৎস্য চাষ কর্মকাণ্ডে ব্যয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

৪'২১। পানির বিভিন্ন উৎসের ভিত্তিতে মাছ উৎপাদনে ১৯৮৪/৮৫ সালের স্থিতাবস্থা এবং ১৯৮৯/৯০ সালের লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৪'৩ এ দেখানো হলো:

সারণি ৪·৩

মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

('০০০' টনে)

উৎস	স্থিতাবস্থা ১৯৮৪/৮৫	লক্ষ্যমাত্রা ১৯৮৯/৯০
১। আভ্যন্তরীণ মৎস্য	৫৮৮·৪	৭৭২·৪
(১) পুকুর	১১২·৫	১৯২·০
(২) বাওর	১·১	২·৮
(৩) উপকূলবর্তী মৎস্য চাষ	৯·০	৩৪·২
(৪) নদী ও মোহনা	২০৭·১	২৫০·৪
(৫) বিল ও হাওর	৫১·৭	৭৫·০
(৬) কাপ্তাই লেক	৫·০	৮·০
(৭) বন্যাবিধৌত সমতল	২০২·০	২১০·০
২। সামুদ্রিক মৎস্য	১৮৫·৬	২২৮·০
মোট :	৭৭৪·০	১০০০·৪

মৎস্য রপ্তানী

৪·২২। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মৎস্য রপ্তানি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি লাভ করে এবং মাছের আন্তর্জাতিক চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনাকালে রপ্তানি ১·১৯ কোটি পাউণ্ড থেকে ৪·৪৯ কোটি পাউণ্ডে এবং রপ্তানি আয় ৩·৭০ কোটি ডলার থেকে ৮·৮৮ কোটি ডলারে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ভবিষ্যতে রপ্তানি আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়। নীচের সারণিতে ১৯৮৪/৮৫ সালে মৎস্য ও মৎস্য-জাত দ্রব্যের প্রকৃত রপ্তানি এবং ১৯৮৯/৯০ সালের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হল :

সারণি ৪·৪

মাছ ও ব্যাঙের পা রপ্তানির চিত্র

(পরিমাণ মেট্রিক টনে)

	১৯৮৪/৮৫		১৯৮৯/৯০	
	পরিমাণ	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (কোটি টাকা)
১। চিংড়ি	১২,৯৯০	১৯৯·৫৫	৩০,০০০	৫০০·০০
২। মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য	৬,৩২৭	২১·০৫	৬,০০০	৩০·০০
৩। ব্যাঙের পা	১,০৬৪	১০·২১	২,০০০	২·৪০
মোট :	২০,৩৮২	২৩০·৮১	৩৮,০০০	৫৩২·৪০

পরিচ্ছেদ ৫ঃ বন উন্নয়ন

বনজ সামগ্রি প্রচলিত জ্বালানীর অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে দেশের ৭৫% এরও বেশী জ্বালানী ব্যবহারের যোগান দেয়। ১৯৭০ সালের গোড়া থেকে বাণিজ্যিক জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধি বনজসম্পদের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষিকাজের প্রয়োজনে জমির ব্যাপক ব্যবহারও বনভূমির পরিমাণ কমিয়ে দেয়। উপর্যুপরি বৃক্ষ কর্তনের ফলে প্রচলিত জ্বালানী হিসেবে কাঠের সরবরাহ প্রায় ১৬% হ্রাস পেয়েছে। অথচ বনজ সামগ্রির ৮০% জ্বালানী কাঠরূপেই ব্যবহৃত হয়। জ্বালানী কাঠের ঘাটতির ফলে জ্বালানী হিসেবে গোবর ও কৃষিবর্জ্যের ব্যবহার বেড়ে গেছে যা জমির পুষ্টি বৃদ্ধির এসব মূল্যবান উপাদান থেকে কৃষিজমিকে বঞ্চিত করছে। সুতরাং বন উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল তা কেবল অব্যাহতই থাকবে না, তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও জোরদার করা হবে।

৫.২। **বনভূমি ব্যবস্থাপনা ঃ** বাংলাদেশের বন প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত যেমন, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বন ও বেসরকারী মালিকানাধীন গ্রাম অথবা বসতবাড়ীর বন। ৩৮.৭০ লাখ একরের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বনাঞ্চল (দেশের মোট স্থল ভূমির ১১ শতাংশ) বনবিভাগের ব্যবস্থাপনাধীন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৪.৯০ লাখ একর পাহাড়ী বন, সুন্দরবনের ১৪.৩ লাখ একর উপকূলীয় বন ও ৩.১০ লাখ একর সমতল শালবন। এছাড়াও রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ২৪ লাখ একরের অনিরূপিত পাহাড়ী বনভূমি যা অ-শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন হিসাবে পরিচিত। সরকারী মালিকানাধীন বন এলাকা প্রধানতঃ দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় অংশে অবস্থিত। অন্যান্য অংশে এ ধরনের বনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। রাষ্ট্র সংরক্ষিত বনজসম্পদের প্রধান প্রধান উৎসগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বনজ সামগ্রি আহরণ ও পরিবহনে উভয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। উপরন্তু ভূখণ্ডের জটিলতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের উৎপাদনশীলতার মান স্বাভাবিক মানের চাইতে নীচুতে অবস্থান করছে।

৫.৩। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট বসতবাড়ীতে বহুমুখী উপযোগিতাসম্পন্ন ফলের গাছসহ বিভিন্ন ধরনের গাছপালা নিয়ে গড়ে উঠেছে বেসরকারী বন। এসব বন এলাকার পরিমাণ হবে প্রায় ৬.৭০ লাখ একর। আনুমানিক হিসেবে এসব বন থেকে সামগ্রিকভাবে দেশে ব্যবহারের জন্য কাঠের প্রায় ৭০ শতাংশ, জ্বালানী কাঠের ৯০ শতাংশ ও বাঁশের ৯০ শতাংশ সরবরাহ পাওয়া যায়।

অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৫.৪। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সম্পদ উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক বন কাজে লাগানোর উপর জোর দেয়া হয়। ১৯৬৫—৭০ সালের মাথাপিছু ০.৪০ ঘনফুট কাঠ ও ০.৫৫ ঘনফুট জ্বালানী কাঠ ব্যবহারের স্তর বজায় রাখার বিষয়টি পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়। পরিকল্পনায় নিবিড় সম্পদ ব্যবস্থাপনা অনুশীলনেরও আহ্বান জানানো হয় যার ফলে বর্তমান বনভূমিতে পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণের চেয়ে বেশী পরিমাণে জমি বৃক্ষরোপণের আওতায় আসে এবং বিদ্যমান বনভূমিগুলোর ব্যবস্থাপনাও সে হারে বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার অধীন বিভিন্ন কর্মসূচীর বাস্তব তৎপরতা নীচের সারণিতে দেখানো হয়েছে:

গ্রন্থ ... (তত্ত্বী বাং...

সারণি ৫.১

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ভৌত তৎপরতা

কর্মসূচী	একক	১৯৭৭/৭৮ লক্ষ্যমাত্রা	১৯৭৭/৭৮ সাফল্য
(১) বনায়ন	'০০০' একর	৭৭.২	২০১.০
(২) জরীপ ও সীমানা চিহ্নিতকরণ	,,	৫৬.৮	৪৮.৭
(৩) বন রক্ষণাবেক্ষণ	,,	১২১.৪	১৩৬.২
(৪) রবার চাষের জন্য চারারোপণ	,,	৩.৭	৪.৭
(৫) কাষ্ঠ উৎপাদন	লাখ ঘনফুট/বছর	৪৫	১৫
(৬) বাঁশ সংগ্রহ	'০০০' টন	৪৫	২০

দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা

৫.৫। নতুন প্রকল্প গ্রহণ না করে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ সম্পূর্ণ করার অধিকতর অভিপ্রায় নিয়ে তৈরী প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায়ও অনুসরণ করা হয়। তথাপি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অঞ্চল থেকে কাঠ ও বাঁশ আহরণ, সম্পদ আহরিত পাহাড়ী বনে বৃক্ষরোপণ এবং উপকূলীয় ও অনিরূপিত রাষ্ট্রীয় বন এলাকাসমূহের বনায়ন। এ ছাড়াও গ্রামীণ বন উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয় এবং বনজ সম্পদ আহরণ ও রবার চাষে বেসরকারী দলগুলোর অংশগ্রহণও নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সাধারণভাবে পুনঃরোপণ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে এই কর্মসূচী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং পুনঃরোপণের ক্ষেত্রেও ঠিক এর মত দীর্ঘমেয়াদী আবর্তক জাতের উপর জোর দেয়া হয়। বীজ ও মজুদ চারার অভাব ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে রবার চাষ, অয়েল পাম ও গ্রাম বনায়নের লক্ষ্যমাত্রাও অর্জিত হয়নি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৫.৬। একদিকে অব্যাহত ক্রমবর্ধমান চাপের হাত থেকে জমিকে রেহাই দেয়া এবং অন্যদিকে জ্বালানী কাঠ ও কাঠের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পিত উপায়ে বনের বর্তমান মজুত থেকে বনজ সামগ্রির উৎপাদন বাড়িয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত করার লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়। যত দ্রুত সম্ভব সরকারী বনের বনজ সম্পদের উন্নয়ন, বিশেষ করে সড়ক, মহাসড়ক, রেলওয়ে, খাল ও বাঁধের পাশে দ্রুত বর্ধনশীল জাতের গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে আবাসভূমির বন উন্নয়নে সাহায্য করা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে জমির পরিবৃদ্ধি স্থিতিশীল করার কথাও পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়।

৫.৭। উপরোল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন কর্মসূচীর তৎপরতা নীচে আলোচনা করা হল:

(১) **বনায়ন :** বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর অধীন ৩২৯'০০০ একর লক্ষ্যমাত্রার স্থলে মোট ২৩৯,৯৬০ একরে গাছপালা লাগানো হয়। বনায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল মন্থর। সেখানে বিনিয়োগ বরাদ্দের (৪২'৯৩ কোটি টাকা) ৬৬% ব্যয়ের মাধ্যমে ২৫৫,০০০ একরের লক্ষ্যমাত্রার স্থলে মাত্র ১৭৫,৯৬০ একরে গাছপালা লাগানো হয়। পুনঃ বৃক্ষরোপণের জন্য রক্ষিত এলাকা ব্যবহার না করায় এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও ব্যর্থ হয়েছে। অতীতের বৃক্ষরোপণের একটি সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে যে, অতীতে বৃক্ষরোপণে যে ৩০% প্রবৃদ্ধি হয়েছিল তা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। বৃক্ষরোপণ কেবল বনায়নের শুরুমাত্র। নির্দিষ্ট সময় পরম্পর উপযুক্ত পরিচর্যার কাজ চালানো না হলে সেগুলোর নির্ধারিত বৃদ্ধি ও উদ্দিষ্ট বনজ-সম্পদ উৎপাদনের হার অর্জন করা যাবে না।

(২) **বনজ সামগ্রি :** সরকারী বনগুলো থেকে মাথাপিছু ৫'০ কোটি ঘনফুট কাঠ ও জ্বালানী কাঠের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার স্থলে পরিকল্পনাকালের প্রান্তিক বছরে মাত্র ৩'৮০ কোটি ঘনফুট কাঠ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটের বনের অপর্যাপ্ত মজুত এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বনগুলো থেকে সম্পদ আহরণ কম হওয়ার কারণেই প্রধানতঃ উৎপাদন কম হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির জন্য বাস্তবায়নাধীন যান্ত্রিক আহরণ কর্মসূচী জোরদার করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তহবিলের অভাবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়া যায়নি। এ ধরনের উন্নয়ন ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল থেকে উৎপাদনের বর্ধিত সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা খুব সামান্যই।

(৩) **বিশেষ বৃক্ষরোপণ :** এসব বৃক্ষরোপণের মধ্যে রয়েছে উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অ-কাষ্ঠজাত, বাঁশ, রবার, তুঁত, তৈল পাম ও ঔষধের গাছ-গাছড়া রোপণ। যদিও বাঁশ শিল্প ও গৃহস্থালী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, দক্ষ প্রচার পদ্ধতির অনুপস্থিতির কারণে প্রধানতঃ এই সম্পদের উন্নয়নের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নেয়া সম্ভব হয়নি। সব এলাকাতেই রবার, তুঁত ও তৈল পামের চারারোপণ তাদের লক্ষ্যমাত্রার নীচে থেকে যায়। জমি ও চারারোপণ সামগ্রির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে প্রধানতঃ ১০,৮০০ একরের রবার চাষের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। জানা গেছে জমি কাগজেপত্রে বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল, কিন্তু উক্ত সংস্থা জমির দখল নিতে পারেনি। মাত্র ৬,৮১১ একরে বৃক্ষরোপণ করা হয়। প্রায় ৪,৯১০ একর জমি থেকে বর্তমানে একর প্রতি গড়ে ৪৫০ পাউণ্ড করে বনজ সম্পদ আহরণ করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তৈলপাম চারা রোপণের উন্নয়নে আরো প্রচেষ্টা নেয়া হয়। নতুন শস্য হিসেবে মাত্র কয়েক বছর আগে এটি চালু করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এক্ষেত্রে অগ্রগতি হয় খুব সামান্যই। ৯,৬০০ একর লক্ষ্যমাত্রার স্থলে মাত্র ২,৩৬৩ একর এর আওতাধীনে আসে। বাস্তবায়নকালে কোন কোন স্থানে তৈলপাম-এর চারাগাছ রক্ষায় গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভাবও একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তৈলপামের মত তুঁত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীরও একই পরিণতি ঘটে। লক্ষ্যমাত্রার (১০,০০০ একর) মাত্র ২৭ শতাংশ অর্জিত হয়। এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ হচ্ছে বন এলাকায় তুঁত-এর চারারোপণ বন ব্যবস্থাপনার জন্যে কেবল একটি বিজাতীয় ধারণাই নয় বরং রেশম চাষের কাছাকাছি এর বনায়নের প্রয়োজনে ব্যবহারকারীদের কাছেও এর লাভালাভের দিকটিতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

(৪) **গ্রামীণ বন :** জ্বালানী সংকটের কারণে গ্রামীণ বনাঞ্চলগুলো ব্যাপকভাবে উজাড় হয়ে গিয়ে ভূমি ও প্রকৃতির মধ্যে মারাত্মক প্রতিবেশ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পল্লী/গ্রাম উন্নয়নের উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রান্তিক খাস জমি এবং বৃক্ষহীন ও সংরক্ষিত বনের ৭,২০০ একর বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। তবে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন জনগণের অংশগ্রহণ ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে বার্ষিক ১'১৬ কোটি চারাগাছ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার স্থলে মাত্র ৭৮ লাখ বিতরণ করা হয় এবং ১,৩৬১ মাইলের সারিবদ্ধ বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রার স্থলে মাত্র ১,১৭৪ মাইল বৃক্ষরোপণ সম্ভব হয়। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের অভাবে অনুক্রম সারিবদ্ধ (ষ্ট্রিপ) পদ্ধতিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীও তেমন সফল হয়নি। জনসমষ্টির অংশগ্রহণের উপর কর্মসূচীটির নির্ভরশীলতার কারণে সংগঠন গড়ে তোলা দুরূহ প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছিল ২৬'৩৬ কোটি টাকা যা থেকে আনুমানিক ২২'৪ কোটি টাকা কাজে লাগানো হয়। সফলতা নিরূপণের পদ্ধতি গড়ে না উঠা এই গ্রামীণ বনায়ন কর্মসূচীর সবচাইতে দুর্বল দিক। তবে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে গ্রামীণ বনায়নের উন্নয়নে উপযুক্ত মডেল প্রণয়নে সহায়তা করতে পারে।

(৫) **শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা :** বনায়ন এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যার সুফল পেতে দীর্ঘ সময় লাগে। চারা থেকে বৃক্ষরোপণ এবং সেগুলো পরিণত (বড়) করে তোলা পর্যন্ত পরিচর্যার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং প্রথম পরিকল্পনার মতো সবসময়ই ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে এখানেও অগ্রগতি ছিল মন্থর। রেঞ্জার কোর্সের অধীন ১০০ জনের লক্ষ্যমাত্রার স্থলে পরিকল্পনাকালে মাত্র ৪৩ জন রেঞ্জারকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয় এবং সিলেট ফরেষ্ট স্কুলে ২১০ জন ফরেষ্টার ও ২৭০ জন বন প্রহরীর প্রশিক্ষণ দেয়ার স্থলে ১৮৫ জন ফরেষ্টার ও ২৭০ জন বন প্রহরীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ

৫'৮ পরিকল্পনাকালে ১৮৪'৮০ কোটি টাকার বরাদ্দে মোট ৪৩টি স্কীম বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ১৬৯'০৭ কোটি টাকার মধ্যে ১৫০'৩৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ৪৩টি স্কীমের মধ্যে ১৬টি স্কীমের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ১০টি স্কীম তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থানান্তর করা হয়েছে। বাস্তবায়িত স্কীমগুলোর জন্য খরচ হয়েছে ৪২'৯৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে তৃতীয় পরিকল্পনায় নিয়ে যাওয়া ১০টি স্কীমের কাজ সম্পূর্ণ করতে আনুমানিক ১১৩'৬ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। ১৭টি স্কীম হয় বাদ দেয়া হয়েছে নতুবা আদৌ বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়নি।

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী, লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশলাদি

উদ্দেশ্যাবলী

৫'৯। গ্রামীণ জ্বালানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অব্যাহত প্রচন্ড চাপের মুখে রয়েছে। ফলে গ্রামের বনগুলো উজাড় হবার উপক্রম হয়েছে। অবৈধ প্রবেশকারীদের দ্বারা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সুন্দরবনের

সরকারী বনগুলো থেকে মাত্রাতিরিক্ত সম্পদ আহরণ করা হচ্ছে। অন্যদিকে সহজে প্রবেশের সুবিধা কম থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বনগুলো থেকে সম্ভাবনার তুলনায় কম বনসম্পদ আহরিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নীচের উদ্দেশ্যাবলী অনুসরণ করা হবে:

(১) বনায়ন, পুনর্বনায়ন ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকারী ও বসতবাড়ীর বনের কাঠ ও অকাষ্ঠজাত বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি;

(২) গ্রাম এলাকাগুলোর অধিকতর মূল্যবান ফলবান বৃক্ষ রক্ষার জন্য স্বল্পমেয়াদী আবর্তমান গাছপালার উন্নয়ন কর্মসূচী ত্বরান্বিত করা; এবং

(৩) প্রতিবেশগত ভারসাম্যকে ব্যাহত না করে কাগজ ও অন্যান্য শিল্পের জন্য কাঠ, জ্বালানী কাঠ, পশুখাদ্য, রবার এবং কাগজ ও অন্যান্য শিল্পের জন্য কাঁচামালের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বনসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করা।

লক্ষ্যমাত্রা

৫'১০। পরিকল্পনাকালে বনসামগ্রির পাশাপাশি ব্যবহার বাড়ানো হবে এবং বাঁশের উপর বনভিত্তিক শিল্পগুলোর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে অধিক কাঠ সরবরাহের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ করা হবে। সে অনুযায়ী তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন বনসামগ্রির নিম্নলিখিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

সারণি ৫'২

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

বনজ সম্পদ	একক	উৎপাদন স্থিতাবস্থা (১৯৮৪/৮৫)	উৎপাদন প্রান্তিক বছর (১৯৮৯/৯০)	গড় প্রবৃদ্ধির হার %
১। কাঠ	লাখ ঘনফুট	৩৭৬'৯৬	৪৪২'০০	৩'২
(ক) সরকারী বন	,,	১৬৮'০৫	২০২'২২	৩'৮
(খ) গ্রামীণ বন	,,	২০৮'৯১	২৩৯'৭৮	২'৮
২। জ্বালানী কাঠ (পাল্পউডসহ)	,,	২২৮১'৬০	২৬৫২'০০	৩'১
(ক) সরকারী বন	,,	২৯৬'৪৫	৩৮৬'৪০	৫'৫
(খ) গ্রামীণ বন	,,	১৯৮৫'১৫	২২৬৫'৬০	২'৭
৩। বাঁশ	কোটি সংখ্যা	৪১'৬৯	৫১'০০	৪'২
(ক) সরকারী বন	,,	৭'৬৯	১০'০০	৫'৮
(খ) গ্রামীণ বন	,,	৩৪'০০	৪১'০০	৪'০
৪। কাঁচা রবার	টন হিসেবে	৯২৭'০০	১৩৬৬'০০	৮'১

কৌশলসমূহ

৫.১১। বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ অনুসরণ করা হবে:

(ক) **গ্রাম/গ্রামীণ বনায়ন:** বনাঞ্চলের জনগণ তথা কৃষি সম্প্রসারণে গ্রামীণ সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোষ্ঠী অথবা গ্রাম বনায়ন বিষয়ক কর্মসূচী অনুসৃত হবে। চারা এবং চারাগাছ, বিশেষভাবে ফল-বৃক্ষ এবং স্বল্পমেয়াদী আবর্তক জাতের চারা বিতরণ কর্মসূচী সম্প্রসারিত করা হবে। চারা ও চারাগাছ উৎপাদনে স্কুল, কলেজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য গ্রুপ-গুলোকে বর্ধিতভাবে ব্যবহার করা হবে। সড়ক, রেলওয়ে ও খালের পাশের খালি জমিও গ্রামীণ বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। পতিত ও অবনমিত সরকারী জমি ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের দলগত কাজের মাধ্যমে গাছ লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হবে। গ্রামীণ বন উন্নয়নে একটি পৃথক শাখা গঠনের লক্ষ্যে বন বিভাগকে পুনর্গঠনের প্রয়োজন হবে।

(খ) **সরকারী বন:** সংরক্ষিত বনগুলোতে পুনঃ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী, দীর্ঘমেয়াদী আবর্তক জাতের বৃক্ষ ছাড়াও জ্বালানী ও সুনির্দিষ্ট শিল্প যেমন, খুঁটি, দিয়াশলাই ও তক্তা (প্লাইউড) হিসেবে ব্যবহারের জন্য দ্রুত বর্ধনশীল জাতের গাছপালা লাগানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। উত্তর-পশ্চিম, কেন্দ্রীয় ও উত্তর-পূর্বের বৃক্ষহীন ও অবৈধভাবে দখলকৃত রাষ্ট্রীয় বনভূমি যা দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার চাপের কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পরিণামে আরো নিম্নমানের হয়ে যাচ্ছে তা উন্নয়নেও যথাযথ মনোযোগ দেয়া হবে। ফলন বাড়ানোর লক্ষ্যে বিদ্যমান বৃক্ষসমূহ ছাঁটাই, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার করার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(গ) **যান্ত্রিক আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ:** পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব বন এলাকা এখনো পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো হয়নি সেসব এলাকায় বনজ সম্পদের অপচয় ও অবরোধ এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সুন্দরবনের অন্যান্য বন এলাকার উপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে যান্ত্রিক আহরণ কর্মসূচীকে উন্নত এবং সম্প্রসারিত করা হবে। সরবরাহের উপর চাপ হ্রাসে কাঠ সংরক্ষণ কলাকৌশল যেমন, সংরক্ষণ-মূলক কলাকৌশল, সিজনিং ও প্রমিতকরণ ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে কাঠ ও বাঁশ জাত সামগ্রির মান ও স্থায়িত্ব বাড়াতে হবে।

উন্নয়ন কর্মসূচী

৫.১২। **সামাজিক বনায়ন:** প্রচলিত জৈববস্তু জ্বালানী গ্রামীণ জ্বালানী চাহিদার এক বড় অংশের যোগান দিয়ে থাকে। অনুর্বর জমিকে পুনরায় কৃষি জমিতে পরিণত করার জন্যে এবং জ্বালানীর চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে বৃক্ষ উৎসকে এর অধিকাংশের সরবরাহক হিসেবে কাজে লাগানো হবে। সুতরাং পরিকল্পনা-কালে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে। এর মধ্যে থাকবে (১) খামার বনায়ন, (২) নিবিড় বৃক্ষরোপণ, (৩) সারিবদ্ধ পদ্ধতিতে চাষ ইত্যাদি।

(১) **খামার বনায়ন:** গাছ লাগানোর জন্য কৃষকদের ব্যবহৃত জমি মূলতঃ বসতবাড়ী। তবে জমি ক্রমবর্ধমানভাবে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠায় বসতবাড়ীতে বৃক্ষরোপণ গ্রামীণ পরিবারগুলোকে জমি থেকে তাদের উৎপাদন এবং আশানুরূপ উপার্জন বাড়াতে অবশ্যই সাহায্য করবে। শাকসব্জির মতো অপ্রধান শস্য কিংবা আন্তঃশস্য লাগানোর

প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গাছ লাগানোর মাধ্যমে এ জমিকে আরও উৎপাদনক্ষম করে তোলা যেতে পারে। বসতবাড়ী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফলগাছ, দ্রুতবর্ধনশীল গাছপালা ও অপ্রধান শস্য সম্পর্কিত জ্ঞান সম্প্রসারিত করা হবে। তাছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দান করে তাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে চারাগাছ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে সকল উপজেলায় নার্সারী ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। ডি এ ই'র অধীনস্থ ইউনিয়ন পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মী ও স্থানীয় বেসরকারী চারা রোপণকারীদের জন্য এই নার্সারীগুলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এই নার্সারীগুলো থেকে জনসাধারণের মধ্যেও চারাগাছ সরবরাহ করা হবে। পরিকল্পনাকালে গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নার্সারী প্রতিষ্ঠার জন্য ৩,৬০০ বেসরকারী চারাগাছ উৎপাদনকারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এসময় প্রতিবছর চারা বিতরণ করা হবে ১·৫২ কোটি। গ্রামীণ বনায়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে এমন সব চারা গাছকে জনপ্রিয় করা যেগুলো জমে থাকা পানিতে প্রতি-বছর ডুবিয়েও টিকে থাকতে পারে। অনেক দেশীয় জাতের গাছপালা রয়েছে, নরম ও শক্ত কাঠ হিসেবে সেগুলোর রয়েছে উচ্চ বাণিজ্যিক মূল্য, যেমন, হিজল, জারুল, মান্দার, পিতালি প্রভৃতি। নার্সারীতে এসব জাতের চারাগাছ উৎপন্ন করে জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

(২) **নিবিড় বৃক্ষরোপণ :** সরকারী মালিকানাধীন ৩৩,৩০০ একর নিয়ামানের বনভূমিতে নিবিড় বৃক্ষরোপণ করতে হবে। খুঁটি, ছোটখাট কাঠ, জ্বালানী ও পশুখাদ্য সরবরাহ করে বনভূমি সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামীণ জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণই হবে এর লক্ষ্য। এই কর্মসূচী চারাগাছ উৎপন্ন, বৃক্ষরোপণ, সম্পদ আহরণ ও বাজার-জাতকরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয় ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে। দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে স্থানীয় ভূমিহীন/দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থাপনের মাধ্যমে বনবিভাগ এ ধরনের বৃক্ষরোপণ বাড়াতে পারে। রোপিত বৃক্ষ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে স্থানীয় জনগণ বিশেষভাবে দিনমজুরদের উপর। তারা নিজেদের মধ্যে একটি গ্রুপ গঠন করে বনবিভাগের তালিকাভুক্ত হবে। চারাগাছ বড় হওয়াকালীন সময়ে জমিতে এই গ্রুপের আন্তঃ-শস্য রোপণ ও গবাদি পশুকে ঘাস খাওয়ানোর অধিকার থাকবে। আন্তঃ-শস্য থেকে পাওয়া মধ্যবর্তীকালীন আয় গ্রুপের কাছে জমা হবে এবং গ্রুপের সদস্যরা তা ভাগ করে নেবে। মধ্যবর্তীকালীন ও চূড়ান্ত-ভাবে গাছ কাটা থেকে প্রাপ্ত আয় যৌথভাবে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রুপ ও বনবিভাগ ভাগ করে নেবে।

(৩) **সারিবদ্ধ পদ্ধতিতে বৃক্ষরোপণ :** প্রধান প্রধান সড়ক, রেললাইন এবং খাল ও নদীর বাঁধগুলো বরাবর সরু খালি জমি কেবল বন উন্নয়নের চমৎকার সুযোগই সৃষ্টি করে না সেই সাথে তা বেড়ীবাঁধ ও নদীর তীর স্থিতিশীল করতেও সাহায্য করে। স্থানীয় জনসাধারণের জ্বালানী ও নির্মাণকাজের চাহিদা পূরণে এইসব এলাকায় গাছপালা লাগানো যেতে পারে। স্থানীয় ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগণ যারা ওই খালি জমির পাশে অথবা কাছাকাছি বসবাস করে তাদেরকে সুনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের খালি জমি দেয়া যেতে পারে। গ্রুপ সংগঠিত করার এবং এসব গ্রুপের সদস্যদের সাহায্যে বৃক্ষরোপণের দায়িত্ব থাকবে বনবিভাগের উপর। তবে খালি জমির বনায়ন রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব থাকবে গ্রুপ সদস্যদের, সেই জমিতে আন্তঃ-শস্য (কয়েক ধরনের) লাগানোর অধিকারও থাকবে তাদের। আন্তঃ-শস্য থেকে প্রাপ্ত

আয় কেবল গ্রুপ সদস্যরাই ভাগ করে নেবে। এ ধরনের ফালি জমি তিনটি বিভিন্ন সংস্থা, যেমন সড়ক ও মহাসড়ক দপ্তর, রেলওয়ে বোর্ড এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের মালিকানাধীন হওয়ায় ওই ফালি জমিকে বৃক্ষরোপণের আওতায় আনার ক্ষেত্রে তাদেরকে অবশ্যই বাঁধ রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে হবে। পরিকল্পনাকালে এ ধরনের ৩০০০ মাইল দীর্ঘ ফালি জমিতে গাছ লাগানো হবে।

৫.১৩। **বন সৃষ্টি :** বনভিত্তিক শিল্প এবং জ্বালানী ও কাঠের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে এবং প্রতিবেশগত কারণে দেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বনভূমিতে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। বনের বৃক্ষশূন্য এলাকা ও সদ্য আবিষ্কৃত এলাকাসমূহও এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। এ ধরনের প্রায় ৭৫,০০০ একর বনভূমিতে বৃক্ষরোপণ করা হবে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটের এলাকাসমূহও অন্তর্ভুক্ত থাকবে যেখানে অতীতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এ সমস্ত স্থানে স্বল্প আবর্তমান জাতের দ্রুত বর্ধনশীল ও দীর্ঘ আবর্তমান উভয় জাতের বৃক্ষই রোপণ করা হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অতীতে প্রায় ১৬৫,০০০ একর বনভূমিতে এ ধরনের বৃক্ষরোপণ করা হয়েছিল, যার প্রায় ৩০%সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং অপর ৩০% এর জন্যে বড় ধরনের পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বৃক্ষরোপণ ব্যবস্থাপনার সিলভিকালচারাল দিকগুলোর ক্ষেত্রে যথাযথ মনোযোগ দানের অভাব। আরো কোন ক্ষতি হওয়ার আগে বিনিয়োগ মূল্য বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর একটি প্রধান কাজ হবে সিলভিকালচারাল অপারেশন—প্রধানত: চারাগাছগুলো পাতলা করে দেয়া ও পরিষ্কার করা। স্থানীয় জনসাধারণের জ্বালানী চাহিদা পূরণের জন্যে বৃহত্তর বৃক্ষরোপণ এলাকার বহির্ভাগে অত্যন্ত স্বল্প মেয়াদী আবর্তমান জাতের জ্বালানী কাঠের বনায়ন এলাকা গড়ে তোলা হবে। সম্পদ আহরিত বন এলাকার বৃক্ষরোপণ ছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চলে সদ্য জেগে উঠা জমিসহ অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন এলাকাসমূহের মোট ২৬১,০০০ একর জমিতে বৃক্ষরোপণ করা হবে। উপকূলীয় এলাকাগুলোতে দু'জাতের যেমন কেওড়া ও বায়েনজাতীয় বৃক্ষ লাগানো হবে। উপকূলীয় বনায়ন কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হবে নয়া বসতি বরাবর ৭০,০০০ একর জমিতে ইতিমধ্যে লাগানো বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ। বনবিভাগ এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় উপকূলীয় এলাকায় নতুন জমির একটি ভূমিব্যবহার সমীক্ষাও চালাবে।

৫.১৪। **আহরণ :** এটা স্বীকৃত যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর যথোপযুক্ত উন্নয়ন ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম বনাঞ্চলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাসালং-এর সংরক্ষিত বন থেকে কাঠ ভাসিয়ে আনার বর্তমান ব্যবস্থায় আহরণ এলাকা বছরে ৩,০০০ একরের চেয়ে বেশী করা যাবে না। অতএব পরিকল্পনাকালে এই এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সড়ক ও নৌ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে যাতে পরিকল্পনাকালের প্রান্তিক বছরে এই সম্পদ আহরণ এলাকাকে বার্ষিক ৪,০০০ থেকে ৪,৫০০ একরে উন্নীত করা যায়। উৎপাদনে অবদান রাখতে পারে এমন অপর দুর্গম সম্ভাবনাময় সংরক্ষিত বন হচ্ছে সাংগু-মাতামুহুরী। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে তৃতীয় পরিকল্পনা সম্পদ আহরণের জন্য ঐ এলাকা উন্মুক্ত করে দেবে।

৫.১৫। **অকাষ্ঠ বনায়ন :** এ শ্রেণীর বনায়নের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে রবার, বাঁশ ও বেত ইত্যাদি। পরিকল্পনাকালে দেশের রবার চাষ এলাকা বর্তমানের ২৩,০০০ একর থেকে প্রায় ৬৭,০০০ একরে বৃদ্ধি করা হবে। এর মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ একর থাকবে সরকারী খাতে এবং বাকী অংশ বেসরকারী খাতের অধীনে। রবার চাষ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে। খামারি বনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বাঁশ ও বেতের ব্যবহারের ব্যাপক প্রসারের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে এফআরআই (FRI) বাঁশ ও বেতের জন্য প্রয়োজনীয় ও দক্ষ প্রচারব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এছাড়াও দেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বনাঞ্চলে কৃত্রিম উপায়ে পুনরায় বাঁশসম্পদ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। দেশে এ পর্যন্ত মোট প্রায় ২,৫০০ একর এলাকায় তৈলপাম রোপণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমান

বনায়নগুলো সফল প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন নতুন বনায়ন করা হবে না। এই সময়কালে বর্তমান বনায়ন রক্ষা করা এবং বর্তমান তৈলপাম গাছের উপর আর্থিক কারিগরি সম্ভাব্যতা জরিপ চালানো হবে। বেসরকারী রবার চাষীদের কর্মকাণ্ডের সমণ্বয় ও নতুন প্রযুক্তির সংগে তাদের পরিচিত করানোর লক্ষ্যে বিএফআইডিসি'র অধীনে একটি সেল গঠন করা হবে।

৫'১৬। **বনতালিকাভুক্তি ও ব্যবস্থাপনা :** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনতালিকাভুক্তি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তালিকার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি চলছে। সুন্দরবনের বনতালিকাভুক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বনতালিকার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাও তৈরী করা হবে। এই সময়ে দেশের বাদবাকী বনাঞ্চলের বিশেষ করে সিলেটের উচ্চ বনাঞ্চলের তালিকা তৈরী করা হবে এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হবে। এসময়কালে ১৯৮৪ সালের এরিয়াল ফটোগ্রাফের ভিত্তিতে উপকূলীয় ম্যানগ্রোভজাতীয় বৃক্ষের বনায়নের একটি তালিকা তৈরী করা হবে। উপকূলীয় বনায়ন ব্যবস্থাপনার জন্য তালিকা উপাত্তের ভিত্তিতে একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী করা হবে, যে পরিকল্পনা হবে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিভিত্তিক প্রচলিত সনাতন পরিকল্পনার চাইতে ভিন্ন ধরনের।

৫'১৭। **বন গবেষণা :** প্রয়োজনমুখী না হয়ে বাস্ত প্রবণতার দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় বাংলাদেশে বন গবেষণা বন উন্নয়ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত খুব সামান্যই অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বন গবেষণার গোটা ক্ষেত্র হবে বনখাতের সাফল্যের জন্য একটি অবিচ্ছেদ্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিকল্পনাকালে গৃহিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে গবেষণার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে। বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থানীয় সমস্যার সাথে সম্পর্কিত লক্ষ্যমুখী গবেষণা হাতে নেবে। এছাড়া মাঠ সমস্যার উপর গবেষণা পরিচালনা করে বন গবেষণায় বিশেষভাবে নিম্নেবর্ণিত বিষয়ে জোর দেয়া হবে : (১) কলম বাগান (বাড ব্যাংক) প্রতিষ্ঠা করা হবে যা উচচমানের বীজ উৎস হিসেবে কাজ করবে, (২) উপযুক্ত দেশী ও বিদেশী দ্রুত বর্ধনশীল জাতসমূহ নির্বাচন ও মূল্যায়ন, (৩) নতুন ভূমিগঠন স্থিতিশীলকরণ এবং সেই সাথে তা ত্বরাণ্বিত করার লক্ষ্যে উপকূলীয় বনায়নের জন্যে ম্যানগ্রোভজাতসমূহ নির্বাচন ও উন্নয়ন, (৪) কর্মতৎপরতাকে চাংগা করে তোলা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহার ও রূপান্তর কৌশল বিষয়ক গবেষণা এবং (৫) বর্তমানের অবাণিজ্যিক ও কম-কাংখিত জাতসমূহের চুড়ান্ত ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা। কার্যকরভাবে দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে দেশের অন্যান্য কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের মতো বন ইনষ্টিটিউটকেও স্বায়ত্বশাসিত করা হবে।

৫'১৮। **বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বহিরাংগন আমোদ প্রমোদ :** বিভিন্ন ধরনের জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের জন্য বন বিশেষভাবে সহায়ক। অতএব প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবন বিশেষ করে যেগুলো বিলোপের হুমকির সম্মুখীন এমন সব জাতের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত বনএলাকাগুলোকে আলাদা করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বন্যপ্রাণীর উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, উন্নয়ন, বিক্রয়-নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়নের প্রয়োজন হবে।

৫'১৯। **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ :** পরিকল্পনাকালে এখাতের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির প্রাপ্তি নিশ্চিত করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বনবিভাগ ও বন উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থা ইতিমধ্যে পর্যাপ্ত যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি ঘাটতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। বন খাত সম্পর্কিত গোটা শিক্ষা পুরনোকালের ধারণার উপর ভিত্তিশীল ছিল ; উন্নয়নের চাহিদার প্রেক্ষিতে তা পরিবর্তন করতে হবে। ইতিমধ্যেই যুক্তিসংগতকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রেঞ্জারদের জন্য অর্ধ পেশাধারী পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কোর্স বিলোপ করে সেখানে একটি দুইধাপ বিশিষ্ট পদ্ধতি বনশিক্ষা চালু করা হবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বন ইনষ্টিটিউটে পেশাগত পর্যায়ের বনশিক্ষা যথাযথভাবে জোরদার করা হবে। প্রতি বছর সেখানে ৩৫ জন ছাত্র ভর্তি করা হবে। সিলেট বনস্কুলের ফরেষ্টারদের প্রশিক্ষণ

কোর্স ডিপ্লোমা পর্যায়ে উন্নীত করা হবে। এটা হবে এস, এস, সি'র পর একটি ৩ বছর মেয়াদী কোর্স। বছরে ছাত্রসংখ্যা হবে ১০০। বছরে ১৫০ জন বনপ্রহরীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে সিলেটের বন-স্কুলের বনপ্রহরী প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারিত করা হবে। সদ্য রিক্রুট করা বন বিষয়ক গ্রাজুয়েট ও অন্যান্য কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য চট্টগ্রামের বর্তমান ফরেষ্ট কলেজকে একটি চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ একাডেমীতে রূপান্তরীত করা হবে। একাডেমী বিভিন্ন পর্যায়ের ফরেষ্ট অফিসারদের জন্য রিফ্রেসার্স কোর্সের ব্যবস্থা করবে। এছাড়া ১৯৮৫/৮৬ সালের শেষ দিকে রাজশাহীর ফরেষ্টারস ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট কাজ শুরু করবে। সামাজিক বনায়ন একটি নতুন ধরনের কর্মকাণ্ড যাতে অফিসার ও ষ্টাফদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। অতএব বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটে ফরেষ্টারদের জন্য ৩—৪ মাসের একটি কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে। এর পাঠ্যক্রমে থাকবে বন সম্প্রসারণ পদ্ধতি, যোগাযোগ পদ্ধতি, শিক্ষাদান দক্ষতা ও মানসম্পন্ন মাঠ সম্প্রসারণ পদ্ধতি। গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে জিটিআই পেশাদারদের জন্য ৪ মাসের আরো একটি কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে। পাঠ্যক্রমে থাকবে বন সম্প্রসারণ ও মানসম্পন্ন মাঠ সম্প্রসারণ অনুশীলন বিষয়ক দর্শণ, কারিগরী কৌশল ও ব্যবস্থাপনা কোর্স।

অর্থ বরাদ্দ

৫'২০। তৃতীয় পরিকল্পনার অধীনস্থ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮৫-৯০ সময়কালে ৩৯২'০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এই বরাদ্দ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রকৃত ব্যয়ের চাইতে শতকরা ১৬১ ভাগ বেশী। এর বিভিন্ন খাতের বরাদ্দ নীচের সারণিতে দেয়া হলো

সারণি ৫'৩

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অর্থ বরাদ্দ

(কোটি টাকা)

কর্মসূচী	বরাদ্দ
১। বনভূমিতে বৃক্ষ রোপণ	১০৫'৩২
২। উপকূলীয় বৃক্ষরোপণ	৩৪'৩৮
৩। গ্রামীণ বৃক্ষরোপণ	১১৭'০০
৪। অ-কাষ্ঠজাত বৃক্ষরোপণ	৫২'৩০
৫। বনসম্পদ আহরণ	৩৯'০০
৬। শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ	৩৩'৫০
৭। অন্যান্য	১০'৫০
মোট :	৩৯২'০০

এর মধ্যে ১১৩'৫৬ কোটি টাকা চলতি প্রকল্পসমূহে এবং বাকী ২৭৮'৪৪ কোটি টাকা নতুন প্রকল্পগুলোর জন্য ব্যয় করা হবে।

পরিচ্ছেদ ৬ঃ পল্লী উন্নয়ন

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষিভিত্তিক। সার্বিক জাতীয় উৎপাদনের ৫০ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। কিন্তু এর পরেও গ্রামীণ জনসাধারণের বিরাট অংশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। গ্রামীণ জনসাধারণের বৃহৎ অংশ বেকার ও অর্ধবেকার। কার্যতঃ ভূমিহীনের সংখ্যা ৫০ শতাংশেরও বেশী এবং গ্রামের ৭৬ শতাংশ পরিবার প্রয়োজনীয় ন্যুনতম ক্যালোরী সীমার নীচে জীবনযাপন করে। চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে জনসংখ্যা অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে এবং শিক্ষার হার অতি নাজুক। নিম্ন উৎপাদনশীলতা, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদের বন্টন অর্থাৎ ভূমি ও সামাজিক কাঠামোর বন্টন উচ্চ আয় বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য সমস্যা আরও প্রকট করেছে এবং পল্লী উন্নয়নের প্রয়াসকে জটিল ও বাধাগ্রস্থ করেছে। এই বাধা বা চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলার জন্য দরকার দৃঢ় নীতি ও বিনিয়োগ কর্মসূচীতে যথাযথ কৌশল গ্রহণ।

পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

৬.২। ষাটের দশকে যদিও কুমিল্লা মডেলভিত্তিক একটি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী নেয়া হয়েছিল তবু এটি ছিল কৃষি খাতের অন্যান্য প্রকল্পের মতই এবং জাতীয় স্তরে এটাকে তেমনভাবে তুলে ধরা হয়নি। স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩- ৭৮) সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পল্লী উন্নয়নকে বিশেষ স্থান দেয়া হয়। কৃষকদের বিশেষ করে ভূমিহীন ও স্বল্প জমির কৃষকদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেয়াই ছিল এর লক্ষ্য। পরিকল্পনায় গ্রামের জনসাধারণকে সংগঠিত করা, সম্পদের ব্যবহার এবং স্থানীয় পরিকল্পনায় পদ্ধতিগত উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। তাই প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দরিদ্রদের স্বার্থে ব্যবস্থাপনায় আনুপাতিক হারে তাদের প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থাসহ সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাপকভিত্তিক করার কথা বিবেচনা করা হয়। সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর দুই ধারাবিশিষ্ট সমবায় কর্মপদ্ধতি এই শ্রেণীকে আকৃষ্ট করায় উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে স্থানীয় সরকারী প্রশাসন কার্যকরী পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, সমন্বয়সাধন এবং নিম্নস্তরের জনসাধারণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। পল্লী উন্নয়নে অন্য দু'টো ক্ষেত্র হ'ল (ক) পল্লী-পূর্ত কর্মসূচীর অধীনে রাস্তা, পুল, কালভার্ট, ড্রেনেজ ও সেচ খাল/প্রণালী, বেড়ীবাঁধ, স্লুইসগেট, হাট ও বাজার টিটিডিসি কমপ্লেক্স ইত্যাদির উন্নয়নসহ গ্রামের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন। এতে পল্লী এলাকায় কর্মবিনিয়োগের সুযোগও সৃষ্টি হয় এবং (খ) ভূমি সংস্কার, যাতে পরিকল্পনার কয়েকটি বিষয় প্রস্তাব করা হয়; যেমন (১) জমির মালিকদের জমির সিলিং কমানো এবং (২) জোতের বাধ্যতামূলক রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে বর্গাচাষীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ।

৬.৩। ১৯৭৪ সালের বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় সীমিত পরিসরে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী শুরু হয়। এতে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং পরে এর পরিসর ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়। ১৯৭৫/৭৬ সালে এর অধীনে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় ১.১৬ লাখ টন সেখানে সেই দশকের শেষের দিকে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৪.৫০ লাখ টনে। আরো গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, ১৯৭০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে পল্লী-উন্নয়ন চিন্তা-বিবেচনাগত দিক থেকে পেল নতুন দৃষ্টিভংগী এবং এর প্রকাশ দেখা গেল স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে। যদিও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, আই আর ডি পি-র দুই ধাপবিশিষ্ট পদ্ধতি এবং 'এলাকা উন্নয়ন' প্রবর্তিত হয়েছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীর পথ নির্মাণের জন্য, তবুও জনসাধারণের জন্য উন্নয়ন তৎপরতায় অংশগ্রহণের অন্যান্য প্রচেষ্টাও অব্যাহত ছিল। কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতিক মৌলিক পরিবর্তনের মৌল শর্ত তখনও অনুপস্থিত ছিল। ১৯৮৩/৮৪ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত স্থানীয় সরকার পদ্ধতি ছিল অপ্রতিনিধিত্বশীল। এমন কি কথিত তিনটি কর্মসূচীও অন্তর্গত সীমাবদ্ধতার জন্য বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। গরীবদের জন্য স্বল্পমেয়াদী কাজের সুযোগ সৃষ্টি হলেও অন্যদিকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী গ্রামের সম্পদশালী গোষ্ঠীকে কমবেশী নিরবিচ্ছিন্নভাবে লাভবান করেছে; যার ফলে বেড়েছে অসাম্য। আই আর ডি পি বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের

সংস্থাসমূহের উন্নয়নে তার অবদান এখনো সীমিত। এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে এখনো অদক্ষ বলে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি মন্থর। যখন উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহের গঠন ও বাস্তবায়ন কেন্দ্রীভূত ছিল, সংস্থাসমূহের বিরোধ এবং শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের অনুপস্থিতির কারণে তখন স্থানীয় পরিকল্পনা এবং সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে টিটিডিসি(TTDC) -এর কাজে অবনতি ঘটেছে। পরিশেষে ভূমিব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে গরীবদের মধ্যে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীতে এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। ১৯৬২/৬৩ সালে প্রয়োজনের চেয়ে কম ক্যালোরী গ্রহণের পরিবারের সংখ্যা যেখানে ছিল ৫৩ শতাংশ সেখানে ১৯৭৫/৭৬ সালে সে পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৯ শতাংশে এবং ১৯৮১/৮২ সালে সে পরিমাণ আরো বেড়ে ৭৬ শতাংশে দাঁড়ায়। ১৯৮১/৮২ সালে খরার দরুন খাদ্য উৎপাদন কমে গেলেও নমনীয় রেশনপদ্ধতির মাধ্যমে প্রচুর-খাদ্য বিতরণ করা হয়েছিল। এর পরেও নিঃসন্দেহে গ্রামের পরিবারগুলোর পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পায়। প্রথম পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ভূমিসংস্কার না হওয়ায় বর্গাচাষী ও ছোট কৃষকদের ক্ষেত্রে ভূমি বিতরণ পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ১৯৬০ সালে বর্গাচাষীরা মোট জমির ১৮'২ শতাংশ চাষ করতেন। ১৯৭৭ সালে জমিতে তাদের অংশীদারিত্বের পরিমাণ ১৮'২ শতাংশ থেকে কমে ১৬'৮ শতাংশে নেমে আসে। ১৯৬০ সালে ১'৫ একরের কম জমির চাষীর সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৩ শতাংশ, ১৯৮২ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮'৭ শতাংশে। এই হিসেবই প্রমাণ করে যে, গ্রামবাংলার দুই-তৃতীয়াংশ পরিবার ভূমিহীন বা তাদের রয়েছে ১'৫ একরেরও কম আবাদযোগ্য জমি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্যায়ন

৬'৪। পল্লী এলাকার ব্যাপক দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লীউন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ গরীব জনসাধারণকে উৎপাদনের সাথে যুক্ত করে এবং আয় ও সম্পদের যথাযথ বন্টন করে পল্লী এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস করা। এলাকা উন্নয়নের সম্প্রসারিত কর্মসূচীর আওতায় গ্রামীণ গরীবদের সংগঠিতকরণে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই উদ্দেশ্যে আই আর ডি পি-কে জোরদার করা হয় এবং কৃষি, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, রাস্তা, মৎস্য, পশুপালন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদিসহ এলাকা উন্নয়নের বিভিন্ন ব্যাপক উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ভার নেয়ার জন্য একে BRDB-তে সংগঠিত করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্ব স্ব পন্থায় প্রকল্প তৎপরতা বাস্তবায়িত করে। এর সমন্বয় সাধনে ছিল জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ের সুশৃঙ্খল সমন্বয়কারী সংস্থাসমূহ। এ ধরনের এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে চারটির নাম হচ্ছে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচী-১ (আর ডি-১), সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প (এস আই আর ডি পি), নোয়াখালী সমন্বিত পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প (এন আই আর ডি পি) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প (এস ডব্লিউ আর ডি পি)। সবগুলো প্রকল্পই সেচ, মৎস্য, পশুপালন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো আর্থসামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে বহু উদ্দেশ্যসমন্বিত। এগুলোতে বি আর ডি বি-র সমবায়গুলো তৎপরতা উন্নয়নে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প-১ (আরডি-১) ১৯৭৬/৭৭ সালে কাজ শুরু করে দু'টি জেলার ৭টি উপজেলায় (৩টি ময়মনসিংহে ও ৪টি বগুড়ায়) এবং ৩৭ কোটি টাকা খরচ সাপেক্ষে কাজ শেষ করে ১৯৮৩/৮৪ সালে। সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প (এস আই আর ডি পি) গ্রহণ করা হয় ১৯৭৭/৭৮ সালে এবং ৭২ কোটি টাকা খরচ সাপেক্ষে পাবনা জেলার ৪টি উপজেলায় কাজ শুরু করে। এটি আর ডি-১-এর অনুরূপ ছিল না। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কাজ ছিল কৃষি, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি। তৃতীয় ক্ষেত্র উন্নয়ন কর্মসূচী নোয়াখালী সমন্বিত পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প (এন আই আর ডি পি)-এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮/৭৯ সালে। ৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের কাজ হয় নোয়াখালী জেলার ৩টি উপজেলায়। এই প্রকল্প সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের অনুরূপ কাজ করে। চতুর্থ প্রকল্প হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প (এস ডব্লিউ আর ডি পি)। এই প্রকল্প ফরিদপুর ও যশোহর জেলার ৪৪টি উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষিসেচ, মৎস্য উন্নয়ন, সমবায় (ইউসিসিএ-কে এসএস) এবং গরীবদের কর্মসংস্থানমূলক কাজ করে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ও এই প্রকল্পের কাজ চলবে।

৬'৫। উপরে উল্লেখিত চারটি এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের তিনটি, যথা আর ডি-১, এস আই আর ডি পি এবং এন আই আর ডি পি-এর কাজ নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে শেষ হয়। এই তিনটি সমাপ্ত প্রকল্পের মোট খরচ হয় ১৪২'০০ কোটি টাকা। গড়ে প্রতি উপজেলার খরচ হয়েছে ১০'১৪ কোটি টাকা। চতুর্থ প্রকল্পের কাজ তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও চলবে।

৬'৬। এলাকাউন্নয়ন প্রকল্পগুলো নির্ধারিত এলাকার কৃষি উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত করা হয়। এটা করা হয় গ্রামীণ জনসাধারণের বাহ্যিক অবকাঠামোর উন্নয়ন ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সীমিত কর্মসূচীসমূহের মাধ্যমে। কর্মসূচীগুলো মূলতঃ মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বাস্তবায়ন সংস্থার সমন্বয়ের অভাবে দেরীতে শেষ হয়। বর্তমান ভূমি মালিকানা ব্যবস্থায় পল্লীর গরীবদের অনুকূলে কর্মসূচী গ্রহণ ও কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৃহত্তর গুরুত্বদানের অপর্যাপ্ততার ফলে গ্রামের গরীবদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য এর চেয়ে ভাল কিছু করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের অনেকগুলো উপাদান ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং তাদের সুফল প্রাপ্তিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এ পর্যন্ত আরডি-১ নামক একটি মাত্র এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বি আই ডি এস-এর দ্বারা মূল্যায়িত হয়েছে যাতে দেখা গেছে যে, এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার চাইতে কৃষির উপর তেমন কোন বৈশিষ্ট্যসূচক ফলাফল দেখাতে পারেনি, আর প্রকল্প এলাকার সমবায়গুলো সাধারনতঃ পল্লীর সচ্ছল পরিবারগুলো দ্বারা চালিত।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং নতুন কৌশল

৬'৭। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষভাগে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে একটি নতুন কৌশলের উদ্ভাবন করা হয়। এই কৌশলে পল্লী উন্নয়নের জন্য তিনটি প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে:

(১) রাস্তা, গুদামজাতকরণ ও বাজারসহ ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন;

(২) সেচকৃত কৃষি, মাঝারি ধরনের পানি নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ এবং

(৩) গ্রামের গরীবদের জন্য উৎপাদন ও কর্মসুযোগ সৃষ্টির কর্মসূচী।

নতুন কৌশলের সংগে সামঞ্জস্য রেখে ১৯৮৩/৮৪ সাল পর্যন্ত তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে (১) পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (আর ডি-২), (২) উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এন ডব্লিউ আর ডি পি) এবং (৩) নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (এন আর ডি পি-২)। এই তিনটি প্রকল্পের মধ্যে আর ডি-২ বৃহত্তম ও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই প্রকল্প ১৩টি (পুরানো) জেলার ৩০১টি উপজেলা নিয়ে বিস্তৃত। পুরানো এই ১৩টি জেলা হচ্ছে, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও কুমিল্লা। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প কৌশলের সেচকৃত কৃষি উপাদানটি এই ১৩টি জেলায়ই কৃষি সহায়ক বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও ১৩টি জেলার মধ্যে দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, জামালপুর, বরিশাল ও খুলনা—এই ৬টি জেলায় রয়েছে উৎপাদন ও কর্ম-সংস্থানমূলক কর্মসূচী। ১৯৮৩/৮৪ সালের শেষ ভাগে এই প্রকল্প শুরু হয়েছে এবং এই সময়ে প্রকল্পটির প্রাথমিক কিছু কাজ করা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প নামের দ্বিতীয় প্রকল্পটি রাজশাহী, পাবনা ও কুষ্টিয়া (পুরনো) এই তিনটি জেলার ৫২টি উপজেলায় ব্যাপৃত। ১৯৮৩/৮৪ সালের শেষ দিকে এর বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়। এই প্রকল্প পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প কৌশলের যে দু'টি নিয়ে কাজ শুরু করে সেগুলো হচ্ছে (১) সেচকৃত কৃষি এবং (২) গরীবদের জন্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী। নতুন তিনটি প্রকল্পের শেষটির নাম হচ্ছে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২। পুরনো নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত সব এলাকাকে কর্ম পরিধি করে এর কাজ শুরু হয় ১৯৮৪/৮৫ সালে। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সবগুলো কৌশলই এই প্রকল্পের উপাদান। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৭টি এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে যে ২২০'৬ কোটি টাকার মোট খরচ করা হয় তার মধ্যে উল্লিখিত তিনটি প্রকল্পে খরচ করা হয় ৭৮'৬ কোটি টাকা।

পল্লী পূর্ত কর্মসূচী

৬'৮। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পল্লী পূর্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচী নেয়া হয় বিকেন্দ্রায়িত অংশীদারীত্বমূলক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে। বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় অবয়বসমূহ জনসাধারণকে জড়িত করে স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলো প্রকল্প চিহ্নিত, পরিকল্পিত, অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত করে। এর উদ্দেশ্য দ্বিবিধ (১) কৃষি ও যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামো গড়ে তোলা এবং (২) ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোতে অবসর মৌসুমে ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য সাময়িক কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী পূর্ত কর্মসূচীতে নীচের প্রকল্পগুলো সন্নিবেশ করা হয়:

(১) স্বাভাবিক পল্লী পূর্ত কর্মসূচী।

(২) চারটি বিভাগের চারটি নির্বাচিত জেলায় বিশেষ সরকারী পূর্ত কর্মসূচী।

(৩) ১০০টি উপজেলায় নিবিড় পল্লী পূর্ত কর্মসূচী।

(৪) গ্রামের সরকারী হাট-বাজারের উন্নয়ন।

(৫) জেলা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন।

(৬) সাব-থানা/ইউনিয়ন পর্যায়ে, প্রতিটিতে ২৫০ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন, ৮০০টি খাদ্যগুদাম নির্মাণ।

(৭) দক্ষিণ-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পল্লী পূর্ত কর্মসূচী।

৬'৯। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর সাফল্য নীচের সারণিতে দেখানো হলো:

সারণি ৬'১

পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর ভৌত সাফল্য

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (পি পি অনুযায়ী)	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (এডিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী)	ভৌত সাফল্য (১৯৮৪/৮৫ সাল পর্যন্ত)
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	**রাস্তা ও সেতু:**				
	(১) পাকা রাস্তা	মাইল	৪৪৮	৩৭০	২৯৪
	(২) কাঁচা রাস্তা	মাইল	৬,৮৪৫	৩,৪৫০	২,৯৭৫
	(৩) সেতু ও কালভার্ট	রানিং ফুট	২৯,০০০	২৮,১০০	২৪,৭৫০

সারণি ৬.১ (ক্রমশঃ)

১	২	৩	৪	৫	৬
২।	সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ				
	(১) সেচ খাল ও নালা খনন এবং পুনর্খনন	মাইল	৮,০৭০	২,০৮০	১,৬৫০
	(২) বেড়ী বাঁধ	মাইল	২,০০০	৫৬০	৪৩৬
	(৩) ক্রসড্যাম	সংখ্যা	১,৮০০	৬৯০	৬১০
	(৪) গভীর ও অগভীর নলকূপ থেকে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	রানিং ফুট	৪৯৪,৫০০	৮০,০০০	৬৫,০০০
	(৫) পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (স্লুইস গেইট নিয়ন্ত্রক)	সংখ্যা	৩,৪৭০	৮৩৬	৫৫৪
	(৬) বদ্ধ জলাশয় পুনঃসংস্কার	একর	২,৪৯২	১,৭৮৫	১,৩৫০
৩।	ভবন নির্মাণ ঃ				
	(১) সেচযন্ত্রের জন্য কারখানা ও গুদাম (নতুন ও অসমাপ্ত)	সংখ্যা	২৪৮	২১০	১৬৬
	(২) টিটিডিসি (নতুন ও অসমাপ্ত)	সংখ্যা	৩৪	২৩	১৭
	(৩) ষ্টাফ কোয়ার্টার (৪ফ্ল্যাটের ভবন, অসমাপ্ত টুইন কোয়ার্টার ও পুরনো টুইন কোয়ার্টারগুলোকে ৪ ইউনিটের কোয়ার্টার রূপান্তরসহ)	সংখ্যা	৪০২	২৯০	২১১
	(৪) টিসিসিএ ভবন	সংখ্যা	৩৬	৩২	২৮
	(৫) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়-কাম কমিউনিটি সেন্টার	সংখ্যা	৩৫৩	২৬১	১৭৮
	(৬) খাদ্য/সার/বিপণন গুদাম (নতুন ও অসমাপ্ত)	সংখ্যা	৮২২	৭৫৩	৭৪৮
৪।	গ্রাম্য হাট ও বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	১,২৪৪	২৩১	২০০
৫।	'আদর্শ চাষী' প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২০৭,০০০	৫২,৬৫০	৪৮,৬৭০
৬।	কর্মসংস্থান	লাখ দিবস	—	—	৩৪০

৬'১০। পল্লী পূর্ত কর্মসূচীতে খরচ ধরা হয় ১৬৯'১ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, পল্লী পূর্ত কর্মসূচীতে খরচের প্রধান অংশ এসেছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী থেকে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিতরণ করা হয়েছে ২১'৪ লাখ টন খাদ্য, পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের খরাদের পরিমাণ ছিল ১১'৯ লাখ টন। গমের মূল্য প্রতি মণ ১৪৫ টাকা ধরলে ২১'৪ লাখ টনের মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৮৩৭'৮ কোটি টাকা। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ১১৫'৬ কোটি কর্ম দিবসের সমান কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, আর পল্লী পূর্ত কর্মসূচীতে এর পরিমাণ হচ্ছে ৩'৪০ কোটি।

সমবায়ের উন্নয়ন :

৬'১১। দেশে বর্তমানে প্রচলিত সনাতন ও দুই ধাপবিশিষ্ট : এই দুই ধরনের সমবায় ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মূল প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বিআরডিবি-র সংগঠিত দুই ধাপবিশিষ্ট সমবায়ের উন্নয়নে। এই ধরনের সমবায়ী উদ্যোগ গ্রাম পর্যায়ে সংগঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলো কে এস এস বলে পরিচিত, সংযুক্ত সমিতিগুলোকে বলা হয় ইউসিসিএ। উপজেলা পর্যায়ে এগুলো গঠন করা হয়েছে ঋণদান, উপাদান বিনিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক সমিতিগুলোর সম্প্রসারণের মতো সরবরাহ ও সেবামূলক কাজের জন্য। ষাটের দশকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর উদ্যোগে কুমিল্লায় কে এস এস কর্মসূচী মডেল হিসেবে পরিগণিত হয় এবং ১৯৭১/৭২ সালের শুরুতে দেশব্যাপী এই মডেল গৃহীত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ ভাগে কে এস এস কর্মসূচী প্রায় সারাদেশেই পরিচিত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ ভাগে অর্জিত সাফল্য এত ব্যাপক ছিল যে, এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ২৩ লাখ সদস্যের ৬২ হাজার সমিতি গঠন করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষের দিকে সমিতির সদস্যদের সংগৃহীত চাঁদার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ কোটি টাকা। ইউসিসিএ/কেএসএস পদ্ধতিতে কোন লাভ অর্জনকারী ব্যবসার মাধ্যমে একে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার পরিবর্তে এই পদ্ধতিকে সরকারী অর্থানুকূল্য ও সমর্থনের উপর নির্ভরশীল করা হয়। ইউসিসিএ/কেএসএস পদ্ধতি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সমবায়ীদের আয় বাড়াতে অবদান রেখেছে সত্য কিন্তু এই পদ্ধতি বহু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর স্বার্থ এড়িয়ে গেছে, ভূমিহীনদের বিচ্ছিন্ন বা নিঃসঙ্গ করেছে এবং মহিলাদের নিরুৎসাহিত করেছে। মূলতঃ তুলনামূলকভাবে সচ্ছল চাষীদের দ্বারাই এ সংগঠনগুলো পরিচালিত হয়েছে এবং সমিতিগুলো তারা নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করেছে।

৬'১২। কে এস এস পদ্ধতির এই সীমাবদ্ধতা অনুমান করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময় ভূমিহীন ও দুঃস্থ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথভাবে উন্নত করার চেষ্টা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম হচ্ছে বিত্তহীন সমবায় সমিতি (বি এস এস) এবং মহিলা সমবায় সমিতি (এম এস এস)। এইগুলোর উন্নয়ন সাধন করা হয় কৃষি ও অকৃষি কার্যক্রমেএর সদস্যদের দক্ষতার উন্নয়ন এবং ঋণ ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে সেবামূলক সমর্থন দানের জন্য। শেষের দিকে কাজ শুরু হওয়ায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই প্রতিষ্ঠানগুলো খুব একটা অগ্রগতি দেখাতে পারেনি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ২'৯০ লাখ সদস্য নিয়ে প্রায় ১০,০০০ বিত্তহীন সমবায় সমিতি এবং ২'৬০ লাখ সদস্য নিয়ে প্রায় ৮,০০০ মহিলা সমবায় সমিতি সংগঠিত করতে পেরেছিল। এখন তারা কে এস এস-এর ইউ সি সি এ-র সাথে যুক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত যখন এগুলো সংখ্যায় আরো অধিক ও সক্ষমতা অর্জন করবে তখন নিজেদের শীর্ষ ইউনিট (এ্যাপেক্স ইউনিট) গড়ে উঠবে। বি এস এস এবং এম এস এস এখন বেত ও বাঁশের কাজ, মৌমাছি সংরক্ষণ, কারু শিল্প, নারকেলের ছোবড়া, মৃৎপাত্র তৈরী, ধান ভানা, পুকুরে মাছ চাষ, তেল পেষা, হাঁস-ছাগল পালন, জাল বানানো, রিক্সা টানা ইত্যাদির ন্যায় অর্থনৈতিক কাজ হাতে নিয়েছে।

৬'১৩। সমবায় কর্মসূচীর ভৌত সাফল্য নীচের সারণিতে সংক্ষেপিত করা হলো :

সারণি ৬'২

সমবায় খাতের অগ্রগতি

সমবায়ের ধরন		দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা	দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সাফল্য	ক্রমপুঞ্জিত সাফল্য
(১) **ইউ সি সি এ গঠন :**	(সংখ্যা)	১৬৪	১৬৪	৪৪৮
(২) **প্রাথমিক সমিতি গঠন :**				
(ক) কে এস এস	(সংখ্যা)	১৫,৩৭০	২২,৩৭০	৬১,৯৭৮
(খ) বি এস এস	(সংখ্যা)	১৬,০০০	১০,২০০	১০,২০০
(গ) এম এস এস	(সংখ্যা)	৬,২০০	৮,২০০	৮,২০০
(৩) **সদস্যদের তালিকাভুক্তি :**				
(১) কে এস এস	(লাখ)	১৬'০০	১৩'০০	২৩'০০
(২) বি এস এস	(লাখ)	২'৮৫	২'৯০	২'৯০
(৩) এম এস এস	(লাখ)	১'৮০	২'৫৭	২'৫৭
(৪) **মূলধন গঠন (সেভিংস ও শেয়ার) :**				
(১) কে এস এস	(লাখ টাকা)	৭০৬	১,৬৬৫	৩,১৭৫
(২) বি এস এস	(লাখ টাকা)	৩৯	২৪২	২৪২
(৩) এম এস এস	(লাখ টাকা)	১২৫	২৬৩	২৬৩

৬'১৪। উপরে বর্ণিত সমবায় কর্মসূচীতে খরচ হয়েছে ৪৮'০ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিআরডিবি-র খরচ ৩৩'০ কোটি টাকা। এছাড়াও বিশেষ করে পল্লী এলাকায় দারিদ্র ও বেকারত্ব দূর করার জন্য সেখানে আইনসিদ্ধ কিছুসংখ্যক আধা-সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা কাজ করেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক, যেটি পরীক্ষামূলক কাজে সফল হয়ে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। ১৯৮২/৮৩ সালে এটি পল্লী এলাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসেবে কাজ শুরু করে। এই ব্যাংকের মূলধন ৩ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে ৫টি জেলায় এর গ্রামীণ শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৪টিতে। গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি বিআরডিবি থেকে ভিন্ন। সাধারণ সমবায়ের চাইতে এই ব্যাংক বেশী নির্ভর করে যৌথ উদ্যোগ ও সচেতনতার উপর। গ্রামের স্বল্পভাগ্যবানদের প্রতি এই ব্যাংকের কর্ম উদ্যোগ বিআরডিবি, বিএসএস এবং এমএসএস-এর কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাদের কাজের সবচেয়ে সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, যদিও তারা গরীবদের জীবন উন্নত করায় সাহায্য করছে তবুও তারা স্বীকৃতি পাচ্ছে কম এমন কি অদক্ষ কৃষি শ্রমিক থেকেও। গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ব্যবসায় উন্নততর প্রযুক্তি সংযোগের লক্ষ্য এখন পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

৬'১৫। একথা স্বীকৃত যে, গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নতির মাধ্যমে সমগ্র পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী শুধুমাত্র কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে না। গ্রামের গরীবদের স্বার্থের উন্নতিও এর বড় উদ্দেশ্য। ১৯৬০-এর দশকে গড়ে ওঠা কুমিল্লা মডেল এখন একটা অবয়ব নিয়ে বিস্তৃত হয়েছে; কেএসএস থেকে বিএসএস এবং এমএসএস এরই ফসল। কিন্তু এটা স্বাভাবিকভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও বিশ্বাসের ধারক হিসেবে মানবীয় সচেতনতায় ভূমিহীন ও সচ্ছল কৃষকদের মধ্যে একটি উপলব্ধিগত পার্থক্য রয়েছে। এই জন্যই পরিকল্পনাকারী ও টার্গেট গ্রুপ এর কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে

পল্লী উন্নয়ন উদ্যোগের নিয়মিত মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এই কারণে কৃষক ও সমবায় কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা পল্লী উন্নয়ন কৌশলে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। চারটি পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ একাডেমী/ইনস্টিটিউট-এ প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এগুলো হচ্ছে, (১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা (বি এ আর ডি), (২) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া (আর ডি এ), (৩) পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সিলেট (আর ডি টি আই), এবং (৪) স্থানীয় সরকারের জাতীয় ইনস্টিটিউট, ঢাকা (এন আই এল জি)। এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন জাতি গঠনমূলক বিভাগ/সংস্থার ব্যক্তি, স্থানীয় সরকারী প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং সমবায়ের নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দেয়। এই প্রশিক্ষণ বিশেষভাবে দেয়া হয় খাতভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী/প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের জন্য। ইনস্টিটিউটগুলো সম্প্রসারিত ক্ষেত্রে এদের প্রশিক্ষণ তৎপরতা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য একটি নমনীয় প্রশিক্ষণ নীতি অনুসরণ করে থাকে। কোর্সে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ওরিয়েন্টেশন, প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ। অনুমান করা হচ্ছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে বি এ আর ডি (কুমিল্লা), আর ডি এ (বগুড়া), আর ডি টি আই (সিলেট) এবং এন আই এল জি (ঢাকা) থেকে জাতি গঠনকারী বিভিন্ন সংস্থা/বিভাগ ও স্থানীয় সরকারী প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ২৩,০০০ লোককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও উপজেলা স্তরে মাঠ/স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে আদর্শ কৃষক, সমবায় ব্যবস্থাপক, স্থানীয় প্রকল্প কমিটির সদস্য, কারিগর সেচ গ্রুপের ব্যবস্থাপকদের।

নূতন নীতিমালা

৬.১৬। দ্বিতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে দুটি বহু প্রতীক্ষিত নীতির সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর প্রথমটি হচ্ছে, স্থানীয় প্রশাসনকে শক্তিশালীকরণ; এর জন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতায় স্থানীয় প্রশাসনকে জোরদার ও সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। স্থানীয় প্রশাসনে এই বৈত প্রকৃতি, স্থানীয় উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রক্রিয়া থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে জনসাধারণের অংশগ্রহণের ভিত্তি প্রস্তুত করবে। লোক প্রশাসন এবং উপজেলা উন্নয়ন অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৬.১৭। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি উন্নয়নটি হচ্ছে ভূমি সংস্কার নীতি। এই নীতিতে (১) জমি মালিকানার নতুন সিলিং নির্ধারণ ও দখলীস্বত্ব, (২) জমি, শ্রম ও উপকরণের ভিত্তিতে ফসলের বন্টন এবং (৩) ন্যূনতম কৃষি মজুরী নির্ধারণ করা হয়েছে। এই তৎপরতা এবং স্থানীয় সরকারের অধিকতর ভূমিকা পালন গ্রামীণ দরিদ্রদের লাভবান করার জন্য পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫—৯০)

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

৬.১৮। অতীতের বহু প্রচেষ্টার পরও ভূমিহীনতা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও পুষ্টির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের এক হতাশাব্যাঞ্জক চিত্রই ফুটে উঠে। আর্থসামাজিক এই বৈরী অবস্থার সারভাগ হিসেবে জনসাধারণের মধ্যে মহামারীর আকারে বিরাজ করছে দারিদ্র। এই প্রেক্ষিতে এখন অবশ্য স্বীকৃত যে, দেশের প্রায় ৯০% লোকই গ্রামে বাস করে। বস্তুতঃ কিছু শহর ও নগর ছাড়া সারা বাংলাদেশই একটি পল্লী বস্তি, এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে শহুরে সম্প্রদায়ের মধ্যেও। এই অবস্থার সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেবলমাত্র গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা পল্লীর দারিদ্র দূরীকরণে সাফল্যের সাথে কাজ করতে পারলেই তা জনসাধারণের কাছে অর্থবহ হবে। এজন্য পরিকল্পনা নীতিকে কাজের সুযোগ সৃষ্টির অনুকূলে প্রভাবিত করা উচিত। এই পরিকল্পনা নীতিতে দরিদ্রদের অধিকতর সুযোগের বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। এটা করতে হবে উৎপাদনশীল কর্ম-সুযোগ সৃষ্টি, গ্রামীণ অর্থনীতি ও আনুষঙ্গিক বিনিয়োগ ক্ষেত্রে কৃষি-অকৃষি ক্ষেত্র নির্বিশেষে দক্ষকরণ ও গ্রামীণ প্রযুক্তি উন্নত করার জন্য।

৬.১৯। গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে উন্নয়নের উদ্দেশ্য হবে:

(১) গ্রামীণ জনগণের বিপর্যয় রোধ করা এবং উৎপাদনশীল খাতকে সম্প্রসারিত করে স্থায়ী-ভিত্তিতে লাভবান কর্মসংস্থান ও আয় সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কমপক্ষে ১০% গ্রামীণ দরিদ্রকে দারিদ্র সীমার উপরে তুলে আনা;

(২) উৎপাদন তৎপরতার নিয়োজিত বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদনের উপকরণসমূহ গ্রামীণ জনগণের আয়ত্বে নিয়ে আসা;

(৩) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পল্লীর গরীবদের স্থানীয় সম্পদের অংশীদারিত্ব অর্জনে সক্ষম করে তোলা; এবং

(৪) মৌলিক অবকাঠামো ও সামাজিক সেবার নিশ্চয়তা দিয়ে গ্রামের জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা।

কৌশল ও নীতি

৬.২০। উপরে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়িত করার স্বার্থে দরকার একটি দৃঢ় কৌশল ও সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন। এ পর্যন্ত পরিকল্পনাভিত্তিক যে চেষ্টা করা হয়েছে তা প্রধানতঃ যোগাযোগ-সংযোগ, গুদাম, বাজারসহ ভৌত অবকাঠামো এবং চাষাবাদের উন্নয়ন তৎপরতায় পরিবৃত। কৃষি ও অবকাঠামোর সেই উন্নয়নের পরও দারিদ্র বৃদ্ধি পাওয়ায় অতীতের কৌশল সম্পর্কে অবধারিতভাবেই প্রশ্ন জাগে। প্রসংগতঃ এখন এটা স্বীকৃত যে, গ্রামীণ অর্থনীতির সেই দু'টি খাত (কৃষি ও অবকাঠামো) পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও পল্লীর দারিদ্র মোচনে এগুলো যথেষ্ট নয়; কারণ পল্লীর কৃষি শ্রমিকদের কাজ ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ যথেষ্ট নয় — গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক দিয়ে। বর্তমান পর্যায়ে ব্যাপকভাবে কাজের ক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে, মহিলা ও শিশুদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী শ্রম নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অন্যদিকে যদিও নতুন কৃষি প্রযুক্তিতে শ্রম শক্তির প্রয়োজন রয়েছে তবুও পল্লী এলাকায় কৃষি শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ সীমিত। ১৫ বছরের কম বয়সের বালকেরা যেহেতু ইতিমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে তাই এদের জন্য প্রায় ৫০ লাখ নূতন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে বলে হিসেব করা হয়েছে। গ্রামের শ্রম শক্তিকে কাজে লাগানোর স্বার্থে কৃষি ক্ষেত্র ছাড়িয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে বহুমুখী করে তুলতে হবে।

৬.২১। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এছাড়াও প্রয়োজন গ্রামের গরীবদের উৎপাদন এবং উন্নয়নের লাভালাভ ন্যায্যভাবে পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা। এর জন্য অতীতে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে ২.৪% সেখানে খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে ৪% হারে। ন্যূনতম ক্যালোরী গ্রহণে অক্ষম এমন গ্রামীণ পরিবারগুলোর আনুপাতিক হারও বেড়েছে। শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এই অবনতিকে অবশ্যই রুখতে হবে। এর জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে পল্লী অর্থনীতির প্রযুক্তি ও মূলধন উভয় ভিত্তিকে উন্নত করা প্রয়োজন। একথা বলা পুনরাবৃত্তি হলেও স্বীকৃত যে, শ্রম ও ভূমি হ'ল বাংলাদেশের দু'টি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। এযাবত যে উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে, প্রধানতঃ সেগুলো ছিল ভূমিকেন্দ্রিক, ফলে কৃষিজ বা ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও পক্ষান্তরে তা গ্রামীণ বৈষম্যকে তীব্র করেছে। পল্লী উন্নয়ন কৌশলে গ্রামীণ জনগণকে শুধু উচ্ছিষ্টভোগী না করে শ্রমকে কার্যকরী সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে হবে।

৬.২২। পরিস্থিতির আলোকেই পল্লী উন্নয়নের কৌশল সম্পূর্ণভাবে পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। এটি শুধু বিষয়গত প্রশ্ন নয়। একটি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে কৃষি উন্নয়নে অবশ্যই অগ্রাধিকার থাকতে হবে এবং যোগাযোগ-সংযোগ, বাজার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার মতো ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন কৃষি উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কৃষি বহির্ভূত তৎপরতাও করতে হবে সম্প্রসারিত। শুধু দরিদ্রের সংস্থাগুলোকেই নয়, বাস্তব সমস্যার প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি-র দলগত উদ্যোগ এবং গ্রামীণ ব্যাংকের

দলগত পদক্ষেপগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতির যথাযথ উন্নয়নে যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী সুসংহতকরণ; অর্থাৎ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীতে বর্তমানের উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের মধ্যে বিদ্যমান বিভাজন এবং কৃষি ও অকৃষি খাতসমূহের মধ্যে বিদ্যমান বিভাজন অবশ্যই রদ করতে হবে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য জীবনমাত্রার মান আপাততঃভাবে উন্নত করলেও পরিণতিতে পল্লী কর্মসংস্থানে সমস্যা দেখা দেয়, কারণ এই বৈশিষ্ট্যে অকৃষি খাতকে সর্বশেষ অবলম্বন বলেই গণ্য করা হয়। উৎপাদন ও কর্মসংস্থান এবং কৃষি ও অকৃষি খাতের এই দ্বৈত সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন অকৃষি খাতের প্রযুক্তিগত উন্নতির মতো জটিল ক্ষেত্রে অগ্রগমন। তাই সেচ ও কৃষি উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান-পল্লী-উন্নয়নের এই তিন উপাদানের সবকটির তুলনায় কর্মসংস্থান উপাদান ও তার উৎপাদনশীলতার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। প্রতিটি স্বতন্ত্র পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এই উপকরণ গুলি আলাদাভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে হাতে নিতে পারে, কিন্তু তাকে অবশ্যই কমপক্ষে একটি পূর্ণাংগ প্রশাসনিক জেলার পরিবৃত হতে হবে। উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচীগুলোকে প্যাকেজ কর্মসূচীর আকারে পরিচালনা করতে হবে এবং এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে (১) ইন্সটিটিউশন, (২) প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ, (৩) ঋণ, (৪) অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ এবং (৫) বাজার। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিধানে তৃতীয় পরিকল্পনার সীমিত পরিসরে উপজেলা কর্মসংস্থান সম্পদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা করা হবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী

৬.২৩। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কর্মসূচীতে আগে উল্লিখিত তিনটি উপাদান সন্নিবেশিত হবে। এগুলোর উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৯৬০ কোটি টাকা। প্রতিটি উপাদানের অধীনস্থ কর্মতৎপরতা ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো :

(ক) **ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন :**

(১) ১,৪০০ মাইল ফিডার রাস্তা এবং ৭০ হাজার রানিং ফুট ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ। এগুলোকে রাস্তার মাধ্যমে গ্রোথ সেন্টারগুলোর সাথে যুক্ত করা হবে।

(২) প্রতিটি উপজেলায় সমন্বিত সেবাকেন্দ্র তথা বাজারের ন্যূনতম মান বজায় রেখে অন্ততঃ একটা পল্লী গ্রোথ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(৩) গ্রোথ সেন্টারগুলোতে বিদ্যুতের বন্দোবস্ত করা হবে (পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বাইরের এলাকাগুলোতে এর দায়িত্বে থাকবে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড)।

(খ) **সেচকৃত কৃষি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও ছোট আকারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ :**

(১) ছোটখাটো সেচ কর্মসূচীর মাধ্যমে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ এবং দেশের চাষযোগ্য জমির অতিরিক্ত ৬ লাখ একর জমিতে দ্রুত ফলনশীল প্রকল্প (ইআইপি) গ্রহণ। এই প্রকল্প হবে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সেচ কর্মসূচীর অতিরিক্ত, যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ছোট পর্যায়ের খনন, বন্যা প্রতিরোধ ও সেচ প্রকল্পসমূহ।

(২) সার, বীজ ইত্যাদির মতো কৃষি উপকরণ উৎপাদনের ব্যবস্থা।

(৩) কৃষকদের পর্যাপ্ত ঋণদানের ব্যবস্থা।

(গ) **গ্রামের দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ও উৎপাদন :** গ্রামের গরীবদের জন্য কর্মসংস্থান ও চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করা, যাতে আরও দারিদ্র্যে ডুবে যাওয়া থেকে তাদের রোধ করা যায় এবং কমপক্ষে তাদের ১০ শতাংশকে দারিদ্র্য সীমার উপরে আনা যায়। উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের কর্মসূচীতে উপাদানসমূহের বিপনন, প্রশিক্ষণ এবং উপকরণসমূহ সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং এগুলো হবে অবশ্যই উন্নতমানের। মহিলা সমবায় সমিতি (MSS)-এর মাধ্যমে মহিলাদের মুনাফাজনক প্রশিক্ষণ দানকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উন্নয়ন

৬.২৪। জাতীয় সরকারের দায়িত্বে পল্লী উন্নয়ন তৎপরতার অতিরিক্ত হিসেবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকবে। ছোট ও মাঝারি ধরনের কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, পল্লী-পূর্ত কর্মসূচী, হাট-বাজার, খাবার পানি সরবরাহ, স্বল্পমূল্যে পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী, খেলাধুলা ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম এবং অন্যান্য বিবিধ ক্ষেত্রে এই উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ কেন্দ্রীভূত থাকবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ সমস্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য উপজেলাসমূহে উন্নয়ন সাহায্য বাবদ ১,২৫০ কোটি টাকা থোক আকারে রাখা হয়েছে।

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন খাতে অর্থ বরাদ্দ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাদ্য ও কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন খাতের উন্নয়ন কর্মসূচী-গুলো বাস্তবায়নের জন্য মোট ১১,৪৬০ কোটি টাকা (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে) বরাদ্দ করা হয়েছে; এর মধ্যে সরকারী খাতের জন্য ৭,০৬০ কোটি এবং বেসরকারী খাতের জন্য ৪,৪০০ কোটি টাকা। সরকারী খাতের উপ-খাত ভিত্তিক বিবরণ নীচের সারণিতে দেখানো হল:

সারণি

উপ-খাত অনুসারে সরকারী বরাদ্দ
(১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

উপখাত	বরাদ্দ
১। খাদ্য ও কৃষি	১৪১০
২। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ	২৭০৩
৩। পশুসম্পদ উন্নয়ন	২৪৫
৪। মৎস্য উন্নয়ন	৩৫০
৫। বন উন্নয়ন	৩৯২
৬। পল্লী উন্নয়ন	১৯৬০
মোট:	৭০৬০

উপরোক্ত বরাদ্দ ছাড়াও কৃষি, পানি সম্পদ এবং পল্লী উন্নয়ন খাতে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য প্রায় ১৫৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া যাবে, যা উপজেলা অবকাঠামো ও বিশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিকল্পনার জন্য রক্ষিত থোক বরাদ্দ থেকে আসবে। সব মিলিয়ে এই খাতের অধীনে মোট ১১,৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

দশম অধ্যায়

শিল্প ও খনিজ সম্পদ

শিল্প খাতের পর্যালোচনা

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান প্রায় ৯ শতাংশ মাত্র। তবে সূতা ও বস্ত্রের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য এবং কৃষি উৎপাদনের মুখ্য উপকরণ সার শিল্প খাত থেকে আসে। এছাড়া মোট বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৬৫ ভাগেরও বেশী এইখাতে অর্জিত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে শিল্পখাত লক্ষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই শিল্প উৎপাদনমাত্রা স্বাধীনতা পূর্বকালের পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা উত্তরকালের প্রথম কয়েক বছরে শিল্পখাতের তৎপরতা মূলতঃ মেরামত ও পুনর্বাসন কেন্দ্রিক ছিল। তবে ১৯৭৬/৭৭ অর্থ বছরের শেষাবধি উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। এরপর থেকে শিল্পায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল : আমদানীর বিকল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিখাতকে সহায়তা দান, জনসাধারণের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো এবং বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেনের ভারসাম্য সুসংহতকরণ।

২। উল্লিখিত ব্যাপক উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শিল্পখাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৮.৪ শতাংশ ধার্য করা হয় যাতে সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে এই খাতের অবদান ১৯৭৯/৮০ সালের ১,৪২২ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে ২,১২৪ কোটি টাকায় (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে) বৃদ্ধি পায়। তবে এসময়ে শিল্প খাতে প্রকৃত বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হয় ৪.৮ শতাংশ যেখানে সার্বিক জাতীয় উৎপাদনে বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৮%। সম্পদের অভাবেই প্রধানতঃ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জিত হতে পারেনি। ১৭,২০০ কোটি টাকার সংশোধিত উন্নয়ন ব্যয়ের (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে) প্রায় ১৮.৪ শতাংশ শিল্পখাতে বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে ১,৩৯০ কোটি টাকা সরকারী খাতে ও ১,৭৬৯ কোটি টাকা বেসরকারী খাতে বরাদ্দ করা হয়। উল্লিখিত বরাদ্দের তুলনায় সরকারী খাতে প্রকৃত ব্যয় হয়, চলতি মূল্যে ১,২৫৪ কোটি টাকা যা ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্য অনুযায়ী প্রায় ৯৫৫ কোটি টাকা। এতে বরাদ্দের তুলনায় এই খাতে ঘাটতি দাঁড়ায় ৩১ শতাংশ। ফলে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি হার গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। অন্যদিকে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বাজেটে চলতি মূল্যে বরাদ্দ ছিল ১,৬২৮ কোটি টাকা যা ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে আনুমানিক ১,২৪০ কোটি টাকা; অর্থাৎ, সম্পদ ঘাটতি ছাড়াও বাস্তবায়ন ঘাটতি দাঁড়ায় ২৩.০ শতাংশ। বেসরকারী খাতের বিনিয়োগেও বড় রকমের ঘাটতি দেখা দেয়। এই পরিকল্পনাকালে বেসরকারী খাতে মোট ১,১২৪ কোটি টাকা (চলতি মূল্যে) বিনিয়োগ করা হয় যা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বরাদ্দের মাত্র ৪৮.৩ শতাংশ; যদিও ১৯৮২ সালের জুন মাসে ঘোষিত নতুন শিল্প নীতিতে (এনআইপি) বেসরকারী খাতে শিল্প স্থাপনের সুযোগ প্রসারিত করা হয়। এর আংশিক কারণ হলো, ঋণ আদায়জনিত সমস্যায় পড়ে দু'টি প্রধান ঋণদানকারী সংস্থা : বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বিএসবি) ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস) তাদের ঋণদান বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। মোটা শিল্প খাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বরাদ্দের মাত্র ৫৭ শতাংশ ব্যবহার সম্ভব হয়।

সরকারী খাত

৩। সরকারী খাতের পুরো বিনিয়োগ নতুন শিল্প উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় লাগানো সম্ভব হয়নি। শিল্পখাতে মোট সরকারী বিনিয়োগের প্রায় ৫৫ শতাংশ নতুন বিনিয়োগ, ২৪.৬ শতাংশ সামঞ্জস্যবিধান, আধুনিকায়ন, পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ (বিএমআরই) খাতে বিনিয়োগ এবং অবশিষ্টাংশ উন্নয়নমূলক তৎপরতায় নিয়োজিত হয়। পূর্বে উল্লিখিত মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে আন্তঃখাত বরাদ্দ বন্টন করা হয়। মোট বিনিয়োগের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ছিল কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত শিল্পে। এর মধ্যে ৩৮.৭৫ সার শিল্পে, ৯.০২% চিনি শিল্পে, ৬.৯৪% বস্ত্র ও কাগজ শিল্পে, ৩.০৩% পাট শিল্পে এবং ১.৭৭% খাদ্য ও সমজাতীয় শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বস্ত্রশিল্প ও চিনি শিল্পের মত মৌলিক চাহিদা ভিত্তিক শিল্পে মোট শিল্প বিনিয়োগের প্রায় এক তৃতীয়াংশ নিয়োজিত হয়। জাহাজ নির্মাণ, প্রকৌশল, সিমেন্ট ও ইলেকট্রনিক্সের মত ভারী শিল্পের ভাগে পড়ে মোট বিনিয়োগের মাত্র এক দশমাংশের মত।

৪। দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারী খাতে মোট ১৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়। কিন্তু নিদারুণ সম্পদ সংকটের কারণে এবং জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্পগুলো দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সম্পদের অপেক্ষাকৃত অর্থবহ ব্যবহারের লক্ষ্যে ১১'৭২ কোটি টাকা খরচ করার পর ৪৮টি প্রকল্প বাদ দেয়া হয়। এই পরিকল্পনা মেয়াদে মোট ১,৪০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৯টি প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হয়। এর মধ্যে ৭৪৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে। জিয়া সারকারখানা প্রকল্প সম্পূর্ণ করা ছাড়াও পরিকল্পনা মেয়াদে সম্পূর্ণ অন্যান্য বড় ধরনের প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে বস্ত্র শিল্প উপখাত ও চিনি শিল্প উপখাতে যথাক্রমে ১৪ ও ৬টি প্রকল্প। এই সমাপ্ত প্রকল্পগুলো প্রায় ৮২০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদন করবে এবং এগুলোতে ২৯,৬৪১ ব্যক্তির কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৫। উল্লিখিত আলোচনায় দেখা যায়, সরকারী খাতে পূর্ব পরিকল্পনা আমলের ৪২টি প্রকল্প (১১টি কারিগরি সাহায্যভিত্তিক প্রকল্প বাদে) তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমান ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে জের হিসেবে আসা শুধু এই প্রকল্পগুলো সমাপ্ত করতে তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে প্রায় ১,৪৪৪ কোটি টাকা দরকার হবে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা প্রকল্পের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রকল্পে ব্যয় হবে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা।

বেসরকারী খাত

৬। ১৯৭৪/৭৫ সালে অনেকটা কুণ্ঠিত লঘু পদক্ষেপে অর্থনীতির বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। ১৯৭৬/৭৭ সালে এতে গতি সঞ্চারিত হয়। তবে মৌলিক নীতি পরিবর্তন আসে ১৯৮২ সালের জুন মাসে। ঐ সময় সরকার নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন (এনআইপি)। এই ঘোষণায় প্রায় সকল শিল্পখাত বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। নয়া শিল্পনীতি অনুসারে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত কিংবা জাতীয়করণকৃত বহু সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার পুঁজি প্রত্যাহার করেন কিংবা বেসরকারী খাতে ফিরিয়ে দেন। এতে বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগে একটি সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৭। ১৯৮০-৮৫ মেয়াদের শিল্প বিনিয়োগ তফসিলে (আইআইএস) বেসরকারী খাতে বড়, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ২,৬৫০ কোটি টাকা। ১৯৮২ সালের জুন মাস অবধি শিল্প বিনিয়োগ তফসিলের আওতায় মোট ৯৫৫.৮১ কোটি টাকার অনুমোদন দেয়া হয়। নয়া শিল্প নীতি (এনআইপি) ঘোষণার পর, ১৯৮২-৮৫ মেয়াদের জন্য শিল্প বিনিয়োগ তফসিল পর্যালোচনা করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে বড় ও মাঝারি শিল্পের জন্য সংশোধিত শিল্প বিনিয়োগ তফসিল (আরআইআইএস), ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ তফসিল (এসআইআইএস) এবং কুটিরশিল্প বিনিয়োগ তফসিল (সিআইআইএস)-এই ৩টি আলাদা তফসিলে বিভক্ত করা হয়। এই তফসিলগুলোর জন্য যথাক্রমে ১,৩৫১ কোটি টাকা, ৩২০ কোটি টাকা, ও ৮০ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়। ১৯৮২-৮৫ মেয়াদে এই তফসিলগুলোর আওতায় চলতি মূল্যে যথাক্রমে ১,৯০৬.৬৭ কোটি টাকা, ৩৫৩.৮৯ কোটি টাকা ও ১৯.৫৭ কোটি টাকার বিনিয়োগ অনুমোদন করা হয়। চলতি মূল্যের ভিত্তিতে ১৯৮০-৮৫ মেয়াদে, রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে (এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন) ১৯.৬১ কোটি টাকার বিনিয়োগসহ, রিপোর্টিং শিল্প ইউনিটগুলোর খাতে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৭৭ কোটি টাকা। 'নন রিপোর্টিং' শিল্প ইউনিটগুলোর, বিশেষ করে, অবাধ তালিকাভুক্ত (ফ্রি লিষ্ট) শিল্প ইউনিটগুলোর খাতে বিনিয়োগের সামঞ্জস্যবিধানের কারণে বেসরকারী খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ চলতি মূল্যে ১,১২৪ কোটি টাকায় পৌঁছবে বলে হিসেব করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পখাতে গ্রুপভিত্তিক তফসিলওয়ারী বরাদ্দ ও বিনিয়োগ অনুমোদন সারণি ১ এ দেখানো হলো।

সারণি ১

দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৬০—৬৫) মেয়াদে শিল্প গ্রুপ ভিত্তিক বরাদ্দ ও মঞ্জুরীকৃত বিনিয়োগ

(কোটি টাকায়)

শিল্প গ্রুপ	বরাদ্দ			মঞ্জুরীকৃত বিনিয়োগ		
	বড় ও মাঝারি	ক্ষুদ্র	কুটির	বড় ও মাঝারি	ক্ষুদ্র	কুটির
১। খাদ্য ও সমজাতীয় শিল্প	২৭৩.৭৬	৫৭.৭০	১৩.৭৫	৫৬৪.৫৯৫	৪৩.৯৪৪	৪.৯০৩
২। বস্ত্র শিল্প	১৪৫.০৫	৯৩.৬৬	১৭.৮১	৭৯৫.৩৯৮	১৮৩.৩৭৫	৫.৯৪২
৩। বিশেষ ধরনের পাটজাত পণ্য, পাটজাত সুতা ও কার্পেট	৮২.৬৩	১১.৯৮	৩.৫০	৫৬.৩৪৮	১.৫৩০	০.০০২
৪। বন শিল্পজাত পণ্য ও সমজাতীয় শিল্প	১১.৭০	১১.৭৬	১৪.৩৭	১৩.৮৭৮	৪.৮৪৬	৩.৯৮৮
৫। কাগজ, বোর্ড, মুদ্রণ ও প্রকাশনা	৩৬.৫৭	২৮.৪২	১.৭৫	৭২.০৩৫	৯.৫৮৮	০.১০১
৬। ট্যানারী, চামড়া ও রবারের সামগ্রি	৯৫.০৬	৩৮.৮০	৪.৩৮	৯১.৫৪৬	৯.৬২২	০.৩৪৬
৭। রসায়ন, ভেষজ ও সমজাতীয় শিল্প	৪৫৫.৫৩	৪৩.৪৭	৪.০০	২৩৬.০১১	২১.০৯৭	০.৪৩৭
৮। কাঁচ, সিরামিক ও অন্যান্য অধাতব খনিজ-সামগ্রি	১০৯.৬৬	২১.৪৪	৩.৬৯	৬৮.৫৫৯	১.৯০৪	১.৫২০
৯। প্রকৌশল শিল্প	৬৮৭.১৫	১৬১.৫৬	১৮.৭৫	৭৩৩.০৮২	৫০.৯৮৮	১.৭২৭
১০। বিবিধ শিল্প	৫৪.৫২	৩০.৯৬	১১.০৬	৩৮.৬৫৯	১৫.৩৫৭	....
১১। সেবামূলক শিল্প	৯৯.৭০	২২.৯০	....	৬৯.৯১৬	....	....
১২। জাহাজ, অভ্যন্তরীণ নৌযান ও সড়ক যান সংগ্রহ	৬৭.৬০	১৬.৮০	....	৪০.৬১৬	....	....
১৩। অন্যান্য শিল্প	২৮.৪২	৩২.৫৫	৪.৯৪	৮২.১৮০	১১.৬৩৭	০.১০২
মোট :	২১৪৭.৩৫	৫৭২.০০	১০০.০০	২৮৬২.৫৪৩	৩৫৩.৮৮৮	১৯.০৬৮

৮। ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ তফসিলের (এসআইআইএস) আওতায় উদ্যোক্তাদের কম সাড়া মেলে। কুটির শিল্প বিনিয়োগ তফসিলের (সিআইআইএস) আওতায় এই সাড়া ছিল আরও কম। অন্যদিকে, সংশোধিত শিল্প বিনিয়োগ তফসিলের ক্ষেত্রে সাড়া ছিল অনেক বেশী। অর্থাৎ এতে দেখা যায় উদ্যোক্তারা বড় ও মাঝারি আকারের শিল্পের পক্ষপাতি। এই বড় ও মাঝারি আকারের শিল্পগুলোতে মঞ্জুরীকৃত বিনিয়োগ—বিনিয়োগ তফসিলের বরাদ্দ ছাড়িয়ে গেছে সংশোধিত শিল্প বিনিয়োগ তফসিলের আওতায় ৪৫টি উপখাতে (Sub groups) উদ্যোক্তারা আগ্রহী হয়েছেন সবচেয়ে বেশী। এই সব শিল্পে উদ্যোক্তাগণ অতিরিক্ত ভীড় করেছেন এবং বিনিয়োগ অনুমোদনের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এই শিল্পগুলোর মধ্যে বস্ত্র শিল্প, জুতা, রি-রোলিং, বাস ও ট্রাকের বডি নির্মাণ, তৈরী ধাতব সামগ্রি, প্রকৌশলীয় সামগ্রি, প্লাষ্টিক সামগ্রি, রং ও বার্ণিশ, সুগন্ধী ও প্রসাধনী, ভোজ্য ও অভোজ্য তেল, সিগারেট, মাছ ধরা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের ব্যাপারে সাড়া ছিল সর্বাধিক।

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য :

৯। কয়েকটি নির্বাচিত প্রধান শিল্পপণ্য খাতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য সারণি ৩ এ নিম্নে দেয়া হলো :

সারণি ৩

নির্বাচিত পণ্যসমূহের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য

শিল্প পণ্যসমূহ	১৯৭৯/৮০ সালে প্রকৃত উৎপাদন	১৯৮৪/৮৫ সালে উৎপাদন		১৯৭৯/৮০ সালের তুলনায় বৃদ্ধি (শতাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা থেকে ঘাটতি (শতাংশ)
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত		
১	২	৩	৪	৫	৬
১। পাট শিল্পজাত পণ্য (হাজার টন)	৫২৫.০	৬৫০.০	৫৬১.০	৬.৯	১৩.৭
২। তুলাজাত সুতা (মিলিয়ন কেজি)	৪৩.২	৮৩.২	৫৯.৪	৩৭.৪	২৮.৭
৩। কলে তৈরী কাপড় (মিলিয়ন মিটার)	৮৫.৯	১৩৮.২	৮৬.৯	১.২	৩৭.১
৪। সার ('000' টন)	৪৪২.০	১০৩৭.০	৮০৬.০	৮২.৪	২২.৩
৫। ইস্পাত পিণ্ড ('000 টন)	১১৩.০	২২৫.০	১০১.০	(—)২৪.১	৫৫.১
৬। সিমেন্ট ('000' টন)	৩৪৩.০	৪৫০.০	২৪০.০	(—)৩০.০	৪৬.৭
৭। কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট ('000' টন)	৭১.৯	৯৩.০	৯০.০	২৫.২	৩.২
৮। চিনি ('000' টন)	৯৩.২	২০০.২	৮৮.০	(—)৫.৬	৫৬.০

এটা লক্ষণীয় যে, টেক্সটাইল, কাগজ ও নিউজপ্রিণ্ট এবং সার শিল্প খাতে উৎপাদন ১৯৭৯/৮০ সালের স্থিতাবস্থা উৎপাদনের ভিত্তিতে পরিকল্পিত বর্দ্ধিত উৎপাদনের চাইতে কম হয়েছে। ইস্পাত, সিমেণ্ট ও চিনি উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে কমে গেছে। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সকল সামগ্রি খাতে উৎপাদন যথেষ্ট কম হয়েছে। দেশে ও বিদেশে উভয় ক্ষেত্রে বাজার সংকোচনই এর প্রধান কারণ। ১৯৮২ সাল থেকে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ক্রমাগত মন্দার কারণে দেশের বাইরের বাজারে প্রতিকূল অবস্থা দেখা দেয়। দেশে বিনিয়োগ মন্থর হয়ে পড়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও শ্লথ হয়ে পড়ে। ১৯৮২/৮৩ সালে কঠোর অর্থনৈতিক রদবদলমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ঘন ঘন ফসলহানির কারণে পল্লীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের আয় হ্রাস পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ বাজারে সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। এই সংগে আমদানি উদার করার ফলে দেশে উৎপাদিত পণ্য আমদানিকৃত পণ্যের সংগে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠে। বিদ্যুৎ সংকট, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা ও বৈদেশিক মুদ্রার অভাব এবং বৈদেশিক মুদ্রামানের এরূপ অবমূল্যায়ন বৈশিষ্ট্যগত সমস্যাগুলোর কারণে দেশজ সামগ্রির উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়, অথচ পণ্যের চাহিদা যায় কমে। এর ফলে বিপুল নিষ্ক্রিয় ক্ষমতা, উচ্চ উৎপাদন ব্যয়, নিম্ন লিকুইডিটি এবং নিম্নমানের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার এক দুষ্ট আবর্তের সৃষ্টি হয়।

১০। শিল্পখাতের অবদান ১৯৭৯/৮০ সালের ১,৪২২ কোটি টাকার স্থলে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১,৭৯৩ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। ফলে পরিকল্পনাকালে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৪.৮% যা আগের ৫ বছরে ছিল ৭.৫%। উল্লেখ্য যে, ১৯৮২/৮৩ সালে শিল্প খাতে সর্বাপেক্ষা নিম্ন প্রবৃদ্ধি হার, মাত্র ০.৩ শতাংশ অর্জিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা চালুর পর থেকে দেশের অর্থনীতিতে সম্পদের যে প্রচণ্ড সংকট চলছিল তার প্রেক্ষিতে অর্থনীতিতে মুদ্রা মূল্য বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহ কমানোর লক্ষ্যে কঠোর ব্যয় সংকোচনমূলক সামঞ্জস্যবিধায়ক ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই নিম্নাভিমুখী সামঞ্জস্যবিধায়ক ব্যবস্থাদি এতই তীব্র ও কঠোর ছিল যে, ১৯৮১/৮২ সালের খরাজনিত ফসলহানি তথা কৃষি খাতে সংকট কাটিয়ে উঠা সত্ত্বেও ঐ ব্যবস্থাদির প্রভাব কাটেনি। ইস্পাত ও সিমেণ্ট শিল্পে বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়ায় নির্মাণকার্য ব্যাহত হয়। এখানে আরও উল্লেখ করা দরকার যে, কতক ক্ষেত্রে (যেমন পাট ও চিনি শিল্পে) প্রধানতঃ ফসলহানির কারণে শিল্প উৎপাদন কমে যায়।

শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি ব্যাহতকারক সমস্যাবলী

১১। **বড় ও মাঝারি শিল্প ঃ** বিশ্ববাণিজ্যে চরম মন্দা ও পাট ফসলের উৎপাদনে অনিশ্চয়তা ক্রমাগতভাবে এই শিল্পের প্রাণশক্তি ক্ষয় করে চলেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রকৃত আয় হ্রাসের দরুণ অভ্যন্তরীণ বাজার সংকোচন ও সংকোচিত বাজারের একাংশ অদৃশ্য ও দৃশ্যমান আমদানির কাছে হাতছাড়া হওয়া এসব মিলে বস্ত্র শিল্পে প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে। বিনিয়োগ মন্থর হওয়ার কারণে সিমেণ্ট ও ইস্পাত সামগ্রির বাজারজাতকরণের ব্যবস্থায় তীব্র সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রকৌশল শিল্পগুলোও আমদানি পণ্যের প্রতিযোগিতার মুখে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কঠিন সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া, দেশের শিল্পগুলো পরিচালনাগত সমস্যার বহুমুখীতায় জর্জরিত। এই সমস্যাগুলোর সংগে জড়িত যে বিষয়গুলো শিল্পখাতের বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করছে তার উপর নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোতে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যাতে সেগুলোর ব্যাপারে তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া যায় ঃ

(১) **বৈদেশিক সহায়তা/মঞ্জুরী/ঋণ/পণ্য বিনিময় চুক্তি ইত্যাদির আওতায় আমদানী ঃ** সেক্টর কর্পোরেশন বা সংস্থাগুলোর সংগ্রহ তৎপরতা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক আমদানি নীতি ও দুই আমদানি মৌসুম ঃ জুলাই—ডিসেম্বর ও জানুয়ারী—জুন মেয়াদের সংগে সম্পর্কিত। এই সময়েই আমদানি খাতে প্রকৃত বরাদ্দগুলো মঞ্জুর করা হয়। সেক্টর কর্পোরেশনগুলো সুবিবেচনক দর পাওয়ার জন্য সব

সমস্ত নগদ বৈদেশিক মুদ্রার যতোটা সম্ভব সরবরাহ সংগ্রহ করতে চাইলেও বহিঃসম্পদের অধিকাংশই পাওয়া যায় মঞ্জুরী, সহায়তা, ঋণ ও পণ্য বিনিময়ের আকারে। অর্থ যোগানোর এইসব ব্যবস্থার আওতায় ক্রেতাপক্ষ প্রতিযোগিতামূলক ও সবচেয়ে সস্তা উৎস থেকে পণ্য কিনতে পারেন না বরং তাকে বিশেষ কোন একটি বা কয়েকটি বাজার থেকে কিনতে হয়। বন্ধনমুক্ত ঋণের আওতায় এ ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনতা পাওয়া যায় তবে তাকেও কেনাকাটার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বলা যায় না। আর বার্টার পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার আওতায় সরবরাহ সংগ্রহ বা আমদানি আরও বেশী অসুবিধেজনক। দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থার আওতায় পণ্য রপ্তানির বদলে পণ্য আমদানি হয় বলে, এতে প্রতিযোগিতামূলক দর পাওয়ার সুবিধে যেমন পাওয়া যায় না তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দর কমানোর ও সময়মত সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য সরবরাহকারী দেশকে রাজি করানোর কোন ব্যবস্থা নেই। এ কারণে প্রতি বছরই সরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ পরিমাণ অলাভজনক ক্রয় করতে বাধ্য হয়। সম্পূর্ণ প্রস্তুত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও এসব পণ্যের বাজারজাতকরণের উপর এ ধরনের ক্রয়ের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে।

সরবরাহ সংগ্রহ কার্যক্রমকে অর্থবার্ষিক সম্পদ বরাদ্দের সংগে সম্পর্কিত রাখতেই হয় বলে কর্পো-রেশনগুলো সময়মত সুবিধেজনক বাজার থেকে সস্তায় কেনার সুযোগ পায় না। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দর পত্রের অধীনে ক্রয় করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং তা সকল সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট পণ্যের জরুরীভিত্তিক চাহিদার সংগে সংগতিপূর্ণ নয়। যেহেতু নগদ সম্পদ সীমিত আর সে কারণে পণ্য সহায়তা চুক্তির আওতায় সরবরাহ সংগ্রহ করতে হয়, সেহেতু ক্রেতা নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে সব সময়ই ঋণ গ্রহণকারীর অর্থ ও ব্যাংক সুদের অংশে যতোটা বেশী সম্ভব অতিরিক্ত পণ্য কেনার চুক্তি করে রাখতে চান। কর্পোরেশনগুলো সরেজমিনে তাৎক্ষণিকভাবে ক্রয় করতে পারে না বলে মূল্যবান ধাতব পদার্থ, খণিজ, রসায়নিক পদার্থ ও ব্যবহার্য পণ্য সংগ্রহের বেলায় আন্তর্জাতিক বাজারের সুযোগ সুবিধে পুরোপুরি নিতে পারে না।

দরপত্রের নানা ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ও সাহায্য-সহায়তাদানকারী বিভিন্ন দেশ কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলীর জন্য সরকারী খাতে সংগ্রহ পদ্ধতি জটিল। এছাড়া, আমদানীর ক্ষেত্রে সরকারী সংস্থাগুলোর আর্থিক ক্ষমতাও সীমিত (৫ কোটি টাকা মাত্র)।

(২) **সংকোচনশীল বাজার :** বিশ্ববাণিজ্যে মন্দা ও শিল্পোন্নত দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান সংরক্ষণ-বাদের প্রেক্ষিতে আমাদের শিল্প পণ্যগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক বাজার কেবল উত্তরোত্তর দুর্ভেদ্যই হয়ে উঠছে না এবং সে কারণে রপ্তানি মূল্যই কমছে না, বরং দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে আমদানি পণ্যের বিরুদ্ধে স্বদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতাও কঠিন হয়ে উঠছে। আমদানি খাতে ক্রমবর্ধমান উদার ব্যবস্থা আর সেই সংগে গোটা আমদানি পরিসরে বিদেশী সহায়তামূলক অর্থযোগানের সিংহভাগ পরিস্থিতি গুরুতর করে তুলেছে। বিদেশী সহায়তার অর্থে ক্রয়ের ক্ষেত্রে দাতাদেশগুলোর পূর্বনির্ধারিত কতকগুলো পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। এ ধরনের বিদেশী সহায়তার সংগ্রহযোগ্য পণ্যের মান কখনও কখনও অযথা কঠোর ভাবে নির্ধারণ করা হয় যার ফলে শুধু ঐ পণ্যের স্থানীয় উৎপাদক বেকায়দায় পড়েন। কোন কোন সময় কয়েকটি পণ্য মিলিয়ে সরবরাহ প্যাকেজগুলো দাতাদেশের পক্ষ থেকে এভাবে স্থির করা হয় যার সঙ্গে একাধিক সরবরাহকারী ও উৎস সংশ্লিষ্ট থাকে। এসবের দরুন বিদেশী সরবরাহকারীদের সুবিধে হয়, অন্যদিকে, স্থানীয় সরবরাহকারীরা কখনও কখনও প্রতিযোগিতার যোগ্যতা হারান। এরকম দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে, একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান কোন পণ্যের কাঁচামালের জন্য যে দর সংগ্রহ করেছেন তা তৈরী ঐ পণ্যের আমদানীর জন্য একটি বিদেশী সরবরাহকারী কর্তৃক উদ্ধৃত দামকেও ছাড়িয়ে গেছে। আবার বিদেশী পণ্যের ব্যাপারে ক্রেতার মোহও সমস্যা বাড়ায়। স্থানীয় উৎপাদকদের দরের ক্ষেত্রে যে অগ্রাধিকার দেয়া হয় তা বিদেশী সরবরাহকারকের দরের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে খুবই অপর্যাপ্ত। এছাড়া, কতকগুলো সাহায্যদাতা প্রতিষ্ঠান আবার দরের ব্যাপারে আদৌ কোন সুবিধে দেয় না। এই সংগে শুল্ক প্রত্যর্পনের পদ্ধতিতে ফেরৎযোগ্য শুল্কের

পরিমাণ নিরূপণেও সমস্যা রয়েছে। এ সকল কারণে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত শিল্পপণ্যগুলোর বাজার সংকুচিত হয় ও ফলে সরকারী শিল্প খাতে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি ও ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সামর্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

(৩) **জোরদার বিপনন তৎপরতার অভাব ঃ** বাজার সংকোচনশীল হওয়া সত্ত্বেও সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর আওতাধীন প্রায় সব শিল্প প্রতিষ্ঠানেই উপযুক্ত পাল্টা পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা কার্যতঃ অনুপস্থিত। অন্যদিকে দেখা যায়, মূল্য বৃদ্ধির, বিশেষ করে যেসব সামগ্রির সংরক্ষিত বাজার রয়েছে সেসব পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির, একটা সাধারণ প্রবণতা রয়েছে। আর যেসব সামগ্রির তেমন সংরক্ষিত বাজার নেই সেগুলোর বাজার সংরক্ষণের জন্য দাবী জানানো হচ্ছে। সাধারণভাবে বিপনন বা বাজারজাতকরণ তৎপরতা বিকাশ লাভ করেনি। রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কর্পোরেশন ও কর্পোরেশনের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিপনন গবেষণা প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। এতে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি ও বিকাশ কিংবা পরিবর্তনশীল চাহিদার সংগে পণ্যের অভিযোজনও গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের মধ্যে বিরাজিত সম্পর্ক একদিকে যেমন সুস্থ বিপনন কৌশলের বিকাশ ব্যাহত করেছে তেমনি এই সম্পর্ক বিপনন নীতিমালা গ্রহণে কর্পোরেশন-এর স্বাধীনতাও সীমিত করেছে।

(৪) **শুল্ক ক্ষেত্রে অনিয়ম ঃ** আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কাঁচামাল ও তা থেকে প্রস্তুত পণ্য সংগ্রহ সরকারের শুল্কনীতির কারণে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে থাকে। সরকারের শুল্কনীতি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কেবল রাজস্ব সংগ্রহের কথা বিবেচনায় রেখেই নির্ধারণ করা হয়। আমদানিকৃত পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী পণ্যের উপর শূন্য থেকে ৩০০ শতাংশ পর্যন্ত কর ধার্য করা হয়। কয়েকটি প্রধান পণ্যের বেলায় কর আরোপের ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি বিরাজমান তা অনেকখানি অবিন্যস্ত। আভ্যন্তরীণ বা বিদেশের বাজারে বিক্রি করা যাবে এমন স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কিছু শিল্প পণ্যের জন্য কাঁচামাল আমদানির উপর যে কর ধার্য রয়েছে তা সম্পূর্ণ তৈরী আমদানিকৃত একই পণ্যের উপর আরোপিত শুল্কের তুলনায় অনেক বেশী। এর ফলে, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যগুলো দামের দিক থেকে আমদানিকৃত অনুরূপ পণ্যগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়ে। এমনকি, প্রতিযোগিতামূলক বিডিং ও রপ্তানির জন্য শুল্ক প্রত্যার্পণের যে অনুমোদিত ব্যবস্থা রয়েছে সেক্ষেত্রেও পদ্ধতিগত দীর্ঘসূত্রিতার মত সমস্যা রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রবর্তিত অনুমানভিত্তিক শুল্ক প্রত্যার্পণের ব্যবস্থা উল্লিখিত পদ্ধতিকে কিছুটা সহজ করেছে।

(৫) **অতি মূলধনীকরণের ফলে মূলধন চার্জ চড়া হয়েছে ঃ** সেক্টর কর্পোরেশন বা সংস্থাগুলোতে সকল বড় রকমের প্রকল্প ব্যয় পরিকল্পিত ব্যয় থেকে অনেক বেশী হওয়াটা কার্যতঃ প্রায় সার্বজনীন, গতানুগতিক ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। ষাটের দশকে পরিকল্পিত এবং ৭০-এর দশকের শেষে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে মূল প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকালের প্রকৃত ব্যয় একান্তই সম্পর্কবিহীন। প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে বিলম্ব ঐগুলোর অতি মূলধনীকরণের জন্য দায়ী। বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মুদ্রা বিনিময় হারের তারতম্যের দরুণ এ ধরনের অতি মূলধনীকরণ ঘটেছে। শর্তসাপেক্ষ তহবিলের আওতায় সরবরাহ সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সূত্র থেকে সেগুলো কেনার ব্যাপারে প্রবল অগ্রাধিকার আরোপের ফলে মূলধন যন্ত্রপাতির দাম অতিমাত্রায় বেশী পড়ে যায়। একজন্য বিশ্বব্যাংক দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়ার উপর অভিমত দিতে গিয়ে বলেছে যে, "দানের ঘোড়ারা অদ্যাবধি তাদের দানাপানি অর্জন করতে পারেনি"।

(৬) **উৎপাদন ক্ষমতার নিম্নমাত্রায় ব্যবহার ঃ** জাতীয়করণকৃত শিল্পগুলোর কৃতিত্বে সবচেয়ে বড় কষ্টারায়গুলোকে এক কথায় বলতে হলে বলা যায় যে, সেগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার হয় না। বড় বড় প্রায় সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে সেগুলোর স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে অনেক কম পণ্য

উৎপাদিত হয়ে থাকে। স্বল্প চাহিদা, কাঁচামাল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যা এবং চড়া উৎপাদন ব্যয় অনিবার্যভাবেই উৎপাদন ব্যাহত করে। সেই সংগে পরিচালনার সমস্যা গুলোও এই সংকট আরও ঘোরতর করে তোলে। সংস্থাত ভিত্তিহীন সমস্যাজনিত প্রকৌশলী ত্রুটি, অপর্যাপ্ত নিশ্চয়তাবিধায়ক যাচাই পরীক্ষা এবং কখনও কখনও বিদেশ থেকে আনা জটিল প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়ার প্রয়োগ অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা সামর্থ্যের কারণেও পুরো উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার হয় না। বিদ্যুৎ সরবরাহ ঘন ঘন ব্যর্থতার কারণে উৎপাদনে প্রচুর ক্ষতি হয়, কারখানার যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থিতিশীল ও অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে অনেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত ব্যয়ে বিকল্প শক্তি ধারণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদক ইউনিট বসাতে হয়। পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে নিম্নমাত্রার উৎপাদন অর্থনৈতিক দিক থেকে অলাভজনক। এই নিম্নমাত্রার উৎপাদনই সরকারী খাতের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অসন্তোষজনক কর্মতৎপরতার মূল কারণ।

(৭) **মূলধন সম্পদের (যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি) একান্ত অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ :** সরকারী খাতের বলতে গেলে প্রায় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানেই যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত অপর্যাপ্ত ও আদৌ মানসংগত নয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম অত্যন্ত আধুনিক ও খুবই মূল্যবান। কিন্তু উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলো থেকে সন্তোষজনক উৎপাদন পাওয়া যায় না। ফলে, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের সচল আয়ু কমে যায়। জাতীয়করণকৃত শিল্পগুলোর জন্য এ এক প্রধান সমস্যা। রক্ষণাবেক্ষণ খাতে তহবিল ও প্রশিক্ষণের অভাব এ দুটি বিষয়ই এর কারণ।

(৮) **অচল প্রযুক্তির ব্যবহার :** এটা সর্বজনবিদিত যে, সাধারণভাবে বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বিশেষ করে এদেশে সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর আওতাধীন প্রায় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরনো ও মান্ধাতার আমলের প্রযুক্তি প্রয়োগে কাজ চলছে। এতে নিম্নমাত্রার উৎপাদন হচ্ছে, উৎপাদিত সামগ্রির মান হচ্ছে নীচু, অথচ ব্যয় হচ্ছে প্রচুর কাঁচামাল যার ফলে উৎপাদন ব্যয় যাচ্ছে বেড়ে। ক্রেতা সম্প্রদায়ও এই পণ্য কিনে সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। আসলে দেশে এক ধরনের দ্বৈত প্রযুক্তির রাজত্ব চলছে। কারণ দেখা যাচ্ছে কোন কোন শিল্পখাতের ক্রেতারা জটিল ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করছেন ও উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করছেন। আসলে বাংলাদেশের যথাযথ প্রয়োগ কৌশল তথা যথার্থ প্রযুক্তি অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানোর সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে একটি সমন্বিত প্রযুক্তিগত কাঠামো বিন্যাস যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৯) **নিম্ন শ্রম উৎপাদনশীলতা :** নিম্ন শ্রম উৎপাদনশীলতা একটি প্রতিষ্ঠানের ঈপ্সিত লক্ষ্য/উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতারই পরিচায়ক। জটিল বেশ কতকগুলো কারণে বিশেষতঃ এই ব্যর্থতা দেখা দেয়। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে শিল্পখাতের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিবেশগত কারণে এই ব্যর্থতার উদ্ভব ঘটে। চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক পুরস্কার ও শাস্তিভিত্তিক নয়, কেন না ব্যর্থতার জন্য কোন একটা একক সুনির্দিষ্ট কারণকে চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন কারখানায় কাজের পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদী কাজের উপযুক্ত নয় যার ফলে শ্রমিকরা ঐ পরিবেশে প্রতিশ্রুত মেয়াদে কাজ করতে পারে না। মেশিন বা যন্ত্র চালানোর কাজটি একঘেয়ে। কাজের বিন্যাসও শ্রমিককে অবসন্ন, ক্লান্ত করে তোলে। বস্তুতঃ যন্ত্র-মানুষ সম্পর্ক তথা কর্ম-পরিবেশে শ্রমিকের যোগ্যতা বাস্তবতাত্ত্বিক বিষয়টি নেতিবাচক মূল্যসম্পন্ন। সেক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটছে। যান্ত্রিক গোলযোগ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের ঘাটতিজনিত কারণে যন্ত্র অচল হয়ে থাকে আর তাতে শ্রম ঘণ্টা ও উৎপাদনের ক্ষতি হয়। সর্বোপরি, বাজারের নানা প্রতিকূলতা ও সেই সংগে অস্থিতিস্থাপক কর্মসংস্থানের কারণে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতাও যাচ্ছে কমে।

(১০) **শ্রমিক, তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপনা কর্মীদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ :** যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ ও সুপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী বাহিনী, তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপনা কর্মচারীদের উপরেই প্রধানতঃ একটি সংগঠনের দক্ষতা নির্ভর করে। স্বাধীনতার পর সৃষ্ট শূন্যতার কারণে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সার্বিক অবক্ষয় দেখা দেয়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তীব্রতম সংকট পরিলক্ষিত হয় মাধ্যমিক ব্যবস্থাপনা ও দক্ষকর্মী স্তরে। কর্মচারীবিন্যাস সংক্রান্ত নীতি পেশাদারী উৎকর্ষ বিধানে সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হয়। বর্তমানে সকল পর্যায়ের কর্মী ও কর্মচারীদের জন্য চাকুরীকালে যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা ক্রম পরিবর্তনশীল পরিবেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একান্ত অপর্যাপ্ত। প্রতিষ্ঠানগুলো বছরের পর বছর অস্থায়ীভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মীরা কাজ করছেন একটা নিরাপত্তাহীন পরিবেশে এবং দীর্ঘমেয়াদী দায়িত্বসূত্রেও তারা আবদ্ধ নন।

১২। **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প :** এই দুটি শিল্পখাত উৎপাদনে যোজিত মূল্যের প্রায় ৫০ শতাংশের যোগান দিলেও সাধারণতঃ অবহেলিত থাকে। সংখ্যাধিক্য ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরবচ্ছিন্ন মনিটরিং (পর্যবেক্ষণ) শক্ত ও ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলোর চাহিদাও সুনির্দিষ্ট নয়। কোন প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনও এজন্য নেই। উৎপাদন-শিল্প-জরীপের (সি এম আই) আওতায় সামান্য কিছু ক্ষুদ্র শিল্প পড়লেও এ জরীপও দৃশ্যতঃ মেয়াদী লাল ফিতের বাঁধা। উৎপাদন শিল্পের সর্বশেষ যে বার্ষিক জরিপ হাতে পাওয়া যায় সেটি ১৯৮০/৮১ মেয়াদের। বড় শিল্পগুলোর বেশীর ভাগ শহর এলাকায় অবস্থিত। এগুলো সংখ্যায় কম বলে সুসংগঠিতও বটে। অথচ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলোর এমন সুবিধে নেই। আর এ কারণেই এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কোন সরাসরি সুযোগ নেই। তাই এগুলোর ব্যাপারে তথ্য যোগাড়ের জন্য মেয়াদান্তিক জরিপ চালানোই বর্তমান রীতি। ১৯৭৮ সালে ক্ষুদ্র শিল্প ও ১৯৮০ সালে কুটির শিল্পের ওপর সর্বশেষ জরিপ হয়েছে। দুটি জরিপই পরিচালনা করেছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা। এ দুই জরিপে অবশ্য কুটির শিল্পের প্রধান অংগ তাঁত শিল্প বাদ পড়েছে। তাঁত শিল্প বোর্ড ১৯৭৮ সালে তাঁত শিল্প জরিপ পরিচালনা করে।

১৩। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবস্থা সম্পর্কিত উপাত্ত না পাওয়ার কারণে বহিঃপ্রক্ষেপ ভিত্তিতে ১৯৮৪/৮৫ সালে এই দুই শিল্পের অবস্থা নিরূপণ করা হয়। ১৯৬২ সালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ছিল ১৬,৩৩১। ১৯৭৮ সালে তা বৃদ্ধি পায় ২৪,০০৫টিতে। এই দুই শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা ১,৪৪,৬৯৫ থেকে বেড়ে ৩,২২,১২৬-এ উন্নীত হয়। বার্ষিক কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪'৮২ শতাংশ। তবে যোজিত মূল্য বৃদ্ধির হার ছিল কম। কারণ আলোচ্য সময়ে কাঁচামাল ও খুচরো যন্ত্রাংশে মূল্য দ্রুততর হারে বেড়ে যায়। ১৯৬২ সালে কাঁচামাল ও খুচরো যন্ত্রাংশের দাম দাঁড়ায় উৎপাদিত পণ্যের গড় মূল্যের ৫০ শতাংশ। কিন্তু ১৯৭৮ সালে এসে ঐ দাম পণ্যের গড় দামের ৭০ শতাংশে উন্নীত হয়। অর্থাৎ প্রতি ইউনিট উৎপাদনে যোজিত মূল্যের পরিমাণ অনেকখানি কমে যায়। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২৪,২১৭টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইউনিটের ৪ লক্ষ কর্মচারী গড়ে ৮,০১৩ টাকা করে যোজিত মূল্যের অবদান যুগিয়েছেন। যদি ধরে নেয়া যায়, ক্ষুদ্র শিল্পে ১৯৭৮ থেকে, ৮৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কর্মসংস্থান হয়েছে ১৯৬২ ও ১৯৭৮-এর মধ্যবর্তী সময়ের একই হারে তাহলে সেই ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালে এ দুই শিল্পে কর্মসংস্থানের আকার দাঁড়াবে ৪'২৮ লাখ আর যোজিত মূল্য হবে ৩৪৩ কোটি টাকা যা উৎপাদন শিল্পখাতের মোট যোজিত মূল্যের প্রায় ১৯'৫ শতাংশ অথবা সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১'৭ শতাংশ।

১৪। অবশ্য শুধুমাত্র যোজিত মূল্যের নিরীখেই ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর মূল্যায়ন করলে চলবে না। এই শিল্পগুলো প্রচুর কর্মসংস্থান করতে পারে যা উঁচু বেকারত্ব হার সম্বলিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭৮ সালের একটি ক্ষুদ্র পর্যায়ের শিল্পে গড়ে ১১,৮৮৪ টাকা স্থায়ী বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হতো। এর বিপরীতে জাতীয় গড় প্রবৃদ্ধিমূলক পুঁজি-শ্রম অনুপাত ছিল ৩২,০০০ টাকা (১,৪০০ মার্কিন ডলার)। কুটির শিল্পে অনেক কম ব্যয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব। এক্ষেত্রে

গড়ে মাত্র ২,০০০ টাকা বিনিয়োগে একটি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়। তবে কর্মী প্রতি যোজিত মূল্যও হয় কম। কোন কোন কর্তৃপক্ষের হিসেবে ক্ষুদ্র শিল্প শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ২৫ টাকা মাত্র (১৯৭৮—৮০)। পক্ষান্তরে কুটির শিল্পে তা দৈনিক ৮ টাকা এবং অদক্ষ কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরী ১২ টাকা। বড় আকারের শিল্পগুলোর কর্মসংস্থান প্রতি যোজিত মূল্যের (২৬,৮২০ টাকা) অবদান বেশী। তবে এই ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে আনুপাতিকভাবে বেশী পুঁজিবিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। ফলে দেখা যায় উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের মধ্যে যোগবিয়োগের একটি সামঞ্জস্যবিধায়ক সম্পর্ক বহাল রয়েছে। আয় ও কর্মসংস্থান উভয় দৃষ্টি কোণ থেকে সম্পদের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র শিল্পই যুক্তির ভিত্তিতে সমর্থনযোগ্য। তাছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র শিল্পগুলো সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের বিকাশে সহায়তা করতে সক্ষম হয়।

১৫। ১৯৮০ সালের কুটির শিল্প (তাঁত শিল্প ছাড়া) জরিপে ৩'২২ লাখ ক্ষুদ্র ইউনিটের অস্তিত্ব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৬২ সাল থেকে এই খাতে কর্মসংস্থান বার্ষিক ২'২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮০ সালে একই খাতে কর্মসংস্থানের চূড়ান্ত সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯'১৬ লাখে। ১৯৮৪ সাল অবধি এই প্রবৃদ্ধি হারকে অভিক্ষিপ্ত করলে কর্মসংস্থানের সংখ্যা প্রায় ১০ লাখে দাঁড়াবে। এছাড়া, কর্মসংস্থান পিছু যোজিত মূল্য ৩,৭৫১ টাকা ধরা হলে মোট যোজিত মূল্য হবে ৩৭৫ কোটি টাকা। কুটির শিল্পে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কম, মজুরীর হারও কম। একথা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদেও আলোচিত হয়েছে। তবু একথাও সত্যি যে কুটির শিল্প গ্রামীণ পরিবারগুলোর আয় বাড়াতে সাহায্য করে। তাঁত শিল্পে টি আই পি সমীক্ষা অনুযায়ী যোজিত মূল্য ১৯৪ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত করে হিসেব করলে কুটির ও তাঁত শিল্পের মোট অবদান দাঁড়ায় ৫৭০ কোটি টাকা বা সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২'৭ শতাংশ বা শিল্পখাতে মোট যোজিত মূল্যের এক তৃতীয়াংশ। ক্ষুদ্র শিল্পের সংগে সমন্বিত করে হিসেব করলে দেখা যাবে, কুটির শিল্প সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শিল্পখাতের মোট অবদানের অর্দ্ধেকের বেশী যোগান দিচ্ছে।

১৬। কর্মসংস্থান ও সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কুটির শিল্পের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও একথা ভুললে চলবে না যে, কর্মসংস্থানের প্রভাব ব্যাপক হলেও, কুটির শিল্পের আয় সংস্থান ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। কুটির শিল্পে শ্রমের মজুরীর স্তর সাধারণতঃ জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় স্তরের নীচে এমনকি, কোন কোন ক্ষেত্রে এই মজুরী একজন অদক্ষ কৃষি শ্রমিকের মজুরীর এক পঞ্চমাংশ। এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে নারকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি বা কাছি তৈরী শিল্পের মজুরীর কথা উল্লেখ করা যায়। কুটির শিল্পে প্রধানতঃ দুই ধারার মজুরী হার লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ মাথাপিছু প্রতি হাজার টাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করলে ৩ টাকা হারে মজুরী বৃদ্ধি পায়। পুঁজি বিনিয়োগেরভিত্তিতে মজুরীর তারতম্য ঘটে অর্থাৎ পুঁজিও মজুরী সরাসরি সম্পর্কিত। দ্বিতীয়তঃ মহিলা শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য থাকলে মজুরী অনিশ্চিতভাবে কম হয়ে থাকে। এভাবে কিছু কুটির শিল্প এমনকি, কৃষিকাজের জন্য চলতি মজুরী হারের চেয়েও কম মজুরীতে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে পারিবারিক আয় বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া আরও কিছু শিল্প (যেমন, ধান ছাঁটাই, কাছি-দড়ি তৈরী, ঘানিতে তেল ভাংগানো, মাদুর তৈরী ইত্যাদি) আছে যেগুলো আধুনিক শিল্পের (যেমন চাল কল, তেল মিল) সংগে প্রতিযোগিতায় প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। এর কারণ সেগুলোতে শ্রমের উৎপাদনশীলতার হার অত্যন্ত নিম্ন। তাই কুটির শিল্পজাত পণ্যের মানগত উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত বিকাশের উপরই এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। ইদানিং সৌখিন সামগ্রী ও শিল্পমণ্ডিত পণ্যের মানগত ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে কিন্তু সেই সংগে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকটি যথার্থ গুরুত্ব লাভ করেনি। দৃষ্টান্ত হিসেবে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের কথা বলা যায়। তাঁতগুলোর ধরতে গেলে প্রায় অধিকাংশই টানা তাঁত। দেশের মোট ৪'৩১ লাখ তাঁতের মধ্যে ২'৯৮ লাখ তাঁত হচ্ছে টানা তাঁত, ১'০২ লাখ আধা স্বয়ংক্রিয় এবং মাত্র ৫ শত স্বয়ংক্রিয় তাঁত। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বা উন্নততর প্রয়োগ ছাড়া কুটির শিল্প বড় জোর হয় মহিলাদের কর্মসংস্থানের (যাদের কৃষি কাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত) প্রান্তিক সুযোগ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে। যদিও মেয়েদের মজুরীর

হার কম ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম বা পেশা হিসেবে কোন মতে টিকে থাকবে, যার অর্থ হবে একদিকে আরো নিম্ন মজুরীর হারে এই শিল্পে মহিলাদের প্রান্তিক কর্মবিনিয়োগ, অন্যদিকে উন্নয়ন তথা আধুনিকায়নের বিরুদ্ধে দেশের লোকজ ঐতিহ্য-নির্ভর অর্থনীতির প্রসার।

১৭। **হস্তচালিত তাঁত ঃ** তাঁত শিল্প বোর্ডের তথ্যানুযায়ী ১৯৭৮/৭৯ সালে দেশে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ছিল ১,৯৭,২৮০ (২৭৭টি বিদ্যুৎ চালিত তাঁতসহ)। এই তাঁতগুলোতে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ছিল ৪.৯১ লাখ পারিবারিক কর্মীসহ মোট ৮.৪৭ লাখ। টি, আই, পি'র ১৯৮১/৮২ সালে পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, তাঁতের সংখ্যা ১ লাখ ৫০ হাজার ইউনিট। আর সেগুলোতে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা ৭.০০ লাখ। হস্তচালিত তাঁতগুলোর প্রধান সমস্যা হচ্ছে এগুলোর অধিকাংশই শ্রমব্যয়সাধ্য টানা তাঁত আর এগুলোতে উৎপাদনের হারও খুব কম। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বি আই ডি এস) পরিচালিত গ্রামীণ শিল্প জরিপে (১৯৭৯) দেখা যায়, এই শিল্পে প্রতি শ্রম দিনে যোজিত মূল্য হয়েছে মাত্র ১৫.০৭ টাকা আর এই শিল্পের একজন শ্রমিক একজন অদক্ষ কৃষি কর্মীর ১২.৪৬ টাকা দৈনিক মজুরীর তুলনায় পেয়েছেন ১১.৩৩ টাকা। আর সাম্প্রতিককালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, এই শিল্প থেকে একটি পরিবারের নীট আয় হয়েছে বার্ষিক ৭,৮১৩ টাকা আর একজন শ্রমিকের আয় হয়েছে ঘণ্টায় ১.৬০ টাকা মাত্র। এমনকি, একজন অদক্ষ কৃষি শ্রমিকের মজুরীর তুলনায়ও শ্রমের এই নিম্নমাত্রার আয় তাঁত শিল্পের অস্তিত্বের জন্য একটা সহজাত হুমকি বিশেষ। হস্তচালিত তাঁত শিল্পের অবক্ষয়ের অন্যান্য কারণগুলো হচ্ছে অর্থনীতির শ্লথ বিকাশজনিত চাহিদার চাপ এবং তারই ফলশ্রুতিতে অধিকতর সস্তা বিকল্পের (যেমন, পুরাতন কাপড় কৃত্রিম সুতা ইত্যাদি) প্রতি পক্ষপাত এবং সুতো সরবরাহ ও ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা। হস্তচালিত তাঁত শিল্পে উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণ ছিল চাহিদা হ্রাস। তুলা ও তুলাজাত সুতার চড়া দামের মুখে হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদনশীলতা না বাড়ানো গেলে এবং সেই সাথে উৎপাদন ব্যয় কমানো না গেলে হস্তচালিত তাঁত শিল্পে সমস্যা চলতেই থাকবে। উৎপাদনশীলতার সমস্যার মোকাবেলা করতে হলে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের আশ্রয় নিতে হবে। অর্থাৎ টানা তাঁতগুলোর পরিবর্তে আধা স্বয়ংক্রিয় (চিত্তরঞ্জন ধরনের) তাঁত বসাতে হবে। কিন্তু এছাড়াও হস্তচালিত তাঁত শিল্পের আরও একটা গুরুতর সমস্যা রয়েছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্প এতদিন ধরে স্বল্প আয়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের কাপড়ের যোগান দিয়েছে। কিন্তু এই ভূমিকার বিরুদ্ধে উল্লিখিত সমস্যাটি এক বিরাট হুমকির সৃষ্টি করেছে। তুলাজাত সুতার দাম বৃদ্ধির কারণেই এই গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৮৪/৮৫ মেয়াদের মধ্যবর্তী সময়ে তুলার দাম তিনগুণেরও বেশী বেড়েছে। এখন সুতিবস্ত্র বিলাসদ্রব্য বলে মনে করা হয়। তাই, উৎপাদিত দ্রব্যের অভিনব ও আকর্ষণীয় ডিজাইন যোগ করে সুতার ক্রমবর্ধমান দামের সংগে তার উপভোগ মূল্য যোগ করে হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে অবশ্যই সামগ্রী বিপণনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করতেই হবে। সুতার দাম নির্ধারিত হয় সরকারী পর্যায়ে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে সুতার দাম বেড়েছে ৮৪ শতাংশ। সুতার এই মূল্যবৃদ্ধির ও সেই সংগে চাহিদা হ্রাস বাজারে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের তাঁতীদের দর কষাকষির ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে।

উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা

১৮। উৎপাদনের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি বহু গুরুত্বপূর্ণ উপখাতেও উৎপাদন সামর্থের ও উৎপাদনশীলতার পূর্ণ সদ্ব্যবহারও নিম্ন পর্যায়ে রয়ে গেছে। ফলে ইউনিট প্রতি ব্যয় অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ায় পণ্য সহায়তা ও নূতন শিল্প নীতির আওতায় আমদানি পণ্যের সংগে প্রতিযোগিতার ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সার্বিকভাবে শ্রম উৎপাদনশীলতা ছিল কম এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে তা আরও কমেছে। সারণি ৪এ উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতার আলোকে বিভিন্ন ধরনের শিল্প পণ্যের পরিস্থিতি প্রদর্শিত হয়েছে :

সারণি ৪

উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতার হার

	শিল্পপণ্য	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৮৪/৮৫	উৎপাদন ১৯৮৪/৮৫	উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের হার (১৯৮৪/৮৫ সালে) (%)	শ্রম উৎপাদনশীলতা ১৯৮৩/৮৪ সালে (১৯৭৯/৮০ সালে ১০০ হিসেবে) (%)
১।	পাটজাত শিল্প ('000' টন)	১১৫০ (১০৩৫)	৫৩১	৪৮.৮ (৫৬.০)	৯২.০
২।	তুলাজাত সুতা (মিলিয়ন কেজি)	৯০ (১৬০)	৫৯	৬৬.০ (৮২.৫২)	১১৫.৪
৩।	সিমেন্ট ('000' টন)	৩৯০ (৩৬০)	২৬০	৬৬.৭ (৭২.২)	৮০.০
৪।	সার ('000' টন)	১১৩৮ (১০৮০)	৮০৬	৭০.৮ (৭৫.৯)	১১১.১
৫।	কাগজ ও নিউজপ্রিণ্ট ('000' টন)	১২৩ (১১১)	৯০	৭৩.২ (৭৩.৯)	৮৩.২
৬।	ইস্পাত পিণ্ড ('000' টন)	২৫০ (১৫০)	১০১	৪০.১ (৬৬.৭)	৮২.০

বিঃদ্রঃ বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত সংখ্যাগুলো অর্জনযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা।

গ্রন্থাগার

১৯। দেশের বাইর ও ভিতর থেকে চাহিদা সংকোচজনিত চাপের মুখে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং কারখানান্তরে শ্রম শক্তির অপরিবর্তনশীলতার দরুণ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বর্তমানে এক দুঃসাধ্য সমস্যার সম্মুখীন। কর্মসংস্থানের নানা রকম কঠিন জটিলতার পাশাপাশি কিছুকাল পর পর সংশোধিত বেতন বৃদ্ধির চাপ এর ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ঐ বর্দ্ধিত ব্যয়ভার পণ্য ব্যবহারকারীর কাঁধে চাপিয়ে দিতে হচ্ছে। এই সব কঠিন সমস্যার মুখে সরকারী খাতের সংস্থা বা কর্পোরেশনগুলো উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে গুরুতর বৈষম্যজনিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সরকারী মূল্য নির্ধারণ নীতির কারণে এই সমস্যা অনেক ক্ষেত্রে আরও প্রকট হয়ে উঠে। এর ফলে কর্পোরেশনগুলোতে গুরুতর আর্থিক সংকটের সৃষ্টি হয়। পণ্য ও শ্রম বাজারের এই সব সমস্যার মুখে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোন উদ্ভাবনী ভূমিকায় যাওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। ফলে প্রায় সকল শিল্পে শ্রম উৎপাদনশীলতা রয়ে গেছে প্রাক-স্বাধীনতাকালের স্তরেরও নীচে। প্রকৃত মজুরীর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজ করেছে। এখানে বিশেষ গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা দরকার যে, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা সুষ্ঠুভাবে ক্রমাগতহারে বৃদ্ধি না পেলে শ্রমিকরা সমষ্টিগতভাবে দরকষাকষি করে একটা অস্থায়ী লাভ অর্জন করতে পারেন কিন্তু তাতে প্রকৃত মজুরীর বিবেচনায় কোন দীর্ঘ মেয়াদী উপকার পাওয়া যায় না। কেবল সহজ, প্রশাসনিক সমাধানের প্রতি পক্ষপাত না দেখিয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উচিত কৃৎকৌশল প্রয়োগ ও আর্থিক সমাধান উভয় প্রকার ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনা। উৎপাদন ব্যয় ও মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থাপত্র অবলম্বনে মুনাফা শিকারের সহজ ব্যবস্থা তার বিকল্প হতে পারে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতায় খুব পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মূল্যে রদবদল শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী সুস্থ বিকাশের প্রয়োজনীয় দক্ষতার কোন বিকল্প হতে পারে না, বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক বিপনন অর্থনীতিতে তো আরও নয়। কর্পোরেশনগুলো এখন মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে আগের চাইতে তুলনামূলকভাবে বেশী স্বাধীনতা ভোগ করছে। তবে একথাও ঠিক যে, অর্থনীতিতে এখন সরকারী ও বেসরকারী খাতের যেমন প্রতিযোগিতা চলছে তেমনি দেশী পণ্য ও আমদানিকৃত বিদেশী পণ্যের মধ্যে বর্দ্ধিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। তাই, বাজার ব্যবস্থাকে কল্যাণকভাবে প্রভাবিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে বিপননকে একটা কার্যকর শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, বাজারের পরিস্থিতির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না।

সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর আর্থিক কর্মতৎপরতা

২০। সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর আর্থিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এগুলোতে ব্যয় ও মূল্য নির্ধারণের প্রতিবর্ত ব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রতিফলন ঘটেছে। কোন কর্পোরেশনই তাদের স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী কোন ঋণেরই কিস্তি পরিশোধ অব্যাহত রাখতে পারেনি যা এই ব্যর্থতার চুড়ান্ত প্রমাণ নির্দেশ করে। ৩০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে বার্ষিক গড় রিটার্ণ ছিল ১%। বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে সরকারী খাতের শিল্পসংস্থাগুলোর আর্থিক কর্মতৎপরতার চিত্র ৫ নং সারণিতে দেখান হলো।

সারণি ৫

সরকারী সংস্থাগুলোর আর্থিক কর্মতৎপরতা

(কোটি টাকায়)

সংস্থা (কর্পোরেশন)	গড় বার্ষিক নীট মুনাফা/ক্ষতি		
	১ম পরিকল্পনা	দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	২য় পরিকল্পনা
১। পাটকল সংস্থা	(—)৫৪.৮	২৩.৮	(—)৩৬.২
২। বস্ত্রকল সংস্থা	০	(—)১৯.৪	(—)১৬.৩
৩। রসায়ন শিল্প সংস্থা	(—)২১.০	০	১১.৭
৪। ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা	৭.৬	১২.৯	(—)৮.৯
৫। চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা	২.৯	২.৮	৩৫.৮
৬। বন শিল্প সংস্থা	০	(—)০.৯	২.৬

টীকা : (১) ১ম পরিকল্পনাকালে ৪ বছরের গড় (১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮) ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৫ বছরের গড় কিন্তু ১৯৮৪/৮৫ সালের হিসাব সাময়িক।

(২) কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাবসহ।

(৩) বিয়োগ চিহ্নের অর্থ ক্ষতি।

নীতি পরিবেশে পরিবর্তন

২১। গোড়ার দিকের জাতীয়করণের জোয়ারের পর, ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে বেসরকারী খাতের অনুকূলে শিল্প নীতিতে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। ঐ সময় বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের সিলিং ২৫ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকায় নির্ধারিত করা হয় এবং এই খাতে জাতীয়করণের বেলায় পূর্বে প্রযোজ্য ১০ বছরের অব্যাহতি সুবিধের পরিবর্তে ১৫ বছরের অব্যাহতি সুবিধে বলবৎ করা হয়। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বেসরকারী বিনিয়োগের সিলিং আরো বাড়িয়ে ১০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। তখন থেকে এযাবৎ নীতির ক্ষেত্রে বেশ কয়েক দফা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালের মে মাসে ঘোষিত শিল্পনীতির আওতায় সরকারী খাতের সংরক্ষিত তালিকা ১৮টি উপখাত থেকে মাত্র আটটি শিল্প উপখাতে সীমিত করা হয়। এবং একই সংগে ৯টি শিল্প উপখাতের একটা যুগপৎ তালিকাও দেয়া হয়। এগুলোর সংগে কর অব্যাহতির মেয়াদ অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকাগুলোর জন্য ৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ৯ বছরে সম্প্রসারণ করা হয় এবং উন্নয়ন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকাগুলোর জন্য মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানির বেলায় আমদানি শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশে, উন্নয়ন এলাকাগুলোর জন্য ৫ শতাংশে এবং উন্নত এলাকাগুলোর জন্য ১৫ শতাংশে হ্রাসের মত কতগুলো উৎপাদনমুলক রাজস্ব সুবিধে দেয়া হয়। এছাড়া, বেসরকারী শিল্প ইউনিটগুলোর সম অংশীদারের পুঁজির ঘাটতি পূরণ অর্থ যোগান ও জনসাধারণের কাছে শেয়ার ইস্যুর আণ্ডার-রাইটিং-এর দায়িত্ব তুলে নেয়ার জন্য বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

২২। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয় ১৯৮২ সালের জুন মাসে। ঐ সময় নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়। নতুন শিল্পনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: ছয়টি প্রধান শিল্প গ্রুপ যথা: অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং সমজাতীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, আণবিক শক্তি, বিমান পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ (পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পল্লী বিদ্যুতায়ন বাদে), টেলি যোগাযোগ এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বনজ সম্পদ আহরণ সরকারী খাতে রেখে ঐ খাতের ভূমিকা সীমিত করে দেয়া হয়। নয়া শিল্প নীতিতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের জন্য ১৩ শ্রেণীর শিল্পের একটি যৌথ তালিকারও ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বহু পরিত্যক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করা হয় এবং কয়েকটি পাট ও কাপড়ের কল স্থানীয় মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

২৩। **উৎসাহমূলক সুযোগ-সুবিধা:** বেসরকারী খাতের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ছাড়াও বেসরকারী খাতের বিকাশের জন্য নয়া শিল্পনীতিতে বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রেরণামূলক ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়; এগুলো হচ্ছে:

(ক) **বিনিয়োগ সুবিধা ও লাইসেন্স ব্যবস্থা:** বর্ধিত বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে বর্ধিত মাত্রায় অবচয় সুবিধে মঞ্জুর করা হয়। কোন রকম মঞ্জুরী গ্রহণের শর্তমুক্ত শিল্প উপখাতের সংখ্যা ১৯ থেকে বাড়িয়ে ৪৭ করা হয়। ওয়েজ আর্নার স্কীম (প্রবাসীদের অর্জিত অর্থ স্কীম) এবং রপ্তানি লাইসেন্স স্কীম (এক্সপিএল) সরবরাহকারী প্রদত্ত ঋণ অথবা অফেরতযোগ্য সরাসরি বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের আওতায় থাকার শর্তে এই শিল্পগুলোতে নতুন পুঁজি বিনিয়োগের জন্য কোন অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যাহার করা হয়। অন্যান্য খাতে মঞ্জুরী পদ্ধতি সুষ্ঠু করে তোলার জন্য শিল্প পরিদপ্তর বেসরকারী খাতের সকল লাইসেন্স চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে 'ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস' দেয়ার জন্য একটি বিনিয়োগ সহায়ক ইউনিট স্থাপন করেন। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগের মঞ্জুরী দানের কর্তৃত্ব কয়েকটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলো ও উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে (ডি এফ আই) বিনিয়োগ অনুমোদন ও চলতি মূলধন মঞ্জুর করার অধিকার দেয়া হয়।

(খ) **রপ্তানিক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ঃ** ১৯৮২ সাল থেকে বৈদেশিক মুদ্রার যে বিনিময় হার নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে তাতে রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মুদ্রাস্ফীতির আপেক্ষিক হারের প্রতিক্রিয়া বাণিজ্য অংশীদারদের উপর যাতে না পড়ে সেজন্য দেশীয় মুদ্রার ক্রমাগত অবমূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া রপ্তানি সম্পাদন লাইসেন্স (এক্স পি এল) সুবিধে প্রদানের সুবাদে সকল অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানিকারক আপনা আপনি ৪০ শতাংশ পরিমাণ মূল্যের এক্স পি এল এর সুবিধে লাভ করেছেন। শুল্ক ফেরৎদানে বিলম্ব পরিহারের পক্ষে ১৯৮২ সালে আমদানি শুল্ক ফেরৎদান স্কীম প্রবর্তন করা হয়। এই সব পদক্ষেপের পরিপূরক হিসেবে যুক্ত হয়েছে রেয়াতী সুদের হারে উদার ভিত্তিক রপ্তানি ঋণ, রপ্তানি আয়ের উপর ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ হারে বর্ধিত মাত্রার কর রেয়াত, মূলধন পণ্য আমদানির উপর হ্রাসকৃত শুল্ক, রপ্তানি-কারকদের চলতি মূলধন চাহিদার ৯০ শতাংশ পর্যন্ত উদার শর্তে ঋণ মঞ্জুরী, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রপ্তানি ঋণের আদেশপত্রের ত্বরিৎ প্রক্রিয়াকরণ, ঋণ পরিশোধের সংশোধিত শর্তাবলী ইত্যাদি। রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য দেশজ উপকরণাদির উৎপাদন এবং বিদেশী সহায়তার আওতায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক দরদানের ভিত্তিতে প্রতিযোগী আমদানি বিকল্প দেশী পণ্যগুলোর ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সুবিধে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানি ঋণ গ্যারান্টি স্কীমেরও প্রবর্তন করেছে ও একই সংগে পুণঃ অর্থ যোগানের সুদের হার ৯ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৮ শতাংশ করেছে। এই সব উৎপাদনমূলক ব্যবস্থার কল্যাণে বিশ্বব্যাপী মন্দা সত্বেও, অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি যথেষ্ট বেড়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ২১ শতাংশ। ফলতঃ ১৯৮৪/৮৫ সালে দেশের মোট রপ্তানিতে অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির অংশ দাঁড়ায় ১৯৭৯/৮০ সালের মোট রপ্তানির আড়াই গুণেরও বেশী।

(গ) **আমদানি ব্যবস্থায় উদার নীতি প্রয়োগ ঃ** প্রবাসীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা তথা ওয়েজ আর্ণার স্কীম এবং রপ্তানিকারকদের উপার্জিত বিদেশী মুদ্রার বাজারে বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ ও আই ই সি অধিক মূল্যে বিনিময় করার সুবিধে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। আরও বহু পণ্য বিশেষ করে, শিল্পের নানা কাঁচামাল ওয়েজ আর্ণার স্কীমের আওতায় আমদানির অনুমতি দেয়া হয়েছে।

(ঘ) **বৈদেশিক বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা ঃ** নয়া শিল্প নীতিতে বিদেশী বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের একটা ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ব্যবস্থা রয়েছে। লায় পরিশোধ পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও আভ্যন্তরীণ সম্পদের উন্নততর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য ১৯৮০ সালের বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগ (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে ব্যবসায় বহির্ভূত ঝুঁকির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে ; মুনাফা ও পুঁজি ফেরৎ পাঠানো এবং জাতীয়করণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা রয়েছে। সকল বিদেশী বিনিয়োগ অনুমোদন মঞ্জুরীর জন্য শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি (এন সি আই ডি) গঠিত হয়েছে।

রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল

২৪। বিশ্বের বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে মুক্ত শিল্পাঞ্চল বা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল তথা মুক্ত শিল্পাঞ্চলে শুল্ক মুক্ত নানা সুবিধে ও বিশেষ

উৎসাহবর্ধক ব্যবস্থা রয়েছে যেগুলো কেবল বিশেষভাবে পৃথক অঞ্চলের বা অঞ্চলসমূহের জন্যই প্রযোজ্য। চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রদত্ত এসব সুযোগ সুবিধের মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত করে তৈরী জমি, কারখানা, ভবন, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, পরিবহন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধে। বিদেশী প্রযুক্তি হস্তান্তর, কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ ও বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা উপার্জনের লক্ষ্যে বিদেশী পুঁজি আকৃষ্ট করার মাধ্যমে দেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সাধারণতঃ এই অঞ্চলগুলো অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

২৫। শিল্পের দেশজ কাঁচামালের অভাব সত্ত্বেও প্রচুর সস্তা ও প্রশিক্ষণযোগ্য জনশক্তি, স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ জ্বালানী শক্তি এবং যুক্তিসংগত পর্যায়ে উন্নত অবকাঠামো ও জাহাজ চলাচল সুবিধের অস্তিত্ব থাকার কারণে বাংলাদেশ নিম্নলিখিত কতকগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে চট্টগ্রামের দক্ষিণ হালিশহরে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন করেছে:

(১) রপ্তানি আয় বৃদ্ধি;

(২) স্থানীয় জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

(৩) ব্যাপক ভিত্তিতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ এবং রপ্তানি শিল্পগুলোতে আরও বেশী পুঁজি বিনিয়োগে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা;

(৪) সম্পর্কিত (Linkage) শিল্পের উন্নয়ন এবং জাতীয় অর্থনীতির সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত করে স্থানীয় সম্পদগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

(৫) স্থানীয় নৈপুণ্য, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা সামর্থের বিকাশ ত্বরান্বিত করা; এবং

(৬) সেবাভিত্তিক শিল্পগুলোর বিকাশ ত্বরান্বিত করা এবং অবকাঠামোর উন্নতি।

প্রয়োজনীয় আইনগত দলিল বলে ইতিমধ্যেই রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল প্রশাসনের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।

২৬। ১৯৮৫ সালের জুন মাসে ২৩.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়। প্রথম পর্যায়ে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের জন্য ২৪৭ একর জমি হুকুম দখল নেয়া হয়। এর মধ্যে ১২৫ একরের মত জমির উন্নয়ন সাধন করা হয় এবং বরাদ্দ দেয়ার জন্য ৯৭টি শিল্প প্লট প্রস্তুত করা হয়। ১৯৮৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে ২৪টি শিল্প প্রকল্পের জন্য ৫৫.৪৪ কোটি টাকার মোট বিনিয়োগ অনুমোদন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মাত্র ৭টি প্রকল্পের কাজ (পাঁচটি পোষাক শিল্পসহ) ১৮.৪৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১৯.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে আনুমানিক ১,৭৭২ জন বাংলাদেশীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নীট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে ৩.৪৩ কোটি টাকা যেখানে মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ ১৩.৪৭ কোটি টাকা। ১৪.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত ৫টি পোষাক শিল্পের মাধ্যমেই ১৯৮৫ সালের জুন পর্যন্ত রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের সমুদয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। এই শিল্পগুলোতে ১,৭০০ ব্যক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে বিনিয়োগে বিদেশীদের কাছ থেকে যে হারে সাড়া পাওয়া যাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছিল তার তুলনায় সাড়া মিলেছে অনেক কম। চট্টগ্রামের বর্তমান রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রামে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের আরও সম্প্রসারণ (দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ) এবং ঢাকা বিমান বন্দরের কাছে একটি ও চালনা বন্দরের কাছে অন্য একটি মোট আরও দুটি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন করা হবে।

তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা

২৭। দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে কয়েকটি কারণে শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হয়। প্রথমতঃ শিল্পখাত সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ৯.৫ শতাংশ যোগান দিলেও আভ্যন্তরীণ চাহিদার অভাবে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এর প্রবৃদ্ধি হয় কম। অন্যদিকে সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হয়, নিরবিচ্ছিন্ন মন্দার কারণে উন্নত দেশগুলোর রপ্তানি চাহিদার প্রভাব পড়ে ও বিনিয়োগ মাত্রার ঘাটতি দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, পরিচালনাগত বিভ্রাটের ফলে উৎপাদন ক্ষমতার একটা বড় অংশ অকেজো থাকে ও নিম্ন মাত্রায় উৎপাদন পরিদৃষ্ট হয়। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় ও ক্ষতি বেড়ে যায়। রাজস্ব ও মূল্য নির্ধারণগত অনিয়মের দরুণ তুলনামূলক সুবিধে ভণ্ডুল হওয়ার ফলে আমদানি পণ্যের তুলনায় দেশজ উৎপাদনের প্রতিযোগিতার সামর্থের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। অবশ্য পরিকল্পনা মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে রাজস্ব ও মূল্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। এসবের ফলে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পখাতের কর্মতৎপরতা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম হয়। সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শিল্পখাত কার্যতঃ কোন অবদানই রাখতে পারেনি বলা যায়। ১৯৭৯/৮০ সালে সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান ছিল ৮.২৩ শতাংশ যা ১৯৮৪/৮৫ সালে বেড়ে মাত্র ৯ শতাংশে দাঁড়ায়।

২৮। দীর্ঘ প্রতিক্ষিত কাঠামোগত পরিবর্তন ও একটা সচ্ছল শিল্পখাত গড়ার সূচনা করতে গিয়ে তৃতীয় পরিকল্পনা উৎপাদন ক্ষমতার নিম্ন মাত্রায় ব্যবহার, নিম্ন মানের দক্ষতা ও নিম্ন উৎপাদনশীলতার সমস্যা সমাধানের দিকে মনোনিবেশ করবে। এই পরিবর্তনের কথা চিন্তাভাবনায় এসেছে অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান বিপননমুখী প্রবণতার গতিময় প্রাসংগিকতার পথ ধরে। পরিকল্পনায় ভূমি ও শ্রমকে দেশের প্রধান সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, ধরে নেয়া হয়েছে এ দু'টির ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতাই দ্রুততর প্রবৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। জমি থেকে অধিক উৎপাদনশীলতা আধুনিক সেচ ও সার প্রযুক্তি বিস্তৃত করার উপর নির্ভরশীল। আর সে ক্ষেত্রে আধুনিক উপকরণের উৎপাদন ও সরবরাহে শিল্পখাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্ধিত কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করতে গেলে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সম্প্রসারণ ও অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই কৃষি খাতের দ্রুত উন্নয়নকে কেন্দ্র করে মাঝারি ধরনের শিল্পায়নের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা হয়েছে। কৃষি খাতের বর্তমান উৎপাদন স্তরের প্রেক্ষাপটে তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে এই খাতকে কাজে লাগানোর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষি জনসাধারণের প্রধান জীবিকা। তাই এই খাতের দ্রুততর উন্নয়নের মাধ্যমেই শুধু ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা ও সংরক্ষণবাদী বিশ্বে শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের জন্য নির্ভরযোগ্য বাজার নিশ্চিত করা যায়। বস্তুতঃপক্ষে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে এমন কোন নজির নেই যা ব্যাপক দারিদ্র ও বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে ক্রমোন্নতি অর্জণ করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

২৯। অবশ্য একথা স্বীকৃত হয়েছে যে, কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এখনও বিরাট এবং এর আধুনিক প্রযুক্তি শ্রম-প্রধান হওয়া সত্ত্বেও বেকারত্ব সমস্যার সমাধানে এর সামর্থ্য সীমিত। এই ধরনের প্রযুক্তির আওতায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধিরযে সুযোগ আছে কৃষি উৎপাদন তার দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পাবে। ভূমির অধিকতর উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধির কারণে শ্রমবাজারের উপর চাপ কিছুটা কমার সম্ভাবনা থাকে ঠিকই। কিন্তু তার পরেও দেখা যায়, অ-কৃষি খাতগুলোতে বেশ প্রচুর পরিমাণ উদ্বৃত্ত শ্রমিকের কর্মসংস্থান করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই অবস্থায় শিল্পখাতকেই বর্ধিত মাত্রায় দেশের শ্রম সম্পদ কাজে লাগাতে হবে। জমির মতই, শ্রম উৎপাদনশীলতা আধুনিক ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোতে বর্তমানে অত্যন্ত কম। আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়টি মূলতঃ ব্যবস্থাপনার সমস্যা বৈ কিছু নয়। কিন্তু ঐতিহ্য লালিত কুটির শিল্পে এ প্রশ্নটি প্রযুক্তি রূপান্তরণ, দক্ষতা সৃষ্টি ও পণ্য উন্নতকরণের মত জটিল সমস্যা।

গ্রন্থ

৩০। তৃতীয় পরিকল্পনায় একদিকে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও অন্যদিকে, প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়ায় ভারী শিল্পে আশু বিনিয়োগের পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তনের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে। দেশে ভারী শিল্পের অন্তর্গত কিছু মৌলিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন যেমন মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী, জেনারেল ইলেকট্রিক, ডিজেল ইঞ্জিন কারখানা, ইস্পাত মিল ও শিপইয়ার্ডের মত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সুষ্ঠু ভিত্তিতে অর্থনৈতিক গঠনকাঠামোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সূচনা করার জন্য উল্লিখিত ভারী শিল্পগুলোর দক্ষ সদ্ব্যবহারের দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা হবে।

উদ্দেশ্যাবলী

৩১। পূর্বে আলোচিত নানা সমস্যা, সম্ভাবনা ও নীতিমালার আলোকে তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পখাতে প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

(১) সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সচল অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটা স্বাবলম্বী শিল্প কাঠামো গড়ে তোলা ;

(২) কৃষি উপকরণের উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি খাতের দ্রুততর উন্নয়নে সমর্থন দেয়া এবং একটা গতিশীল বিপণন সংযোগ সূত্রের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আত্মীকরণ নিশ্চিত করা ;

(৩) জনগণের মৌলিক চাহিদা ও ভোগ্যপণ্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্পকারখানাগুলো কর্তৃক সেগুলোর পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা ;

(৪) দেশজ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করে জনগণের মৌলিক চাহিদা ও ভোগ্যপণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা ;

(৫) বিশেষতঃ ক্ষুদ্র শিল্পগুলোকে দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্থাপন করে এবং গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা ;

(৬) আমদানি-প্রতিযোগী ও রপ্তানিমুখী শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন দেনের ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নতিসাধনে সহায়তা করা ; এবং

(৭) গবেষণা ও অভিযোজনের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু দেশজ প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়ন।

শিল্পনীতি

৩২। বেসরকারী খাতের অনুকূলে গুরুত্ব প্রদানের ব্যবস্থা সম্বলিত নয়া শিল্পনীতি উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে প্রধান হাতিয়ার হবে। শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারী খাতের ভূমিকা নয়া শিল্পনীতিতে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতে সীমিত থাকবে। প্রধানতঃ সংরক্ষিত খাতগুলোতে এবং যৌথ তালিকায় যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগে বেসরকারী খাত থেকে উপযুক্ত সাড়া মেলেনি সেইসব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সরকারী মূলধন বিনিয়োজিত হবে। এমনকি, শেষোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে সরকারী খাত বেসরকারী খাতের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সাড়া সৃষ্টির মধ্যে সহযোগী উদ্যোক্তার আকারেও 'অনুঘটক' হিসেবে একটা কৌশলগত ভূমিকা পালন করবে। এই সঙ্গে সরকারী ভূমিকার যুক্তিসঙ্গত সম্প্রসারণ হিসেবে একটা উদার পরিসরে বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগ নির্দেশনা ও উন্নয়ন এবং উপযুক্ত নীতিভিত্তিক উৎসাহদানমূলক ব্যবস্থাদির মাধ্যমে একটা সুস্থ বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা ও কৌশলসমূহ অনুসৃত হবে।

কৌশলাদি

৩৩। **সচ্ছল শিল্পখাতের উন্নয়ন :** আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিপুল মাত্রায় উৎপাদন ক্ষমতা অকেজো থাকা ও নিম্ন মাত্রার উৎপাদনশীলতা শিল্প খাতের প্রাণশক্তি নিস্তেজ করে দিচ্ছে। আর্থিক ক্ষতি, মূলধন থেকে নিম্ন হারে আয়, এবং দায় পরিশোধের অসামর্থ্য থেকে উল্লেখিত বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। শিল্প খাতের সচ্ছলতা আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন বহির্দেশীয় কারণে এই পরিস্থিতি আরও গুরুতর আকার নিয়েছে। উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে উপযুক্ত চেতনার অভাব এবং পরিবর্তনশীল বিপনন পরিবেশের মোকাবেলায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কুশলী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা থেকেই প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে দেশের বাইরে ও ভিতরে শিল্প পণ্যের চাহিদা দারুণ কমে যায়। অদূর ভবিষ্যতে বিশেষতঃ তৃতীয় পরিকল্পনা মেয়াদেও এধরনের সমস্যা সংকট দূরীভূত হবে বলে মনে হয় না। তবে শিল্পগুলো নিজ উদ্যোগে পরিস্থিতি অনেকটা সহজ করতে পারে। এই উদ্যোগের আওতায় অপচয় পরিহার, শ্রমিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মুনাফায় অংশীদারী অংশ গ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা, বিপনন গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ, উৎপাদন পরিকল্পনা, পণ্য উন্নয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত সামঞ্জস্যবিধান এবং কারখানা পর্যায়ের সমস্যাবলীর সমাধানে গবেষণা ও উন্নয়নের প্রতি অধিকতর মনোযোগ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। চাহিদা সংকট ছাড়াও, যে সব বহির্দেশীয় বিষয় শিল্পের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতাকে গুরুতর-ভাবে ক্ষুন্ন করছে সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমদানিপণ্যের অসম প্রতিযোগিতা, শুল্কগত অনিয়ম, অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি। বাণিজ্য ও শিল্পনীতি সংস্কার সমীক্ষা নামে একটি সমীক্ষা জরিপের কাজ এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই সমীক্ষায় তুলনামূলক সুবিধে, কার্যকর সংরক্ষণ সুবিধের হার এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদের মূল্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই সমীক্ষা সচ্ছল একটি শিল্প খাত গড়ার স্বার্থে জাতীয় রাজস্ব নীতি প্রণয়নে সহায়ক হবে। আধুনিক শিল্পের প্রাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মত বিষয় দ্বিতীয় পরিকল্পনার মতই তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও উচ্চ অগ্রাধিকার পেতে থাকবে। তবে একই সঙ্গে শিল্পগুলোকেও ইন্ধন শক্তি সাশ্রয়, সংরক্ষণ এই শক্তির লাভজনক ব্যবহার সম্পর্কে আরও বেশী করে সচেতন হতে হবে এবং একই কারণে প্রধানতঃ ইন্ধন শক্তি ঘন প্রযুক্তি সমূহের ব্যবহার যথাসম্ভব বন্ধ করতে হবে। সর্বোপরি আভ্যন্তরীণ বাজারকে নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় ধরে নিলে শিল্পগুলোর চলবে না। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হল দারিদ্র্য কমানো ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। তাই শিল্পগুলোর জন্য রক্ষামূলক শুল্কনীতি ঐ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

৩৪। **কৃষির সঙ্গে যোগসূত্র জোরদার করা :** খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন একান্ত আবশ্যক এবং কৃষি খাতে এখনও অনাহরিত বিকাশের সম্ভাবনা থাকায় প্রধানতঃ কৃষিখাতকে কেন্দ্র করেই শিল্পোন্নয়ন-সাধন করতে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নে কৃষির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের বৈশিষ্ট হবে দু'টি : প্রথমতঃ কৃষি সমর্থনমূলক শিল্প (যেমন, ইউরিয়া সার) স্থাপন এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসার। তৃতীয় পরিকল্পনায় শেষোক্ত কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে জোরদার করে তোলার জন্য প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হবে কেননা এই শিল্পগুলোর অবস্থা বর্তমানে দুর্বল এবং মাত্র কয়েকটি শিল্পে (যেমন, পাট ও চিনি) এ ধরনের প্রক্রিয়াজাতকরণ সীমিত। কৃষিখাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই যোগাযোগ ক্ষুদ্র পরিসর চাষী পরিবারের প্রচলিত চাহিদাকে ডিঙ্গিয়ে বিস্তৃত হবে। শিল্প ও কৃষির মধ্যে যে যোগাযোগ রয়েছে তাতে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবধান বা ফাঁক রয়েছে। দুইখাতের যোগাযোগ প্রধানতঃ দু'টি প্রত্যন্ত প্রান্তে কেন্দ্রীভূত। একটি প্রান্তে অবস্থান করছে অত্যন্ত সুসংগঠিত বৃহদায়তন শিল্পসমূহ (যেমন, পাট, কাপড়, চিনি ও সার) এবং বিপুল সংখ্যক অসংগঠিত ক্ষুদ্রায়তন ও অস্তিত্ব রক্ষাভিত্তিক কৃষি খামার, উল্লিখিত শিল্পগুলোর জন্য হয় কাঁচামাল উৎপাদন করে নয়তো ঐ সব শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী ব্যবহার করে অথচ দৃশ্যতঃ তাদের সাথে পরস্পর বিরোধী। আর অন্য প্রান্তে রয়েছে কৃষি এবং একই রকম অসংগঠিত অসংখ্য কুটির শিল্পের (যেগুলো যুগ যুগ ধরে সহাবস্থান করছে) সনাতন ঐতিহ্য লালিত

সম্পর্ক। এই দুই সম্পর্কের মাঝে কৃষি ও শিল্পে মারাত্মক ব্যবধানটি স্থান জুড়ে আছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় উপযুক্ত বাজার এলাকায় গুচ্ছাকারে ক্রমবদ্ধভাবে ক্ষুদ্র গ্রামীণ শিল্প উৎসাহিত করে এবং কুটির শিল্পের পণ্য উৎপাদন, দক্ষতা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান দ্বিকেন্দ্রিক শিল্প কাঠামোকে একটি একক ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করে ঐ মধ্যবর্তী ফাঁক বা ব্যবধান ভরাট করার চেষ্টা করা হবে। ঐ শিল্পগুলোকে একটি একক শিল্প ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আরও উন্নীত করার জন্য উপচুক্তি ও সংযোজন তৎপরতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্য প্রক্রিয়ার অবিকৃতর তারতম্য বিধান করে ঐ শিল্পগুলোর আনুভূমিক ও উল্লম্ব সম্মিলনমূলক সমন্বয়ে নিরুৎসাহিত করা হবে। নয়া শিল্পনীতির আওতায় বড়, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য গৃহীত তিনটি বিনিয়োগ তফসিলের কাঠামো এই সব নীতি অপসারণের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাতেও অনুসৃত হবে এবং আরও উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে ঐ নীতিগুলোর আরও জোরদার করা হবে। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পগুলোর উপর একটি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পগুলোর উপর আরও একটি সমীক্ষা ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই শিল্পগুলোর উন্নয়ন সমীক্ষাগুলোর উদ্দেশ্য।

৩৫। **মৌল চাহিদা ও ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ ঃ** একথা স্বীকৃত যে কৃষি ও শিল্পের সম্পর্ক প্রযুক্তি ভিত্তিক উপাদান-উৎপাদন সম্পর্কের চাইতে আরও গভীরে প্রসারিত। কৃষি খাত দেশের জনসাধারনের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয় এবং এই কৃষি খাতের উন্নয়ন সাধন করা হলে শিল্প খাতের উপর কৃষি খাতে আয়ের প্রভাব পড়বে। কেননা, তখন মৌল চাহিদা ও ভোগ্যপণ্য উভয়ের চাহিদা বেড়ে যাবে। এই বিকাশ বা প্রবৃদ্ধি থেকে ক্ষুদ্র ও হালকা শিল্পগুলো যাতে এই সুবিধে পায় সেজন্য স্পষ্টতঃ তাদের সমর্থনে রাজস্ব ও মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হবে। কৃষি খাতে বিকাশের এই ক্রিয়ার ছাপ যাতে গ্রামীণ আয় ও কর্মসংস্থানে পড়ে সেজন্য পল্লী অঞ্চলের ভোগাকেন্দ্রগুলোর সন্নিকটে ভোগ্যপণ্য শিল্প গড়ে তোলার উৎসাহ দেয়া হবে। উপচুক্তি ও সংযোজন তৎপরতার মাধ্যমে আন্তঃ শিল্প সম্পর্ক জোরদার করে তোলার জন্য শিল্পগুলোকে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্থাপন করার নীতি অনুযায়ী, পরিকল্পনায় পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রয়েছে। পল্লী অর্থনীতির প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য তা একান্তই প্রয়োজন। এছাড়া, পল্লী এলাকার ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভেতরে কাঁচামাল ও পণ্যের দ্রুত চলাচল নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে পল্লী এলাকার সড়কগুলো উন্নয়নেরও ব্যবস্থা করা হবে।

৩৬। **গ্রামীণ কর্মসংস্থান ঃ** তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পখাতে অ-কৃষি কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। অতীত শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় এ বিষয়টি বহুলাংশে বাদ পড়েছে এজন্য যে, উপাদান ও কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা ব্যতিরেকে ইঞ্জিনিয়ারিক প্রযুক্তি বাছাই করা হয়েছে। বিদেশী সহায়তা ও বিভিন্ন উৎপাদন অনুসংগের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণের কারণে মূলধন প্রধান প্রযুক্তি উৎসাহিত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রায়তন পল্লীভিত্তিক শিল্পের মাধ্যমে শ্রমঘন প্রযুক্তির উন্নয়ন করা হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক উদ্দেশ্য ঃ দারিদ্র্য উপশম। তাই দারিদ্র্য বিমোচনে শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতার শর্ত পূরণের জন্য এরূপ প্রযুক্তির দরকার হবে। এতে দৃশ্যতঃ কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতার উদ্দেশ্যগুলোকে আপাতঃ বিরোধী মনে হলেও কার্যতঃ এগুলো পরস্পরকে শক্তিশালী করে তুলবে। উৎপাদনশীলতা উঁচু পর্যায়ে পৌঁছলে পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত তরুণ সদস্যদের উপর চাকুরী খোঁজার চাপ কমবে এমন সম্ভাবনাই স্বাভাবিক আর তাতে পারিবারিক আয় বেড়ে যাওয়ায় একদিকে ভোগ্যপণ্যের জন্য চাহিদা বাড়বে ও অন্যদিকে ঐ ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে।

৩৭। **লেনদেন ভারসাম্যের সমর্থন ঃ** লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি উন্নয়নশীল দেশের জন্য স্বাভাবিক। সম্প্রতি কয়েক বছরে এই ঘাটতি শিল্পের প্রবৃদ্ধি ব্যাহত করেছে। কারণ, ধীরে ধীরে আমদানি বাড়তে থাকায় শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় দেশে বিদেশী সাহায্যের প্রবাহে পরিমাণ বা পদ্ধতিগত কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের আভাস নেই। তাই দেশের রপ্তানিযোগ্য কাঁচামালের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, রপ্তানি থেকে ক্রমেই বেশী করে কাঁচামাল

ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং ঐ ধরনের আমদানি পণ্যাদির প্রধান ব্যবহারকারী শিল্পখাতকেই আমদানি মূল্য পরিশোধের সিংহভাগের দায়ভার বহন করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কঠিন পরিবেশ সত্ত্বেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে পণ্য উন্নয়ন, জোরদার বিপণন উন্নয়ন এবং এগুলোতে রপ্তানি পণ্যগুলোর পশ্চাদমুখী সংযোগ সূত্র উৎসাহিত করা এবং অন্যদিকে স্বদেশী বাজারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ঘুচিয়ে বিদেশী বাজারের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য রাজস্বভিত্তিক উৎসাহদান ব্যবস্থাদির মাধ্যমে অতীত অর্জিত সাফল্যকে সংহত ও আরও বৃদ্ধি করা। রপ্তানি উন্নয়নে আরও বৃহত্তর ভূমিকা পালনের জন্য ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশকে (TCB) পুনর্গঠিত করা হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এজন্য এই পরিকল্পনায় বেসরকারী খাতে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (Trading House) গঠনকে উৎসাহিত করা হবে ও এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব ও আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে। আরও সরাসরি উপায়ে রপ্তানি বাণিজ্য উৎসাহিত করার জন্য চট্টগ্রামে একটি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন করা হয়েছে। তবে এযাবৎ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীরা যথেষ্ট আগ্রহ না দেখানোর ফলে রপ্তানিক্ষেত্রে এর অবদান এখন পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণরূপে বিবেচিত হচ্ছে না। অথচ বিদেশী বেসরকারী পুঁজি লগ্নির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধায়ক আইন ইতিমধ্যেই জারী করা হয়েছে। বাংলাদেশে শ্রম ও বিদ্যুৎ দুই-ই সস্তা। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের মনে আস্থা সৃষ্টির জন্য বিনিয়োগ পরিবেশ আরও উন্নত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। এই প্রয়াসের আওতায় কর্মসম্পাদনের নীতিমালা, শিল্প শৃঙ্খলা ও শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের উন্নয়নসাধন করা হবে। সর্বোপরি, একটা শিল্প ঘাঁটি গড়ে তোলা হবে বিদেশী বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের সংগে সম্পর্কিত বিষয় হিসেবে বাংলাদেশে তৎপর বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে একটা নির্ধারিত সময় কাঠামোর গণ্ডির মধ্যে ক্রমবর্ধিত হারে বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন এবং প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা নৈপুণ্য হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে।

৩৮। **শিল্পে অর্থসংস্থান ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণ :** দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রায় শেষ পর্যায়ে শিল্পে অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুতর সংকট দেখা দেয়। অনেক দিন বকেয়া পড়ে থাকা ঋণ অতিরিক্ত পুঞ্জীভূত হওয়ার দরুণ উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারী খাতকে ঋণদান স্থগিত রাখে। সরকারী খাতে শিল্পে বিনিয়োগের জন্যও সম্পদের অবস্থা সংগীন ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠে। আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান ও এগুলোর অভিভাবক কর্পোরেশনগুলোর জন্য ঋণ পরিশোধ সমস্যা ঘনীভূত হয়। বস্তুতঃ সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই ঋণের ভার দুর্বহ হয়ে উঠে। এই সংকটের মূল কারণ হলো বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট। দ্বিতীয় পরিকল্পনা আমলেই গোটা দুনিয়া অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে। বাংলাদেশও এ থেকে রেহাই পায়নি। বরং অভাবী ও বিদেশী সাহায্য সহায়তার উপর একান্ত নির্ভরশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলোর অনুসৃত মুদ্রা সংকোচ নীতির আঘাতে খুব বেশী রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই মুদ্রা সংকোচ নীতির আঘাত বেশী মাত্রায় পড়ে দেশের শিল্প খাতের উপর। ঐ নীতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার ও বিশ্ব বাজারের পরিস্থিতি বদলে দেয়। ফলে, উভয় বাজারের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বাজার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পাট শিল্প যে অবস্থার সম্মুখীন হয় এ প্রসংগে তা প্রণিধানযোগ্য। বিদেশের মন্দাক্রান্ত বাজারে পাটজাত পণ্যের জন্য কম দাম পাওয়ার কারণে মাত্র সরকারী খাতের পাটকলগুলো ১৯৮৪/৮৫ সালে লোকসান দেয় ১৪৩'৫ কোটি টাকা। গোটা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর মোট লোকসান দাঁড়ায় ১৮০'৫ কোটি টাকা। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে মুদ্রাসংকোচের প্রভাব পড়ায় বাজারের প্রত্যাশিত বিকাশ ঘটেনি। এজন্য সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের বহু শিল্প গুরুতর নগদ অর্থের সংকটে পড়ে, ধরতে গেলে প্রায় দেউলিয়া দশায় উপনীত হয়। সম্প্রতি কয়েক বছরে এই অবস্থাটি শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকারী খাত জড়িয়ে থাকায় অবশ্য বাংলাদেশে এই পরিস্থিতি এড়ানো গেছে। এটা সম্ভব হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে আধা সরকারী কর্পোরেশনগুলোর মাধ্যমে এবং পরোক্ষভাবে উন্নয়ন অর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলোর বদৌলতে এই লেনদেনে শিল্পে বর্ধিত মাত্রায় ব্যাংক

গ্রন্থাগার

থেকে ঋণ, পরিশোধ মেয়াদ পুনঃ নির্ধারণ, পুঁজি পুনর্গঠন এবং কোনরকম আইনগত ব্যবস্থা ও তার ফলাফল পাওয়া যায়নি বলে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার চিত্রটিই প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে।

৩৯। অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বিতীয় পরিকল্পনা আমলে বেসরকারী খাতে শিল্প বিনিয়োগের ৭৮ শতাংশেরও বেশী যোগান দেয়। এই প্রাতিষ্ঠানিক অর্থসংস্থানের ৬০ শতাংশ আবার বিদেশী সহায়তা থেকে যোগান দেয়া হয়। ফলে দেখা গেছে এই প্রতিষ্ঠানগুলোই ছিল বেসরকারী শিল্পখাতে অর্থ যোগানের প্রধান অবলম্বন। উন্নয়ন আর্থিক সংস্থাগুলো ঋণদান তৎপরতা স্থগিত রাখায় তৃতীয় পরিকল্পনা আমলে বেসরকারী শিল্পে অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশের জন্য এহেন পরিস্থিতি মোকাবেলার মাত্র গুটিকয়েক বিকল্পই খোলা রয়েছে। প্রথমতঃ যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ঋণ পাওয়ার সমস্যার মুখে দূরদর্শী উদ্যোক্তারা হয়তো স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহিত হবেন। ফলে বিদেশী সহায়তায় প্রদত্ত প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। বস্তুতঃ বিদেশী সহায়তা পাওয়া যাক বা না যাক, শিল্পোন্নয়নের একটা সুস্থ আভ্যন্তরীণ ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই বিকল্পটির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রৌঢ় যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য বিদেশী সহায়তা প্রাপ্তি কঠিন হয়ে উঠায় তা অপেক্ষাকৃত কম পুঁজির শ্রম প্রধান প্রযুক্তি অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করবে। ফলে, এতে পরিকল্পনার কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা হবে। অবশ্য প্রয়োজনের তাগিদে উত্তম ব্যবস্থা বলে ধরে নেয়া এই বিকল্পগুলো কেবলমাত্র বেসরকারী খাতের জন্য প্রযোজ্য বলে মনে করাটা ঠিক হবে না। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত মৌল কৌশল। তাই বেসরকারী ও সরকারী উভয় খাতকেই ঐ বিকল্পগুলো গ্রহণ করার প্রয়াস চালাতে হবে যদিও শিল্পায়নের ইতিহাসে অসম প্রযুক্তি বিকাশের অসংখ্য নজির রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনকে আরও ইতিবাচকভাবে প্রযুক্তি নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং কর্মসংস্থানগত সুবিধে অসুবিধে ও গ্রহণ ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রযুক্তি বাছাই করতে হবে। তৃতীয়তঃ, দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয়ার্ধে পোষাক শিল্পে যেমনটি ঘটেছে ঠিক সেভাবে গতিশীল ও সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোগ তথা উদ্যোক্তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী বাজারের বুনিয়াদে গড়ে উঠার সুযোগ দিতে হবে এবং সহজ ঋণ প্রাপ্তির জন্য অর্থ সংস্থান প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নির্ভর না করে গৌণ বিদেশী মুদ্রা বাজারের সুবিধে আহরণ করতে দিতে হবে। পরিশেষে, যেহেতু পুঁজির মূল্য আভ্যন্তরীণ (অ-বাণিজ্যযোগ্য) ও বহির্দেশীয় বাজার (বাণিজ্যযোগ্য) উভয় ক্ষেত্রেই একই হতে হবে (যাতে শিল্প খাতের দক্ষতাও সচলাবস্থা নিশ্চিত হয়), সেইজন্য বেসরকারী খাত বিচক্ষণতার সংগে সরবরাহকারকদের ঋণ কিংবা বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের সংগে যৌথ উদ্যোগের সুবিধে গ্রহণ করতে পারে। তবে অংশতঃ আস্থাহীনতা ও আংশিকভাবে বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহণে জড়তার জন্য উল্লিখিত দু'টি ক্ষেত্রের কোনটাতেই তেমন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। উল্লেখ করা দরকার বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহণে সাবধানী হওয়ার পরেও উন্নয়ন অর্থ সংস্থান প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর বাধিক নির্ভরতা অব্যাহত থাকে। ফলে দেশের শিল্পগুলোতে বর্তমানে নাজুক আর্থিক কাঠামোর উদ্ভব ঘটেছে। জনগণের সঞ্চয়সহ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার মাঝেই শিল্প খাতের আর্থিক সংকটের অভিন্ন কারণটি নিহিত। জনগণের সঞ্চয় ও জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত ঋণ থেকে গোটা সরকারী খাতের পুঁজি বিনিয়োগের অর্থ সংস্থান করা হয়েছে, পক্ষান্তরে কর্পোরেশনগুলোর অবশিষ্ট উপার্জন থেকে অর্থ সংস্থান করা গেছে অতি সামান্যই। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ১,২৫৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। শিল্প সংস্থা তথা কর্পোরেশনগুলো নীট মুনাফা অর্জন করে মাত্র ১১৯.৮ কোটি টাকা। সর্বোপরি উল্লিখিত বিনিয়োগের বিপরীতে কর্পোরেশনগুলো সরকারী সম-অংশীদারিত্বের জন্য ফেরত হিসেবে সরকারী কোষাগারে ৯৬.৮ কোটি টাকা যোগান দেয়। পক্ষান্তরে কোন কোন কর্পোরেশন তাদের দায় দেনার দেয় কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দুই প্রস্থ ব্যবস্থা নেয়া হয়, ব্যবস্থা-গুলো হচ্ছেঃ (১) কর্পোরেশনগুলোকে পণ্যের মূল্য নির্ধারণে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান এবং (২) সম-অংশীদারত্বের অনুকূলে পুঁজি পুনর্গঠন (ঋণ-সম অংশীদারত্ব অনুপাত)। এই ব্যবস্থাগুলোর কল্যাণে শিল্প কর্পোরেশনগুলো পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের (১৯৭৫—৮০) ১৯৬ কোটি টাকা ক্ষতির তুলনায় ১৪০ কোটি

টাকা মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু চলতি মূল্যে ৩,০০০ কোটি টাকার উপর বিনিয়োগের বিপরীতে কর্পোরেশনগুলোর গড় বার্ষিক মুনাফা হয় ২৮ কোটি টাকা। এই প্রসংগে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা দরকার যে, উপরে যে দুই ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর পূর্বশর্ত হচ্ছে: প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব থাকতে হবে। অন্যথায় পণ্য মূল্য নির্ধারণের স্বাধীনতার অর্থ হবে অদক্ষতা ও অপচয় চড়াদামে ব্যবহারকারীর কাঁধে স্থানান্তর যা শুধু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পাল্টা আঘাত হানবে। প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা হ্রাস, উৎপাদন হ্রাস, উৎপাদন ক্ষমতার উচ্চ হারে নিষ্ক্রিয়তা এবং আরও বেশী করে সহজে রূপান্তরযোগ্য নগদ অর্থ সংকট ইত্যাদির আকারে এই আঘাত হানা হবে। চাহিদা বাড়িয়ে তোলার স্বার্থে প্রতিষ্ঠানগুলোর বরং লক্ষ্য হওয়া উচিৎ অধিক হারে উৎপাদনের মাধ্যমে সার্বিক মুনাফা অর্জন করা, ইউনিট প্রতি অধিক মুনাফা অর্জন নয়। অনুরূপভাবে, নিম্নমাত্রার ঋণ ইকুইটি অনুপাতে অদক্ষতার অর্থ হবে ইকুইটি পুঁজির উপর নিম্নমাত্রার আয় বা মুনাফা, এমনকি লোকসান, যার ফলে খোদ পুঁজিই অপহৃত হয়ে যেতে পারে।

৪০। বর্তমানে বেসরকারী খাত ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গুরুতর সংকটের সম্মুখীন। বেসরকারী খাতের কাছ থেকে অর্থ সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ বকেয়া ঋণ ক্রমশঃ বাড়ছে। এরকম প্রাপ্য বকেয়ার মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৪৪.৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে প্রাক-স্বাধীনতাকালের প্রকল্প বাবদ হচ্ছে ১২৭.৬ কোটি টাকা। ১৯৭০-এর দশকের প্রকল্পসমূহ বাবদ ৩৮০.৯ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ৩৬.২ কোটি টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রকল্পসমূহ বাবদ বকেয়া হিসেবে জমেছে। একই মেয়াদে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ ছিল ২২২.৭ কোটি টাকা। ঋণের কিস্তি বা অর্থ পরিশোধের প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে ৮০ শতাংশের মত শিল্প উদ্যোক্তা ব্যর্থ হয়েছেন। এর পরিণতিতে অত্যন্ত গুরুতর রকম নগদ অর্থের অভাব দেখা দেওয়ায় উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ঋণদান কার্যক্রম বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞরা এই উন্নয়ন অর্থ সংস্থান প্রতিষ্ঠানগুলোর নগদ সম্পদের সমস্যা পরীক্ষা করে দেখছেন। তবে বড় প্রয়োজন হচ্ছে, বেসরকারী খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক কয়েক বছরের অর্থনৈতিক পরিবেশ সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে দেখা।

৪১। বিনিয়োগ তথা পুঁজির অর্থ-যোগানের জন্য উন্নয়ন অর্থ সংস্থান প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর বেসরকারী শিল্পগুলোর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতার বহু কারণ রয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও পুঁজি বাজারের উন্নয়নের অভাব অন্যতম। অর্থনীতির ধীর অগ্রগতি ও সার্বিক অভাবের ফলেই সুষ্ঠু মূলধন বাজার গড়ে উঠেনি। বেসরকারী খাতের উপর অনেক বেশী গুরুত্ব আরোপ করে শিল্পনীতির পরিবর্তন সাধন করলেও এক্ষেত্রে তেমন কোন বাস্তব অর্থবহ উদ্যোগ এপর্যন্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এখনও তার শৈশবাবস্থা কাটাতে পারেনি যদিও বিগত কয়েক বছরে এই প্রতিষ্ঠানের কিছুটা তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৮৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মাত্র ৬৯টি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত ছিল। এই কোম্পানীগুলোর পরিশোধিত মূলধনের মোট পরিমাণ ২০.৮ কোটি টাকা যদিও শিল্প মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪,০০০ কোটি টাকারও বেশী। ১৯৮৩/৮৪ সালের ১৪ লাখ টাকার তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর লেনদেনের মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ২.২৫ কোটি টাকা। মূলধন বা শেয়ার বাজারে প্রাণচাঞ্চল্যের সুনির্দিষ্ট আভাস অবশ্যই আছে। তবে ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানীগুলোর পরিশোধিত মূলধনের তুলনায় ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতার স্তর এখনও অনেক নীচে। কয়েকটি বিষয় বর্তমানে ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিকাশ ব্যাহত করছে। প্রথমতঃ সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের মালিকানাধীন। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী বা যৌথ মূলধনী সংস্থা হিসেবে আইনানুগ রূপ দেয়া হলেও, এগুলোর শেয়ার এখনও জনসাধারণের কাছে বিক্রির জন্য ছাড়া হয়নি। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের মধ্যে আস্থা এবং বিনিয়োগের অভ্যাস গড়ে তোলা ও সরকারী সম্পদের উপর চাপ কমানোর জন্য এটা

প্রয়োজন। লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ারের অংশবিশেষ নতুন 'মিউচুয়াল ফাণ্ড' কিংবা ইউনিট ট্রাষ্টের বিনিময়ে আইসিবি'কে দেয়া যায়, যাতে সেগুলো বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের মধ্যে বিতরণ করা যায়। এতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিদেশী মুদ্রার উপর চাপ কমানো যাবে। দ্বিতীয়তঃ শিল্পায়নের গোড়ার দিকে নতুন উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ তথাকথিত "ইন্টারলকিং ফ্যামিলি ডাইরেক্টর" পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদেরকে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ডে রেখে নিশ্চিত করতে চায়। এটি যদিও জনপ্রিয় তবে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের উচিত এক সময়ে প্রতিষ্ঠানকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর আকার দিয়ে দেশের শিল্পোন্নয়নে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া। এক্ষেত্রে আইসিবি'র ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। আইসিবি 'মিউচুয়াল ফাণ্ড' ও 'ব্রিজ ফাইনান্সিং' স্কীমের আওতায় প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার কেনায় জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে আইসিবি 'ব্রিজ ফাইনান্সিং স্কীমে' ৪৬.৬ কোটি টাকা দেয়। এর ফলে জনসাধারণ মাত্র ১৪.৭ কোটি টাকার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে একটা নির্দিষ্ট স্তরের উপরে বিনিয়োগের জন্য 'পাবলিক লিমিটেড' কোম্পানী গঠন করা এবং সেগুলোকে ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্তি করতে উৎসাহিত করা হবে। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উপযুক্ত রাজস্ব ব্যবস্থা নেয়া হবে। বর্তমান রাজস্ব নীতিতে পাবলিক লিমিটেড ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীগুলোর আয়করের ব্যাপারে দুই ধরনের হার ধার্য করা হয়। তবে শিল্প জগতের গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী গঠন ও এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি উৎসাহিত করার জন্য বিনিয়োগ ও মুনাফার রেয়াত প্রদানে সুস্পষ্ট তারতম্য বিধান করা দরকার।

৪২। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক পরিবর্তন এসেছে। এখন বেসরকারী শিল্পগুলোর জন্য অধিকমাত্রায় বাণিজ্যিক ঋণ পাওয়া যাচ্ছে। এতে চলতি মূলধনের সমস্যার আংশিক উপশম হয়েছে। ১৯৮৪/৮৫ সালে বেসরকারী শিল্পগুলোর জন্য মোট বাণিজ্যিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৩৯০ কোটি টাকা। এতে বেসরকারী শিল্পগুলোর কেবল চলতি মূলধনের সমস্যা সমাধানে সাহায্য হয়নি বরং এভাবে বেসরকারী পর্যায়ে সঞ্চয় বৃদ্ধির অভিযানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ভূমিকা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ও বেসরকারী পর্যায়ে ঐ সঞ্চয় মুদ্রা তথা পুঁজিবাজার সূত্রে উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় মুদ্রানীতি এদিকটি আরও উৎসাহিত করবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

৪৩। নীচের অনুচ্ছেদগুলোতে তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান শিল্পসংক্রান্ত কার্যক্রম আলোচিত হয়েছে।

৪৪। **পাট শিল্প ঃ** দেশের সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হচ্ছে পাটজাত শিল্প। '৫০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য প্রচুর কাঁচামাল (পাট) আর সস্তা শ্রমের ভিত্তিতে পাটজাত শিল্প গড়ে উঠে ও তা বাংলাদেশের শিল্পায়নে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অবশ্য শিল্প বুনিয়াদ প্রশস্ততর হয়ে উঠায় শিল্পোৎপাদনে পাট শিল্পের অংশের পরিমাণ কমে গেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরুতে এই শিল্পের উল্লিখিত অংশ ১৯৭৩ সালে এক চতুর্থাংশের তুলনায় এক পঞ্চমাংশের নীচে এবং ১৯৮৪/৮৫তে আরও হ্রাস পেয়ে প্রায় এক অষ্টমাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। এর আংশিক কারণ বিশ্ববাজারে চাহিদার মন্দা ও কাঁচা পাটের উৎপাদন হ্রাস। শেষোক্ত বছরে পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ১৯৮৩/৮৪ সালের সর্বোচ্চ ৫.৮৫ লাখ টন ও ১৯৭৯/৮০ সালের ৫.২৫ লাখ টনের তুলনায় ৫.৬১ লাখ টনে হ্রাস পায়। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্ববাজারে চাহিদার অনিশ্চয়তা এবং দেশে কাঁচা পাটের অস্থিতিশীল সরবরাহ উভয়বিধ কারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল ছিল পাট শিল্পের জন্য অত্যন্ত দুঃসময়। এই দুই সমস্যার চাপে থেকেও পাট শিল্প উৎপাদন ও রপ্তানি বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। রপ্তানি বেড়েছে ১৯৭৯/৮০ সালের ৪.৫৬ লাখ টনের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪.৮৪ লাখ টন অর্থাৎ রপ্তানি খাতে বার্ষিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তবে অধিক মূল্যবানও

অপেক্ষাকৃত হাল্কা ওজনের পাটজাত দ্রব্যের (হেসিয়ান) রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও গড় ইউনিট মূল্য ১৯৭৯/৮০ সালে টন প্রতি ৮৫০ মার্কিন ডলার থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৮১৯ মার্কিন ডলারে নেমে যায়। এই সব অভিজ্ঞতা ও বিশ্ববাজারে সম্ভাব্য চাহিদার ভিত্তিতে পাট শিল্পের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালের কার্যক্রম প্রণীত হবে। উন্নয়নশীল দুনিয়ার দেশগুলোতে শিল্প অর্থনীতির ধীরগতি ও ঘন ঘন ক্ষণভঙ্গুর পরিস্থিতি এবং খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর অধিকতর গুরুত্বারোপের মত বিষয়গুলো বিশ্ব বাজারের চাহিদার কোন বৈপ্লবিক উন্নতির জন্য অনুকূল নয়। জ্বালানী তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় বিশ্ববাজারে কৃত্রিম তন্তু ও বিকল্পসমূহের মোকাবেলায় পাটের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অন্যদিকে, কাঁচাপাটের সরবরাহের ব্যাপারটি আগাগোড়াই নাজুক। এই সব বহির্দেশীয় ও আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোর বিবেচনার আলোকে তৃতীয় পরিকল্পনায় পাটজাত শিল্প খাতে আর কোন উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির চিন্তা করা হয়নি। বস্তুতঃপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ নাগাদ মোট ২৫,৭৯৫টি তাঁতের মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ তাঁত অকেজো পড়ে থাকে। অন্যদিকে, উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের হার ছিল মাত্র ৪৯ শতাংশের মত। পাটকলগুলোর নিরূপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১০'৩৫ লাখ টন বলে হিসেব করা হয়েছে। অথচ ১৯৮৪/৮৫ সালে প্রকৃত পাটজাত পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫.৬১ লাখ টন। কাজেই বিশ্বের বাজারে যদি পরিস্থিতির উন্নতি হয় এবং কাঁচা পাটের সরবরাহে সমস্যা দেখা না দেয়, তাহলে ঐ চাহিদার যোগান দেয়ার জন্য বিপুল অকেজো হয়ে পড়ে থাকা উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগানো যাবে। এমনকি, পাটকলে যন্ত্রপাতি বহুদিনের পুরোনো হয়ে যাওয়ার কারণেও যদি সেগুলোর বদলানোর প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে তাহলেও চাহিদা ও লাভালাভ তথা অর্থনৈতিক সাশ্রয়ের নিরীখেই যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বদলানোর কার্যক্রম স্থির করতে হবে। এর বিপরীতে তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎকর্ষ ও প্রকারভেদ উভয় বিবেচনাতে পণ্যের উন্নয়ন এবং ক্ষেত থেকে প্রতিষ্ঠান অবধি কার্যকর মূল্য নিশ্চিত রাখার গবেষণার প্রয়াস কেন্দ্রীভূত রাখতে হবে যাতে পাটজাত পণ্য কৃত্রিম তন্তু ও অন্যান্য বিকল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম হয়। ৪.৯০ লাখ টন পাটজাত পণ্য রপ্তানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এরকম একটা রক্ষণবাদী হিসেব অনুযায়ী তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৯৮৯/৯০ সালে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ৬.৫০ লাখ টন। তবে একথা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা দরকার যে, উৎপাদনের পরিকল্পিত স্তর অর্জন কিংবা তা বজায় রাখার জন্য এই শিল্পকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি (অর্থাৎ বিশ্ব চাহিদা) ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা (অর্থাৎ কাঁচা পাটের সরবরাহ) উভয় দিকেই নজর রাখতে হবে। অন্যথায় যুগপৎ যদি পাটজাত পণ্যের চাহিদা কমে ও কাঁচাপাটের সরবরাহ বেড়ে যায় তাহলে পাট শিল্পকে বিপুল আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে।

৪৫। **চিনি শিল্প :** পাট শিল্পের পরেই দেশের দ্বিতীয় সমধিক গুরুত্বপূর্ণ কৃষিভিত্তিক শিল্প হচ্ছে চিনি শিল্প। পাট শিল্পের মত চিনি শিল্পও ষাটের দশকে দ্রুত প্রসার লাভ করে। স্বাধীনতার পর দেশে কেবলমাত্র একটি ১০ হাজার টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন চিনি কল স্থাপন করা হয়। এই খাতের মূল কার্যক্রমের আওতায় পুরনো চিনি কলগুলোর পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে দেশের চিনি-কলগুলোর মোট উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ১.৯০ লাখ টন। কিন্তু পাট শিল্পের মত কিংবা সম্ভবতঃ তার চেয়েও বেশী মাত্রায় এই শিল্পের প্রকৃত উৎপাদন ইক্ষুর সরবরাহ ও ইক্ষুর মানগত উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে চিনির উৎপাদনে ব্যাপক তারতম্য দেখা দেয়। ১৯৮১/৮২ সালে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ১.৯৯ লাখ টন। ১৯৮৪/৮৫ সালে তা ছিল ৮৮ হাজার টন। চিনিকলগুলোর উৎপাদনে এই অস্থিতিশীলতার কারণ-অপর্যাপ্ত ইক্ষুর সরবরাহ। এজন্য পরিকল্পনায় এই শিল্পের আশুউৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কোন উদ্দেশ্য নেই। পরিকল্পনায় ইক্ষুর ফলন ও মানগত উৎকর্ষের উন্নয়নে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য একই সংগে পরিকল্পনায় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বদলানোর কার্যক্রমের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের বর্তমান মাত্রা বজায় রাখারপ্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। কেননা দেশের ১৬টি চিনি কলের মধ্যে অর্ধেকই ৩৩ বছর বা তারও বেশীকালের পুরনো। উল্লেখ করা দরকার যে, চিনি শিল্পের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা মধ্যবর্তীকালীন মেয়াদে ইক্ষুর সরবরাহ হ্রাসজনিত কারণে বিঘ্নিত হলেও চিনি শিল্পের মোট বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে চিনির সম্ভাব্য চাহিদা তার চেয়েও অনেক বেশী। জনসাধারণের আয়বৃদ্ধিও

গ্রন্থাগার

নগরায়নের সংগে সংগে চিনির এই চাহিদা সুনিশ্চিত ভাবেই আরো বেড়ে যাবে। এতে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে। কারণ চাহিদার ঘাটতি আমদানি করে পুরণ করতে হবে। এ কারণে ইক্ষু ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিক থেকে আন্তর্জাতিক যোজিত মুল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভুমির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার ও ফসলের নিপুণ ধারা বিন্যাসের বিবেচনায় ইক্ষুর স্থান অনেকখানি উচুতে। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের দিক থেকে ইক্ষু চাষ সকল ফসলের শীর্ষে। এছাড়া, বিভিন্ন বন্যাবিধৌত সমতল অঞ্চলের কোন কোন এলাকার মাটি ইক্ষু চাষের অত্যন্ত উপযোগী বলে দেখা গেছে। ইক্ষু ফসলের এই সম্ভাবনাকে ফলন, শর্করা/রসের পরিমাণ ও ফলন মেয়াদ ইত্যাদির আলোকে নানাজাতের ইক্ষু উন্নয়নের মাধ্যমে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সরকারী খাতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মতৎপরতার দায়িত্ব দেয়া হবে। এই কার্যক্রম থেকে একবার সুফল আসতে শুরু করলে এবং দেশের চিনিকলগুলোর উদ্বৃত্ত আখ পাওয়ার মত উৎপাদন স্তরে পৌছানো গেলে, বিশেষতঃ বেসরকারী খাতের সংগে সহযোগিতাক্রমে চিনি উৎপাদনের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করা যাবে। উল্লেখ করা যায় যে, চিনির উঁচু চাহিদার কারণে চিনি শিল্পসংস্থা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে একনাগাড়ে মুনাফা অর্জণ করেছে।

৪৬। **বস্ত্র শিল্প :** বস্ত্র শিল্প ঐতিহাসিকভাবেই শিল্পায়নের পথিকৃত। ১৭৭৯ সালের শিল্প বিপ্লবের সূচনা থেকে শুরু করে অদ্যাবধি শিল্পায়নের ইতিহাস সেই একই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া ও অন্য বহুদেশের অর্থনৈতিক বিকাশ শুরু হয়েছিল সূতীবস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে। শিল্পের প্রধান শক্তি হচ্ছে সস্তা শ্রমশক্তি যা এসমস্ত নব্য শিল্পায়িত দেশগুলো শুরু হতেই লাভ করেছিল। বাংলাদেশ তার বিপুল বাড়তি জনশক্তি সত্বেও সেটাকে এখনও কাজে লাগাতে পারেনি। এদেশে বস্ত্রের এক বিরাট অভ্যন্তরীণ বাজারও রয়েছে। তবে যেহেতু প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (যেমন তুলা ও কৃত্রিম তন্তু) বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে সেহেতু এ বিষয়টি সমান গুরুত্বপূর্ণ যে বস্ত্র শিল্পকে কেবলমাত্র আমদানি পণ্যের বিকল্প তৈরীর সহজ পন্থা হিসেবে না দেখে এটাকে বহির্মুখীও করতে হবে। কাঁচামাল আমদানির আর্থিক সম্পদ সংস্থানের জন্যেই শুধু নয় বরং দেশের বিরাট তাঁত শিল্পকে রক্ষা করার স্বার্থে এ ধরনের পন্থা অবলম্বন প্রয়োজন, যাতে বস্ত্র শিল্প দেশের শিল্পায়নে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪৭। দেশে প্রায় ৪ লাখ হস্তচালিত টানা তাঁত ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের তাঁত রয়েছে। আর আধুনিক কাপড়ের কলগুলোতে রয়েছে ১৩,৬৫০টি বিদ্যুৎ চালিত তাঁত। দেশে উৎপাদিত মোট৭৭.১ কোটি মিটার কাপড়ের প্রায় ৬৫ শতাংশ উৎপাদিত হয় হস্তচালিত তাঁত শিল্পে। এ শিল্পে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা ৭ লাখের মত। স্বীকার্য যে, দেশে কাপড়ের চাহিদার সিংহভাগ সরবরাহের জন্য বস্ত্র শিল্পের মধ্যে তাঁত শিল্পখাতই হবে প্রধান অবলম্বন। তবে যুগপৎ একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই খাতের অর্থনৈতিক ভালমন্দ ও এর অস্তিত্ব কেবল নিম্ন শ্রম উৎপাদনশীলতার কারণে নয় বরং সুতা ও অন্যান্য উপকরণের চড়াদামের কারণেও বেশ প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয়েছে। সুতা ও অন্যান্য উপকরণ তাঁতীদের সংগ্রহ করতে হয় একদল মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। অন্যদিকে দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেশ কম। তাঁত শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী অনেক কৃষি শ্রমিকদের মজুরীর চাইতেও কম বলে দেখা গেছে। এই নিম্ন আয় ও নিম্ন উৎপাদন গত কয়েক বছরে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের অবক্ষয়ের আংশিক কারণ। ১৯৭৮/৭৯ সালে এই শিল্পে ৮.৪৭ লাখ কর্মী নিয়োজিত ছিল। ১৯৮১/৮২ সালে এসে এই সংখ্যা প্রায় ৭ লাখে হ্রাস পায়। কাঁচামালের চড়ামূল্য আর নীচু আয়-এই দুই সমস্যার যে সমাধান সম্ভব তা হচ্ছে উন্নতর প্রযুক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উৎপাদনশীলতা ও যোজিত মুল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

৪৮। হস্তচালিত তাঁত শিল্পখাতের আর একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে সঠিকমানের প্রয়োজনীয় সুতার পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাব। এক্কারণে, তাঁত শিল্প সর্বোত্তম সাফল্য দেখাতে পারেনি। তাই তাঁত শিল্পে

নিয়োজিত শ্রমিকদের পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য সুতার সরবরাহ বাড়ানো ছাড়াও বেশী চাহিদাসম্পন্ন কাউন্টের সুতা ও উৎপাদিত বস্ত্রের মান নিশ্চিত করা দরকার।

৪৯। হস্তচালিত তাঁত শিল্পে বহুলোকের কর্মসংস্থান হয় ও বিশেষত: গ্রামীণ তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের কাপড় এই শিল্প থেকে পাওয়া যায় বলে তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে তাঁত শিল্পের সংগে সংগতি-ক্রমে আধুনিক বস্ত্র শিল্পের যুগপৎ সুষ্ঠুবিকাশসাধন। এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে সেগুলো হলো :

(ক) আধুনিক সুতাকল, বিশেষ করে বেশী চাহিদাসম্পন্ন কাউন্টের সুতা তৈরী করা যাবে এ ধরনের সুতাকল স্থাপন করে হস্তচালিত তাঁত শিল্প খাতেরও রপ্তানিযোগ্য বস্ত্রবয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ও নির্দিষ্ট কাউন্টের সুতা সরবরাহ;

(খ) বড় আকারের বিভিন্ন ইউনিট সমন্বিত কাপড় কল ও ছোট তাঁত বুনন ফ্যাক্টরীগুলোর বুনন ক্ষমতাকে পোষাক শিল্প ও রপ্তানী চাহিদা মেটাতে নিয়োজিত করা;

(গ) তাঁত শিল্পের প্রযুক্তির উন্নতিসাধন করা;

(ঘ) তাঁত বস্ত্রের কার্যকর বিপণন ও বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

(ঙ) উৎপাদন উপকরণ বিতরণ এবং তাঁতজাত বস্ত্রাদি বিপননের দায়িত্ব নেয়ার জন্য বাংলাদেশ তাঁত শিল্প বোর্ডের উদ্যোগে তাঁতী সমবায় সমিতিকে উচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংগঠন ও পুনরুজ্জীবন করা;

(চ) তাঁতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেয়াতি শর্তে পর্যাপ্ত চলতি মূলধন ও মেয়াদী ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ তহবিল গঠন করা;

(ছ) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের জন্য বেশী সংখ্যায় তাঁত শিল্পীদের সর্বাংগীন ও পর্যাপ্ত কারীগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং

(জ) বেসরকারী খাতে, বিশেষত: সমবায় সমিতির কাছে মূলধন প্রত্যাহারের মাধ্যমে হস্তান্তর করার চূড়ান্ত উদ্দেশ্যে হস্তচালিত তাঁত শিল্প প্রধান এলাকাগুলো থেকে কয়েকটি নির্বাচিত স্থানে সুতা ও কাপড়ের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ফিনিশিং-এর সুযোগ সুবিধে দেয়ার জন্য কমন সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা। উল্লেখ থাকা আবশ্যক যেহেতু শিল্পায়নের বাহক এই ঐতিহ্যময় শিল্পকে এগিয়ে যাওয়ার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে বেসরকারী খাতই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হয় তাই সরকারী খাতে কোনও নতুন কাপড়ের কল স্থাপন করার প্রয়োজন হবে না।

৫০। পরিকল্পনায় ১৯৮৯/৯০ সালে মাথাপিছু নতুন কাপড় সরবরাহ বর্তমানের ৯.০ মিটার থেকে ১১.০০ মিটার এবং কাপড়ের উৎপাদন ৭৭.১০ কোটি মিটার থেকে ১২১.৫ কোটি মিটার বৃদ্ধি করা হবে বলে ধরা হয়েছে। এই উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় ৬২ শতাংশ তাঁত শিল্পে উৎপাদিত হবে বলে স্থির করা হয়েছে। তাঁত শিল্পে উৎপাদন ১৯৮৪/৮৫ সালের ৫০.৩ কোটি মিটার থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ৭৫ কোটি মিটারে বৃদ্ধি পাবে। এই অনুসারে পরিকল্পনায় শক্তিচালিত তাঁতের সংখ্যা ১৯৮৯/৯০ সাল নাগাদ আনুমানিক ১৩,৬৫০টি থেকে ২৫,০০০টিতে এবং টাকুর সংখ্যা ১২.৩০ লাখ থেকে ১৮.৩০ লাখ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। ১৯৮৯/৯০ সাল নাগাদ টাকুর সংখ্যা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির পরিকল্পনা থাকলেও পরিকল্পনা মেয়াদে সুতার উৎপাদন বর্তমানের আনুমানিক ৫.৯ কোটি কেজি থেকে ৯.৫ কোটি কেজি অর্থাৎ ৬১ শতাংশ বাড়বে। এই বর্ধিত উৎপাদন পাওয়া যাবে অংশতঃ নতুন স্থাপিত ক্ষমতা থেকে এবং আংশিকভাবে উৎপাদন ক্ষমতার বর্ধিত ব্যবহার থেকে।

৫১। **সার ঃ** আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপের কারণে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে সারের ব্যবহার বহুগুণ বেড়েছে। এর পূর্ববর্তীকালের ৩.০৪ লাখ টনের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে সারের ব্যবহার ১২.৬০ লাখ টনে পৌঁছে। এসত্বেও তুল্য ভূমি-জনশক্তি অনুপাত সম্পন্ন ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোর সার ব্যবহারের মাত্রার তুলনায় বাংলাদেশ নিম্নতম সার ব্যবহারকারী (৩৮.৫ কেজি/একর) দেশগুলোর অন্যতম।

৫২। তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২০৭ লাখ টনে নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে সারের চাহিদাও ১৯ লাখ টনের মত বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশে ৪টি চালু সার কারখানা আছে। এর তিনটি ইউরিয়া সার কারখানার; মোট নির্ধারিত উৎপাদন ক্ষমতা ৯.৭৪ লাখ টন ইউরিয়া ও ১২ হাজার টন এমোনিয়াম সালফেট। ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা একটি। এর নির্ধারিত উৎপাদন ক্ষমতা ১.৫২ লাখ টন। পলাশে দেশের চতুর্থ ইউরিয়া সার কারখানাটি এখন নির্মাণের শেষ পর্যায়ে। কারখানাটি ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই কারখানা চালু হবার পর দেশের মোট ইউরিয়া সার উৎপাদনের ক্ষমতা দাঁড়াবে ১০.৭৪ লাখ টনে। বার্ষিক ৫.৬০ লাখ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা ১৯৮৮/৮৯ সালে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। ঐ সময় মোট ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতা ১৬.০০ লাখ টনের ওপরে উন্নীত হবে। বেসরকারী খাতে একই আকারের আরেকটি ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের বিষয় এখন আলাপ আলোচনার স্তরে রয়েছে। এই প্রকল্পে উৎপাদিত সার অবশ্য বিদেশে রপ্তানির অংগীকার রয়েছে। বারংবার প্রমাণিত হয়েছে যে, ধারণা স্তর থেকে উৎপাদন পর্ব পর্যন্ত একটি ইউরিয়া কারখানা চালু করায় দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। সেজন্যই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আরও দু'টি কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া আবশ্যক হবে যাতে চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধে পর পর সেগুলো চালু হতে পারে। সরকারী খাত এধরনের উদ্যোগগুলোতে গতি সঞ্চারক ইকুইটি যোগান দিতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় একটি নতুন প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৫৩। **ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প ঃ** ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প আধুনিক শিল্পের ভিত্তিমূল। বস্ত্র শিল্পের মধ্য দিয়ে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হলেও ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্পের বিকাশজনিত জরুরী সহযোগিতা না পেলে ঐ বিপ্লব সম্ভব হত না। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশের শিল্পোন্নয়নে যে ইন্দ্রজালিক পরশ লেগেছে তাতে উল্লিখিত সম্পর্ক অত্যন্ত বাস্তব সত্য। বাংলাদেশে ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্পভিত্তি বর্তমানে খুবই দুর্বল। এর কারণ এদেশে শিল্প প্রধানতঃ স্থাপিত হয়েছে স্থানীয় কাঁচামালের ভিত্তিতে। এই শিল্পের গুরুত্ব অনুভূত হয় '৬০-এর দশকের মধ্যবর্তীকালে। একটি ছোট ইস্পাত মিল, একটি মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী, জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট, একটি ডিজেল ইঞ্জিন কারখানা, একটি ড্রাইডক, দু'টি বড় শিপইয়ার্ড এবং সরকারী ও বেসরকারী খাতে কিছু হালকা প্রকৌশল শিল্প নিয়ে বাংলাদেশে ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্পের বুনিয়াদ গড়ে উঠে। বড় বড় কয়েকটি কারখানায় যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতা অকেজো থাকা সত্বেও ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প ১৯৭৯/৮০ সালে শিল্পখাতে যোজিত মূল্যের ১৯.৬ শতাংশ যুগিয়েছে। তবে বাকী অন্যান্য শিল্পখাতের বিকাশের সংগে গতি বজায় রাখতে না পারায় ১৯৮৩/৮৪ সালে এই শিল্পের অংশ ১৭.৫ শতাংশে নেমে যায়। ইস্পাত কারখানার উৎপাদন হ্রাসই এর প্রধান কারণ। ইস্পাত ও প্রকৌশল খাতের বিভিন্ন শিল্পের মিলিত উৎপাদনের সূচক ৬ নং সারণিতে প্রদর্শিত হলো।

সারণি ৬

ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্পের পণ্য উৎপাদনের সূচক

(১৯৭৩/৭৪=১০০)

	১৯৭৯/৮০	১৯৮৩/৮৪
১। লোহা ও ইস্পাত	১৭৪.৬	১২৭.৮
২। অবৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	২১৯.৫	৭২০.৮
৩। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	৩৪০.৬	৩৪৯.০
৪। পরিবহণ সরঞ্জাম	১৪১.২	৮৬.৯

৫৪। উল্লিখিত সারণি থেকে আভাষ পাওয়া যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উৎপাদন ক্ষমতার সার্বিক ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। যেমন—ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন ১৯৭৯/৮০ সালের ১.৩৩ লাখ টন থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১.০১ লাখ টনে হ্রাস পায়। মোট উৎপাদন ক্ষমতার নির্ধারিত মাত্রার ৪০ শতাংশ মাত্র কাজে লাগানো হয়; যদিও উৎপাদনের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২.২৫ লাখ টন। উৎপাদন হ্রাসের সাথে সাথে শ্রম উৎপাদনশীলতাও যে যথেষ্ট নেমে গিয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। অনুরূপভাবে ডিজেল ইঞ্জিনও উৎপাদিত হয় পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ২০,০০০ ইউনিটের মাত্র ৩১.৩ শতাংশ। আমদানিকৃত CKDs SKDs যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম থেকে বেসরকারী খাতে যে সব ইঞ্জিন সংযোজিত হয়েছে সেগুলো এই হিসেবের বহির্ভূত। বস্তুতঃ পক্ষে ইস্পাত উপ-খাতের উৎপাদন ক্ষমতা দীর্ঘ দিন ধরে অব্যবহৃত থাকছে। এই শিল্পের বুনিয়াদ ক্ষুদ্র হলেও, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বিপননের অভাবই এর প্রধানতম দুর্বলতা। তাই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে দ্বিতীয় পরিকল্পনা আমলে বেশ কয়েকটি সমীক্ষা চালানো হয় এবং কতকগুলো ব্যবস্থা নেয়া হয়। এই শিল্পের পরিসরে বেশ অনেকখানি ক্ষমতা অকেজো থাকা ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় এবং মুনাফাজনক ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই খাতের ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানোর প্রতি সর্বাপেক্ষা জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়া উৎপাদিত পণ্যের সুবিধাজনক বিপণনের উপযোগী একটি ধারা তৈরীর প্রয়োজনে প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় রদবদল করতে হবে। অতীতে যে সব ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে ও ত্রুটি হয়েছে সেগুলোর জন্য যেমন সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেয়ার দরকার, তেমনি একথাও স্বীকার করতে হবে যে, অতীতে স্থাপিত ঐ শিল্প ইউনিটগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিবর্তনেরও দায়ভোগ করেছে। এ ধরনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতিতে এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ খাতের ভবিষ্যৎ বিকাশ শুধু ঐ কারণে ব্যাহত হওয়া উচিত নয়। ১৯৬০ এর দ্বিতীয়ার্ধে সূচনা করা হলেও অর্থনৈতিক কাঠামোর অত্যন্ত জরুরী পরিবর্তন আনতে ইতিমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গেছে, যার ফলে বাঞ্ছিত স্থিতিশীল বিকাশ অর্জিত হয়নি। একারণে কৃষি খাতের প্রযুক্তিগত বিকাশ এখনও নিদারুনভাবে বহির্দেশীয় পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল হয়ে আছে। তৃতীয় পরিকল্পনা দারিদ্র সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণেই শুধু কর্মসংস্থানের উপর নয় বরং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের উপর মনোনিবেশ করেছে বলে অর্থনৈতিক তৎপরতার, এমনকি, প্রত্যন্ততম এলাকা তথা কুটির শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রয়োজন। এই প্রযুক্তিই একদিন শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেছিল। বাংলাদেশে এরকম একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি করতে হলে সুদক্ষ ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প গড়ে তোলা অপরিহার্য। তৃতীয় পরিকল্পনা একারণেই এই শিল্পের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার শুধু উন্নয়ন ও সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহারের উপরই গুরুত্ব আরোপ করছে না, শিল্পোন্নয়নের এই বুনিয়াদের ক্রমাগত সম্প্রসারণের

পরিকল্পনা ... গ্রন্থাগার ... বাংলাদেশ

ব্যবস্থাও রেখেছে। বাংলাদেশে মৌলিক ধাতব ও প্রকৌশল শিল্পের অর্থনৈতিক দিকটি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য পরিকল্পনাকালে এই খাতে বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তুলনামূলকভাবে সস্তা প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজপ্রাপ্যতা সুবিধানুযায়ী কাজে লাগিয়ে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রয়োজনীয় ধরনের ইস্পাত তৈরীর সুযোগ সুবিধাসহ একটি স্পঞ্জ লোহা তৈরীর কারখানা ও একটি সংকর ধাতুর ইস্পাত কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখা হচ্ছে।

৫৫। **সিমেন্ট শিল্প ঃ** সিমেন্ট অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে ১৯৭০ এর দশকে মাথাপিছু সিমেন্ট ব্যবহারের পরিমাণ কম বেশী অপরিবর্তিত ছিল। আমদানিই সিমেন্ট সরবরাহের প্রধান উৎস এবং এর আমদানি ১৯৭২/৭৩ সালে ৩.১৮ লাখ টন থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে ৪'৩৯ লাখ টন এবং তাথেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৯'৮৮ লাখ টনে উন্নীত হয়। দেশে দু'টি সিমেন্ট কারখানার একটি চলে আমদানি করা চুনা পাথরে এবং অন্যটি আমদানি করা ক্লিংকার দিয়ে। এ দু'টির মোট উৎপাদন বছরে ৩'০০ লাখ টনের কাছাকাছি। এভাবে সিমেন্টের মোট চলতি ব্যবহারের এক চতুর্থাংশ কোন মতে দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্পের সঙ্গে সিমেন্ট শিল্প মূল শিল্পের এক সারিতে থাকলেও তা মোট শিল্প উৎপাদনের কেবলমাত্র ০'৩৬ শতাংশের যোগান দেয়। আগামী বছরগুলোতে সিমেন্টের ব্যবহার দ্রুত বেড়ে যাবে। হিসেব করা হয়েছে, ১৯৮৯/৯০ সাল নাগাদ সিমেন্টের চাহিদা ১৬'০৫ লাখ টনে এসে দাঁড়াবে। এ কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অবশ্য সিমেন্ট বাংলাদেশে যেমন আমদানি করতে হয় তেমনি সিমেন্ট উৎপাদনের কাঁচামালও (চুনা পাথর) আমদানি করতে হয় বলে এ শিল্পে সংকট অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 'ওপেন মাইনিং' পদ্ধতিতে সহজে উত্তোলনযোগ্য কোন চুনাপাথর মজুদ নাই। বগুড়ার জয়পুরহাটে চুনা পাথরের এক বিপুল সঞ্চয় আছে তবে এই চুনাপাথর মাটি থেকে ৬০০ মিটার গভীরে অবস্থিত। এই চুনাপাথর তোলার জন্য ব্যাপক সমীক্ষা চালানো হয়েছে এবং একাজের জন্য আংশিক তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উন্নয়নে সিমেন্টের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে জয়পুরহাটের চুনাপাথর আহরণের উপর জোর তৎপরতা চালানো হবে। অবশ্য, এই প্রকল্পের সুফল পেতে বেশ দীর্ঘ সময় লেগে যাবে বলে দেশের পূর্ব সীমান্ত হয়ে ভারত থেকে আমদানি করা চুনাপাথরের ভিত্তিতে বার্ষিক ৫'০ লাখ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন সিমেন্ট কারখানা স্থাপনেরও পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ছাতক সিমেন্ট কারখানাটিও ভারতীয় চুনাপাথরে চলে। এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ বাড়িয়ে বার্ষিক ২'০ লাখ টন করার জন্য বর্তমানে কারখানার সম্প্রসারণ কাজ চলছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদার অনেকটা পূরণের জন্য এভাবে মোট সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৮৯/৯০ সালে ৮'৫ লাখ টনে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

৫৬। **কাগজের মন্ড ও কাগজ শিল্প ঃ** দেশে চারটি বড় মণ্ড ও কাগজের কল রয়েছে। এগুলোতে বিভিন্ন ধরনের কাগজের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১.২৩ লাখ টন। কারখানাগুলো পুরানো হয়ে এসেছে। তাই এগুলোতে এখন ১.১০ লাখ টন পর্যন্ত উৎপাদন সম্ভব। ১৯৮৪/৮৫ সালে মিলগুলোতে মোট প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে নিউজপ্রিন্টসহ ৯০ হাজার টন। অর্থাৎ সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতার ৮২ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছে। নিউজপ্রিন্টে বিপুল উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। তবে কাঁচামাল সরবরাহে (যেমন, নরম কাঠ, বাঁশ, নলখাগড়া, আখের ছিবড়া, ইত্যাদি) সংকটের কারণে লেখার কাগজের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে সাক্ষরতা বিস্তারের সংগে সংগে লেখা ও ছাপার কাগজের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও প্রচলিত কাগজ উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা নেই। বরং যেসব কাগজের কল রয়েছে তার কয়েকটিতে নতুন ধরনের কাগজ ও সংশ্লিষ্ট সামগ্রী উৎপাদনের সম্ভাবনা যাচাই চলবে এবং ঐসব নতুন সামগ্রীর বিশেষ মানগত চাহিদার কারণে নতুন ধরনের প্রয়োগ কৌশল প্রবর্তনের প্রয়োজন হবে। এ ধরনের এক নতুন সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে সিকিউরিটি প্রিন্টিং পেপার যা থেকে ব্যাংক নোট, ষ্ট্যাম্প, পাসপোর্ট ও নানা ধরনের সিকিউরিটি কাগজ তৈরী করা যাবে। এ উদ্দেশ্যে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক

ইতিমধ্যেই একটি সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করেছে। এছাড়া জিনিষপত্র মোড়ার কাগজ, সেনিটাইজড পেপার, সিগারেটের কাগজ এবং সেই সংগে অন্যান্য প্যাকিং কাগজের মত বিশেষ ধরনের কাগজের উৎপাদনে বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করা হবে। বিদ্যমান কাগজ কলগুলোর জন্য ১৯৮৯/৯০ সালের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে নিউজপ্রিন্টসহ ১.০ লাখ টন।

৫৭। **চামড়া শিল্প ঃ** বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণে চামড়া পাওয়া যায়। কিন্তু এই শিল্প প্রযুক্তিগত ও বিপণন সমস্যার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারের সুবিধা সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে, বেশীর ভাগ চামড়াই কাঁচা বা আধা পাকা চামড়া হিসেবে রপ্তানি হয় যার যোজিত মূল্য খুবই কম। 'ক্রাষ্ট' ও ফিনিশ্ড চামড়া উৎপাদন এবং রপ্তানি উৎসাহিত করার বিভিন্ন উদ্যোগ এযাবৎ খুব একটা সফল হয়নি। বাণিজ্যিক পরিমাণে চামড়াজাত সামগ্রী রপ্তানি তো দূরের কথা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রীর রপ্তানি মূল্য (৬.৫ কোটি মার্কিন ডলার) ও পরিমাণ (৮২,০০০ বর্গফুট) উভয় দিক থেকেই কমবেশী স্থির ছিল। ক্রাষ্ট বা ফিনিশ্ড চামড়া এবং সেই সংগে চামড়াজাত সামগ্রী রপ্তানি করলে আরও বেশী উপার্জন করা সম্ভব।

৫৮। ট্যানিং বা চামড়া পাকা করার শিল্প একান্ত প্রাথমিক স্তরে থাকলেও এই শিল্পের গুরুত্ব এখানেই নিহিত যে, ১৯৮৪/৮৫ সালে শিল্প উৎপাদনের ১১.৯ শতাংশ অবদান এসেছে চামড়া শিল্প থেকে এবং তুলা, পাট ও খাদ্য শিল্পের পর চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছে এই চামড়া শিল্প। উচ্চ মূল্য যোজক রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে গড়ে উঠার এবং দেশের রপ্তানি খাতে উৎপাদনে বড় রকমের অবদান যোগানোর ক্ষেত্রে চামড়া শিল্পের সম্ভাবনা বিস্তর। সক্রিয় বেসরকারী খাতের সহযোগিতায় এই শিল্পের উন্নয়নে তাই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উৎসাহ যোগানো হবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে, তৈরী সামগ্রী বিশ্ব বাজারে রুচি ও ফ্যাশনের দিক থেকে অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, তাই বিদেশে বিপণনের স্থায়ী সুযোগ বের করার উপর এই শিল্পের সাফল্য নির্ভর করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগকারী যাদের রপ্তানি বাজারে ভালো প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং পরিবর্তনশীল রুচি ও চাহিদায় দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম গবেষণা ও উন্নয়নমূলক আয়োজন রয়েছে তাঁদের সংগে যৌথ উদ্যোগে এই ধরনের শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখতে হবে।

৫৯। **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঃ** বছরব্যাপী বিভিন্ন মৌসুমের বেকারত্ব ও আংশিক বেকারত্ব কমানোর জন্য নয়, কৃষি কাজের ফাঁকে বিপুল সময়ের বেকারত্ব ঘোচানোর মত কর্ম সংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি ও সেই সুবাদে নারী-পুরুষ ও বয়ঃগোষ্ঠি নির্বিশেষে গ্রামের মানুষের আয় যথেষ্ট বাড়িয়ে দেবার জন্য ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের সম্ভাবনার দিগন্ত প্রসারিত করতে হলে অর্থনীতির এই উপখাতের পরিকল্পনা ও সমর্থনমূলক তৎপরতায় এর এক নয়া দৃষ্টিভংগী গ্রহণের প্রয়োজন হবে। এটা জানা কথা যে, গ্রামীণ শিল্প বিস্তারের মাধ্যমে যে উদ্দিষ্ট জনসমষ্টি উপকৃত হবেন, তাঁদের বেশীর ভাগই অভাবী, দুর্দশাগ্রস্ত শ্রেণীর লোক যারা তেমন একটা লেখাপড়া জানে না এবং খুব একটা নৈপুণ্যও তাদের নেই। তাঁদের রয়েছে পুঁজির বা তাৎপর্যপূর্ণ সম্পদের অভাব। উদ্যোগ ও উন্নয়ন চাঞ্চল্য যেখানে যৎসামান্য সেখানে এই শিল্পখাতে উন্নয়নের কাজটি বড় রকমের চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেবে।

৬০। ঐতিহ্যমণ্ডিত কারু ও কুটির শিল্প এখানে তুলনামূলকভাবে সুপরিচিত অংগন। তথাপি এখন সময়ের প্রেক্ষিতে নানা কারণে অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, তথাকথিত আধুনিকতার জোয়ার ও শহরে রুচির গ্রাম এলাকায় অনুপ্রবেশ, নিপুণ হস্তশিল্পীদের শহরে গমন, বড় কারুশিল্পের কদর ও বাজার সংকোচন, কম দাম বা উন্নতমানের কারণে ব্যাপক ভিত্তিতে উৎপাদিত সমজাতীয় বিকল্প পণ্যের সংগে প্রতিযোগিতা, কাঁচামালের অপ্রতুল সরবরাহ, পুঁজির অভাব আর কারু শিল্পী ও কারিগরদের উদ্ভাবনী প্রতিভা বা প্রয়াসের অভাব ইত্যাদি। অবশ্য, উপযুক্ত সমীক্ষা জরীপ ও অনুসন্ধান চালিয়ে যুক্তিসংগত নির্ভুলতা সহকারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প,

কুটির শিল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্রশিল্পের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসনের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেয়া যায়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলো অপেক্ষাকৃত কম পুঁজি বিনিয়োগে তুলনামূলক কম সময়েও সহজে অনেক বেশী কর্মসংস্থান ও রপ্তানি সম্ভাবনা সম্বলিত উন্নয়নের সম্ভাবনা নির্দেশ করে বলে স্বভাবতঃই পরিকল্পনা প্রণয়নে এগুলোর অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। তবে এই কাজে এই শিল্পগুলোকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ ও কাঁচামাল সরবরাহ করতে হবে। শিল্পীদের নতুন পণ্যের ডিজাইন ও ধারণা দিতে হবে এবং রপ্তানিসহ বিপননের সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে।

৬১। পক্ষান্তরে, গ্রামীণ শিল্পখাতে এমন নতুন নতুন তৎপরতার পরিকল্পনা ও উন্নয়ন করা শক্ত যেগুলো ব্যাপক কৃষি উৎপাদনের সহায়ক হবে, বর্ধিষ্ণু কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরবে, পল্লী এলাকায় বর্ধিত আয়জনিত ভোগ্যপণ্যের বাড়তি চাহিদা পূরণে মৌল প্রয়োজনের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করবে এবং একই সংগে কৃষি, ধড় আকারের শিল্প, নির্মাণ ও পরিবহনে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উৎপাদন করবে। চাষাবাদে আধুনিক প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার ও নিবিড় চাষাবাদের পরিবর্তনশীল পদ্ধতির কারণে জমি কর্ষণ, বীজবোনা, নিড়ানো, ফসলকাটা, ঝাড়াই ও মাড়াই, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কৃষিকাজের সংগে সম্পর্কিত কাজগুলো সম্পাদনের সময় কার্যতঃ ঘড়ির কাঁটায় বেঁধে দিতে পারে। এর ফলে অসংখ্য কর্মী সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও যান্ত্রিকীকরণের ফলে কৃষিকাজের বিশেষ কতকগুলো প্রক্রিয়া অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে। সেচ ইতিমধ্যেই যান্ত্রিকীকরণ করা হয়েছে। খাদ্যশস্যের বর্ধিত পরিমাণ উৎপাদনের প্রেক্ষিতে ফসলকাটার পর ঝাড়াই ও শুকানোর কাজ যান্ত্রিকীকরণ করার প্রয়োজন হয়ে উঠতে পারে। বর্তমান প্রান্তিক চাষাবাদ তুলে দিয়ে বাণিজ্যিক কৃষি প্রবর্তনের পরিকল্পনার আলোকে ও সর্বাঙ্গীন কৃষি উন্নয়নকে স্বনির্ভর করতে হলে পল্লী অঞ্চলে হালকা প্রকৌশল শিল্প গড়ে তুলতে হবে। উন্নয়নকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে দেশের প্রতিটি এলাকাকে তার নিজ কাঁচামাল, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাজারের সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে হবে। স্থানীয় সম্পদের সুবিধা সম্পর্কে তথ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এই সত্যতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ শিল্পের পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য তাই একটা নমনীয় দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করাই হবে যুক্তিসংগত। একারণে তৃতীয় পরিকল্পনায় অ-কৃষি কর্মসংস্থান উন্নয়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ে কর্মসংস্থান ও সম্পদকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য রয়েছে যাতে স্থানীয় চাহিদা ও সম্পদের এই সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। স্থানীয় কারু শিল্প ও নতুন ধরনের পণ্য সামগ্রী উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লিখিত কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শন ইউনিটও খোলার প্রয়োজন হতে পারে। গ্রামীণ প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধন ও উন্নয়নের জন্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ লাগসই প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউটকে আরও কার্যকর করে তুলতে হবে এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, তাঁত শিল্প বোর্ড, রেশম শিল্প বোর্ড এবং উপজেলা কেন্দ্রগুলোকে এর সম্প্রসারণ ইউনিট হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

৬২। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সদস্য করে একটি জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমন্বয় পরিষদ স্থাপন করতে হবে। এর কাজ হবে নীতি প্রণয়ন ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পগুলোর উন্নয়ন ও এগুলোতে অর্থ যোগানে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মতৎপরতার সমন্বয়সাধন এবং এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ ও সাফল্যের পূর্ণ মূল্যায়ন।

৬৩। উল্লিখিত প্রস্তাবমত একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়াও উপযুক্ত নীতি ব্যবস্থাদি ও উৎসাহদানমূলক সুযোগ সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করে এই উপখাতের আশু উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক অংগীকার প্রতিফলিত করতে হবে। এ ধরনের নীতি ও উৎসাহদানমূলক ব্যবস্থাদিতে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলো সন্নিবেশ করতে হবে:

(ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য রেয়াতি হারে ঋণদানের মত ব্যবস্থাসহ একটা আর্থিক উৎসাহদানমূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(খ) মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান যার সংগে অন্যান্য শিল্পের জোরদার সম্পর্ক আছে এমন ধরনের শিল্প পল্লী এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্থাপনের জন্য এই ধরনের শিল্পকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অনুরূপ উৎসাহদানমূলক সুবিধা দিতে হবে।

(গ) বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সংস্থাগুলোর মালামাল কেনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত ধরনের মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ঘ) সহজ কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে পর্যাপ্ত স্থানীয় ও বিদেশী মুদ্রার ঋণ, উদার ঋণ ইকুইটি অনুপাত এবং ন্যূনতম আইনগত আনুষ্ঠানিকতার সুবিধাসহ দিতে হবে।

(ঙ) উপরোক্ত বা একই ধরনের শিল্প ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সমিতি বা সমবায় গঠনকে এক সংগে বেশী পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয়, পণ্য বিপনন, বিজ্ঞাপন, পণ্য চিহ্নিতকরণ, মান অনুযায়ী বাচাই এর জন্য পণ্য পরীক্ষা এবং পরামর্শ সার্ভিস ইত্যাদির মত অভিন্ন সুযোগ সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎসাহিত করতে হবে।

অর্থ বরাদ্দ

৬৪। শিল্পখাতের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৫,৮০০ কোটি টাকার আর্থিক বরাদ্দ স্থির করা হয়েছে যার মধ্যে সরকারী খাতে বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৬০০ কোটি টাকা। সরকারী খাতে বরাদ্দের একাংশ বেসরকারী খাতের সঙ্গে ইকুইটি পার্টিসিপেশনের ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মৌলিক পুঁজি হিসেবে থাকবে। বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩,২০০ কোটি টাকা (শিল্প খাতে মোট বরাদ্দের প্রায় ৫৫ শতাংশ); এই বরাদ্দ ইন্ডিকেটিভ এবং বেসরকারী খাতের মেয়াদান্তিক পর্যালোচনা সাপেক্ষে রদবদলযোগ্য। সরকারী খাতের বরাদ্দে স্থানান্তরিত প্রকল্পগুলোর অংশ হচ্ছে ৫৫.৫ শতাংশ। অর্থাৎ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ ধরনের বিপুল সংখ্যক প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে উপখাতওয়ারী বরাদ্দ সারণি ৭ –এ প্রদত্ত হলো :

সারণি ৭

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উপ-খাতওয়ারী বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

উপ-খাত	সরকারী খাতে বিনিয়োগ		বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ		মোট	
	পরিমাণ	%	পরিমাণ	%	পরিমাণ	%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। পাট শিল্প	৬৪.০	২.৪	২৫.০	০.৮	৮৯.০	১.৫
২। বস্ত্র শিল্প	২৮৫.০	১০.৯	৫০০.০	১৫.৬	৭৮৫.০	১৩.৬
৩। অবৈদ্যুতিক, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ ধাতব ও হালকা প্রকৌশল শিল্প	৬৫.০	২.৫	২০০.০	৬.৩	২৬৫.০	৪.৬
৪। পরিবহণ সরঞ্জাম (জাহাজ নির্মাণসহ)	৪৫.০	১.৭	১২৫.০	৩.৯	১৭০.০	২.৯
৫। মূল ধাতুসমূহ (লোহা ও ইস্পাত)	১৪৫.০	৫.৬	৬৫০.০	২০.৩	৭৯৫.০	১৩.৭
৬। সার	১,১৩০.০	৪৩.৫	৮৫০.০	২৬.৫	১,৯৮০.০	৩৪.১
৭। সিমেন্ট	২৪৫.০	৯.৪	....	....	২৪৫.০	৪.২
৮। মণ্ড ও কাগজ	৭৫.০	২.৯	৫০.০	১.৬	১২৫.০	২.২
৯। রসায়ন ও ভেষজ	২৫.০	১.০	২০০.০	৬.৩	২২৫.০	৩.৯
১০। কাঁচ ও সিরামিক	১৫.০	০.৬	৫০.০	১.৬	৬৫.০	১.১

সারণি ৭ (ক্রমশঃ)

উপ-খাত	সরকারী খাতে বিনিয়োগ		বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ		মোট	
	পরিমাণ	%	পরিমাণ	%	পরিমাণ	%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১। চামড়া ও চামড়া সামগ্রী	২০·০	০·৮	১০০·০	৩·১	১২০·০	২·১
১২। চিনি	২০৫·০	৭·৮	২৫·০	০·৮	২৩০·০	৪·০
১৩। খাদ্য ও সমজাতীয় পণ্য	২১·০	০·৮	৭৫·০	২·৩	৯৬·০	১·৭
১৪। খনিজ ও খনিজভিত্তিক শিল্প	২৫·০	১·০	....	....	২৫·০	০·৪
১৫। কাঠ, বাঁশ, বেত ও নারকেলের ছোবড়াজাত পণ্য	১০·০	০·৪	১০০·০	৩·১	১১০·০	১·৯
১৬। মুদ্রণ	১০·০	০·৪	৫০·০	১·৫	৬০·০	১·০
১৭। কৃষি সহায়ক ক্ষুদ্র গ্রামীণ শিল্প	৬৫·০	২·৫	২০০·০	৬·৩	২৬৫·০	৪·৬
১৮। রপ্তানি উন্নয়ন	২৫·০	১·০	....	....	২৫·০	০·৪
১৯। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প উন্নয়ন	৬০·০	২·৩	....	....	৬০·০	১·০
২০। অন্যান্য শিল্প উন্নয়ন	৬৫·০	২·৫	....	....	৬৫·০	১·১
মোট :	২,৬০০·০	১০০·০	৩,২০০·০	১০০·০	৫,৮০০·০	১০০·০

৬৫। সরকারী খাতে বরাদ্দের প্রায় ৫৬ শতাংশ স্থানান্তরিত প্রকল্পগুলোর জন্য নির্দিষ্ট। প্রায় ২১ শতাংশ নতুন শিল্প উৎপাদন ক্ষমতা স্থাপনে বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। অবশিষ্ট বরাদ্দ নতুন সামঞ্জস্য বিধান, আধুনিকীকরণ, পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণমূলক প্রস্তাবগুলোর জন্য (১২ শতাংশ) এবং সরকারী খাত কর্তৃক গৃহীত বেসরকারী খাতের শিল্পসমূহের উন্নয়ন সহায়তার (১১ শতাংশ) জন্য সরকারী খাতের উল্লেখিত শিরোনামগুলোর জন্য ব্যয় বরাদ্দ নিম্নে প্রদত্ত হল:

		কোটি টাকায় বরাদ্দ
(১)	স্থানান্তরিত প্রকল্পসমূহ	১,৪৪৩.৫
(২)	নতুন প্রকল্পসমূহ	৫৫৬.৫
(৩)	নতুন সামঞ্জস্য বিধান, আধুনিকীকরণ, পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণমূলক প্রস্তাবসমূহ	৩১০.০
(৪)	উন্নয়ন সহায়তামূলক/উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	২৯০.০
	মোট :	২,৬০০.০

৬৬। তৃতীয় পরিকল্পনার নির্বাচিত প্রধান প্রধান শিল্পপণ্যের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৮-এ প্রদত্ত হল:

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সারণি ৮

প্রধান প্রধান শিল্পপণ্যের ভিত্তি উৎপাদন ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

পণ্য ও পণ্যসামগ্রী	একক	ভিত্তি উৎপাদন (১৯৮৪/৮৫)			উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৯/৯০)		
		সরকারী	বেসরকারী	মোট	সরকারী	বেসরকারী	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। পাটজাত পণ্য	'000' মেট্রিক টন	৩২৭'০০	২৩৪'০০	৫৬১'০০	৩৬০'০০	২৯০'০০	৬৫০'০০
২। তুলাজাত সুতা	মিলিয়ন কেজি	৩৫'৫৯	২৩'৭৭	৫৯'৩৬	৫৫	৪০	৯৫
৩। কাপড়	মিলিয়ন মিটার	৩৯'৮১	৭৩১'১৪	৭৭০'৯৫	৭৫	১,১৪০	১,২১৫
(ক) বড় মিলে তৈরী	ঐ	৩৯'৮১	৪৭'১৪	৮৬'৯৫	৭৫	১০০	১৭৫
(খ) অন্য বিদ্যুৎচালিত তাঁতে তৈরী	ঐ	....	১৮১'০৮	১৮১'০৮	....	২৯০	২৯০
(গ) হস্তচালিত তাঁতে তৈরী	ঐ	....	৫০২'৯২	৫০২'৯২	....	৭৫০	৭৫০
৪। চিনি	'000' মেট্রিক টন	৮৮'০০	....	৮৮'০০	২০০	২৫	২২৫
৫। সিমেণ্ট	ঐ	২৪০'০০	....	২৪০'০০	৮৫০	...	৮৫০
৬। সার	ঐ	৮০৬'০০	....	৮০৬'০০	১৭০০	৪৫০'০০	২,১৫০
৭। কাগজ	ঐ	৩৯'০০	....	৩৯'০০	৪৫	১০	৫৫
৮। নিউজপ্রিণ্ট	ঐ	৫১'০০	....	৫১'০০	৫০	...	৫০

সারণি ৪ (ক্রমশঃ)

পণ্য ও পণ্যসামগ্রী	একক	ভিত্তি উৎপাদন (১৯৮৪/৮৫)			উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৯/৯০)		
		সরকারী	বেসরকারী	মোট	সরকারী	বেসরকারী	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯। রাসায়নিক পণ্য	কোটি টাকা	....	....	১,০৪৪·৭০	....	....	১,৩০২·২০
১০। ভেষজ পণ্য	ঐ	....	১৪৪·৫০	১৪৪·৫০	....	১৮০·০০	১৮০·০০
১১। মূল ধাতু (ইস্পাত)	'০০০' মেট্রিক টন	১০১·০০	....	১০১·০০	১৯০·০০	৪০·০০	২৩০·০০
১২। ধাতব সামগ্রী	কোটি টাকা	৭১·৪৭	১৮৯·১৭	২৬০·৬৪	....	....	৫২৪·৮২০
১৩। যন্ত্রপাতি	ঐ	৩২·৮০	১৬৪·৬০	১৯৭·৪০	....	....	৩১২·০০
১৪। পরিবহণ সরঞ্জাম	ঐ	৪০·৫৮	৬৬·৭৭	১০৭·৩৫	....	....	১৭·৯০
১৫। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	ঐ	....	৪০০·০০	৪০০·০০	....	....	৬৪৪·২০
১৬। কাঠ, বাঁশ, বেত ও অন্যান্য	ঐ	....	....	১,৪৬৭·৬৫	....	....	২,০৭২·৪০
১৭। সিগারেট	কোটি শলা	....	১,৫৪৮·৬০	১,৫৪৮·৬০	....	....	১,৮৫৯·৭০

৬৭। সরকারী খাতের স্থানান্তরিত ও নতুন প্রকল্পগুলোর জন্য প্রতিষ্ঠান-ওয়ারী বরাদ্দ নীচের সারণিতে প্রদত্ত হল:

সারণি ৯

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী খাতে প্রতিষ্ঠান-ওয়ারী বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

প্রতিষ্ঠান	স্থানান্তরিত প্রকল্প	নতুন প্রকল্প	মোট
১। বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা	১০·০০	৫৪·০০	৬৪·০০
২। বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থা	১৬৯·০০	৫·০০	১৭৪·০০
৩। বাংলাদেশ তাঁত শিল্প বোর্ড	২·০০	৫০·০০	৫২·০০
৪। বাংলাদেশ রেশম শিল্প বোর্ড	৪·০০	২৫·০০	২৯·০০
৫। বস্ত্র দপ্তর	....	৩০·০০	৩০·০০
৬। বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা	১০৮০·০০	৪৩০·০০	১৫১০·০০
৭। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা	১৫·০০	২৪০·০০	২৫৫·০০
৮। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা	৯০·০০	১৩৫·০০	২২৫·০০
৯। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা	২৩·০০	৯৭·০০	১২০·০০
১০। বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা	....	১০·০০	১০·০০
১১। মুদ্রণ ও স্টেশনারী বিভাগ	৯·৫০	....	৯·৫০
১২। বিটাক	....	৭·০০	৭·০০
১৩। বিএমডিসি	৩·০০	১·৫০	৪·৫০
১৪। আই বিএ	৮·০০	....	৮·০০
১৫। ইপিজেডএ	....	২৫·০০	২৫·০০
১৬। আইএসিবি	....	০·৫০	০·৫০
১৭। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা	২০·০০	....	২০·০০
১৮। বিএমইডিসি (বর্তমানে পেট্রোবাংলার সাথে একত্রিত)	৫·০০	২০·০০	২৫·০০
১৯। পরিকল্পনা বিভাগ (টিআইপি)	৫·০০	....	৫·০০
২০। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	...	২০·০০	২০·০০
২১। অন্যান্য (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিল্প বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন (শিল্প বিভাগ), ডিএফআইএস ইত্যাদি)	....	৬·৫০	৬·৫০
মোট :	১৪৪৩·৫০	১১৫৬·৫০	২৬০০·০০

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একাদশ অধ্যায়

জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ

বাংলাদেশে মাথাপিছু বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহারের হার প্রায় ৪১ কেজি তেলের সমপরিমাণ যা নিম্ন আয়ের দেশগুলোর গড় ব্যবহারের প্রায় ১৫% মাত্র। জ্বালানী ব্যবহারের এই নৈরাশ্যজনক স্বল্পতা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার স্বার্থে জরুরীভিত্তিতে জ্বালানী সরবরাহ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকেই তুলে ধরে। তাই তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির পরেই জ্বালানী সম্পদের উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

১'২। জ্বালানী সরবরাহের বর্তমান অবস্থা কৃষি ও শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই সন্তোষজনক নয়। জ্বালানী সম্পদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের উচ্চ পুঁজি ঘনত্বের পাশাপাশি সম্পদের সীমাবদ্ধতা, বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা এবং সম্পদের দুর্বল ব্যবস্থাপনাই এর কারণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেশে জ্বালানী সম্পদের ভিত্তি সীমিত। দেশে বাণিজ্যিক জ্বালানীর একমাত্র প্রাথমিক উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস যার পরিমাণ আনুমানিক ১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। পানি শক্তি সীমিতই রয়ে গেছে। কয়লা মজুদের (জামালগঞ্জের কয়লাক্ষেত্র) আনুমানিক পরিমাণ প্রায় ১ বিলিয়ন টন হলেও গভীরতার (প্রায় ১০০০ মিটার) জন্য এখন পর্যন্ত উত্তোলন করা সম্ভবপর হয়নি। সম্প্রতি পার্বতীপুর এলাকায় ১৭০—৩৫০ মিটার গভীরতায় প্রায় ৫০ মিটার পুরু গণ্ডোয়ানা কয়লার একটি ঘন মজুদের সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু এর মজুদের পরিমাণ এখনো নির্ণয় করা যায়নি। পিট কয়লার মজুদের (খুলনা ও ফরিদপুর জেলায়) পরিমাণ আনুমানিক ৬০০ মিলিয়ন টনের মতো কিন্তু এর উত্তোলন আর্থ-কারিগরী নিরীখে এখনো নির্ধারিত হয়নি। বাণিজ্যিক জ্বালানী সম্পদের সীমিত ভিত্তি ছাড়াও গ্যাসের মজুদ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এর ব্যবহার ট্রান্সমিশন সমস্যায় ভুগছে। অন্যদিকে দেশে জনসংখ্যার চাপ ও বাণিজ্যিক জ্বালানীর উচ্চ মূল্য এই উভয় কারণেই জ্বালানী কাঠ ও কৃষিজাত অপচয় এর ন্যায় জ্বালানীর প্রচলিত উৎসসমূহ প্রবল চাপের সম্মুখীন। জ্বালানী সরবরাহের এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ সিংহভাগ (৭০—৮০%) এ উৎসসমূহ হতে আসে যা অর্থনীতির সনাতন প্রকৃতিরই ইংগিত বহন করে।

১'৩। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সাম্প্রতিককালে বাণিজ্যিক জ্বালানীর চাহিদা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাথাপিছু বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহার ১৯৭২ সালের ২৪ কেজি তেলের সমপরিমাণ থেকে বেড়ে ১৯৮০ সালে ৩২'৮ কেজি এবং ১৯৮৫ সালে ৪১'৩ কেজিতে উঠে আসে। ১৯৯০ সাল নাগাদ এই ব্যবহার স্তর আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮'৩ কেজি তেলের সমপরিমাণ পৌঁছবে। বাণিজ্যিক জ্বালানী উন্নয়নে জোর দেয়া সত্ত্বেও প্রধানতঃ সনাতন জ্বালানীর উপর পল্লীর জনসাধারণের নির্ভরশীলতা অব্যাহত থাকবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সনাতন জ্বালানী শক্তির চাহিদা ও বৃদ্ধি পাবে। পরিণামে গ্রামীণ বন ও সংরক্ষিত বন থেকে আরও অধিক হারে বৃক্ষ উজাড় হবে এবং বিদ্যমান দুর্বল পরিবেশগত ভারসাম্যতাকে বিপদজনক করে তুলবে।

১'৪। গ্যাস বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক জ্বালানী শক্তির উৎস বিধায় এবং ক্রমবর্ধমান জ্বালানী চাহিদায় আমদানীতব্য তরল জ্বালানীর হিস্যা কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের জ্বালানী নীতিতে মূলতঃ এর দ্রুততর ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রসমূহ দেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থান এবং যমুনা নদী দ্বারা পশ্চিমাঞ্চল বিচ্ছিন্ন থাকার দরুণ গ্যাসের ব্যবহার পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সীমিত রয়ে গেছে। এ যাবৎ দেশব্যাপী কোন সমন্বিত গ্যাস ট্রান্সমিশন ও বিতরণ ব্যবস্থা তৈরী করা যায়নি, তদুপরি দেশটির নদীমাতৃকতা ট্রান্সমিশন ব্যবস্থাকে আরও পুঁজিঘন উদ্যোগে পরিণত করেছে। দেশের দূরবর্তী স্থানসমূহে বিতরণ করার জন্য শক্তি উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার এই সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের একটি বিকল্প কৌশল। ইতিমধ্যেই ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাসভিত্তিক বৈদ্যুতিক জ্বালানী সরবরাহের কাজে একটি বৈদ্যুতিক আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর উন্নীতকরণ ও পল্লী বিদ্যুতায়নের সমন্বয়ে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ নাগাদ বাণিজ্যিক জ্বালানীর ব্যবহারের কাঠামোতে পরিবর্তন আসতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনা প্রাকৃতিক গ্যাসের অবদান ১৯৮৪/৮৫ সালের ৫৬'৩% থেকে ১৯৮৯/৯০ সাল নাগাদ ৬৮'২ এ উন্নীত করা এবং আমদানীতব্য তরল জ্বালানী ৩৭% থেকে ২৫% এ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ১নং সারণিতে বাণিজ্যিক জ্বালানীর প্রাথমিক উৎসসমূহের প্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখানো হলো।

সারণি ৯

বাণিজ্যিক জ্বালানীর ব্যবহারের ধাঁচ, ১৯৮০—৯০

	উৎসসমূহ	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)			১৯৮৪/৮৫ (প্রকৃত)			১৯৮৯/৯০ (লক্ষ্যমাত্রা)		
		ট্রেড ইউনিটে পরিমাণ	তেলের সম পরিমাণ হিসাবে (মিলিয়ন টন)	শতাংশে	ট্রেড ইউনিটে পরিমাণ	তেলের সম পরিমাণ হিসাবে (মিলিয়ন টন)	শতাংশে	ট্রেড ইউনিটে পরিমাণ	তেলের সম পরিমাণ হিসাবে (মিলিয়ন টন)	শতাংশে
১।	প্রাকৃতিক গ্যাস	৪৪'৫৩ বিলি ঘনফুট	১'০৪২	৩৬'৫	৯৪'৬ বিলি ঘনফুট	২'৩১	৫৬'৩	১৮০'০ বিলি ঘনফুট	৪'৩৯	৬৮'২
২।	পেট্রোলিয়াম	১'৫২ মিলিটন	১'৫২০	৫৩'২	১'৫০ মিলিটন	১'৫০	৩৬'৬	১'৬০ মিলিটন	১'৬০	২৪'৮
৩।	কয়লা	২৪৭,০০০ টন	০'১৩৯	৪'৯	১২৫,০০০ টন	০'০৮	২'০	২৫০,০০০ টন	০'১৬	২'৫
৪।	পানি বিদ্যুৎ	৫৮৬ মিলি কিলোওয়াট ঘণ্টা	০'১৫৫	৫'৪	৮০০ মিলি কিলোওয়াট ঘণ্টা	০'২১১	৫'১	১১০০ মিলি কিলোওয়াট ঘণ্টা	০'২৯১	৪'৫
	মোট :	—	২'৮৫৬	১০০	—	৪'১০১	১০০	—	৬'৪৪১	১০০
	জনসংখ্যা (মিলিয়নে)		৮৭'২	—	—	৯৯'২	—	—	১১০'৫	—
	মাথাপিছু ব্যবহার (কেজি তেলের সমপরিমাণে)		৩২'৭৫	—	—	৪১'৩৫	—	—	৫৮'২৯	—

মাথাপিছু বাণিজ্যিক জ্বালানীর ব্যবহার তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের হারেই (৮.৭%) বাড়বে বলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গ্যাস ব্যবহারের প্রবৃদ্ধি ১৬ শতাংশের স্থলে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৩.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমেই এটা অর্জিত হবে। খাদ্য ও কৃষি উৎপাদনে এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে জ্বালানী ঘন প্রযুক্তি প্রবর্তনের সাথে সাথে পল্লী বিদ্যুতায়ন অগ্রাধিকার পেতে থাকবে। গৃহস্থালী রান্নাবান্না ও অন্যান্য প্রয়োজনে এবং পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা পরিহার করার লক্ষ্যে সনাতন জ্বালানী উৎস্য উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন হবে। এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি দক্ষতার সাথে প্রাথমিক জ্বালানীকে মাধ্যমিক জ্বালানীতে রূপান্তর ও চূড়ান্ত চাহিদা পূরনে জ্বালানী রূপান্তরের সর্বপর্যায়ে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর দক্ষ ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হবে।

১.৫। প্রাকৃতিক গ্যাস-এর ব্যবহার অনুমিত হারে বৃদ্ধি পেলে আবিষ্কৃত গ্যাসের বর্তমান সম্ভাব্য মজুদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারকল্পে নতুন অংশীদার করার জন্য শতাব্দীর শেষ নাগাদ মাত্র পাওয়া যাবে। ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে দেশের জ্বালানী ভিত্তি প্রসারিত করার জন্য পারমাণবিক জ্বালানীসহ অন্যান্য বিকল্প উৎসের সন্ধান করতে হবে। নিঃশেষিত গ্যাস মজুদের বিকল্প উৎসের সন্ধানে ভূতাত্ত্বিক জরিপ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। আন্তর্জাতিক জ্বালানী অবস্থার আলোকে কয়লা ক্ষেত্রসমূহের উন্নয়নের সম্ভাবনার উপর দৃষ্টি রাখতে হবে। জ্বালানী খাতের পুঁজি ঘনত্ব এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রতিবন্ধকতার দরুন, উৎপাদন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে।

১.৬। জ্বালানী সম্পদের উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে ৫৬৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এটা সরকারী খাতে মোট বরাদ্দের ২২.১০%। এই বরাদ্দের মধ্যে বিদ্যুৎখাতে ৪২৮৫ কোটি টাকা, তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে ১২৯৫ কোটি টাকা এবং সনাতন নতুন ও নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য ২০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। বাদবাকী ৭৫ কোটি টাকা জ্বালানী খাতের জন্য থোক বরাদ্দ হিসাবে রাখা হয়েছে। অধিকন্তু উৎপাদন অংশীদারিত্বের চুক্তির ভিত্তিতে (পি, এস, সি) হাইড্রোকার্বন (তৈল, গ্যাস) অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জ্বালানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং বন খাতের কর্তৃত্বাধীনে নতুন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎসের উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালানো হবে। শেষোক্ত খাতে কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে ৩৯২ কোটি টাকার বিনিয়োগ কর্মসূচী রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিদ্যুৎ উন্নয়ন

১.৭। আধুনিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সর্বাধিক সুবিধাজনক জ্বালানী হওয়ায় গত দেড় দশকে বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ বেশ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি মাথাপিছু এর উৎপাদন বাংলাদেশে নীচু স্তরেই রয়ে গেছে। ক্যাপটিভ জেনারেশন বাদে ১৯৮৪/৮৫ অর্থ বছরে এর পরিমাণ ছিল ৪৬ কিলোওয়াট ঘণ্টা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯৯০ সালের জুন মাস নাগাদ ৮০ কিলোওয়াট ঘণ্টায় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যা পরিকল্পনাকালে বার্ষিক ১২% বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন—একটি পর্যালোচনা

১'৮। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফলে সর্বোচ্চ চাহিদা (পিক ডিমান্ড) প্রাক্ স্বাধীনতা সময়ের (১৯৭০) ২২৫ মেগাওয়াট থেকে ৩০ মেগাওয়াটের মতো নাজুক পর্যায়ে নেমে আসে। সুতরাং স্বাধীনতার পর বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বাসনই তাৎক্ষণিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭২/৭৩ সালের শেষ নাগাদ সর্বোচ্চ চাহিদা ২২২ মেগাওয়াটে পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বাসনের পর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩—৭৮) ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮—৮০) সংহতকরণ ও উন্নয়নে ব্যাপৃত ছিলো। যুদ্ধপূর্ব সময়ের কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প এ সময় সমাপ্ত করা হয়। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছে: (১) খুলনা ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (২) ঘোড়াশাল ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৩) ঈশ্বরদী-সৈয়দপুর ট্রান্সমিশন লাইন এবং (৪) আশুগঞ্জ-জামালপুর ট্রান্সমিশন লাইন। এই সময়কালে যে কয়েকটি নতুন প্রকল্প গৃহীত ও সমাপ্ত হয় সেগুলো ছিল ভেড়ামারা ৬০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন এবং ৫৬ মেগাওয়াট খুলনা (ভাসমান) পাওয়ার প্লান্ট। ফলে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ৫৪৫ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮২২ মেগাওয়াট-এ উন্নীত হয়, যখন সর্বোচ্চ চাহিদা ২২২ মেগাওয়াট থেকে ৪৬২ মেগাওয়াট-এ দাঁড়ায়। কিন্তু চাহিদা উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায় (যথাক্রমে বার্ষিক ১১% ও ৬% হারে)। এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ছিল ব্যাপক গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের উদ্দেশ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সৃষ্টি।

১'৯। চাহিদা এবং উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের ফলে ১৯৮০/৮১ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে সূচিত তৃতীয় পর্যায়ের উন্নয়নকালে দ্রুত সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ছিল পূর্ব-পশ্চিম বৈদ্যুতিক আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যা পূর্বাঞ্চলে উৎপাদিত গ্যাসভিত্তিক সস্তা জ্বালানী পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তর সম্ভবপর করে তোলে। পাঁচটি বিদ্যুৎ উৎপাদনক প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ এই সময়ে সম্পন্ন হয় যেগুলোর মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৩৩০ মেগাওয়াট। তবুও উৎপাদন ক্ষমতা চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় পেছনেই পড়ে থাকে। সরবরাহ বৃদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায় ছিল সম্পদের অভাব যা বিপুল সিস্টেম লস (অবিলকৃত) এবং বিদ্যুতের স্বল্পমূল্যবৃদ্ধির দরুণ আরো প্রকট হয়ে উঠে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ নাগাদ সিস্টেম লস এর পরিমাণ ৩৭'৫ শতাংশে দাঁড়ায়। কারিগরি ক্ষতি এবং কেন্দ্রের ব্যবহার বাদ দিলেও নীট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭%-এ। তৎকালীন মূল্যে যার আর্থিক পরিমাণ ছিল ১১১ কোটি টাকা। অপরদিকে বিদ্যুতের গড় মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ইউনিটের দাম ০'৬৩ টাকা থেকে ১'৫০ টাকায় পৌছে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই বৃদ্ধি ছিল ১১৮% যেখানে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছিল ৭৫% (পুঞ্জীভূত)। এই খাতে স্থানীয় সম্পদ আহরণে ব্যর্থতা বিদেশী সাহায্য ব্যবহারকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে টাকার অংশ ১৯৭৩/৭৪ সালের ৫৭% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৩০% এ হ্রাস পাওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়েছে।

১'১০। সার্বিকভাবে সম্পদের সীমাবদ্ধতার মাঝে, বিনিয়োগ কর্মসূচীতে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের চেয়ে জরুরী অবস্থার মোকাবেলাই অধিক গুরুত্ব পায়। ফলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আকস্মিক ভারসাম্যহীনতার শিকার হয়। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা থেকে যায় যা একটি আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থার অভাবে ঘাটতিপূর্ণ পশ্চিমাঞ্চলে কিংবা উৎপাদন ক্ষমতার সাথে সংগতিপূর্ণ উন্নত বিতরণ ব্যবস্থার অভাবে পূর্বাঞ্চলেও ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। উভয় কারণে লোড বৃদ্ধি চাপা থেকে যায়। অতি সম্প্রতি আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর এবং বিতরণ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নতির ফলে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু কয়েকটি বৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা পেছনে পড়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে পুনরায় লোড বৃদ্ধির একই অবদমন দেখা দেয়। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ বিক্রয়ের প্রবৃদ্ধির হার ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

১'১১। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জুন ১৯৮৫ এর শেষ নাগাদ ৯২২ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের জন্য যে কয়টি প্রধান ভৌত লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয় সেগুলো হলো, ১৩৪২ মেগাওয়াট উৎপাদন সামর্থ্য (সর্বোচ্চ সামর্থ্য), ২৪০৭ কিলোমিটার ট্রান্সমিশন লাইন, ৫১.৪১৪ কিলোমিটার ডিষ্ট্রিবিউশন লাইন (৩৩ কেভি এবং তার নীচে)। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে ২,১৩০ কোটি টাকার (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে ১,৪৩৭ কোটি টাকা) বিনিয়োগ কর্মসূচী নেয়া হয়েছিল। প্রকৃত বিনিয়োগ হয় ২,০১৭ কোটি টাকা। অবশ্য আন্তঃ উপখাত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বিতরণ উপখাত ১১৪ কোটি টাকা বেশী বরাদ্দ পায়। আর্থিক বিনিয়োগের তুলনায়, শুধুমাত্র ট্রান্সমিশন লাইন ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ভৌত সাফল্য স্থিতাবস্থা হতে অধিক হলেও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম থেকে যায়। নীচে ২ নং সারণিতে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ভৌত সাফল্য দেখানো যাচ্ছে:

সারণি ২

ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্যের তুলনামূলক চিত্র

বিস্তারিত	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫	
	(প্রকৃত)	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত
১। উৎপাদন সামর্থ্য (মেগাওয়াট)	৬২৪	১,৩৪২	১,০২৮
২। ট্রান্সমিশন লাইন (কিলোমিটার)	১,৭৬২	২,৪০৭	২,৪২৩
৩। ৩৩ কেভি লাইন (কিলোমিটার)	৪,৮৫১	৮,০৬৯	৭,৭২২
৪। ডিষ্ট্রিবিউশন লাইন (কিলোমিটার)	**১৫,০৯০**	**৪০,৩৪৬**	**৩২,০৭১**
(ক) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১৪,২৮০	২৭,৯৫৬	২০,৩৭৪
(খ) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	৮১০	১২,৩৯০	১১,৬৯৭
৫। বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা :	**২,৯৮১**	**২৫,৯৮১**	**৭,৮৮৮**
(ক) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	২,৯৮১	৭,৯৮১	৩,২৮৮
(খ) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	—	১৮,০০০	৪,৬০০
৬। জ্বালানী উৎপাদন (GWH)	২,৩৩৩	৪,৫০৭	৪,৩৪৫
৭। জ্বালানী বিক্রয় (GWH) (বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড)	১,৪০৬	৩,৪৭২	২,৮৪৩
৮। ব্যবহারকারীদের সংখ্যা (বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড)	৫২২,০০০	৬৪৭,০০০	৮১১,০০০

উৎপাদন ক্ষমতা কম হওয়ার একটি প্রধান কারণ হ'ল কয়েকটি বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিলম্ব, যেমন ২১০ মেগাওয়াট ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ১৫০ মেগাওয়াট আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। উৎপাদন ক্ষমতা কম হওয়া ছাড়াও অত্যধিক সিস্টেম লস এর কারণে বৈদ্যুতিক জ্বালানী বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার নীচে রয়ে যায়।

আমদানি বিকল্প ও উৎপাদন খরচ কমানো

১.১২। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমদানিতব্য জ্বালানীর পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিলো। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিও সাধিত হয়েছিলো। আমদানিকৃত জ্বালানী ১৯৭৯/৮০ সালে মোট উৎপাদনের ২৬% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২০%-এ নেমে আসে এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়ে ৫০% থেকে ৬৪%-এ দাঁড়ায়। আমদানীকৃত উচ্চ মূল্যের জ্বালানীর বিকল্প হিসেবে সস্তা গ্যাসের ব্যবহার বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমিয়ে এনেছে। আন্তঃসংযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তরের ফলে ইউনিট প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ১৯৮২ সালের ০.৫৬ টাকা থেকে কমে ১৯৮৫ সালে ০.৫০ টাকায় নেমে আসে।

বিদ্যুতের বহুমুখী ব্যবহার

১.১৩। ১৯৮৪/৮৫ সালের শেষ নাগাদ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৬৪,০০০ যা ১৯৭৯/৮০ সালে ছিল ৫২২,০০০। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ নাগাদ জনসংখ্যার ৬% বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা পায় যা ১৯৭৯/৮০ সালে ছিল ৪%। মূলতঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে। ৭৩টি উপজেলাব্যাপী সক্রিয় বিদ্যুৎ সরবরাহ সমবায় সমিতির (পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি) সংখ্যা ১৯-এ দাঁড়ায়। প্রায় ৯০% সংযোগ ছিল গৃহস্থালী কিন্তু গৃহস্থালী বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল মোট বিক্রয়ের মাত্র ২৩%। মোট বিক্রয়ের শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহার থেকে আসে ৫৩% এবং বাকী ২৪% আসে সেচ কার্যে ব্যবহার থেকে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালের ১৪০৩ GWH থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২৮৪০ GWH-এ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবস্থাধীনে গৃহস্থালী, শিল্প, বাণিজ্যিক, সেচ ও অন্যান্য ব্যবহারকারীদের বিদ্যুৎ ব্যবহারের বণ্টন ১৯৭৯/৮০ সালের যথাক্রমে ২০%, ৬৫.৮%, ১১.৫%, ২.৬% এবং ০.১% থেকে বদলে ১৯৮৪/৮৫ সালে যথাক্রমে ২৩.৭%, ৬০.২%, ৯.৪%, ২.১% এবং ৪.৬% এ দাঁড়ায়। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর সেচ নলকূপ বিদ্যুতায়নের সাফল্য থেকে এটা অনুমিত হয় যে ১৯৮৪/৮৫ সালে মোট ১৪,৮০০টি নলকূপ (গভীর ও অগভীর নলকূপ এবং লো-লিফট পাম্প) বিদ্যুতের সাহায্যে চালিত হয়।

নির্ভরশীলতার উন্নয়ন

১.১৪। বিশেষতঃ পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা উন্মুক্ত হবার পর পশ্চিম গ্রীডে ব্যর্থতার হার যথেষ্ট কমে যাওয়ায় এ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়। নীচে তা দেখানো হল:

সারণি ৩

ব্যবস্থা নির্ভরশীলতা (সিস্টেম রিলায়েবিলিটি)

বিষয়	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪	১৯৮৫
১। আংশিক গ্রীড ব্যর্থতা	১৯৪	৩৭০	২৫৭	৫২	১৪৪
২। মোট গ্রীড ব্যর্থতা	১৬	১০	১	শূন্য	শূন্য

কিন্তু উৎপাদন ঘাটতির দরুন মাঝে মাঝে লোড শেডিং এর আশ্রয় নেয়া হতো।

সিস্টেম লস

১.১৫। এসব উন্নতি সত্ত্বেও সিস্টেম লস এর ক্ষেত্রে খাতটির তৎপরতা হতাশাব্যঞ্জক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সিস্টেম লস এর পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালের ৪০% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২৩%-এ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, কিন্তু এক্ষেত্রে খুব নগণ্য সাফল্য অর্জিত হয়। এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাফল্য নীচের সারণিতে দেয়া হলো:

সারণি ৪

সিস্টেম লস

বছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত
১৯৭৯/৮০	৩৪%	৪০.০০%
১৯৮০/৮১	৩১%	৩৪.৬৫%
১৯৮১/৮২	২৯%	৩৩.২০%
১৯৮২/৮৩	২৭%	৩০.২২%
১৯৮৩/৮৪	২৫%	৩৪.২৪%
১৯৮৪/৮৫	২৩%	৩১.৫০%

১৯৮৪/৮৫ সালের বিদ্যমান কর ব্যবস্থা অনুযায়ী, ১৯৮৪/৮৫ সালে লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত সিস্টেম লস এর পার্থক্যের পরিমাণ ছিল ৬৫৯ গিগাওয়াট আওয়ার (GWH) এবং এর জন্য আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ৯৫ কোটি টাকা। সিস্টেম লস হ্রাসের ব্যর্থতা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আর্থিক সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বিদ্যুৎ বোর্ডের নিজস্ব লাভ থেকে তাদের বিনিয়োগের এক অংশের খরচ যোগানোর কথা ছিল বিধায় উন্নয়ন কর্মসূচীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উক্ত হারে সিস্টেম ক্ষতি এড়ানোর জন্য মূল্যবৃদ্ধি করতে অব্যাহত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। সিস্টেম লসের সাম্প্রতিক ঊর্ধমুখীতা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে হাতে নেয়া কতিপয় কারিগরী ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হয়নি। এর অর্থ যেহেতু সম্পদের ব্যাপক অপচয়, তাই সিস্টেম লস অবশ্যই গুরুত্বের সাথে মোকাবেলা করতে হবে।

উন্নয়ন উদ্দেশ্যাবলী (১৯৮৫—৯০)

১.১৬। পরিকল্পনার সার্বিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎখাতের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

(ক) সিস্টেম লস সহ অপচয় কমানো এবং দক্ষ ব্যবহারে উৎসাহদানের পাশাপাশি বিদ্যুতের পর্যাপ্ত ও সময় মত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(খ) আমদানিতব্য জ্বালানীর পরিবর্তে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বাধিক পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার করা।

(গ) বিদ্যুৎ সরবরাহের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং মান উন্নত করা।

(ঘ) পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা।

(ঙ) বিদ্যুৎ বোর্ড এর আর্থিক তৎপরতার উন্নতি ঘটানো, যাতে মূলধন ব্যয়ের একটি যুক্তিযুক্ত অংশ এর নিজস্ব আয় থেকে যোগান দেয়া যায়।

উন্নয়নের কৌশলসমূহ

১.১৭। উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলী কতিপয় প্রকল্প এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে পূরণ করা হবে, যার কয়েকটা ইতিমধ্যেই বাস্তবায়নাধীন। নতুন প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন এবং উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের কৌশলাদি নিম্নরূপ :

(ক) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উৎপাদন, ট্রান্সমিশন ও বিতরণের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত করা।

(খ) দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ব্যয় সম্প্রসারণ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেই মোতাবেক তৃতীয় পরিকল্পনায় নতুন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।

(গ) পশ্চিম জোনে আমদানিকৃত জ্বালানীভিত্তিক উৎপাদনে পরিবর্তন সাধনের জন্য ১৯৯০ এর গোড়ার দিকে দ্বিতীয় পূর্ব-পশ্চিম বিদ্যুৎ আন্তঃসংযোগকারী চালু করা।

(ঘ) মূল ট্রান্সমিশন ব্যবস্থার (আন্তঃসংযোগকারীসহ) ভোল্টেজ স্তর ২৩০ কেভিতে উন্নীত করা যাতে আরও দক্ষ তৎপরতা এবং ব্যাপক বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন ও গ্রীড নেট ওয়ার্কের সম্প্রসারণ ও সংযোজনের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্রান্সমিশন ক্ষমতা নিশ্চিত করা।

সুষম এবং দক্ষ উন্নয়নের নীতিসমূহ

১.১৮। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রণীত নীতিসমূহ নিম্নরূপ :

(১) **সম্পদ বৃদ্ধিকরণ :** বাংলাদেশের উন্নয়নের বর্তমান স্তরে বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ অর্থনীতিতে মোট বিনিয়োগের চেয়ে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র সরকারী কোষাগার থেকে বিনিয়োগের এ ধরনের উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে অর্থ যোগানো কষ্টকর। সরকারী কোষাগার থেকে বরাদ্দ বৃদ্ধির সীমিত সুযোগের প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৯৯০ নাগাদ সিস্টেম লস ২০ শতাংশে কমিয়ে এনে বাড়তি রাজস্ব সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। একই সংগে বিদ্যুৎ বোর্ডকে দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদন দামের ভিত্তিতে মূল্য তালিকা নির্ধারণের অনুমতি দেয়া উচিত। এই আর্থিক মিতব্যয়ীতার নিরীখে এমনকি ব্যাংক হতে মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থাও অর্থ যোগানোর সম্ভাব্য পরিপূরকসূত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

(২) **স্থানীয়ভাবে সরঞ্জাম উৎপাদন :** বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এ পর্যন্ত বিদেশী সাহায্যের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল। এই নির্ভরশীলতার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন, স্থানান্তর ও বিতরণের জন্য যন্ত্রপাতি তৈরীর আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা সামান্যই বেড়েছে। যথা-সম্ভব স্থানীয় শিল্পের বিকাশে যথাযথ নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলোর সুপারিশ করা হচ্ছে :

(ক) স্থানীয় শিল্প উৎপাদন করতে সক্ষম নয় শুধুমাত্র সেই সব সামগ্রীর মধ্যে শর্তাধীন সাহায্যের অধীনে আমদানি সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। অপরদিকে শর্তাধীন এবং শর্তমুক্ত সাহায্যের অধীনে কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী সামগ্রী আমদানীর ব্যবস্থা করে যতদূর সম্ভব সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশের স্থানীয় উৎপাদনের ব্যবস্থা করা উচিত।

(খ) বিদ্যুৎ সরঞ্জামের নমুনা, যেখানে সম্ভব সেক্ষেত্রে, স্থানীয় শিল্পের ক্ষমতার বাইরে অবশ্য উক্ত হওয়া উচিৎ নয়। টেণ্ডার দলিল প্রণয়নের সময় স্থানীয় সামগ্রীর নমুনার কথা মনে রাখা উচিত এবং এমনভাবে তা তৈরী করা উচিত যাতে স্থানীয় শিল্পগুলো বাদ না পড়ে। সামগ্রী এবং সরঞ্জামের মান যথাযথ করা উচিত।

পরিকল্পনা বিভাগ
গ্রন্থাগার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

(৩) **সিস্টেম বিশ্বাসযোগ্যতা ঃ** সার্বিক সিস্টেম বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে পশ্চিম অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর বিশেষ নজর দেয়া উচিত যা উল্লেখযোগ্যভাবে আন্তঃ সংযোগকারীর মাধ্যমে পূর্বাঞ্চল থেকে সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। যদি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে দীর্ঘ সময়ের জন্য আন্তঃ সংযোগকারীর উভয় সার্কিট বন্ধ হয়ে যায় তবে তা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। এ ধরনের জটিলতা মোকাবেলা করতে হলে চরম চাহিদার সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে ৬৫% সরবরাহ স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতার মাধ্যমে করা উচিত এবং বাদ বাকী চক্রক্রমিক ভিত্তিতে সরবরাহ করা অথবা লোডশেডিং করা উচিত। পশ্চিমাঞ্চলে দেশীয় স্বল্প প্রাথমিক জ্বালানীর অনুপস্থিতির কারণে সেখানকার বিদ্যুৎ প্ল্যান্টগুলো অবশ্যই তেল চালিত হতে হবে এবং এগুলোর মাধ্যমে কোন একটি আন্তঃ যোগাযোগকারীর ব্যর্থতার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে কতিপয় চূড়া (peak) ধরনের উৎপাদনও প্রয়োজন হবে। যখন আন্তঃ সংযোগকারী জ্বালানী (বেস লোড) সরবরাহ করবে তখন এই ব্যবস্থার সার্বিক বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য বিদ্যুৎ প্ল্যান্টগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিকল্পিত ওভারহলিং হবে তৃতীয় পরিকল্পনার সবচেয়ে সংকটজনক ক্ষেত্র। কিন্তু এর সুযোগ নির্ভর করবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং ওভারলোডিং এর ব্যাপকতার উপর। লোড-এর ব্যাপারে দেখা গেছে যে, এর ৫৫% অবৈধ যা উক্ত সিস্টেম লস সমস্যাকে জটিল করে তুলছে। তাই আগের চেয়ে আরও কঠোরভাবে এর মোকাবেলা করতে হবে। কারণ এতে বিদ্যুৎ খাতে শুধু যে অনিয়ম সৃষ্টি হয় তাই নয়, বরং সম্পদের ক্ষতির ফলে বিদ্যুৎ বোর্ডের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর বিশ্বাসযোগ্যতার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রক্ষণাবেক্ষণের এই প্রেক্ষাপটে একটি তৃতীয় ক্ষেত্রের উপর জোর দেয়া উচিত, তা হচ্ছে জনশক্তির উন্নয়ন যা ১৯৭০-এর দশকে মেধা পাচারের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বস্তুতঃ নড়বড়ে সংরক্ষণ এবং জনশক্তির ঘাটতি রক্ষণাবেক্ষণ এর অবনতি ঘটিয়েছে এবং প্ল্যান্টের ক্ষমতাকে কমিয়ে এনেছে। ফলে রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণের মধ্যে এক গুরুতর ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে যা জরুরী ভিত্তিতে সংশোধন করা প্রয়োজন।

(৪) **সিস্টেম লস ঃ** বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ঘাটতি রাজস্ব বাজেটের মূল কারণ হচ্ছে সিস্টেম লসের উচ্চ হার। এতে করে মূল্যবৃদ্ধির জন্য চাপ সৃষ্টি হচ্ছে যা সিস্টেম লসের মাধ্যমে ক্ষতির পরিমাণ আরো বাড়িয়ে তুলছে। তাই "রপ্তানি" এবং "আমদানি" মিটার স্থাপন, দ্বিতীয় স্তরের নেটওয়ার্ক ও বিদ্যুৎ লাইনের শাখা বিভক্তিকরণ, ক্যাপাসিটর ব্যাংকের প্রবর্তন, পরিমাপের চেয়ে ছোট কণ্ডাক্টর এবং লাইন সংযোগকারী প্রতিস্থাপন ইত্যাদির আকারে ১৯৯০ সাল নাগাদ সিস্টেম লস ২০% এ নামিয়ে আনার ব্যাপক চেষ্টা করা হবে। বাণিজ্যিক তৎপরতা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা আরও সুশৃংখল করা হবে, কম বিল করা ছোট খাট চুরি ও বড় ধরনের চুরি প্রতিহত করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে। কারিগরী ক্ষতি কমানো এবং কারিগরী বহির্ভূত ক্ষতি এড়ানোর জন্য দুটি সমীক্ষা চালানো হচ্ছে; যাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি ব্যাপক ক্ষতি কমানোর কর্মসূচী হাতে নেয়া যায়।

(৫) **ক্যাপটিভ জেনারেটর ঃ** বিদ্যমান দৃঢ় উৎপাদন ক্ষমতা লোড চাহিদার তুলনায় কম এবং বিদ্যুতে ঘাটতি ১৯৮৭ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে বিধায় বেসরকারী মিল এবং শিল্পসমূহে ক্যাপটিভ জেনারেটর স্থাপনের অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

লোড-এর পূর্বাভাস

১.১৯। চাহিদা কাঠামো, প্রযুক্তিগত পছন্দ এবং প্রাথমিক জ্বালানী সম্পদের নিরীখে স্বল্পব্যয়ে বিদ্যুৎ খাত সম্প্রসারণের পথ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০০ সাল পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিক সার্বিক উন্নয়ন কাঠামোর মধ্যে লোড-এর পূর্বাভাস সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। দেশে বিদ্যুতায়নের নিম্ন হারের প্রেক্ষিতে (জনসংখ্যার মাত্র ৬% এর কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া গেছে) এটা জোর দিয়ে বলতে হয় যে বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় পুরোটাই অতৃপ্ত রয়ে গেছে। বিদ্যমান অবদমিত চাহিদা এবং অর্থনীতিতে সম্পদের প্রতিবন্ধকতা মিলিয়ে পরিকল্পনার উপাত্ত অথবা নিয়ন্ত্রণরূপে লোড-এর পূর্বাভাস দেয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এতে প্রাক্কলনের বিভিন্নতা থাকাও অসম্ভব নয়। সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষাপটে এই খাতে পরিকল্পিত উন্নয়ন একটি জরুরী শর্ত; যদিও একটি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট চালু করতে বিদ্যুৎ খাতে উচ্চ মূলধন ব্যয় এবং দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। অতীতের প্রবৃদ্ধি এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে পরিকল্পনায় ধরে নেয়া হয়েছে যে, বিদ্যুতের চাহিদা বার্ষিক ১৪.৫% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৫ সালের ৯৩৬ মেগাওয়াট থেকে ১৯৯০ সালে ১,৮২৩ মেগাওয়াটে দাঁড়াবে। বিদ্যুতের চাহিদা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পায় কিন্তু সরবরাহ বৃদ্ধি কেবলমাত্র পৃথকভাবে ধাপে ধাপে করা যায় বিধায় বিনিয়োগের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সম্প্রসারণের পথ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। অবশ্য দীর্ঘ সময়ের কারণে তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য এই পথ ইতিমধ্যে গৃহীত বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত এবং বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে দৃঢ় উৎপাদন ক্ষমতা চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় পেছনে থাকবে এবং ১৯৮৭-এর প্রায় জুন পর্যন্ত বিদ্যুৎ ঘাটতি অব্যাহত থাকবে। এতে সিস্টেমে চাপ অব্যাহত থাকবে, যদিও তা তীব্র হবে না কারণ উৎপাদন ক্ষমতা সেই সময়ে যথেষ্ট বাড়বে। বিক্রয়, দৃঢ় ক্ষমতা এবং উৎপাদন ক্ষমতার তুলনামূলক অবস্থা নীচের সারণিতে দেয়া হলো:

সারণি ৫

বিক্রয় ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী (১৯৮৫—৯০)

	১৯৮৪/৮৫	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৬/৮৭	১৯৮৭/৮৮	১৯৮৮/৮৯	১৯৮৯/৯০
১। জ্বালানী বিক্রয় (GWH)	২,৮৪০	৩,৬৬৫	৪,৪০৬	৫,২০১	৬,১৩৭	৭,১৪৬
২। সিস্টেম লস (%)	৩৭.৫	২৯	২৫	২৩	২১	২০
৩। মোট উৎপাদন (GWH)	৪,৫৪৫	৫,১৬২	৫,৮৭৫	৬,৭৫৫	৭,৮১৪	৮,৯৯৩
৪। সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট)	—	১,০৭০	১,২২২	১,৩৯৭	১,৫৯৭	১,৮২২
৫। দৃঢ় ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	—	৯৬১	১,২৮২	১,৭৩২	১,৮০২	১,৭৭৩
৬। উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	—	১,৩৪১	১,৭০২	২,১৫২	২,২২২	২,২২২

টীকা: চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সারি জুন মাসের সংখ্যা নির্দেশ করে।

জ্বালানী উৎপাদনের পূর্বাভাস স্থির করা হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের কাছে বিক্রি ও সিস্টেম লসের পূর্বাভাসের ভিত্তিতে। সম্ভাব্য অচল প্ল্যান্টগুলো বাদ দিয়ে নীট প্ল্যান্ট সম্প্রসারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে বিক্রি (বিলকৃত) নির্ভর করবে সিস্টেম লস কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর যা বিদ্যুতের মূল্য ও বিক্রিলব্ধ আয়কে প্রভাবিত করবে এবং উপরে বর্ণিত সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে বিনিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট মাত্রায় নিজস্ব তহবিল যোগাতে সাহায্য করবে। সিস্টেম লস কমানোর কর্মসূচীতে পরিকল্পনাকালে এই ক্ষতির পরিমাণ ১৭% কমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়াবে পরিকল্পনাকালে মোট ৪,৮৪২ জিডব্লিউ এইচ (G W H) বিদ্যুৎ সঞ্চয় এবং প্রতি ইউনিট ১.৬৫ টাকা হারে (১৯৮৫ সালের মূল্যে) ৭৯৮ কোটি টাকা রাজস্ব আয়।

বিনিয়োগ কর্মসূচী

১.২০। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিনিয়োগ কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ৩৬টি বাস্তবায়নাধীন, ৩২টি নতুন এবং ১৫টি কারিগরি সাহায্য প্রকল্প। বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো শেষ করতে সাধারণতঃ দীর্ঘ সময় লেগে থাকে; গ্যাস-টার্বাইন-বিদ্যুৎ প্ল্যান্টগুলো এবং বিতরণ লাইনসমূহ এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম। ফলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নতুন প্রকল্প প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনার সময়কাল পার হয়ে যাওয়ার পর উৎপাদন শুরু করবে। একইভাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনেকগুলো প্রকল্প এই পরিকল্পনাকালে চালু হবার কথা রয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মোট বিনিয়োগের প্রায় ৫৩% বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর জন্য ব্যয় হবে।

১.২১। উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৮৫-এর ১,৩১৮ মেগাওয়াট থেকে ১৯৯০ সালে ২,২২২ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অতিক্ষিপ্ত সর্বোচ্চ চাহিদা ১৮২৩ মেগাওয়াটের তুলনায় এই পরিমাণের অর্থ হচ্ছে উৎপাদিত ২২% বিদ্যুৎ সংরক্ষিত উদ্বৃত্ত থাকবে। এই কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ৮টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং ৭টি নতুন প্রকল্প। প্রায় ১০৪০ মেগাওয়াট পরিমাণের উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নতুন প্রকল্প থেকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই সিস্টেমে আরও ২৭৭ মেগাওয়াট যুক্ত হবে। বিনিয়োগ কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাত্তোর সময়ে লোড বৃদ্ধি মেটানোর জন্য ৪টি প্রকল্প। আমাদের প্রাথমিক জ্বালানী সম্পদের নিঃশেষিতব্য প্রকৃতির কারণে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কার্যক্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। তাই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের জন্য অর্থ যোগানের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১.২২। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অতীতের তুলনায় ট্রান্সমিশন উপখাত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ট্রান্সমিশন প্রকল্পসমূহ লোড প্রবাহ, ভোল্টেজ কমে যাওয়া এবং স্থিতিশীলতার জন্য কম্পিউটার সিমুলেশনের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ৪টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং ১৪টি নতুন প্রকল্প। সকল বাস্তবায়নাধীন এবং ১১টি নতুন প্রকল্প পরিকল্পনার সময়কালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। সকল লোড কেন্দ্রে এবং প্রধান আন্তঃসংযোগ বিদ্যুৎ ষ্টেশনগুলোতে নির্ধারিত পরিমাণ বিদ্যুৎ স্থানান্তরের জন্য এই প্রকল্পগুলো প্রয়োজন।

১.২৩। বিতরণ উপখাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নতুন দিক হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের শহর বিতরণ প্রকল্পসমূহে গুরুত্ব আরোপ। এই প্রকল্পসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে বৃহত্তর নগর প্রকল্পসমূহ এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন প্রকল্পসমূহে মধ্যকার ব্যবধান অতিক্রম করে বিতরণ নেট-ওয়ার্কের পরিকল্পিত সম্প্রসারণের মাধ্যমে জেলা শহরসমূহে (এবং কতিপয় বৃহৎ উপজেলায়) সরবরাহের বিশ্বাসযোগ্যতা উন্নত করা এবং সিস্টেম লস কমিয়ে আনা। অধিকন্তু শহরাঞ্চলে বিতরণ ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট মান স্থির করা হবে। গ্রামীণ এলাকাসমূহে পিডিবি, আর ই বি'র মান অনুসরণ করবে। যাতে পরবর্তীকালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কাছে পিডিবি'র সাজসরঞ্জামাদি হস্তান্তরের ব্যাপারে সুবিধা হয়। পল্লী বিদ্যুতায়নসহ মোট বিতরণ প্রকল্পের সংখ্যা হবে ২২টি।

১.২৪। সিস্টেমের প্রস্তাবিত সম্প্রসারণের সাথে সংগতি রাখার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জনশক্তি প্রশিক্ষণের গতি ত্বরান্বিত হতে হবে। যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাদির উন্নয়ন এর ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য, যাতে কতিপয় যন্ত্রাংশ স্থানীয় ভাবেই তৈরী করা যায়। পরিকল্পনাকালে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত বিবিধ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হচ্ছে প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, কর্মশিবির এবং লোড ডেসপাচ কেন্দ্র।

ভৌত কর্মসূচী

১.২৫। উপরে বর্ণিত বিনিয়োগ কর্মসূচীর লক্ষ্য হচ্ছে অতিরিক্ত ১২০৪ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা, ৮২৩ কিঃ মিঃ সরবরাহ লাইন, ২৩৮২ কিঃ মিঃ উপ-সরবরাহ লাইন এবং ৩৪,৭৮৭ কিঃ মিঃ বিতরণ লাইন (আর ই বি-এর ২৪,২৭২ কিঃ মিঃ সহ) অর্জন করা। ভৌত লক্ষ্যমাত্রার বিস্তারিত বিবরণ নীচের সারণিতে দেখানো হলো :

সারণি ৬

ভৌত লক্ষ্যমাত্রার সারসংক্ষেপ (ক্রমবর্ধিষ্ণু)

কর্মসূচী	১৯৮৫ (প্রকৃত)	১৯৯০ (লক্ষ্যমাত্রা)
১। বিপিডিবি :		
(১) উৎপাদনক্ষমতা (মেগাওয়াটে)	১,০১৮	২,২২২
(২) সরবরাহ লাইন (৬৬ কেভি, ১৩২ কেভি, ২৩০ কেভি) (কিলোমিটারে)	২,৪২৩	৩,২৪৬
(৩) উপ-সরবরাহ লাইন (৩৩ কেভি) (কিলোমিটারে)	৭,৭২২	১০,১০৪
(৪) বিতরণ লাইন (১১ কেভি, ৬.৩৫ কেভি, ০.৪ কেভি) (কিলোমিটারে)	২৩,৩৭৪	৩৩,৮৮৯
(৫) বিদ্যুতায়িত উপজেলার সংখ্যা	৪২৭	৪৭০
(৬) বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	৩,২৮৮	৭,৫০০
(৭) গ্রাহকের সংখ্যা	৮,১০,০০০	১২,০০,০০০
২। আরইবি :		
(১) বিতরণ লাইন (কিলোমিটারে)	১১,৬৯৭	৩৫,৯৬৯
(২) রেজিষ্ট্রিভুক্ত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সংখ্যা	৩৩	৪০
(৩) শক্তিচালিত পিবিএস	১৯	৪০
(৪) বিদ্যুতায়িত উপজেলার সংখ্যা	৭৩	১৭৫
(৫) বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	৪,৬০০	১৪,৬০০
(৬) গ্রাহকের সংখ্যা	১,৫৪,০০০	৫,৫৩,৩৭০

গ্রন্থাগার ... জাতী বাংলা

সারণি ৬ (ক্রমশঃ)

		১৯৮৫ (প্রকৃত)	১৯৯০ (লক্ষ্যমাত্রা)
৩। জাতীয় :			
(১)	বিতরণ লাইন (কিলোমিটারে)	৩৫,০৭১	৬৯,৮৫৪
(২)	বিদ্যুতায়িত উপজেলার সংখ্যা	৩০০	৬৪৫
(৩)	বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	৭,৮৮৮	২২,১০০
(৪)	গ্রাহকের সংখ্যা	৯,৬৪,০০০	১৭,৫৩,১৭০

বিনিয়োগ বরাদ্দ

১.২৬। উপরোল্লিখিত রূপরেখা মোতাবেক বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ কর্মসূচীতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে ৪২৮৫ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংস্থাওয়ারী অর্থ বরাদ্দ নীচে ৭নং সারণিতে দেয়া হলো :

সারণি ৭

বিনিয়োগ বরাদ্দ (১৯৮৫—৯০)

(কোটি টাকায়)

	সংস্থা	স্থানীয় মুদ্রা	বৈদেশিক মুদ্রা	মোট
(১)	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১,৫০৪	২,০৯৬	৩,৬০০
(২)	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	২৭০	৪০৫	৬৭৫
(৩)	আণবিক শক্তি কমিশন	৪	১	৫
(৪)	পরিকল্পনা কমিশন (ইএসপিসি)	১	৪	৫
	মোট :	১,৭৭৯	২,৫০৬	৪,২৮৫

উৎপাদন, সরবরাহ এবং বিতরণের জন্যে উপখাতওয়ারী বিনিয়োগ হচ্ছে যথাক্রমে ১৫৯৪ কোটি টাকা, ৬১৭ কোটি টাকা এবং ১৮০৯ কোটি টাকা। এটা পিডিবি এবং আরইবির মোট বিনিয়োগের যথাক্রমে ৩৭.২%, ১৪.৪% এবং ৪২.৩%। অভ্যন্তরীণ তহবিলের দ্বারা পিডিবিকে বিনিয়োগের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সংগ্রহ করতে হবে। তাই পিডিবিকে সিস্টেম লস কমানোর জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ পরিচালনা ব্যয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। পূর্ব থেকে পশ্চিম অঞ্চলে স্বল্প ব্যয়ের গ্যাস-ভিত্তিক জ্বালানী স্থানান্তরের জন্য পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃসংযোগকারীর উন্নীতকরণের মাধ্যমে এখনও ব্যয় কমানোর সুযোগ রয়েছে। এতে করে গানিকভাবে জ্বালানী ব্যয় ইউনিট প্রতি ১৯৮৫ সালের ০.৪৫ টাকা থেকে কমে ১৯৯০ সালে ০.৩৯ টাকায় দাঁড়াবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পিডিবি দেশজ জ্বালানী (গ্যাস) এবং জলস্রোত হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবে এবং ৭৭৩৩ GWH পশ্চিম অঞ্চলে স্থানান্তর করবে। এর ফলে পরিকল্পনাকালে

২২ লাখ টন আমদানিতব্য জ্বালানী তেলের বিকল্প হিসেবে দেশে দেশজ জ্বালানী ব্যবহৃত হবে। আর্থিক হিসাবে এর মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় ১,৩৪৩.৬ কোটি টাকা। মুদ্রাস্ফীতির সাথে সংগতি রেখে মূল্য নির্ধারণের অনুমতি দেয়া হলে পিডিবি আর্থিকভাবে লাভজনক হবে। ফলে সম্পদের ঐতিহাসিক মূল্যের উপর এর প্রাপ্তির হার ১৯৮৫ সালের ৮% হতে ১৯৯০ সালে প্রায় ১২% এ উন্নীত হতে পারে। ১৯৮৫ সালের মূল্যে এ থেকে নীট আভ্যন্তরীণ নগদ হবে প্রায় ১৩৪৪ কোটি টাকা, অর্থাৎ পরিকল্পনাকালে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের ৩৭%।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ তেল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন

২.১। ৪১ কেজি তেলের সমপরিমাণ বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহারের বর্তমান স্তর অর্থনীতির উন্নয়ন এবং এর প্রাথমিক জ্বালানী ভিত্তি উভয়কেই প্রতিফলিত করে। বাংলাদেশের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদের উৎস সীমিত। পর্যাপ্ত উন্নয়ন তহবিলের অভাবে এই সীমিত সম্পদও উন্নয়নশীল অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবহার করা যাচ্ছে না। সাধারণভাবে দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা অত্যন্ত কম এবং এর খনিজ চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন বিকল্প চিন্তার সুযোগ একেবারেই সীমাবদ্ধ। এখনও কোন তেলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। পূর্বাঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের পরিমাণ সীমিত এবং খনিজ সম্পদের ভিত্তি দুর্বল বিধায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। চাহিদা মেটানো ছাড়াও অব্যাহত প্রবৃদ্ধির জন্যে অর্থনীতির প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তি সম্প্রসারিত করতে ব্যাপক ভিত্তিক খনিজ অনুসন্ধানের কাজ হাতে নেয়া উচিত।

২.২। দেশের পূর্বাঞ্চলে উপকূল ভাগের ২টি সহ মোট ১৩টি গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে; যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাক্কলিত মজুদ হচ্ছে ১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাসের প্রুভেন (Proven) মজুদ জানার জন্যে প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে পরীক্ষা চালান হচ্ছে। কয়লা এবং পিট আবিষ্কার ছাড়া দেশের পশ্চিম অংশে এখনও কোন গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সামগ্রিকভাবে, বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহারের মধ্যে গ্যাসের মাধ্যমে ৫৬ শতাংশ মেটানো হয় এবং বাকীর ৩৭% মেটানো হয় আমদানিকৃত তেল হতে, ২% আমদানিকৃত কয়লা হতে এবং ৫% জলবিদ্যুৎ হতে।

২.৩। দেশের খনিজ সম্পদ অত্যন্ত সীমিত এবং প্রাপ্ত সম্পদ প্রধানতঃ পশ্চিম অঞ্চলে রয়েছে। জামালগঞ্জ এলাকায় প্রায় ৩ হাজার ফুট গভীরে ১ শত কোটি টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা পাওয়া গেছে। যদিও এই মজুদ আবিস্কৃত হয়েছে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে, প্রচুর বিনিয়োগযুক্ত প্রযুক্তিগত অসুবিধার কারণে এখনও তা উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে না। সম্প্রতি দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া এলাকায় বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ অনেক কম গভীরতায় (৫০০—১২০০ ফুট) বিটুমিনাস কয়লা আবিষ্কার করেছে। এর মান এবং মজুদের পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে খুলনা, ফরিদপুর এবং সিলেট এলাকায় পীটের মজুদ রয়েছে। এ সব এলাকা থেকে ১৫ কোটি টনের মত পিট আহরণ করা যায়। সিলেট এলাকায় চুনাপাথরের একটি ক্ষুদ্র মজুদ পাওয়া গেছে। তবে জয়পুরহাট এলাকায় আহরণের উপযোগী প্রায় ১০ কোটি টন চুনাপাথরের মজুদ রয়েছে। দিনাজপুর জেলায় মধ্যপাড়ায় বিপুল পরিমাণ গ্রেনো ডাইয়োরিট ধরনের শিলার মজুদ পাওয়া গেছে। দেশের উল্লেখ করার মত অন্যান্য খনিজসমূহ হচ্ছে সাদা কাদামাটি, কাঁচ তৈরীর উপযোগী বালি এবং কতিপয় ভারি খনিজ। ময়মনসিংহ জেলায় ক্ষুদ্র আকারের খনন তৎপরতা চালিয়ে বছরে প্রায় ৩৫০০ টন চীনামাটি আহরণ করা হয়।

২.৪। প্রাথমিক জ্বালানী সম্পদের এ সমস্ত মজুদের বিপরীতে বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রাথমিক বাণিজ্যিক জ্বালানী চাহিদা ১৯৯০ সাল নাগাদ কমপক্ষে দ্বিগুণ হবে। প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে এই চাহিদা মেটানো সহজ হবে বলে মনে হয় না। অর্থনীতি ইতিমধ্যেই পেট্রোলজাত দ্রব্য এবং অশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানীর উচ্চ বিলের বোঝা বহন করছে। এ ধরনের আমদানির জন্য ১৯৮১/৮২ সালের রপ্তানি আয়ের ৮৭% এবং ১৯৭৯/৮০ সালের ৬৩% কমে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪০% নেমে

আসে। এটা আংশিকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা আমদানির বিকল্পের জন্যে এবং আংশিকভাবে আন্তর্জাতিক তেলের মূল্যের নিম্নগতির কারণে ঘটেছে। তবে বিশেষ করে দায় পরিশোধের স্থায়ী সমস্যার কারণে আমদানি খরচ এখনও উঁচু। কাজেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও লেন-দেনের ভারসাম্য এই উভয় প্রয়োজন মোকাবিলায় এই খাতের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

২.৫। তিনটি প্রধান বাধা এই খাতের যথাযথ উন্নয়নকে সীমিত করে রেখেছে। এগুলো হচ্ছে কারিগরি, আর্থিক এবং প্রতিষ্ঠানিক। কারিগরি দিক থেকে এই দেশ বিশেষ করে অনুসন্ধানের ব্যাপারে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল; সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা এই সমস্যা জটিলতর করেছে। এটা স্বীকার করতে হবে যে অনুসন্ধান, গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং ট্রান্সমিশন উচ্চ মূলধন-ভিত্তিক তৎপরতা এবং সীমিত সংখ্যক বহুজাতিক কর্পোরেশন এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। এতে বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রায়ই কারিগরি বিষয় এবং বিনিয়োগের ব্যবস্থা এই উভয় ক্ষেত্রেই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নও এতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অভিজ্ঞ এবং উপযুক্ত ব্যক্তিরা দেশের অভ্যন্তরে যে অর্থ আয় করেন বিদেশে তাঁদের অনেক বেশী আয়ের সুযোগ এবং তাঁদের চাহিদা থাকার কারণে স্থানীয় ক্ষমতার উন্নয়ন ও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মাত্র সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্যাস এবং তেলের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানিক ক্ষমতা উন্নয়নের জন্য একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

২.৬। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বাণিজ্যিক জ্বালানীর চাহিদা বার্ষিক ৮.৫% হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্পদের নিদারুণ স্বল্পতার পটভূমিতে নতুনভাবে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা, সরবরাহ এবং বিতরণ সুবিধাদি সৃষ্টির চেয়ে গ্যাস উপখাতে বিদ্যমান সুবিধাদি সর্বোচ্চ ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে। যাহোক গ্যাস ক্ষয়িষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ বিধায় হাইড্রোকার্বনের বর্তমান সীমিত মজুদ বৃদ্ধিকল্পে পর্যাপ্ত অনুসন্ধান তৎপরতা হাতে নিতে হবে। পশ্চিম অঞ্চলে অনুসন্ধানের উপর জোর দিতে হবে, বিশেষ করে এখনো যেখানে কোন গ্যাস অথবা তেল আবিষ্কৃত হয়নি। সরকারী খাতের সংস্থাসমূহ ছাড়াও উৎপাদন/লাভ অংশীদারিত্ব চুক্তির (PSC) মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানে বেসরকারী খাত বিশেষ করে বহুজাতিক তেল কোম্পানীগুলোকে জড়িত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। তবে চুক্তির শর্তাবলী সতর্কতার সাথে প্রণয়ন করতে হবে। এতে শুধু বেসরকারী কোম্পানীগুলোকে উদ্বুদ্ধকরণের ব্যবস্থা থাকলে চলবে না, অনুসন্ধান-প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থাও এতে থাকতে হবে। হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান, বিভিন্ন ব্যবহারকারী খাতে বরাদ্দের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ এবং জনশক্তি উন্নয়নে যথাযথ নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩—৮০)

২.৭। অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানী সম্পদের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে আমদানীকৃত জ্বালানীর বিকল্প হিসেবে দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাসের উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয়। বিশ্বব্যাপী তেল সংকটের ফলে জ্বালানী আমদানী ব্যয় কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের মত একটি ক্ষুদ্র অর্থনীতির দেশের এইনীতি গুরুত্ব পায়। ১৯৭৩—৮০ সময়কালে এই খাতের উন্নয়নে সরকার ২৩৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন।

২.৮। এই সময়কালে বিশেষ করে উপকূল সন্নিকটে নতুন হাইড্রোকার্বন সম্পদ অনুসন্ধানের জন্যে ব্যাপক প্রয়াস চালানো হয়। কিন্তু এতে তেমন সাফল্য আসেনি। দশটি কূপ খনন করা হয়, কিন্তু মাত্র একটি কূপে (উপকূল সন্নিকটবর্তী) গ্যাসের সন্ধান মিলে। এই সময়ের প্রধান কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে ৩৫ মাইলেরও বেশী দূরত্বের ১২ ইঞ্চি ট্রান্সমিশন লাইনের দ্বারা তিতাস ক্ষেত্রের সাথে হবিগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রের সংযোগ সাধন এবং বাখরাবাদ ক্ষেত্র থেকে দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কেন্দ্র চট্টগ্রাম পর্যন্ত গ্যাস ট্রান্সমিশন লাইন বসানোর কাজ শুরু করা। প্রাক্কলিত ২১০ MMCFD উৎপাদন ক্ষমতা-সম্পন্ন চারটি গ্যাস ক্ষেত্রের ৯টি উৎপাদন কূপ ১৯৭৯/৮০ সালে মাত্র ১৩০ MMCFD প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করেছে। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী (TGTDC) এবং জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম (JGTDS) এর মাধ্যমে যথাক্রমে তিতাসের প্রতিনিধিত্বকারী এলাকা (TFA) এবং সিলেট এলাকায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২.৯। ১৯৭৯ এর দ্বিতীয় তেল সংকট এবং তেলের মূল্যের ক্রমিক উর্ধ্বগতির ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার সর্বোচ্চ করা এবং আমদানীতব্য জ্বালানীর বিকল্প হিসাবে গ্যাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো। আশা করা হয়েছিল যে, গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালের ৪৪,৫০০ MMCF থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১২৮,০০০ MMCF-এ উন্নীত করা হবে যার ফলে মোট বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহারের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের অংশ ১৯৭৯/৮০ সালের ৩৭ % থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৬৮% দাঁড়াবে। একই সময়ে তেল এবং গ্যাসের সন্ধানে অনুসন্ধান তৎপরতা জোরদার করা হয়।

২.১০। এই সময়ে পরিকল্পিত ৯টি কূপের মধ্যে ৬টি কূপের খনন কার্য সমাপ্ত করা হয়; এর মধ্যে ৪টি কূপে গ্যাস মজুদ পাওয়া গেছে, যদিও তা উত্তোলন করা হয়নি। বিদ্যমান ৯টি চালু কূপের সাথে ১২টি নতুন চালু কূপ যুক্ত হয়েছে; যদিও লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩টি কূপের। গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নসমূহ ছিল চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহের জন্য বাখরাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রকে সক্রিয়করণ এবং ঢাকার সন্নিকটে ডেমরা পর্যন্ত একটি নতুন ট্রান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে তিতাস সিস্টেমের সাথে এই ক্ষেত্রের সংযোগ সাধন। সামগ্রিকভাবে সরবরাহ ব্যবস্থা ১৯২ মাইল সম্প্রসারিত করা হয়, যার ফলে গ্যাস সরবরাহ ১৯৭৯/৮০ সালের ৪৪,৫০০ MMCF থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৯৪,৬০০ MMCF এ বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিক জ্বালানিতে গ্যাসের অংশ ১৯৭৯/৮০ সালের ৩৭% থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৫৬% এ উন্নীত হয়।

২.১১। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটে যা নীচে দেখানো হলো:

সারণি ২.১

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্য

তৎপরতার ধরণ	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪/৮৫ (লক্ষ্যমাত্রা)	১৯৮৪/৮৫ (প্রকৃত)
(১) উন্নয়ন/ওয়ার্কওভার কূপ	৯	২২	২১
(২) সরবরাহ লাইন (মাইল)	১৪২	৪২২	৪০০
(৩) বিতরণ লাইন (মাইল)	১,০০৫	২,১৭৫	২,০০০
(৪) গ্যাস সরবরাহ (MMCF)	৪৪,৫০০	১,২৮,০০০	৯৪,৬০০
(৫) গ্রাহকের সংযোগ (সংখ্যা)	১,১৯,৪০০	২,৫৮,০০০	২,৪০,০০০

২.১২। পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি আমদানির উপর দেশ পুরোপুরি নির্ভরশীলতা অব্যাহত রাখে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রতি বছর গড়ে ১৪ লাখ টন হারে ব্যবহৃত পেট্রোলজাত দ্রব্যের মোট পরিমাণ হচ্ছে ৬৮ লাখ টন। এর মধ্যে ৭০% এসেছে আমদানিকৃত অশোধিত তেল থেকে যা ইষ্টার্ণ রিফাইনারিতে

পরিশোধন করা হয় এবং বাদবাকী ছিল ডিজেল ও কেরোসিনের মত মাঝারি ধরনের আমদানিকৃত পরিশোধিত তেল। ইষ্টার্ণ রিফাইনারি লিঃ বছরে ১৭,০০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি LPG আহরণ প্ল্যান্টও প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৮৪/৮৫ সালে এর উৎপাদন ছিল ৭,০০০ টন। এর প্রায় সবটুকুই (৮৫%) চট্টগ্রাম এলাকায় ব্যবহৃত হয়। তবে চট্টগ্রাম এলাকায় গ্যাস নেটওয়ার্কের কাজ শেষ হওয়ার পর এলপিজি দেশের পশ্চিমাঞ্চলে সরবরাহের জন্য ছেড়ে দেয়া যাবে, যাতে ঐ অঞ্চলের জ্বালানী সমস্যার মোকাবেলা করা যায়। এই সময়কালের শেষে ইষ্টার্ণ রিফাইনারীর আর্থিক অবস্থা পড়ন্ত বিশ্ব মূল্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পেট্রোলজাত দ্রব্যের স্পট-পার্চেজ তুলনামূলকভাবে সস্তা হয়ে যাওয়ায় ইষ্টার্ণ রিফাইনারীতে অশোধিত তেলের ব্যবহার ১০ লাখ টনের নীচে নেমে আসে। অথচ এর ক্ষমতা হচ্ছে ১৫ লাখ টন। অধিকন্তু অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ন্যাপথা রপ্তানি করা হয়, অপরদিকে কিছু মাঝারি মানের পরিশোধিত তেল আমদানি করা হয় উচ্চ মূল্যে। তাই ইষ্টার্ণ রিফাইনারীতে কতিপয় সামগ্রিক পুনঃরূপান্তরের মাধ্যমে অধিক চাহিদা সম্পন্ন মাঝারি মানের পরিশোধিত তেল উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি সমীক্ষার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। অবশ্য বিশ্বমূল্যের নিম্নগতি পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে এর আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে সাহায্য করেছে। পেট্রোলজাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ মূল্য অপরিবর্তিত থাকায় অতীতে বিশ্বমূল্য ও আভ্যন্তরীণ মূল্যে ভারসাম্যহীনতার দরুণ যে ক্ষতি হয়েছিল তা পুরোপুরি পুষিয়ে নেয়া গেছে।

২.১৩। হাইড্রোকার্বন উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুর্বলতর যোগসূত্র হচ্ছে ভূতাত্ত্বিক জরিপের শ্লথ অগ্রগতি। পরিকল্পনাকালে প্রধানতঃ সংগঠনের অভাবে লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৩০% মাত্র অর্জিত হয়। পরিকল্পনাকালে প্রায় ৪০০০ বর্গমাইল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র, ১০০০ বর্গমাইল ভূ-প্রাকৃতিক জরীপ, ৫০০০ রানিং ফুট খনন কাজ এবং ৩০০০ ভূ-রাসায়নিক সমীক্ষার কাজ শেষ করা হয়। এই ধরনের ভূতাত্ত্বিক জরীপের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হচ্ছে জামালগঞ্জের চেয়ে অনেক কম গভীরতায় দিনাজপুরে কয়লার নতুন মজুদ আবিষ্কার।

বিনিয়োগ কর্মসূচী (১৯৮০—৮৫)

২.১৪। ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে মোট ৬১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, যা সরকারী খাতের মোট ব্যয় বরাদ্দ ১১,১০০ কোটি টাকার ৫.৫%। চলতি মূল্যের ভিত্তিতে এই বরাদ্দ ৮৯১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে বিনিয়োগ কর্মসূচীতে কিছুটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং দ্বিপাক্ষিক উৎসসমূহ থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে প্রাপ্ত প্রকল্প সাহায্যের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৫২০ কোটি টাকা (২৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। অবশ্য অনেক প্রকল্পের ক্ষেত্রে সময় পার হয়ে যাওয়া এবং ব্যয় বেড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে যা বিশেষ করে গ্যাস উৎপাদনের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উৎপাদন এবং ট্রান্সমিশনের মধ্যে গুরুতর ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়; ঘন ঘন দোদুল্যমানতা যা জোরালো অগ্রাধিকারের অনুপস্থিতি নির্দেশ করে। বিশেষ ধরনের প্রকল্পের জন্যে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকার এবং একটি জাতীয় গ্যাস নেট-ওয়ার্কের অনুপস্থিতিতে ভারসাম্যহীনতার সমস্যা বেড়ে যায়। এতে উৎপাদনকারী এলাকা থেকে ব্যবহারকারী এলাকায় গ্যাস স্থানান্তর বিঘ্নিত হয়। ফলে বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে তহবিলের পুনঃ বরাদ্দের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ তথ্যের দ্বারা এটা প্রতিফলিত হয় যে প্রায় অর্ধেক তহবিল ব্যয় করতে হয়েছিল এমন সব প্রকল্পে যেগুলো সময় পেরিয়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় চলে যাবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে হাতে নেয়া ৩৮টি প্রকল্পের মধ্যে ২২টি শেষ হয়েছে। সাধারণভাবে এই খাত সম্পদের তীব্র সংকটের চাপের মধ্যে থাকে। কতিপয় কর্মসূচী অন্যগুলোর চেয়ে আরও বেশী অসুবিধায় পড়ে। ৮৯১ কোটি টাকা মোট ব্যয় বরাদ্দের তুলনায় এডিপি'র মাধ্যমে ৯১১ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়। যেখানে ৩২৫ কোটি টাকা অনুসন্ধান ও জরিপের জন্য, ১৮০ কোটি টাকা গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্যে, ৪৩০ কোটি টাকা ট্রান্সমিশন ও বিতরণ লাইনের জন্যে এবং ২০ কোটি টাকা

তৈল শোধনাগার, গুদামজাতকরণ ও পেট্রোলজাত দ্রব্য চলাচলের মত অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়েছে। এই ঘাটতি পেট্রোবাংলার নিজস্ব সম্পদ থেকে মেটানো হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২.১৫। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাণিজ্যিক জ্বালানীর চাহিদা বার্ষিক ৮.৫% হারে বাড়বে বলে আশা করা যায়। এ বর্ধিত চাহিদা প্রধানতঃ দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা মেটানো হবে যাতে লেন-দেনের ভারসাম্যকে জ্বালানী (তেল ও কয়লা) আমদানীর বোঝা হতে রেহাই দেয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাসের দৈনিক সর্বোচ্চ চাহিদা ১৯৮৪/৮৫ সালের ৪৫০ MMCFD থেকে ১৯৮৯/৯০ সালে ৭৫০ MMCFD তে এবং বার্ষিক ব্যবহার ১৯৮৪/৮৫ সালের ৯৪,৬০১ MMCF হতে ১৯৮৯/৯০ সালে ১৮০,০০০ MMCF-এ বাড়বে বলে আশা করা যায়। এতে গড়ে বার্ষিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ১৩.৮%। এই হারে বাড়লে মোট বাণিজ্যিক জ্বালানিতে গ্যাসের অংশ ১৯৮৪/৮৫ সালের ৫৩% হতে ১৯৮৯/৯০ সালে ৬৮%এ বৃদ্ধি পাবে। সহায়ক বহিরাবরণ সুবিধাদিসহ ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ লাইনের পরিপূরক সম্প্রসারণ এবং ১৭টি অতিরিক্ত উৎপাদন/ওয়ার্কওভার কূপ স্থাপনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের এই দ্রুত সম্প্রসারণ অর্জন করা হবে। উৎপাদন, ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ সুবিধাদির মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের দ্বারা কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, গ্যাস খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন তৎপরতার জন্যে বিনিয়োগ বরাদ্দে উৎপাদন থেকে নিম্নস্তরীয় তৎপরতাগুলোর সমন্বয়সাধন করা বিশেষ প্রয়োজন। সরবরাহের নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতার জন্যে তিতাস, বাখরাবাদ এবং জালালাবাদ এই তিনটি প্রধান গ্যাস সিস্টেমের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে একটি জাতীয় গ্রীড প্রতিষ্ঠা করা হবে যাতে এই ক্ষয়িষ্ণু দেশজ সম্পদ সর্বাধিক দক্ষ ও অর্থনৈতিক ব্যবহারের কাজে লাগানো যায়।

২.১৬। যদিও গ্যাসের বার্ষিক ব্যবহার বিদ্যমান অনুমতি উত্তোলনযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের (৮.৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট) একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ, এটা গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান হারে সম্প্রসারণ তৎপরতা অব্যাহত রাখলে আবিষ্কৃত গ্যাসের মজুদ বিদ্যুৎ ও সার প্রকল্পের মত ব্যবহারকারী খাতের চাহিদা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পূরণ করতে পারবে। এর অর্থ হল প্রাপ্ত দেশজ গ্যাস মজুদের ভিত্তিতে ১৯৯০ সালের পর কোন নূতন বিদ্যুৎ ও সার প্রকল্প প্রণয়ন ও গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং গ্যাস মজুদ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যায়ন/পরীক্ষা ও অনুসন্ধান-মূলক খনন কার্য জোরদার করতে হবে। সম্পদ প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতে আমাদের সরকারী খাতের অনুসন্ধান ক্ষমতা সীমিত বলে বেসরকারী খাত, বিশেষ করে বহুজাতিক তেল কোম্পানীগুলোকে তেল এবং গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন তৎপরতায় অংশ নিতে উৎসাহিত করা হবে। এটা একটা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হবে বলে আশা করা যায়। এবং তা' দায় পরিশোধ সমস্যা নিরসনে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

২.১৭। দেশের চাহিদার সাথে খাপ খাওয়াতে ভারসাম্যপূর্ণ পেট্রোলজাত দ্রব্য পাওয়ার জন্যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ইষ্টার্ণ রিফাইনারিতে দ্বিতীয় স্তরের রূপান্তর সুবিধাদির সংযোজন ঘটানো হবে। এছাড়াও এর পরিচালনার সর্বোচ্চ দক্ষতার জন্যে সুষমকরণ এবং আধুনিকায়ন করা হবে। খনিজ সম্পদের গবেষণা এবং অনুসন্ধান তৎপরতা জোরদার করার জন্য ভূতাত্ত্বিক জরীপ শক্তিশালী ও আধুনিক করা হবে। দিনাজপুরে নতুন আবিষ্কৃত কয়লাক্ষেত্রের মজুদ নির্ধারণ এবং এর উত্তোলনের কারিগরি অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বিদেশী পরামর্শদাতাদের উপর নির্ভরতা কমানোর জন্য চাকুরীরত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য আরও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হবে। কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন করা হবে।

গ্রন্থাগ ... তত্ত্বী বাংল

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

২.১৮। গ্যাস, তেল এবং খনিজ উন্নয়নের জন্য প্রধান উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে :

(১) অর্থনীতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বাণিজ্যিক জ্বালানীর বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার সর্বোচ্চ করা এবং জ্বালানি আমদানি খরচের উপর থেকে দায় পরিশোধের চাপ কমানো ;

(২) তেল ও গ্যাসের গুণ নির্ণয় ও অনুসন্ধান তৎপরতা সুসংগত করা, পশ্চিম অঞ্চলে শেষোক্ত তৎপরতার ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে জোর দেয়া ;

(৩) একটি সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন অর্জন করতে পশ্চিম অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া এবং একটি জাতীয় সরবরাহ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ;

(৪) যথাযথ মূল্য নির্ধারণ এবং চাহিদা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও দক্ষ ব্যবহারের উন্নয়ন ঘটিয়ে গ্যাসের মত ক্ষয়িষ্ণু জ্বালানী সম্পদ সংরক্ষণ করা ;

(৫) ইষ্টার্ন রিফাইনারীর দক্ষতা এবং উৎপাদিত দ্রব্য-মিশ্রণ ব্যবস্থাদির উন্নতিসাধন ;

(৬) পার্বতীপুরের নিকটে নতুন আবিষ্কৃত ক্ষেত্রে কয়লা মজুদের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য জরীপ ও অনুসন্ধান খনন ত্বরান্বিত করা এবং এর উত্তোলনের কারিগরি অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা ; এবং

(৭) কার্যকর জনশক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উন্নয়নে স্থানীয় ক্ষমতা ও বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলা।

উন্নয়নের কৌশলসমূহ

২.১৯। উপরের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হবে :

(১) অনুসন্ধান জোরদার করতে উৎপাদন/মুনাফা অংশীদারিত্ব স্কীমের অধীনে বেসরকারী খাতে, বিশেষ করে বহুজাতিক তৈল কোম্পানীগুলোর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হবে এবং বেসরকারী স্বার্থকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে গ্যাস এবং তেলের সম্ভাবনা সম্পর্কে উপাত্ত ভিত্তি গড়ে তোলা হবে।

(২) পশ্চিম অঞ্চলে গ্যাস স্থানান্তরের জন্যে যমুনা সেতু প্রকল্পের পাশাপাশি গ্যাস পাইপ লাইন এবং অন্যান্য সম্ভাবনার ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা হবে।

(৩) CNG এবং LPG-র মত গ্যাসের বিভিন্ন বিকল্প ব্যবহারের পাশাপাশি লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নয়নে অবদান রাখার দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন গ্যাসভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখা হবে। তবে যদি স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর পরে পর্যাপ্ত গ্যাস মজুদ থাকে তবেই গ্যাসভিত্তিক রপ্তানিমুখী শিল্পের পরিকল্পনা করা হবে।

(৪) যথাযথ মূল্য ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু গ্যাস সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গ্যাসের দক্ষ ও অর্থনৈতিক ব্যবহার জোরদার করা হবে, এ ব্যাপারে গ্যাসের অপরচুনিটি কস্ট, বিকল্প জ্বালানীর খরচ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাহিদা এবং সামাজিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উন্নয়নের নীতিমালা

২.২০। অব্যাহত সম্পদ সংকটের প্রেক্ষিতে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা ও বিশ্ব জ্বালানী পরিস্থিতির পরিবর্তনের আলোকে কতিপয় কঠোর নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে। পেট্রোলজাত সামগ্রীর বিশ্ব মূল্যের নিম্নগতির কারণে গত ১২ বছর ধরে বিদ্যমান চাপ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আংশিকভাবে কমেছে। আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই এই উন্নতির প্রভাব পড়েছে। প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক অংগনে হাইড্রোকার্বন মজুদ অনুসন্ধানে আন্তঃজাতীয় সংস্থাসমূহের উৎসাহ ১৯৭০ সালের চেয়ে কমে যাবে। তাই তাদের উৎসাহ আকর্ষণ করা কঠিনতর হবে। ফলে সম্ভাব্য ভাগাভাগির চুক্তিতে আরও উদার শর্ত সংযোজন করতে হবে অথবা অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার উপর অধিক হারে নির্ভর করতে হবে। সেজন্যই দেশের বর্তমান সম্পদ ও ক্ষমতার সংকুচিত অবস্থার কারণে উভয় ধরনের ব্যবস্থার যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে অবশ্যই একটি হাইড্রোকার্বন উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করতে হবে। জ্বালানী বাবদ আমদানী ব্যয় ১৯৮১/৮২ সালে ছিল রপ্তানী আয়ের ৮৭% যা ১৯৮৪/৮৫ সালে রপ্তানী আয়ের ৪০% এ নেমে আসে। হাইড্রোকার্বন খাতের উন্নয়নের চাপ বর্তমানে কম পরিলক্ষিত হওয়ায় এই সহজ হয়ে আসা পরিবেশকে হাইড্রোকার্বন উন্নয়নের জন্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী সার্বিক জাতীয় নীতির আওতায় উৎপাদন—মুনাফা ভাগাভাগি নীতি গড়ে তোলার সুযোগ হিসেবে নেয়া উচিৎ। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহারের বর্তমান স্তর এবং বর্ধিত অর্থনীতিতে এর প্রত্যাশিত চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান মজুদ যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আত্মতুষ্টির কোন উৎস হতে পারে না। যুক্তিযুক্ত কাঠামোর মধ্যে গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান অব্যাহত রাখতে হবে যাতে সীমিত সম্পদ থেকে সার্বিক সুযোগ-সুবিধা সংগ্রহ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়। অর্থাৎ অনুসন্ধান, উন্নয়ন এবং ট্রান্সমিশন ও বিতরণের মধ্যে যুক্তিযুক্তভাবে এ ধরনের তহবিল বরাদ্দ করতে হবে।

২.২১। গ্যাসক্ষেত্র হতে প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক জ্বালানী সরবরাহ থেকে অর্থনীতিকে বঞ্চিত করা যেমন অযৌক্তিক হবে, তেমনি ভবিষ্যতে অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুসন্ধানের দ্বারা গ্যাস মজুদের বৃদ্ধি না ঘটিয়ে গ্যাসের সরবরাহ ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়াও হবে একটি বিবেকহীন কাজ। তাই হাইড্রোকার্বন উন্নয়ন নীতির পাশাপাশি অবশ্যই একটি সংরক্ষণ নীতিও গ্রহণ করতে হবে যাতে সম্পদ সংকট সত্ত্বেও অনুসন্ধান ও উন্নয়নের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা যায়। হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে উন্নয়ন ও অনুসন্ধানের মধ্যে ভারসাম্যতা শর্তে তহবিল বরাদ্দের জন্যে একটি ন্যূনতম বিধি গ্রহণ করা যায়। প্রতিটি গ্যাস কূপের উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতি অবশ্যই ৩/৪টি কূপের অনুসন্ধানের জন্য প্রতিশ্রুতির সাথে ভারসাম্য রেখে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গ্যাস মজুদ বজায় রাখা যায়।

২.২২। এই খাতের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন এবং গ্যাসের মত ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের চাহিদা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একটি যুক্তিযুক্ত মূল্যনীতি অত্যন্ত মূল্যবান হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হবে। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে এধরনের একটি গ্যাস মূল্যনীতি গড়ে তুলতে হবে:

(ক) সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী গ্যাসভিত্তিক শিল্পের জন্য গ্যাসের FOB মূল্য অবশ্যই BTU ভিত্তিতে তুলনামূলক অবস্থায় গ্যাসের রূপান্তরের হারের সমন্বয় সাপেক্ষে অশোধিত তেলের সমানুপাতিক হতে হবে।

(খ) পূর্বাঞ্চলে শিল্পে গ্যাস ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত মূল্য পশ্চিমাঞ্চলে শিল্পে ব্যবহৃত তেল অথবা কয়লার মূল্যের সমান হতে হবে।

(গ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ বাজার কেন্দ্রিক সার শিল্পের জন্য গ্যাসের মূল্য এমন একটি স্তরে নির্দিষ্ট করতে হবে যা উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সাহায্য করবে।

উপরের প্রেক্ষাপটে গ্যাসের বর্তমান মূল্য কাঠামো পুনর্বিবেচনা করা হবে যাতে গ্যাসের গড় মূল্যে এই খাতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রান্তিক ব্যয় মেটানোর পরও প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য একটা ভাড়া/মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।

২.২৩। উপরের ২.১৮ অনুচ্ছেদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান এবং উন্নয়নে দেশকে অধিক মাত্রায় আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে জনশক্তি উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্প নীতি ও কর্মসূচী অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজনের সমর্থনের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস ইনস্টিটিউটকে কার্যকর করা ছাড়াও দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ এবং আশাব্যঞ্জক প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপারে শিক্ষা কোর্সের পুনর্বিন্যাসেরও প্রয়োজন রয়েছে। কাজের ধরনের কারণে, প্রতিভাবান পেশাজীবীদের আকর্ষণ করতে এবং কর্মচারীদের মধ্যে সাড়া উজ্জীবিত করতে আর্থিক এবং অন্যান্য উৎসাহপ্রদ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২.২৪। তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন খাতকে আরও গতিশীল ও কর্মসূচীকেন্দ্রিক করার জন্য সুনির্দিষ্ট কাজকে গোষ্ঠিবদ্ধ করে সুনির্দিষ্ট কোম্পানী গঠনের জন্য সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে (ক) অনুসন্ধান ও উৎপাদন, (খ) ট্রান্সমিশন ও বিতরণ এবং (গ) খনিজ পদার্থ ও খনিসমূহের জন্যে পৃথক কোম্পানী গঠনের চিন্তা হবে সুবিবেচনাপ্রসূত। অনুসন্ধানকে উৎপাদন থেকে সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নকরণ বিশেষতঃ মারাত্মক আর্থিক অসুবিধাজনক অবস্থায় তাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভংগীর ক্ষেত্রে ঘাটতি সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

২.২৫। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বাস্তবায়নের জন্যে প্রণীত কর্মসূচীসমূহ নীচে আলোচিত হলো।

তেল, গ্যাস ও খনিজ উন্নয়ন

২.২৬। **জরীপ/অনুসন্ধান :** বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের পরিধি সুনিশ্চিত করা এবং তেল ও গ্যাসের সম্ভাবনাময় আরও কাঠামো আবিষ্কার ও চিহ্নিত করার জন্যে পরিকল্পনাকালে ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক জরীপ জোরদার করা হবে। চিহ্নিত অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা এবং বিদ্যমান ক্ষেত্রসমূহের উপর বাস্তবায়নাধীন এবং প্রাথমিক পর্যবেক্ষণমূলক ভূকম্পন জরীপ শেষ করা ছাড়াও কমপক্ষে ৩০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় অঞ্চলে অতিরিক্ত মাধ্যাকর্ষণ ও ভূকম্পন জরীপের কাজ হাতে নেয়া হবে। BOGMC কর্তৃক পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে কম-বেশী সম সংখ্যায় মোট ৬—৮ অনুসন্ধানমূলক খনন কাজ বাস্তবায়িত করা হবে। বিশেষ করে পশ্চিম অঞ্চলে অনুসন্ধানের জন্য উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তির (PSC) মাধ্যমে বেসরকারী খাতকে অনুসন্ধান কাজে জড়িত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভিত্তি মানচিত্র ও ব্লকসমূহ তৈরী করা হবে। বেসরকারী খাতের অধীনে ১৫—২০টি অনুসন্ধানমূলক কূপ খননের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

উন্নয়ন/ওয়ার্কওভার ও মূল্যানিরূপণ কূপ

২.২৭। নীচের ২.২ সারণিতে প্রদর্শিত অভিক্ষিপ্ত চাহিদা মেটাতে তৃতীয় পরিকল্পনার জন্যে অতিরিক্ত ১৭টি উন্নয়ন/ওয়ার্কওভার কূপের পরিকল্পনা করা হয়েছে। অন্যান্যের মধ্যে বেগমগঞ্জ, ফেনী এবং সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন বিবেচনা করা হবে। এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে মোট সরবরাহ ক্ষমতা ১৯৮৯/৯০ সালের অভিক্ষিপ্ত চাহিদার চেয়ে ৩০% বেশী থাকবে। কোন কোন বিদ্যমান উৎপাদন কূপের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই বাড়তি দক্ষতা প্রয়োজন। আশা করা হচ্ছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানী প্রয়োজনের ৬৮% প্রাকৃতিক গ্যাস মেটাবে। এছাড়াও ৪টি প্রধান ক্ষেত্রে পাওয়া মজুদের পরিমাণ সুনিশ্চিত করতে ৬টি মূল্যনিরূপণ খনন কাজ চালানো হবে। উন্নয়ন/ওয়ার্কওভার এবং মূল্যনিরূপণ কূপের তালিকা ২.৩ সারণিতে দেয়া হলো :

সারণি ২.২

সর্বোচ্চ-সময়ে গ্যাস চাহিদার পূর্বাভাস

(MMCFD তে)

ব্যবহার	১৯৮৪/৮৫	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৬/৮৭	১৯৮৭/৮৮	১৯৮৮/৮৯	১৯৮৯/৯০
১। বিদ্যুৎ	২০০	২৩০	২৫০	২৭০	৩০০	৩৪৬
২। সার	১৫০	১৬০	১৬০	১৮০	১৮০	১৮০
৩। অন্যান্য (শিল্প/ বাণিজ্যিক/ আবাসিক)	১৫০	১৭৫	২০০	২৩০	২৭০	৩১০
(ক) মোট চাহিদা:	৫০০	৫৬৫	৬১০	৬৮০	৭৫০	৮৩০
(খ) সরবরাহের জন্য খাপখাওয়ানো পিক :	৪৫০	৫০০	৫৫০	৬১০	৭০০	৭৫০
(গ) T F A তে সর্বোচ্চ চাহিদা :	৩২০	৩৭০	৪১৫	৪৭৫	৫০০	৫৫৫

সারণি ২.৩

গ্যাসক্ষেত্র-অনুযায়ী চাহিদা ও সরবরাহের অভিক্ষেপ

(MMCFD তে)

	১৯৮৪/৮৫	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৬/৮৭	১৯৮৭/৮৮	১৯৮৮/৮৯	১৯৮৯/৯০	
১। তিতাস	৩৫৩	৩৯৮	৪৪৯	৫০৫	৫১৮	৫৫৫	চাহিদা
	৩১৫	৩৭৫*	৪০৫*	৪৩৫*	৪৬৫*	৫১০**	সরবরাহ
	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৮)	
২। জালালাবাদ	৪০	৪১	৪২	৪৪	৬৭	৬৭	চাহিদা
	৬০	৯০	১২০	১৫০	২১০*	২৪০**	সরবরাহ
	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৯)	(১১)	
৩। বাখরাবাদ	৫৮	৬৪	১০৫	১২২	১৩০	১৪০	চাহিদা
	৬০	১৫০*	১৮০*	২১০*	২৪০*	২৭০*	সরবরাহ
	(৫)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	
মোট:	৪৫১	৫০৩	৫৯৬	৬৭১	৭২৫	৭৬২	চাহিদা
	৪৩৫	৫১৫	৭০৫	৭৯৫	৯১৫	১০২০	সরবরাহ

* তিতাস এলাকায় গ্যাস সরবরাহের ঘাটতি বাখরাবাদ এলাকা থেকে মেটানো হবে।

** টিএফএ-র ঘাটতি উত্তর-দক্ষিণ পাইপ লাইনের মাধ্যমে জালালাবাদ এলাকা থেকে মেটানো হবে।

টীকা ঃ লাইনের উপরের সংখ্যা চাহিদার নির্দেশক এবং লাইনের নীচেরটা সরবরাহের। বন্ধনীর মধ্যকার অংক প্রতি এলাকায় উৎপাদন/উন্নয়ন কূপের সংখ্যা নির্দেশ করে।

২.২৮। **ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ :** প্রয়োজনীয় বহিরাবরণ সুবিধাদিসহ বাস্তবায়নাধীন ট্রান্সমিশন ও বিতরণ লাইনসমূহ শেষ করা ছাড়াও (ক) কৈলাশটিলা-বিয়ানীবাজার-রশিদপুর-হবিগঞ্জ-আশুগঞ্জ (উত্তর-দক্ষিণ) গ্যাস পাইপ লাইন, (খ) ভৈরব বাজার—কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ—জামালপুর পাইপ লাইন এবং (গ) জয়দেবপুর—টাংগাইল—জামালপুর পাইপ লাইন নামে আরও ৩টি ট্রান্সমিশন লাইন তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শেষ করা হবে। তিতাস এলাকা, বাখরাবাদ এলাকা এবং জালালাবাদ এলাকার গ্যাস বিতরণ নেট-ওয়ার্ক পরিকল্পনাকালে সম্প্রসারিত করা হবে। ব্রহ্মপুত্র এলাকায় ট্রান্সমিশন লাইন এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিৎ যাতে ভবিষ্যতে তা যমুনা নদী অতিক্রম করে পশ্চিম অঞ্চলে সম্প্রসারিত করা যায়।

২.২৯। **পশ্চিম অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ :** পশ্চিমাঞ্চলে জ্বালানী চাহিদার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যমুনা সেতুর পাশ দিয়ে গ্যাস লাইনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ হাতে নেয়া হবে।

২.৩০। তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্যাস উপখাতের লক্ষ্যমাত্রা নীচে দেয়া হলো :

সারণি ২.৪

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গ্যাস ও তেল উন্নয়ন

	১৯৮৪/৮৫ স্থিতাবস্থা	১৯৮৫-৯০ বৃদ্ধি	১৯৮৯/৯০ মোট
গ্যাস :			
(১) গ্যাসের সর্বোচ্চ চাহিদা (MMCFD)	৪৫০	৩০০	৭৫০
(২) গ্যাস সরবরাহ (MMCF)	৯৪,৬০০	৮৫,৪০০	১,৮০,০০০
(৩) গ্রাহকদের সংযোগ (সংখ্যা)	২,৪০,০০০	১,৬০,০০০	৪,০০,০০০
(৪) অনুসন্ধান কূপ (সংখ্যা)	৪২	৮	৫০
(৫) উন্নয়ন/ওয়ার্ক ওভার কূপ	২১	১৭	৩৮
(৬) ট্রান্সমিশন লাইন (মাইল)	৪০০	৩৫০	৭৫০
(৭) বিতরণ লাইন (মাইল)	২,০০০	২,০০০	৪,০০০
(৮) মূল্যনিরূপণ কূপ (সংখ্যা)	—	৬	৬
(৯) জরীপ (বর্গ কিলোমিটার)	১০,০০০	৫,০০০	১৫,০০০
২। তেল/তেল সামগ্রী (লাখ টন)	১৫,০০,০০০	১,০০,০০০	১৬,০০,০০০

পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য

২.৩১। বাংলাদেশে ১৫ লাখ টন অশোধিত তেল শোধনের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ছোট শোধনাগার রয়েছে। কতিপয় গুরুত্বপূর্ন পেট্রোলজাত সামগ্রীর ক্ষেত্রে এর উৎপাদন চাহিদার তুলনায় স্বল্প বিধায় ৫ লাখ টনের মত শোধিত তেল আমদানি করতে হয়; ফলে অশোধিত তেল আমদানির বিল বেড়ে যায়। শোধনাগারটির ক্ষমতার ৬০% বর্তমানে চালু রয়েছে। অংশতঃ পুরোনো হয়ে যাওয়ায় ও সময়ের পরিসরে দক্ষতা কমে যাওয়ায় এবং অংশতঃ অশোধিত তেল আমদানির তুলনায় তেল সামগ্রী আমদানির সুবিধা থাকায় এটা ঘটেছে। যেহেতু এটা প্রত্যাশা করা হয় যে, ভবিষ্যতে জ্বালানীর বর্ধিত চাহিদা মূলতঃ দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে মেটানো হবে, সামান্য রদবদলসহ অশোধিত তেল ও পেট্রোলজাত সামগ্রীর বর্তমান পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

২'৩২। বর্তমানে এই শোধনাগার মাঝারি মানের শোধিত তেলের (ডিজেল/কেরোসিন এবং জেপি) প্রায় ৫০ % চাহিদা মিটিয়ে থাকে এবং বাকীটা আমদানি করা হয়। গত দেড় বছর ধরে বছরে প্রায় ১,০০,০০০ টন হারে ফার্নেস তেলও আমদানি করা হচ্ছে। যদি শোধনাগারটি পুরোদমে চালু থাকে তাহলে বছরে ২,৫০,০০০ টন ফার্নেস তেল উদ্বৃত্ত থাকবে। চট্টগ্রাম এলাকায় বাখরাবাদ গ্যাসের স্থানান্তরের কারণে ফার্নেস তেলের বার্ষিক চাহিদা বছরে ১,২৫,০০০ টন কমে গেছে। কিন্তু তুলনায় ১১০ মেগাওয়াটের ফার্নেস তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যাণ্ট স্থাপন করার এই চাহিদা আবার আগের চেয়েও অনেক বেড়ে গেছে। পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃসংযোগকারী উন্নয়নের প্রভাব পূর্ব অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে ফার্নেস তেলের চাহিদার উপর অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। বিশেষ করে সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র যখন পুরোপুরি গ্যাস দ্বারা চালিত হবে তখন এটা ঘটবে। গ্যাস ক্ষেত্র থেকে কনডেনসেট-এর বর্ধিত সরবরাহের ফলে ন্যাফথার আভ্যন্তরীণ চাহিদা আরও কমে যাবে; ফলে রপ্তানির জন্যে আরও উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে। এই পরিস্থিতি এড়াতে (ক) দ্বিতীয় পর্যায়ের রূপান্তর সুবিধাদির সাহায্যে উদ্বৃত্ত ফার্নেস তেলকে HSD-এ উন্নীত করা হবে এবং (খ) ন্যাফথার পরিমাণ কমানোর জন্য একটা ন্যাফথা বিভাজনকারী সংযোজন করা হবে যার ফলে কেরোসিনের সাথে এটা মিশিয়ে মাঝারিমানের শোধিত তেলের সরবরাহ বাড়ানো হবে। এটা আশা করা যাচ্ছে যে, অশোধিত তেলের পরিমাণ বাড়ানো ছাড়াই এসমস্ত অতিরিক্ত সুবিধাদির ফলে প্রায় ১,৫০,০০০ টন অতিরিক্ত মাঝারি শোধিত তেল পাওয়া যাবে। এছাড়াও উত্তর বংগে LPG পরিবহন এবং জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পুনরায় জ্বালানী ভরার সুবিধাদির জন্যে সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের মত প্রকল্পসমূহ হাতে নেয়া হবে। তাই তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে একমাত্র ইষ্টার্ণ রিফাইনারি পুনর্বাসন প্রকল্পই বাস্তবায়ন করা হবে।

ভূতাত্ত্বিক জরিপ

২'৩৩। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রধান কর্ম তৎপরতাসমূহ হবে (১) বেস লাইন ভূতাত্ত্বিক, ভূপ্রাকৃতিক এবং ভূ-রাসায়নিক উপাত্ত সংগ্রহ বিশেষ করে আকাশ থেকে তোলা ছবি এবং অন্যান্য দূর-নিরীক্ষণ কৌশল ব্যবহার করে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরী; (২) কয়লা, চুনাপাথর, কেওলিন নামের খনিজের জন্যে বিস্তারিত অনুসন্ধান এবং শিলাস্তরের নীচে সম্ভাব্য ধাতব খনিজের মজুদ ও গঠন প্রক্রিয়া অনুসন্ধান; (৩) কাঁচ তৈরীর বালি, সাদা কাদামাটি, পাললিক কাদা ও নদীর বালির বিস্তৃত সমীক্ষা; (৪) শহরাঞ্চলের মধ্যে ও আশেপাশে নির্মাণ কাজের জন্য ভূপ্রযুক্তিগত মানচিত্র প্রণয়ন; (৫) পানি সম্পদের সমীক্ষা, বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ উপাত্তের বিশ্লেষণ; (৬) ষ্ট্রাটিগ্রাফিক গবেষণা, ভূ-প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ভূস্তরের নীচের স্তরসমূহ পরীক্ষা এবং সংগৃহীত নমুনার ভূ-রাসায়নিক ও খনিজ বিশ্লেষণ, এবং (৭) মানচিত্র ও রিপোর্ট প্রকাশ করা।

২'৩৪। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হবে নিম্নরূপ:

(ক)	আঞ্চলিক ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রণয়ন	৭০০০	বর্গমাইল
(খ)	খনিজ অনুসন্ধান	৪০০	বর্গমাইল
(গ)	ছিদ্রপথ খনন (৫টি ছিদ্র)	১০,০০০	ফুট
(ঘ)	ভূ-কারিগরি জরীপ	৭৫০	বর্গমাইল
(ঙ)	ভূ-গর্ভস্থ পানির সমীক্ষা	১,০০০	বর্গমাইল
(চ)	ষ্ট্রাটিগ্রাফিক গবেষণা	১০	টি শাখা
(ছ)	পরীক্ষাগারে নমুনা বিশ্লেষণ	১,১০০	টি নমুনা
(জ)	মাধ্যাকর্ষণ ও চৌম্বক জরীপ	১,৫০০	বর্গমাইল
(ঝ)	ভূকম্পন জরীপ	৯০	লাইন মাইল
(ঞ)	পরীক্ষামূলক খনন (৪টি ছিদ্র)	৮,০০০	আর এফ টি

২.৩৫। উপরের কর্মসূচীসমূহ হাতে নেয়ার জন্য ভূতাত্ত্বিক জরীপ পরিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা আধুনিক পরিকল্পনার সাহায্যে জোরদার করার প্রয়োজন হবে। পর্যাপ্ত সাংগঠনিক সমর্থনের অভাবে OGMR খাতের এই ক্ষেত্র অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝা যায় এ তথ্য থেকে যে অর্থনীতির খনিজভিত্তি সবচেয়ে দুর্বল হবার ফলে দেশ আমদানির উপর গুরুতরভাবে নির্ভরশীল।

অর্থ বরাদ্দ

২.৩৬। OGMR উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়িত করতে সরকারী খাতের অধীনে ১২৯৫ কোটি টাকা (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে) বরাদ্দ করা হয়েছে। এই পরিমাণ পরিকল্পনাকালে সরকারী খাতে মোট ২৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রায় ৫.২% এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার আনুপাতিক বরাদ্দের চেয়ে সামান্য কম। এই বরাদ্দের প্রায় ৩০% স্থানান্তর প্রকল্পগুলোর জন্য ব্যয় হবে। অবশ্য হাইড্রোকার্বন (তেল/গ্যাস) অনুসন্ধানের জন্য বেসরকারী খাতের বিনিয়োগের অধীনে ৫০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এভাবে এই খাতের জন্য মোট বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ১৭৯৫ কোটি টাকা বা পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের ৪.৬%। বরাদ্দের প্রধান অংশ (সরকারী খাতে বিনিয়োগের প্রায় ৮৭%) বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সংস্থাকে দেয়া হবে। শিল্পখাতের অধীনে খনিজসম্পদ উন্নয়ন ও খননের জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২.৩৭। সংস্থা-ওয়ারী এবং কর্মতৎপরতা-ওয়ারী অর্থ বরাদ্দের বিভাজন ২.৫ এবং ২.৬ সারণিতে দেখানো হলো :

সারণি ২.৫

সংস্থা-ওয়ারী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থ বরাদ্দ

(১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

সংস্থা	সরকারী খাত	বেসরকারী খাত	মোট
(১) বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সংস্থা	১১২৫	৫০০	১৬২৫
(২) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম সংস্থা	১৩০	—	১৩০
(৩) বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ	৩০	—	৩০
(৪) পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (BPI সহ)	১০	—	১০
মোট :	১২৯৫	৫০০	১৭৯৫

সারণি ২.৬

কর্মতৎপরতা-ওয়ারী OGMR খাতের অর্থ বরাদ্দ

(১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচী	নূতন প্রকল্প	স্থানান্তর প্রকল্প	মোট
অ. বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সংস্থা :			
(ক) জরীপ ও অনুসন্ধান :			
(১) জরীপ (ভূকম্পন/মাধ্যাকর্ষণ)	১০	৩০	৪০

সারণি ২.৬ (ক্রমশঃ)

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচী		নূতন প্রকল্প	স্থানান্তর প্রকল্প	মোট
	(২) অনুসন্ধান খনন (৬-৮ কূপ)	১০০	৩০	১৩০
	(৩) রিগ ও অন্যান্য সরঞ্জাম	—	৩০	৩০
	উপ-মোট (ক) :	১১০	৯০	২০০
(খ)	উৎপাদন/মূল্যানিরূপণ খনন :			
	(১) উৎপাদন কূপ (৮—১০)	১২৫	২০	১৪৫
	(২) ওয়ার্কওভার কূপ (৪—৫)	৫০	—	৫০
	(৩) মূল্যানিরূপণ কূপ (৬)	৮০	—	৮০
	(৪) খনন রিগ ও অন্যান্য	২৫	—	২৫
	উপ-মোট (খ):	২৮০	২০	৩০০
(গ)	ট্রান্সমিশন :			
	(১) উত্তর-দক্ষিণ পাইপ লাইন (১১৭ মাইল)	১৬০	—	১৬০
	(২) ভৈরব-জামালপুর পাইপ লাইন (২০০ মাইল)	১২০	—	১২০
	(৩) বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম পাইপ লাইন (১১০ মাইল)	—	২০	২০
	উপ-মোট (গ) :	২৮০	২০	৩০০
(ঘ)	বিতরণ :			
	(১) ব্রহ্মপুত্র গ্যাস বিতরণ (১৫০ মাইল)	২০	—	২০
	(২) বৃহত্তর ঢাকা গ্যাস বিতরণ (৫০০ মাইল)	২০	৫০	৭০
	(৩) জালালাবাদ গ্যাস বিতরণ (৩০০ মাইল)	২৫	—	২৫
	(৪) দক্ষিণ-পূর্ব গ্যাস বিতরণ (১০০০ মাইল)	১৫	১০০	১১৫
	(৫) সিলেট চা বাগান গ্যাস বিতরণ (১০০ মাইল)	৩০	৫	৩৫
	উপ-মোট (ঘ) :	১১০	১৫৫	২৬৫
(ঙ)	CNG বাণিজ্যিককরণ ও বিবিধ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	১০	—	১০
(চ)	প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে LPG উদ্ধার	৫০	—	৫০
	মোট (অ) :	৮৪০	২৮৫	১১২৫

সারণি ২.৬ (ক্রমশঃ)

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচী	নুতন প্রকল্প	স্থানান্তর প্রকল্প	মোট
আ. **বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন :**			
(ক) ইষ্টার্ণ রিফাইনারীর BMR	—	২০	২০
(খ) ERL এর দ্বিতীয় স্তরের রূপান্তর	৯০	—	৯০
(গ) উত্তরবংগে LPG পরিবহণ	২০	—	২০
মোট (আ) :	১১০	২০	১৩০
ই. বাংলাদেশ ভূতাত্বিক জরীপ বিভাগ :	—	৩০	৩০
ঈ. পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (BPT সহ):	—	১০	১০
মোট (অ. থেকে ঈ. পর্যন্ত) : (সরকারী খাতের বরাদ্দ)	৯৫০	৩৪৫	১২৯৫
হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের জন্য বেসরকারী খাতের বরাদ্দ (১৫—২০ কুপ) :	৫০০	—	৫০০
সর্বমোট (সরকারী ও বেসরকারী):	১৪৫০	৩৪৫	১৭৯৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সনাতন, নতুন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদ

এযাবত উন্নয়ন চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত সনাতন ও বাণিজ্যিক জ্বালানীরূপে জ্বালানীর বিদ্যমান বিভক্তিতে আপাতঃদৃষ্টিতে প্রচলিত ধারণার চেয়ে অনেক বেশী সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। কারণ বাণিজ্যিক জ্বালানী প্রধানতঃ নবায়নযোগ্য নয় এবং সনাতন জ্বালানী পুরোপুরিভাবে নবায়নযোগ্য। তাই বাণিজ্যিক জ্বালানীর উপর জোর দেয়াটা এক তরফা (ব্যবহারের দ্বারা) যা সংরক্ষণনীতিকে-এর উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। অপরদিকে, নবায়নযোগ্য হলেও সনাতন জ্বালানীকেও খুব একটা নবায়িত করা হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে তৃতীয় পরিকল্পনায় নতুন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদের উন্নয়নের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.২। জ্বালানীর নতুন এবং নবায়নযোগ্য উৎসের মধ্যে রয়েছে সকল জৈব জ্বালানী এবং সূর্যকিরণ, বায়ু, পানি, স্রোত ইত্যাদির মত অজৈব উৎস। জৈব জ্বালানী বাংলাদেশের পল্লী এলাকার জ্বালানীর প্রধান উৎস। মোট জনসংখ্যার ৯০% এরও বেশী রান্নাবান্না, ধান সেদ্ধ করা, গুড় তৈরী এবং অন্যান্য তৎপরতার জন্যে জৈব জ্বালানীর সনাতন উৎসের উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও চা প্রক্রিয়াজাতকরণ, আখ প্রক্রিয়াজাতকরণ, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ইট পোড়ানো, মৃৎশিল্প, সাবান তৈরী, চুনা তৈরী, কামারের কাজ, ইত্যাদির মত শিল্পসমূহের জৈব জ্বালানী ব্যবহৃত হয়। ৮০% এরও বেশী জ্বালানী এককভাবে সনাতন উৎস থেকে আসে। কিন্তু সনাতন জৈব জ্বালানীর সরবরাহ ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে। কৃষিজাত আবর্জনা অধিকতরভাবে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য সরিয়ে নেয়ায় জমির উর্বরতার বিরূপ প্রভাব পড়ছে এবং জ্বালানী ও অন্যান্য ব্যবহারের জন্য নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশগত ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা মূল্যায়ন

৩.৩। দেশে বিশেষ করে পল্লী এলাকায় জ্বালানী সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে একটি সমন্বিত গবেষণা ও কারিগরি উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যাতে প্রচলিত জ্বালানী কাঠের পাশাপাশি নতুন ও নবায়নযোগ্য উৎস ব্যবহার করা যায়। এ সম্পর্কে নবম অধ্যায়ের কৃষি খাতে আলোচনা করা হয়েছে। "বাংলাদেশে গ্রামীণ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তির সমন্বিত উন্নয়ন ও উত্তরণ (৮টি উপ-প্রকল্পসহ)" প্রকল্পের অধীনে ৩ বছর সময়ের জন্যে (১৯৮৪—৮৭) সূর্যকিরণের সাহায্যে পাম্প চালানো এবং সৌরশক্তি ব্যবহার করে হাইড্রোজেন উৎপাদনের কাজ হাতে নেয়া হয়। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক সাভারে একটি সৌর পাম্প বসানো হয় যা সৌর ফটো-ভলটেইক সেল ব্যবহার করে ৬০ ফুট গভীরতা থেকে প্রতি মিনিটে গড়ে ৩০ গ্যালন পানি উত্তোলন করতে পারে। এর কারিগরী অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, পরিচালন দক্ষতার উন্নয়ন, সর্বোচ্চ ব্যবহার, ইত্যাদি বর্তমানে মূল্যায়নাধীন রয়েছে। সৌর শক্তি ব্যবহার করে পানি থেকে হাইড্রোজেন উৎপাদনের জন্য সমীক্ষার কাজ ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগ হাতে নিয়েছিলো। পরীক্ষাগার স্তরের অনুসন্ধান শেষ হয়ে এটা এখন হাইড্রোজেন উৎপাদনের জন্য একটা নমুনা ইউনিট গড়ে তোলার পর্যায়ে পৌঁছেছে।

৩.৪। সুবিধাজনক স্বল্পব্যয়ের জৈবগ্যাস প্ল্যান্ট উন্নয়নের জন্য BAU, BCSIR, DEPC ইত্যাদি সংস্থা দ্বারা গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। BAU-তে বিভিন্ন কৃষিজাত আবর্জনা এবং তাদের মিশ্রণ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জৈবগ্যাস প্রস্তুতকারক নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য এ সমস্ত ফলাফল মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। গোবর-ভিত্তিক আটকানো চিমনিযুক্ত ও ভাসমান চিমনিযুক্ত-জৈবগ্যাস প্ল্যান্ট নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে BCSIR একটি পারিবারিক আকারের সস্তা জৈবগ্যাস প্ল্যান্ট উদ্ভাবন করেছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে মালিকের নিজের ব্যয়ে BCSIR মাত্র ৭৫টি জৈবগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। কিন্তু এর চাহিদা অনেক বেশী। ২১৯টি জৈবগ্যাস প্ল্যান্ট (১১০টি আটকানো চিমনিযুক্ত এবং ১০৯টি ভাসমান চিমনিযুক্ত) DEPC-র তত্ত্বাবধানে সরকারী ব্যয়ে জেলা ও উপজেলা সদরদপ্তরগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫০ ইউনিট।

৩.৫। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গ্রাম্য চুলার (মাটির রন্ধন যন্ত্র) দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। BCSIR স্বল্পমূল্যের এবং সরল নক্সাবিশিষ্ট কতিপয় ধরনের চুলা উদ্ভাবন করে যা প্রায় ৫০—৭০% জ্বালানী কাঠের সাশ্রয় করতে সক্ষম। তারা ৪১৫ টাকা ব্যয়সম্পন্ন সৌর চুলাও উদ্ভাবন করে, যার দ্বারা উজ্জ্বল দিবালোকে ৫-৬ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের জন্য দুপুরে আহার রান্না করা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবহাওয়া দপ্তরের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে আবহাওয়ার গতিবেগ সমীক্ষা করে দেখতে পায় যে, সেচের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে বায়ুকল স্থাপনের জন্য উপকূলীয় এলাকা বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অত্যন্ত উপযোগী হবে। সৌর ফটোভলটেইক সেল উদ্ভাবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিদ্যালয় যথেষ্ট অগ্রগতিসাধন করেছে।

৩.৬। প্রধান সমস্যা হচ্ছে নতুন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উৎস (NRSE) সংক্রান্ত প্রযুক্তিকেন্দ্রিক তৎপরতা বর্তমানে নিদেনপক্ষে পাঁচটি মন্ত্রণালয় এবং আটটি সংস্থার মধ্যে ছড়িয়ে আছে এবং এগুলোর মধ্যে কার্যতঃ কোন সমন্বয় নেই। BAEC, BCSIR, DEPC, BWDB, DU, BUET, BAU, RU,-এর মত কিছু সংখ্যক গবেষণা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ অর্থনীতিতে জ্বালানীর গুরুত্বপূর্ণ উৎসরূপে জৈব-জ্বালানী, সূর্যকিরণ, বায়ু ইত্যাদির দক্ষ ব্যবহারের জন্য উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এধরনের তৎপরতা অধিক্রমন হচ্ছে এবং একাধিকবার করা হচ্ছে, ফলে মূল্যবান জাতীয় সম্পদের অপচয় ঘটছে। পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যেও পানি ও খনিজ সামগ্রীর মত প্রাকৃতিক সম্পদের

ব্যবহার এবং নতুন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদ ও প্রযুক্তি উন্নয়নের সাথে সরাসরি জড়িত সেক্টরসমূহের মধ্যে যথেষ্ট সমন্বয় নেই। দ্বিতীয়তঃ যে ক্ষেত্রের উপর গবেষণার যথেষ্ট দৃষ্টি দেয়া হয়নি তা হচ্ছে কৃষি-সামগ্রী বিশেষ করে খাদ্যশস্য শুকানোর সমস্যা এবং ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ (অর্থাৎ ধান সেদ্ধ করা)। উৎপাদন সম্প্রসারণের সাথে সাথে ফসল কাটার পরবর্তী প্রযুক্তি ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

৩'৭। উপরে বর্ণিত অর্জিত অগ্রগতি এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনা করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫—৯০) NRSE এর উন্নয়নের জন্য নীচের উদ্দেশ্যাবলী ধার্য করা হয়েছে।

(১) জৈবজ্বালানী, জৈবগ্যাস, সূর্যকিরণ, বায়ু, পানিস্রোত, ইত্যাদি দেশজ জ্বালানী সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের উপর জোর দিয়ে কৃষি, পানি ও জ্বালানীর ব্যবহার মধ্যে একটি ভারসাম্যতা অর্জন।

(২) নতুন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎসের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কারিগরি ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিদান।

(৩) নতুন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদের দক্ষ ও অর্থনৈতিক ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে সম্প্রসারণ/উদ্বুদ্ধকরণ সার্ভিস প্রবর্তন।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

৩.৮। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নিম্নোক্ত প্রধান লক্ষ্যসমূহ নির্দিষ্ট করা হয়েছে :

(১) বাংলাদেশব্যাপী ৫০০০ জৈবগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ (প্রতি ইউনিয়নে কমপক্ষে একটি)।

(২) ৭০০,০০০ উন্নত একক শিখাবিশিষ্ট স্টোভ এবং ১০,০০০ একাধিক শিখাবিশিষ্ট স্টোভ তৈরী ও বিতরণ।

(৩) জৈব জ্বালানী/সৌর জ্বালানী/বায়ু, ইত্যাদির নকশা প্রণয়নে সহায়তা সার্ভিস ও বিস্তারের জন্য গ্রামসমূহে ৫ (পাঁচ)টি পল্লী জ্বালানী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

সংশোধিত নীতি

৩'৯। উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালে নিম্নোক্ত নীতিসমূহ অনুসরণ করা প্রয়োজন :

(১) জৈবজ্বালানী, সৌর, বায়ু, ইত্যাদি থেকে জ্বালানী বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ বৃদ্ধির মাধ্যমে NRSE উন্নয়নের জন্য যথাযোগ্য জোর দিতে হবে।

(২) দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষাকরে জ্বালানী-কয়লা, গ্যাস, ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করে ইট পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কাঠের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলসমূহ

৩'১০। নতুন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদের জন্য ধার্যকৃত উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহের উপর প্রধানতঃ জোর দেয়া হবে :

(১) ঢাকায় কেন্দ্রীয় স্টেশন ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও কতিপয় স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে ফটোভোল্টেইক সেলের কৌশলসহ সৌর জ্বালানী সম্পদ নির্ধারণের উপর গবেষণা জোরদার করা হবে।

(২) BCSIR এর IFRD, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় BAEC-এর ইনষ্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স-এ ওয়েট এণ্ড সফ্টওয়্যারের উপর আলোকপাতসহ পর্যায়ক্রমে সিলিকন প্রযুক্তির উন্নয়ন কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে।

(৩) দেশের বিভিন্ন অংশে স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত পাঁচটি গ্রামীণ জ্বালানী কেন্দ্র প্রমাণিত NRSE প্রযুক্তির বিস্তার ঘটাবে এবং সমন্বিত পন্থায় ফটোভোল্টেইক সেল/বায়ু/জৈব-জ্বালানীর ব্যবহারের মাধ্যমে সেচের জন্য পানি উত্তোলন, ছোট গ্রামীণ (বস্ত্র) শিল্প চালানো এবং মৎস্য ও সব্জী সংরক্ষণের জন্য বরফ তৈরী করতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। এর মাধ্যমে সহায়তা সার্ভিসেরও ব্যবস্থা হবে।

(৪) জৈবজ্বালানী এবং কৃষিজাত ও শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থের তাপ-রাসায়নিক ও অন্যান্য সংরক্ষণের জন্য দক্ষ প্রযুক্তি (গ্যাসিফায়ার, পাইরোলাইসিস, ব্রিকেয়েটিং ইত্যাদি) গড়ে তোলা হবে।

(৫) প্রশিক্ষণ, প্রদর্শন, সংবাদ মাধ্যম, প্রচারপত্র, পুস্তিকা ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎসের কার্যকর ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সংস্থায় উদ্ভাবিত কৃতকার্য প্রযুক্তি সাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ করা হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার ভৌত কর্মসূচী

৩'১১। **জৈব জ্বালানী সংরক্ষণ এবং রূপান্তর প্রযুক্তি উন্নয়ন :** বিভিন্ন কৃষিজাত ও শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থকে জ্বালানীতে রূপান্তরের উন্নয়নমূলক তৎপরতা সমন্বিত পন্থায় চালানো হবে। জৈবগ্যাস প্ল্যান্ট (কৃষিজাত বর্জ্য ও আবর্জনা ব্যবহার করে), রান্নার স্টোভ, গ্রাম্য চুলার আরও উন্নয়নকল্পে BCSIR, BAU, BUET প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চালানো হবে। শহর ও পল্লী অঞ্চলে উভয় ক্ষেত্রের গৃহস্থালীর জন্য ফলিত গবেষণার মাধ্যমে স্টোভের দক্ষতার আরও উন্নতি ঘটানো হবে এবং স্টোভ নির্মাতা ও সম্প্রসারণ লোকজনদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এর ব্যবহার প্রসারিত করা হবে। BCSIR এর IFRD র তত্ত্বাবধানে ৭ লাখ উন্নত একশিখাযুক্ত স্টোভ এবং ১০ হাজার উন্নত বহুশিখাযুক্ত স্টোভ নির্মাণ ও বিতরণ করা হবে।

জৈবগ্যাস উৎপাদন

৩'১২। BCSIR-এর IFRD প্রায় ৫০০০ প্রদর্শনমূলক জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট (প্রতি ইউনিয়নে কমপক্ষে একটি) নির্মাণ করবে। গ্রামীণ জ্বালানী কেন্দ্রগুলো সহায়তা সার্ভিসের ব্যবস্থা করবে এবং BCSIR-কে হস্তান্তরের জন্য কার্যকরী উপাত্ত সংগ্রহ করবে।

সৌর এবং অন্যান্য জ্বালানী উৎসসমূহের উন্নয়ন

৩'১৩। বহুমুখী ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে সৌর জ্বালানীর উপর উন্নয়ন ও উদ্ভাবন উভয় ধরনের কাজ হাতে নেয়া হবে। সৌর জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিসমূহ আরও পরীক্ষা ও উন্নত করা হবে। রান্না, গরম করা ইত্যাদির জন্য ফটোভোল্টেইক সেল ব্যবহার করে পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য সৌর জ্বালানীর ব্যবহারের উপর BCSIR, BAEC, DU, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চালানো হবে। জৈবজ্বালানী, ক্ষুদে জলপ্রবাহ, বায়ু, নদীর পানি প্রবাহ ইত্যাদির মত বিবিধ জ্বালানীর উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ BWDB, BCSIR, BAEC, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হাতে নেবে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পশু দ্বারা বহনকারী যন্ত্রপাতির আরো উন্নয়নের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে।

অর্থ বরাদ্দ

৩'১৪। উৎপাদন, সংরক্ষণ, রূপান্তর, ব্যবহার, ইত্যাদিসহ NRSE-র বিভিন্ন দিকের উপর গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতার কাজ হাতে নেয়ার জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ব্যবহারকারীদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

অর্থ বরাদ্দ

৩.১৫। উপরে বর্ণিত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে ১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে মোট ২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কর্মসূচী-ওয়ারী বরাদ্দ নীচে দেয়া হলো :

সারণি ৩.১

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসূচী-ওয়ারী অর্থ বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচী	বরাদ্দ
(১) **গবেষণা ও উন্নয়ন :**	
(ক) জৈবজ্বালানী	২.০০
(খ) সৌর	৫.৫২
(গ) বিবিধ	২.৯৮
উপ-মোট :	১০.৫০
(২) **উন্নতি :**	
(ক) জৈবজ্বালানী	৫.৫০
(খ) সৌর	১.৫০
(গ) বিবিধ	২.৫০
উপ-মোট :	৯.৫০
মোট :	২০.০০

দ্বাদশ অধ্যায়

পরিবহন ও যোগাযোগ

পরিচ্ছেদ ১ঃ পরিবহন

বাংলাদেশে ৪,৮২৭ কিলোমিটার পাকা মূল ও সংযোগকারী সড়ক, ২,৮৯২ কিলোমিটার রেলপথ এবং ৪,৮২৭ কিলোমিটার সদানাব্য জলপথ রয়েছে। দেশের নদীবহুল প্রকৃতি তার সাথে মৌসুমী বন্যা-বানভাসি সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের অন্তরায়। আর বদ্বীপ সদৃশ্য ভূগঠনের ফলে পদ্মা ও যমুনা নদীতে লাখ লাখ টন পলি পড়ায় দেশের নদীপথ নাব্য রাখাও সমপরিমাণ কষ্টসাধ্য। নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের উচ্চ ব্যয়ের পাশাপাশি সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে পরিবহন অবকাঠামো স্বল্পোন্নত। বাংলাদেশে প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মাত্র ৭.৪৫ কিলোমিটার পাকা সড়ক রয়েছে, পক্ষান্তরে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর পরিমাণ হচ্ছে ১৬'৭৬ কিলোমিটার।

১'২। বর্তমান পরিবহন ব্যবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নিম্নতম চাহিদা প্রতিফলিত হয়েছে এবং তা এর উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত নয়। কারণ পণ্য পরিবহনের প্রধান চাহিদা আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের চলাচল থেকে উদ্ভব হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আমদানির পরিমাণ প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের চাইতে অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের রপ্তানি পণ্যের চেয়ে আমদানি পণ্যের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ। আমদানি-রপ্তানির এ-বৈষম্যের অর্থ হচ্ছে বিপরীতমাত্রায় পরিবহণ ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার এবং উচ্চতর পরিবহণ খরচ। কিন্তু এ পরিস্থিতি পরিহার করা কঠিন কারণ বৈদেশিক সাহায্য কাজে লাগাতে হলে আমদানি অবশ্যই রপ্তানির চেয়ে বেশী হবে। তবে অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে যাতে দীর্ঘ পথে মাল পরিবহণের দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা

১'৩। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বিদ্যমান অপ্রতুল পরিবহন ব্যবস্থার বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এজন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকাল (১৯৭৩—৮০) ছিল প্রধানতঃ পরিবহন ব্যবস্থার পুনর্বাসনকাল। অবশ্য সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে জরুরীভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আমদানির বাড়তি চাপ সামাল দেয়ার জন্যও কতিপয় উন্নয়ন কার্যক্রম নেয়া হয়। এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল ৮০৪.৫ কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নির্মাণ, চালনা সমুদ্র বন্দরে পাঁচটি স্থায়ী জেটি নির্মাণ, রেল ইঞ্জিন, বগি ও ওয়াগন সংগ্রহ, ১৮টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ, ড্রেজার সংগ্রহ ইত্যাদি। উল্লেখ্য ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৯ সালে যাত্রী চলাচল ৩৭% এবং পরিমাপের দিক থেকে পণ্য চলাচল ২১% বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৩ সালে রেল ও সড়ক একত্রে যেখানে ৩৬% পণ্য পরিবহন করেছে, ১৯৭৯ সালে তা বেড়ে প্রায় ৪১ শতাংশে দাঁড়ায়, তবে যাত্রী চলাচলে রেল ও সড়কের অংশ একই সময়কালে ৮০% থেকে কমে ৭৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ফলে জল পরিবহন এবং পরিবহন খাতের অন্যান্য উপখাতের মধ্যে যাত্রী চলাচল ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণেও কিছুটা পুনঃ বণ্টন ঘটে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল্যায়ন

১'৪। আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহন খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাতে ১৮১৯'০০ কোটি টাকা (১৯৮৩ সালের মূল্যমানে) বরাদ্দ দেয়া হয়। সড়ক উপখাতের উচ্চতর আত্মীকরণ ক্ষমতার জন্য বাড়তি বরাদ্দ দেয়ার ফলে অবশ্য এই খাতের প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ কিছুটা বেড়ে ১৯৪৩'৯৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সার্বিকভাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পরিবহন খাতের আর্থিক ও বাস্তব কার্য-সম্পাদন ছিল মিশ্র। নীচের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হবে।

১'৫। **বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ** পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ রেলওয়েকে ৫৫২'৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও প্রকৃত ব্যয় হয় ৫৪১.৩৪ কোটি টাকা। বাস্তব অগ্রগতির হিসেবে ডিজেল ইঞ্জিনের সংখ্যা ১৯৮০ সালের ১৯২টি থেকে বেড়ে ১৯৮৫ সালে ২৮৯টিতে দাঁড়ায়। রেল পথের দৈর্ঘ্য ২,৮৮৩'৯০ কিলোমিটার থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২,৮৯১'৮৫ কিলোমিটারে দাঁড়ায় এবং ৬৮৪ কিলোমিটার রেলপথ পুনঃনির্মাণ করা হয়। অবশ্য, মোট মালামাল পরিবহনের পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালের ৩'২ মিলিয়ন টন হতে কমে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২'৮ মিলিয়ন টনে দাঁড়ায় এবং টন-কিলোমিটার ১৯৭৯/৮০ সালের ৮৫৫ হতে কমে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৭৪৮ হয়। সাজসরঞ্জাম ব্যবহারের নিরীখে বাংলাদেশ রেলওয়ের দক্ষতা হ্রাস পায়। নীচের সারণিতে তা দেখানো হয়েছে ঃ

সারণি ১'১

বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালনা দক্ষতা

কার্যক্রম এলাকা		১৯৬৯/৭০	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫
১। পণ্যবাহী চলাচল ঃ				
(১) ওয়াগনের চলার সময় (দিন)	ঃ বিজি	৮.৫	১৭.৭	১৫.০
	এমজি	১০.২	২৩.৭	১৬.০
(২) লাইনের মোট ওয়াগনের সাথে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ওয়াগনের শতকরা হার	ঃ বিজি	৯৩.৯	৮৮.০	৯৩.০
	এমজি	৯১.৯	৮৫.৭	৯৪.৫
(৩) লাইনের প্রতি ওয়াগন হিসেবে দৈনিক নীট টন-কিলোমিটার	ঃ বিজি	২২৯.০	১৮৩.০	১৬০.৯৩
	এমজি	১৭০.০	১৫০.০	১২২.০
(৪) মালবাহী ডিজেল ট্রেনের গড়গতি (কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়)	ঃ বিজি	১৮.১৯	১৪.৭৩	১১.২৭
	এমজি	১৩.৪৯	১১.৫৭	১০.৪৬
২। যাত্রী বগি (ক্যারেজ) ঃ				
(১) লাইনের মোট কোচের সাথে চলাচলের জন্য প্রাপ্ত কোচের শতকরা হার	ঃ বিজি	৮৭.৪	৮৩.৬	৮৫.৫
	এমজি	৮৬.৬	৮২.৯	৮৫.০
(২) লাইনের প্রতি গাড়ীর দৈনিক যাত্রী কিলোমিটার	ঃ বিজি	২৪৩.০	১৯৫.০	২২২.০৯
	এমজি	২১১.০	১৩৪.০	১৭৩.৮১
৩। ডিজেল ইঞ্জিন ঃ				
(১) লাইনের মোট ইঞ্জিনের সাথে সার্ভিসের জন্য প্রাপ্ত ইঞ্জিনের শতকরা হার	ঃ বিজি	৯১.৯	৮৫.৯	৭৭.০
	এমজি	৮৪.১	৭২.৯	৭৯.০
(২) লাইনের প্রতি ইঞ্জিনের দৈনিক ইঞ্জিন কিলোমিটার	ঃ বিজি	৩৭৮.০	২৮৫.০	১৯৩.১২
	এমজি	২১৪.০	১৯২.০	১৬০.৯৩
(৩) প্রতি ইঞ্জিন দিবসে ব্যবহৃত ইঞ্জিন কিলোমিটার (কেবল মাল পরিবহনের ক্ষেত্রে)	ঃ বিজি	৩০৭.০	২৫৪.০	১৬০.৯৩
	এমজি	২০৩.০	১৬৭.০	১৬০.৯৩

১'৬। রেলপথে যাত্রী চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ মূলতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনসাধারণের চলাচল বৃদ্ধি এবং অন্যান্য পরিবহণ মাধ্যমের তুলনায় রেলপথে কম ভাড়া, কারণ ব্যয়বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে রেলভাড়া বৃদ্ধি পায়নি। রেলপথে পণ্য পরিবহণ হ্রাসের কারণ ছিল মূলতঃ রেলের চাইতে সড়ক পথে অধিকতর নির্ভরযোগ্যতা, নমনীয়তা এবং তাৎক্ষণিক ডেলিভারী সার্ভিসের অধিকতর সুযোগ; উপরন্তু রেলওয়ে বড় ধরনের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং রেলপথের সংস্কারের সুবিধার অভাব ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত। প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করতে না পারার দরুণ রেল কর্তৃপক্ষ দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পর্যন্ত সম্পন্ন করতে পারছে না। ফলে রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যা বছরের পর বছর ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হয়ে শেষ পর্যন্ত গোটা কাজটিই পুনঃস্থাপনের প্রয়োজন হয়। রেলওয়ের আর্থিক সংকটের জন্য দায়ী কতিপয় কারণ হচ্ছে অদক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রকৃত সম্পদ ব্যয়ের নিরীখে মূল্য নির্ধারণের অপ্রতুলতা এবং আন্তঃ পরিবহণে প্রতিযোগিতা। পরিকল্পনাকালে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের পরিবর্তে সংগ্রহ কর্মসূচীতে বিনিয়োগের ভ্রান্তিপূর্ণ অগ্রাধিকার নির্ধারণের ফলে এসব সমস্যা জটিলরূপ ধারণ করে।

১'৭। বাংলাদেশ রেলওয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তরকালে মোট ১,০০০'০০ কোটি টাকারও বেশী বিদেশী সাহায্য ও ঋণ পেয়েছে যা বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট সম্পদের প্রায় ৫০%। এই বিপুল বিনিয়োগ সত্বেও যথার্থ অগ্রাধিকার নির্ধারণের অভাবে এবং এডহক কার্যক্রমের দরুন রেল পরিবহণ ব্যবস্থায় পূর্ণাংগ দক্ষতার পুনর্বাসন সম্ভব হয়নি। রেলওয়ের কার্যক্রমে পরিলক্ষিত উন্নয়নের চেয়ে মালামাল ক্রয় অগ্রাধিকার পায়। ফলে রেল ব্যবস্থা সাজ-সরঞ্জামের মানহীনতা, সাংকেতিক যন্ত্রপাতির অভাব ইত্যাদিতে ভুগছে। এজন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সমস্যা আরো জটিলরূপ ধারণ করে এবং বিদ্যমান স্বল্প সংখ্যক দক্ষ লোকবল ও খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ বৃদ্ধি পায়।

আর্থিক অবস্থা—ব্যয় ও ভাড়া

১'৮। সেবামূলক তথা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্বের পরিমাণ সার্বিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও আর্থিক সাফল্যের ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে। পরিচালন হার ১৯৭৯/৮০ সালে ১০৪'৫ থাকলেও ১৯৮৩/৮৪ সালে ১২৩'২ ছিল। বস্তুতঃ, ১৯৭৯/৮০ সালে মোট রাজস্বের ০.৭৯% শতাংশ ক্ষয় তহবিলের জন্য ধরা হলেও ১৯৮৩/৮৪ সালে ক্ষয় তহবিলের কোন বিধান না থাকায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ১৯৬৯/৭০ সালের তুলনায় এ পরিস্থিতি অতীব মারাত্মক কেননা ১৯৬৯/৭০ সালে মোট রাজস্বের ৯'৯২% ক্ষয় তহবিলে ধরার পরও পরিচালন অনুপাত ছিল ৮৩'৪। তাছাড়া, রেলওয়ে সরকারী বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় লভ্যাংশ পরিশোধ এবং মূলধন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দে ব্যর্থ হয়েছে যার ফলে পুঞ্জীভূত প্রতিস্থাপন ব্যয় উন্নয়ন বাজেটভুক্ত করতে হয়েছে; স্বাধীনতা উত্তরকালে ৩ বছর ব্যতীত বাদবাকী সময়কালে রেলওয়ে ক্রমাগত লোকসান দিয়েছে; যা সারণি ১'২ তে দ্রষ্টব্য:

সারণি ৯.২

রেলওয়ের আর্থিক কর্মতৎপরতা

(লাখ টাকায়)

বছর	মোট পরিচালন আয়	মোট পরিচালন ব্যয়	নীট পরিচালন আয়
১৯৭১/৭২ (ক)	৬০০	৮৮০	(—) ২৮০
১৯৭২/৭৩	২৪৬৯	২৩৬১	(+) ১০৮
১৯৭৩/৭৪	২৭৮৩	৩৪২৬	(—) ৬৪৩
১৯৭৪/৭৫	৪০২৭	৪০৭১	(—) ৪৪
১৯৭৫/৭৬	৫০৮৮	৪৯৮১	(+) ১০৭
১৯৭৬/৭৭	৫৪৩০	৫৭২৫	(—) ২৯৫
১৯৭৭/৭৮	৬২৭২	৬৬০৩	(—) ৩৩১
১৯৭৮/৭৯	৮২৮৬	৮০০৩	(+) ২৮৩
১৯৭৯/৮০	৯২২৬	৯৬৩৮	(—) ৪১২
১৯৮০/৮১	১০৪০৮	১২২৭২	(—) ১৮৬৪
১৯৮১/৮২	১২৯০২	১৩১৭১	(—) ২৬৯
১৯৮২/৮৩	১৪৯৪৬	১৫০২৯	(—) ৮৩
১৯৮৩/৮৪ (খ)	১৪৪৬১	১৭৮২২	(—) ৩৩৬১
১৯৮৪/৮৫ (খ)	১৬৭০৬	২০৩৩৯	(—) ৩৬৩৩

(ক) ৬½ মাসের হিসাব, (খ) সাময়িক হিসাব

উৎস : বাংলাদেশ রেলওয়ে

৯.৯। আর্থিক ক্ষতির ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো হচ্ছে মূলধন সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার, রাজস্ব ফাঁকি, পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও যাত্রীভাড়া এবং মাল পরিবহণ ভাড়ার সঙ্গতি রাখার ব্যাপারে সময়োপযোগী কার্যক্রমের অভাব এবং নীট ক্ষতি স্বীকার করেও কতিপয় শাখা লাইনে চলাচল অব্যাহত রাখা। যদিও এই গুরুত্বপূর্ণ জরুরী সার্ভিসের উন্নয়নের যথাযথ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে প্রত্যেকটি বিষয়ের বিশেষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন তবে শুল্ক তফসিল এবং চলাচল ব্যয় সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। 'যানবাহন যা বহন করতে পারে' এই সুপ্রাচীন নীতির ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে রেলওয়ে শুল্ক তফসিল নির্ধারিত হয়। তারপর থেকে সময়ে সময়ে এডহক ভিত্তিতে বৃদ্ধি করা ছাড়া কাঠামোগত কোন সামঞ্জস্যবিধান করা হয়নি। ফলে ব্যয় বৃদ্ধির সাথে শুল্ক তফসিল বৃদ্ধির হার সমতা রক্ষা করতে ব্যর্থ

হয়। এ তথ্য থেকে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে ১৯৮৪/৮৫ সালে প্রতি টন কিঃ মিঃ এর মাল পরিবহন ভাড়া ছিল ০.৭৫ টাকা অথচ অনুমিত ব্যয় ছিল ১.৮৬ টাকা। একইভাবে প্রতি যাত্রী কিঃ মিঃ এর ভাড়া ছিল ০.০৭ টাকা, অথচ অনুমিত ব্যয় ছিল ০.২১ টাকা। একথা ঠিক যে শুল্ক তফসিল বর্ধিত ব্যয়ের সাথে পর্যাপ্তভাবে তাল মিলাতে কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছে; তবে অদক্ষতাজনিত খরচের বোঝা রেলওয়ে ব্যবহারকারীদের ঘাড়ে না চাপানোটাও যুক্তিযুক্ত। রেলগাড়ী ও ইঞ্জিনের তুলনায় কিলোমিটার প্রতি যাত্রী ও মাল পরিবহণ এবং রেলে পরিচালন ব্যয় দৃষ্টে একথা অস্বীকার করা যায় না যে স্বাধীনতার পর থেকে পরিচালনা দক্ষতার উল্লেখযোগ্যভাবে অবনতি ঘটেছে। উচ্চ ব্যয়ের একটা ক্ষেত্র হচ্ছে কিঃ মিঃ প্রতি জ্বালানী ব্যয় বৃদ্ধি যা ১৯৬৯/৭০ সাল থেকে ৮ গুণ বেড়েছে। পক্ষান্তরে এ সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জ্বালানী ব্যয় বেড়েছে ১৪ গুণ।

সড়ক ও জনপথ

১.১০। সড়ক কর্মসূচীতে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয় (ক) বর্ধিত হারে যানবাহন ও মালামাল চলাচলের সাথে সঙ্গতি রেখে বিদ্যমান প্রধান প্রধান সড়ক ব্যবস্থার মান উন্নীতকরণ ও উন্নয়নসাধন এবং (খ) প্রধান প্রধান সড়কের অসম্পূর্ণ অংশ যথা সড়ক ও সেতু নির্মাণ এবং উপজেলাসমূহের সাথে নিকটবর্তী পাকা সড়ক/পরিবহণ ব্যবস্থার সাথে যোগসূত্র স্থাপনকারী সড়ক নির্মাণের উপর। পরিকল্পনায় ৬৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল যার পুরোটাই ব্যবহৃত হয়েছে।

১.১১। পরিকল্পনাকালে মোট ৬৬৯ কিঃ মিঃ পাকা সড়ক নির্মিত হয়। যার ফলে মোট পাকা সড়কের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮২৭ কিলোমিটার। এছাড়া আরও ৫১২ কিঃ মিঃ সড়কের মান উন্নয়ন করা হয় এবং ৫৩১ কিঃ মিঃ সড়ক ইট/নুড়িপাথর দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। এই পরিকল্পনাকালে ২,৩০২ মিটার স্থানান্তরযোগ্য ইস্পাত সেতু সহ (বেইলী সেতু) মোট নির্মিত সেতু/কালভার্টের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৭,০২৮ মিটার। এর ফলে দেশের মোট সেতু ও কালভার্টসমূহের দৈর্ঘ্য বেড়ে প্রায় ৭৬,২২০ মিটারে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে সরকার প্রশাসনকে জনগণের কাছে নিয়ে আসার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করেন এবং সেই মোতাবেক পুরানো থানাগুলোকে (পুলিশ ষ্টেশন) উপজেলায় উন্নীত করা হয়। এই স্থানীয় প্রশাসনকে কার্যকর করার জন্য ১৯৮২/৮৩ সাল থেকে উপজেলা কেন্দ্রসমূহকে সবচেয়ে নিকটবর্তী পাকাসড়কের সাথে সংযুক্ত করার এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। উপজেলা কর্মসূচীর অধীনস্থ সড়কসমূহ এবং সড়ক ও জনপথ পরিদপ্তরের নিয়মিত কর্মসূচীর অধীনে সড়ক সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭৬ এবং ৩০।

১.১২। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক সম্পদ আত্তীকরণের ক্ষেত্রে পরিবহণ ব্যবস্থাকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। তাই চট্টগ্রাম ও চালনা, এই দুই বন্দরকে শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর সাথে সংযুক্ত করা এবং বন্দর দুটির উন্নয়নকে উচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সড়ক খাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ছিল খুলনা-মংলা সড়ক নির্মাণ এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-আরিচা সড়কের মান উন্নীতকরণ। এই পরিকল্পনাকালে দেশের অভ্যন্তরে অন্য যে সব গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও সেতুর কাজ সমাপ্ত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে বগুড়া-নাটোর সড়ক, চিরিংগা-আলীকদম সড়ক, ঢাকা-সিলেট সড়ক (নরসিংদী-সরাইল-সিলেট অংশ), পঞ্চগড় সেতু, সুরমা সেতু, নানাকাজী সেতু প্রভৃতি। এছাড়া বুড়িগংগা সেতু (পোস্তগোলায়), মেঘনা সেতু, মেঘনা-গোমতি সেতু এবং যশোর-ফরিদপুর সড়কে গোরাই সেতুর সম্ভাব্যতা পরীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে ১৯টি যুদ্ধবিধ্বস্ত সেতু ছিল। এর মধ্যে ১১টিকে পুনরায় চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। বাকী ৮টির কাজ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হাতে নেয়া হবে।

অগ্রাধিকারদান ও রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা

১.১৩। **সম্পদের সীমাবদ্ধতা** ঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পরিবহণ ব্যবস্থায় উপজেলাগুলোর সংযোগ-সাধনকারী সড়ক নির্মাণের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক প্রকল্প ইতিমধ্যেই বাস্তবায়নাধীন থাকার ফলে সড়ক কর্মসূচীর সম্প্রসারণ কার্যক্রম সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রাপ্ত সম্পদ ও

জনশক্তির উপর বিরাট চাপের সৃষ্টি করে এবং অনেকগুলো প্রকল্পের মধ্যে সীমিত সম্পদ বণ্টন করে দিতে হয়। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১২১টি, কিন্তু মাত্র ৪টির কাজ সমাপ্ত হয় এবং ৪,৫৫২ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ কর্মসূচীর মধ্যে মাত্র ২১০ কিলোমিটারের কাজ সমাপ্ত হয়। এ ছাড়া মোট ৪,২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৭৬টি উপজেলা সড়ক প্রকল্প এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট ৪৮৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ বিশিষ্ট ১৩টি সড়ক প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৩৪২ কিলোমিটার দৈর্ঘ বিশিষ্ট ৪৭টি উপজেলা সড়ক প্রকল্পের কাজ আংশিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে। বেশী সংখ্যক অসমাপ্ত প্রকল্পের অর্থ হচ্ছে বিনিয়োগ থেকে সুবিধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা হ্রাস। তাই সড়ক কর্মসূচীর সবচেয়ে দুর্বলতম দিক ছিল কতিপয় পুরানো প্রকল্প শেষ করার পূর্বে নতুন করে বেশী সংখ্যক সড়ক ও সেতু নির্মাণ কর্মসূচী গ্রহণ। বিভাগ (অঞ্চল) ভিত্তিতে গঠিত সড়ক ও জনপথ বিভাগের বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও সম্পদের স্বল্প আকারে বিতরণ প্রক্রিয়ায় অবদান যুগিয়েছে। কেননা প্রতিটি বিভাগের জন্যই কাজের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু প্রধান সমস্যা যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে তা হলো এইসব কিলোমিটার প্রতি সড়ক ব্যবস্থা এত অনুন্নত থাকায় বিপুল সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সড়ক সম্প্রসারণের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দেয়। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য সীমিত সম্পদই নতুন সড়ক নির্মাণের দৈর্ঘ নির্ধারণ করে এবং ক'টা সড়কের কাজ হাতে নেয়া হলো তা অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। সড়ক বাছাই এবং সংগঠনের দৃষ্টি কোণ থেকে এর দুটি প্রয়োগ হতে পারে। প্রথমতঃ বিদ্যমান ও সম্ভাব্য যানবাহনের ঘনত্বের ভিত্তিতে সড়কসমূহ বাছাই করা উচিৎ। কারণ প্রশাসনিক প্রয়োজন যে কোন সড়কের উন্নয়নকে যুক্তিসংগত করে তুলতে পারে। দ্বিতীয়তঃ রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রমকে পৃথক করতে হবে, যাতে রক্ষণাবেক্ষণ সড়ক ও জনপথের আঞ্চলিক নিরীখের ঊর্ধে দৃশ্যমান থাকে এবং তাদের মধ্যে উন্নয়ন তৎপরতার ভাগাভাগি এড়ানো যায়।

১.১৪। **সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ঃ** যেখানে বিদ্যমান সড়কসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিলের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়, সেক্ষেত্রে খুব বেশী সড়ক নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেয়া সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। আরও সড়ক নির্মাণের জন্য চাপ সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে কিঃ মিঃ প্রতি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে তহবিল হ্রাস। ফলে সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নামে এক বিপরীতমুখী সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, এই বিঘ্ন নির্মাণাধীন প্রকল্পের ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করে, কারণ চালু হবার আগেই অসমাপ্ত প্রকল্পগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে সম্পদ বরাদ্দের অসংগতি এই তথ্য থেকেই প্রমাণিত হয় যে, পরিকল্পনাকালে যেখানে সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য (উপজেলা কর্মসূচী বাদে) ৫৬১.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণের বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৩৯.২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিনিয়োগের হার ছিল ২৪.৫%। রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী চাহিদার তুলনায় কম ছিল বিধায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এমনভাবে ব্যাহত হয় যে বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে গোটা সড়ক ব্যবস্থায় পুনর্বাসনের কার্যক্রম গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে। যদিও বাজেটের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকে পৃথক করা অর্থহীন, তবুও উপকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর ভিন্নমুখী প্রভাবকে চিহ্নিত করা জরুরী। কারণ বিনিয়োগ ক্ষীণ হওয়ার অর্থ উপকার বিলম্বিত করা, পক্ষান্তরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের অর্থ হচ্ছে উপকারের তাৎক্ষণিক ঘাটতি। তাই ভবিষ্যতের লাভের আশায় বর্তমানের লাভকে উপেক্ষা করা চলে না যদি না দেখা যায় যে ভবিষ্যতের লাভ বর্তমানের ক্ষতিকে পুষিয়ে দিতে পারবে। বস্তুত পক্ষে উন্নয়ন বাজেটের মাধ্যমে পুনঃস্থাপন করার দরুন, উন্নয়ন বাজেটের এই অংশ কোন অবকাঠামো সুবিধা বা লাভ বৃদ্ধি করে না।

১.১৫। **সড়ক পরিবহণ ঃ** সরকারী ও বেসরকারী এই উভয় খাতেই সড়ক পরিবহন চালু রয়েছে এবং এতে রয়েছে যান্ত্রিক যান এবং গরু গাড়ী ও রিক্সার মত স্থানীয় যানবাহন। শেষোক্ত পরিবহন ব্যবস্থার স্থানীয় গুরুত্ব রয়েছে এবং সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে সেগুলোর অবদান উল্লেখযোগ্য (৬০% কিলোমিটার প্রতি যাত্রী এবং ৩৬% টন প্রতি কিলোমিটার মাল পরিবহন) বাস, ট্রাক, মোটরগাড়ী ইত্যাদি যান্ত্রিক যানবাহনের সংখ্যা পরিকল্পনাকালে ১,০৫,৭৮২ থেকে বেড়ে ১,৭৯,৯২৪ হয়েছে এবং

এগুলোর অধিকাংশই বেসরকারী খাতে পরিচালিত। রাস্তায় চালু বাস ও ট্রাকের মোট সংখ্যার মধ্যে (১৯৮৪/৮৫ সালে ৩২,৮০০) বেসরকারী খাতের মালিকানায় ছিল ৯৮%। উল্লেখ্য সরকারী খাতের সড়ক যানবাহন শুধু যান্ত্রিক যানে সীমাবদ্ধ; পক্ষান্তরে বেসরকারী খাতে যান্ত্রিক ও ঐতিহ্যবাহী যন্ত্রবিহীন উভয় ধরনের যানবাহন রয়েছে।

১'১৬। **সরকারী খাতের সড়ক পরিবহন :** সরকারী খাতের প্রধান সংগঠন হচ্ছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (BRTC)। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার ৪৬৫টি চালু বাসের বহর নিয়ে একটি বাস বিভাগ এবং ১৬৮টি চালু ট্রাকের বহর নিয়ে একটি ট্রাক বিভাগ রয়েছে। প্রধানতঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে এবং কয়েকটি আন্তঃজেলা রুটে এর সার্ভিস চালু রয়েছে। বিভিন্ন শহর এবং আন্তঃজেলা রুটসমূহে অবস্থিত ১২টি ডিপো, ৯টি সাব-ডিপো এবং ১১টি স্টেশন থেকে এই সংস্থা-এর সার্ভিসগুলো চালায়। বহর পরিচালনার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা গত সমস্যার জন্য বি আর টি সি কর্তৃপক্ষ-এর বাসের বহরকে বাণিজ্যিকভিত্তিতে চালাতে পারেনি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই সংস্থার অকেজো বাসের হার ছিল গড়ে ২৯%। বাণিজ্যিকভিত্তিতে চলতে ইচ্ছুক কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই হার অত্যন্ত উঁচু। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিদ্যমান বাস ও ট্রাক বহরের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালন দক্ষতার উন্নতি সাধনের উপর সবিশেষ জোর দেয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার জন্য একটি আধুনিক কারখানা এবং অপারেটর/মেকানিক এবং অন্যান্য কর্মীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। উন্নয়ন বাজেট এবং অন্যান্য সূত্র থেকে সম্পদ আহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা ৬৩টি মিনিবাসসহ ২০২টি বাস সংগ্রহ করে এবং ৩০টি বাস পুনরায় চলাচলের উপযোগী করে। জয়দেবপুরে ২৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত এর প্রধান কারখানায় বছরে ১,৩০০টি বাস মেরামত এবং ওভারহলিং করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৩০—৪০% ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৮০ সালের জুন এবং ১৯৮৫ সালের জুনে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার বাস ও ট্রাক বহরের তুলনামূলক অবস্থা নীচে দেয়া হলো :

সারণি ৯'৩

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার বহর (১৯৮০-৮৫)

যানবাহনের ধরন	মোট বহর (সচল)		সড়ক চলাচলযোগ্য		সড়কে চলাচল যোগ্যোরগড় %	
	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫
বাস	৬৭৫	৪৬৫	৩৭৩	৩৩১	৫৫%	৭১%
ট্রাক	১১০	১৬৮	৯৭	১৫৫	৮৮%	৯২%
মোট :	৭৮৫	৬৩৩	৪৭০	৪৮৬	৭১'৫%	৭৭%

উৎস : বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (BRTC)

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে ১৯৮৪/৮৫ সালে অচল বাসের আনুপাতিক হার ছিল ৩ : ১০, যা বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালনযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অত্যন্ত বেশী। যানবাহন বহরের অদক্ষ পরিচালনার কারণে এই সংস্থা বছরে গড়ে ৭০ লাখ যাত্রী বহন করতে পেরেছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অবচয়-এর নীট পরিচালনা ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৫০.০০ কোটি টাকা। এই সংস্থা গঠিত হবার পর থেকে-এর ক্রমপুঞ্জিভূত ঘাটতির পরিমাণ ৯৬.০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১'১৭। **বেসরকারী সড়ক পরিবহন :** ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সড়ক খাতে বেসরকারী খাতের প্রাধান্য অধিক। যন্ত্রচালিত সড়ক পরিবহন যানের হিসেবে ১৯৮৪/৮৫ সালে বেসরকারী খাতের অংশীদারিত্ব ছিল প্রায় ৮৬%। আবার বেসরকারী খাতে যন্ত্রবিহীন যানবাহনের ভূমিকা যন্ত্রচালিত খাতের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক। যন্ত্রচালিত এবং যন্ত্রবিহীন বিভিন্ন সড়ক পরিবহন যানের ১৯৭৯/৮০ এবং ১৯৮৪/৮৫ সালের তুলনামূলক বিবরণ নীচে দেয়া হলো :

সারণি ১'৪

সড়ক পরিবহন খাতে প্রবৃদ্ধি (১৯৮০–৮৫)

(যানবাহনের সংখ্যা)

যানবাহনের প্রকার	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫
১। যান্ত্রিক (চালু) :		
বাস	১০,২৯৪	৯,৩৬৫
ট্রাক	১৬,১১৮	১৭,২৭০
মিনিবাস	৩৭০	৬,১৬৫
প্রাইভেট কার	১৯,৮৪৮	৪০,০০০
জীপ	৮,৩২১	৯,০০০
ট্যাক্সি	১,১১৩	১,৮১৭
অটো-রিক্সা	১০,৬৩২	১৭,৮০৬
ট্রাক ট্রাক্টর	১,৮১৩	৩,৪০২
মটর সাইকেল	৩৮,৭৭৮	৭০,৭৫৭
অন্যান্য	১,৬০২	২,২৮২
ট্রাক্ট্র ট্রেইলর	৯৩৯	২,০৫০
মোট যান্ত্রিক :	১০৫,৭৮২	১১৯,৯২৪
২। অ-যান্ত্রিক :		
রিক্সা	১৬৩,০০০	২০০,০০০
গরুর গাড়ী	২১৬,০৪৩	২৭৬,০০০
মোট অ-যান্ত্রিক :	৩৭৯,০৪৩	৪৭৬,০০০

উৎস : পরিবহন জরীপ উইং, পরিকল্পনা কমিশন।

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে পরিকল্পনাকালে যন্ত্রচালিত এবং যন্ত্রবিহীন যানের সংখ্যাবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৭০% ও ২৬% এবং যন্ত্রচালিত ও যন্ত্রবিহীন যানের অনুপাত ১৯৮৪/৮৫ সালে ছিল ২৭ : ৩ যা ১৯৭৯/৮০ সালে ছিল ২২ : ৭৮। যন্ত্রচালিত যানে বেসরকারী বিনিয়োগে সরকারের উৎসাহ দানের ফলে বেসরকারী অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পায়। যাত্রী এবং মাল পরিবহনের ক্ষেত্রে যন্ত্রবিহীন যানের অংশ ১৯৮৪/৮৫ এবং ১৯৭৯/৮০ সালে ছিল যথাক্রমে ৬০% ও ৩৫% এবং ৫৯% ও ৩৯%।

৯.১৮। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যন্ত্রচালিত যানবাহন সংগ্রহে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫৩৪.০০ কোটি টাকা, পক্ষান্তরে ১৯৭২—৮০ সময়কালে এর পরিমাণ ছিল ২৭৪.২০ কোটি টাকা। এর থেকে বেসরকারী খাতের প্রতি সরকারের গুরুত্ব আরোপ এবং বেসরকারী খাতের উদ্যোগ প্রতিফলিত হয়।

বন্দর উন্নয়ন

৯.১৯। আমদানি রপ্তানির ব্যবধানের কারণে সাহায্য আত্তীকরণের জন্য আমদানি জরুরী হয়ে পড়ায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় চট্টগ্রাম এবং চালনা বন্দর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। ফসলহানি ঘটলে বন্দর দুটিকে বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমদানি সামাল দিতে তাদের ক্ষমতার উপর চাপ সৃষ্টি করতে হয়। খাদ্য বহির্ভূত সামগ্রীর পরিমাণ বেড়ে যাবার ফলে ১৯৭৯/৮০ এবং ১৯৮৪/৮৫র মধ্যে এই বন্দরে মাল উঠানামার পরিমাণ ১০ লাখ টন থেকে বেড়ে ৯৮ লাখ টনে দাঁড়ায়। সাহায্যের প্রভাব অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চলাচলের পরিমাণের ওপরও পরিলক্ষিত হয়। পরিচালিত বাণিজ্যের তিন চতুর্থাংশ ছিল আমদানি, যা রপ্তানির চেয়ে তিনগুণ বেশী। অবশ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানীর তুলনায় আমদানির মন্থর প্রবৃদ্ধির কারণে এই অংশীদারিত্ব ৭৯% থেকে ৭৫%-এ নেমে যায়। বাণিজ্য প্রবাহে ভারসাম্যহীনতা ছিল ব্যাপক এবং সাহায্য নির্ভর আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। খাদ্য এবং সারের ব্যাপক উঠানামার Handling) কারণে সাহায্য নির্ভর আমদানি বন্দরের ভৌত অবকাঠামোর সীমিত ক্ষমতার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এ সমস্যা পরে আলোচনা করা হবে।

৯.২০। ১৯৭৯/৮০ ভিত্তি বছরের তুলনায় পরিকল্পনাকালে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে মাল উঠানামার পরিমাণ নীচে দেখানো হলো :

সারণি ৯.৫

সমুদ্র বন্দরে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের উঠানামার খতিয়ান
(১৯৭৯/৮০ থেকে ১৯৮৪/৮৫)

(লক্ষ টনে)

বছর	চট্টগ্রাম বন্দর			চালনা বন্দর		
	আমদানি	রপ্তানি	মোট	আমদানি	রপ্তানি	মোট
১৯৭৯/৮০	৫৯.৯৯	৩.৩৪	৬৩.৩৩	৬.৭৬	১৪.৭০	২১.৪৬
১৯৮০/৮১	৫০.১৫	৫.৪৭	৫৫.৬২	৭.৪১	৮.৮৬	১৬.২৭
১৯৮১/৮২	৫১.৪৭	৫.০৩	৫৬.৫০	৭.০৮	৯.২০	১৬.২৮
১৯৮২/৮৩	৪৯.৬৩	৪.৫৪	৫৪.১৭	৮.০২	১০.৯৮	১৯.০০
১৯৮৩/৮৪	৫৬.৮১	৩.৯৩	৬০.৭৪	৬.৮৮	১০.৮৬	১৭.৭৫
১৯৮৪/৮৫	৬৮.২৮	৩.৩০	৭১.৫৮	৫.৯৭	২০.৮৬	২৬.৮৩

উৎস : চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১'২১। উপরোক্ত সারণিতে সামুদ্রিক বাণিজ্যে দুই বন্দরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমতঃ লক্ষ্য করা যায় যে, চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি বাণিজ্য এবং চালনা বন্দরে রপ্তানি বাণিজ্য প্রাধান্য পায়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৮৪/৮৫ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে ৯০% এরও বেশী আমদানি হয়েছে কিন্তু এর মাধ্যমে রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৩%। জাতীয় পর্যায়ের রপ্তানি আমদানির ভারসাম্যহীনতার ছায়া বন্দরগুলোর কাজকর্মে প্রতিফলিত হওয়ায় রপ্তানি-আমদানির ভারসাম্যহীনতাজনিত খরচের পরিমাণ আরও বেড়েছে। কারণ জাতীয় পর্যায়ে ভারসাম্যহীনতার অনুপাত যেখানে ১ : ৩, বন্দর পর্যায়ে তা চট্টগ্রামে ১ : ২০ এবং চালনায় ৪ : ১। বাণিজ্যের ধরন (অর্থাৎ পাট রপ্তানি) এবং পরিবহন ধারার কারণে রপ্তানি বাণিজ্যে চালনার সুনির্দিষ্ট সুবিধা থাকলেও, দু'টি বন্দরকে একসঙ্গে ধরে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে এটা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে যে বর্তমানের এই শ্রেণী বিভক্তি অলাভজনক। কারণ এর অর্থ হচ্ছে বর্তমান সুবিধাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে ফিরতি যাত্রায় ব্যাপক ঘাটতি। এর অর্থ হচ্ছে, রেলওয়ে ট্রাক, টাগ ও জাহাজ খালি অবস্থায় ফিরে যাওয়া এবং দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থাকা। সামুদ্রিক বাণিজ্যে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। ১৯৭৯/৮০ সালে রপ্তানি আমদানির অনুপাত ছিল চট্টগ্রামে ১ : ১৮ এবং চালনায় ২ : ১। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যদিও পরিকল্পনা কালে সামগ্রিকভাবে মাল উঠানামার পরিমাণ চট্টগ্রাম ও চালনা দুই বন্দরেই যথাক্রমে ১৩% ও ২৪% বেড়েছে, তবুও মালপত্র চলাচলে উল্লেখযোগ্য আন্তঃবছর উঠানামা পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্থিতিহীনতা এবং সাহায্য পরিস্থিতি এর আংশিক কারণ হলেও প্রধান কারণ হচ্ছে খাদ্য আমদানির পরিবর্তনশীলতা। মাল চলাচলে স্থগিত প্রবৃদ্ধির অভাব বন্দর তৎপরতার দক্ষতা ও এর উন্নয়নে সঙ্গত কারণেই ছাপ ফেলেছে।

১'২২। **চট্টগ্রাম বন্দর :** চট্টগ্রাম বন্দরে প্রবেশমুখী নদীপথ বেশ দীর্ঘ। ৯ মিটার গভীর এবং ১৮৬ মিটার দীর্ঘ জাহাজ এতে প্রবেশ করতে পারে। প্রবেশ পথের এই কাংখিত গভীরতা অব্যাহত রাখতে নদীতে নিয়মিত খনন প্রয়োজন। পরীক্ষামূলক খননের মাধ্যমে এটা নির্ধারিত হয়েছে যে, বার্ষিক ১৩ লাখ ৫০ হাজার ঘন মিটার খনন প্রয়োজন যা ২,৫০০ ঘন মিটার ক্ষমতাসম্পন্ন 'ট্রেইলিং সাকশান হপার ড্রেজারের' সাহায্যে সম্ভব। বর্তমান ড্রেজারটি এ কাজের উপযুক্ত না হওয়ায় ১৯৮১/৮২ সালে চুক্তির মাধ্যমে প্রবেশ পথের নদীগর্ভ খনন করা হয়। অন্যান্য তৎপরতার মধ্যে রয়েছে গুদামজাতকরণ ক্ষমতা ৬,১১২ বর্গমিটার বৃদ্ধি যাতে ১৬,৫০০ টন মাল রাখা যায়, লাইটারেজের মাধ্যমে মাল উঠানামার ক্ষমতা ১'০ লাখ টনে বৃদ্ধি, বিস্ফোরক মালপত্র উঠানামা করার জন্য একটি জেটি নির্মাণ, বন্দরের কাজকর্মের জন্য ১৭টা বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় জাহাজ অধিগ্রহণ, ছোট বড় জাহাজ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৫টি কারখানা এবং দু'টি স্লিপওয়ে উদ্বোধন, নৈশকালীন নৌ-চলাচলের জন্য দু'টি বাতিঘরের সরঞ্জাম সংগ্রহ, রেললাইন পুনঃস্থাপন, কনটেইনার উঠানামা করানোর সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার উঠানো নামানোর জন্য ২টি বহুমুখী জেটি নির্মাণ।

১'২৩। **চালনা বন্দর :** চালনা বন্দরে প্রবেশমুখী নদীপথ ১০৯ কিঃ মিঃ দীর্ঘ। এই বন্দরের গভীরতা বাইরের দিকে ১৬ কিঃ মিঃ দীর্ঘ চরের জন্য সীমাবদ্ধ। একারণে, এমনকি ৮ মিটার গভীরতাসম্পন্ন জাহাজও এই বন্দরে ঢুকতে পারে না। ১৯৬৫ সালে জেটি নির্মাণের কাজ যখন শুরু হয় তখন জেটির পার্শ্বে গভীরতা ছিল ৯ মিটার। ১৯৭৬ সালে তা কমে ৫—৭ মিটারে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালের এক সমীক্ষায় সুপারিশ করা হয় যে নিয়মিত খনন কাজ চালিয়ে জেটি এলাকাকে যথেষ্ট গভীর রাখা উচিৎ যাতে ৮ মিটার গভীরতাসম্পন্ন জাহাজ ভিড়তে পারে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরীক্ষামূলক খনন কাজের ফলে এই নদী পথের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

১'২৪। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কতিপয় বাস্তব সাফল্য হচ্ছে একটি গুদাম, ৩টি অন্তর্বর্তীকালীন শেড এবং ৬ কিঃ মিঃ প্রবেশ সড়ক ও ৩,০৪৯ মিটার সীমানা বেড়া নির্মাণ, দিনে ও রাতে নৌ-চলাচলের জন্য নৌ-চলাচল সরঞ্জাম অধিগ্রহণ এবং বন্দরের কাজকর্মের জন্য ১৩টি বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় জাহাজ সংগ্রহ। একই সঙ্গে মংলাকে উপ-শহররূপে গড়ে তোলার কাজও অব্যাহত থাকে। পুরোপুরিভাবে উন্নয়ন করা হলে বহির্নোঙ্গরে ৫ লাখ টন ছাড়াও চালনা বন্দরে ১০ লাখ টন মাল উঠানামা করতে পারবে।

জাহাজ চলাচল ও জাতীয় পতাকাবাহী পণ্যবহন

১'২৫। আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী বাংলাদেশী জাহাজগুলো স্বদেশাভিমুখী ও বহির্গামী মালের ৪০%পরিবহন করার অধিকারী। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শুরুর সময়ে বাংলাদেশে রেজিষ্ট্রিকৃত জাহাজগুলোর ক্ষমতা ছিল সীমিত। স্বাধীনতার পরে গঠিত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সম্পদ সীমিত বিধায় এতদিন অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় এলাকায় জাহাজ পরিচালনায় নিয়োজিত বেসরকারী খাতকে সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচলে অংশ নেয়ার জন্য ক্রমানুয়ে অধিক মাত্রায় উৎসাহিত করা হয়। ফলে বেসরকারী খাতের মাল পরিবহন ক্ষমতা (DWT) ১৯৭৯/৮০ সালের ১০,০০০ টনের চেয়ে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৮০,০০০ টনে উন্নীত হয়। এই বৃদ্ধি সত্বেও বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (BSC) কর্তৃক কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই কয়েকটি জাহাজ বিক্রী করে ফেলার ফলে বাংলাদেশের মোট নৌ-পরিবহন ক্ষমতা ১৯৭৯/৮০ সালের ৩'৭৮ লাখ টন থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৩'৪৪ টনে কমে যায়। অবশ্য বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন এরপরও জাহাজ চলাচল খাতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

১'২৬। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন মাত্র ৪টি মালবাহী জাহাজ সংগ্রহ করে। অপরদিকে এ সময়ে ৪টি মালবাহী জাহাজ, একটি তেলবাহী লাইটারেজ, একটি কোষ্টার এবং একটি যাত্রীবাহী জাহাজ (হজ্ব যাত্রী জাহাজ) বিক্রি করা হয়। ফলে নৌ-পরিবহন ক্ষমতা (DWT) ১৯৭৯/৮০ সালে ২৫টি জাহাজে ৩'৬৮ লাখ টনের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে ২১টি জাহাজে ২'৬৪ লাখ টনে নেমে যায়। সুবিধাজনক শর্তে বৈদেশিক সম্পদ পাওয়া না যাওয়াই এই ঘাটতি পূরণে ব্যর্থতার কারণ।

নীচের সারণিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের মাল পরিবহনের একটি চিত্র পাওয়া যাবে:

সারণি ১'৬

(লক্ষ টনে)

বছর	বি এস সি'র নিজস্ব ও ভাড়া করা জাহাজে মাল পরিবহন	সমুদ্র পথে দেশের মোট মাল পরিবহন	সমুদ্র পথে মোট পরিবহনে বি এস সি-এর অবদান (%)
১৯৭৯/৮০	১৪'৩২	৮৪'৮০	১৬'৮৯
১৯৮০/৮১	১২'০৩	৭১'৮৯	১৬'৭৩
১৯৮১/৮২	১১'২০	৭২'৭৯	১৫'৩৮
১৯৮২/৮৩	১৪'১৪	৭১'১৯	১৯'৩২
১৯৮৩/৮৪	১২'৪৭	৭৮'৪৬	১৫'৮৯
১৯৮৪/৮৫ (প্রাক্কলিত)	১৪'৬০	৯৮'২১	১৪'৮৭

উৎস: বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (BSC)

১'২৭। কনফারেন্স লাইনের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজগুলো দেশের ৪০% সমুদ্রগামী মাল পরিবহনের অধিকারী। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন জাহাজ ভাড়া করা জাহাজসহ ১৭% মাল পরিবহন করে। ১৯৮৪তে তা ১৫%-এ নেমে আসে। এর প্রধান কারণগুলো হচ্ছে মাল পরিবহন ক্ষমতাহ্রাস এবং আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি। বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের অর্থনৈতিক তৎপরতার হিসাব ১৯৮৩ র জুন পর্যন্ত পাওয়া যায়। ১৯৭৯/৮০ সাল হতে করপোরেশন নীট মুনাফা অর্জনে সক্ষম হলেও, মুনাফার হার ১৯৭৯/৮০ সনের ৭'৫৯ কোটি টাকা থেকে ক্রমশঃ কমে ১৯৮০/৮১, ১৯৮১/৮২ এবং ১৯৮২/৮৩ সালে যথাক্রমে ৫'২২ কোটি, ৩'৫৮ কোটি এবং ২'৪৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মন্দার ফলে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং বয়সের ভারে জীর্ণ জাহাজগুলো বিক্রির ফলে পরিবহন ক্ষমতা কমে যাওয়া এই ক্ষয়িষ্ণু ধারার কারণ। নীট মুনাফার ব্যাপারে অবশ্য একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, মুনাফার হিসাব করার সময় অনুদানের মাধ্যমে সংগৃহীত জাহাজের ঋণ পরিশোধের দায় ধরা হয়নি। যদি বি এস সি'কে এই দায় পরিশোধ করতে হতো, তবে সমুদয় মুনাফাই যে উবে যেত শুধু তাই নয়, উপরন্তু এর সংরক্ষিত তহবিল এবং পুঞ্জীভূত লাভও প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে যেত। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে কোন কোন বছরে মুনাফার প্রধান উৎস ছিল অকেজো জাহাজ বিক্রি।

মেরিন একাডেমী

১'২৮। আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের প্রয়োজন মিটাতে নৌ-বিদ্যা বিষয়ক ও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ১৯৬২ সালে এই একাডেমী স্থাপন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে প্রাক-সমুদ্র সম্পর্কীয় (Pre-Sea) বিষয়বস্তু শিক্ষা দেয়া হতো। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এখানে কতিপয় পরবর্তী সমুদ্র সম্পর্কীয় (Post-Sea) বিষয়বস্তু প্রবর্তন করা হয় এবং মেট, মাষ্টার, ডিওটি (DOT) ১ম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণীর জন্য কোচিং ক্লাশ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, যা এর আগে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতো। একাডেমীতে ক্যাডেট হোষ্টেল, রেডিও-রাডার নির্দেশনা ভবন এবং প্রশিক্ষণ সরঞ্জামের মত কতিপয় অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে। বিএসসি'র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বছরের চাহিদা মেটানোর জন্য ক্যাডেট ভর্তির সংখ্যা ৪৪ থেকে বাড়িয়ে ৪৮ করা হয়েছে। একাডেমী বিভিন্ন কোর্সে ১,৫৩২ জন ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এর মধ্যে ২৮৪ জনকে প্রাক-সমুদ্র কোর্স এবং ১,২৪৮ জনকে সমুদ্র পরবর্তী কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৩৮১ জন ডিওটি (DOT) কোর্সের জন্য মনোনীত হয়েছে।

১'২৯। মাছ ধরার ট্রলারগুলোর ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণদানের জন্য স্থাপিত মেরিন ফিশারীজ ট্রেনিং একাডেমীর পরিচালন ভার ১৯৮৩ সালে মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন থেকে হস্তান্তর করে মেরিন একাডেমীর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ছোট আকারে এই একাডেমী স্থাপিত হয়েছিল। এই একাডেমীকে আধুনিকীকরণের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এক সংশোধিত প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। ১৯৮০ হতে ১৯৮৪ সালের মধ্যে এই একাডেমীতে ১৯১ জন ক্যাডেট প্রশিক্ষণ পেয়েছে। সমাপ্ত হলে এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৬/৮৭ নাগাদ ৪৫৫ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিতে পারবে। ক্যাডেটদের নৌ-চলাচল, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, রেফ্রিজারেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রলার চালানো এবং নৌবিদ্যায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মাছ ধরা জাহাজে নিয়োজিত হয়। ১৯৮০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৫৮ জন ক্যাডেটকে ভর্তি করা হয় এবং ২৩১ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। ৭৪ জন ক্যাডেটকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন

১.৩০। **অবকাঠামো :** ৪,৮২৭ কিঃ মিঃ এরও বেশী সাংবাৎসরিক নৌপথ এবং আরও ৮০৪.৫ কিঃ মিঃ মৌসুমী নৌপথ দিয়ে আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং এটাই শহরাঞ্চলের এবং মফঃস্বল এলাকাগুলোর বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের সাথে যোগসূত্র। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ব্যবস্থা যাত্রী বহনের ক্ষেত্রে অন্যান্য পরিবহনের ধারার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু সেচের জন্য পানি প্রত্যাহার ও প্রধান নদীগুলোতে পলি পড়ার জন্য এই জাতীয় ব্যবস্থা ক্রমশঃ সংকোচনের মুখোমুখি। অবশ্য ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই প্রাকৃতিক পরিবহন ব্যবস্থা সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। আভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, নৌ-চলাচল খালগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, নৌ-চলাচলে সহায়তার ব্যবস্থা করা এবং জাহাজ রেজিষ্ট্রিভুক্তকরণের মত নিয়ন্ত্রণমূলক দায়িত্ব এই কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। নৌ-চলাচলের উপযোগী রাখার জন্য নদীগর্ভসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য এই কর্তৃপক্ষ জলভাগ জরীপ এবং জলপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে, যাতে নৌপথের জলপ্রবাহগত পরিবর্তন নিরূপণ করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া যায়। এই কর্তৃপক্ষ সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের ডেক কর্মীদেরও প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

১.৩১। পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ পাবনার বাঘাবাড়ী বন্দর নির্মাণের কাজ শেষ করে, খাদ্যশস্য উঠানামা করার সুবিধার্থে এবরামপুর, খানপুর এবং মহেশ্বরপাশায় আরসিসি জেটি নির্মাণ করে, অতিরিক্ত যানবাহনজনিত প্রয়োজন মেটানোর জন্য ঢাকা বন্দরকে সম্প্রসারিত করে, পল্লী এলাকার বিভিন্ন স্থানে নৌযান ভিড়ানোর জন্য ঘাট নির্মাণ করে, উদ্ধার তৎপরতার জন্য একটি ৬০ টনের উদ্ধারকারী ইউনিট সংগ্রহ করে, আরিচা, নগরবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, ভূয়াপুর ইত্যাদি স্থানে ফেরী টার্মিনাল সুবিধার ব্যবস্থা করে, সুরমা, বাউলী, বুড়িগংগা, লক্ষ্যা, তিতাস এবং ছরাসাগর নদীতে খনন কাজ চালায় এবং জলবিষয়ক জরীপ জাহাজ ও নৌ-চলাচল সরঞ্জাম সংগ্রহ করে।

১.৩২। **নৌ-পরিবহন যানসমূহ :** এই ক্ষেত্রে বেসরকারী খাত প্রধান ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৯/৮০ সালে নৌপথ খাতে ২,৪৪৫টি রেজিষ্ট্রিকৃত জলযান ছিল, এর মধ্যে ১,৮৪৫টির মালিকানা ছিল বেসরকারী খাতে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরুর সময়ে বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা (BIWTC) বিভিন্ন ধরনের ৬০০টি নৌযানের মালিক ছিল এবং প্রধান প্রধান নৌপথে মোট পরিবহনকৃত মালের প্রায় ৫০% বহন করে। তাছাড়াও এই সংস্থা প্রধান আন্তঃজেলা যাত্রীদের প্রায় ১০ শতাংশ বহন করে। আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন খাতকে ক্রমান্বয়ে বেসরকারীকরণের সরকারী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এটা স্থির করা হয় যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থার কোন সম্প্রসারণ ঘটানো হবে না, তবে প্রতিষ্ঠানটিকে সুসংহত করতে এবং এর কাজের দক্ষতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা হবে। এই বিনিয়োগ কেবলমাত্র ঘূর্ণিদুর্গত উপকূলীয় এলাকার সার ও খাদ্যশস্যের মত সামগ্রী পরিবহন, যাত্রী পরিবহন এবং আরিচা-নগরবাড়ী ও আরিচা-দৌলতদিয়া ঘাটে যাত্রী ও যানবাহন পারাপারের জন্য বিশেষ ধরনের কিছু নৌযান সংগ্রহের জন্য রাখা হয় (অন্যান্য সড়ক নৌপথ সংযোগস্থলের ফেরী পারাপারের দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপর ন্যস্ত)। এই সংস্থা এর কিছু অলাভজনক নৌযান থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ নাগাদ সংস্থাটির কাছে বিভিন্ন ধরনের ৫১১টি নৌযানের একটি বহর ছিল। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের মধ্যে 'রকেট' যাত্রীবাহী সার্ভিস এবং উপকূলীয় দ্বীপগুলোর মধ্যে যাত্রী/মালবাহী সার্ভিস চালিয়ে আসছে। এই সার্ভিসগুলো আর্থিক দিক থেকে কখনও লাভজনক প্রমাণিত হয়নি এবং বিআইডব্লিউটিসির নৌ-যানের স্থায়ী উৎসে পরিণত হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় এর শক্তসামর্থ্য দিন দিন বিলীন হচ্ছে।

১.৩৩। **সরকারী আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন :** বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থাকর্তৃক ১৯৭৯/৮০ থেকে ১৯৮৪/৮৫ পর্যন্ত সময়ে মাল ও যাত্রী পরিবহনের বিবরণ ১.৭নং সারণিতে দেয়া হলো :

সারণি ১·৭

বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থাকর্তৃক যাত্রী ও মাল পরিবহন
(১৯৮০-৮৫)

বছর	মাল পরিবহন (লক্ষ টনে)	যাত্রী পরিবহন (লক্ষজনে)
১৯৭৯/৮০	২০·৪৬	২৭·৩৮
১৯৮০/৮১	১৫·৮৪	২৭·৯৪
১৯৮১/৮২	১৩·২৮	২৯·৮৬
১৯৮২/৮৩	১০·২৬	২৮·০৮
১৯৮৩/৮৪	১০·৫৯	৪৩·০২
১৯৮৪/৮৫	১৩·১৮	৪৮·২১

উৎস : বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা (BIWTC)

১·৩৪। **বেসরকারী আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ :** সড়ক খাতের মত আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনেও বেসরকারী খাতের অংশীদারীত্ব অনেক বেশী। ১৮৯৪/৮৫ সালে মোট যন্ত্রচালিত নৌযানের বহরের মধ্যে বেসরকারী খাতের অংশ ছিল ৮৪% যেখানে ১৯৭৯/৮০ সালে তা ছিল ৭৫%। বেসরকারী খাতে স্থানীয় পরিবহন চাহিদা মেটাতে দেশীয় নৌকাগুলো প্রধান ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৯/৮০ সালে দেশীয় নৌকার প্রাক্কলিত সংখ্যা ছিল ১·৫০ লাখ যা ১৯৮৪/৮৫ সালে বেড়ে ২·০০ লাখে দাঁড়ায়। ১৯৮৪/৮৫ সালে এ সমস্ত দেশীয় নৌকার মাল ও যাত্রী বহনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৮৪ কোটি টন-কিঃ মিঃ এবং ২৪০ কোটি যাত্রী-কিঃ মিঃ। আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনের যন্ত্রচালিত যানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ ছিল ৩৯১·০০ কোটি টাকা যা ১৯৭২—৮০ সময়কালে ছিল ১১৪·২৪ কোটি টাকা।

বেসামরিক বিমান চলাচল

১·৩৫। **অবকাঠামো উন্নয়ন :** দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেসামরিক বিমানচলাচল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হচ্ছে বছরে ৩৫ লাখ যাত্রী ও ০·৬৩ লাখ টন মালসহ বৃহদায়তন বিমান উঠানামার ক্ষমতাসম্পন্ন জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কার্যকরকরণ। এছাড়াও রাজশাহীতে একটা এবং সৈয়দপুরে একটা মোট দুটো বিমানবন্দর আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের জন্য চালু করায় ঢাকার সাথে সংযোগ রক্ষাকারী আভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরের সংখ্যা ৭ এ উন্নীত হয়েছে। এফ-২৮ বিমান উঠানামার জন্য সিলেট বিমানবন্দরকে উন্নীত করা হয়েছে এবং বৃহদাকার বিমান উঠানামার উপযোগী করার জন্য চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের রানওয়ে প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। তবে হ্যাংগার ও প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প রয়ে গেছে।

১·৩৬। **বিমান সার্ভিস :** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক যাত্রী ও মালামাল চলাচল তৎপরতা এই উভয় ক্ষেত্রেই দ্রুত প্রসার ঘটে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ খাতে মাল পরিবহণ অর্ধেকেরও নীচে নেমে যায় এবং যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রেও কিছুটা অধোগতি পরিলক্ষিত হয়। আভ্যন্তরীণ খাতে পরিবহণ ক্ষমতা ৪টি এফ-২৭/৬০০ থেকে বেড়ে ৩টি এফ-২৭/৬০০ এবং ২টি এফ-২৮ মিলিয়ে মোট ৫টিতে দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক খাতে বহরের সম্প্রসারণ ছিল আরও উল্লেখযোগ্য। বিমানের মোট সংখ্যা ৪টি বোয়িং-৭০৭ থেকে বেড়ে ৫টি বোয়িং-৭০৭ এবং ৩টি ডিসি-১০/৩০ মিলিয়ে মোট ৮টিতে দাঁড়ায়।

১·৩৭। **পরিবহন তৎপরতা :** বিমান ১৯৭৯/৮০ সালে প্রায় ৬ লাখ ৪০ হাজার এবং ১৯৮৪/৮৫ সালে প্রায় ৭ লাখ ৩০ হাজার যাত্রী বহন করে। পরিকল্পনাকালে আভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রুটে বিমান পরিবহন তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ নীচের সারণিতে দেয়া হলো :

সারণি ১·৮

বাংলাদেশ বিমানের পরিবহন তৎপরতা

(সংখ্যা লাখে)

ধরণ	বছর					
	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫
১। **আভ্যন্তরীণ :**						
(ক) যাত্রী (সংখ্যা)	৩·৭৯	৩·০৮	৩·২৩	৩·২৫	৩·৪৬	৩·২৭
(খ) মাল পরিবহন (কেজি)	৩৫·৮৮	২৩·৩১	২৩·৩১	১৫·৫৭	১৫·৮০	১৪·৩২
(গ) ডাক (কেজি)	১·৪৫	১·৩৪	১·৩২	১·৩৫	১·৬৮	১·৩২
২। **আঞ্চলিক :**						
(ক) যাত্রী (সংখ্যা)	০·৩৬	০·৫০	০·৫১	০·৫১	০·৮০	১·২৪
(খ) মাল পরিবহণ (কেজি)	৮·৫১	৩·৭২	৪·২২	৩·২৮	৫·৫৮	১২·৭১
(গ) ডাক (কেজি)	০·২৮	০·৩০	০·৩১	০·২১	০·৩২	০·৪১
৩। **আন্তর্জাতিক :**						
(ক) যাত্রী (সংখ্যা)	২·০৬	২·২৬	২·৪৭	২·৪১	২·৯৪	২·৮৩
(খ) মাল পরিবহণ (কেজি)	৪০·৫৮	৩৫·৮৮	৪১·৯৬	৫৫·০৬	৮৪·৭৪	৯৪·৩১
(গ) ডাক (কেজি)	১·৬৪	১·৪৬	১·৬৩	২·০৫	২·৩১	২·০৭

উৎস : বাংলাদেশ বিমান

১·৩৮। **বিমানের ব্যবহার :** ডিসি-১০, বি-৭০৭, এফ-২৮ এবং এফ-২৭ বিমানের ১৯৮৪/৮৫ সালে মোট ব্যবহৃত সময়কাল ছিল যথাক্রমে ৭৯২৫·১৯, ৭২৩৩·৪৬, ২১৬৩·৪৯ এবং ৩১০৪·৫২ ঘণ্টা, ১৯৮৩/৮৪ সালে একই বিমানের ক্ষেত্রে তা ছিল ৫৭২৮, ৮৩৪৭, ২৩৭৬ এবং ৪৩০৩ ঘণ্টা। এটা লক্ষ্য করা যায় যে, ডিসি-১০ ছাড়া বোয়িং এবং ফক্কার বিমানের ক্ষেত্রে মোট ব্যবহৃত ঘণ্টার অবনতি ঘটেছে। গড়ে দৈনিক ডিসি-১০, বি-৭০৭, এফ-২৮ ও এফ-২৭ বিমানের ব্যবহার ১৯৮৩/৮৪ সালে ছিল যথাক্রমে ৭·২৪, ৩·৯৬, ২·৯৬ এবং ২·৮২ ঘণ্টা। ডিসি-১০ এর তৎপরতা অন্য বিমানগুলোর চেয়ে ভাল হলেও তা আন্তর্জাতিক মান দৈনিক ১০ ঘণ্টার নীচে ছিল।

১'৩৯। **আর্থিক তৎপরতা** : গত ছয় বছরে বিমানের ব্যয় ও রাজস্ব আয় নীচে দেয়া হলো :

সারণি ১'৯

বাংলাদেশ বিমানের আর্থিক তৎপরতা

(লক্ষ টাকায়)

বছর	রাজস্ব আয়	ব্যয়	নীট মুনাফা/(লোকসান)
১৯৭৯/৮০	১২,৭৬০'৭৮	১,২২১'২৬	৫৩৯'৫২
১৯৮০/৮১	১৪,৭৮৯'১৩	১৬,২৪১'৮৪	(১,৪৫২'৭১)
১৯৮১/৮২	১৮,৭৩৬'২৭	১৯,৪২২'০৯	(৬৮৫'৮২)
১৯৮২/৮৩	২২,৯৭৮'০২	২১,৮৮৪'৭২	১,০৯৩'৩০
১৯৮৩/৮৪	৩০,০০২'৪৯	২৮,৫৭৯'৬৭	১,৪২২'৮২
১৯৮৪/৮৫	৩৭,০১১'৮২	৩৫,৮৭৮'৬৪	১,১৩৩'১৮

১'৪০। উপরের সারণি থেকে বোঝা যায় যে, সামগ্রিক ভিত্তিতে বিমান একটি লাভজনক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। তবে আভ্যন্তরীণ পরিবহনে আন্তর্জাতিক খাত থেকে ভর্তুকী দেয়া হয়। যাত্রী—কিঃ মিঃ রাজস্ব ১৯৮৪/৮৫ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে আভ্যন্তরীণ ৬৬৮'৬৭ লক্ষ, আঞ্চলিক ৫৩০'১৫ লক্ষ এবং আন্তর্জাতিক রুটে ১৪,৫৮৫'২৮ লক্ষ যা ১৯৮০/৮১ সালে ছিল যথাক্রমে ৫৯০'৬৪, ১৫৭'৫৬ এবং ১১,৬৪৪'৯৮ লক্ষ। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক খাতে বিক্রয় রাজস্বের প্রবৃদ্ধি ছিল দ্রুত। যদিও আভ্যন্তরীণ খাতকে ভর্তুকি দেয়া হয় তথাপি আভ্যন্তরীণ যাত্রী—কিঃ মিঃ বাড়লেও তার হার ছিল অনেক মন্থর। পরিবহণে প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে কেবিন ফ্যাক্টরের অবনতি ঘটে এবং ১৯৮০/৮১ সালের তা যথাক্রমে ৯১'৭% এবং ৬৬'৩৬% এর তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে যথাক্রমে ৭৫'০% এবং ৬০.৪% এ দাঁড়ায়। আঞ্চলিক খাতে কেবিন ফ্যাক্টর কমবেশী প্রায় ৭২'৫% এর স্থিতিশীল থাকে। আভ্যন্তরীণ খাতে ইতিমধ্যেই ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে বিধায় কেবিন ফ্যাক্টরের উন্নতিসাধন কষ্টকর, তবে আন্তর্জাতিক খাতে এর উন্নতি করা গেলে জাতীয় বিমান সংস্থার মুনাফা বাড়বে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১'৪১। গত কয়েকটি পরিকল্পনায় সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবহণ সুবিধাদি অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর পক্ষে অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে। পাকা রাস্তা ৬৬৯ কিঃ মিঃ বেড়ে ৪,৮২৭ কিঃ মিঃ হলেও এর অর্থ হচ্ছে এখনও প্রতি ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকার জন্য ৩'০৮ কিঃ মিঃ পাকা সড়ক। পরিবহন খাতে উন্নয়নে সীমাবদ্ধতার কারণ হচ্ছে তহবিলের অপ্রতুলতা, কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অগ্রাধিকার ও কৌশল নির্ণয় যথাযথ না হওয়ায় তহবিলের ব্যবহার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেমন, অতি বেশী প্রকল্পে তহবিল বণ্টন করার ফলে প্রকল্প শেষ করতে অধিক সময় লাগে। ফলে, উন্নয়নের প্রভাব গেছে কমে এবং সম্ভাব্য মুনাফা বিসর্জন দিতে হয়েছে। সম্পদের অভাবের মুখে নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকারদানের অর্থ ছিল রক্ষণাবেক্ষণে তহবিলের ঘাটতি, যার ফলে বিদ্যমান সুবিধাদি হতে সুফল লাভে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এ ভাবে অতীত কৌশল ও অগ্রাধিকারের সামগ্রিক প্রভাব পরিবহন খাতকে সার্বিকভাবে প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহকারীর পরিবর্তে তহবিল ব্যবহারকারী হিসাবে পরিণত করেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

১'৪২। এই খাতে বিদ্যমান মৌলিক সমস্যাগুলোর প্রেক্ষাপটে তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

(১) উপজেলা সদরদপ্তরগুলোকে জাতীয় পরিবহণ নেটওয়ার্কের অংশরূপে যুক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিবহণ সুবিধাদির উন্নয়ন ;

(২) ভৌত সুবিধাদির যোগ্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান পরিবহণ ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার ;

(৩) পরিবহণের বিভিন্ন ধারা ও মাধ্যমে পরিবহণ সার্ভিসের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ এবং সম্পদের সুযোগ্য বরাদ্দের দ্বারা যানবাহনের অর্থনৈতিক বাছাবিভক্তি নিশ্চিত করা ;

(৪) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও আধুনীকরণের মাধ্যমে জ্বালানী মিতব্যয়িতায় উৎসাহদান এবং বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থা ; এবং

(৫) নিয়মিত কর্ম তৎপরতা এবং সুবিধাদির রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যাত্রীদের অধিকতর নিরাপত্তা ও আরও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১'৪৩ তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে :

(১) ১,২৬৮ কিঃ মিঃ পাকা সড়ক নির্মাণ, বুড়িগংগা, মেঘনা ও গৌরী সেতুসহ ১৫,২৪৪ মিটার সেতু নির্মাণ ;

(২) ৯২৫ কিঃ মিঃ রেললাইনের নবায়ন ;

(৩) ২৫টি রেল ইঞ্জিন ও ৪৫১টি যাত্রীবাহী বগি সংগ্রহ ;

(৪) ২.৩০ লাখ ঘন মিটার নৌপথ খনন ;

(৫) চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার-এর উঠানামার সুবিধাদি বৃদ্ধি এবং এই সমুদ্র বন্দরের মাল উঠানামার ক্ষমতা বার্ষিক ৬ লাখ টন বাড়ানো ;

(৬) সামুদ্রিক পণ্য চলাচলের ক্ষমতা ২'৮৬ লাখ টন DWT-তে বাড়ানো ;

(৭) ১৬১ কিলোমিটার প্রধান প্রধান নৌপথের উন্নয়ন ;

(৮) ১৫০টি স্থানে লঞ্চঘাটের ব্যবস্থা এবং

(৯) ৪৮৩ কিঃ মিঃ নৌপথে নৌচলাচলে সহায়কের ব্যবস্থা করা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের লক্ষ্যমাত্রার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট—১ এ দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদী

১'৪৪। লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই খাতে উন্নয়নের প্রধান কৌশলগুলো হচ্ছে (১) বিশেষ করে বর্তমান অথবা সম্ভাব্য বেশী যানবাহন চলাচলকারী ক্ষেত্রে এবং কেন্দ্রগুলোর মধ্যে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমাপ্ত করা, (২) অর্থনৈতিক বিবেচনার উপযোগী শুধুমাত্র এমন নতুন প্রকল্প গ্রহণ, (৩) আন্তঃবাহন পরিবহণের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে এবং বিদ্যমান বহর রক্ষণাবেক্ষণে পুরো মূল্যাংশের উপর সরবরাহের ভিত্তিতে যথাযথ যানবাহন রাজস্বের বিন্যাসের মাধ্যমে বিদ্যমান সুবিধাদির সর্বোত্তম ব্যবহারে উৎসাহদান এবং (৪) সড়ক ও নৌপথ খাতে বেসরকারী খাতের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

অর্থ বরাদ্দ

১'৪৫। তৃতীয় পরিকল্পনার পরিবহণ খাতের মোট বরাদ্দ ১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যমানে ৪,১৩৭ কোটি টাকা। তবে বর্তমানে অবকাঠামো স্বল্পোন্নত বিধায় পরিবহণ ব্যবস্থার পরিচালক এবং উন্নয়নকারী হিসেবে সরকারী খাতে বেশী বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পরিবহণে সরকারী খাতের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে যমুনা-সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য বরাদ্দকৃত ২০০ কোটি টাকাসহ মোট ২,৬৩৭ কোটি টাকা। বেসরকারী খাতে বরাদ্দ হচ্ছে ১,৫০০ কোটি টাকা। উপ-খাতওয়ারী সরকারী খাতের বরাদ্দ নীচের সারণিতে দেয় হয়েছে :

সারণি -১'১০

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী খাতের বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	উপখাত		বরাদ্দ
১।	রেলওয়ে		৮৩৬'০০
২।	সড়ক ও জনপথ		৭৮০'০০
৩।	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ		২০০'০০
৪।	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থা (BRTC)		৪০'০০
		উপখাতে মোট :	১,৮৫৬'০০
৫।	চট্টগ্রাম বন্দর		৩০১'০০
৬।	চালনা বন্দর		৭৪'০০
৭।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA)		৮৮'০০
৮।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সংস্থা (BIWTA)		৩৪'০০
৯।	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (BSC)		৫১'০০
১০।	মেরিণ একাডেমী		২০'০০
১১।	শিপিং বিভাগ		২'৮৩
১২।	মার্কেন্টাইল মেরিণ ডিপার্টমেন্ট		০'১৭
		উপখাতে মোট :	৫৭১'০০
১৩।	বেসামরিক বিমান চলাচল		৭০'০০
১৪।	বাংলাদেশ বিমান		১৪০'০০
		উপখাতে মোট :	২১০'০০
		মোট :	২,৬৩৭'০০

উপরোক্ত বরাদ্দ ছাড়াও উপজেলা অবকাঠামো ও বিশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিকল্পনার জন্য থোক বরাদ্দ থেকে সড়ক উন্নয়নের জন্য তহবিল পাওয়া যাবে। এই দু ধরনের সড়কের জন্য প্রায় ৩৪৫টি কোটি টাকার বরাদ্দ আশা করা যায় যার ফলে পরিবহন খাতের মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৪৮২ কোটি টাকা।

১.৪৬। **সড়ক খাত কর্মসূচীর বিশেষ দিকসমূহ :** সড়ক ও জনপথ বিভাগ (RHD) উপখাতে নিয়মিত উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য ৭৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের (CHT) বিশেষ কর্মসূচী ও উপজেলা ভৌত অবকাঠামোর থোক বরাদ্দ থেকে রাস্তা প্রকল্পের জন্য আরও প্রায় ৩৪৫ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। এই সব বিবেচনা করে এবং কারিগরি সহায়তা কর্মসূচী ও আবগারী শুল্ক ও বিক্রয় কর (CDST) বাবদ থোক বরাদ্দ হতে সড়ক ও জনপথের সম্ভাব্য অংশীদারিত্ব মিলিয়ে সড়ক উপখাতের প্রকৃত বরাদ্দের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যাবে। যমুনা সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই এবং বিস্তারিত প্রকৌশলী কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এইভাবে উপজেলাসমূহের জন্য সহায়তা বাবদ বরাদ্দের সম্ভাব্য অংশসহ সড়ক উপখাতে সরকারী খাতের বরাদ্দ প্রায় ১৬০০ কোটি টাকার বেশী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

১.৪৭। যানবাহনের সম্ভাব্য মোটা চাহিদা এবং তার ধরন (mode) সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হবার জন্য একটা সমীক্ষার কাজ শেষ করা হয়েছে। সমীক্ষায় প্রদর্শিত মোটা আভ্যন্তরীণ যানবাহনের ক্ষেত্রে পুরো চাহিদা এবং প্রধান প্রধান ধরনের আকৃতিগত অংশীদারিত্ব নীচের সারণিতে দেখানো হলো :

সারণি ১.১১

বিভিন্ন প্রকার যানবাহনে যাত্রী ও প্রধান পণ্য চলাচলের বণ্টন বিন্যাস

(কেবল মাত্র যান্ত্রিক যান)

পরিবহনের ধরন	১৯৮৪/৮৫				১৯৮৯/৯০			
	পণ্য চলাচল		যাত্রী চলাচল		পণ্য চলাচল		যাত্রী চলাচল	
	লক্ষ টনে	%	লক্ষ জনে	%	লক্ষ টনে	%	লক্ষ জনে	%
(১) রেল	২৮.২	১২	১০২৫	৩০	৪১.০	১৩	১৫৮১	২৫
(২) সড়ক	১৪৫.০	৬৩	১৯১৮	৩৮	১৮২.০	৫৯	২৫৪৫	৪১
(৩) জলপথ	৫৭.৩	২৫	১৪১০	৩২	৮৭.০	২৮	২১২০	৩৪
মোট:	২৩০.৫	১০০	৪৪৫৩	১০০	৩১০.০	১০০	৬২৪৬	১০০

উৎস : ইন্টারমোডাল ট্রান্সপোর্ট স্টাডি চূড়ান্ত রিপোর্ট

উপরের সারণিতে মাল চলাচলের প্রবৃদ্ধি রেলপথে ৭.৭%, সড়ক পথে ৪.৭% এবং জলপথে ৮.৮% ধরা হয়েছে এবং যাত্রী চলাচলে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩.৬%, ৮.২% এবং ৮.৫%। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রবৃদ্ধির প্রকৃত হার ছিল রেল, সড়ক ও জলপথে মালামালের ক্ষেত্রে যথাক্রমে (—) ১.৪%, ৬.৪% ও ৪.০% এবং যাত্রীর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩.৩%, ৭.৩% ও.২%।

বাংলাদেশ রেলওয়ে

২.৪৮। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রেল উপখাতের উদ্দেশ্যাবলী এবং কৌশলাদি হচ্ছে নিম্নরূপ:

(১) সিগন্যালিং ও টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ যা যে কোন রেলওয়ের দক্ষ তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু;

(২) বড় ধরনের মেরামত কাজে অধিকতর গুরুত্বপ্রদানসহ বিদ্যমান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাদির উন্নয়ন;

(৩) রেলগাড়ী ও ওয়াগন তৈরীর জন্য স্থানীয় ক্ষমতার আরও উন্নয়ন;

(৪) রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন এবং চলাচল ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণদান; এবং

(৫) চলাচল চাহিদার যৌক্তিকতার ভিত্তিতেই কেবল ন্যূনতম সংখ্যক রেল ইঞ্জিন সংগ্রহ।

১.৪৯। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো যথাসময়ে সমাপ্ত করা গেলে এসব লক্ষ্যের প্রায় সবগুলো অর্জন করা সম্ভব হবে। তৃতীয় পরিকল্পনার এই উপখাতে ৮৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন চলতি প্রকল্পের জন্য ব্যয় হিসাব করা হয়েছে ৪৮০ কোটি টাকা; ক্রমবর্ধমান পরিবহন চাহিদা এবং পরিচালন দক্ষতা ও নিরাপত্তা উন্নয়নমূলক জরুরী কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য অবশিষ্ট ৩৫৬ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

১.৫০। **কর্মসূচী:** ইতিপূর্বে উল্লেখিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন কর্মসূচী হবে নিম্নরূপ:

(১) **সেতুসহ রেললাইনের পুনর্বাসন:** তদানীন্তন ভারতীয় রেলওয়ের অংশবিশেষ নিয়ে বর্তমানে গড়ে উঠা বাংলাদেশ রেলওয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে অত্যাধিক ব্যবহারের জন্য ব্যাপকভাবে ক্ষয়ে যায় এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। পাকিস্তানী আমলে এবং স্বাধীনতার পর রেললাইনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়নি। এর ফলে রেললাইন ও সেতুসমূহের অবস্থার ক্রমাবনতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, রেল ব্যবস্থার বিরাট অংশের পুরোপুরি পুনর্বাসন প্রয়োজন। যানবাহনের বিশেষ চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রধান রেলপথসমূহের মিটারগেজের ৭০২ কিঃ মিঃ রুট এবং ব্রডগেজের ৩৭৮ কিঃ মিঃ রুট বিশেষ অগ্রাধিকার কর্মসূচীর আওতায় পুনর্বাসনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। বাদবাকী অংশের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় করা যাবে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শাখাসমূহের মধ্যে মিটারগেজ রুটে ৩২০ কিঃ মিঃ পুনর্বাসনের কাজ (চট্টগ্রাম—আখাউড়া—ভৈরব-বাজার—টংগী—ঢাকা) আগেই সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য শাখায় পুনর্বাসনের কাজ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে হাতে নেয়া হয়েছিল এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে তা অব্যাহত থাকবে। তাই, তৃতীয় পরিকল্পনার পুনর্বাসন কর্মসূচীতে ৫৪৭.১৮ কিঃ মিঃ মিটারগেজ এবং ৩৭৮.২০ কিঃ মিঃ ব্রডগেজসহ মোট ৯২৫.৩৮ কিঃ মিঃ রেলপথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আখাউড়া—সিলেট— শাখায় (১৭৭.৪৩ কিঃ মিঃ), ভৈরববাজার—ময়মনসিংহ—জামালপুর শাখায় (২০৪.৩৯ কিঃ মিঃ) এবং বনারপাড়া—কাউনিয়া—পার্বতীপুর শাখায় (১৬৫.৩৬ কিঃ মিঃ) মিটারগেজ এবং পার্বতীপুর—খুলনা শাখায় (৩৭৮.২০ কিঃ মিঃ) ব্রডগেজ রেললাইন নবায়ন করা হবে।

(২) **সিগন্যালিং ব্যবস্থা :** ষ্টেশনসমূহের মধ্যে ট্রেন চলাচল এবং গতি নির্ধারণের ভিত্তি হচ্ছে সিগন্যালিং সুবিধাদি। বিদ্যমান ব্যবস্থা প্রায় অচল এবং লেভেলে থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতিতে ভরপুর। মোট ৫১৭টি ষ্টেশনের মধ্যে ৩১২টি ব্লক ষ্টেশন এবং বাকীগুলো ফ্ল্যাগ ষ্টেশন। প্রাচীন নন-ইন্টারলকিং (১৪০টি ষ্টেশন), সিংগেল ওয়্যার মেকানিক্যাল ইন্টারলকিং (৪৫টি ষ্টেশন), ডবল ওয়্যারমেকানিক্যাল ইন্টারলকিং (৮০টি ষ্টেশন), এবং আধুনিক ধরনের ইন্টারলকিং (৬১টি ষ্টেশন)—সব মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের সিগন্যালিং ব্যবস্থা বিরাজমান রয়েছে যা দ্রুতগতি ও উচ্চতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এই ব্যতিক্রম ছাড়াও, অধিকাংশ ষ্টেশনে ব্যবহৃত সিগন্যালিং সরঞ্জামাদি অত্যন্ত পুরানো এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও দীর্ঘদিনের ব্যবহারে স্বাভাবিকভাবেই জীর্ণ হয়ে গেছে। তাই বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গৃহীত নীতি হচ্ছে যেখানে সম্ভব বিদ্যমান সুবিধাদি রক্ষা করা এবং যেখানে ট্রেনের যাতায়াত বেশী সেসব ষ্টেশনে ক্রমানুয়ে আধুনিক রিলে ইন্টারলকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এই নীতির প্রেক্ষিতে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী সকল ষ্টেশনে এবং গুরুত্বপূর্ণ রুটসমূহের প্রায় সবকটি প্রধান ষ্টেশন মিলিয়ে মোট ৬১টি ষ্টেশনে ইতিমধ্যে আধুনিক রিলে ইন্টারলকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচীতে ময়মনসিংহ ও জামাল-পুরের মধ্যবর্তী ষ্টেশনসমূহে এবং চারটি জংশন ষ্টেশনে (কুলাউড়া, শায়েস্তাগঞ্জ, সান্তাহার ও পোড়াদহ এবং কাউনিয়া) সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দ হচ্ছে ২২.৫০ কোটি টাকা।

(৩) **মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাদি :** ১৯৫৩ সালে ১০টি ডিজেল রেল ইঞ্জিনের বহরের সাহায্যে ডিজেল চালিত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্প-নার শেষে এই বহরের শক্তি ২৮৯টিতে উন্নীত হওয়ার মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এগুলো ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধাদি এখনও গড়ে তোলা যায় নি। ফলে মেরামতের অপেক্ষায় থাকা এম জি ইঞ্জিনের হার ১৯৬৯ সালের ১৪.২% থেকে বেড়ে ১৯৭৯/৮০ সালে ২৭.৬% এবং ১৯৮৩/৮৪ সালে ২৬.৯% এ দাঁড়ায়। আবার বি জি ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এ হার ১৯৬৯/৭০ সালের ৮.১% থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে ২৮.৯% এ এবং ১৯৮৩/৮৪ সালে ২৫.৩% বৃদ্ধি পায়। যাত্রীবাহী বগি এবং ওয়াগনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সৈয়দপুর এবং পাহাড়তলীর কারখানায় এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শেড ও ডিপোগুলোতে পর্যাপ্ত সুবিধাদি রয়েছে। কিন্তু এসব কারখানা, শেড ও ডিপোগুলোর অধিকাংশ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম জীর্ণ ও পুরাতন এবং সেগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে সক্ষম নয়। এর ফলে, চলাচলের উপযোগী রেলযান বিশেষভাবে যাত্রীবাহী কোচের বেলায় অবনতি ঘটেছে। মেরামতের অপেক্ষায় থাকা এম জি যাত্রীবাহী কোচের হার ছিল ১৯৬৯/৭০ সালে ১৩.২%, ১৯৭৯/৮০ সালে ১৭.১% এবং ১৯৮৩/৮৪ সালে ১৫.২%। বি জি যাত্রীবাহী কোচের ক্ষেত্রে এ হার ছিল যথাক্রমে ৬.১%, ১২.০% এবং ৬.৮% তাই তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার বিনিয়োগ কর্মসূচীতে বছরে ১০০টি ডিজেল ইঞ্জিনের ভারী মেরামত এবং ব্যাপক নবায়নের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আধুনিক কারখানা নির্মাণ এবং ওয়াগন ও কোচের বিদ্যমান সুবিধাদি সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য পাহাড়তলী ও সৈয়দপুর কারখানার রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানোর কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর ব্যয় ধরা হয়েছে ১২৭.৮৭ কোটি টাকা।

(৪) **রেলইঞ্জিন ও যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ :** তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়েকে যে পরিমাণ যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ করতে হবে তা' ১.১১ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে যাত্রী পরিবহণ এবং মাল পরিবহণের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ২৫% ও ১৩%। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে রেলইঞ্জিন, ওয়াগণ ও যাত্রীবাহী কোচের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৮৯,১৬৪৭ এবং ১৬,৫১৪। সারণি ১.১ এ ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রেলওয়ে সম্পদের ব্যবহারের পরিমাণ অত্যন্ত সামান্য। রেলগাড়ীর Rolling-stock এর প্রাপ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলো সম্পন্ন হলে বিদ্যমান গাড়ীগুলোই অনুমিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী পরিমাণ মালামাল পরিবহন করতে পারবে। তাই মালবাহী ওয়াগণ সংগ্রহের কোন প্রস্তাব করা হয় নি। কেবলমাত্র কর্মতৎপরতার দক্ষতা বাড়িয়েই অতিরিক্ত ২৫% যাত্রী পরিবহণ সম্ভব নয়। এছাড়াও ১২০টি এম জি যাত্রীবাহী কোচ পাল্টানোর প্রয়োজন হবে। তাই কর্মসূচীতে বিদেশ থেকে ১৮১টি এম জি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ, স্থানীয়ভাবে ১২০টি এম জি যাত্রীবাহী কোচ সংযোজন এবং ১০০টি এম জি ও ৫০টি বি জি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে। এতে পরিকল্পনা শেষে বিদ্যমান যাত্রীবাহী কোচগুলির সাথে আরও ৩০১টি কোচ সংযুক্ত হবে। চলাচলের (traction) জন্য ২৫টি (২০টি এম জি + ৫টি বি জি) অতিরিক্ত রেলইঞ্জিন প্রতিস্থাপন খাতে সংগ্রহ করা হবে। ৩৬টি পুরানো এম জি রেলইঞ্জিন রয়েছে সেগুলো ভারী ধরনের মেরামত সুবিধাদির অভাবে ১৯৯৫ সাল নাগাদ চলবে; তখন তাদের ক্ষমতা থাকবে মাত্র ৫০%। তাই ২০টি নতুন এম জি রেলইঞ্জিনের প্রয়োজন। এই কর্মসূচীতে মোট ব্যয় হবে ২৪৭.২২ কোটি টাকা।

(৫) **প্রশিক্ষণ সুবিধাদি :** স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল কর্মকর্তা এবং সিনিয়র অধঃস্তনদের লাহোর রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হতো। কারখানার শিক্ষানবিশরা ছাড়া নিম্নস্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য অবশ্য পাকশি/সৈয়দপুরহাটে অপর্যাপ্ত সুবিধাসহ একটি প্রশিক্ষণ স্কুল ছিল। এই সমস্ত শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সৈয়দপুর ও পাহাড়তলীর কারখানায় রয়েছে। স্বাধীনতার পর সকল স্তরের রেল কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি পূর্ণাংগ জাতীয় একাডেমী প্রতিষ্ঠার জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই অনুসারে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় চট্টগ্রামে একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই একাডেমীতে বছরে ৩৩৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ পরবর্তী প্রশিক্ষণ, ২,০০০ জন কর্মচারীর আভ্যন্তরিণ প্রশিক্ষণ এবং বিভাগ ও শাখাসমূহের ১২৫ জন কর্মচারীর তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। একাডেমী যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় সেজন্য তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচীতে যন্ত্রপাতি বিশেষ করে মডেল কক্ষের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর ব্যয় ধরা হয়েছে ৭'৯৬ কোটি টাকা।

সড়ক ও জনপথ

১.৫১। সর্বাধিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মোট পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য দেশের উন্নয়ন চাহিদার অনেক নীচে রয়ে গেছে। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে সড়ক ও জনপথ পরিদপ্তরের ব্যবস্থাপনাধীনে নির্মিত বিভিন্ন স্তরের সড়কের তুলনামূলক অবস্থা ১'১২ নং সারণিতে দেয়া হলো :

সারণি ১.১২

বর্তমান সড়কগুলোর প্রকারভেদ

(কিলোমিটারে)

সড়কের প্রকার	পাকা সড়ক		কাঁচা/কাঁকর বিছানো সড়ক
	১৯৮০ সালের জুনের অবস্থা	১৯৮৫ সালের জুনের অবস্থা	১৯৮৫ সালের জুনের অবস্থা
(১) জাতীয় মহাসড়ক	১,৩৭৪	১,৪০৮	১৬৯
(২) আঞ্চলিক মহাসড়ক	৮৬১	৮৮৫	১৯৩
(৩) উপ-আঞ্চলিক (জেলা) সড়ক	৭৪৮	৯৬৫	৪৩৪
(৪) সংযোগকারী/উপজেলা সংযোগকারী সড়ক	১,১২৬	১,৫৬৯	৪,০২৩
মোট :	৪,১০৯	৪,৮২৭	৪,৮১৯

সড়ক ও জনপথ বিভাগের পাকা সড়কগুলো ছাড়াও স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থাপনাধীন আরও ৪,১৮৩ কিঃ মিঃ পাকা সড়ক রয়েছে। এতে দেশে মোট পাকা সড়কের পরিমান দাঁড়ায় ৯০১০ কিলোমিটার।

১.৫২। রাস্তা কিলোমিটারে অপর্যাপ্ততা ছাড়াও বিদ্যমান মহাসড়ক নেটওয়ার্ক বেশ কয়েকটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন। সেগুলো হচ্ছে :

(১) গুণগত মানভিত্তিক ও কাঠামোগত ক্ষমতার দিক থেকে জাতীয়/আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্কের মান পর্যাপ্ত নয়; অগ্রাধিকারভিত্তিতে এর উন্নীতকরণ প্রয়োজন। জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়কগুলোর বর্তমান আচ্ছাদনের পুরুত্ব যথাক্রমে ৪৫০ মিঃ মিঃ ও ৪০০ মিঃ মিঃ। পক্ষান্তরে এর জন্য নির্ধারিত মান হচ্ছে যথাক্রমে ৬৭৫ মিঃ মিঃ ও ৬০০ মিঃ মিঃ। ফলে নির্মাণের ১০ বছর পর এ সমস্ত সড়কগুলি আর চলাচলের উপযোগী থাকে না। একইভাবে জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়কগুলোর প্রস্থ হচ্ছে ৩.০০—৪.২৫ মিটার, যদিও নির্ধারিত মান হলো ৫.৫—৬.৭ মিটার।

(২) সড়ক নেটওয়ার্ক নদী ও খালের দ্বারা বিভক্ত। এই ধরনের কিছু ফাঁক (gap) সেতু নির্মাণ করে বন্ধ করা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে ফেরীর ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু অনেক ফাঁক এখনও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। প্রধান সড়ক ব্যবস্থায় কমপক্ষে ২০টি বড় ধরনের ফাঁক শক্তিচালিত ফেরীর মাধ্যমে সংযুক্ত। এ সমস্ত সড়কে গড়ে দৈনিক যানবাহন চলাচলের পরিমাণ ১৫০০—৪৫০০ পিসিই'র (যাত্রীগাড়ী সমতুল্য) মধ্যে উঠানামা করে। পরিকল্পনা সময়ে এ সমস্ত যান চলাচলের প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৭%।

(৩) সম্পদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ সরঞ্জামের স্বল্পতার দরুণ সড়ক ব্যবস্থার নিয়মিত/সময়কালীন রক্ষণাবেক্ষণ বিঘ্নিত করে। সাধারণতঃ সড়কের উপরিভাগ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি তিন বছর অন্তর 'সীল আস্তরণ' করতে হয় এবং সাধারণ ছোটখাটো মেরামত ছাড়াও প্রতি ৬ বছর অন্তর ২৫—৫০ মিঃ মিঃ পুরু বিটুমিনাস কংক্রিটের বহিরাবরণ দিতে হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল এবং উন্নয়ন তহবিলের বিদ্যমান অনুপাত হচ্ছে ১: ৪ সেখানে তা কমপক্ষে হওয়া উচিত ১ : ২। অপরদিকে বিদ্যমান সরঞ্জামাদি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অব্যবহার্য অবস্থায় পড়ে আছে।

১.৫৩। **উন্নয়ন কৌশলাদি ও নীতিমালা :** বাস্তবায়নাধীন ১১৭টি প্রকল্প তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত হবে, যার জন্য প্রাক্কলিত সর্ব মোট ১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে ২০৯৮ কোটি টাকা। প্রকল্পগুলো সমাপ্ত করার জন্য এই অর্থের পুরোটাই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রয়োজন হবে না। পরিপূর্ণতা অর্জনে দীর্ঘসূত্রতা সত্ত্বেও কারিগরি দিক থেকে শেষ করা সম্ভব এমন সব প্রকল্প শেষ করার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনার অধীনে পর্যাপ্ত তহবিল থাকবে না। এই অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ অনেকগুলো নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রবণতার দরুন যেখানে তহবিলের অভাবে এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদের স্বল্পতার কারণে বিদ্যমান সড়কগুলোই রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় না। তাই সড়ক ও জনপথ খাতের কৌশল ও নীতি সংক্রান্ত সুপারিশ হচ্ছে নিম্নরূপ :

(১) বাস্তবায়নাধীন প্রায় ১১৭টি প্রকল্প (উপজেলা সড়কসমূহ বাদে) পর্যালোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পগুলোর জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

(২) বর্ধিত যানবাহনের চাহিদা মোতাবেক জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উন্নয়নকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৩) দীর্ঘবিলম্বিত সেতুগুলোসহ সকল বাস্তবায়নাধীন সেতু প্রকল্পের কাজ সমাপ্তকরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৪) সেতু ও কালভার্টসহ মহাসড়ক সড়ক ব্যবস্থা এবং উপজেলা সংযোগকারী সড়কসমূহের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে "ধাপে ধাপে নির্মাণ" এর কৌশল অনুসরণ করা উচিত।

১.৫৪। **উন্নয়ন কর্মসূচী :** সড়ক ও জনপথ খাতের উন্নয়ন কর্মসূচীগুলো নীচে আলোচিত হল।

(১) সড়ক ও জনপথ পরিদপ্তরের নিয়মিত উন্নয়ন কর্মসূচী নিম্নরূপ :

(ক) বর্ধিত ক্ষমতার প্রয়োজন মেটাতে সেতু ও কালভার্টসহ প্রধান সড়ক ব্যবস্থার প্রায় ১,৯৩১ কিলোমিটার সড়ক উন্নীতকরণ/প্রশস্তকরণ। অন্যান্যের মধ্যে এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে জাতীয় মহাসড়কসমূহ যথা, পশ্চিমাঞ্চলে নগরবাড়ী-দিনাজপুর মহাসড়ক (২১২ কিঃ মিঃ) ও নগরবাড়ী-রাজশাহী মহাসড়ক (১৫৪ কিঃ মিঃ) এবং পূর্বাঞ্চলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক (১০২ কিঃ মিঃ), টাংগাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়ক (৪৫ কিঃ মিঃ) ও চট্টগ্রাম কক্সবাজার সড়ক (১১৪ কিঃ মিঃ)।

(খ) প্রধান সড়ক ব্যবস্থায় ৬,০৭৮ মিটার প্রধান সেতুসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং নির্মাণ। অন্যান্যের মধ্যে এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মেঘনা সেতু, গোমতীর বুড়িগংগা সেতু, ফরিদপুর-যশোর সড়কে গড়াই সেতু এবং ফরিদপুর-বরিশাল, ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে সেতুসমূহ। এ সমস্ত ফাঁকে (Gap) যানবাহনের বর্তমান ও তৃতীয় পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে অনুমিত সংখ্যা নীচে দেয়া হলো :

সারণি ১·১৩

দৈনিক গড় চলাচল (যানবাহন)

সেতুর নাম	১৯৮৫	১৯৯০
(১) মেঘনা সেতু	২০৪০	৪৪২৯
(২) বুড়িগংগা সেতু	২৫০	৫৪৩
(৩) গড়াই সেতু	৬০০	১৩০২
(৪) ঢাকা-সিলেট সড়কে	২২৪০	৪৬৩১
(৫) ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে	৭৮০	১৬৯১

উৎস : ইন্টারমোডাল ট্রান্সপোর্ট স্টাডি

(গ) দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলের আঞ্চলিক নেটওয়ার্কে ৩২২ কিলোমিটার হারানো যোগসূত্রের নির্মাণ/উন্নীতকরণ।

(২) উপজেলা সংযোগকারী সড়ক কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে আনুমানিক ২,৮৯৩ কি: মি: পাকা সড়ক এবং প্রায় ৯,১৪৬ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অধীন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১২২০ মিটার সেতু ও কালভার্টসহ আনুমানিক ৩২০ কি: মি: পাকা সড়ক নির্মাণ।

(৪) এছাড়াও সড়ক ও সেতু নির্মাণের কার্যকর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সহায়ক অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি/সম্প্রসারিত করা হবে। এর মধ্যে থাকবে —

(ক) গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে রাত্রিকালীন পারাপারের সুবিধাদিসহ ৩০টি স্থানে বিদ্যমান ফেরী ও ফেরী টার্মিনালসমূহের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ। ৬২টি ঘাটের উপর এক সমীক্ষার সুপারিশ অনুসারে ৩০টি স্থানকে ফেরী সুবিধাদির উন্নয়নের জন্য বাছাই করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার শেষনাগাদ ২৩টি স্থানে উন্নয়ন কার্যকর হয়েছে এবং তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাকী ৭টি স্থানের উন্নয়ন শেষ করা হবে।

(খ) নমুনা মোতাবেক মানসম্মত সড়ক নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ। সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সমস্ত প্রধান সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে সড়ক রোলার, বুলডোজার, মোটর গ্রেডার, কংক্রিট মিক্সার মেশিন, ট্রাক, মোবাইল কম্প্রেসার ইত্যাদি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনাকালে এসব সরঞ্জামের মোট সংখ্যা হচ্ছে ১,১৫৮ এবং বিভিন্ন রকমের আরও ৮৬৯টি সরঞ্জাম পরিকল্পনাকালে সংগ্রহ করা হবে।

(গ) ১০টি মাঠপর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপনের ব্যবস্থাসহ কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণা পরীক্ষাগারের শক্তিবৃদ্ধি।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থা

১.৫৫। বেসরকারীকরণ নীতির অধীনে সড়ক পরিবহণ সার্ভিসে বেসরকারী খাত ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখবে। তাই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার যানবাহন বহরের শক্তিবৃদ্ধি করার কোন প্রস্তাব রাখা হয়নি। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে কেবলমাত্র এর পুরানো ও বাতিল বাসগুলোর প্রতিস্থাপন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ জন্য ৪০ কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মাধ্যমে অন্ততঃ ২৭৫টি বাস প্রতিস্থাপন করা যাবে। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম শহরে বৈদ্যুতিক ট্রলিবাস প্রবর্তনের এক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ হাতে নেয়া হবে।

১.৫৬। **নীতিমালা :** বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থার পরিচালনা ও আর্থিক তৎপরতা বাড়ানোর জন্য নিম্নোক্ত নীতি রূপরেখাগুলো কার্যকর করা প্রয়োজন :

(১) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থার নিজস্ব বিদ্যমান বহর সন্তোষজনকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তায় চলাচলের অযোগ্য বহরকে পুনর্বাসিত করার জন্য অর্থ যোগাতে এবং আয় বৃদ্ধি করতে না পারা পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থার উচিত তার তৎপরতার পরিধি কমিয়ে আনা এবং পারতপক্ষে তা ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরীতে সীমাবদ্ধ রাখা।

(২) সরকারী (BRTC) ও বেসরকারী খাতের সড়ক পরিবহনে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণের নীতি চালু করতে হবে। ভাড়া পদ্ধতি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পর্যালোচনা/সংশোধনের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে অন্ততঃপক্ষে প্রকৃত পরিচালনা ব্যয় মিটানো সম্ভব হয়।

(৩) সরকারী নির্দেশে সার্ভিস দিতে গিয়ে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হলে তার জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থাকে ভর্তুকী দিতে হবে।

(৪) বিদ্যমান কারখানা ও অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাদির (ডিপো/সাব-ডিপো) সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে যাতে মোট বাস ও ট্রাকের ৮৫% অথবা তার থেকেও বেশী সংখ্যা সড়কে চলাচল করতে পারে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার অধীনে কারখানাটিকে একটি স্বাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানরূপে চালাতে হবে।

(৫) বাসগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও ভালভাবে চালু রাখার জন্য অপারেটর ও মেকানিকদের প্রশিক্ষণদানে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ সুবিধাদি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে।

(৬) চালু গাড়ীর বহরের সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মচারী ও গাড়ীর অনুপাত যুক্তিসঙ্গত করতে হবে।

বেসরকারী সড়ক পরিবহন

১.৫৭। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অধিকতর বিনিয়োগের মধ্যে দিয়ে বেসরকারীকরণের সরকারী নীতির প্রতি ব্যাপক সাড়া প্রতিফলিত হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেও একই নীতি অব্যাহত থাকবে বিধায়, আশা করা হচ্ছে যে, পরিকল্পনাকালে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ হবে প্রায় ৯৫৫ কোটি টাকা বিশেষতঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান এলাকার সড়ক পরিবহন খাতে বেসরকারী খাতের অধিকতর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য নিম্নোক্ত নীতি ও ব্যবস্থাদি বিবেচনা করা উচিত:

(১) যান্ত্রিক যানবাহন প্রবর্তনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে রিক্সা, টানা ও ঠেলা গাড়ীর (ঠেলা) মত ধীর গতির গাড়ীসমূহ উঠিয়ে দিতে হবে। এধরনের গাড়ীর বিদ্যমান চালকদের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) ব্যয়ের প্রতিফলন ও দক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে যুক্তিসংগত সীমা পর্যন্ত যাত্রী ভাড়া কমবেশী করার ক্ষমতা পরিচালককে প্রদান করা উচিৎ। ব্যয় বৃদ্ধির কারণে যখন ভাড়া বৃদ্ধি জরুরী হয়ে পড়ে তখনও ভাড়া বাড়ানো কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই অধিকাংশ চালক মেট্রোপলিটান এলাকায় গাড়ী চালানো এড়াতে চায়। কারণ এখানে চালানোর খরচ দীর্ঘ দূরত্বের রুটের চেয়ে বেশী পড়ে।

সামুদ্রিক বন্দর

১.৫৮। উভয় সামুদ্রিক বন্দরের প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে গভীরতার সীমাবদ্ধতা, ক্রমবর্ধমান হারে কন্টেইনারবাহিত পণ্যের উঠানামা এবং সর্বোপরি বিদ্যমান বন্দর ও আভ্যন্তরীণ পরিবহন সুবিধাদির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে তাদের মধ্যে জাহাজগুলোর সর্বোচ্চ বিতরণ। তাই বন্দরগুলোর উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য হবে কারিগরী ও আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যতটুকু সম্ভব হয় এ সব সমস্যাগুলো দূর করা, যাতে ১৯৮৯/৯০ সালে ধারণাকৃত ১১.১৫ মিলিয়ন টনের নৌ-পরিবহন দক্ষতার সাথেও লাভজনকভাবে পরিচালনা করা যায়। প্রাক্কলিত হয়েছে যে আমদানি বৃদ্ধির ফলে চালনা বন্দরের অবদান ১৯৮৪/৮৫ সালের ২৭% থেকে বেড়ে ৩০.৫% এ দাঁড়াবে। অপরপক্ষে চট্টগ্রাম বন্দরের অবদান ৭৩% থেকে কমে ৬৯.৫%-এ নেমে আসবে। এতে করে উভয় বন্দরের মধ্যে মালামাল বিতরণে অধিকতর ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। উভয় বন্দরে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের অনুপাতে উন্নতি ঘটবে, এতে খালি অবস্থায় ফিরে যাবার ব্যয় কমবে। চট্টগ্রামে এই অনুপাত ২০:১ থেকে ১৩:১ এ কমে আসতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

গ্রন্থাগার

বন্দর উন্নয়ন কর্মসূচী

১.৫৯। **চট্টগ্রাম বন্দর :** চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য ৩০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর মধ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

(ক) **দু'টি বহুমূখী জেটির কাজ শেষ করা :** বন্দরে সময় কমানো এবং বন্দরে পণ্য হস্তান্তর ব্যয় কমানোর জন্য কনটেইনারজাতকরণ নামে নতুন পরিবহন ও প্যাকেজিং কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। ১৯৭০ সাল থেকে বর্ধিত সংখ্যক কনটেইনার জাহাজ চট্টগ্রামসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলোতে আসছে। এই অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয় এবং তা ১৯৮৭/৮৮ নাগাদ শেষ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ৯০,০০০ কনটেইনার উঠানামার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং এতে বন্দরের মাল উঠানামার ক্ষমতা ৬ লাখ টন বৃদ্ধি পাবে।

(খ) চট্টগ্রাম বন্দরে ১৬ কি: মি: দীর্ঘ প্রবেশ পথ রয়েছে যার সর্বোচ্চ অনুমোদিত ৯ মিটার গভীরতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত খনন প্রয়োজন। পরীক্ষামূলক খনন কাজ চালিয়ে দেখা গেছে যে, ২,৫০০ ঘন মিটার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ট্রেইলিং হপার সাকশান ড্রেজারের দ্বারা বন্দরের প্রবেশ পথে প্রয়োজনীয় গভীরতা নিশ্চিত করা যায়। অতএব, একটি ট্রেইলিং সাকশন হপার ড্রেজার সংগ্রহ করা হলে তা বন্দরে প্রবেশ পথের গভীরতা নিশ্চিত করবে।

১.৬০। **চালনা বন্দর :** চালনা বন্দরের উন্নয়নের জন্য ৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই উন্নয়ন কর্মসূচী হচ্ছে নিম্নরূপ :

(১) **সহায়তা সুবিধাদি :** দ্বিতীয় পরিকল্পনা শুরুর আগেই পাঁচটি জেটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে; কিন্তু সহায়তা সুবিধাদি যেমন গুদাম, ট্রানজিট শেড, আভ্যন্তরীণ সড়ক, মাল উঠানামার সরঞ্জাম, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, প্রশাসনিক ও আবাসিক ভবনসমূহ, খুলনা-মংলা-সড়ক ইত্যাদি না থাকার সেগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা যায়নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এইসব সুবিধাদির অধিকাংশ হয় সমাপ্ত হয়েছে, নতুবা নির্মাণের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তাই প্রয়োজনীয় সহায়তা সুবিধাদির জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে ইতিমধ্যে নির্মিত ৫টি জেটি অতিরিক্ত ১০ লাখ টন ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

(২) **নতুন জেটি :** প্রথমে চালনা বন্দর প্রকল্পে অন্যান্যের মধ্যে ৮টি জেটি নির্মাণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সম্পদের স্বল্পতা এবং মাল চলাচল বৃদ্ধির অনিশ্চয়তার কারণে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র পাঁচটি জেটি নির্মিত হবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই ৭টি জেটির জন্য ভিত্তি পিলার প্রোথিত করার কাজ শেষ হয়ে যায়। পাঁচটি জেটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে বর্ধিত মাল চলাচলের আশা করা হচ্ছে বিধায়, ইতিপূর্বে ভিত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করা দু'টি জেটির নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হবে, যাতে বন্দরে মাল উঠানামার ক্ষমতা প্রায় ৪.৫ লাখ টন বৃদ্ধি পায়।

১.৬১। চালনায় পাঁচটি জেটি এবং চট্টগ্রামে দু'টি বহুমুখী জেটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের মাধ্যমে অভিক্ষেপ অনুযায়ী অতিরিক্ত মাল উঠানামার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। এতে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে মাল উঠানামার ক্ষমতা বাড়বে যথাক্রমে ১০ লাখ টন ও ৬ লাখ টন। এছাড়াও বন্দরের কারিকর দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে অভিক্ষেপের চেয়েও অনেক বেশী মাল উঠানামার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

বেশী গভীরতাসম্পন্ন বন্দর

১.৬২। আগেই বলা হয়েছে যে, চালনা ও চট্টগ্রাম উভয় বন্দরের প্রধান সমস্যা হচ্ছে সীমিত গভীরতা ও নদী ভরাট হয়ে যাওয়া। আন্তর্জাতিক নৌ-পরিবহনে বড় ধরনের জাহাজের দিকে ঝোঁক লক্ষ্য করে সমস্যা সমাধানকল্পে সম্প্রতি লাইটারেজ এর প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু লাইটারেজ ব্যয়বহুল, সময়ক্ষেপনকারী এবং বর্ষাকালীন সময়ে অনুপযোগী। প্রাক্কলিত হয়েছে যে লাইটারেজের জন্য বার্ষিক অতিরিক্ত ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হবে। এর স্থায়ী সমাধানের জন্য একটি সম্ভাব্যতার সমীক্ষার কাজ ১৯৭৮ সালে হাতে নেয়া হয়। এই সমীক্ষায় পতেঙ্গায় পিওএল, সার, খাদ্যশস্য ও সিমেন্ট ইত্যাদি বড় ধরনের মাল উঠানামা ব্যবস্থা সুবিধাদি নিশ্চিত করার জন্য সুপারিশ করা হয়, যেখানে ৫০,০০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ ভিড়তে পারবে। এর আগে তহবিলের অভাবে এই সুপারিশ কার্যকর করা যায়নি। তাই, আগেকার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পুনর্বিবেচনা করার ব্যবস্থা হয়েছে যাতে প্রকল্পটি উপযুক্ত বিবেচিত হলে নক্সা তৈরীসহ পূর্ণাংগ প্রকৌশলগত সমীক্ষা শেষ করা যায়।

বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন :

১.৬৩। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের জন্য ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে তিনটি তেলবাহী ট্যাঙ্কার, কনটেইনার জাহাজসহ সমুদ্রগামী শুকনো মালবাহী জাহাজ ও কনটেইনার সংগ্রহ এবং কারখানার আধুনিকীকরণ। জাহাজ সংগ্রহের ব্যাপারে শুধু আংশিক অর্থ প্রদানের প্রয়োজনে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন একটি স্বনির্ভর সংস্থা। তাই পরিকল্পনায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি এমন কোন জাহাজ অথবা সরঞ্জাম যদি আর্থিক ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয় তবে সব আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন তা সংগ্রহ করতে পারবে।

শিপিং পরিদপ্তর

১.৬৪। শিপিং পরিদপ্তরের প্রধান দায়িত্বসমূহ হচ্ছে সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল তদারক করা এবং শিপিং উপখাতের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় বিদেশী জাহাজে কর্মরত বাংলাদেশী রেজিষ্টিকৃত নাবিকের সংখ্যা ছিল ৫০,০০০। এখন তা সংকুচিত হয়ে প্রায় ৯,০০০ এ দাঁড়িয়েছে। যদিও এই হ্রাসের পেছনে অনেকগুলো বাহ্যিক কারণ রয়েছে, তথাপি প্রশিক্ষণের বর্তমানে অভাবও এর অন্যতম প্রধান কারণ। বর্তমানে অস্থায়ী কাঠামোর অপ্রতুল ভাবে সজ্জিত একটি প্রশিক্ষণ স্কুল রয়েছে। তাই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে একটি স্থায়ী নাবিক প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপন করা হবে। এ জন্য পরিকল্পনায় ২.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিদপ্তর

১.৬৫। সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিদপ্তর বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমায় দুর্গত জাহাজের অনুসন্ধান ও উদ্ধার সহায়তার জন্য নিযুক্ত। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের মধ্যে চলাচলকারী জাহাজের জন্য নৌ-চলাচল সহায়তা দেয়ার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে '৩টি বাতিঘর পুনর্বাসনের' কাজ শেষ করা হবে। সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিদপ্তরের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৭ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মেরিণ একাডেমী

১.৬৬। দুটি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প: (১) মেরিণ একাডেমীর মাষ্টার প্ল্যান এবং (২) সামুদ্রিক মৎস্যশিকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সম্পন্ন করার জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মেরিণ একাডেমী সমাপ্ত হলে প্রাক-সমুদ্র এবং পরবর্তী-সমুদ্র উভয় ধরনের কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা হবে এবং উচ্চতর স্তরের পেশাগত পরীক্ষার জন্য কোচিং ক্লাশের ব্যবস্থা করা যাবে।

আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন

১'৬৭। বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের (BIWTA) জন্য ৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বি আই ডব্লিউ টি এ'র উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রধান বিষয়গুলো হচ্ছে :

(১) সারাবছর নির্ধারিত ন্যূনতম গভীরতা নিশ্চিত করতে বর্তমান নৌ-পথের ১৬০ কিঃ মিঃ খনন ;

(২) নৈশ ও নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিত করা এবং ৪৬০ কিঃ মিঃ এরও বেশী পথে নৌ-চলাচলের চিহ্ন প্রদানের মাধ্যমে নৌ-চলাচলের সুবিধার ব্যবস্থা করা ;

(৩) গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ১৫০টি লঞ্চ ভিড়ানোর ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা ;

(৪) আরিচা, নগরবাড়ী, দৌলতদিয়া, সিরাজগঞ্জ, ভুয়াপুর, মাওয়া ও কেওরাকান্দী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফেরী কেন্দ্রে যাত্রীদের অপেক্ষা করার শেড, ট্রাক/বাস পার্ক করার ইয়ার্ড, পায়খানা সুবিধা, রেস্তোরাঁ ইত্যাদির মত বিদ্যমান সুবিধাদির উন্নয়ন এবং নতুন সুবিধাদির সৃষ্টি করা ;

(৫) ৩টি হাইড্রোগ্রাফিক জরীপ জাহাজ সংগ্রহ এবং

(৬) জাহাজের ক্রমবর্ধমান হারে কণ্টেইনারজাতকরণের প্রেক্ষিতে আভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরগুলোতে কণ্টেইনার উঠানামা করানোর কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষা।

১'৬৮। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মত একই ধরনের উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করবে। ফেরী সংগ্রহ করা ছাড়া বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা তার কার্য পরিধি বাড়াবে না। তাই এর উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে থাকবে এর মেরামত সুবিধাদির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ। যদি পরিকল্পনার সময়কালে সংস্থা যথেষ্ট উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারে অথবা এ ধরনের সংগ্রহের আর্থিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা দেখিয়ে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অগ্রিম পায় তবে বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা কোষ্টার এবং তেলবাহী ট্যাংকার সংগ্রহ করতে পারবে। তাই এ ধরনের প্রকল্পের জন্য কোন আর্থিক বরাদ্দ রাখা হয়নি। উপরে বর্ণিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই সংস্থার জন্য ৩৪ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বেসরকারী খাতে নৌ-পরিবহন

১'৬৯। যে সব ক্ষেত্রে বেসরকারী খাত এখনও কোন অবদান রাখেনি সে সব ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও সরকারী খাতের সংস্থা তার ক্ষমতা সম্প্রসারিত করবে না। তাই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বর্ধিত নৌ-পরিবহন চাহিদা মেটানোর প্রধান দায়িত্ব বেসরকারী খাতকে পালন করতে হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন খাতে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ ছিল ৩৯১'০০ কোটি টাকা। যেহেতু বেসরকারী খাতকে উৎসাহদানের সরকারী নীতি অব্যাহত থাকবে এবং যেখানে বেসরকারী খাতের বেড়ে উঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে, সে সব ক্ষেত্রে সরকারী খাতকে তার ক্ষমতা বাড়াতে দেয়া হবে না সেহেতু প্রাক্কলিত হয়েছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন খাতে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ ৫৪৫'০০ কোটি টাকা হতে পারে যা দ্বিতীয় পরিকল্পনার চেয়ে ৩৯% বেশী।

বেসামরিক বিমান চলাচল

১'৭০। পরিকল্পনাকালে কৌশল হবে আরও আধুনিক সুবিধাদি এবং উন্নততর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে বিদ্যমান বিমান বন্দরগুলোর সার্ভিসের উন্নয়ন ঘটানো। সকল বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিমান বন্দরের উন্নয়ন, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পাকা সড়ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং বেসামরিক বিমান চলাচল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শেষ করা হবে। নতুন প্রকল্পগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আভ্যন্তরীণ টার্মিনাল ভবন নির্মাণ এবং জিয়া বিমান-

বন্দর ও সিলেট বিমানবন্দরে যাত্রী উঠানামার সুবিধাদি বৃদ্ধি করা। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে সিলেটে এফ-২৮ বিমান উঠানামার জন্য এবং চট্টগ্রামে বোয়িং ৭০৭ বিমান উঠানামার জন্য পর্যাপ্ত টার্মিনাল ও রানওয়ে সুবিধাদি পাওয়া যাবে। এতে সিলেট ও জিয়া বিমানবন্দরে কাস্টমস পরীক্ষার ও মালপত্র তদারক সুবিধাদি বৃদ্ধি পাবে এবং জিয়া বিমানবন্দরে অতিরিক্ত পার্কিং সুবিধার ব্যবস্থা হবে যেখানে বর্তমান ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। এর ফলে বর্তমান টার্মিনাল ভবনে ভীড় কমবে; ইতিমধ্যে সেখানে ভীড়ের অস্তিত্ব রয়েছে। এইসব কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিমান ঃ

১'৭১। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প, যেমন, গ্রাউণ্ড ট্রেনিং কেন্দ্র, মোটরযান পরিচালনা, যোগাযোগ-সরঞ্জাম এবং বাংলাদেশ বিমানকে সহায়তাদান, ইত্যাদি সমাপ্ত করা হবে। নতুন প্রকল্পগুলোর মধ্যে হ্যাংগার কমপ্লেক্স, ফ্লাইট কেটারিং কেন্দ্র, ছাপাখানার আধুনিকীকরণ এবং একটি নতুন ডিসি-১০ প্রশিক্ষণ বিমান সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। বিমানের বর্তমান বহরে রয়েছে এফ-২৭, এফ-২৮, বোয়িং-৭০৭ এবং ডিসি-১০ বিমান। এফ-২৭ এবং এফ-২৮ বিমানের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাদি দেশের মধ্যে থাকলেও অন্যান্য বিমানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ বিদেশী বিমান সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এটা যে শুধু ব্যয়বহুল তাই নয়, উপরন্তু ফ্লাইটের নির্দিষ্ট সময়সূচী বজায় রাখতেও তা বিঘ্ন ঘটায়। জিয়া বিমান বন্দরে অবতরণকারী বাংলাদেশ বিমান ও বিদেশী বিমানগুলোর জন্য ফ্লাইট কেটারিং কেন্দ্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিমানের ক্রুদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ বিমান জরুরী বলে বিবেচিত হচ্ছে। তাদেরকে এখন এ ধরনের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠাতে হয়। এটা সংগৃহীত হলে শুধু যে স্থানীয়ভাবে তাদের প্রশিক্ষণ নেয়া যাবে তাই নয়, বৈদেশিক মুদ্রাও বেঁচে যাবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিমানের জন্য ১৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১'৭২। বাংলাদেশ বিমান বিদ্যমান বহর থেকে পুরোনো কিছু বোয়িং—৭০৭ বিমান প্রতিস্থাপন করে কিছু অতিরিক্ত বিমান সংগ্রহ করবে। এছাড়াও বিমানের প্রশাসনিক ভবনরূপে কাজ চালানোর জন্য কুর্মিটোলার কাছে সান-ইন-শেড হোটেলের নির্মাণ কাজ শেষ করবে। বোয়িং—৭০৭ বিমান প্রতিস্থাপনের যুক্তি এই তথ্যের মধ্যে নিহিত যে এগুলোর মধ্যে তিনটি বিমান নির্মিত হয়েছে ১৯৬২-৬৭ সালের মধ্যে। এসমস্ত বিমানের অর্থনৈতিক আয়ু ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে এবং এ ধরনের বিমান এখন প্রায় ব্যবহৃত হয় না বিধায় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বাণিজ্যিক ঋণের ভিত্তিতে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত করা হবে।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় প্রস্তুতির বিশেষ কর্মসূচী

১'৭৩। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রায় বাৎসরিক ব্যাপার। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস দেশে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। এতে জীবন ও সম্পদহানি এত ব্যাপকভাবে ঘটে যে প্রায়ই গোটা দেশকে বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়তে হয়। গত ২৫ বছরে অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের ১৩টি ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপর আঘাত হেনেছে। সর্বশেষ ১৯৮৫-সালের ২৪শে মে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে আঘাত হানে এবং জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ধ্বংসসাধন করে।

১'৭৪। ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের কোন প্রতিকার নেই। এর মধ্যে কেবলমাত্র রয়েছে সময় থাকতে সতর্ক করার ব্যবস্থা করা এবং পর্যাপ্তভাবে নিরাপদ কম্যুনিটি ভবন নির্মাণ করা যাতে এ ধরনের বিপর্যয়কালে সম্ভাব্য দুর্গত এলাকার লোকজন আশ্রয় নিতে পারে। তবে সড়ক, আভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পরিবহন সুবিধা, বিমান পরিবহন সুবিধার মত পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা অত্যাবশ্যক। ঘূর্ণিঝড় এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস কোন এলাকায় আঘাত হানার পর দ্রুত বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়ে দুর্গত জনগণের দুর্দশা লাঘবের জন্য তা জরুরী। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীতে দেশের বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করে ঘূর্ণি উপদ্রুত এলাকাসমূহে স্থানীয় সড়ক নির্মাণ, আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন যান সংগ্রহ, নৌ-চলাচল সহায়তাদি, বিদ্যমান আভ্যন্তরীণ টার্মিনাল (ঘাট) সুবিধাদির পুনর্বাসন এবং নতুন সুবিধাদি নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৬'০০ কোটি টাকা এবং পরিবহন খাতের বরাদ্দ থেকে তা মেটানো হবে।

পরিবহন খাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য শিল্পভিত্তিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

ক্রমিক নং	উপ-খাত	ইউনিট	১৯৭৯/৮০ সালের অবস্থা	১৯৮৪/৮৫ সালের অবস্থা	তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা: অতিরিক্ত	বদল	মোট	১৯৮৯/৯০ সালের প্রত্যাশিত অবস্থা	শতকরা পরিবর্তনের হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	রেলওয়ে :								
	(ক) ডিজেল ইঞ্জিন	সংখ্যা	বিজি-৪৪	৭৬	....	৫	৫	৭৬	....
			এমজি-১৪৮	২১৩	....	২০	২০	২১৩	....
	(খ) ষ্টীম ইঞ্জিন	সংখ্যা	বিজি-৬৮	ফেজ আউট	....	....	....	....	....
			এমজি-১২৯		....	....	....	....	....
	(গ) মোট রেল ইঞ্জিন	সংখ্যা	বিজি-১১২	৭৬	....	৫	৫	৭৬	....
			এমজি-২৭৭	২১৩	....	২০	২০	২১৩	....
	(ঘ) যাত্রী কোচ	সংখ্যা	বিজি-৩৭০	৩৪২	....	৫০	৫০	৩৪২	....
			এমজি-১,০০০	৯৯১	৬০	৩৪১	৪০১	১,০৫১	৬.০
	(ঙ) অন্যান্য কোচ	সংখ্যা	বিজি-৮৪	৬১	....	....	....	৬১	....
			এমজি-২৫৯	২৫৩	....	....	....	২৫৩	....
	(চ) মালবাহী ওয়াগন	সংখ্যা	বিজি-৪,২৫২	৪,০৮০	....	....	....	৪,০৮০	....
			এমজি-১২,১০৫	১২,৪৩৪	....	....	....	১২,৪৩৪	....
	(ছ) রুট কিলোমিটার	কিলোমিটার	বিজি-৯৭৩'৬৯	৯৭৮'৯২	৮	....	৮	৯৮৬'৯২	০'৮
			এমজি-১৯১০'২১	১৯১২'৯১	....	....	....	১৯১২'৯১	....
	(জ) লাইন কিলোমিটার	কিলোমিটার	বিজি-১৫৯৯'৩৫	১৬০৪'৩৮	৮	....	৮	১৬১২'৩৮	০'৫০
			এমজি-২৯৪২'৮০	২৯৪৫'৫০	....	....	....	২৯৪৫'৫০	....

ক্রমিক নং	উপ-খাত	ইউনিট	১৯৭৯/৮০ সালের অবস্থা	১৯৮৪/৮৫ সালের অবস্থা	তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা			১৯৮৯/৯০ সালের প্রত্যাশিত অবস্থা	শতকরা পরিবর্তনের হার
					অতিরিক্ত	বদল	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২।	**সড়ক ও মহাসড়ক :**								
(ক)	পাকা (সড়ক ও জনপথ)	কিলোমিটার	৪,১১২	৪,৮৩৩	১,২৮৮	১,৯৩২	৩,২২০	৬,১১৮	২৬'৭
(খ)	সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৬৪,০২৪	৭৬,২২০	১৫,২৪৪	১,৮২৯	১৭.০৭৩	৯১,৪৬৪	২০'০
৩।	**সড়ক পরিবহন :**								
(ক)	বাস (রাস্তায়) :								
	(১) সরকারী (বিআরটিসি)	সংখ্যা	৬৭৫	৪৬৫	....	২৭৫	২৭৫	৪৬৫	....
	(২) বেসরকারী	সংখ্যা	১০,২৯৪	৮,৯০০	১,৯১০	৮১৯	২,৭২৯	১০,৮১০	২১'৫
(খ)	ট্রাক :								
	(১) সরকারী (বিআরটিসি)	সংখ্যা	১১০	১৬৪	....	....	....	১৬৪	....
	(২) বেসরকারী	সংখ্যা	১৬,১১৮	১৭,১০২	৩,৮২৮	২,০৬১	৫,৮৮৯	২০,৯৯০	২২'৪
(গ)	অটোরিক্সা	সংখ্যা	১৫,১৬৮	১৬,৫৮০	২,৫১৪	১,০৭৭	৩,৫৯১	১৯,০৯৯	১৫'২
৪।	**অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ :**								
(ক)	প্রধান নদীপথগুলোর উন্নয়ন	কিলোমিটার	৫,২২১	৫,৫৬৭	১৬১	....	১৬১	৫,৭২৮	২'৯
(খ)	প্রধান ও গৌন নদী বন্দরগুলোর উন্নয়ন	সংখ্যা	৬*	১৪*	২	....	২	১৬	১৪'৩
(গ)	লঞ্চঘাট	সংখ্যা	২০০	২৫০	৫০	১০০	১০০	৩০০	২০.০
(ঘ)	ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট যান	সংখ্যা	৮ (৩২টি সংশ্লিষ্ট যান)	৮	....	....	....	৮	...
(ঙ)	উপকূলীয় নৌযান	সংখ্যা	১৭	২২	৪	....	৪	২৬	১৮'২
(চ)	প্রধান ফেরীঘাটসমূহ	সংখ্যা	৫	৬	৪	....	৪	১০	৬৬'৭

১। শুধু শ্রেণীভুক্ত বন্দর।

২। নারায়ণগঞ্জের মধ্যে খানপুর ও একরামপুর, খুলনায় মহেশ্বরপাশা ও ঢাকায় বাদামতলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-১ (ক্রমশঃ)

ক্রমিক নং	উপ-খাত	ইউনিট	১৯৭৯/৮০ সালের অবস্থা	১৯৮৪/৮৫ সালের অবস্থা	তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা: অতিরিক্ত	বদল	মোট	১৯৮৯/৯০ সালের প্রত্যাশিত অবস্থা	শতকরা পরিবর্তনের হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫।	**আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থা :** (সরকারী ও বেসরকারী)								
	(ক) তেল ট্যাংকার	সংখ্যা	২৩	৩১	....	৭	৭	৩১	....
	(খ) কোষ্টার	সংখ্যা	৪৪	৯৯	....	১০	১০	৯৯	....
	(গ) বার্জ/ফ্ল্যাট/পাটের নৌকা	সংখ্যা	৯৪৯	৮৯৬	....	১০০	১০০	৮৯৬	....
	(ঘ) স্বয়ংচালিত বার্জ	সংখ্যা	২৫২	৬৪৫	৩০	৬০	৯০	৬৭৫	৪.৭
	(ঙ) টাগ	সংখ্যা	১৭৪	১৮৫	....	২০	২০	১৮৫	....
	(চ) এইচ ডি লঞ্চ	সংখ্যা	১৮	১৬	....	....	....	১৬	....
	(ছ) যাত্রী নৌযান/লঞ্চ	সংখ্যা	৯৬৮	১৫০০	৪০০	৭৫	৪৭৫	১৯০০	২৬.৭
	(জ) ফেরী	সংখ্যা	১৭	২০	৪	....	৪	২৪	২০.০
৬।	**বন্দর :**								
	(ক) চট্টগ্রাম বন্দর	জেটি সংখ্যা	১৭	১৮	২	....	২	২০	১১.১
	(খ) চালনা বন্দর	জেটি সংখ্যা	৫	৫	২	....	২	৭	৪০.০

পরিশিষ্ট-১ (ক্রমশঃ)

ক্রমিক নং	উপখাত	ইউনিট	১৯৭৯/৮০ সালের অবস্থা	১৯৮৪/৮৫ অবস্থা	সালের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা: অতিরিক্ত	বদল	মোট	১৯৮৯/৯০ সালের প্রত্যাশিত অবস্থা	শতকরা পরিবর্তনের হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭।	**সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল :**								
	(ক) মালবাহী জাহাজ	সংখ্যা	১৮	২৫	৪	৭	১১	২৯	১৬'০
	(খ) তেলবাহী ট্যাংকার	সংখ্যা	৩	১	২	১	৩	৩	২০০'০
	(গ) কোষ্টার	সংখ্যা	৩	২	....	....	....	২	....
	(ঘ) যাত্রীবাহী জাহাজ	সংখ্যা	১	....	....	....	....	....	....
	মোট :		২৫	২৮	৬	৮	১৪	৩৪	২১'৪
৮।	**বেসামরিক বিমান চলাচল :**								
	(ক) বিমান বন্দর	সংখ্যা	৮	৮	....	....	....	৮	....
	(খ) বিমান	সংখ্যা	৮	১৩	১*	৩	৪	১৪	৭'৭

টীকা ১ : শর্ত

বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার-

বাস—৫'৫%
ট্রাক—৬'১%
অটোরিক্সা—৪%

টীকা ২ : অতিরিক্ত ও বদলের অনুপাত

বাস—অতি ৭০%, বদল ৩০%
ট্রাক—অতি ৬৫%, বদল ৩৫%
অটোরিক্সা—অতি ৭০%, বদল ৩০%

*মোড় আপ ট্রেইনার বিমান

রেফারেন্স : ইন্টারমোডাল পরিবহন সমীক্ষা, ১৯৮৫

পরিচ্ছেদ ২ঃ যোগাযোগ

উন্নয়নশীল অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য বর্তমানে দেশে বিদ্যমান টেলি-যোগাযোগ সুবিধাদি অপর্যাপ্ত। বাংলাদেশের প্রতি ১০০ জনসংখ্যা পিছু টেলিফোনের ০.১৮ ঘনত্ব বিশ্বের অন্যতম সর্বনিম্ন এবং এর উন্নয়ন দুটো উন্নয়ন অনুক্রম থেকে উৎসারিত। প্রথমতঃ উন্নয়নে অংশীদারিত্বের পক্ষে কৌশল পরিবর্তনের ফলে সরকারী প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ যোগাযোগকে স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার অত্যাবশ্যকীয় মাধ্যমে পরিণত করেছে। দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্বারোপের ফলে এমন এক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে যা জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে যাবে।

অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা (১৯৭৩—৮০)

২.২। **ডাকঘর ঃ** ১৯৭৩/৭৪ সালে দেশে ৬,৬৮০টি ডাকঘর ছিল। যদিও ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ৬৮,০০০ গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে, তবুও ডাকঘরের সংখ্যা ৭০ এর দশকে মন্থর গতিতে বেড়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরুতে এই সংখ্যা ৭,২৯২এ দাঁড়ায় এবং এর একটা বিরাট সংখ্যা, প্রায় ৬,০০০টি পল্লী এলাকায় অবস্থিত ছিল। শহরাঞ্চলের জন্য অবশিষ্ট ছিল মাত্র ১,২৯২টি। পোষ্টাল নেট-ওয়ার্কের সীমিত সম্প্রসারণ ছাড়া মেইল ভ্যান সংগ্রহের মাধ্যমে বিলি ব্যবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে।

২.৩। **টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ঃ** প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে মোট টেলিফোন সেটের সংখ্যা ছিল পল্লী এলাকায় ৬,০০০ এবং শহর ও নগরসমূহে ৫৪,০০০টি। ১৯৭৯/৮০ সালে টেলিফোনের সংখ্যা বেড়ে ১,২০,০০০টিতে দাঁড়ায়। অভ্যন্তরীণ দূরপাল্লার টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ নেট-ওয়ার্কের ক্ষেত্রে সাফল্য মোটামুটি ভাল। প্রধান চলাচল কেন্দ্রগুলোকে মাঝারি ক্ষমতার মাইক্রো-ওয়েভের সাহায্যে অথবা জেলা ও মহকুমা শহরগুলোকে ভি এইচ এফ নেট-ওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন তিন চ্যানেলের ভি এইচ এফ ভূমিস্থ লাইনের নেট-ওয়ার্ক থানা সদরদপ্তরগুলো (বর্তমানে উপজেলা) পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। এই সময়ের একটা উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হচ্ছে ভারত মহাসাগরীয় যোগাযোগ উপগ্রহের মাধ্যমে বৈদেশিক যোগাযোগের উন্নয়নকল্পে ১৯৭৫ সালে একটি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন।

২.৪। **আবহতত্ত্ব ঃ** বাংলাদেশ মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় আবহাওয়া জনগণের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আবহগত সেবার উন্নতিকল্পে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ৮টি প্রথম শ্রেণীর, ২টি পাইলট বেলুন, ৪টি রইনসনডে পর্যবেক্ষণাগার এবং ৪টি বিমান চলাচল পূর্বাভাষ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ৯টি প্রথম শ্রেণীর এবং ৪টি পাইলট বেলুন পর্যবেক্ষণাগার চালু করার মধ্য দিয়ে এই উন্নয়নসমূহ অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা

২.৫। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার অধীনে ৩৪১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনাকালে সামগ্রিক এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩২১.৪৭ কোটি টাকা যা পরিকল্পনা বরাদ্দের ৯৪%এর সামান্য বেশী। উপজেলাসমূহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত ৩৮.৭৩ কোটি টাকাসহ এই খাতের প্রকৃত ব্যয় অবশ্য ছিল ৩৪৬.৯০ কোটি টাকা। প্রকৃত বাস্তব অর্জন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মোট ৩৯টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয় এবং ৩০৮.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ের ৩০টি চলতি প্রকল্প তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত করা হয়।

ডাকঘর

২'৬। ডাক সেবার উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২৪'২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ১৯৮০/৮১ সালের শুরুতে দেশে ডাকঘর ছিল ৭,২৯২টি এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭০০টি নতুন ডাকঘর চালু করা, কিন্তু এই সময়ে মাত্র ২৯১টি ডাকঘর চালু করা হয়। ফলে ১৯৮৪/৮৫ সালে মোট ডাকঘরের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,৫৮৩টিতে। ডাক বিতরণ ও ডাক পরিবহন সার্ভিসের উন্নয়নের জন্য ৫৫টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে মোট ১৬টি গাড়ী ক্রয় ও চালু করা হয়। এছাড়াও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৯৫টি নতুন ডাকঘর ভবন এবং ডাক কর্মচারীদের জন্য ২৯৮টি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়। যে সব উপজেলায় পাকা বাড়ী ছিল না সেসব জায়গায় ২১'৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে উপজেলা ডাকঘর ভবন নির্মাণের জন্য ১৯৮২/৮৩ সালে এক নতুন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। এই কর্মসূচী সকল উপজেলা ডাকঘরের প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাদি সুনিশ্চিত করবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে থোক বরাদ্দ থেকে এই কর্মসূচীর জন্য ৭'২০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭৬টি উপজেলা ডাকঘর ভবনের কাজ শেষ হয়েছে এবং আরও ১৮টি নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন

২'৭। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ট্রাংক এক্সচেঞ্জসমূহে স্বয়ংক্রিয়করণের মত যোগাযোগের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কথা মনে রেখে অর্থনীতির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার চাহিদা মেটাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচিসমূহ প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল বিদ্যমান ১,২০,০০০টি লাইন ইউনিটের সাথে ৫৫,০০০টি নতুন টেলিফোন যোগ করা। বাস্তবিকপক্ষে নতুন লাইনের প্রকৃত সংখ্যা হয় প্রায় ৬২,০০০ তন্মধ্যে শহরাঞ্চলে স্থাপিত টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ৪৬,০০০ ইউনিট এবং গ্রামাঞ্চলে ছিল ১৬,০০০ ইউনিট। টেলিফোনের ঘনত্ব আগেকার ১০০০ জনসংখ্যা প্রতি ১'৩ থেকে বেড়ে ১.৮-এ দাঁড়ায়।

২'৮। এই পরিকল্পনাকালে পুরাতন এবং নতুন জেলা শহরগুলোতে কায়িকভাবে চালিত এক্সচেঞ্জ-সমূহ পাল্টে স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জে রূপান্তরের উপরও জোর দেয়া হয়। ফলে জেলা সদরদপ্তরগুলোতে স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জের সংখ্যা ৪৫টি থেকে ৮৪টিতে বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনায় জেলা স্তরের নীচেও টেলিফোন সুবিধাদি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রাখা হয়। কতিপয় উপজেলা শহরে ৩০ লাইনের ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ১৪৪টি চৌম্বক কায়িকভাবে চালিত এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়। অবশ্য কতিপয় উপজেলা শহরে ২০টি স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ চালু করা হয়। এছাড়াও পরিকল্পনাকালে ১০০টি ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং পল্লী প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রকে পাবলিক কল অফিসসমূহের (পিসিও) মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়।

২'৯। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহজ করার জন্য স্বয়ংক্রিয় নাম্বার চিহ্নিতকরণ (এএনআই) সুবিধাদিসহ ঢাকা (৩০০০ লাইনের), চট্টগ্রাম (১০০০ লাইনের), খুলনা এবং সিলেটে প্রত্যেকটিতে ৫০০ লাইন করে ডিজিটাল ট্রাংক এক্সচেঞ্জসমূহ স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকার সহিত বাইরের ১৮টি দেশের সাথে সরাসরি ডায়ালিং এবং ৬৭টি দেশের সাথে ট্রানজিট সুবিধাদি রয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক গ্রাহক ডায়ালিং (আইএসডি)-এর স্থানীয় এক্সচেঞ্জ এ পর্যন্ত ঢাকার গ্রাহকদেরকে ৯৮২টি সংযোগ দিয়েছে। মোট ৯৬টি নতুন বহির্বিশ্ব টেলিগ্রাফ/টেলেক্স সার্কিট এবং ১২৯টি বহির্বিশ্ব টেলিফোন সার্ভিস খোলা হয়েছে। উল্লেখ্য এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২০ ও ৩০টি সার্কিট। বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ এবং ঢাকার কাছে তালিবাবাদে একটি নতুন 'বি' ধরনের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে বহির্বিশ্ব সার্কিটের মোট সংখ্যা ২৯১টিতে বৃদ্ধি পায়।

২'১০। গ্রাহকদের জন্য দেশব্যাপী ডায়ালিং (এনডব্লিউডি) সুবিধাদির ব্যবস্থা করার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বগুড়ায় চারটি ডিজিটাল ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ পর্যন্ত ২৬টি জেলা শহরকে এনডব্লিউডি পদ্ধতিতে সংযুক্ত করা হয়েছে, যদিও দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৪টি জেলাশহর সংযোগ করার।

গ্রন্থাগা

২'১১। পরিপূরক যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে শহর এবং পল্লী এলাকায় ১১৩টি টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপন করা হয়েছে এবং পরিকল্পনার সময়কালে ১০০৮টি নতুন টেলেক্স লাইন চালু করা হয়েছে। জাতীয় ট্রাংক নেট ওয়ার্কে, আতওয়ারী-ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর-কুলবাড়িয়া-রংপুর, বগুড়া-নাটোর-রাজশাহী, পাবনা-কুষ্টিয়া-চুয়াডাংগা এবং খুলনা-বরিশাল রুটে ৯৬০ চ্যানেলের নতুন মাইক্রোওয়েভ রুট চালু করা হয়েছে। মাইক্রোওয়েভ ট্রাংক প্রধান রুটসমূহের সাথে বাকী জেলাসদরসমূহের সংযোগের জন্য মোট ২৫টি ইউ এইচ এফ যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। কুষ্টিয়া-চুয়াডাংগা-কৃষ্ণনগরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারত মাইক্রোওয়েভ যোগসূত্র এবং ঠাকুরগাঁও-আতওয়ারী-ভদ্রপুরের মাধ্যমে বাংলাদেশ-নেপাল-ইউএইচএফ যোগসূত্রও চালু করা হয়েছে। বিদ্যমান ক্ষমতার সাথে প্রায় ১২,০০০ নতুন চ্যানেল ক্ষমতা যোগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫,০০০ চ্যানেল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মাইক্রোওয়েভ চ্যানেলের বিদ্যমান ৯৬০টি লাইনের স্থলে ১,৮০০টি লাইনের কাজ শেষ করা হয়েছে।

২'১২। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বছরে (১৯৮৪/৮৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের টেলি-যোগাযোগ-সুবিধাদির উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। এই প্রকল্পের অতি উচ্চ শব্দতরংগের (ইউএইচএফ) বেতার যোগসূত্রের মাধ্যমে রাংগামাটি, বান্দরবন এবং খাগড়াছড়ি জেলা শহরগুলোর সাথে ২২টি উপজেলার সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এই জেলা শহরগুলোকে চট্টগ্রাম ন্যাশনওয়াইড ডায়লিং (এনডব্লিউডি) এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে।

২'১৩। যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সাথে সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখা দেয়। এই চাহিদা মেটাতে পরিচালনা বিষয়ক এবং টেলিফোন অপারেটার, লাইনম্যান, ইত্যাদির মত নীচু স্তরের কারিগরি লোকজনদের প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর এবং বরিশালে পাঁচটি টেলিযোগাযোগ প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও মাঝারি স্তরের কারিগরি লোকদের প্রশিক্ষণের জন্য বগুড়ায় টেলিযোগাযোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উচ্চতর কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা জনশক্তির প্রশিক্ষণের জন্য জয়দেবপুরে টেলিযোগাযোগ ষ্টাফ কলেজ স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে।

২'১৪। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক চাহিদার জন্য টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন (টিএণ্ডটি) বোর্ড উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উদ্বৃত্ত রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হয়েছে। বার্ষিক রাজস্ব সংগ্রহ ১৯৮২/৮৩ সালের ৬০'০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ তে ১৫১'০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

২'১৫। যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের সাথে সাথে টি এস এস এর বিদ্যমান ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ডায়লিং (ই এম ডি) পদ্ধতি অনুপযোগী হতে পড়তে শুরু করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাই বিদ্যমান টেলিফোন শিল্প সংস্থার (টি এস এস) ফ্যাক্টরীকে কিছু সময়ের জন্য ই এম ডি সরঞ্জাম উৎপাদনসহ ইলেকট্রনিক সুইচিং ফ্যাক্টরীতে পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বৈদেশিক সহায়তা না পাওয়ায় টি এস এস এর সামঞ্জস্যকরণ, আধুনিকীকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। টি এস এস এর বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ২০,০০০ লাইন এবং ৩০,০০০ টেলিফোন সেট। তবে কাঁচা মালের ঘাটতি, শ্রমিক অসন্তোষ এবং ব্যবস্থাপনার অদক্ষতার কারণে এর উৎপাদন ক্ষমতার ৬৬% ব্যবহৃত হচ্ছে।

২'১৬। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সহায়তাকল্পে বছরে ২,২৫,০০০ কন্ডাক্টর কিলোমিটার ক্যাবল উৎপাদনকল্পে বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিঃ (বিসিএস) নামে বাংলাদেশের একটি ফ্যাক্টরী রয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আড়াই শিফটের ভিত্তিতে এর উৎপাদন ক্ষমতা ৩,৬৫,০০০ কন্ডাক্টর কিলোমিটারে বাড়ানোর কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। এটা ধারণা করা হয় যে, এই সম্প্রসারণের ফলে আউটডোর ও ইনডোর টেলিযোগাযোগ ক্যাবল, জংশন ক্যাবল ও গ্যালভেনাইজড তারের ক্ষেত্রে দেশ যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে তাই নয়, রপ্তানির জন্য উদ্বৃত্তও থাকবে। কিন্তু এই সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন লক্ষ্যমাত্রায় বাস্তবায়ন ব্যর্থ হয়েছে। প্রধানতঃ কাঁচামালের ঘাটতি, শ্রমিক অসন্তোষ, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং বাজারের অস্থিরতার কারণে পরিকল্পনার সময়কালে এর উৎপাদন ক্ষমতার গড়ে ৭০ শতাংশ ব্যবহৃত হয়।

২.১৭। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উভয় ফ্যাক্টরীর উৎপাদন শুর নীচের সারণিতে দেখানো হলো :

সারণি ২.১

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ লাইন, টেলিফোন সেট ও কন্ডাক্টর ক্যাবল-এর উৎপাদন

বছর	টি এস এস				বি সি এস	
	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ লাইন (সংখ্যা)	বছর প্রতি ২০,০০০ লাইনের নিরূপিত ক্ষমতার %	টেলিফোন সেট (সংখ্যা)	বছর প্রতি ৩০,০০০ সেটের নিরূপিত ক্ষমতার %	পরিমাণ (কন্ডাক্টর কিলোমিটার)	বছর প্রতি ৩৬৫,০০০ কন্ডাক্টর কিলোমিটারের নিরূপিত ক্ষমতার %
১৯৮০/৮১	১৪,০২০	৭০.১	১৯,২৩২	৬৪.১০	২৫০,০০০	৬৮.৫
১৯৮১/৮২	১১,৪৮১	৫৭.৪	১৭,৭৮১	৫৯.২৭	৩৩২,০০০	৯১.০
১৯৮২/৮৩	১৩,২০১	৬৬.০	১৭,৪১৭	৫৮.০৩	২৩১,৩০৪	৬৩.৪
১৯৮৩/৮৪	১৪,৫৫৫	৭২.৮	২১,৫৯৫	৭১.৯৮	২৯২,৮৯৩	৮০.২
১৯৮৪/৮৫	১১,৭৩০	৫৮.৬৫	২১,৩২৬	৭১.০	২৫২,০০০	৬৯.০

আবহতত্ত্ব

২.১৮। আবহগত তথ্যের উন্নয়নকল্পে দ্বিতীয় পরিকল্পনার অধীনে ১২.৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই কর্মসূচীর অধীনে ৮টি প্রথম শ্রেণীর, ৩টি পাইলট বেলুন এবং ৮টি এগ্রোমেট পর্যবেক্ষণাগার চালু করা হয় এবং পেশাগত যোগ্যতা ও বিভিন্ন আবহগত সার্ভিসের উন্নতি করা হয়। পরিকল্পনার সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হচ্ছে, ১৩ তলা রাডার টাওয়ারসহ আবহাওয়া সদর দপ্তরের ভবন নির্মাণ কাজ শেষ করা। টাওয়ারের চূড়ায় ইউএনডিপির সহায়তায় একটি আধুনিক হাইড্রোলজিক্যাল তথা আবহাওয়া সতর্কীকরণ রাডার বসানো এবং চালু করা হয়েছে। এছাড়া আবহগত প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, আবহগত কারখানা ও পরীক্ষাগার, আবহাওয়াবিষয়ক বিভাগ এবং আবহগত টেলিযোগাযোগ সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী, কৌশলাদি ও নীতিমালা

২.১৯। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে চলতি প্রকল্পগুলো সমাপ্তিকরণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শুধু বৈদেশিক অর্থ-সাহায্যের সম্ভাবনা রয়েছে এমন ওটিকয়েক অপরিহার্য নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজেলা প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। প্রধান উদ্দেশ্যাবলী, কৌশলাদি ও নীতিমালা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ক. ডাকঘর

২.২০। ডাকঘরকে অন্যতম মৌলিক জনহিতকর সার্ভিস মনে করা হয় এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামোর এটা একটা অংশ। রেল, সড়ক ও টেলিযোগাযোগের ন্যায় সব বাহনের চেয়ে ডাকঘর জীবনের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সবচেয়ে সস্তা ও সহজ যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু অপর্যাপ্ত অফিস ও আবাসিক ভবন, কাউন্টার সুবিধাদির অনুপস্থিতি, দ্রুত বুকিং এর অভাব, সংগ্রহ, বাছাই ও দ্রুত ডাক বিতরণের অব্যবস্থার কারণে ডাক সার্ভিসের বর্তমান মান নীচু স্তরের। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচীসমূহে ডাকঘর ও আবাসিক ভবন নির্মাণ/মেরামত/উন্নয়ন, যান্ত্রিকীকরণ, দ্রুত ডাক সার্ভিস ও জনকল্যাণ তৎপরতার মাধ্যমে ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন ঘটিয়ে ডাক সার্ভিসের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২.২১। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী গড়ে ২০ থেকে ৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জন্য অথবা ৩০০০ থেকে ৬০০০ অধিবাসীর সেবার জন্য একটি ডাকঘর স্থাপন করতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ডাকঘরের মোট সংখ্যা ছিল ৭,৫৯০ ইউনিট। ফলে একটি ডাকঘর ১৮.৮৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা অথবা ১৩০৭০ জন অধিবাসীকে সেবা করেছে। (১৯৮৪/৮৫ সালের জনসংখ্যা ৯ কোটি ৯২ লাখ ধরে)। যদিও ডাকঘরের ঘনত্বের দিক দিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক মানের চেয়ে ভাল কিন্তু জনসংখ্যার দিক দিয়ে এটা খুবই অকিঞ্চিৎ। অধিকন্তু দেশের বিদ্যমান ডাকঘরগুলোও সকল এলাকায় সুসমভাবে অবস্থিত নয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অধীনে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৫০০ ডাকঘর খোলা হবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলাদি হবে বিদ্যমান সার্ভিসের সুষ্ঠুতর ব্যবহার এবং ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন ঘটিয়ে ডাক সার্ভিসের উন্নয়ন করা।

২.২২। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে দেশে ডাকঘর রয়েছে ৭,৫৯০ টি যার ৮০% পল্লী এলাকায় অবস্থিত। ভাড়াহীন জায়গার অভাবে গ্রামীণ ডাকঘরগুলো দোকান, বাজার, পরিত্যক্ত অথবা ভাংগা বাড়ীতে চালু রাখা হয়েছে। অধিকাংশ গ্রামীন ডাকঘরগুলো বাইরের এজেন্টদের মাধ্যমে চালু রাখা হয় এবং তারা এর জন্য খণ্ডকালীন ভাতা পান। উপজেলা সদরদপ্তরগুলোর উন্নীতকরণ এবং পল্লী এলাকার উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গুরুত্বারোপের ফলে কার্যকরভাবে পল্লী এলাকায় ডাকব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরী হয়ে পড়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাই ইউনিয়ন পরিষদ সদরদপ্তরগুলোতে শাখা ডাকঘরসমূহে টিনশেড/আধাপাকা ঘর নির্মাণের মাধ্যমে ২০০ গ্রামীণ ডাকঘরে ন্যুনতম ভৌত সুবিধাদি যোগানোর এবং ২০০ ডাকঘরে সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

খ. টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সার্ভিস

২.২৩। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিদ্যমান সুবিধাদির সুসংহতকরণ, প্রশাসনিক ও পরিচালনা দক্ষতার উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির আধিকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য টেলিযোগাযোগ যোগসূত্র গড়ে তোলার চেষ্টা চালানো হবে।

২.২৪। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। বিশ্বের সর্বত্র এনালগ থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে রূপান্তরের ঝোঁক পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোন কোন দেশে পরিচালনা দক্ষতা ও ব্যয় পরিমিত করার জন্য ১০০ শতাংশ এনালগ সুইচসমূহের পরিবর্তন চালু রয়েছে। অর্থনৈতিক অসুবিধার কারণে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্রমান্বয়ে রূপান্তরের যথেষ্ট সুযোগসহ উভয় প্রকার ব্যবস্থার সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে এনালগ সুইচগুলো ক্রমশঃ সরিয়ে ফেলে ডিজিটাল সুইচ বসানো হবে। তাই, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের উন্নয়ন এবং নির্ভুলভাবে বিল করার জন্য ডিজিটাল মাইক্রোওয়েভ পদ্ধতি এবং ডিজিটাল কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত স্থানীয় এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ৭৫,০০০ অতিরিক্ত টেলিফোন সংযোগের মাধ্যমে টেলিফোনের ঘনত্ব ১৯৮৪/৮৫ সালের ১০০ জনসংখ্যাপ্রতি ০.১৮ থেকে ১৯৮৯/৯০ এ ০.২৩ এ উন্নীত করা হবে।

২.২৫। প্রায় সবকটি জেলা শহরকে ইতিমধ্যেই স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ ব্যবস্থার দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। বাকী জেলাশহরগুলোতেও বিদ্যমান কায়িকভাবে চালিত এক্সচেঞ্জ পাল্টে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বসানো হবে। জেলা শহরগুলোকে স্থিতিশীল মাইক্রোওয়েভ অথবা ইউএইচএফ রেডিও যোগসূত্র দ্বারা সংযুক্ত করা হবে এবং টেলিযোগাযোগ চলাচলের চাহিদা মেটাতে চ্যানেল ক্ষমতা বাড়ানো হবে।

২.২৬। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ২৬টি জেলা শহরকে সরাসরি ডায়লিং (এনডব্লিউডি) ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে বাকী জেলা শহরগুলোকে পর্যায়ক্রমে এনডব্লিউডি ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রচেষ্টা চালানো হবে। উল্লেখ্য যে, আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং কলগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে চারটি প্রধান স্বয়ংক্রিয় ট্রাংক এক্সচেঞ্জ

(টি এ এক্স) এবং একটি আন্তর্জাতিক গেইটওয়ে এক্সচেঞ্জ (আই টি এ এক্স) এর মাধ্যমে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড দু' বছরে বার্ষিক রাজস্ব আয় আড়াইগুণ বাড়িয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উভয় ব্যবস্থার আওতা সম্প্রসারণের ফলে রাজস্ব আয় দ্বিগুণ হতে পারে।

২.২৭। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ এবং সরকার কর্তৃক নিম্নস্তর থেকে উন্নয়ন তৎপরতা সম্প্রসারণের ফলে সকল উপজেলা সদরে (৪৬০টি) টেলিযোগাযোগ সুবিধাদির সম্প্রসারণ জরুরী হয়ে পড়েছে। বিদ্যমান ৩০২টি কায়িকভাবে চালিত এক্সচেঞ্জ ছাড়াও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে প্রাথমিকভাবে সবগুলো উপজেলা সদর এবং কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কেন্দ্রকে আওতাভুক্ত করার জন্য প্রতিটি ৩০টি টেলিফোন লাইনের ক্ষমতাসম্পন্ন ১৪৪টি ম্যাগনেটো এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়েছে। উপজেলার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ৮,৭০০ লাইনের ক্ষমতাসম্পন্ন ৪২টি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন এবং বিদ্যমান ৯৫টি কায়িকভাবে চালিত এক্সচেঞ্জে প্রতিটির ক্ষমতা ৩০ থেকে ৭০ লাইনে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্প্রচার নেটওয়ার্কের উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ টেলিফোনসমূহে ডিজিটালকরণের প্রস্তুতিমূলক অন্তর্বর্তী নেটওয়ার্ক হিসেবে ডিজিটাল রেডিও যোগসূত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিদ্যমান কায়িক ট্রাংকগুলোর পরিবর্তে জেলা শহর এবং উপজেলা সদরের মধ্যে ইউএইচএফ ডিজিটাল রেডিও যোগসূত্র স্থাপন করা হবে। উন্নততর চ্যানেল ক্ষমতার ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের পর্যাপ্ত গুণগত উন্নয়নসহ ৩২২টি গ্রামীণ উপজেলা এর আওতায় আসবে।

২.২৮। সাধারণ মানুষের জন্য টেলিগ্রাফ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে স্বল্পব্যয়ের যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু শতাব্দী প্রাচীন মোর্স সার্কিট ফোনোগ্রাম এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট টেলিপ্রিন্টার সার্কিট ব্যবহারের ফলে এই সার্ভিস দ্রুত এবং সুষ্ঠু হতে পারেনি এবং গণপ্রয়োজনের লক্ষ্যকেও সন্তুষ্ট করতে পারছে না। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ঢাকায় একটি জেনটেক্স এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়ায় তিনটি উপ-এক্সচেঞ্জ স্থাপনের মধ্য দিয়ে টেলিগ্রাফ সার্ভিসের আধুনিকায়ন করা হবে। উপজেলা টেলিযোগাযোগ প্রকল্পের অধীনে জেলা ও উপজেলা সদরগুলোকে টেলিপ্রিন্টার সার্ভিসের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে। এতে একস্থান থেকে অন্যত্র দ্রুত টেলিগ্রাফ সার্ভিস সম্প্রচারের সুবিধা হবে। এর ফলে ডাক ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের উপর চাপ ক্রমশঃ কমে আসবে।

২.২৯। ব্যবসা ও বাণিজ্য এবং আর্থিক তৎপরতার বৃদ্ধির ফলে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ টেলেক্স সার্ভিসের চাহিদা বেড়েছে। টেলেক্স সার্ভিসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ঢাকার বিদ্যমান ডিজিটাল টেলেক্স এক্সচেঞ্জের ক্ষমতা বাড়ানো হবে।

২.৩০। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে বৃহত্তর ঢাকা নগরীতে রেজিস্ট্রিভুক্ত মোট টেলিফোনের চাহিদা ছিল ৪০,০০০টির মত এবং অন্যান্য শহরাঞ্চলে চাহিদা ছিল ৬০,০০০টি। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, রেজিস্ট্রিভুক্ত চাহিদা মেটাতে যখনই একটি নতুন এক্সচেঞ্জ চালু করা হয়, এক্সচেঞ্জ ক্ষমতা সম্প্রসারণের সাথে সাথে নতুন নতুন চাহিদা আসতে থাকে, যা অন্যথায় সুপ্ত ছিল। প্রায় সবক্ষেত্রেই নতুন চাহিদার পরিমাণ মূল রেজিস্ট্রিভুক্ত চাহিদাকে ছাড়িয়ে যায়। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল হবে কমপক্ষে এই রেজিস্ট্রিভুক্ত টেলিফোনের চাহিদাগুলো পূরণ করা।

২.৩১। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মোট মাইক্রোওয়েভ সম্প্রচার চ্যানেলের প্রয়োজন ছিল ১৫,০০০ লাইন। এর মধ্যে ১২,০০০ চ্যানেল বসানো হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নতুন টেলিফোনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে অতিরিক্ত ৫,০০০ ট্রাংক চ্যানেলের প্রয়োজন দেখা দেবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-খুলনা মাইক্রোওয়েভের (১,৮০০ চ্যানেল) অতিরিক্ত চ্যানেল ক্ষমতার দ্বারা এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ উপজেলায় ১,৬০০ চ্যানেল সজ্জিত ৩২২টি ইউ এইচ এফ রেডিও যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে এই প্রয়োজন আংশিকভাবে মেটানো হবে। এছাড়াও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দূরবর্তী

টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রকল্পের অধীনে অতিরিক্ত চ্যানেলিং সরঞ্জাম যুক্ত করে বিদ্যমান মাইক্রোওয়েভ নেটওয়ার্কে ১৬০০ চ্যানেল ক্ষমতা সম্প্রসারিত করা হবে। এর ফলে এনডব্লিউডি কর্মকাণ্ডে দূরবর্তী চ্যানেল ক্ষমতার ঘাটতি মেটানো যাবে এবং গ্রামীণ উপজেলায় স্থিতিশীল টেলিযোগাযোগ সার্ভিস নিশ্চিত করবে।

২.৩২। বিদ্যমান টেলিফোন বিল ও হিসেব ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কমপিউটার স্থাপন আর্থিক দিক থেকে যুক্তিসংগত। এছাড়াও কমপিউটার সার্ভিস সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সার্বিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নতি ঘটাবে। উপরন্তু ইহা রাজস্ব মওকুফ এবং জরিমানার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করবে; বর্তমানে টেলিফোন বিল ব্যবস্থায় যার কোন অস্তিত্ব নেই।

২.৩৩। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ১৮টি দেশের সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য ২৯১টি আন্তর্জাতিক টেলিফোন সার্কিটের ব্যবস্থা ছিল। বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের সাথে সরাসরি সার্কিট খোলার দাবী মেটাতে এবং ক্রমবর্ধমান গ্রাহকদের আন্তর্জাতিক টেলিফোন যোগাযোগের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আন্তর্জাতিক চ্যানেলের মোট প্রয়োজন দাঁড়াবে ৬০০ চ্যানেল। বেতবুনিয়া ভূ-কেন্দ্রের জীবনকাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অধিকন্তু এর কলাকৌশল সেকেলে এবং নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা ও তৎপরতা চালানোর দৃষ্টিকোণ থেকে এর অবস্থানও অসুবিধাজনক। তাই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ঢাকার গেটওয়ে এক্সচেঞ্জের নিকটে একটি 'এ' মানের ডিজিটাল ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এই ভূ-কেন্দ্র ৬০০ চ্যানেল ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ দূরবর্তী নেটওয়ার্কের উপর চাপ কমাবে এবং আন্তর্জাতিক সার্কিটের দক্ষতা বাড়াবে।

২.৩৪। ডিজিটাল সুইচিং ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে টেলিফোন শিল্প সংস্থার ইএমডি উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস করা হবে। এটা সাব্যস্ত করা হয়েছে যে আর্থিক দিক থেকে যুক্তিসংগত হলে হলে ডিজিটাল সুইচিং এবং ডিজিটাল টেলিফোন সেট উৎপাদনের জন্য ফ্যাক্টরীর প্রয়োজনীয় সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ ও পুনর্বাসন করা হবে। এরজন্য প্রাথমিকভাবে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ হাতে নেয়া হবে।

২.৩৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আর্থিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য পর্যাপ্ত এবং স্থিতিশীল টেলিযোগাযোগ জরুরী। একটি বিশেষ প্রকল্পের অধীনে এ অঞ্চলের ২২টি উপজেলাকে ৩/২৪ চ্যানেল ইউ এইচ এফ রেডিও যোগসূত্রের মাধ্যমে জেলাশহরগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হবে। রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলা শহরগুলোকেও ৬০ চ্যানেল ইউএইচএফ রেডিও যোগসূত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রাম এনডব্লিউডি এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত করা হবে। এর ফলে এ অঞ্চলে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা সমস্যার উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং অর্থনৈতিক তৎপরতা জোরদার হবে।

গ· আবহতত্ত্ব

২.৩৬। আবহাওয়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো ও উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর তীব্র প্রবাহ, বন্যা ও খরার মত মৌসুমী প্রভাবের সামনে অসহায়। এপর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাসের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা গেছে; কিন্তু এসবের গতিবিধি এবং ব্যাপকতা নিরূপণের মত অবস্থা বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তরের (বিএমডি) হয় নাই বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও এর নাই। বিশ্বের বহু দেশ একই ধরনের অথবা ভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবেলা করছে। তবে তারা বনায়ন, মাটির বাঁধ, বেড়ী বাঁধ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সেচ, স্থায়ী আশ্রয়স্থল, ইত্যাদির মত উপযোগী রক্ষাপ্রদ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়সমূহের অবস্থিতি, গতি প্রকৃতি ও ব্যাপকতা সম্পর্কে নির্ভুল ও সময়মত পূর্বাভাস দেয়ার মাধ্যমে জীবনহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর প্রচেষ্টা চালানো হবে।

২.৩৭। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সাধারণ পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের মৌলিক ক্ষমতা অর্জনের ব্যাপারে বাংলাদেশ আবহগত সার্ভিস ভৌত সুবিধাদি এবং তৎপরতার প্রণালীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসাধন করেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আবহগত সার্ভিসের ক্ষেত্রে ক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হবে। এই লক্ষ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষি আবহবিদ্যা। আবহবিদ্যার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব রয়েছে, এমন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে নৌ-আবহাওয়া তত্ব, সমুদ্র তত্ব, পানি আবহাওয়া তত্ব এবং ভূকম্পন তত্ব। ডব্লিউএমও/ইউএনডিপির সাহায্যে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ সার্ভিস, সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদির উন্নয়ন আশা করা হচ্ছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী

২.৩৮। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যোগাযোগ খাতের প্রধান প্রধান কর্মসূচী নীচে দেয়া হলো :

ক. ডাকঘর :

(১) ২৯টি ডাকঘর ভবন ও ২৪৬ ইউনিট আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ ;

(২) ৪১টি গাড়ী, ৬০টি তিনচাকার যান, ১০টি দু'চাকার যান এবং ৫০টি রিক্সা ভ্যান সংগ্রহের মাধ্যমে ডাক ভ্যান সার্ভিসের উন্নয়ন ;

(৩) ১৩১টি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ;

(৪) ১৫৭টি উপজেলা সদরে ডাকঘর ভবন তথা পোষ্টমাষ্টারের আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে শাখা ডাকঘরগুলোর (২০০ ইউনিট) জন্য টিনশেড নির্মাণ ; এবং

(৫) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে বিদ্যমান ডাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ, নবায়ন ও উন্নয়ন।

খ. টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন :

(১) শহরাঞ্চলে ৬৫,০০০ ডিজিট্যাল টেলিফোন ও গ্রামাঞ্চলে ১০,০০০ টেলিফোন মোট ৭৫,০০০ অতিরিক্ত টেলিফোন স্থাপনের মাধ্যমে টেলিফোন সার্ভিসের সম্প্রসারণ ; এর ফলে টেলিফোনের ঘনত্ব প্রতি ১০০ জনসংখ্যার জন্য ১৯৮৪/৮৫ সালের ০.১৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯/৯০ সালে ০.২৩তে দাঁড়াবে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে মোট টেলিফোনের সংখ্যা ২,৫৭,০০০ হবে।

(২) বাকী ১০টি জেলায় বাহ্যিকভাবে চালিত এক্সচেঞ্জ পাল্টে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বসানো এবং মেট্রোপলিটান ঢাকা নগরী ও অন্যান্য প্রধান জেলা শহরগুলোতে ১৪টি ডিজিট্যাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন ; এর ফলে জেলা শহরে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মোট সংখ্যা ১৯৮৪/৮৫ সালের ৮৪ থেকে বেড়ে ১৯৮৯/৯০ সালে ১০৮ এ দাঁড়াবে ;

(৩) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলাশহরগুলোতে ৮,৭০০ টেলিফোন লাইনের ক্ষমতাসম্পন্ন ৪২টি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন ; ফলে উপজেলায় মোট স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জের সংখ্যা বেড়ে ৬২ হবে।

(৪) ট্রাংক সুবিধাদির উন্নয়নকল্পে জেলা শহরসমূহ এবং সেগুলোর উপজেলাসমূহের মধ্যে ৩২২টি ইউএইচএফ রেডিও যোগসূত্র স্থাপন ;

(৫) ঢাকায় একটি জেনটেক্স এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়ায় ৩ (তিন) টি উপ এক্সচেঞ্জ স্থাপন। এর ফলে বিদ্যমান ১৩৩টি টেলিগ্রাফ অফিসের আধুনিকায়ন এবং শহরাঞ্চলে ২০টি নতুন আধুনিক টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপন সম্ভব হবে। এই কর্মসূচীর অধীনে পল্লী এলাকার বিদ্যমান ৪৭১টি টেলিগ্রাফ অফিসের মধ্যে ৩২২টি টেলিগ্রাফ অফিসের আধুনিকায়ন করা হবে।

(৬) অতিরিক্ত ১৫টি জেলা শহরে এনডব্লিউডি সুবিধাদির সম্প্রসারণ। ২৬টি জেলা শহরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থার আওতায় এসেছে;

(৭) ৩০০০ লাইনের পিবিএক্স/পিএ বিএক্স সম্প্রসারণ এবং ১০০০ টেলেক্স ও ১২০০ জেনটেক্সলাইন স্থাপন।

(৮) ঢাকা-খুলনা ডিজিটাল মাইক্রোওয়েভ ব্যবস্থাকে ১৮০০ চ্যানেলে সম্প্রসারণ;

(৯) আন্তর্জাতিক সার্কিটের মোট সংখ্যা ৬০০ করার লক্ষ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে টেলিগ্রাফ/টেলেক্সের ১৬৭টি আন্তর্জাতিক সার্কিট এবং টেলিফোনের ১৪২টি আন্তর্জাতিক সার্ভিস সম্প্রসারণ;

(১০) ঢাকায় ৬০০ চ্যানেলবিশিষ্ট একটি ভু-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;

(১১) বিল করা এবং হিসাব ও পরিকল্পনার কাজের জন্য একটি কম্পিউটার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; এবং

(১২) বগুড়ায় টেলিযোগাযোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জয়দেবপুরে টেলিযোগাযোগ ষ্টাফ কলেজের অবশিষ্ট কাজ শেষ করা।

গ. **আবহতত্ত্ব**

(১) নির্ভুল আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়ার জন্য আবহগত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও রিপোর্ট করার লক্ষ্যে মংলা, চাঁদপুর ও কুতুবদিয়ায় ১ম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার নির্মাণ;

(২) কৃষি-আবহগত সার্ভিসের উন্নয়নের জন্য জয়দেবপুরে একটি কৃষি-আবহগত পাইলট ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা এবং ঢাকায় একটি পাইলট বেলুন পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন;

(৩) ঢাকা বিমানবন্দরের আবহাওয়া পরিদপ্তরের কর্মরত কর্মীদের জন্য ২২টি ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ;

(৪) ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় আবহবিদ্যা প্রয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নৌ-আবহবিদ্যা ও সমুদ্রবিদ্যা, পানি-আবহবিদ্যা এবং ভূকম্পন বিদ্যার উন্নয়ন; এবং

(৫) কক্সবাজার ও খেপুপাড়ায় রাডারসমূহের প্রতিস্থাপন।

ঘ. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় :

বিদেশে অবস্থিত বাদবাকী ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে রেডিও সংযোগ প্রতিষ্ঠা।

অর্থ বরাদ্দ

২.৩৯। উল্লেখিত উন্নয়ন কর্মসূচী ও লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য যোগাযোগ খাতে ৩৮৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মোট বরাদ্দের প্রতিষ্ঠান-ওয়ারী বণ্টন ২.২নং সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.২

যোগাযোগ খাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫—৯০) অর্থ বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম	চলতি	নতুন	মোট
ক. ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় :			
(১) টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড	২৮০.৭৫	৬৫.০০	৩৪৫.৭৫
(২) ডাকঘর	২৬.২০	৭.৬২	৩৩.৮২
খ. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় :			
আবহাওয়া পরিদপ্তর	১.২৩	৬.০০	৭.২৩
গ. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় :	০.৭০	০.৫০	১.২০
মোট :	৩০৮.৮৮	৭৯.১২	৩৮৮.০০

২.৪০। উপরে উল্লেখিত বরাদ্দ ছাড়াও উপজেলা টেলিযোগাযোগ প্রকল্প, উপজেলা ডাকঘর প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ টেলিযোগাযোগ প্রকল্পের ব্যয় মিটানোর জন্য এই খাতে অতিরিক্ত প্রায় ৫৭.০০ কোটি টাকা উপজেলা অবকাঠামো ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ পরিকল্পনার থোক বরাদ্দ থেকে পাওয়া যাবে।

২.৪১। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষতঃ দূরবর্তী দ্বীপগুলো প্রায়শঃই জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে। বিগত ১২৫ বছরে ৪১টির মতো ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে আঘাত হেনেছে এবং এর মধ্যে বিগত ২৫ বছরেই এ ধরনের ১৩টি ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেছে। সম্প্রতিক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়টি ১৯৮৫ সালের ২৪ শে মে-র রাতে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকা ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহে আঘাত হেনে অসংখ্য জীবন এবং বিপুল সম্পদ ধ্বংস করেছে। তৃতীয় পরিকল্পনা সঠিক ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগ সুবিধাদি প্রবর্তনের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়-উত্তর ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম আয়োজনের ব্যবস্থা করে জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ কারণে কক্সবাজার ও খেপুপাড়ার পুরাতন ও বিকল রাডারগুলো বদল করার জন্য এই খাতের স্বাভাবিক কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া দূরবর্তী দ্বীপগুলোতে সুবিধাজনক স্থানে বাড়তি পিসিও এবং ইউএইচএফ রেডিও সংযোগ স্থাপন করে ঐসব স্থানের সাথে বর্তমান টেলিযোগাযোগ সুবিধাদি আরো জোরদার করা হবে। কর্মসূচীটি এ উপখাতের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দের ভেতরেই গ্রহণ করা হবে।

সুপারিশকৃত নীতিমালা

২.৪২। **সুপারিশকৃত প্রধান প্রধান নীতিমালা হল :**

(১) সরকারী বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রায়শঃই বছরের পর বছর টেলিফোন বিল অপরিশোধিত রাখতে দেখা যায়। সকল বকেয়া বিল আদায়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিতে হবে;

(২) টেলিফোন/টেলেক্স বিলের জন্য রিবেট ও জরিমানা ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বর্তমান বিল পদ্ধতির উন্নতিসাধনের মাধ্যমে অনিয়মিত টেলিফোন/টেলেক্স বিল সমস্যার সমাধানে জরুরী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন;

(৩) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সকল ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের সাথে সাথে সঠিক বিল ব্যবস্থা গড়ে তোলা আবশ্যক; এবং

(৪) যেহেতু অভ্যন্তরীণ টেলিফোন সার্ভিসের মান এখনো সন্তোষজনক পর্যায়ে নয়, সেহেতু এজাতীয় সার্ভিসের অবিরত মানোন্নয়ন এবং জনসাধারণের অভিযোগের দ্রুত সাড়া দেয়ার ব্যাপারে প্রতিনিয়ত পদ্ধতিগত প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক।

পরিশিষ্ট-৯

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের বর্তমান সুযোগ-সুবিধা এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

বিষয়	১৯৭৯/৮০ সালের অবস্থা	১৯৮৪/৮৫ সালের অবস্থা	১৯৮৫—৯০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	১৯৮৯/৯০ সালের প্রস্তাবিত অবস্থা
১	২	৩	৪	৫
১। টেলিফোন ক্ষমতা : (লাইনের সংখ্যা)	১,২০,০০০	১,৮২,০০০	৭৫,০০০	২,৫৭,০০০
(ক) স্বয়ংক্রিয়	১,০০,০০০	১,৫৮,৬৬০	৭৫,০০০	২,৩৩,৬৬০
(খ) হস্তচালিত	২০,০০০	২৩,৩৪০	—	২৩,৩৪০
(১) শহরাঞ্চল :	১,০৯,৪০০	১,৫৫,৪০০	৬৫,০০০	২,২০,৪০০
(ক) স্বয়ংক্রিয়	১,০০,০০০	১,৫২,৯৬০	৬৫,০০০	২,১৭,৯৬০
(খ) হস্তচালিত	৯,৪০০	২,৪৪০	—	২,৪৪০
(২) গ্রামীণ :	১০,৬০০	২৬,৬০০	১০,০০০	৩৬,৬০০
(ক) স্বয়ংক্রিয়	—	৫,৭০০	১০,০০০	১৫,৭০০
(খ) হস্তচালিত	১০,৬০০	২০,৯০০	—	২০,৯০০
২। প্রতি শতজনে টেলিফোন সংখ্যা :	০'১৩	০'১৮	০'২৩	০'২৩
(ক) শহরাঞ্চলে টেলিফোন(শতাংশে)	৯১.১৭	৮৫.৪	৮৫.৮	৮৫.৮
(খ) গ্রামাঞ্চলে টেলিফোন(শতাংশে)	৮.৮৩	১৪.৬	১৪.২	১৪.২
৩। টেলিফোনের আওতাধীন এলাকা :				
(১) জেলা পর্যায়ে (৬৪টি জেলা)	৯৪	৯৪	১৪	১০৮
(ক) স্বয়ংক্রিয়	৪৫	৮৪	২৪	১০৮
(খ) হস্তচালিত	৪৯	১০	(—)১০	—
(২) পল্লী এলাকায় স্বয়ংক্রিয়, হস্তচালিত বা পাবলিক কল অফিস সম্বলিত পল্লী	৯৪৯	১১৯০		১১৯০
(ক) উপজেলা পর্যায়ে (৪৬০টি উপজেলা)				
(১) হস্তচালিত	৩১৯	৪৪০	(—)৪২	৩৯৮
(২) স্বয়ংক্রিয়	—	২০	৪২	৬২
(খ) ইউনিয়ন পর্যায়ে (৪,৩৫০টি ইউনিয়ন)	৫৩০	৫৯০	—	৫৯০
(গ) গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্র (৯৭৪টি)	১০০	১৪০	—	১৪০

পরিশিষ্ট-১ (ক্রমশঃ)

বিষয়	১৯৭৯/৮০ সালের অবস্থা	১৯৮৪/৮৫ সালের অবস্থা	১৯৮৫—৯০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	১৯৮৯/৯০ সালের প্রস্তাবিত অবস্থা
১	২	৩	৪	৫
(৩) পাবলিক কল অফিস (সংখ্যা)	**৮৭৪**	**১৪০১**		**১৪০১**
(ক) শহরাঞ্চল (করেসনসমূহ)	১৪০	৬৩৪	—	৬৩৪
(খ) পল্লী অঞ্চল	৭৩৪	৭৬৭	—	৭৬৭
(৪) টেলিগ্রাফ অফিস (সংখ্যা)	**৪৮৮**	**৬০১**	**২০**	**৬২১**
(ক) শহরাঞ্চল	১২৮	১৩০	২০	১৫০
(খ) পল্লী অঞ্চল	৩৬০ (হস্তচালিত)	৪৭১	৩২২ (স্বয়ংক্রিয় রূপান্তর)	৪৭১
(৫) দেশভিত্তিক ট্রাংক ডায়ালিং সুবিধা (৬৪টি জেলা)	—	২৬	১৫	৪১
(৬) পিবিএক্স/পিএবি এক্স (লাইন)	১৫,১৫৫	২৫,১১০	৩,০০০	২৮,১১০
(৭) টেলেক্স/জেনটেক্স (লাইন)	৪১০	১,৪১৮	২,২০০	৩,৬১৮
(৮) বৈদেশিক সার্কিট (সংখ্যা)	**৬৬**	**২৯১**	**৩০৯**	**৬০০**
(ক) টেলিগ্রাফ/টেলেক্স	৩৭	১৩৩	১৬৭	৩০০
(খ) টেলিফোন	২৯	১৫৮	১৪২	৩০০

জিপিপিডি—শাখা-৩—১৩২৮/৮৫-৮৬/(পিঃ)—৬-৯-৮৬—২,০০০।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন ও পানি সরবরাহ

আধুনিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলে শহরাঞ্চলের দ্রুত প্রসার ঘটছে। ফলে প্রায়ই বিপুল সংখ্যক মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস করতে প্রলুব্ধ হচ্ছে। কিন্তু তাদের সকলের জন্য নতুন পরিবেশে সুন্দরভাবে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা কঠিন। এতে করে শহরাঞ্চলে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। তাই পরিকল্পিত উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে গৃহনির্মাণ ও পানি সরবরাহের মত জীবন ধারণের ভৌত অবস্থাসমূহের উন্নতি সাধন। কিন্তু যেহেতু সামগ্রিকভাবে জনগণ স্বাচ্ছন্দ কামনা করে, তাই জীবন ধারণের এইসব মৌলিক সুবিধাসমূহ পল্লীবাসীদের জন্যও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। বস্তুতঃ গরীব দেশগুলোকে গ্রাম্য বস্তি বলে মনে করা হয়। গ্রাম থেকে শহরমুখী জনস্রোত এ থেকে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা মাত্র। তাই ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় সরকারী ও বেসরকারী খাতে শহর এবং গ্রামীণ উভয় জনগোষ্ঠি অন্তর্ভুক্ত। এই কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে গৃহনির্মাণ, অফিস ও বাণিজ্যিক ভবনসমূহের উন্নয়ন, বেসরকারী গৃহনির্মাণের জন্য এলাকার উন্নয়ন, পল্লী ও শহরাঞ্চলে পানি সরবরাহ, ভূগর্ভস্থ নর্দমার ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন, নগরীর সড়ক উন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধার প্রসার ঘটানো।

২। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে প্রথমবারের মত উন্নয়নের সুফল জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়া এবং শহরমুখী জনস্রোত বন্ধ করার জন্য এক ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ছিল প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন তৎপরতা সম্প্রসারণের সরকারী নীতি। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা কাঠামোর আওতায় সেখানে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি প্রয়োজন। ১৯৮২ সাল থেকে এই লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা

৩। স্বাধীনতার পর শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে মেট্রোপলিটান এলাকাসমূহে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। এই চাপ মোকাবেলার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারী খাতে ২৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে ২৭০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-৮০) বরাদ্দ করা হয় ২৫০ কোটি টাকা। এটা ছিল ৩ হাজার ২ শত ৬১ কোটি টাকার মোট পরিকল্পনা বরাদ্দের ৮ শতাংশ। এ সময় ভৌত সুবিধাসমূহের উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হয় ২৪১ কোটি টাকা। দু'টি পরিকল্পনার বরাদ্দকৃত সম্পদের কমবেশী প্রায় পুরোটাই ব্যবহৃত হওয়া সত্বেও নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং প্রয়োজনীয় নীতিগত সমর্থনের অভাবে ভৌত অগ্রগতির লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। সহজ শর্তে ঋণের মাধ্যমে বেসরকারী খাতে বহুতল ভবন নির্মাণে উৎসাহদানের নীতি প্রবর্তনের চার বছর পর ১৯৮১ সাল থেকে তুলনামূলকভাবে কম তহবিল বরাদ্দ পাচ্ছে। বস্তুতঃ এই সময়ে স্বল্পকালের জন্য গৃহনির্মাণের 'জোয়ার' সৃষ্টি হয়েছিল।

৪। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) এই খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৮২০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭৩৯ কোটি টাকা ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও উপজেলা কেন্দ্রসমূহে অফিস ও বাসভবন নির্মাণের মত অবকাঠামো সুবিধার উন্নয়নে ৩১৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এতে করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫৮ কোটি টাকা। প্রথম পঞ্চবার্ষিক এবং দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় সম্মিলিত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫১১ কোটি টাকা।

৫। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্জিত প্রধান লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **সরকারী অফিস ও বাসস্থান:** ৪৬০টির মধ্যে ২৬৫টি উপজেলা শহরে অফিস ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। বিভিন্ন উপজেলা শহরে ১১৬০টি ষ্টাফ কোয়ার্টার এবং ১৪৫টি ডরমিটরী নির্মিত হয়েছে। প্রধান প্রধান পৌর কেন্দ্রে ৪৭৩১টি হাউজিং ইউনিট নির্মিত হয়েছে।

গ্রন্থা... ...ত্রী বা...

এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০০০টি। বেসরকারী হাউজিং এর জন্য ৫৪০০টি হাউজিং প্লটের উন্নতিসাধন করে সেগুলি বেসরকারী মালিকদের কাছে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জাতীয় সংসদ ভবন নির্মাণের কাজ শেষ করা এবং ঢাকায় একটি পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের অংশ।

(২) **পানি সরবরাহ এবং ভূগর্ভস্থ নর্দমা ব্যবস্থাঃ** গড়ে প্রতি ১৩৮ জন লোকের জন্য ১টি করে নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়েছে; যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫০ জনের জন্য ১টি। ৫৬টি জেলা সদরে পাইপ লাইনের সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে; এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৪টি জেলা সদর। ঢাকা ও চট্টগ্রামে পানি সরবরাহের সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামে পাঁচটি করে স্যানিটারী পায়খানা বসানো হয়েছে।

উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

৬। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে সব প্রধান সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল সেগুলো নিম্নরূপঃ

(১) **সম্পদের সীমাবদ্ধতাঃ** যদিও বাসস্থান ও নিরাপদ পানীয় জল মানুষের মৌলিক চাহিদার অবিচ্ছেদ্য অংশ, তবুও একদিকে উচ্চ মূলধন ব্যয় এবং অন্যদিকে কোন বাস্তব ফলাফল সরাসরি দৃশ্যমান নয় বিধায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের সুযোগ এমনিতেই সীমিত। এই খাতে বরাদ্দ সব সময় কম ছিল। স্থানীয় মুদ্রার স্বল্পতার কারণে প্রাপ্ত প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার মন্থর হয়েছে। বিপুল সংখ্যক সংস্থা একই ধরণের অসংখ্য কর্মসূচী ও প্রকল্প গ্রহণ করায় তহবিল সমস্যা জটিলতর হয়েছে।

(২) **প্রযুক্তি বাছাইঃ** ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নে প্রচুর সিমেন্ট ও ইস্পাত প্রয়োজন, অথচ এগুলোর জন্য আমাদের দেশ আমদানির উপর নির্ভরশীল। এমনকি বাঁশ এবং বনজ সামগ্রীর সরবরাহও দিন দিন কমে যাচ্ছে। লেনদেনের ভারসাম্য অবস্থার সংকটের কারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে সিমেন্ট ও ইস্পাত সামগ্রীর সরবরাহ ছিল অনিয়মিত, যা এই খাতের প্রবৃদ্ধির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। যদিও সিমেন্ট এবং ইস্পাত আমদানি করতে হচ্ছে, তবুও সস্তা কোন প্রযুক্তি এ ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না। অথচ একাধিক বিকল্পের সুযোগ রয়ে গেছে।

(৩) **নিয়ন্ত্রণ সমস্যা এবং আন্ত-সংস্থা সমন্বয়ঃ** শহর কেন্দ্রগুলোতে উন্নয়ন কাঠামোর অনুপস্থিতি, নিয়ম মাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগের অভাব, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মত মেট্রোপলিটান এলাকা সমূহে বহুসংখ্যক সংস্থার অস্তিত্ব শহরাঞ্চলের পরিকল্পিত উন্নয়নে মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি করছে।

(৪) **জমির হুকুমদখল এবং তার ব্যবহারঃ** ভূমি বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ। তাই যে কোন উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের নতুন ব্যবহারের জন্য পুনঃবরাদ্দ দরকার হয়ে পড়ে। এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্প অথবা শহর সম্প্রসারণের জন্য মূল্যবান কৃষি জমিও কাজে লাগাতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের মত কৃষিভিত্তিক সমাজে ভূমির প্রতি মানুষের গভীর আসক্তি রয়েছে বিধায় ভূমি অধিগ্রহণ সমস্যা প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য বিলম্ব ঘটায়। বস্তুতঃ এটাকে প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্যতম প্রধান বাধারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করে প্রায়ই একটি প্রকল্পে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের চেয়ে বেশী জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এতে বেশ কিছু সময়ের

জন্য বাকী জমি অব্যবহৃত থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে পরিমাণগত স্বল্পতার জন্য আগামী বছরগুলোতে জমির চাহিদা আরও তীব্র হবে বিধায় জমির ব্যবহার সংক্রান্ত একটা জাতীয় নীতি জরুরী হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এ সম্পর্কে একটা সমীক্ষার কাজ হাতে নেয়া হয়।

বাসস্থান সমস্যা

৭। গ্রামাঞ্চলে ৩০ শতাংশ পরিবারের নিজস্ব বাড়ী নাই। সেখানে বাড়ীর ৮০ শতাংশই কাঁচা। নগরায়নের ফলে গ্রামীণ বসতি স্থাপনের বর্তমান অবস্থার শহরে বাসস্থানের সংকট আরও প্রকট হবে। শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে সাড়ে তিন গুণ বেশী অব্যাহত থাকলে শহরে জনসংখ্যা ১৯৮০ সালের আদমশুমারী মোতাবেক ১১'৮ মিলিয়নের দ্বিগুণ হবে। বড় শহরগুলোকে এই বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুর্ভোগ পোহাতে হবে যদি না তা নিম্নোক্তভাবে মোকাবেলা করা হয়: (ক) বিভিন্ন স্থানে শিল্প স্থাপন, (খ) পল্লী এলাকায় কাজের সুযোগ বৃদ্ধি এবং (গ) সুপরিকল্পিতভাবে উপজেলা সমূহকে গ্রামীণ অর্থনীতির মূল কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা। এধরনের সুষ্ঠু বসতি স্থাপন এবং কর্মসংস্থান নীতির অভাবে ঢাকা এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য মেট্রোপোলিটান শহরও ব্যাংগের ছাতার মত গড়ে উঠবে। উদাহরণ স্বরূপ, একটা রক্ষণশীল হিসাব মোতাবেকও দু' হাজার সালে ঢাকার জনসংখ্যা (বৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ৩ শতাংশ হিসেবে) তিনগুণ বেড়ে যাবে। এর ফলে গড়ে বছরে ৫০ হাজার নতুন বাড়ী তৈরীর এবং পরিকল্পিত শহর উন্নয়নের প্রয়োজন হবে।

৮। সুচিন্তিত বসতি স্থাপন নীতি ছাড়া বাসস্থানের এই বিরাট সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ঘন জনবসতির এক ব্যতিক্রমী একক দৃষ্টান্ত। তাই এ ধরণের একটা নীতি অত্যন্ত জরুরী। অবশ্য একটি নীতি তখনই ভাল যখন সকল মহল এটাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করে। এই প্রেক্ষাপটে বাসভবনের প্রয়োজন বেসরকারী খাতেরই বেশী। তাই সরকারী খাতের চেয়ে তাদেরকেই এ ব্যাপারে বেশী সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকারী খাত অবশ্য ভূমি ব্যবহারে মিতব্যয়ীতার নিশ্চয়তা বিধান, বাসভবন সুবিধার সুষম উন্নয়নে বিশাল এলাকার ব্যবহার এড়ানো এবং রাজস্ব সংক্রান্ত সুযোগদানের মাধ্যমে বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার মত কাজগুলিতে নিজেদের ভূমিকা আরও জোরদার করবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, কৌশল ও নীতি

৯। **ভৌত পরিকল্পনা**: প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় ভাবে স্থানীয় সরকারসমূহের অধীনে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ন্যস্ত করার সরকারী নীতির প্রেক্ষিতে ভৌত পরিকল্পনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে উপজেলা ও জেলা সদরে অবকাঠামো উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা এবং সেখানে উন্নয়ন তৎপরতার প্রসার ঘটানো। এর ফলে প্রধানতঃ স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র শিল্প এবং উপজেলা ও জেলা সদরে এবং এর আশেপাশে জনবসতি গড়ে উঠবে। এই প্রেক্ষাপটে ভৌত পরিকল্পনার প্রধান কৌশল হবে উপজেলা ও জেলা সদরে পূর্ণাংগ ভৌত ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার উদ্ভাবন করা।

১০। **গৃহায়ন**: আবাসিক সমস্যা এত ব্যাপক এবং প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ এত অপ্রতুল যে সরকারী খাতের বিনিয়োগের মাধ্যমে এর মাত্র এক ভগ্নাংশের সমাধান সম্ভব। তাই এ ক্ষেত্রে প্রধান কাম হবে এমন একটা প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন, যাতে বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণ জোরদার হয়। ভূমি উন্নয়ন, রাস্তা নির্মাণ, পানি সরবরাহ এবং সরকারী কর্মচারীদের জন্য বাসভবন নির্মাণের মত যে সব ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থার কোন অবকাশ নেই কেবলমাত্র সে সব ক্ষেত্রেই সরকারী খাতের বিনিয়োগ সীমিত রাখতে হবে। ছিন্নমূল পরিবারের পুনর্বাসনের দায়িত্বও সরকারী খাতকে নিতে হবে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই খরচ বহন করবে এ ভিত্তিতে সরকার কতিপয় আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠির গণবাসস্থানের (কোর হাউস) ব্যবস্থা করবে। জেলা

শহরগুলোতে গৃহনির্মাণে বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালে বীজ-তহবিলের (Seed fund) কৌশল গ্রহণ করেছিল। স্বল্প ও মাঝারি আয়ের লোকদের জন্য ছোটছোট সার্ভিস প্লট উন্নয়ন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও এই কৌশল অব্যাহত থাকবে।

১১। **পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা** ঃ এর মধ্যে থাকবেঃ—

(ক) **পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাঃ** তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামে পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। খাবার পানির নলকূপের সংখ্যা বাড়ানো হবে। স্থানীয় ভাবে এগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর জোর দেয়া হবে। গ্রামে জলাবদ্ধ পায়খানার ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। জেলা এবং উপজেলাস্তরে এগুলো তৈরী করা হবে।

(খ) **শহরাঞ্চলে পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাঃ** নগরী এবং পৌর এলাকার যেখানে বস্তি-বাসীরা অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, সেখানে অধিকসংখ্যক মানুষের জন্য কলের পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সমাপ্তিকল্পে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। উপজেলা কেন্দ্রসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে খাবারপানি সরবরাহের ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১২। **নগর উন্নয়নঃ** যত্রতত্র বসতি স্থাপন ও দালান নির্মাণের ফলে মেট্রোপলিটান শহরগুলোতে সংকট দেখা দিচ্ছে এবং প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এ তিনটি বড় শহরের সুশৃংখলভাবে সম্প্রসারণের জন্য মহা-পরিকল্পনা তৈরী করা হবে। অন্যান্য প্রধান শহরের জন্যও একই ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। একই সংগে বিভিন্ন মেট্রোপলিটান/নগর কর্তৃপক্ষকে এসব কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনের উপর অধিকতর মনযোগ দেয়ার দরকার হবে। শুধুমাত্র উন্নয়ন তৎপরতার উপর জোর না দিয়ে সড়ক নির্মাণ, সড়কে আলোর ব্যবস্থা, পার্ক, কঞ্জারভেন্সী ইত্যাদির মত সাধারণ সার্ভিস সুবিধাবলী রক্ষণাবেক্ষণার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক তৎপরতার উপরও অধিকতর নজর দিতে হবে। তাদের নজর থাকতে হবে সামগ্রিকভাবে নগরীর উপর, কোন বিচ্ছিন্ন এলাকা অথবা বস্তির মাঝখানে কোন আবাসিক এলাকার উন্নয়নের উপর নয়। বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টির পরিবর্তে নাগরিক সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ বাড়াতে হবে।

১৩। **পর্যটন, ফায়ার সার্ভিস ও অন্যান্য উন্নয়নঃ** তৃতীয় পরিকল্পনায় পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে একটা মহা-পরিকল্পনা তৈরীর জন্য এক সমীক্ষার কাজ হাতে নেয়া হবে। এই সমীক্ষা শেষে পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। বিদ্যমান ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনগুলো আরও শক্তিশালী করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকায় নতুন নতুন ষ্টেশন স্থাপন করা হবে। এই পরিকল্পনার সময়কালে পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের (ভিডিপি) প্রশিক্ষণ সুবিধা বাড়ানো হবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কর্ম্মসূচী

১৪। উপরে বর্ণিত লক্ষ্য ও কৌশলকে সামনে রেখে ভৌত পরিকল্পনা এবং গৃহায়ন খাতের প্রধান কর্মসূচীগুলো নীচে আলোচিত হলো :

(১) **আবাসিক ভবন নির্মাণঃ** প্রধান প্রধান শহরগুলোতে ৩৮৪ ইউনিট স্বল্পব্যয়ের বহুতল ফ্লাট, জেলা শহরগুলোতে ৯৮৮টি ফ্লাট এবং উপজেলা কমপ্লেক্সসমূহে ১৯১১টি ফ্লাট নির্মাণ ছাড়াও চট্টগ্রামের কৈবল্যধামে স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য গৃহনির্মাণ এবং পরিবেশ

উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকার মীরপুরে স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্প, ঢাকার মীরপুর ও দত্তপাড়ায় প্রায় ৫ হাজার বাস্তুহারা পরিবারের পুনর্বাসন প্রকল্প এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বীজ-তহবিলের (সীড মানি) সাহায্যে বাড়ী করার উপযোগী স্থান ও বিভিন্ন সার্ভিসের উন্নয়ন সাধন করে প্লট বিক্রয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি আবাসিক ভবন নির্মাণ উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাধীন থাকবে।

(২) **অফিস সংস্থান:** জেলা শহরগুলোতে ১'৫০ লাখ বর্গফুট এবং উপজেলা কেন্দ্রসমূহে ৬ লাখ বর্গফুট অফিস ভবন নির্মাণ, ঢাকায় ২০ তলা সচিবালয় ভবন নির্মাণের কাজ শেষ করা এবং ৬টি জেলা শহরে হাইকোর্ট ভবন নির্মাণ হচ্ছে অফিস সংস্থান উন্নয়নে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রধান প্রধান দিক।

(৩) **নগর উন্নয়ন:** তৃতীয় পরিকল্পনার ভৌত পরিকল্পনার প্রধান বিষয়গুলো হবে নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী হাতে নেয়ার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহাপরিকল্পনাগুলোর সময়োপযোগীকরণ ও নতুন আঞ্চলিক পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন এবং (১) জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা (দ্বিতীয় পর্যায়), (২) গৃহনির্মাণ উন্নয়ন নীতি (২য় পর্যায়) এবং (৩) উপজেলা ও জেলা শহর পরিকল্পনাগুলোর কাজ শেষ করা।

(৪) **পানি সরবরাহ:** ঢাকায় ৯০ হ'তে ১০৯ এমআইজিপিডি, চট্টগ্রামে ১৯ হ'তে ৩৯ এমআইজিপিডি, জেলা শহরগুলোতে ২৪'৭ হ'তে ৪০ এমআইজিপিডি, উপজেলা শহরগুলোতে ০'৬৬ হ'তে ৫ এমআইজিপিডি পাইপের পানি সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পল্লী অঞ্চলে প্রতি ১২৫ জন মানুষের জন্য ১টি করে নলকূপের ব্যবস্থা করে খাবার পানি সরবরাহ করা তৃতীয় পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা। এতে পানিবাহিত রোগ এড়ানোও সম্ভব হবে। সমীক্ষাধীন ডেমরা পানি শোধন প্লান্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পানি সরবরাহের জরুরী চাহিদা মেটানোর জন্য তৃতীয় ঢাকা ওয়াসা নামে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। চট্টগ্রামে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন পানি সরবরাহ প্রকল্প এবং ৩৫টি জেলার পানি সরবরাহ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন চলতি প্রকল্পের কাজ ১৯৯০ সালের মধ্যে শেষ করা হবে। পরিকল্পনা কালে পল্লী এলাকায় ১'৭৪ লাখ নলকূপ বসানো এবং ০'৫০ লাখ নলকূপ পাল্টানো হবে। এছাড়াও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রতি গ্রামে ১৩টি স্বাস্থ্যসম্মত জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর জন্য ৫ লাখ স্যানিটারী পায়খানা তৈরী করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

(৫) **পর্যটন উন্নয়ন এবং অন্যান্য সার্ভিস:** চলতি প্রকল্পগুলোর সমাপ্তি ছাড়াও পর্যটন সংক্রান্ত একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সমীক্ষার কাজ শেষ করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর এবং বাকী ৫টি জেলা সদরে নতুন দমকল ষ্টেশন স্থাপন করা হবে। পরিকল্পনাকালে পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম পৌর-কর্পোরেশনের চলতি প্রকল্পগুলো এ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পৌরসভাগুলোর নিজস্ব আয়ের সম্পূরক সহায়তা হিসেবে ৯২ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অর্থ বরাদ্দ

১৫। ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন ও পানি সরবরাহ খাতের জন্য মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৯৮৪/৮৫ মূল্যমানে ৪,২০০'০০ কোটি টাকা এর মধ্যে সরকারী খাতে ৫৫০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে ৩৬৫০ কোটি টাকা। এছাড়া এ খাতে উপজেলা অবকাঠামো, বিশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিকল্পনা ও পৌরসভাগুলোর জন্য উন্নয়ন সহায়তার জন্য থোক বরাদ্দ থেকে প্রায় ৬৯৬ কোটি টাকা পাওয়া যাবে এবং এসব মিলিয়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকারী খাতে বরাদ্দ দাঁড়াবে ১২,৪৬'০০ কোটি টাকা। এ বরাদ্দের প্রধান প্রধান কার্যক্রম এবং এজেন্সি-ওয়ারী বিভাজন সারণি ১ ও ২এ দেখানো হয়েছে।

বেসরকারী খাত

১৬। গৃহনির্মাণ উন্নয়ন স্বাভাবিকভাবেই একটি ব্যাপক আকারের বেসরকারী তৎপরতা। আবাসিক সুবিধাদির ৯০ শতাংশেরও বেশী এই খাতের মাধ্যমে আসে। এটা স্বীকার করেই সরকার বাজার ও আর্থিক উৎসাহ দানের মাধ্যমে বেসরকারী গৃহ নির্মাণকে উদ্বুদ্ধ করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উপজেলা কেন্দ্রসমূহে বেসরকারী নির্মাণ কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে এক বিশেষ ঋণদান কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। নির্মাণ সামগ্রীর উচ্চমূল্য এবং ব্যাংক সুদের উচ্চ হার অবশ্য এ খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সীমিত করেছে বিশেষ করে স্বল্প ও মাঝারি আয়ের জনগোষ্ঠী এর শিকার হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে নিম্নলিখিত ধারায় নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন প্রয়োজন:

(১) গৃহনির্মাণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এক বিশেষ তহবিল সৃষ্টি করতে পারে, যা যথাযথ সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

(২) গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থার ঋণ তৎপরতা ব্যাপক ভিত্তিক করা যেতে পারে যাতে সমবায় ও গোষ্ঠীর ঋণের সুবিধা পায়।

(৩) সাধারণ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং বীমা কোম্পানীগুলোর তহবিলের একটা সুনির্দিষ্ট অংশ হাউজিং ব্যাংক এর পরিচালনায় গৃহনির্মাণ ঋণ হিসেবে দেয়ার জন্য আলাদা করে রাখা উচিত।

(৪) যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে ১০০০ বর্গফুটের অনধিক ইউনিটের ঘর নির্মাণের জন্য আয়কর রেয়াতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৫) বেসরকারী খাতের সংস্থাগুলোকে তাদের কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণে উৎসাহিত করা উচিৎ।

(৬) শহরগুলোতে সক্রিয় গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতিগুলো যথাযথ নতুন আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

(৭) ভবনের নক্সা ও নির্মাণ কাজে সুপরিকল্পিত গবেষণা তৎপরতা সংগঠিত করা উচিৎ। এ ধরণের তৎপরতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং সাহায্য করা উচিত।

(৮) ঘোষিত নগর সীমার মধ্যে গৃহ নির্মাণের জন্য কোন পরিবারকেই কোন সূত্রে নির্দিষ্ট আয়তনের একখণ্ড জমির বেশী বরাদ্দ দেয়া উচিৎ নয়।

সারণী ১

প্রধান কর্মসূচী-ওয়ারী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থ বরাদ্দ

[কোটি টাকায়]

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	বরাদ্দ
ক.	খাতওয়ারী বরাদ্দ	
১।	গৃহায়ন	৭৩·৩৯
২।	কার্যালয় ও প্রাতিষ্ঠানিক ভবনাদি	৪৬·৭২
৩।	নগর উন্নয়ন (নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও পৌর কর্পোরেশন)	৬৬·৭৯
৪।	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	৮০·০০
৫।	শহরাঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	২৩৬·২৫
৬।	পর্যটন উন্নয়ন	৫·৮৫
৭।	অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা	২০·০০
৮।	আনসার ও পুলিশ প্রশিক্ষণ সুবিধাদি	২১·০০
	উপ-মোট:	৫৫০·০০
খ.	থোক বরাদ্দ	
১।	জেলা ও উপজেলা অবকাঠামো	৫৯২·০০
২।	বিশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিকল্পনা	১২·০০
৩।	পৌরসভাসমূহে উন্নয়ন সহায়তা	৯২·০০
	উপ-মোট:	৬৯৬·০০
	মোট:	১,২৪৬·০০

সারণী ২

এজেন্সী-ওয়ারী সরকারী খাতের অর্থ বরাদ্দ

[কোটি টাকায়]

ক্রমিক নং	এজেন্সী	চলতি	নতুন	মোট
ক.	**পূর্ত মন্ত্রণালয়**	৪০'১৯	১০২'৬৪	১৪২'৮৩
১।	**গণপূর্ত বিভাগ :**			
	(ক) সরকারী কর্মচারীদের গৃহায়ন ..	৪'৭০	৯'৪৩	১৪'১৩
	(খ) সরকারী কার্যালয় ও প্রাতিষ্ঠানিক ভবনাদি	১৬'৩২	২৮'৩৩	৪৪'৬৫
২।	গৃহ সংস্থান পরিদপ্তর	৬'৩৮	৫২'৮৮	৫৯'২৬
৩।	ঢাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ডিআইটি) ..	১'১৮	..	১'১৮
৪।	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) ..	২'১৮	১০'০০	১২'১৮
৫।	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) ..	০'২০	..	০'২০
৬।	রাজশাহী শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ..	..	২'০০	২'০০
৭।	নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর	৯'২৩	..	৯'২৩
খ.	**আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়**	২'০৭	..	২'০৭
গ.	**স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়** ..	৩২৮.২৫	৩০'০০	৩৫৮'২৫
৮।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল পরিদপ্তর ..	১৭৭'৪২	১৩'০০	১৯০'৪২
৯।	ঢাকা ওয়াসা	৯০'২৫	..	৯০'২৫
১০।	চট্টগ্রাম ওয়াসা	৩৩'০০	..	৩৩'০০
১১।	ঢাকা পৌর কর্পোরেশন (ডিএমসি) ..	২১'০০	১২'৫০	৩৩'৫০
১২।	চট্টগ্রাম পৌর কর্পোরেশন (সিএমসি) ..	৬'০০	২.৫০	৮'৫০
১৩।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো ..	০'৫৮	২.০০	২'৫৮
ঘ.	**বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়** ..	৫'৮৫	..	৫'৮৫
১৪।	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বিপিসি) ..	৫'৮৫	..	৫'৮৫
ঙ.	**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	২৯'৫০	১১'৫০	৪১'০০
১৫।	ফায়ার সার্ভিস ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা ..	১৮'৫০	১'৫০	২০'০০
১৬।	আনসার পরিদপ্তর	১১'০০	..	১১'০০
১৭।	পুলিশ পরিদপ্তর	..	১০'০০	১০'০০
	উপ-মোট : ..	৪০৫'৮৬	১৪৪'১৪	৫৫০'০০

সারণী ২ (ক্রমশঃ)

ক্রমিক নং	এজেন্সী	চলতি	নূতন	মোট
চ. থোক বরাদ্দ				
	(ক) জেলা ও উপজেলা অবকাঠামো ..	..	৫৯২·০০	৫৯২·০০
	(খ) বিশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিকল্পনা ..	..	১২·০০	১২·০০
	(গ) পৌরসভা উন্নয়ন সহায়তা	..	৯২·০০	৯২·০০
	উপ-মোট : ..	..	৬৯৬·০০	৬৯৬·০০
	মোট : ..	৪০৫·৮৬	৮৪০·১৪	১,২৪৬·০০

১৭। কর্মসূচী-ওয়ারী প্রধান প্রধান লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নীচের সারণীতে দেয়া হল :

সারণী ৩

কর্মসূচী-ওয়ারী প্রধান প্রধান লক্ষ্যমাত্রা

কর্মসূচী	একক	১৯৮৪/৮৫ সালের পরিস্থিতি	তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা	১৯৮৯/৯০ সালের প্রস্তাবিত পরিস্থিতি
সরকারী কর্মচারীদের বাসা/কার্যালয় :				
১। সরকারী কর্মচারীদের বাসা (উপজেলা শহর বাদে) ..	সংখ্যা	৪,৭৩১	৩৮৪	৫,১১৫
২। উপজেলা শহরে কর্মচারীদের বাসা	ঐ	১,১৬০	১,৯১১	৩,০৭১
৩। উপজেলা শহরে ডরমিটরি	ঐ	১৪৫	৫২২	৩৯৭
৪। জেলা শহরে অফিস ভবন	লক্ষ বর্গফুট	..	১·৫০	১·৫০
৫। উপজেলা শহরে অফিস ভবন ..	ঐ	১১·৮২	৬.০০	১৭·৮২
পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ				
৬। অগভীর নলকূপ	ঐ	৫,৯৩,০৮৩	১,২০,০০০	৭,১৩,০৮৩
৭। গভীর নলকূপ	ঐ	১৬,৮৩১	৪,০০০	২০,৮৩১
৮। তীপ সেট পাম্প	ঐ	৮,৮৯১	৫০,০০০	৫৮,৮৯১
৯। বিকল নলকূপের প্রতিস্থাপন ..	ঐ	৫০,৭২৭	৫০,০০০	১,০০,৭২৭
নগর এলাকায় পানি সরবরাহ				
১০। ঢাকা মহানগরী	এমআইজিপিডি	৯০	১০৯	১৯৯
১১। চট্টগ্রাম মহানগরী	ঐ	১৯	৩৯	৫৮
১২। বাদবাকী জেলা শহরসমূহ ..	ঐ	২৪·৭	৪০·০	৬৪·৭
১৩। উপজেলা শহরসমূহ ..	ঐ	১·০	৫·০	৬·০

পরিকল্পনা ... গ্রন্থাগার ... বাংলা

ঘূর্ণিঝড় পুনর্বাসন/সতর্কীকরণ কর্মসূচী

১৮। ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস প্রায়ই বাংলাদেশের উপকূলভাগ ও অদূরবর্তী দ্বীপসমূহে আঘাত হানে। এতে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। গত ২৫ বছরে বাংলাদেশের উপকূল ভাগে এরকম ১৩টি ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস আঘাত হেনেছে। সম্প্রতি ১৯৮৫ সালের ২৪শে মে সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়, যা গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই পরিকল্পনা প্রণয়-কালে এবং পল্লী ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো ও ভৌত সুবিধাদি উন্নয়নের সময় এই ব্যাপক বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থার প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখা হবে। বরাদ্দকৃত সম্পদের মধ্যে সাধারণ ভৌত সুবিধার উন্নয়ন এমনভাবে করা হবে যাতে প্রতিরোধমূলক সুযোগসমূহ শক্তিশালী ও আশাব্যঞ্জক হয়।

গ্রন্থাগার

চতুর্দশ অধ্যায়

শিক্ষা ও ধর্মীয় বিষয়

পরিচ্ছেদ ১ঃ শিক্ষা

শিক্ষা মানব কর্মদক্ষতা উন্নয়নের জন্য মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে অতীতের শিক্ষা উন্নয়ন এ মানবিক প্রয়োজনীয়তা মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না; ইহা সাধারণতঃ প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করে প্রান্তিকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং চরিত্রগতভাবে সমাজের উপর তলার মধ্যেই বজায় থাকে। ফলে সাংঘাতিক সামাজিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ এর ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ১৯৮১ সালে জনসংখ্যার মাত্র ১৯.৭% ছিল শিক্ষিত। ১৯৬১ সালে এ হার ছিল ১৭% এবং ইহা গত দু'দশকে সাক্ষরতার প্রান্তিক বৃদ্ধি নির্দেশ করে যা শিক্ষা সম্পর্কে উপর তলার জন্য শিক্ষা ধারনাকেই সমর্থন করে। দ্বিতীয়তঃ উঁচু শ্রেণীভিত্তিক হওয়ায় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যার ফলে অত্যন্ত সীমিত কর্মসংস্থানের চাইতে অতিরিক্ত, অথচ দক্ষ শ্রমিকের তীব্র অভাব রয়েছে। এর ফলে শিক্ষা ও চাকুরীর বাজারেই শুধু ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়নি, অতি শিক্ষিতের জন্যও নিম্ন-কর্মসংস্থানের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয়তঃ উঁচু শ্রেণীভিত্তিক হিসাবে তা শহর ও পল্লীর মধ্যে গুরুতর ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছে। ১৯৮১ সালে শহর এলাকার শিক্ষিতের হার ছিল ৩৫% অথচ গ্রাম এলাকায় ছিল ১৭% মাত্র। যাহোক গ্রামীণ জনগোষ্ঠির শহর এলাকায় সমাগমের ফলে ১৯৬১—১৯৮১ সময়কালে শহর-পল্লীর এ বৈষম্য হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৬১ সালে শহর ও পল্লীর এ শিক্ষিতের হার ছিল যথাক্রমে ৩৮.৭% ও ১৩%। চতুর্থতঃ মৌলিকভাবে পিতৃপ্রধান সমাজে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার এ শ্রেণীভিত্তিক প্রবৃত্তি বৈষম্যমূলক ফল দিয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে নারী শিক্ষার হার (১৩.২%) ১৯৮১ সালে পুরুষ শিক্ষার হারের (২৬%) প্রায় অর্ধেক ছিল। পল্লী এলাকায় এ হার আরো খারাপ ছিল—পুরুষের ২৩% এর জায়গায় মেয়েদের ছিল ১১.২%। শহর-পল্লী এবং পুরুষ-নারী শিক্ষার প্রেক্ষিতে মনে হয় নীতিগতভাবে নারীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার হয়েছে পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক। যেহেতু জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ গ্রামে বাস করে এবং জনসংখ্যার অর্দ্ধেকই নারী তাই উঁচু শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণভাবে সাক্ষরতা প্রবৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করেছে। গত ২০ বছরে শিক্ষার হারের শ্লথ প্রবৃদ্ধি এর প্রমাণ. অধিকন্তু সাধারণ শিক্ষার উপর নজর দেয়ায় এ শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্ন সাক্ষরতা স্তরেও উদ্বৃত্ত শিক্ষিত লোকের সৃষ্টি করেছে এবং তাদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে হতাশার অনুভূতি জন্ম দিয়েছে, কারণ এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জ্ঞানলাভ অপেক্ষা পরীক্ষা পাশের জন্য না বুঝে মুখস্থ করার প্রতি উৎসাহিত করে।

১.২। শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ভারসাম্যহীনতা দূর করে একে অধিকতর কার্যকর এবং জনগণের কাছাকাছি নেয়ার জন্য স্বাধীনতার পর পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রথমবারের মত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষার অংগীকার করা হয় এবং এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা-কালে বাস্তব পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। যাহোক, সম্পদের প্রতিবন্ধকতা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং সর্বোপরি উপযুক্ত মানসিকতার অভাবহেতু এ কাজ আশানুরূপ সম্পাদন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা

১.৩। শিক্ষার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪৫৪.০১ কোটি টাকা, কিন্তু সম্পদের অপ্রতুলতার জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৫৮.৮৬ কোটি টাকা যা সরকারী খাতের মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ৩.৩%। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয়ের জন্য সরকারী খাতের বরাদ্দ ছিল ৭০৭ কোটি টাকা যা সরকারী খাতের মোট বরাদ্দ ১৬,০৬০ কোটি টাকার (চলতি মূল্যে) ৪.৪%। পরিকল্পনাকালে ব্যয় হয়েছিল ৫১০.৬ কোটি টাকা অর্থাৎ সরকারী খাতের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩.৭%। এ ব্যয় পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হলেও ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তন সূচিত করেছিল।

১.৪। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাস্তবায়নের জন্য ১৪৩টি প্রকল্প নেয়া হয় কিন্তু সম্পদের প্রতিবন্ধকতার জন্য কিছু প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়। ১৪৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৯০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয় এবং ৩৬টি প্রকল্প অসমাপ্ত রয়ে যায়। সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে ৩৮টি প্রকল্প দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সময় তৈরী হয় এবং ৫২টি প্রকল্প পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলো হতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা হতে স্থানান্তরিত ৬৫টি প্রকল্পের জন্য ১২৩ কোটি টাকা খরচ হয়। ফলে যদিও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সমাপ্ত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা স্বল্প ছিল (৩৮টি), সেগুলোর জন্য ব্যয় মোট ব্যয়ের ৭৬%। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য নিম্নে আলোচিত হল।

১.৫। **সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাঃ** ১৯৮৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করে এবং এ উদ্দেশ্যে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের প্রায় ৪৭% এ কর্মসূচীর জন্য রাখা হয়। শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ ৭০৭ কোটি টাকার মধ্যে ৩৩১.৭ কোটি টাকা (খাতওয়ারী বরাদ্দের ৪৬.৯%) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রকৃত ব্যয় হয় ২১০.৭ কোটি টাকা যা শিক্ষাখাতে প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪১.৪%। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা ১৯৭৯/৮০ সালের ৮২.৮৬ লক্ষের স্থলে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৩৪ লক্ষে বর্ধিত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। এই কর্মসূচী স্কুল গৃহের উন্নয়ন, শ্রেণী কক্ষের সম্প্রসারণ, পানি সরবরাহ ও শৌচাগার নির্মাণ ইত্যাদি জনহিতকর কার্যের উন্নয়ন, পাঠ্যবই ও পোষাক বিতরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বাস্তব সুযোগ-সুবিধাদি উন্নয়নের উপর জোর দেয়। বাস্তব সাফল্যগুলো ছিল: ১৩,২০৯টি লক্ষ্যমাত্রার স্থলে ৯,৬০৬টি স্কুলের সংস্কার, পরিকল্পিত ২৪,১০৮টি শ্রেণীকক্ষের জায়গায় ১১,২৭৪টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, ৪.৪১ লক্ষ জোড়া বেঞ্চের লক্ষ্যমাত্রার স্থলে ৩.২৮ লক্ষ জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ, পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ২০,৩০০টি নলকূপের স্থলে ৬,২৪২টি নলকূপ খনন এবং ৩৭,২৮০টি শৌচাগারের স্থলে ৫,৭৪৫টি শৌচাগার নির্মাণ। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রেরণা দেয়ার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ১৮৬.০৮ লক্ষ সেট পাঠ্যবই বিতরণের স্থলে ২৩১.৩০ লক্ষ সেট পাঠ্যবই এবং ৩৫ লক্ষ সেট পোষাক বিতরণ করা হয়। শিক্ষক ও পরিদর্শক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ৫৬,৬১৭ জনের স্থলে ২,১০,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৭২% বেশী। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন জোরদার করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর স্থাপন করা হয় এবং ১,৮৩৪ জন সহকারী উপজিলা শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য এর প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব উপজেলা কর্তৃপক্ষের কাছে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়।

১.৬। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব সুবিধাদি সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার ৪৭%, বেঞ্চ সরবরাহ ৭৪.৩৮% নলকূপ খনন ৩০.৭৩% এবং শৌচাগার নির্মাণ ১৫.৪২% মাত্র অর্জিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্তির সংখ্যা সম্প্রসারণে ঘাটতি হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের ক্ষেত্রে অসন্তোষজনক সাফল্য। যদিও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বই

বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী হয়েছে তবু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৬.৩৪ লক্ষ যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৭ লক্ষ অতিরিক্ত শিশু ভর্তি করা। ফলে এক্ষেত্রে সাফল্য মাত্র ১৩%। এই সাফল্য ব্যয়ের তুলনায় আনুপাতিকভাবে খুবই কম যা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা বরাদ্দের ৬৩.৫% মাত্র। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রেক্ষাপটে এটা সম্পদের নিষ্ফল ব্যবহার প্রমাণ করে। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১০% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮০ সালে ৪০,৪৪৫টির স্থলে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪৪,২০০-তে দাঁড়ায়। এতে বাহ্যিকভাবে বিদ্যালয় ও ভর্তি সংখ্যার মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা যায়। বিদ্যালয় ও শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় ভর্তি সংখ্যার সম্প্রসারণ প্রাথমিক শিক্ষা সুবিধাদি উন্নয়নে একটা ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা প্রকাশ করে। এটা একটা গুরুতর বিষয় তাই বর্তমান নিম্নস্তরের সাক্ষরতা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, প্রশাসক ও সমাজ চিন্তাবিদদের অবশ্যই এ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। কারণ এ সমস্যা ভৌত সুযোগগুলির প্রদানের সমস্যার চেয়ে গুরুতর। প্রকৃতপক্ষে ভৌত সুবিধাদি ব্যবহারের তীব্রতা হ্রাস এবং মাঝপথে স্কুল ত্যাগের উচ্চ হার চাহিদার ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ সমস্যা শুধু কৃষিকার্য ও অন্যান্য কার্যে সাহায্য করার জন্য দরিদ্র পরিবার কর্তৃক শিশু বাড়ীতে রাখার মত শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাই নয়, এটা মনোভাবের সমস্যাও বটে। পরবর্তী সমস্যার ক্ষেত্রে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রায় ⅔ অংশ পল্লী পরিবারে কোন শিক্ষিত সদস্য নেই। কিন্তু এটা দরিদ্র পরিবার সম্পর্কে সঠিক কোন চিত্র নাও দিতে পারে, কারণ ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি তাদের প্রবল সনাতন আবেগ থাকতে পারে। দেশে বহু সংখ্যক মক্তব রয়েছে। এগুলো প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। প্রথমতঃ এগুলো প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতার মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়াও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত দেয়। শ্রীলংকার উচ্চ সাক্ষরতার হার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এগুলো প্রাথমিক স্কুলের প্রতি পরিবারের বিদ্যমান মনোভাবগত সমস্যাসমূহ প্রকাশ করে। কারণ এগুলো পল্লী সমাজের সনাতন কৃষ্টির পাশাপাশি পল্লী সমাজ হতে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করে। মাত্র এক বা দু' বছর আগে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন উপজেলা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ককে উৎসাহিত করা হয়েছে। বহু সংখ্যক মক্তবের অস্তিত্ব পল্লী শিক্ষা পদ্ধতির শূন্যতা নির্দেশ করে। কাজেই পাঠ্যক্রমের যথোপযুক্ত সংস্কার, ভর্তি সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বর্ধিত অভিযান এবং সমাজের প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব বর্ধিত করণ ইত্যাদি কার্যক্রম পল্লী শিক্ষা পদ্ধতির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

১.৭। **গণশিক্ষাঃ** সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ১৯৮৫ সালের মধ্যে ১০—৪৫ বয়সের ৪০০ লক্ষ নিরক্ষর লোককে অক্ষর জ্ঞান দান করা। কিন্তু ১৯৮২ সালের মাঝামাঝি এ কর্মসূচীর মূল্যায়ন করে এর বাস্তবায়ন কৌশল পরিবর্তন করা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ১০৭ লক্ষ বই এবং ১ লক্ষ চার্ট বিলি করা হয়, কিন্তু মাত্র ৭ লক্ষ লোককে অক্ষর জ্ঞান দান করা সম্ভব হয়। এ তুচ্ছ সাফল্য কর্মসূচীর কৌশলগত দুর্বলতা ও অপ্রতুলতাই প্রকাশ করে। প্রাথমিক শিক্ষার উপর এর ফলাফল গুরুতর, কারণ এটা লক্ষ্য করা গেছে যে নিরক্ষর পরিবারের ছেলে-মেয়েরাই অধিকহারে মাঝপথে প্রাথমিক শিক্ষা পরিত্যাগ করে। এটাও পরিদৃষ্ট হয়েছে যে নিম্ন অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হারও নিম্ন। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার সফলতার জন্য বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর অগ্রগতি কম হলেও এ কর্মসূচী বাদ দেয়া যাচ্ছে না। এটাও অবশ্য স্বীকার করা দরকার যে গণশিক্ষা আন্দোলন কেবলমাত্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই শুরু হয় এবং যেখানে নিরক্ষতা এত ব্যাপক, সেখানে দ্রুত সুফল কদাচিত আশা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ৪০০ লক্ষ মানুষকে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী।

১.৮। **মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয় শিক্ষাঃ** মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয় শিক্ষার জন্য ২৪টি প্রকল্প নেয়া হয়, যার মধ্যে ১৫টি ১৯৮৫ সালের জুনের মধ্যে শেষ করা হয়, ৭টি তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং ২টি প্রকল্প বাতিল করা হয়। গৃহীত প্রধান প্রধান কর্মসূচী ছিলঃ পল্লী জনগোষ্টিকে স্বল্প

খরচে রীতি বহির্ভূত বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের জন্য কমিউনিটি স্কুলের উন্নয়ন সাধন করা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক বিজ্ঞান কোর্স চালু হওয়ায় গ্রামীণ স্কুলসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষা সুবিধাদির উন্নয়ন করা। অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল—সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলসমূহে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য ভৌত সুযোগ-সুবিধাদির উন্নতি সাধন করা। মাধ্যমিক স্কুল উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পরীক্ষাগার নির্মাণের কাজে অগ্রগতি সাধিত হওয়ায় ১,২০০টি মাধ্যমিক স্কুল ও ১৫০টি মাদ্রাসায় বিজ্ঞান-যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয় এবং ৬,৫০০ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কমিউনিটি বিদ্যালয় কর্মসূচীর আওতায় ৩৪১টি বিদ্যালয়ে কারখানা ঘর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩০১টি কমিউনিটি বিদ্যালয়ে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে যা মার্চ ১৯৮৫ হতে কাজে লাগানো হয়েছে।

১'৯। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২৫টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে (১৪টি বালক ও ১১টি বালিকা বিদ্যালয়) জাতীয়করণ করা হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৮০ সালে ৮,৩২৭টির স্থলে ১৯৮৫ সালে ৯,০৮৫টিতে বৃদ্ধি পায়। মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির মোট সংখ্যা ছাত্রদের বেলায় ১৯৮০ সালে ২০ লক্ষের স্থলে ১৯৮৫ সালে ২৪'৮৫ লক্ষ এবং ছাত্রীদের বেলায় ৬'১৪ লক্ষের স্থলে ৮'৩১ লক্ষে দাঁড়ায়। শিক্ষক সংখ্যাও ১৯৮০ সনের ৮৭,৯৬৩ জন হতে ১৯৮৫ সনে ৯৭,৭৪৮ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৬টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি সংখ্যা ১৯৮০ সালের ২,৭২০ হতে ১৯৮৫ সালে ৩,৩০০-তে দাঁড়িয়েছে।

১'১০। মহাবিদ্যালয় স্তরে ৩৫টি সরকারী মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধন করা হয় এবং ৩০টি বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধাদি প্রদান করা হয়। স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১২টি সরকারী মহাবিদ্যালয়ে উন্নয়নের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয় এবং ৭২টি জাতীয়করণকৃত মহাবিদ্যালয়সহ ৯৮টি সরকারী মহাবিদ্যালয়ে মৌলিক শিক্ষাগত সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জিত হয়। মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৮০ সালে ৫৫৬টির (উচ্চ মাধ্যমিক ২১৩টি এবং স্নাতক ৩৪৩টি) স্থলে ১৯৮৫ সালে ৬০২টিতে (উচ্চ মাধ্যমিক ২২৮টি ও স্নাতক ৩৭৪টি) উন্নীত হয় এবং ঐ সময়ে তাদের ছাত্র ভর্তির সংখ্যাও ৩'৯৬ লক্ষ হতে ৪'২৮ লক্ষে বৃদ্ধি পায়।

১·১১। **মাদ্রাসা শিক্ষা:** বাংলাদেশে প্রায় ২,৮০৫টি মাদ্রাসা রয়েছে। এগুলো পল্লী শিক্ষা বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষার সনাতন ভিত্তি সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এ পদ্ধতির কিছু কিছু আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। আধুনিকীকরণ কর্মসূচীর আওতায় বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তির জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে সাথে ১৫০টি নির্বাচিত বেসরকারী মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। মাদ্রাসায় ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ১৯৮০ সনের ৩'৫৪ লক্ষের স্থলে ১৯৮৫ সনে ৬'১৯ লক্ষে বৃদ্ধি পায়।

১·১২। **শিক্ষক প্রশিক্ষণ:** শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন প্রধানতঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের যোগানের উপর নির্ভরশীল। এ অভাব পূরণার্থে বেশ কিছু সংখ্যক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ ও তাদের হোস্টেল স্থাপনের উপর বিশেষ জোর দিয়ে ৬টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও ৪৭টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আরো উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। ৪টি কলেজ অব এডুকেশনকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে সেগুলোর উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। ১০টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়কে বিজ্ঞানাগারের সুবিধা ও বই প্রদান করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা তিনটির স্থলে দু'টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে এবং তৃতীয়টি রাংগামাটিতে নির্মাণাধীন রয়েছে।

গ্রন্থা

১·১৩। **কারিগরী শিক্ষাঃ** প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি সনাতনভাবে উদার শিক্ষা কেন্দ্রীক। ফলে তা শিক্ষিত বেকার যুবক সৃষ্টি করছে বটে, কিন্তু অন্যদিকে অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারছে না। কাজেই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কারিগরী শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেয়া হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পরই তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে কারিগরী শিক্ষার জন্য। এর জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৮৮.২ কোটি টাকা, কিন্তু সম্পদের ঘাটতির জন্য এ খাতে প্রকৃতপক্ষে ৪৯.১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় (বরাদ্দের ৫৫.৭%)। পরিকল্পনাকালে বাস্তবায়নের জন্য ৩৫টি প্রকল্প নেয়া হয়েছিল, যার মধ্যে জুন ১৯৮৫ সালের মধ্যে সমাপ্ত হয় ২০টি, ৯টি তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত হয়, ২টি বাতিল করা হয় এবং ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে জনশক্তি উন্নয়ন খাতে হস্তান্তর করা হয় ৪টি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, ১২টি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, চর্ম শিল্পের জন্য একটি সাধারণ ফিনিশিং সুবিধাদি প্রদান কেন্দ্র, ১৬টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ১টি কাঁচ ও সিরামিক প্রতিষ্ঠান, ১টি বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ৫৪টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং ১টি চর্ম প্রযুক্তিবিদ্যা মহাবিদ্যালয়, একটি এডুকেশনাল ইকুইপমেন্ট বোর্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত ছিল। উন্নয়নের প্রধান প্রধান অংশগুলো ছিলঃ বেসামরিক পূর্ত কর্মসূচী, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের উপদেষ্টা সেবা, ফেলোশীপ ইত্যাদি।

১.১৪। চারটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি ১৯৮০ সনের ২,০৮০ হতে ১৯৮৫ সনে ৩,১২০ টিতে এবং পলিটেকনিক স্তরে ১১,৮৩৫ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১২,৭৪৯-এ দাঁড়ায়। ১৩টি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে দ্বিতীয় শিফট বন্ধ হওয়ায় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রবর্তিত মডিউলার কোর্স বিলোপ করায় বাণিজ্যিক স্তরে ভর্তি সংখ্যা হ্রাস পায় এবং ১৯৮০ সনের ৬,৪২০ হতে ১৯৮৫ সনে তা ৪,৪৯০ টিতে নেমে আসে। ফলে প্রকৌশল কারিগরী ও দক্ষ শ্রমিকের অনুপাত দাঁড়ায় লক্ষ্যমাত্রা ১ঃ৫ঃ১৫-এর স্থলে ১ঃ৫ঃ২-এ।

১·১৫। **বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাঃ** বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অধীনে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত ৩৮টি প্রকল্পের মধ্যে ২৯টি সমাপ্ত হয়, ৬টি তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রবিষ্ট হয় এবং ৩টি স্থগিত হয়ে যায়। ভৌত কর্মসূচীর মধ্যে অধিকাংশই ছিল ছাত্র-ছাত্রীর আবাস ও শ্রেণীকক্ষ এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বাসস্থান নির্মাণ, ক্রীড়া সুযোগসহ সাধারণ সুবিধাদি সৃষ্টি এবং বই, জার্নাল ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ভর্তি সংখ্যা ১৯৮০ সনের ৩০,০০০ থেকে ১৯৮৫ সনে ৩৮,৩০০-তে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ১,৫৬২ (৫,৭৮৩ হতে ৭,৩৪৫)। অবস্থানের পরিবর্তনহেতু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কাজ আরম্ভ করতে পারেনি।

১·১৬। **শিক্ষাবৃত্তি/ভাতাঃ** দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও নারী পুরুষ ভিত্তিক শিক্ষা বৃত্তির জন্য উদার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পাঁচ বছরে প্রায় ১,১৮,১৭৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ছাত্র বৃত্তি এবং ৩,৪৯,৯০০ জনকে ভাতা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে কারিগরী শিক্ষার ১,০৩,৯১২ জন ছাত্র-ছাত্রীও এর অন্তর্ভুক্ত।

১·১৭। **অন্যান্য শিক্ষাগত তৎপরতাঃ** শিক্ষা প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার ক্ষমতা শক্তিশালী করা, শিক্ষা প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং পাঠ্যসূচী ও পাঠ্য বই আধুনিকীকরণ ইত্যাদির জন্য অনেক কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। বিসিএস শিক্ষায় নতুন যোগদানকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (NIFAER) স্থাপিত হয়। এতে ৭৯১ জনকে শিক্ষা প্রশাসন, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে ন্যাশনাল কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ড স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, এবং

এর মধ্যে ৫টি সমাপ্ত হয় এবং ২টি তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত হয়। সংসদ সচিবালয় গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ এবং মধ্য কালীন শিক্ষা পরিকল্পনা (MTEP) নামক আরো দুটি প্রকল্প দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে হাতে নেয়া হয় এবং দুটোই সমাপ্ত হয়েছে।

১'১৮। শিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্য মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত সাফল্যে বিশেষ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার বেলায় বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রারম্ভে ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন কৌশলের অনুপস্থিতি, ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে নৈরাশ্য সৃষ্টিকারী সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, পিতামাতার দারিদ্র্য, অপ্রতুল ব্যবস্থাপনা ও দুর্বল পরিদর্শন, বাস্তবায়ন স্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের অভাব ও বয়স্ক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও স্থানীয় নেতাদের মধ্যে পেশাদারী উৎসর্গ ও উদ্বুদ্ধকরণের অভাব এবং পড়ানো ও জ্ঞান উপার্জনের উপকরণসমূহের ফলদায়কহীন বিতরণ ইত্যাদি শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ঘাটতির কারণ। কর্মসূচীর বাস্তবায়নকালে ভর্তি সংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি এবং আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের উপর অধিক জোর দেয়। অনেক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই অনুমোদিত ব্যয়ের অতিরিক্ত খরচ করে সমাপ্ত করা হয়।

১'১৯। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্র ভর্তির অগ্রগতি সংযোজনী ২-এ সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১'২০। সম্পদ আহরণে বিলম্ব ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজনের স্বল্পতাহেতু প্রকল্প প্রণয়নে বিলম্ব ঘটায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার শিক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন বিলম্বে শুরু হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যখন সমাপ্তির পথে তখন এতে তিনটি প্রধান ঘটনা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। প্রথমতঃ ৪৪টি উপজিলায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য আই, ডিএ এর পূর্বতন প্রতিশ্রুতি ছাড়াও সিডা, ইউনিসেফ, ইউ এন ডিপি সহ বিশ্ব ব্যাংক ৪১৬টি উপজিলা ও সমস্ত মেট্রোপলিটান থানাগুলোতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অর্থসংস্থানের প্রতি আগ্রহ দেখায়। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থ সংস্থানের প্রস্তাব নিয়ে এডিপি এগিয়ে আসে। সর্বশেষে কারিগরী শিক্ষার অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর লব্ধ সুবিধাদি একীভূত করার ব্যাপক কর্মসূচীর অর্থ সংস্থানের জন্য বিশ্বব্যাংকের সাথে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরব্ধ এ তিনটি প্রধান কর্মসূচী প্রকৃত পক্ষে হবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ।

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

১'২১। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিক্ষাখাতে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

(১) ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য ৭০% ছেলে-মেয়ের ভর্তি করা এবং শতাব্দীর শেষে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষাকাল সমাপ্ত করার জন্য বিদ্যালয়ে রাখা নিশ্চিত করা;

(২) শিক্ষা সুবিধার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের বৈষম্য হ্রাস করা;

(৩) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরী শিক্ষার শিক্ষকগণকে চাকুরীকালীন ও চাকুরী পূর্বকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(৪) বিজ্ঞান, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া;

(৫) বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা হ্রাস করা;

(৬) মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিভিন্ন শিক্ষায় ছাত্র ভর্তি যুক্তিসংগত করা; এবং

(৭) শিক্ষা সুযোগের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদী

১'২২। উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগুলো প্রয়োগ করা হবে :

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য ৭০% ছেলেমেয়েকে ভর্তি করার জন্য ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি করা হবে, সাথে সাথে অপচয় পরিহার করার জন্য ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার উপর জোর দেয়া হবে।

(খ) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার অধিকাংশই পল্লীতে অবস্থিত সেগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদান করা হবে এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং নারী পুরুষ ভিত্তিক শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের উদার ব্যবস্থা রাখা হবে।

(গ) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে সাধিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ছাড়াও উপজিলা এবং বিদ্যালয় স্তরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য গুচ্ছ প্রশিক্ষণ কর্ম-সূচী পরিচালনা করা হবে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

(ঘ) পল্লী জনগণের স্ব-নিয়োগ সুবিধা প্রদানের জন্য কমিউনিটি বিদ্যালয়সমূহে অনানুষ্ঠানিক বৃত্তি-মূলক শিক্ষার সুবিধাদি প্রদান করা হবে।

(ঙ) বালিকাদের শিক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছাড়াও সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের ভর্তি উৎসাহিত করা হবে।

(চ) গণশিক্ষা কর্মসূচী স্থানীয়করণ করা হবে। উপজিলা পরিষদ এ কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করবে।

(ছ) কারিগরী শিক্ষায় ছাত্রদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণদানের জন্য শিল্পভিত্তিক কর্মসূচী সংগঠন করা হবে।

(জ) বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারণ ক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় মেরামত ও নবায়নের কাজ গ্রহণ করা হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান নীতিমালা

১'২৩। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয়করণের জন্য ক্রমবর্ধমান দাবী রয়েছে। এ দাবী সরকারী রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের উপর অতিরিক্ত বোঝার সৃষ্টি করছে। এ নীতি ক্রমবর্ধমান কমিউনিটি অংশগ্রহণ নীতির বিপরীত। অধিকন্তু, এটা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষা ব্যয়ের বৈষম্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাই জাতীয়করণ নীতি আর অনুসরণ করা উচিত কিনা এ বিষয় বিবেচনা করা দরকার।

১'২৪। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের বর্তমান নীতি সরকারী অর্থের অপচয় ঘটাচ্ছে, কারণ এতে যারা শিক্ষকতার পেশায় যোগদান করেন না এমন ব্যক্তিকেও প্রশিক্ষণ দান করা হয়। এ সমস্যা দূরীকরণের জন্য ভাল শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে শিক্ষকতায় কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার পর তাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো উচিত।

১'২৫। শিক্ষাখাতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং সেজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা ও ধর্মীয় বিষয়ের জন্য মোট বরাদ্দের ৪৭%-এ কর্মসূচীর জন্য রাখা হয়। এ কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। যাহোক সার্বজনীন প্রাথমিক

শিক্ষা প্রকল্পের সমুদয় ব্যয় কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হত বলে এতে কমিউনিটির কোন এক্তিয়ার ছিল না, ফলে বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য বিফল হয়। বিকেন্দ্রীকরণকে সত্যিকারভাবে অর্থবহ এবং কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ বা মেরামত উপজিলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হওয়া উচিত।

১'২৬। সম্মান ও পাশ স্নাতক কোর্স একই সংগে চালু রাখার বর্তমান পদ্ধতি স্নাতকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করছে। শিক্ষা যেখানে বৈষম্য দূরীকরণের হাতিয়ার রূপে কাজ করার কথা, সেখানে বর্তমানে তা সমাজের বৈষম্য সৃষ্টির পন্থা হিসেবে বিরাজ করছে। সমতা ও ন্যায় বিচারের খাতিরে কেবলমাত্র এক ধরনের (পাশ অথবা সম্মান) শিক্ষা পদ্ধতি চালু রাখা উচিত।

১'২৭। উচ্চ মাধ্যমিকরূপে চিহ্নিত হলেও ইণ্টারমিডিয়েট মহাবিদ্যালয়গুলো এখনও উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি স্তরের সাবেক চরিত্র বহাল রেখেছে। উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট স্তর ইণ্টারমিডিয়েট মহাবিদ্যালয় চরিত্র বজায় রাখবে। অপরপক্ষে ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগ শিক্ষা বোর্ডের সাথে এবং ডিগ্রি অংশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমন্বয়করণ ডিগ্রি কলেজের প্রশাসন ব্যবস্থার অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি করেছে। কাজেই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে কলেজ শিক্ষার একটা অংশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত এবং পূর্ব্বের ন্যায় তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত করা উচিত। যাহোক কতিপয় প্রতিষ্ঠানে (যেমন রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল, ঢাকা, ক্যাডেট কলেজ, ভিকারুন নেসা বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় কোর্সই চালু থাকবে।

১'২৮। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগসমূহের অপরিকল্পিত উন্মোধন সম্পদের ব্যাপক অপচয় ঘটায়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিভাগসমূহের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় যৌক্তিকতা প্রবর্তনের জন্য যুক্তিসঙ্গত ও সুচিন্তিত প্রচেষ্টা নেয়া হবে। সম্ভবতঃ কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু বিভাগ ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে দেয়া হবে এবং একই বা অনুরূপ বিভাগসমূহ শক্তিশালী করার জন্য তাদের শিক্ষকগণকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলী করা হবে। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বিনিময় প্রাথমিকভাবে চেষ্টা করা হবে এবং ক্রমে ক্রমে তা প্রয়োগ করা হবে। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সার্ভিস সৃষ্টি করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ডিগ্রি কলেজকে সমন্বয়করণের বর্তমান পদ্ধতি সম্ভবতঃ কোন উপকারেই আসে না। এ জন্য একটা এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি চিন্তা করা যেতে পারে।

১'২৯। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান এবং এগুলো প্রায় সম্পূর্ণভাবে কর প্রদানকারীদের অর্থে সংরক্ষণ করা হয়। তাই উচ্চ শিক্ষাকে অর্থবহ ও যুক্তিসংগতভাবে সম্প্রসারিত করার জন্য ব্যয়ের অংশভাগী হওয়া ও বাছাই পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার। অন্যথায় উচ্চ শিক্ষার সম্প্রসারণ সরকারী কোষাগারের সীমাবদ্ধতার জন্য প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে।

১'৩০। শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষকদের মূল্যায়ন করার প্রথা থাকা উচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এর ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাফল্যের মূল্যায়ন করার পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই উদ্ভাবন করবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

১'৩১। শিক্ষার বিভিন্নস্তরে তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচীগুলো নিম্নে আলোচিত হলো :

১'৩২। **প্রাথমিক শিক্ষা :** দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৯৮৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা নেয়া হয় এবং এ উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য ৪৭ লক্ষ অতিরিক্ত ছেলেমেয়ে ভর্তি করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। বাচ্চাদের ভর্তির জন্য অনুপ্রেরণা দেয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে ভর্তির অনুপাত শুরুর স্তরেই রয়ে যায়।

১˙৩৩। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ১১৬ লক্ষ ছেলেমেয়েকে অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনবয়সী জনসংখ্যার ৭০% কে ১৯৯০ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা (অর্থাৎ ২৬˙৮০ লক্ষ অতিরিক্ত ছেলে-মেয়ে) যাতে এ শতাব্দীর শেষে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় ভর্তির এ লক্ষ্যমাত্রা পরিমিত হলেও অন্যান্য আর্থসামাজিক অবস্থা অনুকূল না হলে এবং সার্বিক প্রচেষ্টা না নিলে এটা অর্জন কষ্টকর হবে।

১˙৩৪। ভর্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার ওপর ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি নির্ভর করবে। ভর্তি সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভর্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে :

(১) সমন্বিত স্কুল উন্নয়ন এপ্রোচ অনুসরণ বিশেষ করে স্কুল স্তরে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি গঠন করে স্কুলের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে কমিউনিটিকে জড়িতকরণ ;

(২) সহকারী উপজিলা শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ করে স্কুল পরিদর্শন ও প্রশাসনের উন্নয়ন। প্রত্যেক কর্মকর্তা গড়ে ১৫—২০টি স্কুল পরিদর্শনের জন্য দায়ী থাকবেন ;

(৩) ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা হবে এবং গৃহীত ব্যবস্থাদির অনবরত মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে ;

(৪) ছাত্র-ছাত্রী ও পিতা-মাতাকে সরাসরি উৎসাহদানের জন্য পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে ; এবং

(৫) ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি করা হবে।

১˙৩৫। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রথম প্রকল্পটি ৪৪টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৮৫/৮৬ সালে শেষ হবে। দ্বিতীয়টি অবশিষ্ট উপজেলা এবং পৌরসভা, থানাগুলো অন্তর্ভুক্ত করবে। পরে এ প্রকল্প তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশোধিত হয়েছে এবং তা ১৯৯০ সাল নাগাদ চলবে। প্রধান প্রধান কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩,০০০ বিদ্যালয়সহ ১৬,২৫৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় মেরামত বা নবরূপদান, ৯,২৮৫টি বিদ্যালয়ে ২৯,৫৬৩টি অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, ১৬,৬৪১টি শৌচাগার, ১৮,১২১টি নলকূপ এবং শ্রেণীকক্ষ ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা (৫,৫৬,৪১২টি বসার বেঞ্চ, ২৬,৯১১ খানা চেয়ার, ২৬,৯১১ খানা টেবিল এবং ৪,৪১০টি লোহার আলমারী) ও পাঠ্যবই সরবরাহ, ৬১˙৫০ লক্ষ শিশু উপকরণ এবং ১৮ লক্ষ শিক্ষক সম্পাদিত পাঠ্যবই সরবরাহ, ১,৯৫,৬৪৬ জন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, পরিদর্শক ও শিক্ষা প্রশাসকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা; বিদ্যালয় বিহীন এলাকাসমূহে ১,০০০ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারী ব্যবস্থাপনায় আনয়ন এবং সহকারী উপজিলা শিক্ষা অফিসার ও প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ।

১·৩৬। **গণশিক্ষা:** সাক্ষরতা উন্নয়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। ৭৪% নিরক্ষর জনসংখ্যাসহ বাংলাদেশকে এ অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর সাথে প্রতিকূলভাবে তুলনা করা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে যে সমগ্র জাতিভিত্তিক গণশিক্ষা কর্মসূচী ইপ্সিত ফল দিতে পারেনা। এ কর্মসূচীর দায়িত্ব থাকবে উপজিলার উপর যার জন্য উপজিলাগুলো সাহায্য পাবে। নিম্ন স্তরে নীচ হতে উপরে পরিকল্পনা দ্বারা স্থিরীকৃত প্রয়োজনানুযায়ী উপজেলাগুলো কেন্দ্র হতে বই ও শিক্ষা উপকরণ পাবে। এ কর্মসূচীর সীমিত অগ্রগতির প্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় ২৪ লক্ষ বয়স্ককে অক্ষর জ্ঞান দানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

১·৩৭। **মাধ্যমিক শিক্ষাঃ** ১৯৬০ দশকের প্রথমদিকে মাধ্যমিক পর্যায়ে বহুমুখী কোর্স চালু করা হয়। এখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটা দেখা যাচ্ছে যে ৮ম শ্রেণী সমাপ্তের পর এ ধরনের কোর্স প্রবর্তন সময়োপযোগী হয়নি; কারণ এ পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এত অল্পবয়স্ক যে তারা তাদের ভবিষ্যত পেশা নির্দ্ধারণ করতে পারেনা। তাই বহুমুখী কোর্সের পরিবর্তে একত্রীভূত কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গ্রামীণ জনগণকে রীতি বহির্ভূত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কমিউনিটি স্কুল প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। মোট ৪০০টি স্কুলে প্রতিবছর ৩৩,৬০০ লোককে প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন এরূপ একটি চলতি প্রকল্প ১৯৮৭ সালের জুনে শেষ হবে। প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঁচটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যথা কৃষি, নির্মাণ, মেকানিক্স, সেলাই ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ। যদি প্রকল্পটি ভালভাবে চলে, তবে আশা করা যায় যে এ সমস্ত স্কুল পরিকল্পনাকালে ১,৬৮,০০০ লোককে প্রশিক্ষণ দেবে। যেহেতু এ সমস্ত স্কুল, উন্নয়ন ও পল্লী এলাকায় দক্ষতা স্থানান্তরের প্রধান অবলম্বন হিসেবে কাজ করবে, তাই এগুলোর প্রভাব ও উন্নয়নের নিমিত্তে গ্যাপসমূহ চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে এ সমস্ত কর্মসূচীর মধ্য মেয়াদী পর্যালোচনা করা হবে।

১·৩৮। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের যত্রতত্র নজিরবিহীন ও অপরিকল্পিতভাবে অসংখ্য মাধ্যমিক স্কুল গড়ে ওঠে। এর ফলে (কিছু কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত) সবগুলো স্কুলেই আর্থিক সংকটের মধ্যদিয়ে পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ২৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী হয়েছে। স্বল্প ছাত্র ভর্তির ফলে উদ্ভুত নড়বড়ে আর্থিক অবস্থা অনেক বিদ্যালয়কে অনুপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগে বাধ্য করে। ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার মান হ্রাস পেয়েছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ভর্তির উপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি করবে। যাহোক স্বাভাবিক স্তরের নীচে ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এ সমস্ত বিদ্যালয় এ চাপ বহনে শুধু সমর্থই হবেনা অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সম্ভবতঃ এ সমস্ত বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নেও সহায়ক হবে। আশা করা যাচ্ছে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ভর্তি সংখ্যা ২·৬৭ লক্ষ বৃদ্ধি পাবে (অর্থাৎ ২৪·৮৩ লক্ষ হতে ২৭·৫০ লক্ষ)।

১·৩৯। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেসরকারী বিদ্যালয়ে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধা প্রদান করা এবং শিক্ষাব্যয়ে শহর-গ্রাম ও সরকারী-বেসরকারী বৈষম্য হ্রাস করা।

১.৪০। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য গৃহীত কর্মসূচীগুলো হচ্ছেঃ

(১) তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দেয়াসহ চলতি মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চালু রাখা এবং ২০০ মাদ্রাসাসহ ৪,০০০টি বিদ্যালয়কে এ প্রকল্পের অধীনে উন্নয়ন করা।

(২) ৪০০ বিদ্যালয়ের জন্য কমিউনিটি বিদ্যালয় প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ ১৯৮৬ সালের জুনের মধ্যে শেষ করা।

(৩) সরকারী বিদ্যালয়গুলোর মেরামত ও ভৌত সুবিধাদির নবরূপদানমূলক চলতি প্রকল্প চালু রাখা।

(৪) মাধ্যমিকস্তরে একীভূত বিজ্ঞান কোর্স প্রবর্তন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ ডি বি সাহায্যকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের বাইরে কতগুলো নির্ধারিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধাদি প্রদান করা।

১'৪১। **মাদ্রাসা শিক্ষাঃ** বর্তমানে ২,৮০৫টি মাদ্রাসা বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা প্রদান করছে (ইবতেদে হতে কামিল স্তর পর্যন্ত)। এর মধ্যে ২টি সরকার কর্তৃক পরিচালিত এবং অবশিষ্টগুলো জনগণের দয়ার উপর নির্ভরশীল। ভৌত সুবিধাদি ও যন্ত্রপাতির দিক থেকে অধিকাংশ মাদ্রাসারই অবস্থা খারাপ। আধুনিকতার প্রভাবমুক্ত বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলো ঔপনিবেশিক আমল থেকেই একটা পৃথক শিক্ষা পদ্ধতি চালু রেখেছে। বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির আধুনিকীকরণ তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের চলতি প্রকল্পের অধীনে বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা করা এবং ২০০ মাদ্রাসার জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা এ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অধিকন্ত আরো ১২৫টি মাদ্রাসায় এরূপ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মাদ্রাসাস্তরে ভর্তির সংখ্যা ৩'১৯ লক্ষ হতে ৩'৫০ লক্ষে উন্নীত হবে।

১'৪২। **শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ** ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত সাফল্য শিক্ষকদের যোগ্যতা ও পেশাগত প্রশিক্ষণের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশে শিক্ষার সর্বস্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের দারুন অভাব রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রায় ২০% শিক্ষককে এখনও প্রশিক্ষণ দিতে হবে; কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মাত্র ৩০% শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে জীবনে একবার মাত্র ভিত্তি প্রশিক্ষণ এ সমস্যার কোন সমাধান দেয় না। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত ব্যবধানে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের জ্ঞানকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। তাছাড়া, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে নতুন পাঠ্যসূচী, কমিউনিটি স্কুলসমূহে অনানুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক কোর্স ও মাদ্রাসাসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষা চালু হয়েছে। এর ফলে শিক্ষকগণকে নতুন পাঠ্যসূচীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য ক্রাশ প্রোগ্রামের অধীনে স্বল্প চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিক্ষক প্রশিক্ষণে সঠিক অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১'৪৩। শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হবে সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষককে নতুন পাঠ্যসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মাদ্রাসার শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১'৪৪। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচীগুলো হচ্ছেঃ

(১) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিয়মিত প্রশিক্ষণ চালু থাকবে।

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীকালীন এবং উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ দানের লক্ষ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে ক্রাশ প্রোগ্রাম হিসেবে 'গুচ্ছ' প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

(৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন নয়টি বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন কেন্দ্রেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

(৪) রাংগামাটি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কাজ এবং অন্যান্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা হবে।

(৫) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে জয়দেবপুরে একটি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হবে।

(৬) বি,আই,ডি,ই প্রকল্পের অধীনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অডিও-ভিজুয়াল এইডস যেমন চার্ট, পোষ্টার, গ্লোব, মানচিত্র ইত্যাদি সরবরাহ করা হবে।

(৭) বি,আই,ডি,ই প্রকল্পের অধীনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, NIEAER এবং NAPE এ টেলিভিশন সেট, ভিডিও টেপ, ক্যাসেট, টেপ রেকর্ডার, ফিলম, স্লাইড, ফিল্মস প্রজেক্টর এবং ওভারহেড প্রজেক্টার সরবরাহ করা হবে।

(৮) একটি পাইলট কর্মসূচীর অধীনে মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে করেসপনডেন্স কোর্স পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে।

(৯) এডিবি সাহায্যকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কেন্দ্রে (SEDC) মাদ্রাসার বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

(১০) NAPE তে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষকদের বিষয় শিক্ষাদানের উপর চাকুরীকালীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। NIEAER প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক ও প্রশাসকদের শিক্ষা প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

১'৪৫। **মহাবিদ্যালয় শিক্ষাঃ** ১৯৮৫ সালে দেশে ২৭৬টি উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়সহ (উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট—১১শ ও ১২শ শ্রেণী) মোট ৬২১টি মহাবিদ্যালয় ছিল। এর মধ্যে তিনটি উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়সহ ১০৯টি মহাবিদ্যালয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ের বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ৬২১টি মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে ৫১২টি (২৩৯টি স্নাতক ও ২৭৩টি উচ্চ মাধ্যমিক) মহাবিদ্যালয় বেসরকারী ব্যবস্থাধীনে রয়েছে। যেহেতু মাধ্যমিক পর্যায়ে সমন্বিত কোর্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তাই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীর চাপ বাড়বে। অতএব মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত ভৌত সুবিধাদি নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তি সংখ্যা যুক্তিসংগত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং ভর্তির ব্যাপারে বাছাই পদ্ধতি কড়াকড়িভাবে অনুসৃত হবে। অনগ্রসর গ্রুপের জন্য (পল্লী এলাকা ও বালিকা) কিছুটা শিথিলতা অনুমোদন করা যেতে পারে।

১'৪৬। স্নাতক পর্যায়ে সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য ১২টি সরকারী মহাবিদ্যালয়কে বিশেষভাবে উন্নত করা হচ্ছে। অধিকন্তু, ৭২টি জাতীয়করণকৃত মহাবিদ্যালয়সহ ৯৮টি সরকারী মহাবিদ্যালয়কে একটা পৃথক প্রকল্পের অধীনে উন্নীত করা হচ্ছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, বেসরকারী স্নাতক মহাবিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের জন্য কোন কর্মসূচী গৃহীত হয়নি। উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়ের বর্ধিত উৎপাদন স্নাতক স্তরে বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার চতুর্থ/পঞ্চম বছরে ভর্তির উপর চাপ সৃষ্টি করবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মহাবিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রধান বিষয় হলেও কতগুলো নির্ধারিত বেসরকারী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ে সুবিধাদির আরো উন্নয়নের জন্য পরিমিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

১'৪৭। মহাবিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধাদি বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে জোরদার করা এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য কতিপয় সরকারী মহাবিদ্যালয় উন্নত করা। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এ স্তরে ভর্তি সংখ্যা ১২,০০০ বাড়বে (অর্থাৎ ৪'২৮ লাখ হতে ৪'৪০ লক্ষ)।

১.৪৮। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মহাবিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচীসমূহ গ্রহণ করা হবে:

(১) স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য ১২টি সরকারী মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নের চলতি প্রকল্প এবং ৭২টি জাতীয়করণকৃত মহাবিদ্যালয়সহ ৯৮টি সরকারী মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়ন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাপ্ত করা হবে।

(২) বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধাদি প্রদানের জন্য বাছাইকৃত বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয় এবং স্নাতক মহাবিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক শাখার উন্নয়ন সাধন করা হবে।

(৩) স্নাতকস্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধাদির উন্নয়নের জন্য বাছাইকৃত বেসরকারী স্নাতক মহাবিদ্যালয়-সমূহ আরো উন্নত করা হবে।

১.৪৯। **কারিগরী শিক্ষা:** বর্তমানে বাংলাদেশে ৪টি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, একটি চর্ম প্রযুক্তিবিদ্যা মহাবিদ্যালয়, একটি বস্ত্র শিল্প প্রযুক্তিবিদ্যা মহাবিদ্যালয়, ১৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, একটি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট, একটি কাঁচ ও সিরামিক ইনস্টিটিউট, ৫২টি বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কাজ করছে।

১.৫০। বাংলাদেশে কারিগরী জনশক্তির সরবরাহে বিশেষ করে দক্ষ শ্রমিক স্তরে ঘাটতি রয়েছে। শিল্পের সাথে যোগসূত্রের অভাব ছাড়াও সিলেবাসের দুর্বলতা এবং অর্থনীতির চাহিদার সাথে অসংগতিপূর্ণ কর্মসূচীর জন্য বর্তমানে যে সমস্ত সুবিধা রয়েছে সেগুলোর অপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট মডিউলার কোর্স এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট দ্বিতীয় শিফট বাণিজ্য কোর্স চালু করে এ অবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। যাহোক, বাস্তবায়ন পর্যায়ে মডিউলার কোর্স বাতিল করা হয় এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় শিফট বাণিজ্য কোর্স প্রবর্তনের কর্মসূচীও বাদ দেয়া হয়। এর পরিবর্তে পলিটেকনিক কোর্সের পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের জন্য দ্বিতীয় শিফট পলিটেকনিক কোর্স চালু করা হয়। সম্পদের অপ্রতুলতার জন্য কারিগরী শিক্ষা কর্মসূচীর বাস্ত-বায়ন বিলম্বিত হয়। যাহোক, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বছরে প্রধানত তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় একটা ব্যাপক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকৌশল মহা-বিদ্যালয়, পলিটেকনিক, কারিগরী শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও কারিগরী শিক্ষা পরিদপ্তর একত্রীকরণ এবং কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের কাজ সমাপ্ত করার জন্য এ ব্যাপক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।

১.৫১। কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

(১) প্রান্তিক সম্প্রসারণের সাথে কারিগরী শিক্ষার ভৌত সুবিধাদি একত্রীকরণ,

(২) কারিগরী শিক্ষার মান উন্নয়ন, এবং

(৩) বালিকাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ।

১.৫২। বর্তমান সুবিধাদির একত্রীকরণ এবং এগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের সাথে সাথে ছাত্র ভর্তি সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৬৭১ জন অতিরিক্ত ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হবে (ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ২০,৩৫৯ হতে ২২,০৩০ বৃদ্ধি পাবে)। সুবিধাদি একত্রীকরণের জন্য ব্যাপক কারিগরী শিক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত সহায়তাদানের দরকার হতে পারে।

১.৫৩। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নিম্নলিখিত কর্মসূচীগুলো নেয়া হবেঃ

(১) প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় ও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট একত্রীভূত করণের চলতি প্রকল্প এবং কারিগরী শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের পুনরুজ্জীবন দান প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে।

(২) ১৯৮৫/৮৬ সালের মধ্যে কার্যকর করার লক্ষ্যে মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।

(৩) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা হবে।

(৪) কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের নির্মাণ কাজ শেষ করা হবে এবং ১৯৮৬ সালে এটাকে কার্যকর করা হবে।

(৫) কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের সহযোগিতায় ন্যাশনাল কারিকুলাম এণ্ড টেক্সটবুক বোর্ড সিলেবাস সংশোধনী এবং আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নেবে।

(৬) বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য ছাত্রদেরকে শিল্পকারখানার সাথে সংযুক্ত করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(৭) টাংগাইল ও পটুয়াখালীতে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করা হবে।

১.৫৪। **বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাঃ** বিগত দশকগুলোতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এ সম্প্রসারণ অবশ্য অপরিকল্পিত হওয়ায় এর উৎপাদনে মারাত্মক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। দেশ যখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন তৎপরতার জন্য অতিদক্ষ জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা দারুণভাবে অনুভব করছে তখন সাধারণ কলা শিক্ষায় শিক্ষিত স্নাতকদের সংখ্যা অনেক উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা বর্তমান সুবিধাদির একত্রীকরণ, দেশের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন শৃংখলায় ছাত্র ভর্তি যুক্তিসংগতকরণ এবং ভর্তির ব্যাপারে বাছাই পদ্ধতির প্রবর্তনের দিকে নজর দেয়। যাহোক দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ছাত্র ভর্তি বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে পরিকল্পনায় গৃহীত যুক্তিসংগত উদ্দেশ্য ও বাছাই পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়নি। উচ্চ শিক্ষায় এ দারুন অসমর্থতা ও বৈষম্যের প্রতি মানুষের মধ্যে সাধারণ সর্তকতার সৃষ্টি হলেও অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। নীতিগতভাবে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার আনুভূমিক বা উদার সম্প্রসারণ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বিশ্বের বিশেষতঃ প্রতিবেশী দেশসমূহের ধারা বিবেচনা করে ইপ্সিত বিষয়ে সীমিত সম্প্রসারণ বিবেচনা করা হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি সংখ্যা ৩,৬০০ বৃদ্ধি পাবে (অর্থাৎ ৩৪,৯৬৭ থেকে ৩৮,৬০০)। সংশ্লিষ্ট সেক্টরের অধীনে কৃষি ও স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়ন সাধন করা হবে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্র ভর্তি অভিক্ষেপন সংযোজনী ৩-এ দেখানো হয়েছে।

১.৫৫। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দুটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়—একটা খুলনা বিভাগ এবং অপরটি সিলেটে স্থাপিত হবে। শিক্ষা প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এফিলিয়েটিং বোঝা হতে অব্যাহতি দেয়ার জন্য এবং শিক্ষার মান রক্ষা, পথ নির্দেশদান, পরিদর্শন এবং স্নাতক মহাবিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষা পরিচালনার জন্য একটা এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হবে। শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের লক্ষ্যে মহাবিদ্যালয়গুলো নিয়মিতভাবে পরিদর্শনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত।

১.৫৬। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

(১) ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান স্তরের ছাত্রছাত্রী ভর্তি স্থিতিশীল রাখা এবং গুণগত মান উন্নয়নের জন্য জোর প্রদান ;

(২) বিভাগসমূহের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বয় সাধন;

(৩) বিভিন্ন শিক্ষার মধ্যে ছাত্র-ভর্তি যুক্তিসংগতকরণ;

(৪) ইপ্সিত লাইনে সীমিত সম্প্রসারণ।

১.৫৭। উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচীসমূহ গৃহীত হবে :

(১) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হতে স্থানান্তরিত ঢাকা, রাজশাহী ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সংস্থান নির্মাণের চলতি প্রকল্পগুলো সমাপ্ত করা হবে।

(২) ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করা হবে।

(৩) বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের বর্তমান ভর্তি সংখ্যা নিয়ে কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে মেরামত ও নবরূপদানসহ নূন্যতম সুবিধাদি প্রদান করা হবে।

(৪) কাজ শুরু করার জন্য ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়কে মৌলিক নিম্নতম সুবিধাদি প্রদান করা হবে।

(৫) দুটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়—একটি খুলনা বিভাগে এবং অপরটি সিলেটে স্থাপিত হবে।

১.৫৮। শিক্ষা খাতের অধীনে বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনুমোদিত প্রকল্প হতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের বিচ্যুতি সর্বাপেক্ষা বেশী। এর কারণ এ হতে পারে যে অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ খুবই কম। অনুমোদিত প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে বিচ্যুতি কমানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উচিত একটি অপরিবর্তনীয় পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

১.৫৯। **বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ভূমিকা:** দেশের উচ্চতর শিক্ষার পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ভূমিকা আরো কার্যকর করা প্রয়োজন। এটা স্বীকার্য যে এর নিজস্ব সমস্যা ও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরিকল্পনা শৃংখলা প্রবর্তন করার চেষ্টা চলছে বলে প্রতীয়মান হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে আরো ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং পরস্পর স্বাধীন, তাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সার্বিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে সমন্বয়-কারী প্রতিষ্ঠানরূপে শক্তিশালী করা উচিত।

১.৬০। **ছাত্র বৃত্তি/ভাতা:** দারিদ্রের জন্য দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন এবং এটা অবশ্যই শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে যেখানে প্রায় ৮০% জনগোষ্ঠি দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে সেখানে শিক্ষার সুযোগে বৈষম্য একটা বড় রকমের সমস্যা। এ অবস্থায় ছাত্রবৃত্তি/ভাতা প্রদান মেধাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সুযোগ নিশ্চিত করার ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মেধা এবং মেধা ও সংগতির ভিত্তিতে ছাত্র বৃত্তি এবং ভাতা প্রদানের জন্য এক ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। অঞ্চল ও নারী-পুরুষ ভিত্তিতে নিম্নতর পর্যায়ে (ইউনিয়ন ও থানা ভিত্তিক প্রাথমিক ও জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি/ভাতা) ছাত্রবৃত্তি বিতরণ সমগ্র দেশে মেধা প্রতিপালনে একটা উত্তম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

১.৬১। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ছাত্র বৃত্তি ও ভাতা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য পূর্বের মতই থাকবে:

(১) আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে মেধাবী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।

(২) ছাত্র বৃত্তির উদার ব্যবস্থার মাধ্যমে অনগ্রসর লোকদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।

(৩) সুযোগের সমতা নিশ্চিত করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইপ্সিত শিক্ষার দিকে চালিত করা।

১.৬২। পূর্ববর্তী পরিকল্পনার গৃহীত ছাত্র বৃত্তি ও ভাতার নির্ণায়কসমূহ বেশ সন্তোষজনকভাবে কাজ করে। তাই তৃতীয় পরিকল্পনায়ও ঐগুলো প্রয়োগ করা হবে। এগুলোর মধ্যে মেধা ও সঙ্গতি ভিত্তিতে এবং একটা মেধা ভাণ্ডারের মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রবৃত্তি ও ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত। ৫ম ও অষ্টম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিক ও জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি ইউনিয়ন ও উপজেলা ভিত্তিতে প্রদান করা হবে এবং মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক ছাত্রবৃত্তি দেয়া হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে দাখিল, আলীম ও ফাজিল স্তরের পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী ছাত্রবৃত্তি দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাস ও সম্মান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হবে। দুস্থ লোকদের ছেলেমেয়েদের বৃত্তি প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে (তফশীল সম্প্রদায়, উপজাতীয় এলাকার ছাত্রছাত্রী এবং পল্লী বালিকা)। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১.২৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে সাধারণ ছাত্র-বৃত্তি এবং ২.৬৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে ভাতা দেয়া হবে। ১.২০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তি ভোগ করবে।

১.৬৩। **শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন, পাঠ্যসূচী উন্নয়ন, গবেষণা এবং আবিস্কার:** দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিক্ষা প্রশাসনের সংস্কার এবং বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা পরিদপ্তরকে তিনটি পৃথক পরিদপ্তরে বিভক্ত করা হয়, যথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা পরিদপ্তর এবং পরিদর্শন পরিদপ্তর। ধারাবাহিকভাবে পাঠ্যসূচী উন্নয়নের জন্য স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে জাতীয় কারিকুলাম উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের সময়মত উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে পূর্বেই স্থাপিত হয়েছে। এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় কারিকুলাম এবং টেক্সট বুক বোর্ড নামে একত্রীকরণ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভাল শিক্ষক ও বইয়ের অভাব দুর করার লক্ষ্যে গণমাধ্যম ব্যবহারের উদ্ভাবনী ধারণা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য একটা পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি তেমন কোন অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি।

১.৬৪। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন, পাঠ্যসূচী উন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে চলতি প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শেষ করা হবে। বহু ভাষাভিত্তিক শর্টহ্যাণ্ড কোর্স (multi-lingual shorthand course) পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার জন্য একটা নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।

১.৬৫। **বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর:** বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সৃষ্টি করা হয়:

(১) ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠণ করা, তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী এবং জাতীয় সেবার জন্য উৎসর্গের বোধ সৃষ্টি করা;

(২) দেশ রক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দান করা; এবং

(৩) জাতীয় দুর্যোগের সময় শৃংখলাবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবস্থা করা।

১.৬৬। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী ছিল, সেনাবাহিনী শাখার ৫টি রেজিমেন্ট, নৌবাহিনী শাখায় তিনটি ফ্লুটিলা এবং বিমান বাহিনী শাখায় তিনটি স্কোয়াড্রন তৈরী করা। ধারণা করা হয় যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের দু'টি ডিভিশন থাকবে, জুনিয়ার ডিভিশনে ৮ম হতে ১০ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী ২ বছরের জন্য এবং অন্য ডিভিশনে তিন বছর মেয়াদে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ নেবে। পরিকল্পনাকালে প্রায় ১,২০০ ক্যাডেট তৈরী করা হয় যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,৫০০ জন ক্যাডেট তৈরী করা। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের অসমাপ্ত কাজ চলতি প্রকল্পের অধীনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও সমাপ্ত করা হবে।

১.৬৭। **ক্যাডেট মহাবিদ্যালয়:** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে মেধাবী ছাত্রদের উচ্চমানের শিক্ষা ও নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মধ্যে প্রতিরক্ষা সার্ভিসে যোগদানের মানসিকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ৪টি ক্যাডেট কলেজ স্থাপিত হয়। উচ্চমানের শিক্ষা প্রদানের জন্য কয়েকটি আবাসিক মডেল স্কুল ইতিপূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ব্যাপারে এ স্কুলগুলো ক্যাডেট মহাবিদ্যালয়ের মত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তাই নির্মিত ভৌত সুবিধাদি পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়নি। একদিকে ক্যাডেট কলেজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং অন্যদিকে আবাসিক মডেল স্কুলগুলোর অধিকতর ব্যবহারের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে ৬টি আবাসিক মডেল স্কুলকে ক্যাডেট কলেজে রূপান্তর করে উন্নত করা হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সিলেট, রংপুর, পাবনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহের আবাসিক মডেল স্কুলগুলো ক্যাডেট কলেজে রূপান্তরিত করার প্রকল্পটি শেষ হয়। শুধু কুমিল্লা আবাসিক মডেল স্কুলের রূপান্তরের প্রকল্পটি তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কোন নতুন ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠার দরকার নেই। যাহোক, অনেকগুলো ক্যাডেট কলেজ ষাট দশকের প্রথম দিকে স্থাপিত হওয়ায় কতকগুলোর মেরামত ও নবরূপদান করা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য আবাসিক সংস্থান নির্মাণ দরকার হয়ে পড়ে।

১.৬৮। তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্যাডেট কলেজের জন্য গৃহীত কর্মসূচীগুলো হচ্ছে:

(১) কুমিল্লা আবাসিক মডেল স্কুলের ক্যাডেট কলেজে রূপান্তরের অসমাপ্ত কাজ ১৯৮৫/৮৬ সালের মধ্যে শেষ করা;

(২) পুরাতন ক্যাডেট কলেজসমূহের মেরামত ও নবরূপদান; এবং

(৩) পুরাতন ক্যাডেট কলেজগুলোর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ।

১.৬৯। **মহিলা শিক্ষা:** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০% নারী। কোন জাতিই তার জনসংখ্যার অর্ধেককে কর্মহীন রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইপ্সিত স্তর সম্ভবতঃ অর্জন করতে পারে না। বাংলাদেশ সরকার আর্থ-সামাজিক জীবনে নারীর ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে এবং তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মহিলা বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মহিলাদেরকে বর্ধিত শিক্ষা সুবিধাদি এবং চাকুরীর সুযোগ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১,৪০০ শূন্যপদে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য মহিলাদেরকে শিক্ষিকারূপে নিয়োগ করা হয়। শিক্ষা সহকারীর ৫০৮টি পদের সবকয়টি শিক্ষিকা দ্বারা পূরণ করা হয়। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার সংখ্যা ১৯৮০ সালের ১০,০০০ হতে ১৯৮৫ সালে ১৬,০০০-এ বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষিকাদের ভর্তি সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মহিলা ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয় এবং উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসমূহে মহিলা শিক্ষানবীশদেরকে অতিরিক্ত বই ভাতা প্রদান করা হয়। বর্ধিত সংখ্যায় ছাত্রী ভর্তিকে উৎসাহিত করার জন্য পল্লী অঞ্চলের প্রায় সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া নতুন জেলাসদর পর্যন্ত বালিকাদের জন্য পৃথক সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। উপজিলা সদরে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদানের জন্য উন্নীত ৭০০টি বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে মেয়েদের জন্য ৩৫০টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে।

১.৭০। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রত্যেক পুরাতন জেলা সদরে একটি করে মহিলা কলেজ জাতীয়করণের মাধ্যমে উন্নত করা হয়েছে। সব পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে ১৫% আসন সংরক্ষিত রাখা ছাড়াও ঢাকায় মেয়েদের জন্য একটি পৃথক পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। ১০টি ক্যাডেট কলেজের মধ্যে একটি সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। শিক্ষা স্তর বরাবর চলাচলে মেয়েদেরকে উৎসাহ দেয়ার জন্য সাধারণ ছাত্রবৃত্তির ৪০% (মেধাভাণ্ডার ব্যতিরেকে) মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। আশা করা যায়, এ সমস্ত ব্যবস্থা শিক্ষা লাভে মেয়েদের বর্ধিত সংখ্যায় অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদানে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

১.৭১। পল্লী জনগণকে অনানুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে পল্লী অঞ্চলে চাকুরী, স্ব-নিয়োজিত চাকুরী সুবিধা প্রদানের জন্য ৪০০টি কমিউনিটি স্কুল স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০০টি মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। জানা গেছে যে এ সমস্ত স্কুল থেকে পাশ করা মেয়েরা পোশাক শিল্পে চাকুরী পাচ্ছে। চাকুরী ক্ষেত্রে সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ১৫% নন-গেজেটেড পদ এবং ১০% গেজেটেড পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

১.৭২। উপরোক্ত ব্যবস্থাবলী শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পদক্ষেপ। যাহোক এটা লক্ষ্য করা গেছে যে বুদ্ধিমতি বালিকারা অপেক্ষাকৃত ভাল এবং উচ্চমানের শিক্ষা লাভের জন্য বালিকা বিদ্যালয়ের পরিবর্তে সহশিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি হওয়ার প্রতি বেশী আগ্রহ দেখায়। সহশিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বালক-বালিকাদের মধ্যে অধিকতর প্রতিযোগিতার সুযোগ দান করে। তাই, বালক-বালিকাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার স্পৃহা জাগরণ এবং বালিকাদেরকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যে তাদের জন্যে পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতি পুনঃ পরীক্ষা করা হবে।

১.৭৩। ক্ষয়ক্ষতিজনিত কারণে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভগ্ন প্রায়। কতগুলো ভবনের মেরামত, নবরূপদান এবং প্রয়োজনে পুনঃ নির্মাণ করা দরকার। তৃতীয় পরিকল্পনায় তাই বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভগ্নদশাগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় পুনর্নির্মাণ কর্মসূচী

১.৭৪। ১৯৮৫ সালের মে মাসের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলবর্তী এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরাট ক্ষতি সাধন করে। প্রায় ২৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৪০টি মাদ্রাসা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। আরো ৩১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০৯টি মাদ্রাসা ও ১৬টি মহাবিদ্যালয় আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণের জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বলে হিসেব করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় পুনঃনির্মাণ কাজ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিক্ষা খাতে পরিকল্পনার বরাদ্দের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে। দালানসমূহ এমনভাবে পুনঃনির্মাণ করা হবে যাতে প্রয়োজনে সেগুলো ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

পরিচ্ছেদ ২ঃ ধর্মীয় বিষয়

মানব জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। অতীতের তুলনায় বর্তমান যুগে মানব জীবনে ধর্মের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের আকাংখার সাথে সাথে মানব চরিত্রের খারাপ দিকগুলো প্রকাশ লাভ করেছে এবং চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। মানব প্রকৃতির মন্দ দিকগুলো দমন এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হতে উদ্ভূত শক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফলের অপব্যবহার হতে থাকবে।

২.২। ধর্মীয় কার্যাবলী ১৯৭৯/৮০ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রথম বারের মত অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ২'০৫ কোটি টাকা বরাদ্দসহ ৮টি প্রকল্প তাতে সন্নিবেশিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতের অধীনে ধর্মীয় বিষয় একটি আলাদা উপ-খাত হিসেবে পরিগণিত হয়। ঐ সময় তা ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। পরবর্তীকালে এর জন্য একটা আলাদা মন্ত্রণালয় স্বষ্টি করা হয়।

২.৩। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদের স্বল্পতা ছাড়াও চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অনেক অকৃতকার্যতার জন্য সম্ভবতঃ দায়ী। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য উৎপাদনের উপাদান অপেক্ষা মানব উপাদান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তিগত সংমিশ্রণ যাই হোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত মানব কর্মকাণ্ড ধর্মীয়ভাবে প্রবৃত্ত এবং নৈতিকভাবে পরিশোধিত না হবে ততদিন পর্যন্ত যে কোন উন্নয়ন প্রচেষ্টা ঈপ্সিত ফল আনতে পারবে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নৈতিকতার উন্নয়ন একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। যদিও অদৃশ্যমান তবুও এটাই একমাত্র উপাদান যা অপচয় বন্ধ করতে পারে এবং দৃশ্যমান উন্নয়ন-উপাদানের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।

অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা

২.৪। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এক্ষেত্রে প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ ছিল ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ধর্মীয় বিষয়ের জন্য ১৪'৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে ১২'৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে। তবে প্রকৃতপক্ষে ১২'২৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাস্তবায়নের জন্য ৯টি প্রকল্প নেয়া হয় যার মধ্যে পাঁচটি ১৯৮৫ সালের জুনের মধ্যে শেষ হয়। দু'টি তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট দু'টি ১৯৮২/৮৩ সালে বাতিল করা হয়।

২.৫। পরিকল্পনানুযায়ী বিভাগীয় ও পুরাতন জিলা সদরসমূহে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। অধিকন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,৫০০টি বই সমিতি এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ২১টি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ৪টি যুব ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় এবং বই বিতরণের জন্য ৪টি ভ্রাম্যমান ভ্যান সংগ্রহ করা হয়। ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্পটি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শেষ না হয়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত হয়। পরিকল্পিতভাবে প্রায় ১২,৯৭৫ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১,৮৭৫টি মসজিদ গ্রন্থাগার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে অধিক গ্রন্থাগার স্থাপনের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য ২,৮০০টি মসজিদ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গ্রন্থাগারের জন্য ১২,০০০টি বই এবং ২৮টি জার্নাল সংগ্রহ করা হয় যা লক্ষ্যমাত্রাকে প্রান্তিকভাবে ছাড়িয়ে গেছে। প্রকাশনা কর্মসূচীর অধীনে ৩৪৮টি বই প্রকাশ করা হয় এবং ৫০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরী করা হয়। বায়তুল মোকাররম মসজিদে অজু করার স্থান এবং মহিলাদের নামাজের স্থান নির্মাণের কাজ যথাসময়ে শেষ হয়েছে। বাংলায় ক্ষুদ্রাকারের ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়েছে এবং ২০টি ভলুমে বৃহদাকারের বিশ্বকোষ প্রকাশের কাজ চলছে। যথাক্রমে ১৭'১৩ লক্ষ ও ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পর ''ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ছাপাখানা নির্মাণ'' এবং ''মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজকল্যাণ কর্মসূচী'' নামক প্রকল্প দু'টি ১৯৮২/৮৩ সালে বাতিল হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২.৬। চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করার উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যথোপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। যাহোক মাত্র পাঁচ বছর সময়কালে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা ছিল অনেকটা কঠিন। এ ক্ষেত্রে কোন দৃশ্যমান ফললাভের জন্য বিবেক প্রসূত এবং দৃঢ় সংকল্প ভিত্তিক দীর্ঘকালের প্রচেষ্টা দরকার। অবশ্যই এ প্রচেষ্টা পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহের সময়ও চালু রাখতে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ধর্মীয় বিষয়ের জন্য ৪০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ও কৌশলাদি

২.৭। ধর্মীয় বিষয়ে তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধন করা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সর্বোচ্চ অবদান রাখার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা। উদ্দেশ্য হাসিলের কৌশল হবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে ইমামগণের সেবা ব্যবহার করা এবং কার্যকর প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ করা। মসজিদের বর্তমান সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করা হবে এবং প্রাপ্য সম্পদের সাথে সংগতি রেখে সর্বনিম্ন অতিরিক্ত ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি করা হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

২.৮। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে:

(১) তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্পটি ১৯৮৬ সালের জুনের মধ্যে শেষ করা হবে এবং চলতি প্রকল্প শেষ হওয়ার সাথে সাথে নবসৃষ্ট জিলা-সমূহে আরো ২০টি কেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(২) বাংলায় ইসলামের ক্ষুদ্র বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা এবং বৃহদাকার বিশ্বকোষের একটা ভল্যুম সম্পন্ন করার কাজ ১৯৮৬ সালের জুনের মধ্যে শেষ করা হবে এবং এর অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

(৩) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর অধীনে ১৮,০০০ ইমামকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

(৪) মসজিদসমূহকে পুনরায় সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে এবং স্থানীয় জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য নির্বাচিত বইসহ প্রায় ৪,০০০টি মসজিদ গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে।

(৫) ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রকাশনা কর্মসূচীর অধীনে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে ৪০০টি বই প্রকাশ করা হবে। ২৫০টি নির্বাচিত বই পুনর্মুদ্রণ করা হবে, ২০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরী এবং বুখারী শরীফ-এর বংগানুবাদের কাজ গ্রহণ করা হবে।

(৬) ৪টি মিনার নির্মাণ করে জাতীয় মসজিদকে (বায়তুল মোকাররম মসজিদ) আরো সম্প্রসারিত করা হবে।

(৭) বাংলায় সঠিক ও স্বল্প ব্যাখ্যাসহ পবিত্র কোরআনের ক্যাসেট তৈরি, এর বংগানুবাদ ও শুদ্ধ উচ্চারণসহ ধীরগতিতে ক্যাসেট তৈরীর কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(৮) ২,৪০০ সামাজিক প্রতিবন্ধীকে পুনর্বাসন করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(৯) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গ্রন্থাগারের জন্য প্রায় ১৫,০০০ বিদেশী এবং ২০,০০০ দেশী বই সংগ্রহ করা হবে।

২.৯। ধর্ম পালন করা প্রধানতঃ কমিউনিটিরও দায়িত্ব। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত করা ছাড়াও কমিউনিটির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা নেবে। লক্ষিত জনগোষ্ঠির ধর্মীয় তৎপরতা উন্নয়নের জন্য সরকার ইতিমধ্যে কতিপয় ট্রাষ্ট গঠন করেছেন। আশা করা যায় যে এ সমস্ত ট্রাষ্ট বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের জন্য অর্থবহ কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

অর্থ বরাদ্দ

২.১০। শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক খাতের উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ১,৩৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১,২২০ কোটি টাকা সরকারী খাতে। (৫০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দসহ) এবং ১৫০ কোটি টাকা বেসরকারী খাতে। সরকারী খাতের মোট বরাদ্দের মধ্যে ৪০ কোটি টাকা ধর্ম বিষয়ক উপখাতের জন্য রাখা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে বেসরকারী খাত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, মাদ্রাসা ইত্যাদি উন্নয়নের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। সরকারী খাতে কর্মসূচীভিত্তিক বরাদ্দ সারণী ১-এ দেয়া হল:

[library stamp]

সারণী ১

সরকারী খাতে কর্মসূচী ভিত্তিক বরাদ্দ
(১৯৮৪/৮৫ সালের মধ্যে)

[কোটি টাকায়]

কর্মসূচী	শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ক খাতে মোট বরাদ্দ পরিমাণ	%
১। প্রাথমিক শিক্ষা	৫৩৮'০০	৪৪'১০
২। গণশিক্ষা	২৫'০০	২'০৫
৩। মাধ্যমিক শিক্ষা	১২৫'০০	১০'২৫
৪। মাদ্রাসা শিক্ষা	৬'৭৫	০'৫৫
৫। শিক্ষক প্রশিক্ষণ	১'৫০	০'১২
৬। কলেজ শিক্ষা	৫৮'৩৪	৪'৭৮
৭। ছাত্রবৃত্তি	৫৫'০০	৪'৫১
৮। কারিগরী শিক্ষা	১৬৯'৩৫	১৩'৮৮
৯। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	১০০'০০	৮'২০
১০। শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা	১১'০৬	০'৯১
১১। বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুতর মেরামত ও নবরূপদান ..	৩০'০০	২'৪৫
১২। থোক বরাদ্দ	৫০'০০	৪'১০
(ক) মোট (শিক্ষা মন্ত্রণালয়):	১১৭০'০০	৯৫'৯০
(খ) মোট (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়):	১০'০০	০'৮২
(গ) মোট (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়):	৪০'০০	৩'২৮
সর্বমোট (ক+খ+গ):	১২২০'০০	১০০'০০

সংযোজনী ১

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচীভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ
(চলতি মূল্যে)

[কোটি টাকায়]

কর্মসূচী	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০—৮৫) বরাদ্দ	ব্যয়
১। প্রাথমিক শিক্ষা	৩৩১.৬৮	২১০.৭০
২। গণশিক্ষা	৬.৯৮	৯.৪১
৩। মাধ্যমিক শিক্ষা	৮৬.৮৬	৭৫.৩৩
৪। মাদ্রাসা শিক্ষা	২.১৮	১.৬৯
৫। শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৯.৫২	১৩.১৩
৬। কলেজ শিক্ষা	১৯.০৮	১৯.০২
৭। ছাত্রবৃত্তি	৫০.০০	৪৭.৫৩
৮। কারিগরী শিক্ষা	৮৮.১৮	৪৯.১৪
৯। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	৪৮.৮৫	৫০.৯১
১০। শিক্ষা পরিকল্পনা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	২৭.০২	৩.৭২
(ক) মোট (শিক্ষা মন্ত্রণালয়) :	৬৭০.৩৫	৪৮০.৫৮
(খ) মোট (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়) :	২১.৯৬	১৬.২২
(গ) মোট (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়) :	১৪.৬৯	১২.২৮
(ঘ) অন্যান্য :	..	০.৪৩
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) :	৭০৭.০০	৫০৯.৫১

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য

শিক্ষাস্তর			১৯৭৩ সালের অবস্থা	১৯৮০ সালের অবস্থা	১৯৮৫	
					লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
১। প্রাথমিক শিক্ষা (লক্ষ ছাত্র)	..	..	৬০.০০	৮২.৮৬	১২৯.৯০	৮৯.২০
২। মাধ্যমিক শিক্ষা (লক্ষ ছাত্র)	..	..	১৭.০০	২০.০০	২৫.০০	২৪.৮৩
৩। কলেজ শিক্ষা (লক্ষ ছাত্র)	..	..	৩.২৮	৩.৯৬	৪.৮১	৪২৮
৪। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ('000' ছাত্র)	..	..	২৩.৭৩	৩০.০০	৩৪.০০**	৩৮.৩০
(ক) সাধারণ	..	..	১৯.২৯	২৫.৬৮	২৯.০০	৩১.৮৯
(১) বিজ্ঞান	..	..	(৬.২৮)	(৭.২৯)	(৯.৩৯)	(৮.৫০)
(২) কলা ও অন্যান্য		..	(১৩.০১)	(১৮.৩৯)	(১৯.৬১)	(২৩.৩৯)
(খ) পেশাদারী	..	..	৪.৪৪	৪.৩২	৫.০০	৬.৪১
(১) প্রকৌশল	..	..	(১.৯৪)	(১.৯০)	(২.২০)	(৩.০৮)
(২) কৃষি	..	..	(২.৫০)	(২.৪২)	(২.৮০)	(৩.৩৩)
৫। কারিগরী শিক্ষা ('000' ছাত্র)	..	..	১৫.৭১	২০.৩৩	৩০.৮৩	২০.৩৬
(ক) প্রকৌশল	..	..	১.১১	২.০৮	৩.৩৩	৩.১২
(খ) কারিগর	..	..	১০.৯০	১১.৮৩	১৭.৫০	১২.৭৫
(গ) বৃত্তিমূলক	..	..	৩.৭০	৬.৪২	১০.০০	৪.৪৯
৬। বাণিজ্যিক ('000' ছাত্র)	..	..	২.৫৫	২.৭২	১০.০০	৩.৩০

** বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া।

সংযোজনী ৩

তৃতীয় পরিকল্পনায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা

শিক্ষাস্তর		১৯৮৫ (ভিত্তিস্তর)	১৯৯০ (লক্ষ্যমাত্রা)
১। প্রাথমিক শিক্ষা (লক্ষ ছাত্র)	..	৮৯·২০	১১৩·০০
২। মাধ্যমিক শিক্ষা (লক্ষ ছাত্র)	..	২৪·৮৩	২৭·৫০
৩। কলেজ শিক্ষা (লক্ষ ছাত্র)	..	৪·২৮	৪·৪০
*৪। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ('000' ছাত্র)	..	৩৪·৯৮	৩৮·৬০
(ক) সাধারণ ..	..	৩১·৮৯	৩৪·৯০
(১) বিজ্ঞান ..	..	(৮·৫০)	(১০·৭০)
(২) কলা ও অন্যান্য	..	(২৩·৩৯)	(২৪·২০)
(খ) প্রকৌশল ..	..	৩·০৮	৩·৭০
৫। কারিগরী শিক্ষা ('000' ছাত্র)	..	২০·৩৬	২২·০৩
(ক) প্রকৌশল ..	..	৩·১২	৩·৪৪
(খ) কারিগর ..	..	১২·৭৫	১৩·২৬
(গ) বৃত্তিমূলক ..	..	৪·৪৯	৫·৩৩
৬। বাণিজ্যিক শিক্ষা ('000' ছাত্র)	..	৩·৩৩	৩·৫৮
৭। মাদ্রাসা শিক্ষা (লক্ষ ছাত্র)	..	৩·১৯	৩·৫০
৮। অ-আনুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা (কমিউনিটি স্কুলসহ) (লক্ষ ছাত্র)		৩·৫৪	৭·৫৬

*কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া।

পরিকল্পনা ... গ্রন্থাগার ... বাংলাদেশ

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্বাস্থ্য

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে স্বাস্থ্য অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর থেকে সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে সবার জন্য বিশেষ করে যাদের সুযোগের অভাব রয়েছে তাদের জন্য অত্যাবশ্যক/ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করার নীতি গ্রহণ করে আসছেন। পর্যায়ক্রমিক স্বাস্থ্য পরিকল্পনাসমূহে জনগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নয়নে প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার (পি এইচ সি) ওপর জোর দেয়া হয়েছে। "২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য স্বাস্থ্য (এইচ এফএ-২০০০)" এই বিশ্বজনীন কৌশল সরকারের জাতীয় লক্ষ্যরূপে গৃহীত হয়েছে।

অতীত কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা

২। যদিও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে স্বাস্থ্য খাতে গ্রামীণ অবকাঠামো গঠন, শারীরিক চিকিৎসা, দন্ত চিকিৎসা, নার্সিং ও প্যারামেডিকস-এর ক্ষেত্রে জনশক্তির উন্নয়ন, গুটিবসন্তের পুরোপুরি উচ্ছেদ এবং যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, উদরাময় ও কলেরার ন্যায় সংক্রামক ব্যাধিসমূহ নিয়ন্ত্রণের মত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তবুও সকল মানুষের জন্য ব্যাপক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করার প্রকৃত লক্ষ্য এখনও অর্জিত হয়নি। অতীতের পরিকল্পনাসমূহে স্বাস্থ্যখাতে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল এবং মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩০% এর আওতাধীনে আনা সম্ভব হয়েছিল। সাধারণভাবে অপুষ্টির স্তরের মুখেও ব্যাধি ও মৃত্যুর হার ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা স্বাস্থ্য পরিচর্যার উন্নতির সাক্ষ্য দেয়। বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচী আওতাধীন তৎপরতার ওপর একটি সমীক্ষা নীচে সংক্ষেপে আলোচিত হলো।

পল্লী স্বাস্থ্য অবকাঠামো

৩। পরিকল্পিত ৩৫৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের (ইউ এইচ সি) মধ্যে ৩৪১টি কার্যোপযোগী করা হয়েছে এবং ১০০টি ইউ এইচ সি সব দিক থেকে সমাপ্ত হয়েছে। তদানীন্তন ইউনিয়ন স্তরের ১,২৭৫টি গ্রামীণ ডিসপেনসারী স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের (এস ও এইচ পি সি) অধীনে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউ এইচ এফ ডব্লিউ সি) রূপে আংশিকভাবে কাজ করছিল। ঐ মন্ত্রণালয়ের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ শাখা আরও ১,০৫৪টি ইউ এইচ এফ ডব্লিউ সি নির্মাণ করেছে এবং এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৪,৫০০টির লক্ষ্যমাত্রার স্থলে ইউনিয়ন স্তরে ২,৩২৯টি ইউ এইচ এফ ডব্লিউ সি স্থাপন করা হয়েছে।

হাসপাতাল এবং বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য পরিচর্যা সার্ভিস

৪। বিগত বছরগুলোতে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ১৯৭২ সালে শয্যা ছিল ১০,৪৫০টি যা ১৯৮০ সালে ১৫,৩৪৩টিতে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও ৪,৩১৮টি শয্যা যুক্ত হয়ে ২৫,৩৮২টি শয্যার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট শয্যা সংখ্যা ১৯,৬৬১টিতে দাঁড়ায়।

৫। বিদ্যমান আটটি মেডিক্যাল কলেজ ও তাদের সংযুক্ত হাসপাতালসমূহ, প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসার জাতীয় ইনষ্টিটিউট (এন আই পি এস ও এম) এবং হৃদরোগ ইনষ্টিটিউটকে (আই সি ভি ডি) আরও উন্নত করা হয়। খুলনা এবং কুমিল্লায় ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ করা যায়নি। জাপানী সহায়তায় নারায়ণগঞ্জে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার অধিকাংশ কাজ শেষ হয়েছে।

ঔষুধ, টিকা, সেরা এবং অন্যান্য সরবরাহ

৬। তেজগাঁও-এ একটি এবং বগুড়ায় অপর একটি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ উৎপাদন ইউনিট প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী সমাপ্ত করা হয়। টিটেনাস টক্সয়ডের স্থানীয় উৎপাদনের জন্য প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং এ সমস্ত ঔষধের ক্ষেত্রে দেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। ডিপথেরিয়ার টিকা তৈরী এবং ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড উৎপাদন বাড়ানোর জন্য গণস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট (আই পি এইচ) সম্প্রসারণের কাজও হাতে নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য সীমিত সংখ্যক নির্বাচিত অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের ব্যবস্থা রেখে এবং এগুলোর স্থানীয় উৎপাদনের উপর জোর দিয়ে ১৯৮২ সালে একটি নতুন জাতীয় ওষুধ নীতি গ্রহণ করা হয়।

স্বাস্থ্য জনশক্তি

৭। সাধারণভাবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৭,০০০ জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯৮৫ সালের জুন নাগাদ মেডিক্যাল স্নাতকের ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা ১৬,০০০ টিতে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩,২৪০ জন মেডিক্যাল সহকারীর সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এই সময়ে ৩,৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু তাদের সকলের জন্য চাকুরীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা যায়নি। ২০টি মেডিক্যাল সহকারী প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপনের মূল পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল এবং এগুলোর মধ্যে ১৮টি প্রকৃতপক্ষে চালু করা হয়। পরে, ভাড়াটে বাড়ীতে সক্রিয় ১০টি খণ্ডকালীন স্কুল বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাকি ৮টি স্কুলের নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়।

৮। পরিকল্পনাকালে নার্স প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদার করা হয় এবং সাহায্যকারী নার্সসহ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নার্সের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬,৫০০ জন। এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬,৮৬৪ জন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে ২৮,০০০ পল্লী চিকিৎসক এবং ২৮০ জন জুনিয়ার নার্সকেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ

৯। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো ও স্বাস্থ্য তথ্য ইউনিট শক্তিশালী করার এবং ঢাকায় একটি জাতীয় ইলেকট্রো-মেডিক্যাল সরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। ইউনানী, আয়ুর্বেদীয় এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি উন্নয়নের প্রকল্পসমূহের প্রকৃত বাস্তবায়ন এবং ঢাকায় একটি ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। মহামারী ও রোগ নিয়ন্ত্রণ গবেষণা ইনষ্টিটিউট (আইইডিসিআর) প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার

১০। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ছিল ৪১৩ কোটি টাকা, যা সরকারী খাতের মোট ব্যয়ের ২.৬%। এ বরাদ্দের বিপরীতে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ৪০৩ কোটি টাকা পাওয়া গেছে এবং প্রকৃত ব্যবহারের পরিমাণ হচ্ছে ৩৭০.৭৯ কোটি টাকা। এতে দেখা যায় প্রাপ্ত তহবিলের ৯২% ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পদের ৫৯% সরাসরি পল্লী এলাকার জন্য কাজে লাগানো হয়।

১১। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মোট ৯৩টি প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়, যার মধ্যে ৪৬টি ছিল বাস্তবায়নাধীন এবং ৪৭টি নতুন। এগুলোর মধ্যে ৪৬টি প্রকল্প পরিকল্পনাকালে শেষ হয়, ১২টি প্রকল্প বাতিল/স্থগিত হয় এবং ৩৫টি প্রকল্প তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত হয়।

প্রধান সমস্যাবলী এবং ঘাটতিসমূহ

১২। **ব্যবস্থাপনা সমস্যা :** স্বাস্থ্য সার্ভিস পরিচালনায় আধুনিক ব্যবস্থাপনা কৌশল অথবা রীতির প্রয়োগ ছিল অত্যন্ত নগণ্য। ফলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং পদ্ধতি কার্যকর ছিলনা বললেই চলে। ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প তৈরী এবং প্রকল্প প্রণয়নে ক্রমাগত বিলম্ব, নির্বাহী সংস্থা (এম ও এইচ পি সি) এবং নির্মাণ সংস্থা (পি ডব্লিউ ডি) এর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাবের ফলে বাস্তবায়ন মন্থর হয় এবং এর ফলে এগুলোর সেবার পরিমাণ ছিল অপর্যাপ্ত। প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজনের অভাবে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো প্রায়ই দুর্বলভাবে পরিচালিত হয়েছে। কর্তৃত্বের অস্পষ্ট স্তর এবং স্থানীয়ভাবে অপর্যাপ্ত হিসাবযোগ্যতা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ডিজিএইচএস সদর দপ্তর স্তরে প্রকল্প পরিচালনা এবং মূল্যায়ন ছিল অপর্যাপ্ত। জেলা স্তরে অতিরিক্ত সিভিল সার্জন (উন্নয়ন) এর পদসমূহ অবলুপ্তি এবং অন্যান্য পদসমূহের সংকোচন ও কতক ক্ষেত্রে অদক্ষ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং মনিটরিং এর জন্য দায়ী ছিল।

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদির ব্যবহার

১৩। পল্লী এলাকায় বিদ্যমান সুবিধাদির ব্যবহার সন্তোষজনক ছিল না। জেলা হাসপাতালসমূহ, মেডিক্যাল কলেজ এবং স্নাতকোত্তর ইনষ্টিটিউট হাসপাতালসমূহে শয্যা ব্যবহারের হার ছিল ১০০%এর ওপরে। অথচ ইউএইচসিসমূহে তা ছিল মাত্র ৫০ থেকে ৬০%। পল্লী এলাকায় কম অসুস্থতার জন্য এটা ঘটেনি। বরং এটা ছিল অপর্যাপ্ত অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ এবং অপর্যাপ্ত কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ফলে উদ্ভূত সাধারণভাবে নিম্নমানের সেবার প্রতিফলন। তাই বহিঃবিভাগীয় গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় ব্যবহারকারীদের মধ্যে যথেষ্ট আস্থা সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে তারা এধরনের প্রতিষ্ঠানকে পাশ কাটিয়ে শহরের বৃহত্তর হাসপাতালসমূহে ভীড় জমায়।

সংগঠন ও সমস্যাসমূহ

১৪। স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার বিভক্তিকরণ উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব সৃষ্টি করে বলে সেগুলো সংযুক্তি করার কথা চিন্তা করা হয়। উপজেলা এবং তার নিম্নস্তরে এই সার্ভিসগুলো কার্যক্ষেত্রে সংযুক্ত করা হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তদারকি নিয়ন্ত্রণ দ্বিধাবিভক্ত থেকে যায়। যদিও নীতিগত সমঝোতা ছিল যে দুই শাখার লোকজনের দ্বারা পরিচালিত সার্ভিসসমূহ সমন্বিত এবং সংযুক্ত করা হবে, জেলা এবং বিভাগীয় স্তরে যেখানে এই দুই শাখা সম্পূর্ণরূপে পৃথক সেখানে এই লক্ষ্য অর্জনের সঠিক ধরণ কি হবে তা পুরোপুরি নির্ধারণই করা হয়নি। এসমস্ত অনিয়মের কারণে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যার মত গুরুত্বপূর্ণ পিএইচসি সার্ভিসসহ নিম্নতর স্তরের সার্ভিসসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৫। এর চেয়ে কম হলেও অনুরূপ সংযুক্তির সমস্যা স্বাস্থ্য সার্ভিসের প্রতিষেধক, আরোগ্যকারী, শিক্ষাবিষয়ক এবং প্রশাসনিক অংশসমূহের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। অন্যান্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক খাতের সাথে কার্যকর সহযোগিতার অভাব এগুলোর সাথে মিলে এ ব্যবস্থার দক্ষতা কমিয়ে ফেলে।

অন্যান্য ঘাটতিসমূহ

১৬। অধিকাংশ ইউএইচসি সমূহে এখনও অত্যাবশ্যকীয় ভৌত এবং কার্য সম্পাদনমূলক সুবিধাদির অভাব রয়েছে। একইভাবে, জেলা স্তরের হাসপাতালসমূহ অপর্যাপ্ত সুবিধাদি ও সেই সংগে জনশক্তির স্বল্পতায় ভুগছে। ইউএইচসি ও জেলা হাসপাতালসমূহের মধ্যে পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত যোগসূত্র ও যোগাযোগ এবং সেই সংগে জাতীয় স্তরের শিক্ষাদানমূলক ও বিশেষজ্ঞ স্তরের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সূত্র আদান-প্রদান ব্যবস্থা এখনও প্রতিষ্ঠা করা যায়নি।

১৭। মহামারী বিষয়ক সার্বক্ষণিক সতর্কতা ও তথ্য আহরণ ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য গবেষণাগার সার্ভিস, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্কুল স্বাস্থ্য, শিল্প স্বাস্থ্য সার্ভিস এবং গণস্বাস্থ্য আইনের প্রশাসনের মত অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় উপ-ব্যবস্থাবলী শুধু যে অপর্যাপ্ত ছিল তাই নয়, সাধারণ স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার সাথে তা যথাযথভাবে সংযুক্তও ছিলনা।

১৮। জাতীয় সদর দপ্তর এবং বহির্বিভাগীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরিসংখ্যান তথ্য ব্যবস্থা কার্যকরভাবে সংযুক্ত করা যায়নি, যা উন্নয়ন এবং তৎপরতা পরিকল্পনায় ও সেই সংগে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সমস্যার সৃষ্টি করে।

বাজেট সংক্রান্ত এবং আর্থিক অসুবিধাসমূহ

১৯। এইচ এফ এ-২০০০ এর মত দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় লক্ষ্য ও কৌশলের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন এবং রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত আর্থিক সম্পদের পরিমাণ ছিল অপর্যাপ্ত। অপ্রতুল সম্পদ পরিস্থিতির কারণে উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ প্রকল্পের অগ্রগতির সাথে সংগতি রেখে করা যায়নি। বার্ষিক পুনরাবর্তক (রাজস্ব) বাজেট উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট বর্ধিত প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপর্যাপ্ত ছিল বিধায় সরবরাহ এবং সার্ভিস-এর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। পিএইচসি এবং এর সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে রাজস্ব বাজেটের ৪০%এর কাছাকাছি ব্যয় করা হয় এবং অপর ৪০% ব্যয় হয় হাসপাতাল ও ক্লিনিক্যাল সার্ভিসসমূহে। বাজেটের প্রায় ২০% ব্যয় করা হয় ওষুধ এবং অন্যান্য মেডিকোসার্জিক্যাল প্রয়োজন মেটাতে, যার সরবরাহ সব সময় কম ছিল এবং এমনকি প্রকৃত প্রয়োজনের ২৫% ও তা মেটাতে পারেনি। ইউএইচসি এবং ইউএইচএফডব্লিউসি প্রতিষ্ঠা করা হয়, কিন্তু সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং অত্যাবশ্যকীয় জীবন রক্ষাকারী ওষুধসহ পরিচালনা ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল পাওয়া যায়নি। ফলে মূলধন বরাদ্দের পুরো সুযোগ সব সময় পাওয়া যায়নি।

২০। অর্থের বরাদ্দ যথাযথ না বাড়িয়ে অনির্ধারিত প্রকল্পসমূহের অন্তর্ভুক্তি স্বল্প সম্পদের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করে। অনুমোদিত প্রকল্পের আর্থিক ফেজিং এর সাথে এডিপি-র বরাদ্দ কদাচিত সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে। এ সমস্ত কারণের জন্য অনেক প্রকল্পই পরিকল্পিত বরাদ্দ পায়নি। ফলশ্রুতিতে প্রকল্প সমাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে।

ব্যয় ভাগাভাগির সমস্যা

২১। স্বাস্থ্য পরিচর্যার সবচেয়ে ব্যয়বহুল উপাদান হচ্ছে হাসপাতাল সেবা, যা বিনামূল্যে অথবা প্রায় বিনামূল্যে পাবার ব্যবস্থা রয়েছে; এটা গণস্বাস্থ্য পরিচর্যার আরো উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ গুরুতরভাবে সংকুচিত করে তোলে। যদি বিনামূল্যে হাসপাতাল ভিত্তিক পরিচর্যা অব্যাহত থাকে, তবে যাদের হাসপাতালে অবাধ প্রবেশের সুযোগ রয়েছে এমনসব সুবিধাভোগী গোষ্ঠির মধ্যে যাদের প্রকৃত প্রয়োজন রয়েছে তাদের সুযোগ না দিয়ে অপ্রয়োজনে হাসপাতালে পরিচর্যা ব্যবহার করার প্রবণতা থাকবে।

স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা

২২। বিগত বছরগুলোতে জনগণের স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। জন্ম থেকে বর্তমান আয়ুষ্কাল আনুমানিক ৫০ বছরের মত। অপরিণত মৃত্যুর হার প্রতি ১,০০০ জনে ১৫ জন যা ১৯৮০ সালে ছিল ১,০০০ জনে ১৬·৭৫ জন যেখানে অপরিণত জন্মহার প্রতি ১,০০০ জনে ৩৯ জন। হিসাবে দেখা যায় যে, শিশু মৃত্যু ও প্রসূতি মৃত্যু হারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে; ১৯৮০ সালের ১,০০০ প্রতি ১৪০ ও ৭ জনের তুলনায় বর্তমানে যথাক্রমে ১২৫ ও ৬ জনে নেমে এসেছে।

২৩। পুষ্টি গ্রহণ বিগত বছরগুলোতে হ্রাস পেয়েছে এবং ১৯৭৫ এর ২,০৯৪ কিলো ক্যালোরী থেকে ১৯৮২-তে ১,৯৪৩ কিলো ক্যালোরীতে নেমে এসেছে। ভিটামিন 'এ' ঘাটতিজনিত রাতকানা রোগ ও দৃষ্টিহীনতা, লৌহ ঘাটতিজনিত রক্তশূন্যতা, আয়োডিন ঘাটতিজনিত গলগণ্ড, প্রোটিন-ক্যালরী ঘাটতিজনিত কশিওরকোর ও ম্যারাসমাস রোগ বাড়ছে।

রোগের ধরণ

২৪। এখনও বাংলাদেশের প্রধান রোগসমূহ হচ্ছে সংক্রামক রোগ। এসব রোগের কারণে মৃত্যু ও অসুস্থতার হার অত্যন্ত বেশী। কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, হাম, জলাতংক ও যৌনরোগের মত সংক্রামক ব্যাধিসমূহ এবং ম্যালেরিয়া, ফাইলেরাইসিস ও কৃমির মত পরোপ-জীবী রোগসমূহ অসুস্থতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ১৯৭৫—৭৮ সময়কালে পরিচালিত এক জরীপে দেখা যায় যে, উদারাময় রোগসমূহ, অপুষ্টি ও নিউমোনিয়ায় মৃত্যুর হার যথাক্রমে ১৬·৩%, ১১·১% এবং ১০·৮%। অন্যান্য ক্ষেত্রের হিসেব হচ্ছে অকাল প্রসব/জন্মকালীন আঘাত ৮·৬%, ধনুষ্টংকার ৪·৪%, ফুসফুসগত যক্ষ্মা ৩·৩%, হাম ২·৭% এবং হৃদরোগ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ৪·৫%।

২৫। সংক্রামক নয় এমন রোগসমূহের মধ্যে বহুমূত্র, হৃদরোগ, মানসিক রোগ, পাকস্থলী-অন্ত্রনালীর রোগ, ক্যান্সার, বাত, গেটেবাত, শ্বাসরোগ এবং ইউরেজেনিটাল রোগ বাড়ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি

২৬। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (ইউ এইচ সি) এবং ইউনিয়ন স্তরের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউ এইচ এফ ডব্লিউ সি) বহির্বিভাগীয় নেট ওয়ার্ক গঠন করেছে এবং গণস্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানের অব-কাঠামোর পাদপীঠরূপে কাজ করছে। ইউ এইচ সিতে রয়েছে একটি ৩১ শয্যার হাসপাতাল, একটি বাইরের রোগী দেখাশুনার সার্ভিস এবং মাঠ কর্মীদের নিয়ে একটি ভ্রাম্যমান অংশ। বর্তমানে ইউ এইচ এফ ডব্লিউ সি হচ্ছে জনগণ এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান ব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগের প্রথম স্তর এবং একে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা (পি এইচ সি) প্রদানের কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করা হয়। এর ভ্রাম্যমান অংশ মাঠস্তরের পরিবার কল্যাণ কর্মীদের নিয়ে গঠিত যারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে স্বাস্থ্যের প্রতিষেধক ও উন্নতিকর দিক, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বুঝায়, ম্যালেরিয়ার জন্য রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে, টিকাদান, ভিটামিন 'এ', কৃমির বড়ি সরবরাহ করে এবং সাধারণ ও ছোটখাটো রোগের চিকিৎসা করে। বর্তমানে ৩৪১টি ইউ এইচ সি, ১,২৭৫টি গ্রামীণ ডিসপেনসারী (ইউ এইচ এফ ডব্লিউ সিতে রূপান্তরিত হবে) এবং ১,০৫৪টি ইউ এইচ-এফ ডব্লিউ সি চালু রয়েছে। উপজেলা ও তার নীচের স্তরে হাসপাতাল শয্যার সংখ্যা ৮,১০০।

২৭। জেলা হাসপাতালসমূহ এবং কতিপয় সংক্রামক ব্যাধি ও বিশেষ ধরনের হাসপাতাল (যক্ষ্মা, কুষ্ঠ) নিয়ে পি এইচ সি'র দ্বিতীয় পর্যায় গঠিত। বর্তমানে দেশে রয়েছে ১৪টি সাধারণ হাসপাতাল (প্রতিটি ১০০ থেকে ১৫০ শয্যার ক্ষমতাসম্পন্ন), ৪৩টি সাধারণ জেলা হাসপাতাল (প্রতিটি ৫০ শয্যার), ১২টি যক্ষ্মা হাসপাতাল (প্রতিটি ২০ থেকে ১২০ শয্যার) এবং পাবনায় একটি মানসিক হাসপাতাল (৪০০ শয্যার) রয়েছে। এ ছাড়াও বাইরের রোগীদের চিকিৎসার জন্য শহরাঞ্চলে ৩৮টি ক্লিনিক, ৪৪টি যক্ষ্মা ক্লিনিক এবং ২৩টি স্কুল স্বাস্থ্য ক্লিনিক রয়েছে।

২৮। জাতীয় স্তরে আটটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (প্রতিটি ৫০০ থেকে ১,০৫০ শয্যার) ও ৮টি স্নাতকোত্তর স্তরের বিশেষ পর্যায়ের ইনষ্টিটিউট (এদের ৫টি হাসপাতাল সংলগ্ন) নিয়ে স্বাস্থ্য পরিচর্যার তৃতীয় পর্যায় গঠিত। একটি ডেণ্টাল কলেজ, একটি প্রাথমিক পরবর্তী নার্সিং কলেজ, ৮টি মেডিক্যাল সহকারী প্রশিক্ষণ স্কুল, ৩৮টি নার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ২টি প্যারামেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটও রয়েছে।

২৯। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শাখার অধীন প্রশাসনিক ইউনিটসমূহ ৮টি প্রশাসনিক ইউনিট এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো ও স্বাস্থ্য তথ্য ইউনিটের মত দু'টি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সংস্থাসহ স্বাস্থ্য সার্ভিসের মহাপরিচালকের দপ্তর নিয়ে গঠিত। অন্য ইউনিটগুলো হচ্ছে নার্সিং ডিরেক্টরেট এবং ঔষধ প্রশাসন।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা (পি এইচ সি)

৩০। পিএইচসি'র মান ও কর্মপরিধি প্রত্যাশা মাফিক নয়। এ পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার ৩০% স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাদির আওতায় এসেছে। ১৫ বছরের কম ছেলে-মেয়েদের মাত্র ৬০% যক্ষ্মা প্রতিষেধক বিসিজি টিকা এবং ২ বছরের কম শিশুদের মাত্র ২% ডিপিটি টিকার আওতায় এসেছে। ৫%-এর চাইতেও কম প্রসূতি প্রসবের আগে যথাযথ পরিচর্যা পান। মহামারী বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা প্রায়ই অর্জিত হয় না।

৩১। ইউ এইচ সি এবং ইউ এইচ এফ ডব্লিউ সি সুবিধাদি, এক্স-রে ও প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার মত রোগ নিরূপণের উপকরণ, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সরবরাহ, টিকা, সেরা, জরুরী সার্ভিস ও জীবন রক্ষাকারী অস্ত্রোপচার এবং মেডিক্যাল পরিচর্যার নিরিখে অপর্যাপ্ত। এছাড়াও যথাযথ যোগাযোগ ও যোগসূত্র ব্যবস্থার অভাবে পিএইচসি সার্ভিস জনগণের কাছে প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছানো যায়নি।

আভ্যন্তরীণ রোগী ও বাইরের রোগী পরিচর্যা

৩২। জনস্বাস্থ্য খাত জনগণকে প্রদত্ত স্বাস্থ্য সুবিধাদির ৭৫% ব্যবস্থা করে থাকে। দেশের মোট ২৭,৬৩৭টি হাসপাতাল শয্যার মধ্যে স্বাস্থ্য সার্ভিসের অধীনে রয়েছে ১৯,৬৬১টি হাসপাতাল শয্যা যা বিভিন্ন ধরনের ৪৩৬টি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র হাসপাতালসমূহে বণ্টন করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে সরকারী হাসপাতালসমূহে ৫,৭০,০০০ রোগী ভর্তি হয়েছিল। এছাড়াও ৮টি এমসিএইচ ও এফপি কেন্দ্রে ২০৪টি, ২০টি পুলিশ হাসপাতালে ৭৬৯টি, ৯টি রেলওয়ে হাসপাতালে ৪৭৬টি এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১২৫টি ছোট খাটো সুবিধাদির আওতায় ১,০৪১টি শয্যা রয়েছে। ১৩৩টি বেসরকারী সংগঠনও (এনজিও) স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করছে। বর্তমানে শয্যা ও জনসংখ্যার অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১ : ৩৫৮৯।

৩৩। স্বাস্থ্য সার্ভিসের অধীনে ১,৪০৬টি বহির্বিভাগ চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে এবং ১৯৮৩ সালে প্রায় ৫ কোটি ১০ লাখ রোগী এই সুবিধাদির সুযোগ গ্রহণ করেছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়সমূহে ২১৮টি বহির্বিভাগ চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে এবং এ ধরনের সুবিধা বেসরকারী খাতে রয়েছে ৩১৩টি।

৩৪। হোমিওপ্যাথ, হেকিম, কবিরাজ, এলোপ্যাথিক, হাতুড়ে ডাক্তার, দাই এবং সনাতন ভেষজ বিদ্যার গণ-চিকিৎসকেরাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করছে।

স্বাস্থ্য জনশক্তি

৩৫। দেশে বর্তমানে প্রায় ১৬,০০০ জন ডাক্তার, ১,০৫০ জন স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, ৫১০ জন দন্ত চিকিৎসক, সাহায্যকারীসহ ৬,৫০০ জন নার্স, ৩,৬০০ জন চিকিৎসা সহকারী, ৫,৮০০ জন ফার্মাসিষ্ট, ৩৫০ জন রেডিওগ্রাফার, ১,৩৫০ জন ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান, ১,২৬৫ জন স্বাস্থ্য স্যানিটারী পরিদর্শক, ১,৮৭০ জন সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং ২৫,০০০ জন জনস্বাস্থ্য সহকারী/পরিবার কল্যাণ কর্মী রয়েছে। জনস্বাস্থ্য খাতে বিশেষ করে প্যারামেডিক গ্রুপে রেডিওগ্রাফার ও ডেন্টাল টেকনিশিয়ানদের মত মাঝারি স্তরের কর্মীবৃন্দের অভাব রয়েছে। উপজেলা এবং তার নীচের মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মীদের সংখ্যা ৪০,০০০ এর মত। তাদের অধিকাংশই পিএইচসি'র বিভিন্ন ভ্রাম্যমান উপাদান বিতরণের সাথে জড়িত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

৩৬। "২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য" এই বিশ্বজনীন কৌশল অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তৎপরতার সমর্থন এবং উন্মেষ ঘটানোর ব্যাপক নীতিমালার ভিত্তিতে এ খাতের প্রধান উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারিত হয়েছে। এ সমস্ত উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে রয়েছে:

(১) মান উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান ব্যবস্থার আওতা বৃদ্ধি করা;

(২) বিদ্যমান পিএইচসি কর্মসূচী এবং এর সাহায্যকারী ব্যবস্থা সুসংহত ও শক্তিশালী করা;

(৩) প্রধান সংক্রামক ও অ-সংক্রামক ব্যাধিসমূহ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা করা;

(৪) যথাযথ স্বাস্থ্য জনশক্তির উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(৫) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে হোমিওপ্যাথি, ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা;

(৬) সম্প্রসারণমুখী স্বাস্থ্য পরিচর্যা সার্ভিসের সমর্থনে সম্পদ সংগ্রহ করা;

(৭) অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ, টিকা এবং অন্যান্য রোগ নিরূপক ও চিকিৎসা বিষয়ক উপাদানের পর্যাপ্ত উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণ বাড়ানো;

(৮) স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার মনিটরিং ও উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা; এবং

(৯) জৈব চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গবেষণার জন্য সুবিধাদির ব্যবস্থা এবং তা সম্প্রসারণ করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদী

৩৭। উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলগুলো গ্রহণ করা হবে:

(১) পরামর্শ ও সূত্রমূলক তিন স্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা (পি এইচ সি) সার্ভিসসমূহের ব্যবস্থা করা হবে। সার্ভিসসমূহের স্তর সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে: (ক) সম্প্রদায় স্বাস্থ্যকর্মী/স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মী/স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে সম্প্রদায় স্তর (গ্রাম স্তর), (খ) মাঝারি স্তরের স্বাস্থ্য জনশক্তি দ্বারা স্বাস্থ্য পদসমূহের মাধ্যমে মধ্যবর্তী স্তর (ওয়ার্ড স্তর), (গ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্তর (ইউনিয়ন স্তর)। ইউ এইচ এফ ডব্লিউ সি প্রতিষ্ঠা এবং স্বেচ্ছাসেবী সম্প্রদায় স্বাস্থ্যকর্মী/স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবী বাড়ানোর চালু কর্মসূচী জোরদার করা হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সাথে সংশ্লিষ্ট সুচিহ্নিত সার্ভিসসমূহ উন্নততরভাবে বিতরণের নিয়ামক হিসেবে কাজ করার জন্য সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগনিরূপণ ও চিকিৎসা সুবিধাদির ব্যবস্থা রাখা হবে।

(২) উন্নত ও সুষ্ঠু সার্ভিস প্রদানের জন্য উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এ পর্যন্ত সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসসমূহকে নিম্নোক্ত কাজের লক্ষ্যে যুক্তিযুক্ত করা হবে। (ক) গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ প্রসব, প্রবৃদ্ধির চার্ট, পুষ্টি, টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবারগতভাবে একত্রে প্রতিষেধক ও প্রসারমূলক স্বাস্থ্য শিক্ষা (স্বাস্থ্য সচেতনতা) সজাগদৃষ্টি; (খ) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর রেজিষ্ট্রীকরণ ও রিপোর্ট রাখা; এবং (গ) সূত্রমূলক ও পরবর্তী তৎপরতা।

(৩) কার্যকরভাবে সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে টিকাদান এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা, মহামারী বিষয়ক সতর্কতা স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার মত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী-গুলো আরও সম্প্রসারিত ও জোরদার করা হবে। টিকাদানের বিশ্বজনীন মান অর্জনের লক্ষ্যে ২ বছরের কম বয়স্ক ৮০% শিশুকে ডিপিটি এবং ১৫ বছরের কম বয়স্ক ৯০% ছেলেমেয়েকে বিসিজি টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে।

(৪) যথাযথ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ডাক্তার এবং আধা পেশাজীবীদের জন্য অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য জনশক্তির উন্নয়ন ঘটানো হবে। বিশেষজ্ঞ জনশক্তি (কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক) সৃষ্টি এবং মাঝারি ও নিম্নতন পর্যায়ের স্বাস্থ্য জনশক্তি সৃষ্টির ওপরও জোর দেয়া হবে। উচুমানের বিশেষজ্ঞের মারাত্মক স্বল্পতা মোকাবেলা করতে গিয়ে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা প্রশিক্ষণ ও গবেষণার প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ বিদ্যমান মেডিকাল কলেজগুলোর কয়েকটিকে পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী করা হবে। সাধারণ চিকিৎসকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী হাতে নেয়া হবে।

(৫) তথ্যভিত্তিক সার্ভিসসমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে দেশব্যাপী স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। শেষ পর্যন্ত অঞ্চলভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার স্তরে গোটা স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হবে এবং তাকে সমর্থন করবে তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থা, যার মধ্যে তথ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা স্তরের বিশেষ শহরাঞ্চলীয় স্বাস্থ্য সংস্থাপনসমূহ গ্রামীণ জনগণের সেবা করবে। অধিক সংখ্যক শয্যাসহ জেলা হাসপাতালে বিশেষ ধরনের সার্ভিস সম্প্রসারিত করা হবে এবং প্রাথমিক স্তরের বিশেষ পরিচর্যা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেবার জন্য একইভাবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর শয্যা সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হবে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসমূহে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ইউনিটসমূহ স্থাপন করা হবে।

(৬) অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, টিকা, সেরা, রাসায়নিক ও বিকারক, রিহাইড্রেশন ফ্লুইড ইত্যাদির সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে নতুন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে এগুলোর উৎপাদন বাড়ানো হবে। মৌলিক ভেষজ ও ওষুধের অতি কেন্দ্রীভূত সরবরাহ ব্যবস্থার ফলে অতীতে যে জটিলতা পোহাতে হয়েছে, সরবরাহ কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে এবং বিতরণ ব্যবস্থা জোরদার করে তা দূর করা হবে।

(৭) সরকারী/বেসরকারী খাতে দেশজ ও হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নকে উৎসাহিত করা হবে। অবশ্য গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বহুমুখী ক্লিনিকসমূহ প্রাথমিকভাবে সরকারী খাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে।

(৮) সরকার, নিয়োগকারী ও কর্মচারীদের দ্বারা যৌথভাবে পরিচালিত স্বাস্থ্য সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্প শ্রমিক/অন্যান্য সংগঠিত গোষ্ঠির জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধাদি গড়ে তোলা হবে।

(৯) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকাসমূহে, বিশেষ করে উন্নয়নমূলক, তৎপরতামূলক ও জৈব-চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসা গবেষণার মাত্রা সম্প্রসারিত করা হবে।

(১০) বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর নিরপেক্ষতার দিকে লক্ষ্য রেখে সম্পদ সৃষ্টির জন্য ব্যয়-অংশীদারিত্ব, স্বাস্থ্য বীমা ও সমবায়ের মত বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।

(১১) বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্যে অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন খাতের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় এবং সেই সংগে সংগঠনের আদর্শ, তহবিল, কর্মচারী ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

(১২) বেসরকারী সংস্থাসমূহকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, ওষুধ শিল্প ও সেবা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা হবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন কর্মসূচী

৩৮। **প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ও দিক নির্দেশকসমূহ ঃ** ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য স্বাস্থ্য এই জাতীয় কৌশলের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যখাতের লক্ষ্যমাত্রা ও দিক নির্দেশকসমূহ ঠিক করা হয়েছে। এগুলো চারটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যথা—স্বাস্থ্যের অবস্থা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান, সমর্থনকারী সার্ভিসসমূহ এবং স্বাস্থ্য জনশক্তি। সারণী ১-এ এগুলো দেখানো হয়েছে।

৩৯। **পিএইচসি ও সহায়ক সার্ভিসসমূহ ঃ** বিদ্যমান সকল ইউএইচসি-গুলোতে কর্মসম্পাদনের অসুবিধাসমূহ বিশেষ করে প্রতিষেধক ও উন্নত পরিচর্যার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসুবিধাগুলো দূর করা হবে। বর্তমানে মাত্র ৩৪১টি ইউএইচসি চালু রয়েছে। আংশিকভাবে চলতি কর্মসূচী এবং আংশিকভাবে নতুন কর্মসূচীর মাধ্যমে বাকী ৫৬টি ইউএইচসি নির্মাণের কাজ শেষ করা হবে। এইচএফএ-র জাতীয় কৌশল এবং উপজেলাসমূহকে প্রশাসনিক, আর্থ-সামাজিক ও উন্নয়ন তৎপরতার প্রধান কেন্দ্ররূপে উন্নীত করার সরকারী নীতির সাথে সংগতি রেখে ইউএইচসিগুলোতে ক্রমান্বয়ে বহির্বিভাগীয় স্তরে যথাযথ সার্ভিসমূহের উন্নতিকল্পে সরবরাহসহ পর্যাপ্ত সুবিধাদির ব্যবস্থা করা হবে যুক্তিসংগত।

৪০। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শাখার অধীনে বিদ্যমান ১,২৭৫টি ইউএইচএফডব্লিউসি-র অনেকগুলোর এখনও ন্যূনতম মানসম্মত ইউএইচএফডব্লিউসি স্তর পর্যন্ত যথাযথ উন্নয়ন প্রয়োজন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রয়োজনীয় সকল ৪,৫০০টি ইউএইচএফডব্লিউসি-কে প্রতিষ্ঠা, চালু এবং মানসম্মত করা হবে। সম্প্রদায় (গ্রাম) স্তরে স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহ প্রয়োজন এবং প্রতিটি গ্রাম অথবা ওয়ার্ড স্তরে এ ধরনের একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকতে হবে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এমসিএইচ এবং পরিবার সার্ভিসসমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যয় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সমাজকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো পরিচালনা করতে হবে। যে সমস্ত সম্প্রদায় স্বয়ম্ভরতার অনুপ্রেরণায় নিজস্ব অর্থ যোগানের ভিত্তিতে পিএইচসি কর্মসূচীতে এগিয়ে আসে এবং আসার ইচ্ছা প্রকাশ করে, ক্ষেত্রবিশেষে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুরীর আকারে তাদেরকে সমর্থন দেয়া যেতে পারে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বহুমুখী পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি উপজেলায় এ ধরনের একটা করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বাকী কেন্দ্রগুলোর কাজ ভবিষ্যতে হাতে নেয়া হবে।

৪১। নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য সকল গর্ভাবস্থা ও প্রসবকে সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বাবধানের আওতাধীনে আনার জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসহ ইউএইচসি ও ইউএইচএফডব্লিউসিতে মা ও শিশুদের পরিচর্যার জন্য বিশেষ সার্ভিস সংগঠিত করতে হবে। এমসিএইচ সার্ভিস ও তৎপরতার সাথে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীকে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত করতে হবে।

৪২। প্রধান সংক্রামক ব্যাধিসমূহ নিয়ন্ত্রণে সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী কারিগরী সার্ভিস প্রদান করবে। ইউএইচসি এবং ইউএইচএফডব্লিউসিতে নিশ্চল (স্ট্যাটিক) পরিচর্যাসহ এগুলোর তৎপরতার একটি বড় অংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা স্তরে সন্নিবদ্ধ রাখতে হবে। স্থানীয় সংস্থাসমূহকে কারিগরী সহায়তা ও দিক নির্দেশনা দেয়ার উপযোগী করার জন্য মহামারী বিষয়ক সতর্কতা জোরদার করা হবে। মহামারীর সম্ভাবনা রয়েছে এমন সব রোগ সময়মত চিহ্নিত করার জন্য স্থানীয় স্তরে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সতর্কতা বজায় রাখতে হবে যাতে করে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া যায়। বিভিন্ন সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং একই সংগে জেলা স্তরে মহামারী বিষয়ক সার্ভিসের গণস্বাস্থ্য পরীক্ষাগার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৪৩। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে খাবার রিহাইড্রেশন লবন (ও আর এস) তৈরী ও বিতরণে কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উদরাময়জনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা অধিকতর ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। রোগ নির্ধারণ এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বিকেন্দ্রীকরণ এবং ও আর এস-এর উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাও এ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কর্মসূচী ও কৌশল প্রণয়নে ও লোকজনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যাপারে আইসিডিডিআরবিতে প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ সহায়তা কাজে লাগানো হবে।

৪৪। ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হাম, যক্ষা, পারটুসিস (হুপিং কাশি) এবং পলিওমাইলেটিসের বিরুদ্ধে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর (ইপিআই) আওতা সম্প্রসারিত করা হবে এবং এতে ইউএইচসি, ইউএইচএফডব্লিউসি এবং মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রধান দায়িত্ব থাকবে। সকল মাঠকর্মী এবং তাদের তত্ত্বাবধানকারী ডাক্তারদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ইপিআই কর্মসূচী কার্যকর করতে পুরোপুরিভাবে জড়িত, সমবেত ও দায়ভাগী করতে হবে। এজন্য প্রতিটি উপজেলা ও ইউনিয়নের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে হবে, যাতে সার্বজনীন টিকাদান লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে।

৪৫। **ব্যাপক পুষ্টি কর্মসূচীঃ** এর মধ্যে থাকবে প্রবৃদ্ধির চার্ট, স্তন্যপান সম্প্রসারণ, উদরাময় সংক্রামক রোগে ওআরএস-এর ব্যবহার, পুষ্টিবিষয়ক সতর্কতা, ইউএইচসিতে পুনর্বাসন কেন্দ্রসহ পুষ্টি ইউনিট স্থাপন, অন্ধত্ব প্রতিরোধ, শিশুদের মায়ের দুধ ছাড়ানো এবং কৃমিমুক্ত খাবার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থাসহ খাদ্যের উন্নয়ন। অন্যান্য খাতের সহযোগিতায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশে ব্যবহৃত সকল ভোজ্য লবন আয়োডিনযুক্ত করে গলগণ্ডের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৪৬। **স্বাস্থ্য শিক্ষাঃ** উপজেলা ও ইউনিয়ন স্তরে প্রধান তৎপরতা হিসেবে স্বাস্থ্য শিক্ষা আরও শক্তিশালী এবং উন্নত করতে হবে। বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা গোষ্ঠি হিসেবে স্কুলের ছাত্রদের জন্য পিএইচসির ব্যবস্থা প্রদান করার লক্ষ্যে বর্তমানের ভংগুর স্কুল স্বাস্থ্য সার্ভিস শক্তিশালী করতে হবে। ক্রমাগতভাবে এবং স্বল্পভাবে সকল স্কুলকে এর আওতায় আনতে হবে।

৪৭। **ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীঃ** ম্যালেরিয়া পুনরায় এক প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নততর মহামারী নিরোধ ব্যবস্থার আওতায় কার্যকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যাপকতর এলাকায় ছিটানোর ব্যবস্থা এবং যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমানে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

গণঅংশ গ্রহণ

৪৮। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং জনগণের ঘনিষ্ঠ অংশ গ্রহণ প্রয়োজন। জনগণকে তাদের সমস্যা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং এসব সমস্যায় নিজেদের সামর্থ্যের মধ্যে সমাধান করতে হবে। তাই গোষ্ঠি, স্থানীয় সরকার সংস্থা, বেসরকারী সংগঠনসমূহ এবং জনগণের অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসহ সর্বস্তরের জনগণের অংশ গ্রহণের প্রচেষ্টা পিএইচসি কর্মসূচীসমূহের ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতা, সম্পদের সমাবেশ, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য একান্ত প্রয়োজন। প্রাথমিক প্রচেষ্টা হবে গণশিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টিশিক্ষা আন্দোলন এবং অন্যান্য উদ্বুদ্ধকরণ পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্প্রদায় পর্যায়ে সহায়তা করা এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে কারিগরি সমর্থন দেয়া। বর্তমানের ব্যক্তিগত ও সেই সংগে সম্প্রদায়গত স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিস্ক্রিয়তর অবস্থা থেকে ক্রমশঃ স্বাস্থ্য পরিচর্যায় স্ব-ব্যবস্থাপনা ও সক্রিয় অংশ গ্রহণে আস্থা সৃষ্টি করাই হবে এর লক্ষ্য। উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ইতিমধ্যেই ইউএইচসি এবং ইউএইচএফডব্লিউসিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় এবং নিজ নিজ এলাকায় পিএইচসিকে শক্তিশালী করার প্রক্রিয়ায় জড়িত।

পি এইচ সি সমর্থনকারী কর্মসূচী

৪৯। এই ক্ষেত্রে একটা প্রধান কর্মসূচী হচ্ছে পিএইচসির জন্য তথ্যভিত্তিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য জেলা হাসপাতালসমূহের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন। পর্যাপ্ত রোগনির্ণায়ক ও চিকিৎসা সুবিধাদি, মানসম্মত কর্মীবৃন্দ এবং কমপক্ষে ১০০ শয্যার হাসপাতাল ব্যবস্থাসহ সকল জেলা হাসপাতালকে (সাবেক মহকুমা হাসপাতালসমূহসহ, তবে ৭টি জেলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বাদে) আধুনিকীকরণ করা হবে। এই কর্মসূচীর (বহুমুখী প্রকল্পসহ) মধ্যে থাকবে ৩৬টি বিদ্যমান ৫০ শয্যার হাসপাতালকে ১০০ শয্যার হাসপাতালে উন্নীতকরণ, ৯টি বিদ্যমান ১০০ শয্যার হাসপাতালের আধুনিকায়ন এবং নতুন জেলাগুলোতে ১১টি নতুন ১০০ শয্যার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।

৫০। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ওষধ ও টিকার উৎপাদন আরও বাড়ানো হবে। প্রয়োজনীয় টিকা, সেরা, আন্তঃশিরা তরল পদার্থ এবং পরীক্ষাগারের রাসায়নিক পদার্থ ও বিকারক তৈরীর জন্য গণস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউটকে শক্তিশালী করা হবে। ডিপিটি টিকা এবং এন্টি-ভেনম সেরার সকল উপাদান তৈরীর জন্য সুবিধাদি সৃষ্টি করার উপর বিশেষ জোর দেয়া হবে। ওষুধ সামগ্রীর মান নিশ্চিত করার জন্য ওষুধ নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারকে জোরদার করা হবে। পিএইচসির জন্য অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্রয়োজন চিহ্নিত করার লক্ষ্যে কয়েকটি উপজেলায় একটি বহুমুখী প্রকল্পও হাতে নেয়া হবে।

৫১। সরকারী কারখানাসমূহ এবং বেসরকারীখাতে স্থানীয়ভাবে পিএইচসির জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ উৎপাদনের প্রচেষ্টা চালানো হবে। ঢাকা এবং রাজশাহীতে দুটি সরকারী কারখানা শক্তিশালী করা ছাড়াও দেশে এ ধরণের আরও একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হবে। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের স্থানীয় উৎপাদনে অধিকতর আত্মনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে এন্টিবায়োটিকসহ মৌলিক ওষুধ সংক্রান্ত কাঁচামালের ব্যাপক স্থানীয় উৎপাদন বাড়ানো হবে। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাপক বিস্তারের জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে একটা "ন্যাশনাল ফরমুলারী অব এসেনশিয়াল ড্রাগ্‌স" প্রকাশ করা হবে।

৫২। শিল্পাঞ্চলের স্বাস্থ্যবিধি এবং শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য একটি উপ-ব্যবস্থা শিল্প ও ফ্যাক্টরীতে নিয়োজিত জনগণের কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক। নিপসম (NIPSOM) শিল্প স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনশক্তিকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। রাসায়নিক নিরাপত্তার জন্য পরীক্ষাগার সুবিধাদির ব্যবস্থা এবং প্রধান প্রধান শিল্প এলাকাসমূহে চিকিৎসা সুবিধাদির ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হবে।

৫৩। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকল্পনা, পরিচালনা, তথ্য আহরণ ও মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে কার্যকর ও সময়মত পরিসংখ্যান ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্য স্বাস্থ্য তথ্য উপ-ব্যবস্থা আরও উন্নত করা হবে। প্রতি উপজেলায় এ ব্যবস্থা অবশ্যই সক্রিয় করতে হবে।

স্বাস্থ্য জনশক্তির উন্নয়ন

৫৪। বর্তমান জনশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান দক্ষতা শক্তিশালী করার অতি জরুরী প্রয়োজনের পাশাপাশি উন্নয়ন তৎপরতার অধীন সম্প্রসারিত তৎপরতার সাথে তাল রাখার উপযোগী বিভিন্ন শ্রেণীর অতিরিক্ত জনশক্তিরও প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য চাহিদার জন্য চিকিৎসক অথবা বিশেষজ্ঞদের ব্যয়বহুল প্রশিক্ষণের আয়োজন নেই। অবশ্য উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পৃক্ত দ্রুত সম্প্রসারণশীল তৎপরতার জন্য ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন।

৫৫। **ডাক্তারঃ** ডাক্তারের বার্ষিক বৃদ্ধির সংখ্যা বর্তমানে ১,২০০ জন এবং এই হারে ১৯৯০ সালে ক্রমপুঞ্জিত ডাক্তারের সংখ্যা দাঁড়াবে ২২,৫০০ জনের কাছাকাছি। উন্নয়ন তৎপরতার সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে তৈরী অতিরিক্ত ৬,৫০০ জন ডাক্তারের প্রায় সবক'জনের চাকুরী স্বাস্থ্য সার্ভিসে সংস্থান হতে পারে। কিন্তু আগে হোক পরে হোক এমন একটা অবস্থা আসবে, যখন সকল নতুন স্নাতককে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই বেসরকারী খাতে এবং সেই সংগে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী সংস্থাসমূহে ডাক্তারদের বর্ধিত সংখ্যায় চাকুরীতে বহাল করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। বহির্বিভাগীয় এলাকাসমূহে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য দীর্ঘ মেয়াদী স্বল্প সুদের ঋণের আকারে বিশেষ উৎসাহ দেয়া উচিৎ যা একটা অতিরিক্ত সময়ের পর পরিশোধ করা যাবে। ডাক্তারদের মাথাপিছু সম্মানীর ভিত্তিতে বীমা স্কীমের অধীনে নিয়োগের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা উচিৎ।

৫৬। চিকিৎসা পরিচর্যাসহ সরকারীখাতে স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর বর্তমানে আরোপিত গুরুত্ব অব্যাহত থাকবে এটা ধরে নিয়ে বার্ষিক ডাক্তার নিয়োগ ও উৎপাদন যতটা সম্ভব গণস্বাস্থ্য সুবিধাদির সম্প্রসারণ এবং বেসরকারী খাতের অত্যন্ত সীমিত বর্তমান চাহিদার সাথে সুসমন্বিত করতে হবে। খুলনা মেডিক্যাল কলেজের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন ছাড়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকারী খাতে নতুন কোন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে না। অবশ্য বেসরকারী খাতে পরীক্ষামূলকভাবে এক বা একাধিক মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৫৭। স্নাতকোত্তর স্তরের প্রশিক্ষণের সম্ভাবনা সৃষ্টি এবং তাদের মান উন্নয়নে সমর্থ করে তোলার জন্য ৮টি মেডিক্যাল কলেজের বিদ্যমান সুবিধাদি জোরদার করা হবে। বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অস্থায়ীভাবে অবস্থিত ঢাকার ডেন্টাল হাসপাতালকে নতুন চত্বরে স্থানান্তরিত করা হবে। শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আরও উন্নত করা হবে। পিএইচসির সূত্রমূলক কেন্দ্র হিসেবে জেলা হাসপাতালগুলো এবং ইউএইচসিসমূহের উন্নয়নের ফলে অদূর ভবিষ্যতে অনেক বেশী সংখ্যক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন দেখা দেবে। কতিপয় মেডিক্যাল কলেজে এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত বিশেষ বিষয়াদির জন্য স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারিত করা হবে। সাধারণ চিকিৎসকদের আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এব্যাপারে বেসরকারী খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৫৮। স্বাস্থ্য প্রশাসকদের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আন্তসার্ভিস প্রশিক্ষণদানের জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। সাভারস্থ গণপ্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, নিপসম, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (এনআইপিওআরটি) এবং বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্রে (বিএমডিসি) বিদ্যমান সুবিধাদি এই লক্ষ্যে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করতে হবে।

৫৯। **মাঝারি স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীঃ** তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নার্স এবং ধাত্রীদের মৌলিক প্রশিক্ষণের কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হাতে নেয়া হবে। প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হবে। গণস্বাস্থ্যের নার্স এবং সাহায্যকারী নার্স-ধাত্রীসহ সকল শ্রেণীর নার্সদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হবে। ১৯৯০ সাল নাগাদ প্রতি ৪টি হাসপাতাল শয্যাপিছু কমপক্ষে ১জন নার্স-এর অনুপাত অর্জন করতে হবে এবং এর অর্থ হচ্ছে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় খাতে কেবলমাত্র হাসপাতাল সার্ভিসের জন্য বর্তমান ৬,৫০০ নার্সের বিপরীতে ১৯৯০ সাল নাগাদ কমপক্ষে ১০,২০০ নার্স প্রয়োজন হবে।

গ্রন্থাগার ... এই.গ...

৬০। ৮টি মেডিক্যাল সহকারী প্রশিক্ষণ স্কুলে বর্তমানে বার্ষিক ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ২৪০ জন। ১৯৯০ সালের জন্য মেডিক্যাল সহকারী তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৪,৬০০ জন। আরোগ্যকারী ভূমিকার চেয়ে ইপিআই, এমসিএইচ এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীতে মেডিক্যাল সহকারীদের সেবা কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৬১। পরীক্ষাগার টেকনিসিয়ান, রেডিওগ্রাফার, ফার্মাসিষ্ট, স্বাস্থ্য ও স্যানিটারী পরিদর্শক, ডেন্টাল টেকনিশিয়ান, রেডিওথেরাপী টেকনিশিয়ান ও ফিজিওথেরাপী টেকনিশিয়ানদের মত প্যারামেডিক্যাল লোকজনদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে পুনর্বিবেচনা ও পুনর্নির্ধারণ করা হবে। রেডিওগ্রাফার, ডেন্টাল টেকনিশিয়ান এবং পরীক্ষাগার টেকনিশিয়ানদের ব্যাপক ঘাটতির প্রেক্ষিতে কতিপয় নির্বাচিত মেডিক্যাল সহকারী প্রশিক্ষণ স্কুলে এসব শ্রেণীর কর্মীদের জন্য জরুরী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেয়া হবে। প্যারামেডিক্যাল টেকনিশিয়ান এবং মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান এবং মেডিক্যাল সহকারীদের চাকুরীর সুযোগ এবং পেশা সৃষ্টির ব্যাপারে উপযুক্ত ভাবনা চিন্তা করা হবে।

৬২। **মৌলিক স্বাস্থ্য কর্মীঃ** তৎপরতার উচ্চমান বজায় রাখা এবং তাদেরকে নতুন উন্নয়নের সাথে পরিচিত রাখার জন্য নিয়মিতভাবে পিএইচসি কর্মীদের জন্য বিরতিহীন শিক্ষা কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হবে। স্বাস্থ্য সহকারী এবং অনুরূপ অন্যান্য শ্রেণীর মৌলিক স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে এবং চাকুরীকালীন মাঠস্তরের অনুশীলন ক্ষেত্র উন্নীত করা হবে। তদারককারী স্তরের কর্মী, ইপিআই টেকনিশিয়ান এবং তাদের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণও জোরদার করা হবে। স্যানিটারী পরিদর্শকদের মত একই ভাবে স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিক করা হবে। এমওএইচপিসির জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন শাখার অধীনে এক বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় ঐতিহ্যবাহী প্রসবকালীন পরিচর্যাকারীনিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৬৩। বর্তমানে উপজেলা ও তার নীচের স্তরে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসকে একীভূত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একীভূত হতে হলে এমওএইচপিসির দুই শাখার মাঠস্তরের কর্মীদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিৎ নয় এবং তাদের সকলকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এই উভয় সার্ভিসের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণের বিদ্যমান সমস্যাগুলো সতর্কতার সংগে এবং ধারাবাহিকভাবে অপসারন করতে হবে।

৬৪। স্বাস্থ্য চাহিদার স্থানীয় ধারণার সাথে বৈজ্ঞানিক বিচারের সংঘাত থাকতে পারে, কিন্তু তাদেরকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা চলবে না। যদি স্থানীয়ভাবে স্বাস্থ্য বিষয়ক কোন সমস্যা সম্পর্কে উদ্বেগ অথবা তা সমাধানের আগ্রহ না থাকে, তবে প্রদত্ত সেবা জনগণ গ্রহণ করবে না। উদাহরণস্বরূপ, টিকাদান অথবা জন্মনিয়ন্ত্রণের মত প্রতিষেধকমূলক প্রদত্ত সেবা আরোগ্যকারী সেবার মত ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য না হতে পারে, কারণ জনগণ এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক লাভ দেখতে পায় না। আরোগ্যমূলক সেবার ব্যবস্থা করে স্বাস্থ্যকর্মীদের আস্থা অর্জন করতে হবে। তবে তারা যদি নিজেদের আরোগ্যমূলক ভূমিকার মধ্যেই শুধু আবদ্ধ রাখে তবে তা হবে দুর্ভাগ্যজনক। এধরণের পরিস্থিতিতে প্রতিষেধকমূলক তৎপরতায় কি কি সুবিধা অর্জিত হতে পারে সে সম্পর্কে সম্প্রদায়কে এবং সেই সংগে স্বাস্থ্য কর্মীদেরকে সতর্কতার সাথে শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে সম্প্রদায়কেই সম্প্রদায় স্বাস্থ্য কর্মী ও স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীদের সংগঠিত করতে হবে এবং তারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা তৎপরতার মৌলিক প্রশিক্ষণের সাথে পরিচিত থাকবে।

হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ

৬৫। বিদ্যমান আটটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য বিশেষ ধরণের হাসপাতালসমূহের আরও উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোর প্রতিটিতে ১,০৫০টি করে শয্যা থাকবে। অন্য দু'টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে এমনভাবে উন্নীত

করা হবে যাতে প্রতিটিতে অত্যাবশ্যকীয় বিশেষজ্ঞ ইউনিটসহ কমপক্ষে ৭৫০টি শয্যা থাকে, যা বর্তমানে নেই। কতিপয় বিশেষজ্ঞ সার্ভিসসহ শহীদ সোহরাওর্দী সাধারণ হাসপাতালকে একটি পূর্ণাংগ ৫০০ শয্যার হাসপাতালে রূপান্তর করা হবে। আইসিডিডিআর শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে। বিশেষ রোগনিরূপক ও চিকিৎসাবিষয়ক সার্ভিসের জন্য ছ'টি বড় হাসপাতালে নিউক্লিয়ার মেডিসিন সংস্থা যুক্ত করা হবে।

৬৬। বর্তমান ইউনিটকে উন্নীত করে রংপুরে একটি ১০০ শয্যার যক্ষ্মা ও বক্ষব্যাধি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে। চকবাজার (ঢাকা) ও খুলনায় একটি করে দুটি ১০০ শয্যার শিশু হাসপাতাল এবং ঢাকায় আইপিজিএমএণ্ড আর এর চত্বরে আর একটি ২০০ শয্যার আধুনিক শিশু হাসপাতাল পরিকল্পনা কালে প্রতিষ্ঠা করা হবে। ফরিদপুর সদর হাসপাতাল উন্নীত করে মোট ২৫০টি শয্যার ব্যবস্থা করা হবে। বৃহত্তর হাসপাতালসমূহে আঘাতজনিত ঘটনাসমূহের চিকিৎসা সুবিধাদির ব্যবস্থা করা হবে।

৬৭। সামগ্রিকভাবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকারী খাতে ৯,৮৭৩টি নতুন হাসপাতাল শয্যা যুক্ত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, যাতে স্বাস্থ্য সার্ভিসের অধীন হাসপাতাল শয্যার সংখ্যা ১৯,৬৬১টি থেকে ১৯৯০ সাল নাগাদ ২৯,৫৩৪টিতে বৃদ্ধি পায়। মোট শয্যার মধ্যে ১২,২৩১টি হবে উপজেলা স্তরে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়, এনজিও এবং বেসরকারী খাতের অধীন হাসপাতাল শয্যা ৭,৯৭৬ থেকে ১৯৯০ সালে ১১,২০০তে বাড়বে বলে হিসেব করা হয়েছে। এভাবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ নাগাদ দেশে মোট ৪০,৭৩৪টি হাসপাতাল শয্যা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে, এতে শয্যা ও জনসংখ্যার অনুপাত দাঁড়াবে ১:২৭১২।

অন্যান্য সাধারণ কর্মসূচীসমূহ

৬৮। এই ক্ষেত্রের কর্মসূচীসমূহ সাধারণভাবে জাতীয় স্তরের প্রশাসনসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পরিচালিত। একটি কর্মসূচীর আওতায় স্বাস্থ্য সার্ভিসসমূহের মহা-পরিচালকের সদর দপ্তর নির্মাণ করা হবে যা বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে ভাড়া করা অবস্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। হাসপাতাল সংলগ্ন নার্স কোয়ার্টার নির্মাণের কাজও হাতে নেয়া হবে।

ঘূর্ণিঝড় পুনঃনির্মাণ কর্মসূচী

৬৯। ঘূর্ণিঝড় এলাকাসমূহে বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য খাতের অধীনে ৩৯০'০০ লাখ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে নিম্নলিখিত কাজ চিহ্নিত করা হয়েছে:

(১) হাতিয়ায় একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা।

(২) আমতলীতে একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা।

(৩) ঘূর্ণিদুর্গত এলাকাসমূহের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতালসমূহের ২য় তলায় ১টি করে ১৬টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়স্থল নির্মাণ।

৭০। ক্রমিক নং (১) ও (২)-এর কর্মসূচীসমূহ "নতুন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহ সংস্থাপন" শিরোনামে এক ব্যাপক কর্মসূচীর অধীনে বাস্তবায়িত হবে এবং ক্রমিক নং (৩) বাস্তবায়নাধীন "উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহ" ও "মহকুমা হাসপাতালসমূহের আধুনিকায়ন" প্রকল্পসমূহের অধীনে বাস্তবায়িত হবে। নতুন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের নকশা এমনভাবে করা হবে যাতে এই কমপ্লেক্সসমূহ প্রয়োজনের মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

অর্থ বরাদ্দ

৭১। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থ যোগানোর জন্য ৫৫০ কোটি টাকা (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে) বরাদ্দ করা হয়েছে। এই মোট বরাদ্দের মধ্যে ৩৫টি স্থানান্তরিত প্রকল্পের জন্য ২৪০.৩৪ কোটি টাকা আলাদা করে রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের কর্মসূচীতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা তৎপরতাকে মোট বরাদ্দের ৭৩.৬ শতাংশসহ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কর্মসূচীভিত্তিক বরাদ্দ সারণী ২-এ দেয়া হলো। উপরোল্লিখিত বরাদ্দ ছাড়াও বেসরকারী খাতে পলি ক্লিনিক, এক্স-রে ক্লিনিক, রোগনিরূপণ পরীক্ষাগার, নার্সিং হোম, বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উন্নয়নের মত কর্মসূচীতে ৫০.০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সারণী ১

প্রধান নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

ক্রমিক নং	স্বাস্থ্য নির্দেশক	একক	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪/৮৫ (প্রকৃত)	১৯৮৯/৯০ (লক্ষ্যমাত্রা)
১	২	৩	৪	৫	৬
স্বাস্থ্যের অবস্থা					
১।	সদ্যোজাত শিশু মৃত্যু ..	প্রতি ১০০০ (জীবিত জন্ম)	১৪০	১২৫	১০০
২।	শিশু মৃত্যু	প্রতি ১০০০ (১ হতে ৫ বছর)	২৪	২২	১২
৩।	প্রসুতি মৃত্যু	প্রতি ১০০০ (জীবিত জন্ম)	৭	৬	৪
৪।	স্থূল জন্ম হার	প্রতি ১০০০ (জনসংখ্যা)	৪৩.২৫	৩৯.০০	৩১.০০
৫।	স্থূল মৃত্যু হার	প্রতি ১০০০ (জনসংখ্যা)	১৬.৭৫	১৫.০০	১১.০০
৬।	জনসংখ্যা বৃদ্ধি ..	প্রতি বছর (শতাংশে)	২.৬৫	২.৪০	১.৮০
৭।	জন্মকালে আয়ুষ্কাল ..	বছরে	৪৭	৫০	৫৪
স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান					
৮।	হাসপাতাল শয্যাসমূহ ..	ক্রমবর্ধমান সংখ্যা	২১,১৪১	২৭,৬৩৭	৪০,৭৩৪
	(ক) স্বাস্থ্য সার্ভিস ..	ঐ	১৫,৩৪৩	১৯,৬৬১	২৯,৫৩৪
	(খ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়, এনজিও এবং বেসরকারী খাত।	ঐ	৫,৭৯৮	৭,৯৭৬	১১,২০০
৯।	জনসংখ্যা প্রতি হাসপাতাল শয্যা	ঐ	৪,১৬৮	৩,৫৮৯	২,৭১২
১০।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ..	প্রতি গ্রামীণ উপজেলায় একটি	২৯০	৩৪১	৩৯৭

সারণী ১ (ক্রমশঃ)

ক্রমিক নং	স্বাস্থ্য নির্দেশক	একক	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪/৮৫ (প্রকৃত)	১৯৮৯/৯০ (লক্ষ্যমাত্রা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১১।	(ক) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউ এইচ এফডব্লিউসি) ..	প্রতি ইউনিয়ন একটি	১,৭৭৩	২,৩২৯	৪,৫০০
	(খ) সম্প্রদায় ভিত্তিক সেবার জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র (নিজ খরচে)	প্রায় ৫,০০০ লোকের জন্য একটি।	..	..	৩৯৭
১২।	প্রতিষেধক টিকাদান :				
	(ক) যক্ষ্মা	১৫ বছরের নিচে আওতায় আনা হয়েছে (% হিসেবে)	৫০	৬০	৯০
	(খ) ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি ও ধনুষ্টংকার।	২ বছরের নীচে টিকা দেয়া হয়েছে (% হিসেবে)	১	২	৮০
	(গ) হাম ..	আওতাধীন (% হিসেবে)	..	০.৮	৮০
	(ঘ) পলিওমাইলিটিস ..	ঐ	..	২	৮০
১৩।	উদরাময়াদি রোগ নিয়ন্ত্রণ ..	% ওআরএস বিতরণের আওতাধীন।	৫	৫০	৯০
১৪।	যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ	% প্রাক্কলিত মোট রোগীর রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসা।	১০	১৩	৩৫
১৫।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী/প্রসবকালীন পরিচর্যাকারিনী দ্বারা প্রসব।	% প্রসব পরিচর্যা করা হয়েছে।	২	৫	৫০
১৬।	প্রসব পূর্বকালীন পরিচর্যা ..	% প্রসূতি মহিলাকে কমপক্ষে একবার পরিচর্যা দেয়া হয়েছে	১০	১৫	৫০
১৭।	অন্ধত্ব প্রতিরোধ ..	৬ বছরের নীচে শিশুরা এ ভিটামিন ক্যাপসুল পাচ্ছে (% হিসেবে)	৬০	৭৫	৯০
১৮।	গলগণ্ড নিয়ন্ত্রণ ..	% প্রতিরোধের আওতায় আনা হয়েছে।	২০	৩০	১০০
১৯।	পুষ্টি সেবা ..	% ২য়/৩য় ডিগ্রির অপুষ্টি-জনিত ঘটনার সন্ধান ও চিকিৎসাদান (% হিসেবে)।	৫	৫	৩০

সারণী ১০·(ক্রমশঃ)

ক্রমিক নং	স্বাস্থ্য নির্দেশক		একক	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪/৮৫ (প্রকৃত)	১৯৮৯/৯০ (লক্ষ্যমাত্রা)
১	২		৩	৪	৫	৬
২০	জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতাধীন আনা।		জনসংখ্যার (% হিসেবে)	২৫	৩০	৬৫
সাহায্যকারী সার্ভিসসমূহ						
২১	অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ এবং টিকা		সরকারী স্বাস্থ্য সার্ভিসের জন্য প্রাপ্ততা (মোট প্রয়োজনের%)।	১০	২৫	৬০
২২	অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, টিকা, ওআরএস এবং আই ভি ফ্লুইড উৎপাদন।		মিলিয়ন টাকা মূল্যে	১৫	৮০	৩০০
২৩	স্বাস্থ্য পরীক্ষাগার সার্ভিস :					
	(ক) ইউএইচসি-তে সাধারণ ক্লিনিক্যাল রোগ নিরাপক পরীক্ষাগার সুবিধাদি।		আওতায় %	২০	২৫	১০০
	(খ) জেলা পরীক্ষাগার সুবিধাদি		ঐ	২০	২৫	৬০
	(গ) ইউএইচএফডব্লিউসি-তে সাধারণ পরীক্ষাসমূহ।		ঐ	..	৫	২৫
২৪	ইউএইচসি-তে এক্সরে সুবিধাদি		ঐ	১০	২০	৬০
২৫	জেলা হাসপাতালসমূহে রক্ত সঞ্চালন সার্ভিস		ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যায়	..	২০	৬৪
স্বাস্থ্য জনশক্তি						
২৬	স্নাতক ডাক্তার	..	ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যায়।	১১,০০০	১৬,০০০	২২,৫০০
২৭	স্নাতকোত্তর ডাক্তার	..	ঐ	৬৩১	১,০৫০	২,১০০
২৮	দন্ত চিকিৎসক	..	ঐ	২৬২	৫১০	৭৫০
২৯	মৌলিক নার্স/ধাত্রী	..	ঐ	২,৭০০	৬,৫০০	১০,২০০
৩০	মেডিক্যাল সহকারী	..	ঐ	৪৫০	৩,৬০০	৪,৬০০
৩১	ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান	..	ঐ	১,১০০	১,৩৫০	২,০০০
৩২	রেডিওগ্রাফার	..	ঐ	১৯০	৩৫০	৭০০
৩৩	ফার্মাসিষ্ট (ডিপ্লোমা)	..	ঐ	৫,২০০	৫,৮০০	৮,৫০০
৩৪	স্বাস্থ্য স্যানিটারী পরিদর্শক	..	ঐ	৯৩০	১,২৬৫	১,৫০০
৩৫	সহকারী স্বাস্থ্য ইন্সপেক্টর	..	ঐ	১,৩৫০	১,৮৭০	৪,৫০০
৩৭	স্বাস্থ্য সহকারী	..	ঐ	১২,৩৯০	১৫,০০০	২৩,০০০

সারণী ২

কর্মসূচী-ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচী		বরাদ্দ	মোট বরাদ্দ বিতরণের হার
১		২	৩
(ক) পিএইচসি ও সহায়ক সার্ভিস	..	২৭৫.০৮	৫০.০২
(খ) পিএইচসি সহায়তাকারী কর্মসূচীসমূহ	..	১২৯.৫৭	২৩.৫৬
(গ) স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন	..	৫৫.৮৩	১০.১৫
(ঘ) হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ	..	৮০.৪৩	১৪.৬২
(ঙ) সাধারণ ধরনের কর্মসূচীসমূহ	..	৯.০৯	১.৬৫
	মোট ..	৫৫০.০০	১০০.০০

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা

বাংলাদেশ একটি অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও অধিক। ১৯৮৫ সালের মধ্যভাগের হিসাবানুযায়ী বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ছিল ১০০'৫ মিলিয়ন। তখন প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা ছিল গড়ে ১,৮০৮ জন। প্রতি হাজারে স্থূল জন্ম ও মৃত্যু হার ছিল যথাক্রমে ৩৯ ও ১৫, ফলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ২'৪%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ হার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করছে। প্রথমতঃ একই পরিমাণ জমি থেকে অধিক খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্যে মাথাপিছু যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন যা এমনিতেই কম এবং তা ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে আরও হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে পল্লী এলাকায়, যেখানে স্বাভাবিক জন্ম হার বেশী ও কৃষি ব্যতীত অন্য সুযোগ সীমিত, সেখানে ভূমিহীন ও দরিদ্রের সংখ্যা বাড়ছে। দ্বিতীয়তঃ কর্মোপযোগী লোকের সংখ্যা প্রতি বছর প্রায় ১'৫ মিলিয়ন হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যার জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের দরকার হবে; এতে বেকার সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয়তঃ দ্রুত বর্দ্ধমান জনসংখ্যা যার ৪৬ শতাংশ ১৫ বছরের নীচে; অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতির সকল কর্ম প্রচেষ্টাকে দারুনভাবে বাধা দিচ্ছে কারণ ভোগের জন্য প্রাপ্ত সীমিত সম্পদের উপর এই অংশের দাবী অধিক। এই সবের কারণে জনগণের একটি বিরাট অংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে জীবন যাত্রা নির্বাহে বাধ্য হচ্ছে। দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধির আরও অসুবিধা রয়েছে। যেমন শিক্ষার বর্তমান নিম্নহার এবং শহরগামী জন-স্রোতের বর্তমান ধারা বজায় রাখতে হলেও বর্দ্ধিত বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্যে প্রয়োজন শিক্ষার পরিবেশ ও সুবিধার সম্প্রসারণ। সংক্ষেপে বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যাগুলোর মধ্যে অধিক বেকারত্ব, উচ্চ নির্ভরশীলতা অনুপাত ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্রই অন্যতম।

২। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার সমস্যা তাই ষাটের দশকের প্রথম দিকে সমাজকর্মী এবং পরিকল্পনাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর তখন থেকেই উন্নয়নের একটি কর্মকৌশল হিসাবে সরকার পরিবার পরিকল্পনা ভিত্তিক কার্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে দুটি আদমশুমারীর কাজ শেষ হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও এ দুটি আদমশুমারীর ফলাফল থেকে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী ইতিমধ্যেই সুফল দিতে শুরু করেছে। ১৯৬১ হতে ১৯৮১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২'৭% থেকে হ্রাস পেয়ে ২'৩৭-এ দাঁড়িয়েছে।* বর্তমানে চালু একটি ধারাবাহিক জনসংখ্যা সংক্রান্ত জরিপে আরো দেখা যায় যে, সন্তান উৎপাদন হার যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে এবং অপরদিকে মহিলাদের বিয়ের বয়সসীমা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই গতিধারার দুর্বল দিক হচ্ছে এই যে, পল্লী অঞ্চল অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত হওয়া সত্বেও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সাধিত অগ্রগতি পল্লীবাসী ও শহরবাসীদের মধ্যে অসমতার সৃষ্টি করেছে। জনসংখ্যার আকার ও এর বৈশিষ্ট্য, যথা অশিক্ষা, বেকারত্ব, আধা-বেকারত্ব, পুত্র সন্তানের প্রতি অধিক আকর্ষণ, অল্প বয়সে বিবাহ ইত্যাদিসহ পরিবার পরিকল্পনামূলক সেবা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর অসুবিধা ইত্যাদি পল্লী এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব অসুবিধা থাকা সত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান উচ্চ হার (২'৪%) প্রতিহত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। অন্যথায় শুধু যে অর্থনৈতিক উন্নয়নই ব্যাহত হবে তা নয়, অত্যধিক জনসমষ্টির চাপে জমির ভার বহনকারী ক্ষমতাও ভেংগে পড়বে। ফলে বর্তমানের অবনতিশীল আর্থ-সামাজিক দৃশ্যপট আরো মারাত্মক আকার ধারণ করবে।

---

*উল্লেখিত হারসমূহ ১৯৬১—৭৪ (২'৭%) এবং ১৯৭৪—৮১ (২'৩৭%) এর আন্তঃশুমারী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকে উদ্ধৃত।

অতীত অগ্রগতি পর্যালোচনা

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

৩। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হারকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এর প্রতিরোধের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৯০ সালের মধ্যে নীট পুনরুৎপাদন হার (এন আর আর) ১ এ উপনীত হওয়ার দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যকে সামনে রেখে দ্বিতীয় পরিকল্পনার জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচী ছিল স্থুল জন্ম হার প্রতি হাজারে ৪৩ থেকে ৩২-এ হ্রাস করা। সাথে সাথে স্থুল মৃত্যু-হার ১৭ থেকে ১৪-এ এবং জনসংখ্যা স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ২.৭% থেকে ১.৮% এ নেমে আসবে বলে অনুমান করা হয়। জনসংখ্যা বিষয়ক উপরোক্ত পরিবর্তনের লক্ষ্যে গর্ভনিরোধক কৌশলের ব্যবহারে সক্ষম দম্পতির হার ৩৭.৫% ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা দরকার ছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্য

৪। সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হ্রাস না পেলেও সাম্প্রতিক কর্মসূচীর ধারা থেকে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে দেশে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতার নাটকীয় হ্রাস পরিলক্ষিত হবে। সাম্প্রতিক অতীতে গর্ভনিরোধ পদ্ধতির কৌশলের ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৭৯ সালে সক্ষম দম্পতির ১২.৭% ভাগ, ১৯৮১ সালে ১৮.৬%, ১৯৮৩ সালে ২১.৭% এবং মধ্য ৮৫তে ২৫% ভাগ এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিককালে গর্ভনিরোধ ব্যবহারের এই ক্রমবর্ধমান ধারা স্বাধীন জরীপের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। এই ধারা সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাসে আমাদের প্রচেষ্টার একটা যুগান্তকারী ঘটনা। স্থুল জন্মহার ১৯৮৫ সালের মধ্যভাগে ১৯৮০ সালের ৪৩ হতে ৩৯ এ হ্রাস পেয়েছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৭% থেকে ২.৪% এ নেমে এসেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গর্ভনিরোধক পন্থা ব্যবহারের অগ্রগতি

৫। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অর্জিত লক্ষ্যের শতকরা হারসহ গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারের বছর-ওয়ারী সাফল্য নীচের ১নং সারণীতে দেখানো হল:

সারণী ১

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন গর্ভনিরোধক পন্থার অগ্রগতি

[সংখ্যা লাখে]

পন্থা	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫
বন্ধ্যাকরণ ..	২·৫৮৮ (৬৫·২%)	৩·০২৯ (৫৮·৬%)	৩·৬৩১ (৫৪·৭%)	৫·৫২১ (৭২·২%)	৪·৯১৬ (৫৩·৫%)
জরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতি (আই ইউ ডি)।	০·৪১৬ (৪২·৯%)	০·৮৩৭ (৫২·৩%)	১·১৭৭ (৭২·৭%)	৩·০১১ (১৬৩%)	৪·৩২৪ (১৫৩·৩%)
খাবার বড়ি ..	৮১·৩৭৭ (৪৬%)	৭৭·৫১৩ (৩৭%)	৮২·৫৭৯ (৩৫%)	৯৭·২৫৭ (৩৮·২%)	১১৫·৫২৮ (৪৩·৫%)
কনডম ..	৮৭১·১১৮ (৭৫·৮)%	৯৩২·৩০৪ (৬৫·৭%)	১১৬৮·২১৪ (৭৩·১%)	১৩১০·৯৬৪ (৭২·১%)	১৫১৯·৯৮ (৭৯·৫%)
সুচি প্রয়োগ (ইনজেকটিবল)	১·১২০ (৩২·৯%)	০·৮১১ (২৪·৬%)	০·৭২৭ (১৭·৯%)	১·২২৫ (২৫·৩%)	১·৬৬০ (২৯·২%)
এমুকো ..	০·৬০৮ (১৭·৯%)	০.৬৩৫ (১৯·৩%)	০.৬৯৬ (১৭·২%)	০·৬৪৩ (১১·৩%)	০·৭১৮ (১২·৭%)
ফেনা বড়ি ..	৫০·১১১ (৩৯·৩%)	৪১·২৫৯ (৩১·৪%)	৫৪·০৪৪ (৩৫·৬%)	৪৩·৮৪৭ (২৪·২%)	৩২·২২২ (১৫·১%)
অন্যান্য পদ্ধতি ..	০·২৮০ (—)	০·৪৩৪ (—)	০·৫৮৫ (—)	০·৫৬৭ (—)	০·৬৮৬ (—)

(বন্ধনী মধ্যস্থিত সংখ্যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অর্জিত সাফল্য বুঝায়)

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আর্থিক অগ্রগতি

৬। পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে মোট ৩১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ বরাদ্দ সরকারী খাতে মোট পরিকল্পিত বরাদ্দের ২.৮% ভাগ। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রদত্ত বিগত পরিকল্পনার আর্থিক বরাদ্দ ও তার প্রকৃত ব্যবহার ২নং সারণীতে দেখানো হয়েছে:

সারণী ২

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বছরভিত্তিক আর্থিক বরাদ্দ

[কোটি টাকায়]

বছর		মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	জনসংখ্যা খাতে এডিপি বরাদ্দ	জনসংখ্যা খাতে বরাদ্দ মোট বরাদ্দের অংশ (%)	জনসংখ্যা খাতে প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দের অংশ (%)
১৯৮০/৮১	..	২,৩৬৯	৬৯.৬৪	২.৯	৪৭	৬৭
১৯৮১/৮২	..	২,৭১৫	৮৬.২৮	৩.২	৪০	৪৬
১৯৮২/৮৩	..	৩,১২৬	৮৫.৬৫	২.৭	৭১	৮৩
১৯৮৩/৮৪	..	৩,৫৮৫	১০৬.৯২	৩.০	৮৬	৮০
১৯৮৪/৮৫	..	৩,৪৯৮	১১১.০১	৩.২	১০২	৯২
মোট:	..	১৫,২৯৩	৪৫৯.৫০*	৩.০	৩৪৬	৭৫

*এই টাকার মধ্যে কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসমূহের জন্য বরাদ্দ রয়েছে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

৭। অতীত অগ্রগতি ছাড়াও কতিপয় কর্মসূচীমূলক ও আর্থ-সামাজিক উপাদানের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এমন কতকগুলো অবস্থা সৃষ্টি করবে বলে প্রতীয়মান হয় যা ভবিষ্যতে জন্মহার হ্রাসের উপযোগী হবে। সেগুলো হলো:

(ক) জনসংখ্যা সমস্যা সম্বন্ধে অধিকতর স্পষ্ট ধারণা এবং পরিবার পরিকল্পনা ও তার পন্থা সম্পর্কে বৃহত্তর জ্ঞান,

(খ) সাম্প্রতিক জরিপগুলোতে ২টি জিনিস উদঘাটিত হয়েছে। এক, বাঞ্ছিত পরিবারের আকারের স্তরে হ্রাসমান ধারার ইংগিত এবং দুই, গর্ভনিরোধ পন্থার চাহিদা বৃদ্ধি,

(গ) অধিকতর জনগোষ্ঠিকে পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধার আওতাভুক্তকরণ,

(ঘ) শিশু মৃত্যু হার হ্রাসকল্পে মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ। সেই সংগে অনাক্রম্যতা, খাবার স্যালাইন তৈরী ও সনাতন ধাত্রীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ এবং সমন্বয় সাধনের জন্য একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান স্থাপন,

(ঙ) পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও তার অনুগামী যত্নের গুণগত মানোন্নয়ন,

(চ) পরিবার পরিকল্পনা কর্মী ও জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধিকরণ,

(ছ) মহিলাদের কর্ম তৎপরতার ন্যায় বহুবিধ খাতওয়ারী কর্মসূচীর ব্যাপক সম্প্রসারণ,

(জ) উচ্চ পর্যায়ের একটি রাজনৈতিক অংগীকার এবং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠির বৃহত্তর অংশ গ্রহণ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
জনসংখ্যা বিষয়ক লক্ষ্যসমূহ

৮। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হারের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবন করে এই উচ্চ হারের আমূল হ্রাস-করণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল সম্পদ বিনিয়োগ করা ব্যতীত জাতির নিকট কোন বিকল্প নেই। স্থিতিশীল জন্ম ও মৃত্যু হার থেকে শুরু করে দ্রুত জন্ম ও মৃত্যু হার হ্রাস পর্যন্ত জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় আটটি বিকল্প দৃশ্যপটের বিষয় পর্যালোচনা করার পর বর্তমান শতাব্দীর শেষে এন আর আর-১ অর্জন করার জন্য অত্যন্ত দ্রুত জন্মহার হ্রাস এবং ধীর মৃত্যুহার হ্রাসের পথকে তৃতীয় পরিকল্পনার উন্নয়ন কর্মসূচীর ভিত্তি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

৯। বিভিন্ন গর্ভনিরোধ পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় মাত্রাসহ প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসের বাৎসরিক লক্ষ্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নীচের ৩ নং সারণীতে দেখানো হয়েছে:

সারণী ৩

প্রয়োজনীয় গর্ভনিরোধ পদ্ধতিসহ তৃতীয় পরিকল্পনার পরিকল্পিত জনসংখ্যার আকার, জন্ম, মৃত্যু ও বৃদ্ধিহার।

বছর	বছরের মধ্যবর্তী জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	বছরের প্রারম্ভিক জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	বছরের মধ্যবর্তী স্থূল জন্ম হার	বছরের মধ্যবর্তী স্থূল মৃত্যু হার।	জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার	গর্ভনিরোধ পদ্ধতির হার	গর্ভনিরোধ পদ্ধতি ব্যবহারের সক্ষম দম্পতির সংখ্যা (সহস্রে)
১৯৮৫	১০০˙৫	৯৯˙২	৩৯˙০	১৫˙০	২˙৪	২৫˙০	৪১˙৯৫
১৯৮৬	১০২˙৯	১০১˙৭	৩৭˙৬	১৪˙৪	২˙৩	২৮˙০	৪৯˙১০
১৯৮৭	১০৫˙২	১০৪˙১	৩৬˙২	১৪˙১	২˙২	৩১˙০	৫৬˙৫১
১৯৮৮	১০৭˙৪	১০৬˙৩	৩৩˙৮	১৩˙৯	২˙০	৩৪˙০	৬৪˙৪৪
১৯৮৯	১০৯˙৫	১০৮˙৫	৩২˙৪	১৩˙৭	১˙৯	৩৭˙০	৭২˙৮০
১৯৯০	১১১˙৫	১১০˙৫	৩১˙০	১৩˙৪	১˙৮	৪০˙০	৮১˙৫৯

স্থূল জন্ম হার প্রতি হাজারে বর্তমানের ৩৯ জন থেকে ১৯৯০ সালে ৩১-এ হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সময়ে স্থূল মৃত্যু হার, স্বাস্থ্যগত পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে ১৫ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৩˙৪-এ দাঁড়াবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২˙৪ থেকে কমে ১˙৮-এ দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হয়েছে। জনসংখ্যা বিষয়ক এই পরিবর্তনের জন্য গর্ভনিরোধ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ১৯৮৫ সালের ২৫% হতে বৃদ্ধি করে ১৯৯০ সালে ৪০% এ উন্নীত করা দরকার। মোট কথা গর্ভনিরোধ পদ্ধতি ব্যবহারকারী সক্ষম দম্পতির সংখ্যা আগামী পাচ বছরে দ্বিগুণ করতে হবে অর্থাৎ ১৯৮৫ সালের ৪২ লাখ থেকে তা ১৯৯০ সালে ৮২ লাখে উন্নীত করতে হবে।

মাতৃমঙ্গল ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

১০। তৃতীয় পরিকল্পনায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রমের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা। নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়ন এ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

(১) প্রতি হাজার জীবন্ত জন্মে মায়ের মৃত্যু হার ১৯৮৫ সালের ৬ থেকে ১৯৯০ সালে ৪-এ হ্রাস করা ;

(২) প্রতি হাজার জীবন্ত জন্মে শিশু মৃত্যুর হার ১৯৮৫ সালের ১২৫ থেকে ১৯৯০ সালে ১০০-তে নামানো, এবং

(৩) প্রতি হাজার জীবন্ত জন্মে নিওন্যাটাল মৃত্যু হার ১৯৮৫ সালের ৮৫ থেকে ১৯৯০ সালে ৬৫-তে হ্রাস করা।

জনসংখ্যা নীতি, প্রস্তাবনা ও কৌশলাদি:

১১। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধান নীতিমালার মোটামোটিভাবে দু'টি দিক থাকবে: একটি হচ্ছে বর্তমানের অপূরণকৃত চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত গর্ভনিরোধ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা এবং অন্যটি হচ্ছে স্বাস্থ্য এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে নূতন চাহিদা সৃষ্টি করা।

১২। **গর্ভনিরোধ সেবার ব্যবস্থা:** প্রাপ্ত প্রমাণে জানা যায় যে, বর্তমানে গর্ভনিরোধ সেবার চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে অপূর্ণ রয়েছে। গর্ভনিরোধ পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে যেখানে গড়ে ২৫% লোক সাড়া দেবে বলে হিসাব করা হয়েছিল, সেখানে কতিপয় পরীক্ষামূলক কর্মসূচীর আওতায় ৪০% লোক তা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। জনসংখ্যা নীতির তাই প্রধান লক্ষ্য হবে নিম্নলিখিত উপায়গুলোর মাধ্যমে গর্ভনিরোধ সেবা কর্মসূচী আরো শক্তিশালী করা :

(ক) বাসগৃহ ও চিকিৎসা কেন্দ্রের সুবিধাদি দিয়ে উক্ত পদ্ধতির আওতা সম্প্রসারণ ;

(খ) সেবার গুণগত মানোন্নয়ন ও অনুগামী যত্ন নেয়া যাতে পদ্ধতি ব্যবহারকারী হারের গ্রহণযোগ্যতা ও ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পাবে ;

(গ) ফলপ্রসূ জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আই. ই. এম. কার্যসূচী বিশেষ করে গর্ভনিরোধ শিক্ষা শক্তিশালীকরণ ;

(ঘ) বিভিন্ন পদ্ধতির সর্বাধুনিক, নিরাপদ ও ফলপ্রসূ মার্কা ও কৌশলের সাহায্যে গর্ভনিরোধ পদ্ধতির সীমা আরো ব্যাপক করার পদক্ষেপ গ্রহণ ; এবং

(ঙ) ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান, মাঠকর্মীদের কাজের অগ্রগতি ও প্রশিক্ষণসহ জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রমের দক্ষতার উন্নয়ন।

১৩। **স্বাস্থ্য এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যঃ** শিশু মৃত্যু হার হ্রাসকল্পে প্রাথমিক স্বাস্থ্য, মাতৃ মংগল ও শিশু স্বাস্থ্যের উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এতে করে নবজাতকদের বেঁচে থাকার ব্যাপারে মা-বাবারা বেশী আস্থাশীল হবেন।

১৪। **শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞানঃ** জন্মহার হ্রাসকরণ প্রক্রিয়া উন্নত করার উপায় হিসেবে শিক্ষা খাতের নানা রকম শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞানের পর্যায় বৃদ্ধির জোর প্রচেষ্টা চালানো হবে।

১৫। **মহিলা কর্মসূচীঃ** নারী শিক্ষা, সাধারণ শ্রমিক সমাজ এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নারীর অংশ গ্রহণ, ইত্যাদির উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করে নারীকুলের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।

১৬। **সামাজিক অংশ গ্রহণঃ** ছোট পরিবার গঠন, গর্ভনিরোধ কৌশলের সামাজিক বৈধতা, বিলম্বে বিবাহ, নারীমুক্তি, বৃহত্তর সামাজিক জীবনে নারীদের অংশ গ্রহণ, ইত্যাদির সমর্থনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সম্প্রতি গঠিত উপজেলা পরিষদের অধীন পল্লী এলাকায় কার্যকর সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-গুলোর উন্নতি বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এই কাজে জনগণের অর্থপূর্ণ অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কার্যক্রমভিত্তিক যৌথ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হবে।

১৭। **আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাঃ** ছোট পরিবার গঠনের সমর্থনে উৎসাহ এবং বৃহৎ পরিবার গঠনে নিরুৎসাহ প্রদানের বিধানসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। সন্তান উৎপাদন-ক্ষমতা প্রভাবকারী সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন খাতের উন্নয়ন নীতি পর্যালোচনা করে তদনুযায়ী উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হবে।

১৮। **বহুখাতভিত্তিক কার্যক্রমঃ** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্ভাব্য ভূমিকা নির্ণয় করার জন্য বর্তমানে চালু বহুখাতভিত্তিক কার্যক্রম অনুসৃত হতে থাকবে। বিভিন্ন খাতে গৃহীত কর্মসূচীগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক সমন্বয়ের কারিগরী দিক থেকে উপযুক্ত একটি কৌশল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৯। **বেসরকারী সংস্থার ভূমিকাঃ** সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচীর সমর্থনে ও সহযোগীতা প্রদানে বেসরকারী সংস্থাগুলোর ভূমিকা আরো জোরদার করতে হবে।

গর্ভনিরোধক দ্রব্যাদির ব্যবহার

২০। গর্ভনিরোধক সেবার জন্য প্রধান কর্ম-কৌশল হবে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতির পর্যাপ্ত সরবরাহ যাতে যে কোন ব্যবহারকারী তার পছন্দমত পদ্ধতি বেছে নিতে পারে। যদিও বিভিন্ন পদ্ধতির পারস্পরিক মিশ্রণ স্বতঃপ্রবৃত্ত পছন্দের দ্বারা স্থিরীকৃত, তথাপি সঠিক পরিকল্পনার খাতিরেই একটি পদ্ধতি মিশ্রণ পছন্দ করতে হবে। বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত গর্ভনিরোধ পদ্ধতির গতি নীচের সারণীতে দেখানো হয়েছে:

সারণী ৪

বিভিন্ন জরিপে দৃষ্ট গর্ভনিরোধক পদ্ধতি বিতরণের শতকরা হিসাব

পদ্ধতি	বি এফ এস ১৯৭৫	সি পি এস ১৯৭৯	সি পি এস ১৯৮১	সি পি এস ১৯৮৩	বি আই ডি এস ১৯৮৪
বন্ধ্যাকরণ	১০.৪	২৫.৯	২৫.৮	৪০.১	৫১.৬
খাবার বড়ি	৩৫.০	২৬.৪	১৮.৮	১৫.২	১৬.১
কনডম	৯.১	১১.৮	৮.৬	১২.৪	৭.৩
জরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতি ..	৬.৫	১.৬	২.২	৪.৬	১৩.৭
সূচি প্রয়োগ	..	১.৬	২.২	০.৯	১.৬
অন্যান্য	৩৯.০	৩০.৭	৪২.৪	২৬.৮	৯.৭
মোট ..	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট ব্যবহার (সকল দম্পতির %)	৭.৭	১২.৭	১৮.৬	২১.৭	২৪.৮
আধুনিক পদ্ধতির সামগ্রিক ব্যবহার (সকল দম্পতির %)	৪.৭	৮.৯	১১.০	১৬.২	২২.৪

নোটঃ বি এফ এস স্টাডিতে অন্যান্য পদ্ধতির সাথে ইনজেকশন পদ্ধতি এবং যোনীদ্বারে ব্যবহৃত পদ্ধতিকে একীভূত করা হলেও আধুনিক পদ্ধতিসমূহের মোট ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপরের উল্লেখিত প্রবণতা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খাবার বড়ি ব্যবহারের তেমন উন্নতি হয়নি। পর্যাপ্ত কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে এই গতিধারা পাল্টাতে হবে। ধারণা করা হচ্ছে যে, প্রাচীন পদ্ধতির বিনিময়ে জরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতি ও সূচি প্রয়োগের আপেক্ষিক ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে।

২১। সারণী ৫-এ পদ্ধতির বছরওয়ারী হিসাব দেখানো হয়েছে :

সারণী ৫

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন গর্ভনিরোধক পদ্ধতির বছরওয়ারী মিশ্রণ

[শতকরা হার]

পদ্ধতি	১৯৮৩	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৬/৮৭	১৯৮৭/৮৮	১৯৮৮/৮৯	১৯৮৯/৯০
বন্ধ্যাকরণ ..	৪০.০	৪০.৬	৪১.২	৪১.৮	৪২.৪	৪৩.০
খাবার বড়ি ..	১৫.২	১৫.৫	১৬.০	১৬.৫	১৭.০	১৭.৫
কনডম ..	১২.৪	১৩.০	১৩.০	১৩.০	১৩.০	১৩.০
জরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতি	৪.৬	৭.৫	৯.০	১০.৫	১২.০	১৪.০
সুচি প্রয়োগ ..	১.০	১.৩	১.৬	১.৯	২.২	২.৫
অন্যান্য পদ্ধতি	২৬.৮	২২.১	১৯.২	১৬.৩	১৩.৪	১০.০
মোট ..	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

২২। উপরোল্লেখিত পদ্ধতি মিশ্রণের ভিত্তিতে তৈরী বিভিন্ন পদ্ধতির চলতি ও নতুন ব্যবহারকারীর বছরওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা সারণী ৬-এ দেখানো হল :

সারণী ৬

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রা পূরণে বছরওয়ারী নতুন গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণকারীর সংখ্যা

[সংখ্যা হাজারে]

পদ্ধতি	১৯৮৪/৮৫	১৯৮৫/৮৬			১৯৮৬/৮৭			১৯৮৭/৮৮			১৯৮৮/৮৯			১৯৮৯/৯০		
	নিঃ	পুরাঃ	নঃ	নিঃ	পুরাঃ	নঃ	নিঃ	পুরাঃ	নঃ	নিঃ	পুরাঃ	নঃ	নিঃ	পুরাঃ	নঃ	নিঃ
বন্ধ্যাকরণ ..	১৬৭৮	১৫১০	৪৫৯	১৯৬৫	১৭৬৮	৫২৯	২২৯৭	২০৬৩	৫৫১	২৬১৪	২৩৫৩	৬৮৭	৩০২৭	২৭২৪	৭১৯	৩৪৫৯
জরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতি	২৫২	১৫১	২১২	৩৬৩	২১৮	২৮৫	৫০৩	৩০২	৩৫৫	৬৫৭	৩৯৪	৪৬২	৮৫৬	৫১৩	৬১৩	১১২৬
খাবার বড়ি ..	৬২৯	৩১৫	৪৩৫	৭৫০	৩৭৫	৫১৮	৮৯৩	৪৪৭	৫৮৫	১০৩২	৫১৬	৬৯৯	১২১৫	৬০৮	৮০০	১৪০৮
কনডম ..	৫৪৫	২৭৩	৩৫৭	৬৩০	৩১৫	৪১০	৭২৫	৩৬৩	৪৫০	৮১৩	৪০৭	৫২১	৯২৮	৪৬৪	৫৭৮	১০৪২
সূচি প্রয়োগ ..	৪২	২৮	৩৫	৬৩	৪২	৪৭	৮৯	৬০	৫৯	১১৯	৮০	৭৭	১৫৭	১০৫	৯৬	২০১
অন্যান্য ..	১০৪৯	৫২৫	৫৪৪	১০৬৯	৫৩৪	৫৩৬	১০৭০	৫৩৫	৪৮৫	১০২০	৫১০	৪৪৭	৯৫৭	৪৭৯	৩২৫	৮০৪
মোট ..	৪১৯৫	২৮০২	২০০৮	৪৮৪০	৩২৫২	২৩২৫	৫৫৭৭	৩১১০	২৪৮৫	৫৭৫৫	৪২৬০	২৮৫৩	৭১৪০	৪৮৯৩	৩০৯৭	৮০৪৪
খাবার বড়ির চাহিদা (মিলিয়ন চক্র)	৯·৪৩	..	..	১১·২৫	..	..	১৩·৪০	..	..	১৫·৪৮	..	..	১৮·২২	..	..	২১·১২
কনডম (মিলিয়ন টুকরো) ..	৮১·৭৫	..	..	৯৪·৫০	..	..	১০৮·৭৫	..	..	১২১·৯৫	..	..	১৩৯·২০	..	..	১৫৬·৩০

(১) নোট : পুরা = পুরাতন, নঃ = নতুন, নিঃ = নিয়মিত

(২) ক্ষয়ক্ষরণ/পরিত্যাগের অনুমিত হার হচ্ছে বন্ধ্যাকরণ ১০%, জরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতি ৪০%, কনডম ও খাবার বড়ি ৫০%, সূচি প্রয়োগ ৩৩% এবং অন্যান্য ৫০%।

(৩) ১৫ চক্র বড়ি এবং ১৫০টি কনডম ব্যবহারকে যথাক্রমে রক্ষণের এক দম্পতি বছর হিসেবে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

২৩। তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত জনসংখ্যা কার্যক্রমগুলোর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ (IEM) বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, বহুখাত-ভিত্তিক কার্যক্রম ও অন্যান্য সহায়ক সেবা—যেমন প্রশিক্ষণ, গবেষণা, মূল্যায়ন এবং রিপোর্টিং-এর ব্যবস্থা, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা

২৪। এই সেবার মধ্যে গর্ভনিরোধ পদ্ধতি এবং পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

গর্ভ-প্রতিরোধক সেবা

২৫। বাড়ী বাড়ী খাবার বড়ি, কনডম ও যোনীতে ব্যবহারোপযোগী পদ্ধতি সরবরাহ, নিরাপদ সময়ের উপদেশ প্রদান, প্রত্যাহার ও ক্লিনিকের সুবিধাদির প্রসংগ উল্লেখপূর্বক গর্ভ-নিরোধকের সেবা প্রদান করা হবে। ক্লিনিক কর্তৃক দেয় সেবা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মাতৃমংগল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, সরকারী হাসপাতাল ও মডেল ক্লিনিক এবং সাহায্যকারী ভ্রাম্যমান সার্জিক্যাল টীমসহ মেডিক্যাল কলেজগুলোর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এ ছাড়া খাবার বড়ি, কনডম, সূচি প্রয়োগ, ইত্যাদির সামাজিক বিপণনের (Social Marketing) মাধ্যমেও এই সেবা প্রদান করা হবে। গর্ভ-নিরোধক আধুনিক পদ্ধতির মধ্যে খাবার বড়ি, কনডম, জরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতি, সূচি প্রয়োগ, টিউবেকটমি, ভ্যাসেকটমি, মাসিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি এবং গতানুগতিক পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যাহার, নিরাপদ সময় অনুসরণ ও বুকের দুধ খাওয়ানো উল্লেখযোগ্য।

২৬। **খাবার বড়িঃ** এই বড়ি মাঠ কর্মীদের দ্বারা বিতরণ করা হবে, ক্লিনিকগুলোতে সরবরাহ করা হবে এবং সামাজিক বিপণন কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা হবে। খাবার বড়ি ব্যবহারে বর্তমানের ক্রমাবনতিশীল ধারাকে উল্টিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে খাবার বড়ির সুষ্ঠু সরবরাহ ও আনুষংগিক শিক্ষার উপর পর্যাপ্ত গুরুত্বারোপ করা হবে। এর ফলে খাবার বড়ি বিতরণে মাঠ কর্মীদের ভূমিকা ও দক্ষতা আরো জোরদার করা হবে। এই কর্মসূচীর আওতায় অতি জনপ্রিয় কোম্পানীর খাবার বড়ি, যেমন, কম্বিনেশন-৫ ও অভরাল আমদানী করা হবে এবং ধীরে ধীরে স্বল্পমাত্রা সমন্বিত বড়ি চালু করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

২৭। **কনডমঃ** মহিলাদের বিপরীতে পুরুষদের ব্যবহারোপযোগী একমাত্র পদ্ধতি কনডমের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া আবশ্যক। যে কনডম ব্যবহারকারীদের নিকট সরবরাহ করা হবে তার যথার্থ গুণাগুণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বহিঃ বিভাগ সেবা কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত কনডমের নমুনা নিয়মিত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকবে।

২৮। **জরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতিঃ** এই পদ্ধতি গ্রহণের উচ্চ হার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অনুগামী কার্যাদি সম্পন্ন ও ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য সুবিধাদি প্রদান করা হবে। তাছাড়া অধিকতর কার্যকর ও নিরাপদ ব্র্যাণ্ডের কপার আই ইউ ডি (Copper—T 380 AG এবং Multiload Copper IUD 375) সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হবে।

২৯। **সূচি প্রয়োগঃ** যেহেতু সূচি প্রয়োগ পদ্ধতিগুলো জনপ্রিয় বলে পরিচিত, তাই উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ক্লিনিকগুলোর কর্মচারীবৃন্দের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও পদ্ধতির নিয়মিত যোগান নিশ্চিত করার মাধ্যমে এর ব্যাপক প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে ব্যবহৃত ব্র্যাণ্ড Depo Provera Noristerat এর ব্যবহার এ কর্মসূচীতে অব্যাহত থাকবে।

৩০। **টিউবেকটমি ও ভ্যাসেকটমিঃ** ক্লিনিকের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও ক্লিনিকে দেয় সেবার উন্নতির সাথে সাথে পদ্ধতি দুটির প্রস্তাবিত সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। পদ্ধতি দুটির এই গুণগত মান বজায় রাখা ও এর আরো উন্নতি সাধন করার জন্য ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। এই পদ্ধতির স্বতঃস্ফূর্ত গ্রহণ সম্পূর্ণ নিশ্চিত করার জন্যে অনুপ্রাণিত সম্মতির ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হবে।

৩১। **মাসিক নিয়ন্ত্রণঃ** এটা অনস্বীকার্য যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে মাসিক নিয়ন্ত্রণকে ব্যাপক হারে গ্রহণ করাতে না পারলে জনসংখ্যা বিষয়ক দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য হিসাবে ২০০০ সালের মধ্যে এন আর আর-১ অর্জন করা সম্ভব হবে না। অন্য পদ্ধতির অকৃতকার্যতার কারণে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান একমাত্র মাসিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং ডাক্তার ও সহায়কী কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে মাসিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যাপক সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন এবং দেশের সকল ক্লিনিক ও হাসপাতালে মাসিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সুবিধাদি থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত ও বেসরকারী সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে এই পদ্ধতিকে আরো উন্নত করা উচিত।

৩২। **নরপ্লান্টঃ** দীর্ঘস্থায়ী এই পদ্ধতিতে প্রতিদিন ব্যবহার না করার একটা সুবিধা আছে; যার ফলে এটি আমাদের আধা-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে একটি বিশেষ উপযোগী পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তাই প্রথমে একে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি হিসাবে চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পরে প্রয়োজনবোধে ও অভিজ্ঞতার আলোকে এর ব্যবহার সম্পর্কে বৃহত্তর কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

৩৩। **সামাজিক বিপণন কর্মসূচীঃ** ক্লিনিক সুবিধা বহির্ভূত গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতি প্রাপ্তির ব্যাপারে একটি অতিরিক্ত ধারা হিসাবে এই কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। উন্নত ধরনের বাণিজ্যিক কৌশল অবলম্বন করে সামাজিক বিপণন কর্মসূচী গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতির সার্বিক ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। শহর ও পল্লী এলাকায় ক্লিনিক বহির্ভূত ফলপ্রসু সেবা প্রদান করার জন্য বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে কাজে লাগানো হবে।

শিক্ষা, তথ্য ও উদ্বুদ্ধকরণ (IEM)

৩৪। ছোট পরিবার গঠন ও গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতির প্রতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে এবং মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচীর সাথে পল্লীর বিরাট নারী সমাজকে একাত্মতা করার লক্ষ্যে তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কৌশলাদি প্রণয়ন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে গণ-যোগাযোগ মাধ্যমে, যথা—বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ভ্রাম্যমান সিনেমা ভ্যান এবং মাঠকর্মী ও জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আন্তঃ ব্যক্তি যোগাযোগসহ সকল উপায় গ্রহণ করা হবে। বেতার ও টেলিভিশন কর্তৃক প্রচারিত জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রমগুলোর মানোন্নয়ন করা হবে। প্রতিদিন বেতারে এক থেকে দেড় ঘন্টার এবং টেলি-ভিশনে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ ঘন্টার জনসংখ্যা ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার করার ব্যবস্থা থাকবে।

৩৫। তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকবে। যেমন—পরিবার পরিকল্পনা ও গর্ভ-নিরোধ শিক্ষা, জনসংখ্যা শিক্ষা এবং মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ শিক্ষা।

৩৬। **পরিবার পরিকল্পনা ও গর্ভনিরোধক শিক্ষাঃ** এই শিক্ষার অধীনে ছোট পরিবারের মূল্য, জন্ম সময় দীর্ঘায়িত করার স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক কারণ, বিলম্বিত বিবাহের সামাজিক উপকারিতা, গর্ভনিরোধের বিভিন্ন পদ্ধতি, তাদের দোষ-গুণ সংকেত ও বিরুদ্ধ সংকেত এবং অনুগামী প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেয়া হবে।

৩৭। **জনসংখ্যা শিক্ষাঃ** জনসংখ্যার উচ্চহার এবং জনসংখ্যার ক্রমবর্দ্ধমান আকারের আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ভাবার্থ, জাতীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অধিক জনসংখ্যার কুফল এবং তা দমনে সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। জন্মহারের গতি নেতিবাচক করার জন্য উপযুক্ত কর্মকৌশল উদ্ভাবন ও প্রজনন ক্ষমতার উপর যে সকল আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত উপাদানের সম্ভাব্য প্রভাব আছে সেগুলো অবশ্যই যোগাযোগ কার্যক্রমের মধ্যে বিবেচিত হবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যোগাযোগ কর্মসূচী এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে শিশু জীবিত থাকার ব্যাপারে মাতা-পিতার আস্থা জন্মে, শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়, শিক্ষা ও সাক্ষরতার মূল্যবোধ উন্নত হয়, লাভজনক কর্মে নারী সমাজের অংশ গ্রহণের পক্ষে ইতিবাচক সামাজিক মতামত সৃষ্টি হয়, বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তামূলক প্রয়োজন মেটানোর উপায় হিসাবে সঞ্চয়ের প্রতি অধিক আগ্রহ জন্মে ইত্যাদি।

৩৮। **মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্য শিক্ষাঃ** পল্লী এলাকায় প্রধানতঃ মাঠকর্মীদের সহায়তায় বর্তমানে চালু শিশু প্রসবে যত্নবান আচরন ও কৌশলকে অনুকূলভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই শিক্ষাকে গ্রহণ করা হবে। নির্ধারিত কয়েকটি কৌশল, যেমন—বুকের দুধ খাওয়ানো, নবজাতকের নাড়ি কাটার সময় ধনুষ্টংকার-বিরোধী সাবধানতা এবং জন্ম-পূর্ব যত্ন প্রতিষ্ঠিত করতে গণসংযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করা হবে। খাবার স্যালাইন ও সংক্রমন মুক্তকরণ পদ্ধতির মত নির্দিষ্ট ব্যবস্থা যোগাযোগ কর্মসূচীর মাধ্যমে বার বার জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। ছোট পরিবার গঠনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার পক্ষে দক্ষ গ্রামীণ দেশীয় গণ-মাধ্যমগুলো সক্রিয় করে তুলতে হবে।

মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচীঃ

৩৯। দেশে মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ ব্যবস্থা অপ্রতুল। প্রতি হাজার জীবন্ত জন্মে মা ও শিশুর মৃত্যুর হার যথাক্রমে ৬ ও ১২৫ এবং বর্তমানে যতগুলো শিশু জন্মগ্রহণ করে তার মাত্র ৫% প্রতিষ্ঠানিক সুযোগ পায়। এই সুযোগের নাটকীয় উন্নয়ন আপাততঃ সুদূর পরাহত। পূর্বের ঘোষণানুযায়ী মাতৃমংগল ও শিশু কল্যানের জাতীয় লক্ষ্য হচ্ছে প্রতি হাজার জীবন্ত জন্মে মায়ের মৃত্যুর হার ৬ থেকে ৪-এ, শিশু মৃত্যুহার ১২৫ থেকে ১০০-তে এবং নব-জন্ম মৃত্যু হার ৮৫ থেকে ৬৫-তে হ্রাস করা।

৪০। মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচীকে গুরুত্ব দিয়ে সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি জাতীয় কর্ম-কৌশল প্রণীত হয়েছে। এই কর্ম-কৌশল অনুসরণে মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণমূলক লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলো হলো মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ সম্পর্কিত ক্লিনিকগুলোর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, সনাতন জন্ম পরিচর্যাকারীদের প্রশিক্ষণ, শিশুদের টিকা দান, খাবার স্যালাইন ও প্রতিষেধকের ব্যবহার এবং মাঠকর্মীদের সহায়তায় উন্নতমানের মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণের ব্যবস্থা করা। পরিবার পরিকল্পনা মাতৃমংগল ও শিশু কল্যানের যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম বলে আশা করা যায়।

৪১। **মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্য ক্লিনিকঃ** ওষুধ ও আনুষংগিক মালামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করে ৮৭টি মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ৩৫৬টি মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্য ইউনিটের ক্লিনিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি উন্নত ও শক্তিশালী করার ব্যবস্থা থাকবে। পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলো প্রসবের পূর্বকালীন, জন্মোত্তর এবং শিশু পরিচর্যার ব্যবস্থা করবে।

৪২। **সনাতন জন্ম পরিচর্যাকারীদের প্রশিক্ষণঃ** পল্লী অঞ্চলের নারীদিগকে নিরাপদ সন্তান প্রসবের ন্যূনতম নিশ্চয়তা প্রদান করার উদ্দেশ্যে সনাতন জন্ম পরিচর্যাকারীদেরকে নির্বাচিত সহজ সন্তান প্রসব-কালীন পরিচর্যা কৌশল ও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রসব চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রশিক্ষিত সনাতন পরিচর্যাকারী ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ভূমিকা জোরদার করার জন্য একটি সার্বক্ষণিক যোগসূত্রে কর্মসূচী প্রণয়ন করা হবে।

৪৩। **টিকাদানঃ** স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনস্থ টিকাদান কার্যসূচী ৬টি রোগের বিরুদ্ধে এর সেবা প্রসারিত করবে। রোগগুলো হচ্ছে, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস, পোলিও, যক্ষ্মা ও হাম। সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কমপ্লেক্স এবং মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে এগুলো সরবরাহ করার ব্যবস্থা থাকবে। এ ধরনের সেবার আরো উন্নতিকল্পে এবং এ কর্মসূচীর আওতায় অধিক লোক জনকে সুবিধা দেয়ার জন্য প্রয়োজনে এ কর্মসূচীর সংগে পরিবার কল্যাণ সহকারী ও চিকিৎসা সহকারী-গণকে সম্পৃক্ত করা যাবে।

৪৪। **খাবার স্যালাইন কর্মসূচীঃ** উদরাময়, পেটের পীড়া প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের এই প্রকল্পের অধীনে অধিক হারে স্যালাইন প্রস্তুত ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

৪৫। **মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্যের অন্যান্য কর্মসূচীঃ** তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অধিকতর মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার গোটা কর্মসূচীকে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত পরিবেশের লক্ষ্যে পরিচালিত করা হবে।

৪৬। **মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচীর সমন্বয়ঃ** দু'টি পৃথক প্রশাসনিক পরিদপ্তরে মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্যের প্রকল্পের বর্তমান অবস্থান একটি ফলপ্রসু ও কার্যকর পদ্ধতির লক্ষ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভব করছে। জাতীয় সমন্বয় কমিটির তত্ত্বাবধানে তাই বলিষ্ঠ সমন্বয়ের একটি সুষ্ঠু কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলোর কর্মোপযোগী সংহতিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে একে অপরের পরিপুরক হিসাবে মাঠ কর্মীদের কাজের ধারা সংশোধন করা হবে এবং সমন্বিত তদারকী ব্যবস্থা ও সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করার কৌশল প্রণয়ন করা হবে।

৪৭। **গর্ভনিরোধক উৎপাদনঃ** বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির ব্যাপারটি প্রায়ই অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় এর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকল্পে সরকার কনডম ও খাবার বড়ি তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে।

৪৮। **প্রশিক্ষণঃ** আমাদের সরকারী খাতের কার্যক্রমগুলোর মধ্যে জনসংখ্যা সমস্যা অপেক্ষাকৃত একটি নতুন বিষয়। এ কার্যক্রম বহু পেশাভিত্তিক হওয়ায় বিভিন্ন প্রকল্পাধীনে কার্যরত বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের নিমিত্তে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাধ্যমে কর্ম ও দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এ সব প্রশিক্ষণ কার্যে ক্রমাগত উপদেশ প্রদান করার উদ্দেশ্যে জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের (NIPORT) অধীনে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করার সুপারিশ রয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এ সকল প্রতিষ্ঠান কি ধরনের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করবে তা নিম্নে প্রদত্ত হল:

(ক) **জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান (NIPORT)ঃ** তৃতীয় পরিকল্পনা কালে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচীর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বহু খাতভিত্তিক কর্মসূচী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানে এটা সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কৌশল হবে বিশেষ গোষ্ঠি ও নির্দিষ্ট কর্মসংক্রান্ত। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি তার প্রশিক্ষণ ভবন সম্প্রসারিত করবে, প্রশিক্ষণ কৌশল উন্নত করবে, এবং প্রশিক্ষক শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি করবে। প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও পাঠাগার সুবিধাদিরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হবে।

(খ) **পরিবার কল্যাণ পরিদর্শনকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (FWVTI) :** সর্বমোট ১২টি প্রতিষ্ঠান তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১,৮০০ জন নতুন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শনকারী ও ৫,৫০০ জন পুরাতন পরিদর্শনকারীকে প্রশিক্ষণ দেবে। উপদেষ্টা কমিটি স্থির করবে ভবিষ্যতে এই ক্যাডারের কতজন লোকের জন্য কি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পড়বে। প্রয়োজনবোধে এ প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যান্য প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা তার সম্ভাব্যতাও যাচাই করা হবে।

(গ) **আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) :** ইউনিয়ন পর্যায়ের পরিবার পরিকল্পনা সহকারী ও ওয়ার্ড পর্যায়ের পরিবার কল্যাণ সহকারীগণকে প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রতিষ্ঠিত ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ অব্যাহত রাখবে। সর্বমোট ৪,৫০০ জন পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, ১২,০০০ জন জনস্বাস্থ্য সহকারী, ৩,৫০০ জন সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং ১০,০০০ জন নতুন পরিবার কল্যাণ সহকারীসহ মোট ২৩,০০০ জন পরিবার কল্যাণ সহকারীকে ব্যাপক প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হবে ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী তৈরী করা হবে।

৪৯। বর্তমানে ২৪,০০০ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সনাতন জন্ম পরিচর্যাকারী রয়েছেন। আগামী পাঁচ বছরে (১৯৮৫—৯০) ৪০,০০০ নতুন পরিচর্যাকারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যাতে প্রতিটি গ্রাম অন্ততঃ একজন করে পরিচর্যাকারীর সেবা পেতে পারে। এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর।

৫০। ৩টি মহিলা কার্যক্রমের অধীনে ব্যবসায়িক দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এমনভাবে দেয়া হবে যাতে কার্যক্রমে অংশ গ্রহণকারীরা তাদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়।

গবেষণা, মূল্যায়ন ও মনিটরিং (REM)

৫১। যে পরিবেশে সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই কোন প্রকার গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতি আদৌ ব্যবহার করেন না বা পরিবার পরিকল্পনার কোন সুবিধা ভোগ করেন না, সেখানে তাদের এই অনীহার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের জন্য মৌলিক ও ব্যবহারিক উভয় ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন। তাছাড়া আমদানীকৃত গর্ভ-নিরোধ প্রযুক্তির তাৎপর্য সম্পর্কে যা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এদের নিরাপত্তা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রভাব ফেলে তা পরীক্ষা করার জন্য মৌলিক গবেষণার দরকার। সেজন্যই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গবেষণা ও মূল্যায়নের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৫২। গবেষণা ও মূল্যায়নের বৃহত্তর ক্ষেত্রগুলো হবে : (ক) প্রজনন ক্ষমতার পর্যায়, গতি, নির্ধারক ও ফলাফল সম্বন্ধীয় সামাজিক ও জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা; (খ) নির্দিষ্ট কর্মসূচী বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর সন্ধান সংক্রান্ত কাজ ও পরিচালনামুখী গবেষণা; (গ) জনসংখ্যা প্রকল্পের কৃতকার্যতা ও ব্যর্থতা যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন ও ফলাফল সমীক্ষা; এবং (ঘ) প্রজনন ও গর্ভ-নিরোধ গবেষণা।

৫৩। নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পূর্বোক্ত গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে অংশ গ্রহণ করবে :

(ক) **জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠান (NIPORT) :** জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় সকল গবেষণার মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য এবং এসব গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়মিত সেমিনার ও প্রকাশনার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি চুক্তির ভিত্তিতে বাস্তবধর্মী ও পরিচালনামুখী গবেষণার আয়োজন করা হবে। এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রতি দুই বছর অন্তর গর্ভ-নিরোধ প্রচলন জরিপের আয়োজন ছাড়াও প্রজনন ক্ষমতার গতি-প্রকৃতি ও ধারা নির্ণয়ের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে একটি জাতীয় প্রজনন ক্ষমতা জরিপ পরিচালিত হবে।

(খ) **জনসংখ্যা উন্নয়ন ও মূল্যায়ন ইউনিট (PDEU) :** এই প্রতিষ্ঠানে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রকল্পের সার্বিক ফলাফল নির্ধারণ করার জন্য প্রকল্প সম্বন্ধীয় মূল্যায়ন সমীক্ষা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জনগণকে একীভূত করার নীতি বিষয়ক অনেকগুলো সমীক্ষা গ্রহণ করবে। কয়েকটি সমীক্ষা পরিচালনার ভার এ ইউনিটের উপরই থাকবে। অবশিষ্টগুলো সঠিক কৌশলের মাধ্যমে চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এ ইউনিট জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাপ্ত দৃষ্টান্তসমূহ পর্যালোচনা করবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতিতে এগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবে।

(গ) **ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থা ইউনিট (MIS unit) :** একটি বিশেষ পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ সেবা পরিসংখ্যান সেল গঠনের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তরের ব্যবস্থাপনা তথ্য ইউনিটটি আরো জোরদার করা হবে। এ ইউনিটের কাজ হবে দেশের ৪০টি নমুনা ইউনিয়নের কর্মসূচী ভিত্তিক উপাত্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা। এটি বিভিন্ন কার্যক্রমের সাফল্যও মনিটর করবে।

(ঘ) **বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) :** নিয়মিত আদমশুমারী ছাড়াও জনসংখ্যা বিষয়ক নির্ভরযোগ্য সংকেত সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো গুরুত্বপূর্ণ নমুনা রেজিষ্ট্রেশন ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করার ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

(ঙ) **বাংলাদেশস্থ উদরাময় রোগ গবেষণার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (ICDDRB) :** মাতৃমংগল, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার কর্ম কৌশলের উপর এই কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। প্রজনন ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য উপাদানের উপর মতলব বাঁধ প্রকল্পের কারণে যে উন্নয়ন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এ প্রতিষ্ঠান তার দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফলের উপর সমীক্ষাও পরিচালনা করতে পারবে।

(চ) **বাংলাদেশ প্রজনন ক্ষমতা গবেষণা কর্মসূচী (BFRP) :** আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বার বার সন্তান প্রসবে স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও গর্ভনিরোধ কৌশলের নিরাপত্তা, কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতার উপর মৌলিক গবেষণা এই কর্মসূচীর অধীনে পরিচালিত হবে।

আর্থ-সামাজিক ও আইনগত ব্যবস্থাদি

৫৪। আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে উচ্চ প্রজনন ক্ষমতাকে কোন মতেই একটি অযৌক্তিক জৈবিক প্রক্রিয়া বলে বিবেচনা করা যায় না। সুস্থ অর্থনৈতিক কারণের জন্য অধিকাংশ দম্পতি বৃহৎ পরিবার প্রত্যাশা করে। পরিবারের আকার ক্রমশঃ ছোট হতে থাকলেও বেশীর ভাগ জরিপে বাঞ্ছিত পরিবারের গড় আকার এখনও অনেক বড় অর্থাৎ প্রায় ৪ সদস্যবিশিষ্ট। সে তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা বিষয়ক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাঞ্ছিত পরিবারের আকার হচ্ছে ২ সদস্য বিশিষ্ট। আমাদের পরিবেশে উচ্চ প্রজনন হার মৌলিক সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দ্বারাও সমর্থিত।

৫৫। অতএব, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ছাড়াও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রধান নীতি হবে নতুন কর্মসূচী ও প্রকল্প সূচনা করা। এসব কার্যক্রম ও প্রকল্প এমনভাবে প্রণয়ন করা হবে যাতে ঘন ঘন সন্তান উৎপাদনের স্বাভাবিক ধারাকে গ্রহণ করার মত উপযোগী সামাজিক, অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য ও আইনগত পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। নতুন কার্যক্রম ও প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাগুলো হবে: সামাজিক ব্যবস্থা, যথা মহিলা কর্মসূচী, শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞান বিশেষতঃ নারী শিক্ষা, বিলম্বে বিবাহ, সামাজিক বৃত্তি ও সমাজের সামগ্রিক অংশ গ্রহণ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যথা বন্ধ্যাত্বকরণ, বণ্ড স্কীম, সন্তান না হলে বৃত্তি স্কীম, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও কর্ম সংস্থানের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, যথা শিশু মৃত্যুহার হ্রাসকল্পে মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচী; আইনগত ব্যবস্থা, যথা বিবাহযোগ্য বয়সের সময়সীমা আরো বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ রেজিষ্ট্রি, মাতৃত্ব সুবিধা সীমিতকরণ ও চিকিৎসা ভিত্তিতে গর্ভাবস্থা নষ্ট করা, এবং সামাজিকভাবে নিরুৎসাহকরণ ব্যবস্থা।

জাতীয় উন্নয়ন নীতিতে জনসংখ্যা বিষয়কে একত্রীভূত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের জনসংখ্যা উইং-এর জনসংখ্যা ও উন্নয়ন ইউনিট সমগ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রতি সার্বক্ষণিক সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।

মহিলা কর্মসূচী

৫৬। শিশু জন্ম দেয়া ও প্রজনন আচরণের ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজে নারীদের ভূমিকা বৃদ্ধি এককভাবে কোন ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পেরেছে বলে দেখা যায়নি। জনসংখ্যা খাতে নারী উন্নয়ন কর্মসূচীর আরো বিস্তৃতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। নারী সমবায় কর্মসূচী বর্তমানের ৪০টি উপজেলা থেকে ১০০টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হবে। সমাজ সেবা পরিদপ্তরাধীন মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচী ৪০ থেকে ৮০টি উপজেলায় বিস্তার লাভ করবে। আর মহিলাদের কারিগরী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বৃদ্ধি পাবে ২০ থেকে ৩০টি উপজেলায়। এ সকল কর্মসূচীর অধীনে ব্যবসায় দক্ষতা, ঋণ ব্যবস্থা এবং আয় উৎপাদনকারী কার্যাবলীর উন্নয়নে আশু দৃষ্টি প্রদান করা হবে।

(ক) **নারী শিক্ষাঃ** মাতা-পিতাকে পকেট ভাতাদি ও ছাত্রীদেরকে বইপত্র ও মনিহারী দ্রব্যাদি সরবরাহ করা ইত্যাদি ধরণের শিক্ষা সাহায্যের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

(খ) **বিলম্বে বিবাহঃ** জন্মহার কমানো ও সমাজে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে তাদের বিবাহের বয়সসীমা বাড়ানো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর সাথে অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তন, যথা নারী শিক্ষা ও লাভজনক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশ গ্রহণ প্রভৃতির সম্পর্ক রয়েছে। এই সমস্ত আন্তঃসংযুক্ত সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষে গণচেতনার উন্নয়ন একটি অপরিহার্য পূর্ব শর্ত। একটি বাড়তি অংশ হিসাবে সকল সমাজ উন্নয়নমূলক পল্লী কর্মসূচীতে এই উদ্দেশ্যটি অন্তর্ভুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে সুপরিকল্পিত তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল অতি প্রয়োজনীয়।

জনগণের অংশ গ্রহণ

৫৭। জনসংখ্যা কর্মসূচীর সামাজিক সুফল সমন্ধে ব্যাপক গণ-চেতনার উন্মেষ এবং ছোট পরিবার গঠনের পক্ষে সাধারণ গণ-সম্মতি সৃষ্টি প্রজননের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী শক্তি হিসাবে পরিগণিত। যে নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কাঠামো বড় পরিবার গঠন সমর্থন করে সেখানে এই ধরণের গণ-জাগরণই জন্মহার কমানোর লক্ষ্যে চূড়ান্ত উপায় বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, যথোপযুক্ত গণ-চেতনা ও গণ-আন্দোলনের জন্য একটি সুসংগঠিত সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে উপজেলা পরিষদের নেতৃত্বে বিকেন্দ্রায়িত পল্লী প্রতিষ্ঠানের আরো উন্নতি বিধান করা সম্ভব। গণচেতনার উন্মেষ ঘটাতে কার্যসূচী গ্রহণ করতে এবং জনসংখ্যা কর্মসূচীতে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশমালা প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে অধিক আগ্রহ জন্মানোর জন্য গণ-বৃত্তি প্রদান করার নিয়ম চালু করা সমীচীন।

নূতন চিন্তাধারা

৫৮। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কতকগুলো **নূতন** কৌশল উদ্ভাবন করা হবে। এগুলো হচ্ছেঃ

(ক) **বন্ধ্যাকরণ বণ্ড স্কীমঃ** বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের আয়ের উপর মাতা-পিতার নির্ভরশীলতার আংশিক বিকল্প হিসাবে ১২ বছর মেয়াদী এ-ধরণের বণ্ড মুলতবী পরিশোধের নিয়ম সাপেক্ষে চালু করা হবে। বাস্তবায়নের ধরণ নির্ধারণকল্পে এক বিশেষ আন্তঃমন্ত্রণালয় পদ্ধতির প্রয়োজন। ২ বা ৩টি সন্তানসহ বন্ধ্যাকৃত দম্পতি আনুপাতিক হারে পরিবর্তনশীল মূল্যমানের বণ্ড পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারবেন যা ১২ বছর পর ৪ গুণে বর্ধিত হবে।

(খ) **সন্তান না হলে বৃত্তি প্রদান স্কীমঃ** এটি বণ্ড স্কীমেরই একটি সম্পূরক। বণ্ড স্কীমে যেখানে সন্তান ধারণের সম্ভাবনাকে বাতিল করা হয়েছে, সেখানে এ স্কীমের উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্মের মধ্যে ব্যবধানের মতবাদ জাগ্রত করা। যে সকল দম্পতির অনধিক ২টি সন্তান আছে তারা পরবর্তী সন্তান ধারণের জন্য যদি পাঁচ বছর বিলম্ব ঘটাতে পারে তবে তারা ৫ বছরের ভাংগানো যোগ্য সঞ্চয় সার্টিফিকেট অথবা বণ্ড অধিকার করার দাবীদার হবেন।

(গ) **সামাজিক নিরাপত্তাঃ** বড় পরিবার গঠনের পক্ষে বৃদ্ধ বয়সের অর্থনৈতিক সমর্থন যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক, সেহেতু অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজন আংশিকভাবে হলেও মিটানোর জন্য সম্ভাব্য বিকল্প উপায় খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করতে পারে এমন কয়েকটি উপায় হচ্ছে— সমাজ ভিত্তিক কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা স্কীম, অর্থনৈতিক দুরবস্থাকালে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, গর্ভনিরোধ পন্থা ব্যবহারকারীদের অবসর ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা, নতুন ধরণের সঞ্চয় কর্মসূচী ইত্যাদি।

উন্নয়ন কর্ম কৌশলের প্রশিক্ষণ

৫৯। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যার একীভূতকরণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নীতিমালার উপর সাহায্য সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে জনসংখ্যা উন্নয়ন ও মূল্যায়ন ইউনিটের মাধ্যমে জনসংখ্যার পরিমাণ ও উন্নয়নের মধ্যে আন্তঃসম্বন্ধ নির্ণয় করার লক্ষ্যে সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ইতিমধ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতা উন্নয়ন কর্মকৌশলের সঠিক প্রশিক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা সরবরাহ করতে পারে যাতে প্রজনন হ্রাসের সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

সামাজিক ও আইনগত নিরুৎসাহজনক ব্যবস্থাদি

৬০। ছোট পরিবার গঠনের পক্ষে পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি সামাজিক, প্রশাসনিক নিরুৎসাহকারী ও আইনগত ব্যবস্থার সূচনা করা যেতে পারে। এখানে কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রস্তাবের উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

(ক) **রেশন কার্ডঃ** বিধিবদ্ধ ও সংশোধিত উভয় রেশন এলাকায় দুটি সন্তান বিশিষ্ট সর্বোচ্চ ৪ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে রেশন কার্ডের সুবিধা সীমিত রাখা যেতে পারে।

(খ) **কনজারভেন্সী করঃ** কোন ভূ-খণ্ডের আকার নয় বরং অধিবাসীর সংখ্যা বিচার করেই কনজারভেন্সী কর নিরূপণ করা যেতে পারে।

(গ) **বিদেশে নিয়োগঃ** ছোট পরিবার সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীগণকে বিদেশে বদলীযোগ্য নিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

(ঘ) **সরকারী চাকুরীতে নিয়োগঃ** সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোতে সকল প্রকার নিয়োগের ব্যাপারে সাধারণতঃ বিবাহিত প্রার্থী অপেক্ষা অবিবাহিত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

(ঙ) **সরকারী বাসা বাড়ী বরাদ্দঃ** সরকারী বাসা বাড়ী বরাদ্দের ব্যাপারে ক্ষুদ্রাকারের পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

(চ) **মাতৃমংগল সুবিধাঃ** যদি প্রথম সন্তান জীবিত থাকে তবে দ্বিতীয় সন্তান পর্যন্ত এই সুবিধা সীমিতকরণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধন করা যেতে পারে।

(ছ) **প্রসূতি সেবার ব্যয়ঃ** সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্বিতীয় সন্তানের পর তৃতীয় বা তৎপরবর্তী সন্তান প্রসবকালে ক্রমবর্ধমান হারে প্রসব ফি ধার্য করা যেতে পারে।

(জ) **চিকিৎসা ভিত্তিতে গর্ভপাতঃ** শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম গ্রহণের আশংকা থাকলে বা কতিপয় আর্থ-সামাজিক অবস্থায়, যেমন, ধর্ষণ, অবৈধ সম্পর্ক বা গর্ভনিরোধ পদ্ধার ব্যর্থতার ফলে গর্ভ সঞ্চার হয়ে থাকলে মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডাক্তার ও চিকিৎসা সহায়কীদের দ্বারা ১২ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাতের বিধান করা যেতে পারে।

(ঝ) **আয়করঃ** দু'সন্তান পর্যন্ত পরিবারকে আয়কর আইনের সুবিধা প্রদান করা যায়।

(ঞ) **বিবাহযোগ্য বয়সঃ** বর্তমান বিবাহযোগ্য সর্বনিম্ন বয়সসীমা মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে বাড়িয়ে ২০-এ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ২৫-এ উন্নীত করা যেতে পারে।

(ট) **গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্রেশনঃ** বিবাহ ও অন্যান্য গণ প্রয়োজনে যেমন, বিদ্যালয়ে ভর্তি, সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ, পাসপোর্ট ইস্যু, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বয়স নির্ধারণের জন্য প্রত্যায়ন পত্রের প্রয়োজনীয়তা বিধান করে বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধন আইনে কতিপয় সংশোধনী আনা যেতে পারে। আইনগত বিষয় বিশেষতঃ উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিষ্পত্তিতে মৃত্যু প্রত্যায়নকেও একইভাবে আইনগত বিধানে পরিণত করা যায়।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

৬১। মূল জনসংখ্যা নীতির আওতায় স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সমন্বয়ের অধীনে বিভিন্ন বহু খাতের সংস্থাগুলো জনসংখ্যা বিষয়ক কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে বলে আশা করা হয়েছে:

(ক) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য উইং পরিবার পরিকল্পনার জন্য ক্লিনিক্যাল সার্ভিস বিশেষতঃ বন্ধ্যাকরণ, মাসিক নিয়ন্ত্রণ ও ক্লিনিক্যাল গর্ভনিরোধ ব্যবস্থাদি থেকে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনে ডাক্তারসহ প্রতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য দায়ী থাকবে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার সমন্বিত কর্মসূচী বাস্তবায়নে এই বিভাগ প্রয়োজনীয় সহযোগিতার নিশ্চয়তা বিধান করবে। সকল হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বন্ধ্যাকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শয্যা সংরক্ষিত রাখা উচিত।

(খ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যা বিষয়ক উপাদানগুলোর একীভূতকরণ, জনসংখ্যা কর্মসূচীর বহির্মূল্যায়ন এবং আদমশুমারীর উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত সংক্রান্ত জনসংখ্যা সমীক্ষার জন্য দায়ী থাকবে।

(গ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় মহিলা সমবায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে এবং সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসূচীতে জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করবে।

(ঘ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিক স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই একীভূত জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখবে এবং নারী শিক্ষার উন্নতি কল্পে নতুন নতুন প্রকল্পও গ্রহণ করবে।

(ঙ) তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় রেডিও এবং টেলিভিশনের সাহায্যে জনসংখ্যা নীতি ও জনসংখ্যা বিষয়ক প্রকল্পসমূহের লক্ষ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃ মংগল ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচীর বিষয়বস্তু আরো জোরের সাথে তুলে ধরে জনসংখ্যার চলতি প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করবে।

(চ) সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী সমাজের আয় ও গর্ভ-নিরোধ পন্থার ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে মাদার্স ক্লাব ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের চালু প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করবে। জিনিষপত্রের উন্নততর নমুনা তৈরী ও বাজারজাতকরণের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় এই মন্ত্রণালয় পরিপূরক সেবা প্রদান করবে।

(ছ) শ্রম মন্ত্রণালয় শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রের চালু পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করবে এবং সুসংগঠিত শিল্প ও আবাদী এলাকার জন্য নতুন নতুন প্রকল্পের উদ্যোগ নিবে।

(জ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইমাম ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের জনসংখ্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য কার্যসূচী প্রণয়ন করবে।

(ঝ) যুব মন্ত্রণালয় দেশের যুবকদের জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে জনসংখ্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিবে এবং বিলম্বে বিবাহের জন্যও উদ্বুদ্ধ করবে।

(ঞ) কৃষি মন্ত্রণালয় তার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টিশিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করবে।

অর্থ বরাদ্দ

৬২। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জনসংখ্যা বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা ও বিভিন্ন খাতের মাধ্যমে জনসংখ্যা কার্যক্রমের বিভিন্নমুখী ধারা অর্জনের স্বার্থে বহুমুখী কাজের আওতাভুক্ত প্রচুর সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে। এ পর্যন্ত তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য ৩২টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫টি বর্তমান চালু প্রকল্পকে আরো ব্যাপকভাবে কার্যকর করে বেশী লোককে এ সব প্রকল্পের আওতায় এনে ঢেলে সাজানো হবে। বাকী ৭টি প্রকল্প হবে সম্পূর্ণ নতুন। এগুলোকে চাহিদা সৃষ্টিকারী কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে। সরকারী খাতের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ৮৭০ কোটি টাকা (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচীর জন্য আরো ৭০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সরকারী কর্মসূচীর উপ-খাতওয়ারী বরাদ্দ নিম্নের সারণীতে দেখানো হল:

সারণী ৭

উপ-খাতওয়ারী বরাদ্দ

[কোটি টাকায়]

উপ-খাত	বরাদ্দ
(১) বেতনাদি বাবদ	৩৫০
(২) গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতিসহ পরিবার পরিকল্পনা সেবা	১৫০
(৩) পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ	১৫০
(৪) মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচী	১১০
(৫) মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচীসহ তথ্য, মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৬৫
(৬) গবেষণা, মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ	৪৫
মোট ..	৮৭০

পরিকল্পনা বিভাগ ... গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

সপ্তদশ অধ্যায়

ক্রীড়া, সংস্কৃতি, যুব উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক এবং গণমাধ্যম (SCYSWAM*)

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সমাজকল্যাণ

দৈহিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের পশ্চাৎপদ সদস্যদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শরীক হতে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করাই সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। সার্বিক-ভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সম্পূরক হিসেবে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং দরিদ্র শিশু, ছিন্নমূল নারী, পংগু ও দৈহিক দিক থেকে অক্ষম জনগোষ্ঠির মত সমাজের অসহায় অংশের দিকে বিশেষভাবে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরিবারকে জনগোষ্ঠির প্রাথমিক ইউনিট হিসেবে ধরে তাদের ভেতরকার সম্ভাবনার সর্বোত্তম বিকাশের প্রচেষ্টা চালানোর লক্ষ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাজ সেবা কার্যক্রমে একটি সমন্বিত ও সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অতীত কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা

১.২। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশের সমস্ত সম্পদ যুদ্ধ বিধ্বস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য নিয়োজিত করা হয়। এই খাতে এতিম, বিধবা, ছিন্নমূল মহিলা, যুদ্ধে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং শারীরিক দিক থেকে পংগুদের জন্য বেশ কয়েকটি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়।

১.৩। প্রকৃতপক্ষে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম সমাজকল্যাণ খাতকে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়। যারা সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা মানব হিতৈষীদের সহায়তা ছাড়া নিজেদের উদ্যোগে সমাজে ঠাঁই করে নিতে অপারগ তাদের মঙ্গলার্থে কর্মসূচী নেয়া হয়।

১.৪। শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠি ও বস্তিবাসীদের উৎপাদনশীল ও স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বৃত্তিমূলক এবং উপার্জনশীল প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ৬৮টি কেন্দ্র খোলা হয়। চল্লিশটি গ্রামীণ উপজেলাকে পল্লী সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয় ও এসব কেন্দ্রে ভূমিহীন কৃষকসহ অসহায় জনগোষ্ঠিকে দক্ষতার প্রশিক্ষণসহ উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে নিয়োগ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গৃহীত কার্যক্রমে সমাজের অবহেলিত ও উপেক্ষিত জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপার্জনমুখী কার্যক্রমে সীমিত পরিসরে নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে।

১.৫। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ সকল কার্যক্রমে ১২.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং তার পুরোটাই ব্যবহার করা হয়। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে অর্থ বরাদ্দ করা হয় প্রধানতঃ প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে গৃহীত অসমাপ্ত প্রকল্পসমূহ সম্পন্ন করার জন্য। এই পরিকল্পনাকালে ১৩.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়; এর মধ্যে পরিকল্পনাকালে ১১.৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মোট বরাদ্দ ছিল ৫১.০০ কোটি টাকা যা থেকে ৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ৩৯.১১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এই পরিকল্পনাকালে ব্যাপক গ্রাম ও সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এতে স্কুল ত্যাগী কিশোর, যুবক, মহিলা এবং ভূমিহীনদের শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সম্ভাবনা বিকাশের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

---

* Sports, Culture, Youth Development, Social Welfare, Women's Affairs and Mass Media.

১.৬। উপরোল্লেখিত কার্যক্রমের আওতায় ১০৪টি উপজেলায় গ্রামীণ সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ দানের জন্য ১৯৬টি কম্যুনিটি সেন্টার বা গোষ্টি কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। এতিমদের স্বাবলম্বী ও উৎপাদনক্ষম করে তুলতে দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও উপার্জনমুখী কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে সাবেক মহকুমা শহরগুলিতে ৭০টি কারুশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ সকল কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্টির কারিগরী, ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাদের আয় উপার্জন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। এ সকল কার্যক্রমে প্রায় ৪,০০,০০০ লোক উপকৃত হয়েছেন।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

১.৭। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ হবে নিম্নরূপঃ

(১) দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী গ্রামীণ জনগোষ্টির জন্য উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং উৎপাদনশীল কার্যক্রমে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনসাধারণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা;

(২) দরিদ্র জনগোষ্টিকে লাভজনক ও উপার্জনমুখী কর্মতৎপরতায় নিয়োজিত করে তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা;

(৩) গ্রামের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্টির প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্যিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

(৪) সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য যৌথ পরিবার গঠন, এবং নিজ পরিবার তথা সমাজের বৃদ্ধ, অক্ষম, ভিক্ষুক এবং সামাজিক ও দৈহিক দিক থেকে পংগু ব্যক্তিদের দায়িত্বভার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;

(৫) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দৈহিক দিক থেকে পংগু ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু ও তরুণদের স্বাবলম্বী এবং সমাজ ও পরিবারের উৎপাদনক্ষম সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সাধন করা; এবং

(৬) এতিম ও অসহায় শিশুদের যথোপযুক্ত বিকাশ ও তাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদি

১.৮। ওপরের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে নীচের কৌশলসমূহ অবলম্বন করা হবে:

(১) সরকারী সকল শিশু সদন ও বেবী হোমকে পর্যায়ক্রমে এস,ও,এস (SOS) শিশু পল্লীর মত 'শিশু পরিবারে' রূপান্তরিত করা হবে যাতে করে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতেও নিরাশ্রয় ও এতিম শিশুরা পারিবারিক জীবনের আদর যত্ন ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়;

(২) দৈহিক দিক থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে তাদের ঝোঁক, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের মত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে ঢেলে সাজানো হবে;

(৩) বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের ভেতর স্বল্পমাত্রার তহবিল বন্টনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে কেবল সে সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেই আর্থিক সহায়তার জন্য নির্বাচিত করা হবে যারা অতীতে তাদের সমাজ সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে;

(৪) বর্তমানে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম মূলতঃ স্থানীয় পর্যায়ে সমাজ-সেবার উন্নয়নে নিয়োজিত। যেহেতু বেশ কয়েকটি কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদের সহায়তার প্রয়োজন, তাই তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য উপার্জনমুখী কার্যক্রমসহ প্রাথমিক শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়টি অধিকাংশ সমাজসেবা প্রকল্পের সাথে সমন্বিত করা হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

১.৭। পরিকল্পনাকালে নিম্নবর্ণিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

(১) **গ্রামীণ গোষ্ঠীভিত্তিক উন্নয়নঃ** এই কার্যক্রমের অধীনে গ্রামীণ সমাজের দরিদ্রতর গৃহস্থালী-গুলোকে সংগঠিত করে তার সদস্যদের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান পূর্বক তাদের পারিবারিক উপার্জন বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে শিশু, যুবক, মহিলা ও বয়স্ক পুরুষদের নিয়ে বিশেষ 'টার্গেট গ্রুপ' গঠন করা হবে। প্রতিটি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা হবে ২০০ জন যারা সবাই এই কার্যক্রম থেকে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। এ ছাড়াও এই কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও অন্যান্য কৃষক এবং পেশাজীবী গ্রুপকে সহায়তা দেয়া হবে। প্রতিটি ইউনিয়নকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও উপার্জনমুখী প্রকল্প হাতে নেয়ার জন্য উন্নয়ন মঞ্জুরী বরাদ্দ করা হবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১০০টি উপজেলাকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে এবং প্রতিটি উপজেলায় ৮টি করে ইউনিয়নে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

(২) **শিশু কল্যাণ কার্যক্রমঃ** বর্তমানে সরকারী শিশু সদনগুলোতে যে পরিবেশ বিরাজমান তা শিশুর যথোপযুক্ত বিকাশের অনুকূল নয়। শিশুর মানসিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের ৭৩টি শিশু সদনের সবগুলোকেই শিশু পরিবারে পরিণত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে এসকল প্রতিষ্ঠানে যতটা সম্ভব পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

(৩) **দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রমঃ** বর্তমানে দৈহিক দিক থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য পি, এইচ, সেন্টার ঢাকা নামে পরিচিত যে কেন্দ্র রয়েছে তার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সমন্বয় সাধন করে নতুন স্থানে সরিয়ে নেয়া হবে। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি অতিরিক্ত ইউনিট এই কমপ্লেক্সে সংযোজিত হবে। এ ছাড়াও প্রস্তাবিত কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হবে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধী গ্রুপের ঝোঁক ও চাহিদা মোতাবেক বর্তমানে সকল কার্যরত ও প্রস্তাবিত নতুন কেন্দ্রের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঢেলে সাজানো হবে।

(৪) **ভবঘুরে কল্যাণ কার্যক্রমঃ** ভবঘুরেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে কার্যরত ছ'টি ভবঘুরে কেন্দ্রের সবগুলোতে নূতন ভবন নির্মাণসহ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। এছাড়া, সম্ভাব্য কম সময়ে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো আধুনিক ও বহুমুখী করা হবে।

(৫) **স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমাজ সেবাঃ** যেহেতু স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের কল্যাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, সেহেতু 'বার্ডেম' (BIRDEM) সহ কয়েকটি নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অনগ্রসর জনগোষ্ঠির ভেতর শিক্ষা, সাক্ষরতা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা এবং উপার্জনমুখী তৎপরতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের সম্পূরক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়তা দেয়া হবে।

অর্থ বরাদ্দ

১.১০। সমাজকল্যাণ খাতের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যার কর্মসূচীভিত্তিক বিভাজন নীচে দেয়া হ'ল:

সারণী ৯

কর্মসূচীভিত্তিক বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচী	বরাদ্দ
(ক) গ্রামীণ গোষ্ঠিভিত্তিক উন্নয়ন	৩১.৭৬
(খ) দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম	১২.১৫
(গ) শিশু কল্যাণ কার্যক্রম	১৬.৭৯
(ঘ) ভবঘুরে কল্যাণ কার্যক্রম	৭.১০
(ঙ) বহুমূত্র রোগীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	৫.২০
(চ) জাতীয় একাডেমী উন্নয়ন কার্যক্রম	২.০০
মোট : ..	৭৫.০০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ মহিলা বিষয়ক

সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও মহিলারা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। দেশের সুষম আর্থ-সামাজিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য মহিলাদের সমহারে অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি, লোকাচার, নিরক্ষরতা, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগের সীমাবদ্ধতা এবং কর্মসংস্থানের অভাব বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল ধারার সাথে মহিলাদেরকে সম্পৃক্ত করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভংগীর কারণেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ সীমিত। পুরুষদের শিক্ষার হার যেখানে ৩২.৯% সেখানে মহিলাদের ক্ষেত্রে এখনো তা মাত্র ১৪.৩%। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যবধান আরও ব্যাপক। শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ একই রকমভাবে নীচু। ১৯৮১ সালের জনসংখ্যার উপাত্তে দেখা যায়, ৪৬.৬ লাখ লোক কৃষি বহির্ভূত শ্রমে নিয়োজিত যাদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা মাত্র ২.৬ লাখ। পরিবারে মহিলাদের ঐতিহ্যগতভাবে নিম্নতর অবস্থানই শুধু নয়, জমি-জমার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সমাজে তাদের পারিবারিক অবস্থানও তাদের অর্থনৈতিক গতিশীলতাকে [illegible]বিত করছে।

২.২। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের মহিলারা গৃহস্থালী কাজকর্মে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও তাদের অবদান কখনই বিবেচনা করা হয় না। এর কারণ মূলতঃ এই যে, উপার্জনমুখী কার্যক্রমে মহিলাদের অংশ গ্রহণের হার আদতেই খুব কম এবং তাদের গৃহস্থালী কার্যে অবদান আদমশুমারী উপাত্তে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। সংগঠিত খাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ কেবল সীমিতই নয়; সাধারণতঃ তারা নিম্ন বেতনভুক্ত কাজকর্মেই নিয়োজিত থাকেন। সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে গেলে হয় তাদের সদ্ব্যবহার করা হয়না নয়তো তাদের অপব্যবহার করা হয়। ফলে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়। সুতরাং একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন কার্যক্রমে নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করে তাদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

২.৩। উন্নয়ন কার্যক্রমে নারী সমাজের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা এবং জাতিসংঘ নারী দশকের শ্লোগান 'সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি'র চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে বাংলাদেশ কেবল দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধই নয় বরং সরকার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও সমর্থনসূচক নীতিমালাও গ্রহণ করেছেন। মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয় আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। জাতিসংঘ নারী দশকের নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা তথা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ও মহিলাদের জন্য বিপুলসংখ্যক বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

অতীত কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা

২.৪। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মহিলাদের কোন সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের কথা বিবেচনা করা হয়নি। অবশ্য এ পরিকল্পনাকালেরই শেষ দিকে নারী সমাজের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কিছু সু-নির্দিষ্ট উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সার্বিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। গৃহীত পাঁচটি প্রকল্পের কোনটাই প্রথম পরিকল্পনা কালে সমাপ্ত হয়নি। এর সবগুলিই দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে অব্যাহত থাকে। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে আগের পাঁচটির সাথে আরো ২টি প্রকল্প যুক্ত করা হয়। কিন্তু দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা শেষে (ক) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং (খ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেল—এই দু'টি প্রকল্প মাত্র সমাপ্ত হয়।

২.৫। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী সমাজের কার্যকরী অংশগ্রহণকে অর্থবহ ক'রে তোলার জন্য আরো গতিশীল ও বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ২৬টি প্রকল্পের জন্য চলতি মূল্যে ৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে ২১টি প্রকল্প সমাপ্ত ও একটি পরিত্যক্ত হয় এবং বাকী চারটি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত করা হয়। এই খাতে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (১৯৮০—৮৫) মাধ্যমে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৯ কোটি টাকা যার মধ্যে ২৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এর পরিমাণ মোট বরাদ্দের ৮২%।

২.৬। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান ভৌত সাফল্যের ভেতর ছিল ২০৪টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র, একটি হাঁস-মুরগীর খামার (উপজেলা পর্যায়ে) এবং দরিদ্র ও আশ্রয়হীন মহিলাদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য ৩৮টি ইউনিয়ন উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন। দু'টি উপার্জনমুখী পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল। লাভজনক প্রমাণিত হ'লে অন্যান্য জায়গাতেও তা সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা ছিল। একটি ছিল পরিত্যক্তা মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত খুলনা তাঁত শিল্প, অপরটি রাজশাহীতে রেডিও ও ঘড়ি মেরামত কেন্দ্র। মহিলাদের পরিচালনায় একটি বস্ত্র ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সম্ভাব্যতা জরিপও

চালানো হয়। অবশ্য এই তিনটি উদ্যোগের কোন পরবর্তী পদক্ষেপ আজো গৃহীত হয়নি। শিক্ষকতায় মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্রাশ প্রোগ্রামের অধীনে ৪৭টি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের হোষ্টেল মেরামত ও পুনঃনির্মাণ করা হয় যাতে আরো বেশী ছাত্রীর জন্য স্থান সংকুলান হয়। প্রোগ্রামটি সাফল্যজনক ভাবেই শেষ হয়। কর্মরত এবং চাকুরী অন্বেষণরতা মহিলাদের আবাসিক সংকট সমাধানকল্পে ৪টি বিভাগীয় সদরে ৪টি বৃত্তিজীবী মহিলা হোষ্টেল নির্মিত হয়। ২০টি জেলা শাখাসহ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠা এবং ৩২টি দিবা-যত্ন কেন্দ্র খোলার মধ্যদিয়ে শিশুদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়। ঢাকায় একটি জাতীয় একাডেমী এবং জাতীয়, জেলা, মহকুমা ও উপজেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমিতির অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যমান দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র এবং দিবা-যত্ন কেন্দ্রগুলোর উন্নয়নের মাধ্যমে মহিলাদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সীমিত অগ্রগতি সাধিত হয়। তবে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও গবেষণা, ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও নেতৃত্ব প্রশিক্ষণের ব্যাপারে মহিলাদের জন্য কোন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়নি।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

নারী উন্নয়নের মূল লক্ষ্য

২·৭। **স্বাস্থ্যঃ** তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মহিলাদের জন্য গ্রামকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। এই কার্যক্রমে শিশু ও মাতৃমংগল, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, টিকাদান কার্যক্রম, পারিবারিক স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। যেহেতু পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশু এবং গর্ভধারিণী ও নবজাতক সন্তানের মাতারাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রমে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকেন তাই শিশু প্রসূতি ও নবজাতক শিশুদের মৃত্যুহার উল্লেখ যোগ্য পরিমানে কমানোর উদ্দেশ্যে মাতৃ ও শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হবে। পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের প্রায় ২১,০০০ মাঠকর্মী ১২২৫টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মহিলাদের পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা প্রদান করছেন। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৩,০০০-এ। মহিলা পরিবার কল্যাণ সহকারীরা মহিলাদের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং সেই সাথে পুষ্টি এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন।

২·৮। **শিক্ষাঃ** পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যকার শিক্ষার বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার মহিলাদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত ও ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। দেখা গেছে যে অতীতে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রধানতঃ শিক্ষা ব্যবধানের কারণে মহিলা পুরুষের মধ্যে অসমতা রয়ে গেছে। তৃতীয় পরিকল্পনা আমলে গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে বেশ কিছু সংখ্যক বৃত্তি মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ভবিষ্যতে কেবল মহিলা শিক্ষক গ্রহণের নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটে ৫০ আসনবিশিষ্ট মহিলা হোষ্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। স্কুল ও কলেজে মহিলা প্রার্থীদের জন্য স্থান সংরক্ষিত রাখা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চল থেকে আগত মেধাবী মহিলাদের জন্য বৃত্তি ছাড়াও বিশেষ ভর্তুকির ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি পুরোনো জেলায় একটি করে মেয়েদের কলেজ এবং প্রতিটি নতুন জেলায় একটি করে মেয়েদের স্কুল সরকারী করা হয়েছে। এছাড়া মহিলাদের যাবতীয় কার্যক্রমে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষ প্রশিক্ষণ আবশ্যক করা হয়েছে। মেয়েদের জন্য ২০০টি কম্যুনিটি স্কুলে অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে সকল সরকারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হবে।

২.৯। কর্মসংস্থানঃ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য মহিলা কর্মীদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দেশের শ্রমশক্তির সাথে তাদের সম্পৃক্ত করা। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে মেয়েদের সুযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশেষভাবে অনানুষ্ঠানিক ও অ-কৃষিখাতে মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী খাতের চাকুরীসমূহে মহিলাদের কোটা ১০% থেকে ১৫%-এ বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে ৬০ শতাংশেরও বেশী চাকুরী মহিলাদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে। অন্যান্য খাতেও মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে। নূতন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সনাতন দক্ষতার উন্নয়ন এবং ক্রমশঃ ক্ষয়-প্রাপ্ত দক্ষতার পুনর্জীবিত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। গ্রামীণ মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এমনভাবে কার্যক্রম প্রণীত হচ্ছে যাতে তারা ঘরে বসেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। সর্বনিম্ন পর্যায়ে বেশ কিছু সংখ্যক দক্ষতা উন্নয়ন এবং উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বৃত্তিজীবী মহিলাদের হোস্টেল এবং শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। গ্রামের ভূমিহীন মহিলাদের ভিতর স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কোন রকম বন্ধক বা আমানত ছাড়া ঋণ সরবরাহ করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

২.১০। মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সঠিকভাবে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:

(১) অর্থোপার্জনকারী কর্মকাণ্ডে নারী সমাজের অধিকতর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুরুষ ও নারী সমাজে উন্নতির বৈষম্য কমিয়ে আনা;

(২) শিক্ষা (প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রতিষ্ঠানিক উভয় ধরণের) এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অধিকতর হারে অংশগ্রহণের জন্য নারী সমাজকে উৎসাহিত করা;

(৩) নারী সমাজকে স্ব-নিয়োজিত কর্মসংস্থানে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে ঋণ সুবিধার সম্প্রসারণ করা;

(৪) চাকুরী প্রার্থী এবং চাকুরীরত মেয়েদের জন্য আবাসিক সুবিধা সম্প্রসারণ এবং কর্মজীবী মহিলাদের শিশুসন্তানদের জন্য কম্যুনিটি ভিত্তিক দিবা-যত্ন সুবিধার বিস্তার করা;

(৫) বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের জন্য নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(৬) শিশুদের নৈতিক, দৈহিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং

(৭) সামাজিক ভাবে অসহায় ও পরিত্যক্তা নারীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদি

২.১১। উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী নিম্নতম অর্থব্যয়ে অর্জনের উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ গৃহীত হবে:

(১) সার্বিক উন্নয়নে নারী সমাজ ও শিশুদের অবস্থার উন্নয়নকে একটি অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে 'শিশু/মাতাদের' জন্য একটি 'সুপ্রীম কাউন্সিল' বা সর্বোচ্চ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট এই কাউন্সিলের প্রধান। এর কাজ হচ্ছে শিশু ও মায়েদের জন্য প্রধানতঃ শিশু ও মাতৃমংগল, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের পুনর্বাসনের মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সরকারের সামগ্রিক কার্যক্রমের সম্পূরক হিসেবে বেসরকারী সংস্থাসমূহকে নারীসমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অবদান রাখতে উৎসাহিত করা হবে। তা'ছাড়া দরিদ্র মহিলাদের জন্য সামাজিক, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রদানকল্পে বেসরকারী সংস্থাসমূহকে জোরদার করা হবে।

(৩) স্বল্প ব্যয়ে শিশুদের জন্য দিবা-যত্ন কেন্দ্র খোলা হবে। এতে করে সংগঠিত শ্রমশক্তি হিসেবে নারীসমাজ বিকাশ লাভ করতে পারবে। এ ধরণের কার্যক্রমের বিস্তারকল্পে স্থানীয় উদ্যোগেও মডেল' উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হবে।

(৪) বিভিন্ন গ্রামীণ সমাজ সেবা প্রকল্প এবং উপজেলা ভিত্তিক উৎপাদন ও প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোতে নারীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। চাকুরী ও শ্রম দক্ষতা কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে। মহিলাদের কাজের চাপ কমানোর জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের প্রয়াস চালানো হবে। সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করা হবে যাতে তা নারী সমাজের সুপ্ত সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সুষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা সুনিশ্চিৎ করে।

(৫) নেতৃত্ব বিকাশ কার্যক্রমে জোর দেয়া হবে যাতে মহিলাদের ভেতর স্বেচ্ছা-উদ্যোগ ও অতিরিক্ত সচেতনতা জন্ম নেয়। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং বিশেষ সুবিধাদি সংরক্ষণ এবং তাদের নিজেদের ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে ইস্যু ভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ, গবেষণা ও প্রকাশনার মত প্রচারধর্মী উদ্যোগ হাতে নেয়া হবে।

(৬) উদ্বুদ্ধকরণ শিক্ষার জন্য প্রতিটি মহিলা কর্মসূচীতে অ-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপাদানসমূহ যেমন সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি সম্প্রসারণ, ও স্বনির্ভরতার উপর প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(৭) মহিলাদের কার্যক্রম বহুমুখী হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। দিক নির্দেশনা প্রণয়ন ও মহিলাদের কার্যক্রমে ব্যবহারিক সমন্বয় সাধনের জন্য একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। সমন্বয় কমিটির উপর মহিলাদের কার্যক্রমের পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নেরও দায়িত্ব থাকবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

২.১২। **দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র :** তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হবে যাতে করে বেকার ও নিরাশ্রয় নারীরা আরো বেশী হারে এসব কেন্দ্রের আওতায় আসে। প্রধানতঃ হাঁস মুরগী পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, পশু পালন, পোষাক তৈরী (গার্মেন্টস), হস্তশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপরই প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা, বয়স্ক শিক্ষা, পুষ্টি, মৌলিক স্বাস্থ্য এবং সমবায় ব্যবস্থাপনার ওপরও প্রশিক্ষণ দেবে।

২.১৩। **মহিলাদের জন্য সেবাঃ** কর্মজীবী মহিলাদের তীব্র আবাসিক সংকটের কথা বিবেচনা করে ঢাকার কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেলের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ এবং খুলনা হোষ্টেলের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা হবে। নতুন নতুন জায়গায় কর্মজীবী মহিলাদের জন্য আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থা করা হ'লে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বেসরকারী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনিয়োজিত কার্যক্রমের প্রতিও সমর্থন যোগানো হবে।

২·১৪। **কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য দিবা-যত্ন কেন্দ্রঃ** অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নিম্নবেতন-ভুক্ত মায়েদের সন্তানেরা মায়েদের কর্মস্থলে থাকার সময় বাড়ীতে অযত্নে পড়ে থাকে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন স্থানে নিম্ন বেতনভুক্ত মায়েদের শিশুদের জন্য দিবা-যত্ন কেন্দ্র খোলা হবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এ ব্যাপারে ইউনিসেফ-এর সহযোগিতা পাওয়া যাবে। সাহায্য আসবে "দিবা-যত্ন সেবার উন্নয়ন" (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায়।

২·১৫। **মহিলা একাডেমী এবং BJMS এর সুদৃঢ়করণঃ** বর্তমান জাতীয় একাডেমী এবং BJMS কে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে আরো জোরদার করা হবে। একাডেমিটি হবে দক্ষতা উন্নয়ন, চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ এবং রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের একটি কেন্দ্র।

২·১৬। **বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর তৎপরতাঃ** দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে "জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর শাখা স্থাপন" প্রকল্প নেয়া হয়। বর্তমানে ২০টি পুরোনো জেলা সদরে শিশু একাডেমীর শাখা রয়েছে। এই শাখাগুলো বহাল থাকবে এবং এগুলো সারা দেশের উপজেলা পরিষদসমূহকে পেশাগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং শিশুদের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রচার কার্য চালিয়ে যাবে।

২·১৭। **উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল্যায়ন সমীক্ষাঃ** উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কর্মতৎপরতা এবং অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব নিরূপণ করার জন্য এগুলোর মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রকল্প প্রণয়নে অতীব প্রয়োজনীয় এসব মূল্যায়নের ফলাফল ব্যবহার করা হবে।

২·১৮। **সামাজিকভাবে অসহায় নারীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনঃ** প্রায়ই দেখা যায় দারিদ্র্য, প্রলোভন এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাসহ বেশ কিছু মহিলা ভিক্ষা-বৃত্তি এবং বেশ্যাবৃত্তির মত অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। এ পরিণতি মোটেই বাঞ্ছিত নয়। এতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতি ছাড়াও এসব মহিলার জীবনে নেমে আসে অনিশ্চয়তা এবং জাতি তার মানব সম্পদের অপচয়ের সম্মুখীন হয়। এসব মহিলাকে অসামাজিক প্রভাব থেকে দূরে রাখার জন্য এবং তাদেরকে সমাজের উপযোগী ও উৎপাদনক্ষম সদস্যা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরাপত্তা, যত্ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুবিধাদি প্রদান করা হবে। ফলে তারা ধীরে ধীরে লাভজনক কর্মসংস্থান পেয়ে সমাজে সঠিক অর্থে পুনর্বাসিত হ'তে পারবে।

অর্থ বরাদ্দ

২.১৯। উপরোক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মহিলা বিষয়ক খাতে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নীচে কর্মসূচী ওয়ারী বরাদ্দ দেখানো হ'ল। এছাড়াও, জনসংখ্যা, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, অর্থ, কৃষি ইত্যাদি খাতে নারী উন্নয়নের বিশেষ কার্যক্রমে আরো ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

সারণী ২

কর্মসূচী-ওয়ারী বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	বরাদ্দ
(ক)	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে স্থানান্তরিত প্রকল্পসমূহ ..	২.৬৭
(খ)	উইন্ডিং আপ প্রকল্পসমূহ	০.১৫
(গ)	নতুন কর্মসূচীসমূহ:	
	(১) মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনকেন্দ্র	১২.৪৫
	(২) মহিলাদের জন্য সেবা	৫.৫৯
	(৩) শিশুদের জন্য সেবা	৫.৫৫
	(৪) জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী জোরদারকরণ	৩.৫৯
	(৫) সামাজিকভাবে অসহায় মহিলাদের পুনর্বাসন	১৮.০০
	(৬) আবর্তনশীল ঋণ বিতরণ তহবিল	২.০০
	মোট:	৫০.০০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যুব উন্নয়ন

যুব সমাজ হচ্ছে দেশের জনসংখ্যার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ও সম্ভাবনাময় অংশ। আর এই অংশের জনসংখ্যা অতি দ্রুত বাড়ছে। ১৫—৩০ বছর বয়ঃক্রমের ভেতর যুব সমাজ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০% এবং এদের ৯০% বাস করে গ্রামাঞ্চলে। এদের অধিকাংশই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের বা উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত হবার জন্য দক্ষতা অর্জনের মত প্রশিক্ষণের কোন সুযোগ পায় না। ফলে, যুব সমাজের এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতধারা থেকে দূরে থেকে যাচ্ছে। কঠোর দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা বা অতি অল্প পরিমাণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন বিমুখ ধারণা ও মূল্যবোধ তাদেরকে পংগু করে রেখেছে। ফলে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অবদান যে কেবল কম তাই নয় বরং তারা সামাজিক শৃংখলার প্রতিও হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৩.২। প্রাণবন্ত ও উদ্যমী যুবকগণ সমাজের সবচেয়ে উপকারী জনগোষ্ঠী। সঠিকভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারলে তাদেরকে একটি বিরাট উৎপাদক শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব যুবকদের এখন যা সবচেয়ে প্রয়োজন তা হচ্ছে সঠিক দিক নির্দেশনা এবং সংগঠিত কর্মকাণ্ডে তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ। এতে করে তাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হবে।

৩.৩। সুশৃংখল, সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকেরা দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ ও অবদান রাখতে পারে। যুবশক্তিকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং তাদের ভেতর নৈতিক মূল্যবোধ ও মন-মানসিকতা জাগ্রত করে তাদের সঠিক সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ১৯৭৮ সালে যুব মন্ত্রণালয়(পরবর্তীকালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়) গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল যাবতীয় যুব উন্নয়ন কার্যক্রমকে এক অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত ও সমন্বিত করা যাতে জাতি গঠন কর্মকাণ্ডে যুব শক্তিকে যথাযথভাবে সংগঠন, পরিচালন, উদ্বুদ্ধকরণ ও সদ্ব্যবহার করা যায়।

অতীত কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা

৩.৪। সরকারী পর্যায়ে পৃথকভাবে যুব কার্যক্রম সর্বপ্রথম শুরু হয় ১৯৭৯ সালে। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যুব উন্নয়ন কার্যক্রমে বরাদ্দ করা হয় ৯.৫০ কোটি টাকা যার মধ্যে ব্যয় হয় ৭.০১ কোটি টাকা। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪২,২৫৫ জন বেকার যুবককে প্রশিক্ষণ দান যার মধ্যে ৩৬,২০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

৩.৫। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যুব উন্নয়নের জন্য চলতি মূল্যে ২৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। পরিকল্পনায় ২২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৯৮৫ সালের জুন মাসের মধ্যে ১৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এই খাতে পুরো পরিকল্পনাকালে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহের মাধ্যমে মোট বরাদ্দ করা হয় ২৫.৫০ কোটি টাকা যার মধ্যে ১৯.৬০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। সর্বমোট ৬,২৩৮ জন যুবক বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষণ নেয় এবং ২৯৯৯ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে হাঁস-মুরগী ও পশুপালন, টেলিযোগাযোগ, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স, কৃষি, মৎস্য চাষ এবং অটোরিকশা ড্রাইভিংও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

৩.৬। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী ধার্য করা হয়ঃ

(১) জাতীয় সংস্কৃতির অধ্যয়ন ও চর্চার মাধ্যমে যুবকদের মধ্যে সুষ্ঠু মূল্যবোধের সঞ্চার এবং তাদেরকে সৃজনশীল কর্মতৎপরতায় উৎসাহ প্রদান;

(২) কারিগরী, বৃত্তি ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনে যুবকদেরকে কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ সুবিধার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার;

(৩) স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনসমূহের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়তাদানে যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা;

(৪) শ্রমের মর্যাদা অনুধাবন ও স্বাবলম্বী হ'তে যুবকদেরকে উৎসাহ প্রদান;

(৫) যুব উন্নয়ন কর্মতৎপরতায় বেসরকারী সংস্থাসমূহকে উৎসাহ প্রদান; এবং

(৬) যুব ক্লাব গঠন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুবকদের ভেতর ভাবের আদান-প্রদান এবং অপরাপর দেশের যুবকদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান।

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদি

৩.৭ উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে নীচের কর্মকৌশল অবলম্বন করা হবেঃ

(১) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুব সম্প্রদায়কে সর্বাধিক অবদান রাখতে উৎসাহিত করার জন্য প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ও তাঁদের ভেতর উদ্যম সৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষ্য-মাত্রা অর্জনের প্রয়াসও চালানো হবে।

(২) যুবকদেরকে কার্যকরী উৎপাদক শক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানে বহুমুখী ও খাতওয়ারী কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। তাদের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর মূল গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

(৩) বিভিন্ন যুব সংগঠনের মাধ্যমে যুবকদেরকে স্থানীয় পর্যায়ে সমাজ উন্নয়নে জড়িত করা হবে। সড়ক নির্মাণ, খাল খনন, ভূমি উন্নয়ন ও বনায়ন, বাঁধ নির্মাণ, সাক্ষরতা অভিযান, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি কার্যক্রমে তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো হবে।

(৪) সমস্যার মূলে পৌঁছার জন্য গ্রাম-কেন্দ্রিকতা হবে যুব উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল কথা।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

৩.৮ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যুব উন্নয়ন খাতের প্রধান প্রধান কর্মসূচী নীচে আলোচিত হলঃ

(১) **আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম এবং যুবকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ** যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হবে সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম এবং উপার্জনমুখী কর্মকাণ্ডে যুবকদের নিয়োজিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। যুবকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

(২) **স্ব-কর্মসংস্থান কার্যক্রমঃ** দেশে চাকুরীর সুযোগ সীমিত হওয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদেরকে স্ব-কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

(৩) **আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ তৎপরতাঃ** কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ে ১৯৮৫/৮৬ সালে আন্তর্জাতিক যুব বর্ষের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ, কমনওয়েলথ যুব কার্যক্রম এবং বিভিন্ন বেসরকারী আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে অধিকতর যুব তৎপরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেমিনার, ওয়ার্কশপ, শিবির ইত্যাদি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুব বিনিময় কার্যক্রম, শিক্ষা সফর এবং যুবকর্মী প্রশিক্ষণ শিবির ইত্যাদি বিষয়াদি কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ে নেয়া হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(৪) **দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন ও তার প্রকাশনাঃ** যুবক বা যুবতীদের সচ্চরিত্রের দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করা হবে যাতে তাদের গুণগত উন্নয়ন সাধিত হয় এবং তাদের ভেতর সমাজের জন্য মহৎ কাজে উদ্যোগী হওয়ার অনুপ্রেরণা জাগে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশেষ প্রকাশনা বের করা হবে। যুবক-যুবতীদের জন্য নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণও এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৫) **বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রতি আনুকূল্যঃ** যুব উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত বে-সরকারী সংস্থা-গুলোর কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করবে মন্ত্রণালয় এবং সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের জন্য বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রতি সহায়তা দানের ব্যবস্থা তৃতীয় পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে।

অর্থ বরাদ্দ

৩.৭। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যুব উন্নয়ন খাতে ১৭.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ খাত-ওয়ারী বরাদ্দ নীচে দেখানো হল:

সারণী ৩

খাতওয়ারী বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	বরাদ্দ
১	আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম ও যুবকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৭.০০
২	যুবকদের জন্য স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান কার্যক্রম	৩.০০
৩	আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ তৎপরতা	০.৯০
৪	জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন, সচ্চরিত্রের দৃষ্টান্তমূলক কাজের প্রকাশনা এবং যুবকদের জন্য চরিত্র গঠনমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ।	১.১০
৫	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম তৎপরতায় বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রতি অনুদান	৫.০০
	মোট: ..	১৭.০০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : গণ-মাধ্যম

উন্নয়নের জন্য গণ-মাধ্যম একটি অন্যতম কার্যকর হাতিয়ার। জনসাধারণকে তথ্য প্রদান, শিক্ষাদান এবং উদ্বুদ্ধকরণের মত কাজে রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের আর্থ-সামাজিক ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে জ্ঞান বিস্তারের মাধ্যমে জনগণকে উন্নয়নমুখী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করা এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তা ছাড়া গণমাধ্যমগুলো বিনোদনেরও মাধ্যম। যেহেতু আমাদের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশই বাস করে গ্রামাঞ্চলে, তাই গণ মাধ্যম বিশেষ করে রেডিও ও টেলিভিশন তাদেরকে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছিত তথ্য প্রদান করতে এবং তাদেরকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪.২ বিশ্বের অন্যতম স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বেকারত্ব, গণদারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং জনসংখ্যা বিস্ফোরণের মত সমস্যায় জর্জরিত। কৃষি, পরিবার পরিকল্পনা, বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে নতুন ধ্যান-ধারণা প্রচারে গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্প্রসারিত হবার সাথে সাথে জনগণ ও সরকারের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে গণমাধ্যমসমূহকে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে হবে।

অতীত কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা

৪'৩। **টেলিভিশন :** প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশকে টি,ভি, কার্যক্রমের আওতায় আনার জন্য ৪টি রিলে ষ্টেশন স্থাপনসহ ঢাকা টি, ভি, ষ্টেশনে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ডি, আই, টি, ভবনে অবস্থিত ঢাকা টি,ভি, ষ্টেশনকে নবনির্মিত রামপুরা টেলিভিশন ষ্টেশনে স্থানান্তর করা হয় এবং দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে রংপুর, নোয়াখালী ও মোমেনশাহীতে আরো তিনটি রিলে ষ্টেশন স্থাপন করা হয়। টেলিভিশন উপগ্রহ ষ্টেশন এবং রামপুরায় ঢাকা টেলিভিশন ষ্টেশনের কাজ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সমাপ্ত হয়। এ ছাড়া রংগিন টি,ভি প্রবর্তনেও কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়।

৪'৪। **রেডিও :** প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ঢাকার নয়ারহাটে রেডিও বাংলাদেশ-এর ১০০০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার এবং খুলনায় ১০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার চালু করা হয়। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় খুলনায় ১০০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার এবং সিলেটে ২০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার স্থাপন করা হয়। ফলে দেশে ট্রান্সমিটারের সংখ্যা ১৩থেকে বেড়ে ১৫তে দাঁড়ায়। দেশের ৯০% জনগণকে রেডিও অনুষ্ঠানের আওতায় আনার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে রংপুরে ১০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার ও সম্প্রচার ভবন এবং ঢাকার আগার গাঁওয়ে জাতীয় সম্প্রচার ভবন চালু করা হয়।

৪'৫। **অন্যান্য কার্যক্রম :** প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন ক্লাব ও সমিতির মধ্যে জনসংযোগ দফতর ১২০৮টি টি ভি সেট বিতরণ করে। এর মধ্যে ৬১০টি বিনামূল্যে এবং ৫৯৮টি ৫০% রেয়াতী মূল্যে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়াও ৪৫০০টি রেডিও সেট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে ৪০০০টি টি ভি সেট বিতরণ করা হয় বিনামূল্যে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সাফল্যের মধ্যে রয়েছে ৮৪৯০টি টি ভি ও রেডিও সেট বিতরণ এবং প্রেস ইন্সটিটিউট ভবন নির্মাণ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

৪.৬। গণমাধ্যমকে যোগাযোগের একটি শক্তিশালী উপকরণ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নীচের উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে :

(১) আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কার্যক্রম তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে দেশের পুরো জনসংখ্যাকে রেডিও ও টি ভি কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা ;

(২) জনগণকে জাতীয় সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য রেডিও, টি ভি এবং অন্যান্য গণ যোগাযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত পরিবার, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, পুষ্টি ও গণশিক্ষার ওপর কার্যক্রম প্রচার;

(৩) সামাজিক দৃষ্টি ও মূল্যবোধের আলোকে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে মন-মানসিকতার পরিবর্তন সাধন; এবং

(৪) জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নব নব দক্ষতা ও উন্নয়নমুখী জ্ঞান বিস্তার।

গ্রন্থাগার ... বাংলা

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদি

৪.৭। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কর্মকৌশল অবলম্বন করা হবে:

(১) উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠির জন্য গণযোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে রেডিও ও টেলিভিশনকে সহজলভ্য করে তোলা হবে।

(২) যেহেতু ৮৫% জনগণ বাস করে গ্রামাঞ্চলে তাই গ্রামীণ জীবনমুখী কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

(৩) রেডিও ও টিভি শ্রোতা দর্শক এবং অনুষ্ঠান পরিবেশকদের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

(৪) সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষ্টি ও মূল্য বোধের ওপর ভিত্তি করে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের ওপর জোর দেয়া হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

৪.৮। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নীচের কর্মসূচীসমূহ গ্রহণ করা হবে:

(১) **টেলিভিশন:** তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে রামপুরায় ঢাকা ষ্টেশনের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে। নয়া সুযোগ-সুবিধা সংযোজনের ফলে, স্থানীয়ভাবে একদিকে যেমন উন্নত মানের অনুষ্ঠান প্রযোজনাকল্পে ঢাকা টি ভির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে, অন্যদিকে সুষ্ঠুভাবে প্রযোজিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য তৈরী অনুষ্ঠানমালা বিরাজমান যোগাযোগ ব্যবধান কমিয়ে আনবে। এছাড়া তিনটি বিভাগীয় সদরে তিনটি সীমিত ক্ষমতার ওবি-ইএনজি (OB/ENG) ইউনিট স্থাপন করা হবে। এছাড়াও বি টি ভি (BTV)-কে সংরক্ষণ সুবিধা এবং গ্যারেজসহ কারখানা সুবিধা প্রদান করা হবে।

(২) **রেডিও:** শতকরা ১০০ ভাগ জনগণকে রেডিও কার্যক্রমের আওতায় আনার জন্য চট্টগ্রামে ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার স্থাপন করা হবে। এ ছাড়া 'আগারগাঁওয়ের জাতীয় সম্প্রচার ভবন সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি প্রকল্পও হাতে নেয়া হবে। বিভিন্ন রেডিও ষ্টেশনে ব্যবহৃত ট্রান্সমিটার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি পুরোনো হয়ে পড়াতে কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। উন্নতমানের অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রাখার স্বার্থে পুরোনো যন্ত্রাংশ রদবদল এবং তাদের মানোন্নয়নের জন্য একটি সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ ও পুনর্গঠন (BMR) প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।

(৩) **অন্যান্য কার্যক্রম:** কার্যক্রমের মানোন্নয়নের জন্য রেডিও, টি ভি এবং অপরাপর যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করা হবে। জাতীয় গণযোগাযোগ ইনষ্টিটিউট, ফিল্ম আর্কাইভ এবং সেন্সার বোর্ডের জন্য বিবিধ সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে। এ ছাড়া, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখা এবং ছাপানোর কাজও শেষ করা হবে।

অর্থ বরাদ্দ

৪.৯। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই উপখাতে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কর্মসূচীওয়ারী ৪নং সারণীতে নীচে দেখানো হলো।

সারণী ৪

কর্মসূচী-ওয়ারী বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচী	বরাদ্দ
(১) রেডিও কার্যক্রম	২৫·৩৪
(২) টেলিভিশন কার্যক্রম	১৪·৬৬
(৩) অপরাপর গণ যোগাযোগ সংস্থার কার্যক্রম	১০·০০
মোট : ..	৫০·০০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

একটি জাতিকে ভাল চেনা যায় তার সংস্কৃতি দিয়ে এবং এতেই ঐ জাতির আশা-আকাংখা ও মূল্য বোধ সার্বিকভাবে প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতিই ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবন গড়ে তোলে। সংস্কৃতির উপাদান হচ্ছে ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত যা মানব জীবনের বিভিন্ন অংশ পরিস্ফুট করে। এ সকল উপাদানের উন্নয়নের অর্থই হচ্ছে বাঞ্ছিত অর্থনৈতিক, নৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজের উন্নয়ন।

অতীত কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা

৫.২। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই খাত যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালে অবশ্য এক্ষেত্রে গুণগত উন্নয়ন এবং মাপগত সম্প্রসারণের জন্য কিছু অবকাঠামোগত সুবিধা বিকাশ লাভ করে। এ সময় প্রধানতঃ গুরুত্ব আরোপ করা হয়: (ক) বাংলাভাষা, সাহিত্য এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ্যবই প্রণয়নের ওপর গবেষণা ও প্রকাশনা; (খ) বই-এর প্রচারমূলক তৎপরতা; (গ) বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠাগার নির্মাণ ও উন্নতি সাধন; (ঘ) জাতীয়, আঞ্চলিক ও উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রচার; (ঙ) যাদুঘর ও স্মৃতি সৌধ নির্মাণ এবং (চ) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের সংরক্ষণের ওপর। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ভৌত সাফল্যের খতিয়ান নীচের অনুচ্ছেদসমূহে দেয়া হ'ল।

৫·৩। **ভাষা ও সাহিত্য :** জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়। এ সময় বাংলা একাডেমী ১৮০টি গবেষণা পুস্তক এবং ১২০টি সাময়িকী বের করে যেখানে এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে ১৮০টি এবং ১৭৪টি। পাঠ্য বই ও রেফারেন্স বই প্রকাশিত হয় ২৬৬টি। এ সংখ্যা ছিল পরিকল্পিত ১৮৯টির ১৪০%। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র বই ব্যবসা এবং বইয়ের প্রচারের ওপর দেশব্যাপী ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে।

৫·৪। **গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ :** ঢাকার শেরে-বাংলা নগরে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়। এই ভবনেই জাতীয় আর্কাইভও স্থান পাবে। ঢাকায় কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী এবং রাজশাহী ও খুলনার বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নয়নও সমাপ্ত হয়। চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীর নির্মাণ কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া ৬৮টি গ্রামীণ উপজেলা লাইব্রেরীকে বই-পুস্তক ও আসবাবপত্র দেয়া হয়।

৫.৫। **চারুকলা ও পারফর্মিং আর্টস**ঃ শিল্পকলা একাডেমীর অস্থায়ী আর্ট গ্যালারী ও অডিটোরিয়ামের সংস্কার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর আধুনিক অডিটোরিয়ামের নির্মাণ কাজও শুরু হয়ে গেছে। শিল্পকলা একাডেমী নিয়মিত যাত্রাগান, নাট্যোৎসব ও চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। সংগীত, নাটক ও নৃত্যকলার ওপর বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে। উপজাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে মোমেনশাহীর বিরিসিরিতে অবস্থিত উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমীর উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে এবং এতে প্রয়োজনীয় ভৌত সুযোগ-সুবিধার সংযোজন করা হয়েছে।

৫.৬। **যাদুঘর, সমাধি ও স্মৃতি সৌধ**ঃ ঢাকায় জাতীয় যাদুঘর নির্মাণ সমাপ্ত হয় এবং এতে বহু প্রদর্শনযোগ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। সোনারগাঁও লোক শিল্প ও হস্তশিল্প যাদুঘর উন্নয়ন কার্যক্রমে সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়নি। মৌলানা আবদুল হামিদ খাঁন ভাসানী, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং কবি জসিমুদ্দিনের সমাধির ওপর স্মৃতি সৌধ নির্মাণ সমাপ্ত হয়। তিনটি জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন জরীপের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং অপর পাঁচটি জেলায় এ ধরণের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। ১৫টি ঐতিহাসিক ভবন ও চারটি যাদুঘর সংরক্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৫.৭। পরিকল্পনাকালে এ সমস্ত কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২৪.৯৮ কোটি টাকা হলেও প্রায় ২৬.৭১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ শেষ করতে ঘাড়তি ১.৭৩ কোটি টাকার যোগান দেয়া হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

৫.৮। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যাবলী নীচে দেয়া হ'ল:

(১) জনগণের আশা-আকাংখার সাথে সংগতি রেখে দেশের সর্বত্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের লালন ও উন্নয়ন;

(২) বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আরো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন;

(৩) উপজেলা পর্যন্ত গ্রন্থাগার সার্ভিসের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন;

(৪) উপযুক্ত মান সম্পন্ন পুস্তক প্রকাশনা এবং সাধারণ মানুষের জন্য তার সহজলভ্যতা সুনিশ্চিতকরণ;

(৫) বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে চারুকলা ও পারফর্মিং আর্টসের ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করন;

(৬) 'অপসংস্কৃতি'র আগ্রাসী অভিযানের মুখে জাতীয় সংস্কৃতির পতন রোধ এবং দেশাত্মবোধে জাগরণে উৎসাহ প্রদান; এবং

(৭) জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ।

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদি

৫.৯। উপরে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে নিম্নলিখিত কর্মকৌশলসমূহ অবলম্বন করা হবে:

(১) বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধিকতর উন্নয়ন সাধনে বাংলা একাডেমীকে বৈদ্যুতিক টাইপ রাইটার ও বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসর সরবরাহ করা হবে।

(২) জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে বই ব্যবসা ও বইয়ের প্রচার বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় জড়িত করা হবে।

(৩) গুণগত বইয়ের প্রকাশনাকে উৎসাহিত করা হবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে তা সহজলভ্য করতে রেয়াতী হারে মুদ্রণ সামগ্রী সরবরাহ করা হবে।

(৪) জাতীয়, আঞ্চলিক ও উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারকল্পে আরো অডিটোরিয়াম এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

(৫) সাংস্কৃতিক অধঃপতন রোধ করার লক্ষ্যে লোক শিল্প, ধ্রুপদী সংগীত ও সাহিত্য প্রসারের মাধ্যমে সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকদের আকাঙ্খিত সার্বজনীন মুল্য বোধকে তুলে ধরা হবে।

(৬) সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে কমুনিটির উদ্যোগ বিশেষ করে যুব সংগঠনগুলোর প্রয়াসকে উৎসাহিত করা হবে।

(৭) সাংস্কৃতিক অংগনে একক প্রতিভাকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে।

(৮) আরো যাদুঘর স্থাপন করা হবে এবং ঐতিহাসিক ভবনসমূহকে চিহ্নিত করে সংরক্ষণ করা হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচীসমূহ

৫.১০। এই খাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গৃহীত প্রধান প্রধান কর্মসূচীসমূহের বিবরণ নীচে দেয়া হ'ল:

(১) **ভাষা ও সাহিত্য:** বাংলা একাডেমী নিম্নলিখিত কাজগুলি করবে (ক) ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা এবং বই-পুস্তক, জার্নাল ও সাময়িকী প্রকাশ, (খ) বাংলায় উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠ্য ও রেফারেন্স বই প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ এবং (গ) বাংলা টাইপ রাইটারের উন্নয়ন সাধন ও তাতে বিদ্যুৎ সংযোজন করন। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র উপযুক্ত মানের পুস্তক প্রকাশনা এবং জনসাধারণের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির ব্যাপারে তৎপরতা চালাবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রকাশক, বই বিক্রেতা, সম্পাদক ও কম্পোজিটরদের জন্য প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করবে। এ ছাড়া জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে নিয়মিত গ্রন্থ মেলার আয়োজন করা হবে।

(২) **গ্রন্থাগার ও আর্কাইভঃ** চট্টগ্রাম বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হবে। ১৭টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নয়ন সাধন করা হবে এবং ৭টি জেলায় পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করা হবে। এসব লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে। গ্রন্থাগারিকদের জন্যও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হবে।

(৩) **চারুকলা ও পারফর্মিং আর্টসঃ** ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীর আধুনিক অডিটোরিয়াম নির্মাণ সমাপ্ত হবে। একাডেমীর কর্মতৎপরতা জোরদার করার লক্ষ্যে শিল্পকলা একাডেমীর কয়েকটি নির্বাচিত জেলা কেন্দ্রের উন্নয়ন সাধন করা হবে। এসব কেন্দ্রে মঞ্চ, সংগীত ও চিত্রকলা সামগ্রীর মত সর্বনিম্ন সুযোগ-সুবিধা সংযোজন করা হবে। মোমেনশাহীর বিরিসিরি সাংস্কৃতিক একাডেমীর আরো উন্নয়ন সাধন করা হবে। কক্সবাজার ও বান্দরবনে রাংগামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমীর দু'টি শাখা স্থাপন করা হবে। রাংগামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমীর জন্য একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হবে। এ ছাড়া ধ্রুপদী সংগীতের বিস্তার ও উন্নয়নে কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

(৪) **যাদুঘর, সমাধি ও স্মৃতি সৌধঃ** ঢাকার জাতীয় যাদুঘরে প্ল্যানেটেরিয়াম নির্মাণ করা হবে। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস এবং চট্টগ্রাম উপজাতীয় যাদুঘরকে পূর্ণাংগ যাদুঘরে পরিণত করা হবে। খুলনায় একটি বিভাগীয় যাদুঘর, ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যাদুঘর এবং সিলেটে একটি যাদুঘর স্থাপন করা হবে। ইউনেস্কোর সহায়তায় পাহাড়পুর ও বাগেরহাটের পুরাকীর্তিসমূহ সংরক্ষণ করা হবে। লালবাগ কেল্লার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য একটি কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। আহসান মঞ্জিলের সংস্কার সাধন করে এটিকে যাদুঘরে পরিণত করা হবে। এছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ঐতিহাসিক ভবনসমূহের জরিপ অব্যাহত থাকবে।

অর্থ বরাদ্দ

৫.১১। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই খাতে ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রধান প্রধান কর্মসূচী-ওয়ারী বরাদ্দ নীচে দেখানো হ'ল:

সারণী ৫

কর্মসূচী-ভিত্তিক বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচী	বরাদ্দ
(১) ভাষা ও সাহিত্য	৬.২৫
(২) গ্রন্থাগার তৎপরতা	৫.৫৫
(৩) চারুকলা ও পারফর্মিং আর্টস	২১.৮০
(৪) যাদুঘর, সমাধি ও স্মৃতি সৌধ	১৭.৪০
মোট:	৫১.০০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ক্রীড়া উন্নয়ন

শৃংখলা, উত্তম শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং নৈতিক চরিত্র উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান খেলাধুলা। এ সকল গুণাবলীর অভাব ঘটলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং খেলাধুলার গুরুত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন করতে হবে যাতে করে জনসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

অতীত কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা

৬.১। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শারীরিক শিক্ষার মৌলিক উপাদানসমূহের উন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গুণগত উন্নয়ন এবং সংখ্যাগত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

৬.২। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল অবকাঠামো নির্মাণের ওপর। এসবের ভেতর রয়েছে জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও মহকুমা ষ্টেডিয়াম; জেলা সদরে জিমনেসিয়াম ও ক্রীড়া শিক্ষা কেন্দ্র, সুইমিং পুল এবং শারীরিক শিক্ষা কলেজ ও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। এ ছাড়া খেলোয়াড়, কোচ, আম্পায়ার, রেফারী প্রভৃতিদের জন্য কয়েকটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে কিছু ক্রীড়া উপকরণও বিতরণ করা হয়। খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খেলাধুলার জাতীয় টীমকে বিদেশ সফরে পাঠানো হয় এবং বেশ কিছু বিদেশী টীমকে দেশে স্বাগত জানানো হয়।

৬.৩। এই পরিকল্পনাকালে নির্মিত ভৌত কাঠামোসমূহের মধ্যে রয়েছে জাতীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও কোচিং সেন্টার, জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্স, বহুতল বিশিষ্ট স্কাউট ভবন, আউটার ষ্টেডিয়াম (আংশিক উন্নয়ন), ঢাকায় বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রথম পর্যায়), রাজশাহীতে শারীরিক শিক্ষা কলেজ ইত্যাদি। এ ছাড়া ১৪টি জেলা সদরে জিমনেসিয়াম ও খেলাধুলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৩৩টি মহকুমা ষ্টেডিয়াম দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে চালু করা হয়। এ ছাড়াও ১৬টি জেলা ষ্টেডিয়ামের আংশিক উন্নয়ন সাধন করা হয়। তিনটি বিভাগীয় ষ্টেডিয়ামের কাজ এগিয়ে চলেছে।

৬.৪। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ৩৯৬০ জন খেলোয়াড়, ৩২১৬ জন রেফারী এবং ৪৫৬ জন স্থানীয় কোচকে খেলাধুলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ৫৩৮৫টি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়। পরিকল্পনা কালে মোট বরাদ্দকৃত ৩৪.৮৬ কোটি টাকার মধ্যে ২৮.২৫ কোটি টাকা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যয়িত হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

৬.৫। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যাবলী নীচে লিপিবদ্ধ করা হল:

(১) জনগণের মধ্যে ঐতিহ্যগত এবং স্বল্প ব্যয়ের গ্রাম্য খেলাধুলায় অংশ গ্রহণের স্বপক্ষে আগ্রহের সঞ্চার করা;

(২) খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যুব সমাজের শক্তি ও উদ্যমকে সুশৃংখল কর্মতৎপরতার খাতে প্রবাহিত করা;

(৩) খেলাধুলার মানোন্নয়ন করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াংগনে দেশের জন্য গৌরবোজ্জ্বল স্থান অর্জন;

(৪) ক্রীড়া প্রতিভাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;

(৫) খেলাধুলায় মহিলাদের ব্যাপকতর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকরণ;

(৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শারীরিক শিক্ষা প্রদানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি।

পরিকল্পনা বি... গ্রন্থ... গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদি

৬.৬। উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে নীচের কৌশলসমূহ অবলম্বন করা হবেঃ

(১) বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের ব্যাপকতর অংশগ্রহণের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বল্প ব্যয়ে দেশীয় খেলাধূলার উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

(২) বিদ্যমান ভৌত কাঠামোসমূহ সুদৃঢ় করা হবে এবং কোন কোন কাঠামো সম্প্রসারিত করা হবে।

(৩) গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত যুবক-কিশোরদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সমিতিসমূহের সহায়তায় খেলাধূলার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। সরকারের জাতিগঠন কর্মকাণ্ডের সম্পূরক হিসেবে ক্রীড়া ক্ষেত্রে যুব সংগঠনসমূহকে জড়িত করা হবে।

(৪) প্রতিটি উপজেলাতে কমপক্ষে একটি উপযুক্ত মানের খেলার মাঠ থাকবে। এতে সারা বছর বিভিন্ন খেলার অনুশীলন চলতে থাকবে।

(৫) তরুণ গ্রুপ থেকেই প্রতিশ্রুতিশীল ক্রীড়া প্রতিভা চিহ্নিত করে বিজ্ঞানভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের সাথে সাথে সাধারণ শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হবে। কোচ এবং ক্রীড়া সংগঠকদেরও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিবিড় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

(৬) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং সকল মাধ্যমিক স্কুলে শরীর চর্চা শিক্ষক রাখার ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(৭) আরো বেশী হারে মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করে খেলাধূলায় মহিলাদের জন্য সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ করা হবে।

(৮) জাতীয়, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধূলার ওপর বই, জার্নাল ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

৬.৭। ক্রীড়া উন্নয়নের প্রধান প্রধান কর্মসূচীগুলো নীচে বর্ণনা করা হ'লঃ

(১) **প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাঃ** ভৌত কাঠামোর অভাবে ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার ক্রীড়া কলেজ শুরু করতে পারেনি। ১৯৮৬ সাল থেকে এই কলেজটিকে চালু করার জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। রাজশাহী এবং ঢাকার শারীরিক শিক্ষা কলেজ দু'টোতে পর্যাপ্ত ভৌত সুবিধার অভাবে নিযুক্ত কার্যক্রম পরিচালনা বিঘ্নিত হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ'দুটো প্রতিষ্ঠানের আরো উন্নয়ন সাধন করা হবে।

(২) **স্টেডিয়াম, জিমনেশিয়াম ইত্যাদির উন্নয়নঃ** উপযুক্ত জমি না পাওয়ায় ঢাকায় আন্তঃকক্ষ স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্ভব হয়নি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে। পরিকল্পনার দ্বিতীয় জেলা পর্যায়ে অসমাপ্ত স্টেডিয়াম ও জিমনেসিয়ামসমূহ সম্পূর্ণ করা হবে। যে চারটি বিভাগীয় স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছিল, সেগুলো শেষ করে চালু করা হবে। ঢাকায় জাতীয় স্টেডিয়ামকে আরো উন্নত করা হবে এবং বান্দরবন জেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে।

(৩) **মহিলাদের জন্য ক্রীড়া সুবিধার উন্নয়নঃ** ঢাকার মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের আরো উন্নতি সাধন এবং তিনটি বিভাগীয় সদর দফতরে আরো তিনটি এ জাতীয় কমপ্লেক্স নির্মাণের ব্যাপারে একটি কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

(৪) **প্রশিক্ষণঃ** পরিকল্পনাকালে জাতীয় খেলোয়াড়, কোচ, ক্রীড়া সংগঠকদের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ১২--১৬ বছরের বালক বালিকাদের খেলাধূলার সংগঠনের জন্যও একটি কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। গ্রামীণ যুব ও ক্রীড়া সংগঠনসমূহে খেলাধূলার উপাদান সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবকদের জন্য খেলাধূলার সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে।

অর্থ বরাদ্দ

৬.৮। ক্রীড়া খাতের জন্য ৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রধান প্রধান কর্মসূচীর বরাদ্দ নীচে দেখানো হল:

সারণী ৬

কর্মসূচী-ওয়ারী বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচী	বরাদ্দ
(১) প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি	২২.১০
(২) ষ্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম ইত্যাদির উন্নয়ন	২২.৭০
(৩) মহিলাদের জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা	১৫.২০
(৪) প্রশিক্ষণ	৪.০০
মোট: ..	৬৪.০০

স্কাইসওয়াম খাতে বরাদ্দের সার-সংক্ষেপ

স্কাইসওয়াম-এর অধীনস্থ বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৩০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)। নীচে খাতওয়ারী বরাদ্দ দেখানো হ'ল:

সারণী ৭

স্কাইসওয়াম খাতে বরাদ্দের সার-সংক্ষেপ

(কোটি টাকায়)

খাত	বরাদ্দ
১। সমাজকল্যাণ	৭৫.০০
২। মহিলা বিষয়ক	৫০.০০
৩। যুব উন্নয়ন	১৭.০০
৪। গণ মাধ্যম	৫০.০০
৫। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন	৫১.০০
৬। ক্রীড়া উন্নয়ন	৬৪.০০
মোট: ..	৩০৭.০০

পরিকল্পনা বিভা
গ্রন্থাগার
গঃ বাংলাদে

অষ্টাদশ অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি গবেষণা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য। ইহা সম্পদের দক্ষ ও উৎপাদনশীল ব্যবহারে সাহায্য করে। উন্নত দেশগুলোতে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের উৎপাদন উপাদান পরিস্থিতি দক্ষতা ও উন্নয়ন চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ যথাযথ প্রযুক্তির সন্ধান এখনও পায়নি। আমদানিকৃত প্রযুক্তি শুধু যে ব্যয় বহুল তাই নয় বরং সব সময় তা দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, সম্পদের অবস্থা এবং প্রাপ্ত কারিগরি দক্ষতার উপযোগী হয় না। প্রায়শঃই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার সাথে উন্নত প্রযুক্তি আমদানির বিষয় জড়িত থাকার ফলে ব্যবহারকারী দেশগুলোতে প্রায়োগিক ও ব্যবস্থাপনা সমস্যা দেখা দেয় এবং সেসব দেশ থেকে উন্নত দেশগুলোতে সম্পদ পাচার হয়ে যায়। তাই দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচিত তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি উন্নয়নে যথাসম্ভব চেষ্টা চালানো এবং কেবলমাত্র সে ধরণের প্রযুক্তি আমদানি করা যা তাদের উন্নয়নে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

২। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহে লাগসই প্রযুক্তি অর্থাৎ দেশীয় এবং অভিযোজিত এই উভয় প্রকার প্রযুক্তি উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে পারবে। এসব পরিকল্পনায় গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতার অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং (ক) বর্তমান গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়ন, (খ) গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় ও নির্দেশনার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাউন্সিল (এন সি এস টি) নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন এবং (গ) দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নে দিক নির্দেশ দেয়ার জন্য এক ব্যাপক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত নীতি নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে।

৩। **বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা খাতঃ** অর্থনীতির প্রায় সকল খাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। সে অনুযায়ী পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ ও পানি ব্যবহার, শিল্প ইত্যাদি পৃথক পৃথক খাতে প্রযুক্তিগত গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য নিজস্ব কর্মসূচী ও আর্থিক বরাদ্দ রয়েছে। এ ছাড়াও পরিকল্পনায় বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের পারমাণবিক প্রযুক্তি, বি সি এস আই আর-এর কৃষি-শিল্প বিষয়ক গবেষণা, স্পার্সোর (SPARRSO) মহাকাশ গবেষণা ও দূর নিরীক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ এবং কর্মসূচীসহ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা (এস টি আর) নামে একটি পৃথক খাত গঠন করা হয়েছে।

অতীত কার্যতৎপরতা পর্যালোচনা

৪। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত খাতের লক্ষ্য ছিল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের চাহিদা অনুযায়ী ফলিত ও প্রতিযোজিত ধরণের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি গবেষণার উন্নতি সাধন। পরিকল্পনার এই খাতে আর এণ্ড ডি (R & D) এর লক্ষ্য ছিল (ক) স্থানীয় সম্পদ ও নৈপুণ্যের ভিত্তিতে দেশীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং (খ) আমদানিকৃত প্রযুক্তির উপযোগীকরণ। বিভিন্ন খাতের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচীসমূহ পরিচালিত করতে হয়েছে।

৫। পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মৌলিক দুর্বলতা ও সমস্যাবলী চিহ্নিত করা হয় ; অপরিকল্পিত গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতা, বহু সংস্থা জড়িত থাকার ফলে কাজে সমন্বয়ের অভাব, লক্ষ্য ও কার্যক্রমের দ্বৈততা ও অস্পষ্টতা, সম্পদের অপচয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে ব্যাপকতার

অভাব। আর এণ্ড ডি-এর কাজ কোন্ নির্দেশনা এবং ব্যবস্থায় পরিচালিত হওয়া উচিত এবং কোন্ কোন্ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহে জোর দেয়া উচিত সে ব্যাপারে পূর্বেকার পরিকল্পনাগুলোর চেয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়।

৬। সহজ পণ্য অথবা পদ্ধতি থেকে শুরু করে প্রকৌশল ও ফেব্রিকেশন ক্ষেত্র সম্পর্কীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তির যথাযথ অভিযোজনের লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে পরিকল্পনায় তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ে সমস্যা সমাধানমূলক গবেষণার লক্ষ্যে আর এণ্ড ডি কর্মকাণ্ড পুনর্বিন্যাসের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পরিকল্পনার সুপারিশ মোতাবেক উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে : (১) কৃষি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, (২) প্রকৌশলী ও ধাতু শিল্পসহ বৃহৎ শিল্পসমূহ, (৩) ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প, (৪) জ্বালানী, (৫) গৃহায়ন, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং গণপূর্ত। গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জনসম্পদের উন্নয়ন অত্যাবশ্যক এবং পরিকল্পনায় সেই অনুযায়ী মাঠভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মৌলিক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে। এর জন্য যথোপযুক্ত পাঠ্যক্রম তৈরীরও সুপারিশ করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বহু সংস্থা বিভিন্ন ধরণের কাজ করছে বিধায় কাজের সমন্বয় সাধন এবং একটা সঠিক নির্দেশনার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। পরিকল্পনায় সেই প্রেক্ষিতে আর এণ্ড ডি পরিকল্পনার নির্দেশনা ও সমন্বয়ের জন্য একটা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। এতে আরও প্রস্তাব করা হয় যে এই লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জাতীয় কাউন্সিলের (এন সি এস টি) কার্যকর ভূমিকা পালন করা উচিৎ।

৭। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন (বি এ ই সি) এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিল (বি সি এস আই আর) নামে দুটি বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রাক-স্বাধীনতা আমল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়ের মধ্যে বি এ ই সি এবং বি সি এস আই আর এর আর এণ্ড ডি কাজের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা এবং দেশে বিদ্যমান এ ধরণের অপরাপর সংস্থার বাস্তব সুবিধাদিও বেড়েছে। মহাকাশ গবেষণা এবং দূরনিরীক্ষণের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্পার্সো নামে একটা নতুন সংস্থা গঠিত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আর এণ্ড ডি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ যথেষ্ট বেশী ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এই খাতে প্রায় ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

পারমাণবিক প্রযুক্তি এবং খনিজ অনুসন্ধান

৮। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণার কাজ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে। বি এ ই সি ১৯৭৬ সালে সাভারে একটি আণবিক শক্তি গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কাজ শুরু করে এবং দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত থাকে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেও এ প্রকল্পের কাজ চলবে। এই ইনষ্টিটিউট বিভিন্ন ক্ষেত্রে আণবিক শক্তি ব্যবহারে সমন্বিত গবেষণা ও উন্নয়নের সুবিধাদি গড়ে তুলবে। গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনার জন্য এই ইনষ্টিটিউট এ পাঁচটি বিভাগ থাকবে : (১) আইসোটোপ উৎপাদন এবং পারমাণবিক প্রযুক্তি গবেষণার জন্য পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, (২) বিকীরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্য ও অন্যান্য পচনশীল পণ্যের জীবাণুমুক্তকরণ ও সংরক্ষণের জন্য খাদ্য গবেষণা ও জীববিজ্ঞান বিভাগ; (৩) ইলেকট্রনিক সামগ্রী ও সরঞ্জাম উৎপাদন ও গবেষণার জন্য ইলেকট্রনিক্স ও জড় বিজ্ঞান বিভাগ, (৪) রোগ সম্পর্কিত গবেষণা এবং রোগ নির্ণয়ে পারমাণবিক কলাকৌশল প্রয়োগের জন্য পারমাণবিক ঔষধ বিভাগ; এবং (৫) কমপিউটার সুবিধা এবং কর্মসূচী উন্নয়নের জন্য একটি কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগ।

৯। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ব্যবহারিক ও গবেষণার ভবনগুলোর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হয় এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণা সুবিধারও উন্নতি হয়। এর সাথে পারমাণবিক ঔষধ এবং খাদ্য শস্যের বিকীরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত আর এণ্ড ডি কর্মসূচী বিষয়ক সুবিধাদির উন্নয়ন অব্যাহত থাকে। পারমাণবিক ঔষধ কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দিয়ে সজ্জিত করা হয় এবং এতে রোগীদের রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কিছু সংখ্যক ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের নমুনা তৈরী করা হয় এবং একটি কমপিউটার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বি এ ই সি এবং অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। পারমাণবিক প্রযুক্তির মৌলিক গবেষণার জন্য একটি ৩ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক রিএক্টর স্থাপনের কাজ অব্যাহত ছিল। কেন্দ্রে রেডিও আইসোটোপ উৎপাদনের ফলে গবেষণার সুযোগ আরো বৃদ্ধি পাবে।

১০। পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা ছাড়াও বি এ ই সি খণিজ অনুসন্ধান এবং পারমাণবিক চিকিৎসা সুবিধা উন্নয়নের প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

১১। সমুদ্র সৈকতের বালু কণা থেকে খনিজ সম্পদ আহরনের অনুসন্ধানের কাজ ১৯৬৮ সালে শুরু হয়। জরিপে খনিজ মজুতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় শিল্পে ব্যবহারের জন্য খনিজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদন সম্পর্কে পরীক্ষা চালানোর জন্য একটা পরীক্ষামূলক প্লান্ট ১৯৭৫ সালে স্থাপন করা হয়। প্রকল্পটিতে এখনও কাজ চলছে। জরিপ ও পরীক্ষার ফলাফলে খনিজ মজুতের পরিমাণ লাভজনক বিবেচিত হলেও উৎপাদন প্রক্রিয়া এখনও বাণিজ্যিক উত্তোলনের পর্যায়ে পৌছেনি। প্রাপ্ত খনিজের প্রায় সমস্তটাই বি এ ই সির নিজস্ব আণবিক শক্তি গবেষণা ইনষ্টিটিউটে ব্যবহৃত হয়েছে। একই ভাবে সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইউরেনিয়াম ও থেরিয়াম প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে জরিপের কাজ ১৯৭৬ সাল থেকে অব্যাহত রয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বি এ ই সি দিনাজপুর ও সিলেটে দুটি পারমাণবিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা

১২। বি সি এস আই আর প্রধানতঃ ফলিত গবেষণা এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়ার উন্নয়নে নিয়োজিত ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই পরিষদের আওতায় তিনটি গবেষণা ল্যাবরেটরীতে (ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম) আর এণ্ড ডি সুবিধার উন্নয়ন করা হয়, একটি খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হয় এবং প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য একটি পরীক্ষামূলক প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুবিধাদির উন্নয়ন সাধন করা হয়। ল্যাবরেটরী ও প্রতিষ্ঠানসমূহ রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া, কাঁচ ও চীনা মাটি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত, জ্বালানী ও শক্তি, উদ্ভিদজাত ঔষধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে গবেষণা চালায়।

১৩। বি সি এস আই আর-এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ১৯৫৫ সাল থেকে শুরু হয় এবং তখন থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তা অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত এটা খাদ্য, পানীয়, রাসায়নিক সামগ্রী, তৈল, কাগজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বেশ কিছু পণ্য এবং সেগুলোর উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রকাশ করেছে। কিন্তু এর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত হয়েছে। জ্বালানী ও শক্তি সম্পর্কে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার (সৌর চুল্লী ও বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট) বাণিজ্যিক ব্যবহার এখনো শুরু হয়নি। এই সংস্থা জুটন নামের একটি নতুন ধরণের কৃত্রিম আঁশ উদ্ভাবন করেছে। এর লাভজনক বাজার এখনও যাচাই করে দেখার অপেক্ষায় আছে। এর বাণিজ্যিক উৎপাদনের অর্থনৈতিক ও কারিগরি দিক সম্পর্কিত একটি পরীক্ষার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

মহাকাশ গবেষণা ও দূরনিরীক্ষণ

১৪। প্রাকৃতিক সম্পদ জরিপ এবং আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য মহাকাশ গবেষণা ও দূরনিরীক্ষণ প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা হয়েছে। একটি প্রকল্পের অধীনে মহাকাশ গবেষণা ও দূরানুধাবনসংস্থা (স্পার্সো) গড়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্পার্সোর কারিগরি ও গবেষণা ক্ষমতার উন্নতি সাধিত হয়েছে।

১৫। স্পার্সো আবহাওয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও সতর্কীকরণ এবং বিভিন্ন সংস্থার কাছে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি ও প্রতিচ্ছবি পরিবেশনের কাজ হাতে নিয়েছে। এছাড়াও, তারা আকাশ থেকে তোলা ছবি এবং ভূউপগ্রহের উপাত্ত থেকে সম্পদ জরিপ সংক্রান্ত সমীক্ষার কাজ চালাচ্ছে।

১৬। স্পার্সো প্রাকৃতিক সম্পদ জরিপের জন্য বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী দেশগুলোর ২০০০ কিলোমিটার ব্যাসের মধ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে দূরনিরীক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে আঞ্চলিক দূরানুধাবন কেন্দ্র স্থাপনের একটা কাজ হাতে নেয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে ফ্রান্সের প্রায় ২৮·৭৪ কোটি টাকার সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের মহাশূন্য উপগ্রহ 'ল্যাণ্ডসেট' এবং ফ্রান্সের 'স্পট' থেকে সম্পদ জরিপ সংক্রান্ত তথ্য অথবা প্রতিচ্ছবি গ্রহণের জন্য একটি ভূ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। ফরাসী সাহায্যের দুই-তৃতীয়াংশই ঋণ। এই প্রকল্প শেষ করতে আরও অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে।

১৭। উচ্চ বিনিয়োগ ব্যয় ছাড়াও এ কর্মসূচী চালু হলে বাৎসরিক বিরাট অংকের পরিচালনা ব্যয় বহন করতে হবে। পক্ষান্তরে যেসব দেশ এর আওতায় থাকবে তাদের কাছে ছবি অথবা টেপ বিক্রি করে যে আয় আসবে তার পরিমাণ নগণ্য হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রকল্পটি চালু করার আগেই এই কর্মসূচীর ব্যয় নির্বাহ ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নগুলো বিবেচনা ও সমাধান করা প্রয়োজন।

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

১৮। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অধীনে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত পরীক্ষা এবং বাতাস ও পানি দূষণ সংক্রান্ত তদারকীর কাজ চালানো হয়। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ নামে অপর একটি প্রকল্পের অধীনে এই পরিদপ্তর ২৫৭টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। এ সমস্ত প্ল্যান্টের মধ্যে ভাসমান ধরণের গোলাকার গম্বুজ বিশিষ্ট মাত্র ১৪৭টি প্ল্যান্ট চালু রয়েছে। নির্দিষ্টভাবে আটকানো চিরনিযুক্ত অবশিষ্ট প্ল্যান্টগুলো চালানোর সমস্যাজনিত কারণে প্রায় অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। কেবলমাত্র প্রদর্শনী প্ল্যান্ট হিসেবেই এই প্ল্যান্টগুলো স্থাপন করা হয়েছে এবং এর প্রযুক্তি এখনও জনগণের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেনি।

মান নির্ধারণ ও গুণ নিয়ন্ত্রণ

১৯। কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার (সি টি এল) আমদানিকৃত এবং স্থানীয় উভয় প্রকার পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউশন (বি ডি এস আই) দেশে প্রমাণ ওজন এবং মাপের সনদ দান এবং মেট্রিক পদ্ধতি চালুর (ও প্রচারের) ব্যবস্থা করছে। বাস্তব সুবিধাদি এবং পরিচালনা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সি টি এল এর একটি উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত যন্ত্রপাতি আমদানি না হওয়ায় এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নি।

জাতীয় বিজ্ঞান পাঠাগার ও যাদুঘর

২০। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কাজ হাতে নেয় এবং এই বিভাগ প্রধানতঃ বই পত্র সংগ্রহ করে একটি জাতীয় বিজ্ঞান পাঠাগার গড়ে তোলে।

অর্থ বরাদ্দ (১৯৭৩—৮৫)

২১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা (এস টি আর) খাতে গত তিনটি পরিকল্পনা মেয়াদে অর্থ যোগান এবং ব্যয় (চলতি মূল্যে) নিম্নরূপ ছিল:

(কোটি টাকায়)

পরিকল্পনা		সরকারী খাতে মোট বরাদ্দ	এস টি আর খাতের জন্য পরিকল্পনায় বরাদ্দ	মোট বরাদ্দের অংশ (%)	এস টি আর খাতের জন্য আর এ ডি পি-তে বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	..	৩,৯৮৪	২৩'২৭	০'৫৮	১৬'১৮	১৪'১৫
দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	..	৩,২৬১	৩৯'১৭	১'২০	২৬'৫৪	২৪'৯৭
২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	..	১৬,০৬৩	১২৯'০০	০'৮০	১১৯'৮৮	১০৯'৮৮

১৯৭৯/৮০ সালের স্থির মূল্যে এস টি আর খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ ছিল ৯২.০০ কোটি টাকা।

২২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা খাতের জন্য উপরোক্ত বরাদ্দ ছাড়াও কৃষি ও পানি সম্পদ, শিল্প, পরিবহণ, জ্বালানীর মত অন্যান্য খাতেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত তৎপরতার জন্য আর্থিক বরাদ্দ রাখা হয়। এসব-খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রযুক্তিগত গবেষণা এবং উন্নয়ন তৎপরতার জন্য মোট এডিপি বরাদ্দ ছিল প্রায় ২৬৪'০০ কোটি টাকা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা খাতের বরাদ্দ মিলিয়ে এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এডিপি'র মাধ্যমে বরাদ্দকৃত মোট অর্থের ২'৫ শতাংশের সামান্য বেশী।

২৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা খাতের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১২৯'০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল যা পরিকল্পনাকালে সরকারী খাতে মোট বরাদ্দের ০'৮০ শতাংশ। এ খাতের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২০'০০ কোটি টাকা।

২৪। এই খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে ২৪টি প্রকল্প প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে চলতি প্রকল্প হিসাবে এসেছে এবং ছ'টি ছিল নতুন। এই ত্রিশটি প্রকল্পের মধ্যে তিনটি প্রকল্প ১'৪২ কোটি টাকা, (০'৫৬ কোটি টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আগে এবং ০'৮৬ কোটি টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে) বিনিয়োগ করার পর প্রকল্পগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। পরিকল্পনাকালে ২৭টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকে এবং এর মধ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়া নাগাদ ২০টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয় এবং সাতটি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

২৫। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উক্ত খাতে প্রাককলিত ব্যয় ছিল ১০৯'৮৮ কোটি টাকা যা এ খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দের প্রায় ৮৫ শতাংশ বা এডিপি বরাদ্দের ৯২ শতাংশ। প্রধান বরাদ্দ ছিল মহাকাশ গবেষণা ও দূরনিরীক্ষণ প্রযুক্তি এবং পারমাণবিক গবেষণার জন্য। প্রথমটির ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ফলে উচ্চতর বিনিয়োগ সম্ভব হয়েছিল।

বাস্তবায়ন সমস্যা এবং দূর্বলতাসমূহ

২৬। **নীতিমালা এবং বাস্তবায়নের ব্যবধানসমূহঃ** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নে বিঘ্নসৃষ্টিকারী প্রধান সমস্যা হল পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচী প্রণয়ন এবং কাজের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনার অভাব। উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহে (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সমন্বয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ দিক নির্দেশনার উপর জোর দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনাসমূহ এই উদ্দেশ্যে ব্যাপকভিত্তিক নীতি মালার সুপারিশ করেছে। ১৯৮০ সালে প্রণীত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতেও স্বীকার করা হয়েছে যে, অসমন্বিত আর এণ্ড ডি নীতি নিয়ে জাতীয় গবেষণা কাউন্সিল অথবা গবেষণা সংস্থাগুলোর বহু মুখী লক্ষ্যসমূহ জাতীয় প্রেক্ষাপটে গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতা প্রণয়ন, পরিচালনা ও বাস্তবায়নে কার্যকর হতে পারেনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম এবং গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও সমন্বয় সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রগুলো মোটা-মুটি ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২৭। এ ধরণের নীতি নির্ধারণ সত্বেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা ও গবেষণার দিক নির্দেশনা ও সমন্বয়ের সমস্যা গোটা পরিকল্পনাকালে অব্যাহত ছিল। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ১৯৮৫ (খসড়া) একই সমস্যার প্রতিধ্বনি করে। গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতার অগ্রগতি এ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২৮। স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণার দিক নির্দেশ এবং সময়ের নিরীখে কর্মসূচীর পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালার ব্যাপকতার অভাব ছিল। জাতীয় উন্নয়নে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনার অসংগতি এবং স্থানীয় প্রযুক্তির উন্নয়নে আমদানির বিকল্প নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, আমদানিকৃত প্রযুক্তি বাছাই ও আত্মীকরণ সংক্রান্ত উপযুক্ত নীতিমালার অভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ উন্নয়ন ব্যাহত করেছে।

২৯। গবেষণার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ও কর্মসূচীগত দুর্বলতা থেকে। বিভিন্ন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে সক্রিয় একাধিক সংস্থা কার্যতঃ অসমন্বিতভাবে তাদের তৎপরতা চালায়। এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণা তৎপরতায় পুনরাবৃত্তি ঘটেছে (যেমন জ্বালানী ও শক্তির ক্ষেত্রে)।

৩০। **অপরিকল্পিত গবেষণা উন্নয়নঃ** শিল্প অথবা গৃহস্থালীতে প্রযুক্তির বাজার চাহিদা যথাযথ ভাবে যাচাই না করে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ফলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৩১। **প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘ সূত্রতাঃ** অধিকাংশ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ দীর্ঘদিন ধরে চলে। এমনকি কোন কোনটি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আগে শুরু হয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত গড়ায়। বর্ধিত ব্যয়ের সাথে তাল মিলাতে অথবা নতুন সুবিধা যোগ করতে প্রকল্পগুলো সংশোধন করতে হয়। ধীর এবং বিলম্বিত বাস্তবায়ন যথাযথ ভাবে কাংখিত সুযোগ ও ফল প্রদানে ব্যাঘাত ঘটায়। প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, তথ্য সংগ্রহ এবং মূল্যায়নে দুর্বলতা প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত করে এবং পরিনামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে-এর অবদানের ক্ষেত্রে অগ্রগতিও মন্থর হয়ে পড়ে।

৩২। **প্রযুক্তির বিস্তারঃ** গবেষণা পরীক্ষাগারসমূহ থেকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তি স্থানান্তরের সমস্যা প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিস্তারকে ব্যাহত করে। কৃষির মত কতিপয় খাতে সম্প্রসারণ পদ্ধতি প্রযুক্তির ব্যবহারে সহায়ক হয়েছে। অবশ্য মৌলিক দুর্বলতা ছিল অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা, গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তির প্রয়োজ্যতার মধ্যে যথাযথ যোগসূত্রের অভাব।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলীঃ

৩৩। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

৩৪। উৎপাদন উপাদান পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতা ও সরবরাহে ভারসাম্যহীনতা (ভূমি, মূলধন ও শ্রম) ক্ষুদ্র শিল্প ভিত্তি, নিম্ন উৎপাদন মাত্রা কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে, উন্নয়নের অপর্যাপ্ত অবকাঠামো (পরিবহণ ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ইত্যাদি) এর প্রেক্ষিতে এক্ষেত্রে লক্ষ্য হবে এমন প্রযুক্তিসমূহের উন্নয়ন যা সরকারী ও বেসরকারী খাতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগের জন্য দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যথাযথ হবে এবং একই সংগে অর্থ ব্যয়ের দিক থেকেও কার্যকরী হবে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণার উদ্দেশ্য, সুযোগ এবং মাত্রা অবশ্যই জাতীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন নীতিমালা ও লক্ষ্যসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলসমূহ

৩৫। গবেষণা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত তৎপরতায় বাছাই এবং অগ্রাধিকার চিহ্নিত করণের প্রয়োজনীয়তা আছে। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দুটি স্পষ্টতঃ পৃথক ক্ষেত্র ও বিষয়। বিশেষ করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মত স্বল্পকালিন সময়ের জন্য এবং ব্যাপক প্রযুক্তি উন্নয়ন চাহিদার প্রেক্ষিতে তুলনামূলক অগ্রাধিকারের প্রশ্নে অবশ্যই মৌলিক গবেষণার চেয়ে ফলিত এবং প্রয়োগের উপযোগী গবেষণার উপর বেশী জোর দিতে হবে। মূল বৈজ্ঞানিক গবেষণা যা প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে উন্নত ও শক্তিশালী হতে সাহায্য করবে তা সুষ্ঠুভাবে বাছাইকৃত হওয়া উচিৎ। আবার মৌলিক গবেষণা অসম্পূর্ণ ও অস্থায়ী পর্যায়ে গ্রহণ করা উচিৎ নয়। ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত উপাদান যোগানের প্রেক্ষিতেই এর প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা উচিৎ।

৩৬। প্রায় সকল খাতে, বিশেষ করে কৃষি, শিল্প, নির্মাণ, যোগাযোগ, শক্তি এবং জ্বালানীর মত উৎপাদন ও অবকাঠামো খাতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি প্রয়োজন রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বর্তমান পরিকল্পনা ধারার ব্যতিক্রম হিসাবে প্রতি খাতের জন্য প্রযুক্তিগত উন্নতির প্রয়োজনীয়তা প্রথমে সতর্কতার সাথে নির্ধারণ করতে হবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেই মোতাবেক গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতার পরিকল্পনা করতে হবে। প্রতিটি খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা অবশ্যই উক্ত খাতের সার্বিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

৩৭। আন্তঃশিল্পের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার লক্ষ্য। বিভিন্ন খাত অথবা শিল্পের মধ্যে আনুভূমিক এবং উলম্ব এই উভয় যোগসূত্রের চাহিদা অবশ্যই প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে মেটাতে হবে। সাধারণ উৎপন্ন দ্রব্য অথবা প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে প্ল্যান্ট বা সামগ্রির যন্ত্রীকিকরণ ও নির্মাণ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত গবেষণার দিক নির্দেশনার পরিবর্তন আনতে হবে। উন্নততর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য আন্তঃশিল্প চাহিদা পূরণের এটা একটি দিক হলেও, অর্থনৈতিক রূপান্তরের মাধ্যমে ক্রমশঃ অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত লাখ লাখ লোক যাতে জড়িত, সেই সনাতনী হস্ত শিল্পভিত্তিক স্বল্পব্যয়ের প্রযুক্তিসমূহের উন্নয়নের দিকেও সবিশেষ নজর রাখতে হবে।

৩৮। যেহেতু প্রযুক্তি আমদানির চাহিদা থেকে যাবে, তাই একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এবং যেখানে স্থানীয় প্রযুক্তি নেই এবং তার উন্নয়নও সম্ভব নয়, সেই সব ক্ষেত্রে প্রযুক্তি আমদানি সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার এগুলোর উপযোগীতা সতর্কভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

৩৯। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া। এই আঙ্গিকে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে অর্থনীতির উৎপাদন যোগ্যতা বাড়ানোর দিকে নির্দেশিত করতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধাপসমূহ, আর্থ-সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তনসমূহ এবং সম্পদ ব্যবহারের ধরণের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। স্বল্প মেয়াদী প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তৎপরতা উৎপাদন ও চাকরীর সুযোগ সৃষ্টির মত অর্থনীতির তাৎক্ষনিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হবে। যেখানে প্রয়োজন, সেখানে অত্যাবশ্যকীয় নতুন সুবিধার উন্নয়ন ঘটিয়ে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ব্যবহার করেই তা করতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা

৪০। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ও এর গবেষণা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে জাতীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি নীতিমালা জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন বিশেষ করে নিম্নোবর্ণিত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে:

(ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের উদ্দেশ্যসমূহ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার আন্তঃখাত ও খাতের আভ্যন্তরীণ অগ্রাধিকার নির্ধারণ, এবং একটা সময় সীমার মধ্যে অর্জণক্ষম ফলাফল অথবা লক্ষ্যমাত্রা নিরূপন;

(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি-মালা ও পদক্ষেপসমূহ;

(গ) স্থানীয় প্রযুক্তিসমূহের উন্নয়ন এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তিসমূহ বাছাই, অধিগ্রহণ, আত্তী-করণ ও ব্যবহারের জন্য নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ;

(ঘ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন এবং অব্যাহত তদারকী ও মূল্যায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়ন; এবং

(ঙ) প্রযুক্তিগত তথ্যের বিস্তার এবং পরীক্ষাগারসমূহ থেকে ক্ষেত্রসমূহে প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহারে কার্যকর পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং গবেষণা প্রক্রিয়ায় তা পুনঃ পরিবেশন করা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি নীতিগত সমর্থন

৪১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য একটি সার্বিক জাতীয় নীতির সমর্থন প্রয়োজন। এদের উৎপাদন ও চাকুরী, মূল্য সমর্থন, আমদানি পরিপূরণ ও সংরক্ষণ এবং স্থানীয় শিল্প ও প্রযুক্তি উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। এ ব্যাপারে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিমালা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নীতিমালা ও কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন দিবে।

সংগঠন

৪২। একাধিক সংগঠনের অস্তিত্ব এবং তাদের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অথবা বিভিন্ন সংগঠনের সাথে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের যোগসূত্র যুক্তিযুক্তকরণের জন্য এবং সমন্বিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিসমূহের বিস্তারের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম পন্থা প্রণয়নে পুরো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাঠামো

পর্যালোচনা করতে হবে। কাজের পুনরাবৃত্তি এবং সম্পদের অপচয় এড়ানোর জন্য বিভিন্ন সংগঠনের কাজের লক্ষ্য ও দায়িত্ব সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাউন্সিল এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগকে গোটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাংগঠনিক কাঠামো ও কাজকর্ম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের দুর্বলতা ও ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভবিষ্যত দিক নির্দেশনার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা ও পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন করতে হবে।

জনশক্তি উন্নয়ন

৪৩। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত কাজ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহে এর প্রয়োগের দায়িত্ব পালনের মত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি যোগানের উপর। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি জনশক্তি উন্নয়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে পেশা অথবা হাতের কাজ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ। এ ধরনের প্রশিক্ষণ দানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন খাতে প্রতিষ্ঠানসমূহ রয়েছে। জনশক্তি উন্নয়নের পরিকল্পনা ও নীতিমালাসমূহ এখনও জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা ও প্রক্রিয়ার সাথে যথাযথভাবে একত্রীভূত হয়নি বিধায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজনের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়নের সাথে সাথে বিভিন্ন খাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে একটি জনশক্তি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করা প্রয়োজন।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

৪৪। গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতা অব্যাহত রাখবে। গবেষণা ও উন্নয়ন সুবিধাদির সৃষ্টির জন্য এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কাজের জন্য তারা উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট থেকে আর্থিক বরাদ্দ পায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে অসমাপ্ত চলতি উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হবে। এছাড়াও কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় নতুন ক্ষেত্রে গবেষণা ও সমীক্ষা সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।

বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন

৪৫। পারমাণবিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বি এ ই সি তার গবেষণা অব্যাহত রাখবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সাভারে আণবিক শক্তি গবেষণা ইনষ্টিটিউট প্রকল্পের কাজ শেষ করা হবে (১৯৮৬/৮৭ সালে)। গবেষণা সুবিধাদির উন্নয়নের পাশাপাশি ইনষ্টিটিউটের পরীক্ষাগারসমূহে একযোগে গবেষণা চালানো হবে। বি এ ই সি রংপুর, বরিশাল ও খুলনার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলোর সংলগ্ন তিনটি পারমাণবিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করবে। এসব হাসপাতালে এ ধরনের কেন্দ্র এখন নেই। একইসংগে বি এ ই সি ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে বিদ্যমান তিনটি পারমাণবিক চিকিৎসা কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি উন্নয়নের একটি প্রকল্প হাতে নেবে। ঢাকায় আণবিক শক্তি কেন্দ্রের অত্যাবশ্যকীয় পুরাতন, যন্ত্রপাতি পরিবর্তনের একটি প্রকল্পও হাতে নেয়া হবে।

৪৬। ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম উত্তোলনের চলতি প্রকল্প তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে প্রকল্পটি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে এর বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং জরীপের তথ্য-সমূহ পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

৪৭। সাভারে আণবিক শক্তি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের কর্মচারীদের বাসস্থান সুবিধাদির আরও উন্নতি করা হবে এবং এই লক্ষ্যে স্বল্প ব্যয়ে গৃহ নির্মাণের একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।

বি সি এস আই আর

৪৮। বি সি এস আই আর এর পরীক্ষাগার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত ফলিত গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতা চালিয়ে যাবে। বিভিন্ন খাত অথবা ক্ষেত্রসমূহের প্রয়োজন এবং শিল্প বিষয়ক ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত সামগ্রী ও পদ্ধতির সম্ভাবনাপূর্ণ চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে গবেষণা কর্মসূচীগুলো প্রণয়ন করতে হবে। গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতা এবং পদ্ধতি ও উৎপাদিত সামগ্রী উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়ার জন্য বি সি এস আই আর ঢাকার পরীক্ষাগারে কেবলমাত্র বর্তমান যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন ও নতুন যন্ত্রপাতি সংগ্রহের একটি প্রকল্প হাতে নেবে।

স্পার্সো

৪৯। সমাপ্ত প্রকল্পের অধীনে স্পার্সো কর্মসূচী অব্যাহত রাখবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় হাতে নেয়া আঞ্চলিক দূরানুধাবন প্রকল্পের বাস্তবায়ন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প পুরোপুরি চালু হবার আগেই এর পরিচালনা, অর্থসরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ

৫০। জৈব প্রযুক্তি ও সমুদ্র বিদ্যা গবেষণা, এ দুটি বিষয়ের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ দুটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ হাতে নেবে।

৫১। কেবলমাত্র বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর জন্য একটি জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমী ভবন নির্মাণ করা হবে। তথ্যাদি সংরক্ষণ ও পাঠাগার সুবিধাদির উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যান্সডক (BANSDOC) ও জাতীয়-বিজ্ঞান পাঠাগারের জন্য বই ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করার একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হবে এবং প্রতিষ্ঠান দুটিকে একই সংগঠনে একত্রীভূত করা হবে।

৫২। একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর (এন এম এস টি) প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এ ব্যাপারে চালু প্রকল্পটি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

৫৩। কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার এবং বাংলাদেশ ষ্টাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউশন ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন (বি এস টি আই) নামে একটি প্রতিষ্ঠানে একত্রীভূত করা হয়েছে। বি এস টি আই উৎপাদিত পণ্য এবং দ্রব্য সামগ্রীর মান নির্ধারণ এবং নির্ধারিত মানসমূহের উন্নয়ন ও প্রয়োগ এবং দেশী এবং বিদেশী উভয় প্রকার উৎপাদিত পণ্য ও দ্রব্য সামগ্রীর মান পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকবে। পরীক্ষার সুবিধাদি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে না পারায় 'কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারের আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চলতি প্রকল্পটি প্রায় অবাস্তবায়িতই রয়ে গেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পরীক্ষা সংক্রান্ত সুবিধাদি উন্নয়নের সাথে সাথে মান নির্ধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট ভবন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি বিষয়ক বাস্তব সুবিধাদিরও উন্নয়ন সাধন করা হবে। পরীক্ষা এবং মান নির্ধারণ উভয় প্রকল্পের সুবিধাদির উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষাগারসমূহের চলতি প্রকল্পের আওতাধীন সুবিধাদি সমন্বিত হবে। একটি পৃথক প্রকল্পের অধীনে খুলনা এবং চট্টগ্রামে পরীক্ষাগারের দুটি নতুন শাখা স্থাপন করা হবে।

অর্থ বরাদ্দ

৫৪। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এস টি আর খাতে মোট অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ৬০'০০ কোটি টাকা (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে)। এর মধ্যে সাতটি চলতি প্রকল্পের জন্য ২৮'৬৬ কোটি টাকা নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। সংস্থা-ওয়ারী বরাদ্দ ১ নং সারণীতে দেয়া হলো :

সারণী ১

সংস্থা-ওয়ারী অর্থ বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

সংস্থা	অর্থ বরাদ্দ
১। বি এ ই সি	২৪'৯১
২। বি সি এস আই আর	৫'৭৭
৩। স্পার্সো	৮'৪০
৪। এন এম এস টি	৪'০০
৫। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ	৬'৫০
৬। বি এস টি আই	১০'৪২
মোট ..	৬০'০০

৫৫। এস টি আর খাতে উপরে বর্ণিত ৬০'০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছাড়াও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে এবং নিজ নিজ খাতের অধীনে এগুলোর জন্য অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৬

ঊনবিংশ অধ্যায়

জনশক্তি ও শ্রম

উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ অপরিহার্য বিশেষ করে বাংলাদেশের মত একটি দেশে যেখানে অন্যান্য সম্পদের ঘাটতি থাকলেও রয়েছে প্রচুর জনশক্তি এবং সেই জনশক্তিকে উৎপাদনশীল কাজে লাগানো যেতে পারে। যেহেতু শ্রমের মান ও দক্ষতা বহুলাংশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দ্বারা নির্ণীত হয়, সেহেতু উপযুক্ত শিক্ষা ও দক্ষতা, উন্নয়ন বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মসূচী গ্রহণের উপর সঠিক গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের জনশক্তি পরিস্থিতি মূলতঃ দুটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এখানে রয়েছে চরম বেকারত্ব ও আংশিক-বেকারত্বের সহাবস্থান ; এর একদিকে রয়েছে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি অন্যদিকে রয়েছে কুশলী দক্ষ লোকের অভাব। এই ধরণের পরিস্থিতিতে যেমন দেশীয় অর্থনীতি এবং বিদেশী চাকুরী বাজারে নিয়োগ সুবিধা বিস্তৃত করা যায় না তেমনি দক্ষতা এবং এর সর্বোচ্চ ব্যবহারের সুষম অগ্রগতিও নিশ্চিত করা যায় না। অথচ বিদেশের চাকুরী বাজার সম্পর্কীয় প্রশ্নটি দেশের আর্থিক লেন-দেন এর ভারসাম্য বজায় রাখার সংগেও জড়িত। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, শ্রম-কল্যাণ ও শ্রমিক সম্পর্কিত কর্মসূচীসমূহ শ্রমশক্তির কার্যকারীতা নির্ধারণ করে এবং তা শ্রম-উৎপাদনশীলতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত সাংগঠনিক পদ্ধতির সংগে শ্রম উৎপাদনশীলতা এবং এর অগ্রগতির কার্যকর মনিটরিং হচ্ছে হাতে নেয়া উন্নয়ন কর্মসূচীর মতই গুরুত্বপূর্ণ। জনশক্তি ও শ্রম খাতের কর্মসূচীতে সাধারণতঃ উপরোক্ত ক্ষেত্র ও তার অগ্রগতি সম্পর্কীয় বিষয়াদিই বিবৃত হয়েছে।

অতীত অগ্রগতি পর্যালোচনা

২। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরুর আগে দেশে একটি নৌ-কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ৫টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ছিল, যার বার্ষিক ২,৮৮০ জনকে দক্ষতাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণদানের ক্ষমতা ছিল। এছাড়া ছিল চারটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও যুব-চাকুরী বিনিয়োগ ইউনিট, মহিলা চাকুরীপ্রার্থিনীদের জন্য বিশেষ সুবিধা সম্বলিত দুটি শাখা অফিসসহ নয়টি চাকুরী বিনিয়োগ কেন্দ্র, চারটি শিল্প সম্পর্ক ইনষ্টিটিউট (আই-আরআই) এবং ২২টি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র। এসবের পাশাপাশি বছরে ২,১৮৪ জন শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন সাতটি নূতন টিটিসি স্থাপনের কাজও শুরু হয়েছিল। বিদ্যমান তিনটি শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণ কার্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও অব্যাহত ছিল। এর বাইরেও বেশ কিছু সেক্টর/কর্পোরেশনের উদ্যোগে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জরুরী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। দেশে ও বিদেশে কারু-শিল্পের দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং চাকুরী বিনিয়োগ সুবিধাদির সুব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও মনিটরিং এর লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) গঠন করা হয়।

৩। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা এবং স্বনিয়োগ, শ্রম কল্যাণ, শিল্প সম্পর্ক উন্নতকরণ এবং জনশক্তি গবেষণা ও মূল্যায়নের অগ্রগতি বিষয়ক কর্মসূচীসহ দেশের অভ্যান্তরে ও বিদেশে চাকুরীর সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্প্রসারণের দিকে খেয়াল রেখেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচীসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছিল।

৪। দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ১৯৮০—৮৫ সময়কালে সাতটি নতুন টিটিসি স্থাপন করা হয়। ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে সম্পূর্ণ চালু টিটিসির সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টিতে। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ভিটিআই) সমূহও অন্তর্ভুক্ত ছিল ভিটিআই সম্পর্কিত চারটি স্কীম এর আগে শিক্ষাখাতের সংগে সংযুক্ত ছিল যা জনশক্তি ও শ্রম

খাতে স্থানান্তরিত ও বাস্তবায়িত করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে দেশে চালু ভিটিআই-এর সংখ্যা ৪২টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫২টিতে দাঁড়ায়। অবশ্য পরে ১৯৮৪ সালে সরকারী নির্দেশে ভিটিআই-সমূহকে পুনরায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ১৯৮০ সালের স্থিতাবস্থা অনুসারে ৫টি টিটিসি এবং ৪২টি ভিটিআই এর বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দানের ক্ষমতা ছিল ৫,১৫৬ জনের। এর মধ্যে ২,৭১৩ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছে নিয়মিত কর্মসূচীর আওতায় এবং ২,৪৪৩ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচীর আওতায়। প্রাক্কলিত হিসেবে দেখা যায় যে ১৯৮৫ সালে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২২,২৯০ জনে, যার মধ্যে নিয়মিত কর্মসূচীর অধীনে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৮,৫৯০ জন এবং ১৩,৭০০ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছে ১২টি টিটিসি ও ৫২টি ভিটিআই নেটওয়ার্কের অধীনে বিশেষ কর্মসূচীর আওতায়। প্রকৃত প্রশিক্ষণ তৎপরতা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ১৯৮০—৮৫ ক্যালেণ্ডার বছরগুলোতে টিটিসি ও ভিটিআই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অধীনে নিয়মিত এবং বিশেষ ট্রেড প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রাক্কলিত হিসেবে সর্বমোট ৮৪,৭৬৪ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এই সময়ে ভিটিআই ও টিটিসিসমূহে প্রশিক্ষণের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক সৃষ্টির লক্ষ্যে বগুড়াতে একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (ভিটিটিআই) স্থাপন করা হয়।

৫। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতায় ঢাকায় আন্তর্জাতিক মর্যাদা সম্পন্ন ইসলামিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশ জমি এবং জমি উন্নয়নের জন্যে ব্যয় বহন করেছে।

৬। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিএমইটির উদ্যোগে শিক্ষানবীশ এবং চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও সরকার, আইডিএ এবং আইএলও যৌথ সুপারভাইজরী ট্রেনিং প্রজেক্টের আওতায় তিনটি সেক্টর কর্পোরেশনের প্রায় ১৬০০ জন সুপারভাইজরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৭। দেশের জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ দক্ষতা বৃদ্ধি নীতি তৈরীর লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ কাউন্সিল (এনসিএসডিটি) গঠন করা হয়েছে। আইডিএ সাহায্যভুক্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় এই কাউন্সিলের সদর দফতর এবং ৪টি আঞ্চলিক অফিস নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। সমগ্র টিটিসি নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী একই প্রকল্পের আওতা থেকে যোগান দেয়া হয়।

৮। চাকুরী বিনিয়োগ উন্নয়নের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি বিধানের লক্ষ্যে পরিকল্পনাকালে বর্তমানে চালু নয়টি চাকুরী বিনিময় কেন্দ্রকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে আরও জোরদার এবং ১২টি নতুন চাকুরী বিনিয়োগ জনশক্তি অফিস স্থাপন করা হয়। এভাবেই আগের ২১টি জেলা সদরে জেলা চাকুরী বিনিয়োগ ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) স্থাপন করে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। এই জেলা অফিসগুলো প্রাতিষ্ঠানিক চাকুরী বিনিয়োগ মণিটরিং এবং জনশক্তি ও চাকুরী বিষয়ে পরিসংখ্যান/তথ্য সংগ্রহ করবে যা দেশে ও বিদেশে চাকুরী বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হবে এবং একই সাথে চলতে থাকবে প্রচলিত চাকুরী রেজিষ্ট্রেশন ও চাকুরী বিনিয়োগ সেবা।

৯। মজুরী ভিত্তিক চাকুরীর সংস্থান বিষয়ক তৎপরতা ছাড়াও বিএমইটির উদ্যোগে স্ব-নিয়োগ বৃদ্ধির জন্যে সুসংগঠিত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কর্মসূচীতে রয়েছে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে যন্ত্রপাতি বিতরণ, দক্ষতা উন্নতকরণ প্রশিক্ষণ এবং বৃত্তিমূলক কাজকর্মের উপদেশ। গ্রামীণ ভূমিহীন গরীব ও দুঃস্থ মহিলাদের অকৃষি কাজে স্ব-নিয়োগের উপর বিশেষ নজর রেখে এই কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

১০। বাংলাদেশ থেকে পেশাগত দক্ষ, আধা-দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের বিদেশে চাকুরী, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ও উপসাগরীয় এলাকাসমূহে নিয়োগের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে বিএমইটি। ১৯৮০ সালে বিদেশে চাকুরী নিয়ে গেছে মোট ৩০,০৭৩ জন, ১৯৮১ সালে ৫৫,৭৮৭ জন, ১৯৮২ সালে ৬২,৮০৫ জন, ১৯৮৩ সালে ৫৯,৩১৬ জন এবং ১৯৮৪ সালে ৫৬,৭৫৪ জন। বিদেশে চাকুরীরত বাংলাদেশী নাগরিকদের পাঠানো টাকার পরিমাণ ছিল ১৯৮০ সালে ৫২৩.০০ কোটি, ১৯৮১ সালে ৬৮৬.০০ কোটি, ১৯৮২ সালে ১,১৭৩.০০ কোটি, ১৯৮৩ সালে ১,৫৬৮.০০ কোটি এবং ১৯৮৪ সালে ১,২৬৫.০০ কোটি টাকা। বিদেশে চাকুরী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাণিজ্যিকভিত্তিতে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এণ্ড সার্ভিসেস লিমিটেড নামে একটি সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

১১। শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে তিনটি নতুন শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পূর্বের ২২টি কেন্দ্রসহ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫টিতে। এর মধ্যে ২টি কেন্দ্র রয়েছে চা-শিল্প শ্রমিকদের জন্যে। এই কেন্দ্রগুলো শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা ও বিনোদনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ নজর রাখার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি প্রদান করে থাকে। টংগি, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনাতে রয়েছে চারটি শিল্প সম্পর্ক ইনষ্টিটিউট (আই আর আই)। এই সব কেন্দ্রে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর সংবদ্ধ উদ্বুদ্ধকরণ শিক্ষা কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে।

১২। গবেষণা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বাংলাদেশ জনশক্তি পরিকল্পনা কেন্দ্র (বিএমপিসি)। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশব্যাপী 'সংস্থাপন অনুসন্ধানসহ জনশক্তি ও চাকুরী বিনিয়োগের উপর গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা করা। এই কেন্দ্র জনশক্তি পরিকল্পনা কৌশল, চাকুরী বিনিয়োগ পরিকল্পনা, জনসংখ্যা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ওপর বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে। বিভিন্ন খাতে শ্রম উৎপাদনশীলতা পর্যালোচনা করার জন্যে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উৎপাদনশীলতা মণিটরিং-এর জন্যে একটি জাতীয় কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে।

১৩। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাখাত থেকে স্থানান্তরিত ৪টি ভিটিআই প্রকল্পসহ মোট ২৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এগুলোর জন্য বরাদ্দ করা হয় ১১১.৬০ কোটি টাকা (চলতি মূল্যে)। এই ২৯টি প্রকল্পের মধ্যে ১৯টির কাজ শেষ করা হয়, ৫টি বাদ দেয়া হয়, ২টি শিক্ষাখাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ও বাকী তিনটি তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থানান্তর করা হবে।

আর্থিক অগ্রগতি

১৪। বিগত বছরগুলোতে তহবিল ব্যবহারের দিক থেকে এই খাতে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই খাতে আর্থিক কর্ম সম্পাদনের একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি ১'এ প্রদান করা হলো:

সারণি ১

বিগত পরিকল্পনাকালে আর্থিক অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

পরিকল্পনা	পরিকল্পনায় বরাদ্দ	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বরাদ্দ	তহবিল ব্যবহার	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর শতকরা হার হিসেবে তহবিল ব্যবহার
১	২	৩	৪	৫
প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ..	১২.০০	৯.১৪	৫.০৩	৫৫%
দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ..	১৬.০০	১৬.৬২	৯.৬৮	৫৮%
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ..	১১১.৬০*	১০৭.৩৫**	৮৯.৮০**	৮৪%

* শিক্ষাখাত থেকে স্থানান্তরিত ৪টি ভিটিআই স্কীমের জন্যে বরাদ্দকৃত ২৩.৬০ কোটি টাকাসহ।

** চারটি ভিটিআই স্কীমের বরাদ্দ/ব্যবহারসহ

অতীত কৌশলাদী পর্যালোচনা

১৫। বিভিন্ন খাতে উৎপাদন তৎপরতা এবং স্ব-নিয়োগ ও বিদেশে নিয়োগের জন্যে দক্ষ কারিগরের প্রয়োজনীয়তার মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে জনশক্তি ও শ্রম খাতের কর্মসূচীতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই উপ-খাতের জন্যে সর্বোচ্চ ৮৭% বরাদ্দ করা হয়। টিটিসি স্থাপনের জন্যে হাতে নেয়া প্রকল্পগুলোর কাজ শেষ করে সত্বর সেগুলো চালু করার প্রতিও জোর দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্যে নতুন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির চেয়ে চালু ব্যবস্থাগুলোকেই আরো জোরদার ও সুসংহত করার প্রতি নজর দেয়া হয়। সংহবদ্ধ দক্ষতা প্রশিক্ষণ নীতির অগ্রগতি, সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে দক্ষতা সৃষ্টির তৎপরতার মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় সাধন, বৃত্তিমূলক ট্রেড কোর্সের প্রশিক্ষণকালীন সময়সীমার পুনর্বিন্যাস, মানগত শিক্ষা পাঠ্যসূচী ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের উন্নয়ন, বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতার জন্যে একই জাতীয় মান এবং কোন প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে বা অন্য যে কোন ব্যবস্থাতেই প্রশিক্ষণ হোক না কেন সবার ক্ষেত্রেই দক্ষতা পরীক্ষার মান উন্নয়ন প্রচেষ্টা ইত্যাদি ছিল এই উপ-খাতের গুরুত্বপূর্ণ দিক। অর্থনৈতিক তৎপরতা বিস্তারের সংগে সংগে দেশের চাকুরী বিনিয়োগের কৌশলগত ক্ষেত্র উন্নয়ন নেটওয়ার্ক বিকেন্দ্রিকরণের প্রশ্নটিও গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। চাকুরী বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলোকে এলাকার ঐতিহ্যগত ভূমিকার প্রতি লক্ষ্য রেখে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা ও উপযোগী বলে বিবেচনা করা হয়। স্ব-নিয়োগ ও বিদেশে চাকুরী বৃদ্ধির উপরও অতিরিক্ত জোর দেয়া হয়েছে, কারণ দেশের শুধুমাত্র মজুরী ভিত্তিক নিয়োগ দেশের মারাত্মক বেকার সমস্যাকে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি।

১৬। বিনিয়োগের ব্যাপারে কৌশলটি ছিল খুব বেশী সংখ্যক স্কীমে বিনিয়োগ করে সম্পদ না কমিয়ে পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থাসহ পরিকল্পনা মেয়াদে যত বেশী সম্ভব প্রকল্প শেষ করা ও পুরোদমে চালু করা। সে অনুসারে, অপেক্ষাকৃত স্বল্প অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কয়েকটি স্কীম হাতে নেয়া হয়নি। এরই পাশাপাশি, যে সব স্কীম বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলোর অধিকাংশই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সমাপ্ত হয়।

বাস্তবায়নের সমস্যাবলী ও দুর্বলতাসমূহ

১৭। প্রধানতঃ নির্মাণ সামগ্রী, শ্রম, ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান মূল্য এবং প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন, আনুষ্ঠানিকতা ও সম্পন্নকরণ ও বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণে প্রায় সব চালু স্কীমের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে বিশেষ করে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক ও কার্যক্রমগত দিকে ঘাটতি দেখা দেয়। পরিকল্পনা ও অনুমিত হিসেব প্রণয়ন, প্রকৃত নির্মাণ কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে বিলম্ব, সর্বোপরি কেন্দ্রীয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রগতি মণিটরিং ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন শ্লথ হয়ে পড়ে। বিপুল পরিমাণ সাহায্য প্রাপ্ত প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে সাহায্য প্রাপ্তি ও তা ব্যবহারে বিলম্বও এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব বিস্তার করে।

১৮। দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীতেও কয়েকটি সমস্যা দেখা দেয়। এগুলো হলোঃ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার না করা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের গুণগত মানের ক্ষেত্রে বড় ধরণের ব্যবধান এবং একদিকে দক্ষ কর্মীর স্বল্পতা, আবার অন্যদিকে কয়েক ধরণের কাজের দক্ষ লোকদের কর্মহীনতা। দেশে দক্ষতা উন্নয়নে একটি জাতীয় নীতি না থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ প্রয়োজনের বাস্তবানুগ অনুমানভিত্তিক একটি নীতি প্রণয়নের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৯। জাতীয় প্রয়োজনের উপযোগী একটি শ্রম বাজার তথ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের বিষয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্ব পেলেও জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয় (ডিইএমও) গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এসব ডিইএমও নিবন্ধন ও নিয়োগের ব্যবস্থার বিধিবদ্ধ কাজের পাশাপাশি জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ এবং কর্মসংস্থান মণিটরিং-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবে বলেও আশা করা হয়েছিল। স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান সম্পর্কে বলা যায়, শ্রম বাজারে কোন তাৎপর্যবহ ফলাফল বা প্রভাব ফেলার মত উল্লেখযোগ্য পরিধিতে কোন কর্মসূচী নেয়া হয়নি।

২০। বিভিন্ন পরিকল্পনা মেয়াদে স্থাপিত শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ কাজের দিক থেকে দুর্বল থেকে যায়। এগুলো শ্রমশক্তির উপর কোন কল্যাণমূলক প্রভাব ফেলতে পারেনি, বা ফেললেও তা ছিল অতি সামান্য। এসব কেন্দ্র কোন অর্থবহ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। এগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বিত করার জন্যও কোন কার্যকর ব্যবস্থা ছিলনা। একইভাবে একমাত্র ঢাকা ছাড়া অন্যান্য জায়গার আইআরআই সমূহে শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও জনশক্তির অভাব ছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

২১। ব্যাপকতর পরিধিতে এ খাতের উদ্দেশ্য হবে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের জনশক্তির চাহিদা পূরণে শ্রম শক্তির দক্ষতার মানোন্নয়ন। এ ছাড়াও শ্রমশক্তির কল্যাণ ও নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখা হবে।

দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শ্রম ও জনশক্তি খাতের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী হবে :

(১) দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় নীতি কাঠামোর মধ্যে প্রশিক্ষণ ক্ষমতা আরো ভালোভাবে ব্যবহারের সাথে সাথে কারুশিল্পে দক্ষতা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা;

(২) কারখানায় শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণের সুযোগ বিস্তৃত করা এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মতৎপরতায় এ ধরণের প্রশিক্ষণের আরো কার্যকরভাবে সমন্বয় বিধান;

(৩) জনশক্তি রফতানি তৎপরতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনদান জোরদার করা;

(৪) ব্যাপকতর পরিধিতে স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান তৎপরতা বৃদ্ধি ;

(৫) বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক তৎপরতা বিস্তৃত করার প্রেক্ষিতে দেশের কর্মসংস্থান সার্ভিস নেটওয়ার্ক পুর্নগঠন ও আরো শক্তিশালী করা ;

(৬) আরো কার্যকর উদ্বুদ্ধকরণ, শ্রমিকদের শিক্ষাদান ও শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন ;

(৭) কারখানা নিরাপত্তা ও পেশাগত স্বাস্থ্য পরিবেশ নিশ্চিতকরা ;

(৮) বিকলাংগ শ্রমিকদের বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন ব্যবস্থাসহ শ্রমিক কল্যাণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদার করা, এবং

(৯) জনশক্তি ও কর্মসংস্থান পরিস্থিতি সম্পর্কে বাস্তবানুগ কর্ম গবেষণা পরিচালনা এবং কর্মসংস্থান ও উৎপাদিক শক্তি মনিটরিং ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদী

২২। বাস্তবানুগ উদ্দেশ্য ও মুল্যায়নের ভিত্তিতে প্রণীতব্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি কাঠামো প্রণয়নের সময় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বেসরকারী কর্মসুচীসহ বিভিন্ন সংগঠনের আওতায় পরিচালিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমন্বয়সাধনের একটি ব্যবস্থাও অনুসরণ করা হবে। প্রশিক্ষণ, পাঠক্রম, প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও কোর্স বিষয়বস্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রহণ ও প্রচেষ্টায় এবং দক্ষতার মান, দক্ষতা পরীক্ষা ও সনদ প্রদান পদ্ধতিতে সংগতি স্থাপন এই সমন্বয় প্রক্রিয়ার গুরুত্বপুর্ণ দিক। প্রশিক্ষণের নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার বদলে প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মানোন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিরাজমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাদি তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা জোরদারসহ এগুলোর সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এজন্য শিল্পসমুহের সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সংযোগের প্রয়োজন। কর্মরত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং কারখানায় শিক্ষানবিশীর উপর আরো গুরুত্ব দেয়া হবে। প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থার উপরও গুরুত্ব দেয়া হবে। কোর্সের প্রয়োজন হিসেবে কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের শিল্পের সাথে সম্পর্কিত থাকার পন্থা নিরুপন করা প্রয়োজন। কারণ, শিল্প কারখানার সাথে সম্পর্ক ও সমন্বয়ের উপরও কোর্সের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রশিক্ষণ কাজের ব্যয় নির্বাহে নিয়োগকারীদের অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কারণ, এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে শিল্পসমুহই লাভবান হবে। পোষাক প্রস্তুত শিল্পের ক্রমবর্ধমান শ্রমিকদের জন্য কিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও এধরণের পরীক্ষামূলক উদ্যোগের ক্ষেত্র হতে পারে।

২৩। কর্মসংস্থান সার্ভিসের ক্ষেত্রে গ্রামীণ অনানুষ্ঠানিক খাতের প্রয়োজনোপযোগী শ্রম বাজার পরিচালনা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রস্তাব প্রণয়নের প্রয়োজন হবে। স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানে গোষ্ঠি তৎপরতা উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণকারী একটি বিকেন্দ্রীকৃত সাংগঠনিক নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিএমইটি'র ভূমিকা হবে শ্রম বাজার পরিচালনার জন্য কর্মী প্রশিক্ষণদান, সামগ্রিক ব্যবস্থা মূল্যায়ণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরী।

২৪। জনশক্তি রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সকল প্রকার উদ্যোগমূলক সমর্থন দেয়া হবে। সেই সাথে বিদেশ প্রত্যাগতদের উৎপাদনশীল ভূমিকা বৃদ্ধির বিষয়টির উপরও যথাযথ মনোযোগ দেয়া হবে। বিদেশ প্রত্যাগতকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সুশৃংখলভাবে সংগ্রহ করা হবে এবং বিদেশ প্রত্যাগতরা স্বনিয়োজিত কর্মসূচীর কোন পরামর্শ দিলে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

২৫। শ্রমিক কল্যাণের বিষয়টি বৃহত্তর প্রেক্ষিতেও উৎপাদনশীলতার পটভূমিতে দেখা হবে। এ জন্য শিল্প নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও বিকলাংগ শ্রমিকদের বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

২৬। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচীর আওতায় পড়বে:

(১) দক্ষতা উন্নয়ন।

(২) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।

(৩) শ্রমিক-কল্যাণ।

(৪) শিল্প নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য।

(৫) শিল্প সম্পর্ক।

(৬) সাংগঠনিক উন্নয়ন।

(৭) গবেষণা, মূল্যায়ন ও মনিটরিং।

২৭। উপরোক্ত কর্মসূচী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গৃহীত ও বর্তমানে চালু তিনটি এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ১৫টি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে। দক্ষতা উন্নয়নের ব্যাপক গুরুত্বের কারণে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে।

২৮। **দক্ষতা উন্নয়ন:** দক্ষতা উন্নয়নের বর্তমান কার্যক্রম শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের বিএমইটি'র দায়িত্বে পরিচালিত হয়। টিটিসিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদির পাশাপাশি স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানে বিশেষ দক্ষতা অর্জন কর্মসূচী ও তত্ত্বাবধায়ক পর্যায়ের প্রশিক্ষণসহ শিক্ষানবিশী, কারখানায় কর্মকালীন মানোন্নয়নের মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক পন্থায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীগুলো পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা খাতে ভিটিআইসমূহের মাধ্যমেও দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া বেসরকারী উদ্যোগেও কিছু প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

২৯। আইডিএ'র সহায়তাপ্রাপ্ত বর্তমানে চালু বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় খুলনা, বগুড়া, বরিশাল, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে পাঁচটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ, এনসিএসভিটির সদর দফতর ভবন এবং এর চারিটি আঞ্চলিক অফিস ভবন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম

বছরে সম্পন্ন হবে। এ প্রকল্পের আওতাতেই টিটিসিসমূহের প্রশিক্ষণ ও এনসিএসডিটি সচিবালয়ের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং বিএমইটির অধীনে সমগ্র দক্ষতা প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্কে প্রশিক্ষণ সামগ্রী সরবরাহ ও তা' উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকবে। ফরিদপুরে টিটিসি নির্মাণ কাজ ১৯৮৬ সালের জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। অতঃপর এ কেন্দ্রটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পুরোদমে পরিচালনা করতে পারবে।

৩০। সুযোগ সুবিধাসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে অধিকতর উৎপাদন ও উন্নততর মানের প্রশিক্ষণ বিস্তারের লক্ষ্যে বর্তমান ১১টি টিটিসি-কে আরো জোরদার ও পুর্নগঠিত করা হবে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে বহুমুখী বিষয় সংযোজিত করা হবে এবং তার মাধ্যমে অধিকতর সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের পরিধি সম্প্রসারণ করা হবে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের দক্ষতা বাড়াতে গিয়ে টিটিসি প্রশিক্ষকদের শিল্প কারখানার সংগে সংশ্লিষ্ট রাখার ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রয়োজন হিসেবে টিটিসিসমূহে উৎপাদনমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করা হবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসমূহে নতুন নতুন বিষয় চালু করতে এবং নবায়নের প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যাপক ও বাস্তবানুগ অনুমানের ভিত্তিতে ধাপে ধাপে কাজ শুরু করা প্রয়োজন। '৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশ মেরিণ টেকনোলজী ইনষ্টিটিউট (বিআইএমটি) স্থাপিত হয়। তখন এর নাম ছিল মেরিণ ডিজেল ট্রেনিং সেন্টার। এখানে নৌপ্রযুক্তি সম্পর্কে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থা আরো ভালভাবে ব্যবহার ও প্রশিক্ষণের উন্নততরমানের উদ্দেশ্যে এই ইনষ্টিটিউটকে আরো শক্তিশালী করা হবে। এ জন্য নতুন ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন প্রয়োজন হতে পারে।

৩১। পুরনো জেলা সদরসমূহে পাঁচটি নতুন টিটিসি স্থাপন করা হবে। এ জেলা সদরগুলোতে বর্তমানে দক্ষতা প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রশিক্ষণের চাহিদা সম্পর্কে বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এসব নতুন কেন্দ্রের প্রকৃত অবস্থান, বিষয়, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, ইত্যাদি নির্ধারণ করা হবে। বিএমইটি'র হিসাব অনুসারে বিদ্যমান ১২টি টিটিসি'র বার্ষিক প্রশিক্ষণ ক্ষমতা প্রায় ৪,০০০। পাঁচটি নতুন টিটিসি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চতুর্থবর্ষে মোটামুটিভাবে কাজ শুরু করবে এ হিসেবের ভিত্তিতে বিআইএমটিসহ ১৭টি টিটিসি'র বার্ষিক প্রশিক্ষণ ক্ষমতা ১৯৮৯/৯০ সালে প্রায় ৫,৫০০-এ দাঁড়াবে। বিএমইটি আরো মনে করে যে, এসব টিটিসিতে আনুষংগিক প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধি করে দুটি শিফ্‌ট চালু করা হলে এ সংখ্যা দ্বিগুণ করা যাবে।

৩২। টিটিসিসমূহ এবং বিআইএমটি-র প্রশিক্ষণার্থীদের একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মাসিক বৃত্তি দেয়া হবে। এই প্রকল্পের অধীনে ভিটিটিআইতে প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষণ ভাতা দেয়া হবে। এছাড়া, শিল্পকারখানায় তিন মাস সম্পর্কিত থেকে কাজ করার সময়ও ছাত্র প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি দেয়া হবে।

৩৩। সাম্প্রতিক জরীপসমূহে দেখা গেছে, সরকারী খাতের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে দক্ষ শ্রমিকের মোট চাহিদার এক পঞ্চমাংশের সামান্য কিছু বেশী পূরণ হয়। বেসরকারী খাতে প্রচুর সংখ্যক বেসরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে দক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিক আসছে। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের প্রশিক্ষণের সামগ্রিক মান খুবই নীচু। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা দেশ ও বিদেশের কর্মসংস্থান বাজারে কর্মসংস্থান সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিছু সংখ্যক নির্বাচিত বেসরকারী কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম সরবরাহ করে সহায়তা করা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানকে পরীক্ষা পদ্ধতি ও সনদ দানের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৩৪। দেশের সমন্বিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পরস্পর নির্ভরশীল অংশ হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষানবিশী ও কারখানায় প্রশিক্ষণ এবং ব্যাপক দক্ষতা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ দুয়েরই সমান মাত্রায় উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

৩৫। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাজারে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিকের স্বল্পতাকে আরো প্রকট করেছে। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে আমাদের শিল্পসমূহের উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতার ওপর। আধা দক্ষ শ্রমিক (জাতীয় দক্ষতা গ্রেড-৩) গড়ার জন্য টিটিসি এবং ভিটিআইসমূহে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও দক্ষ এবং অতি দক্ষ পর্যায়ে শ্রমিককে (যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতা গ্রেড-২ ও ১) উন্নীত করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। দক্ষতা স্থানান্তরের কারণে ঘাটতি পূরণে এবং শিল্পসমূহে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে, শিল্প শ্রমিকদের দক্ষতার মানোন্নয়নে শিক্ষানবিশী, কারখানায় ও মানোন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যাপক ভিত্তিক ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। দেশে সরকারী খাতের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব শ্রমিকদের মানোন্নয়নের জন্যে কারখানায় অর্থবহ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ বা অর্থ বরাদ্দ নেই। তাই বর্তমান পর্যায়ে দেশের শিল্প শ্রমিকদের সামগ্রিক দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষানবিশী ও কারখানায় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আয়োজন করা প্রয়োজন। এ ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যয় নির্বাহে অংশ নেয়ার এগিয়ে আসার জন্য শিল্পসমূহকে উদ্বুদ্ধকরণের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

৩৬। **কর্মসংস্থান বৃদ্ধিঃ** দেশের সামগ্রিক বেকার সমস্যার প্রেক্ষিতে এবং স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বৃদ্ধি ও গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক তৎপরতার ক্রমবর্ধমান বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনের নিরীখে কর্মসংস্থান সার্ভিস পুনর্গঠনের দরকার হয়ে পড়েছে। আরো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে ইপ্সিত ফলাফল যাতে আসে সেজন্যই এটা করতে হবে। বর্তমান ডিইএমওসমূহের কর্মী সংখ্যাসহ কাজের সব দিক বিবেচনা করার সাথে সাথে আরো বিচার-বিবেচনা করা দরকার যে বর্তমান অফিসগুলোই নব গঠিত জেলাসমূহের কর্মসংস্থান সার্ভিস চালাতে পারবে কিনা।

৩৭। প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক মানুষ শ্রম বাজারে প্রবেশ করছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান বিপুল সংখ্যক বেকারের সমস্যা মোকাবেলা করতে পারবে বলে আশা করা যায় না। তাই এ সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান হচ্ছে স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সে লক্ষ্যে সংগঠিতভাবে সুযোগ সৃষ্টি করা। দেশে স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে, যাদের কোন না কোন বিষয়ে দক্ষতা প্রশিক্ষণ রয়েছে, তাদের জন্য এ সম্ভাবনা অনেক। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিএমইটি'র উদ্যোগে শহর ও গ্রামাঞ্চলে পাইলট ভিত্তিক স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের একটি কর্মসূচী নেয়া হবে। এ কর্মসূচীর আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে কাজের সরঞ্জাম বিতরণ করা এবং বেকারদের নগদ অর্থ ঋণ দেয়া হবে। এই কর্মসূচীতে ২৫,০০০ লোক লাভবান হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত কর্মসূচীর আওতায় 'বিএমইটি' বেকারদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন করবে এবং এ কর্মসূচীর দর্শন ও কাজের বিষয়ে বিএমইটি, ডিইএমও, ব্যাংক ও স্থানীয় কর্মসংস্থান সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মীদেরও প্রশিক্ষণ দেবে। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরণের বহু সংগঠনেই স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান কর্মসূচী চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্যোগ ও সম্পদ ব্যবহারে দ্বৈততা এড়াতে একটি জাতীয় নীতি কাঠামোর আওতায় এ ধরণের সকল কাজকে সমন্বিত করার ব্যবস্থা অনুসরণ করা প্রয়োজন। বিএমইটি এই সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। ডিইএমও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা যাবে।

৩৮। এখনও জনশক্তি রপ্তানি জাতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সত্তরের দশকের শেষ ভাগ থেকে শুরু হয়ে আশির দশকের প্রথম ভাগ ধরে জনশক্তি রপ্তানি দেশের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী খাত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিদেশে কাজ নিয়ে যাওয়া লোকের সংখ্যা এবং তাদের পাঠানো টাকার পরিমাণও বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালে বিদেশ গমণকারীদের সংখ্যা ও তাদের পাঠানো টাকার পরিমাণ কমেছিল। তবে '৮৫ সালে সে অবস্থার উন্নতি দেখা যায়। এ ধারার অবনতি রোধে বিরাজমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদির মাধ্যমে সুসংগঠিতভাবে সম্ভাব্য সকল ধরণের সাহায্য সমর্থদান এবং পাশাপাশি বাজার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মতৎপরতা চালানো প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আরো কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা পালনে বিদেশে শ্রম এ্যাটাশেবৃন্দসহ বাংলাদেশ মিশনসমূহকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৩৯। জনশক্তি রপ্তানির ব্যাপারে অর্থনীতির স্থানীয় প্রয়োজনীতার প্রতি নির্ভুল নজর রাখতে হবে। দেশের অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করে একটি সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হবে। দেশে যেসব পেশাজীবীর প্রয়োজন রয়েছে, তাদের বিদেশ গমণে বিধি-নিষেধ আরোপ করা উচিত। জনশক্তি রপ্তানি প্রক্রিয়া অব্যাহত পর্যালোচনাধীন রাখতে দেশের সামগ্রিক কর্মসংস্থান মনিটরিং ব্যবস্থার এটি এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিদেশ গমণকারী শ্রমিকদের শিক্ষা প্রদানে বিএমইটির উদ্যোগে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জনশক্তি রপ্তানি গড় বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৬০,০০০ জন রাখা হয়েছে।

৪০। **শ্রমিক-কল্যাণঃ** শ্রমিক-কল্যাণের বিষয়টিকে উৎপাদনশীলতার সাথে সম্পর্কিত করা হবে এবং সে অনুসারে শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধার ব্যবস্থাকে শ্রমিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ উপাদান হিসেবে গণ্য করা হবে। বর্তমান ২৫টি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে কয়েকটি স্থাপনের কাজ পঞ্চাশের দশকে শুরু হয়েছিল। এগুলির অধিকাংশ কেন্দ্রের অবস্থা প্রায় ভংগুর। এগুলোর কার্যক্রম ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাও সন্তোষজনক নয়। ফলে এসব কেন্দ্র কোন অর্থবহ কল্যাণমূলক কাজ করতে পারছেনা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্তমান ২৫টি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রের ২১টি ও শ্রীমংগলে চা শিল্পের জন্য শ্রমিক-কল্যাণ বিভাগটিকে উন্নত, পুনর্গঠিত ও জোরদার করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪১। কল্যাণ ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভংগী উভয় দিক থেকেই বিকলাংগ শিল্প শ্রমিকদের পুনর্বাসন বাঞ্ছনীয়। বিকলাংগ শিল্প শ্রমিকরা যাতে সমাজের উপযুক্ত সদস্য হতে পারে, সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে পুনর্বাসনের একটি স্কীম নেয়া হবে।

৪২। **কারখানা নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যঃ** শিল্পায়নের অগ্রগতির সাথে সাথে পেশাগত ঝামেলাও বাড়ছে। এসব ঝামেলা থেকে কখনো কখনো পেশা ক্ষেত্রে দুর্ঘটনাও ঘটে। এ দুর্ঘটনার ফলে উৎপাদন সরঞ্জামেরই ক্ষতি ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস ছাড়া দক্ষ শ্রমিকদের জীবনহানি ঘটে। তাই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পেশাগত দুর্ঘটনা বিশ্লেষণ ও দুর্ঘটনা রোধ প্রশিক্ষণের একটি সমন্বিত কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ কেন্দ্র পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সমস্যাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করবে এবং কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণদানের উপযোগী হবে।

৪৩। **শিল্প সম্পর্কঃ** দেশে সুস্থ শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রম কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপনার প্রতিনিধি, শ্রমিক, তত্ত্বাবধায়ক ও শ্রমিক সংঘ নেতৃবৃন্দের জন্য শ্রম-সম্পর্ক ও শ্রম-প্রশাসন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প ক্ষেত্রে শান্তি ও উৎপাদনশীলতার জন্য এটি একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত তিনটি শিল্প সম্পর্ক ইনষ্টিটিউট (আই আর আই) ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততাও কাজ পরিচালনায় তহবিলের অপ্রতুলতার কারণেই পুরোপুরি চালু হতে পারেনি। এই সময়ে প্রধানতঃ ভবনসমূহের জীর্ণদশার কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবস্থার অবনতি ঘটে এবং কর্মীদের অলসতার কারণে এগুলোর ব্যবস্থাপনাও দুর্বলতর হয়ে পড়ে। '৬০' এর প্রথমভাগ থেকে টংগীস্থ আই আর আই' তে কাজ চলছে এবং এই ইনষ্টিটিউটটি আরো ব্যাপক ভিত্তিক প্রশিক্ষণ তৎপরতা কার্যকরভাবে আয়োজন করতে পারে। ইনষ্টিটিউটটিকে কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থা দ্বারা শক্তিশালী করলে শ্রম সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেশের গোটা প্রশিক্ষণ তৎপরতায় সমন্বয় সাধনের এটি কিছু ভূমিকা পালন করতে পারবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে

তিনটি আই আর আই উন্নত ও জোরদার করা হবে। আরেকটি প্রকল্পের আওতায় টংগীতে আই আর আই টিতে কিছু অতিরিক্ত সরঞ্জাম ও অন্যান্য ব্যবস্থা যোগান দিয়ে এটিকে জোরদার করা হবে।

৪৪। **সংগঠন উন্নয়ন এবং গবেষণা, মনিটরিং ও মূল্যায়নঃ** কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং দেশের শ্রম আইন বলবৎকরণ, তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করার জন্য যথাযথ পরিদর্শন সুবিধাদিসহ একটি উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো অপরিহার্য। কল-কারখানা, দোকান, প্রতিষ্ঠান, সড়ক পরিবহণ, চা বাগান, ডক, বন্দর, আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের শ্রম ঘন্টা, কাজের পরিবেশ, শ্রমিক-কল্যাণ, নিরাপত্তা, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, ন্যূনতম বেতন প্রদান, ম্যাটারনীটি বেনিফিট, কর্মীদের ক্ষতিপূরণ, কর্মসংস্থানের শর্তাবলী এবং শ্রমের মান সম্পর্কিত বিভিন্ন শ্রম আইন ও বিধি বলবৎকরণ ও প্রশাসনের দায়িত্বে থাকবে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন দফতর।

৪৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে অনেক কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১২,৫০০টি কারখানা রেজিষ্ট্রীকৃত। দেশের ৪৮টি পৌর এলাকায় অসংখ্য দোকান ও প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান কল-কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কাজ সম্পাদনের উপযোগী করে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসহ পরিদর্শন দফতরকে সংগঠিত করা হয়নি। পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথ পদ্ধতিতে পরিচালনার কাজ জোরদার করার জন্য কারখানার পরিদর্শন ও সংস্থাপন বিভাগটিকে আরো কিছু কর্মচারী এবং অন্যান্য ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে শক্তিশালী করা হবে।

৪৬। সরকারের শ্রম প্রশাসনের বিভিন্ন সাংগঠনিক ইউনিটসমূহ বিভিন্ন স্থানে বেশীর ভাগই ভাড়া করা বাড়ীতে অবস্থিত হওয়ায় শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থার দক্ষতা ও কার্যকারিতার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান পরিদর্শক, ন্যূনতম বেতন বোর্ড, আই ডব্লিউ টি এ বোর্ড এবং শ্রম উৎপাদনশীলতা মনিটরিংয়ের জাতীয় কেন্দ্রের কার্যালয়সমূহ একটি জায়গায় অবস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে শ্রম প্রশাসন যন্ত্রের জন্য একটি অফিস ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪৭। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও শ্রম উৎপাদনশীলতা বিষয়ে গবেষণা, মূল্যায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ জনশক্তি পরিকল্পনা কেন্দ্র (বিএমপিসি) এবং শ্রম উৎপাদনশীলতা মনিটরিং-এর জাতীয় কেন্দ্র (এনসিএমএলপি) গঠিত হয়। এ সংগঠন দু'টি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নিয়মিত ভিত্তিতে গবেষণা ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে। বিএমইটি নিজস্ব শাখাসমূহের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সুবিধা সম্পর্কে জরীপ ও সমীক্ষা চালাবে। এক্ষেত্রে বিএমইটি প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহে ডিইএমও'র সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক কাজে লাগাবে।

অর্থ বরাদ্দ

৪৮। উপরোক্ত কর্মসূচীসমূহে অর্থ যোগাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় জনশক্তি ও শ্রম খাতের জন্য ৯৩·০০ কোটি টাকা (১৯৮৪/৮৫ মূল্য হিসেবে) বরাদ্দ করা হয়েছে। মোট বরাদ্দের মধ্যে ১২·২০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে তিনটি স্থানান্তরিত প্রকল্পের জন্য। খাতওয়ারী কর্মসূচীসমূহের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ খাতের মোট বরাদ্দের প্রায় ৭২·৮০ শতাংশ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৪৯। মোট বরাদ্দের কর্মসূচী-ওয়ারী হিসাব নীচে দেয়া হলোঃ

সারণী ২

কর্মসূচীওয়ারী বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচী	বরাদ্দ	তুলনামূলক অংশ
১। দক্ষতা উন্নয়ন	৬৭.৭০	৭২.৮০%
২। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি	৭.০০	০৭.৫৩%
৩। শ্রমিক-কল্যাণ	৫.১০	০৫.৪৮%
৪। কারখানা নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য	৪.০০	০৪.৩০%
৫। শিল্প সম্পর্ক	১.৭০	০১.৮৩%
৬। সংগঠন উন্নয়ন ও গবেষণা, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন ..	৭.৫০	০৮.০৬%
মোট : ..	৯৩.০০	১০০.০০.

বিংশ অধ্যায়

জন প্রশাসন

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে জন প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরণের অর্থনীতিতে সরকারী খাত একদিকে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং অপরদিকে বেসরকারী খাতকে নিয়ন্ত্রণ ও উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের প্রচলিত নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলীর পরিধি বৃদ্ধির সংগে সংগে প্রশাসন ব্যবস্থা স্বাভাবিক কারণেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এতবেশী করে জড়িত হচ্ছে যে একে শুধুমাত্র আর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা মাত্র বলে বিবেচনা করা হয় না। প্রশাসনিক ব্যবস্থা এখন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার এক অত্যাবশ্যক উপকরণও বটে। তাই বিশেষতঃ প্রশাসন ও উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণের নীতির আলোকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন চাহিদার সংগে সংগতি রেখে বাংলাদেশের মত দেশকে অবশ্যই দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করতে হবে।

অতীত উন্নয়ন পর্যালোচনা

২। স্বাধীনতার পর দেশের তাৎপর্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অত্যন্ত কেন্দ্রায়িত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কথা সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। পরিকল্পনার বাস্তবায়নে দুটি বিষয়ে মৌলিক সমর্থন প্রত্যাশা করা হয়। একটি হল রাজনৈতিক অংগীকার ও অপরটি প্রশাসনিক সংস্কার ও দক্ষতা। বহু সংখ্যক শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনা সরকারের উপর ন্যস্ত হওয়ার কারণে উন্নয়ন প্রশাসনে সরকারের দায়িত্বও বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। চাকুরী পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংগঠিত প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই পরিকল্পনায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের আশু প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণদানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে পরিকল্পনায় সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী (COTA), জাতীয় লোক প্রশাসন ইনষ্টিটিউট (NIPA) ও ষ্টাফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (STI) এবং নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের অফিসারদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কাঠামো স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। পরিকল্পনায় সমন্বিত প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়নের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্যে একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ পরিষদ (NTC) গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

৩। প্রশাসনযন্ত্র যাতে দক্ষতার সাথে সরকারী কাজ সম্পাদন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রশাসন যন্ত্রকে আরো জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জন প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং পরিসংখ্যান ক্ষেত্রে উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে জন প্রশাসন একটি পৃথক উন্নয়ন খাত হিসেবে গড়ে উঠে। সরকার ও সরকারী সংস্থাগুলোর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ প্রশাসনিক ষ্টাফ কলেজ (BASC), জাতীয় লোক প্রশাসন ইনষ্টিটিউট (NIPA), সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী (COTA) এবং ষ্টাফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটস (STI) এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বিআইডিএস, বিবিএস ও কোটার গবেষণা ও উন্নয়ন সেলের আরো উন্নয়ন এবং সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ও মানব সম্পদ উন্নয়নবিষয়ক জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশনের (NFRHRD) মতো নতুন সংস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয়। মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোতে পরিকল্পনা সেল প্রতিষ্ঠা করে সেগুলোর পরিকল্পনা প্রণয়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।

৪। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি ব্যাপক ভিত্তিক পরিকল্পনা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও উভয় পরিকল্পনাকালেই প্রকল্প পরিকল্পনা জোরদার করার মাধ্যমে একটি স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রক্রিয়া উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেয়া হয়।

৫। জনপ্রশাসনকে গুরুত্ব দিয়ে পূর্ববর্তী সকল পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়নের জন্য অনেক বেশী ব্যাপক সুযোগ এনে দেয়।

৬। পরিকল্পনায় দেশের জন প্রশাসন ব্যবস্থার প্রধান প্রধান দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা হয়। এ সবের মধ্যে ছিল ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভাব, কর্মকর্তা কর্মচারী সংক্রান্ত অনুপযুক্ত নীতিমালা, পুরাতন ও অনুপযোগী আর্থিক ও হিসেব ব্যবস্থা এবং সংগঠনসমূহের অহেতুক বৃদ্ধি। এ ধরনের দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রশাসন যন্ত্রের পুনর্গঠন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সার্বিক প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ জন প্রশাসনের সামগ্রিক উন্নতির উপর গুরুত্ব প্রদান করে।

৭। একটি দক্ষ এবং কার্যকর জনসেবা প্রক্রিয়ার উন্নয়নকে মৌলিক লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে খাত-ওয়ারী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পেশাভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টিভংগীগত উন্নয়ন, কর্মচারী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পেশাগত পরিকল্পনার প্রচলন, কর্মমুখী উৎসাহদানের মাধ্যমে সরকারী চাকুরীর নৈতিকমান উন্নয়ন এবং জনপ্রশাসনে একটি আধুনিক ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতির উন্নয়ন ও কর্মচারী কল্যাণ সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনায় স্থানীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষণের ব্যাপারটিও বিবেচনা করা হয় এবং সে অনুসারে এসব সংস্থায় প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়। পরিকল্পনায় স্বীকার করা হয় যে, প্রশিক্ষণ নিজে নিজেই প্রশাসনের দক্ষতা বাড়াতে পারেনা। সে জন্য প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান বিকেন্দ্রীকরণের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের পদ্ধতি, বিধি ও কাঠামোর যুক্তিসংগতকরণ এবং হিসেব, বাজেট প্রণয়ন ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের সরলীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কর্মসূচী ও প্রধান প্রধান সাফল্য

৮। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী প্রশাসনের খাতওয়ারী কর্মসূচীর মধ্যে ছিল প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, সাংগঠনিক উন্নয়ন পদ্ধতি আধুনিকীকরণ, ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে কর্মসূচী প্রণয়নমুখী গবেষণা এবং কর্মচারী কল্যাণের মাধ্যমে কর্মচারী উদ্বুদ্ধকরণ।

৯। **প্রশিক্ষণ :** জনপ্রশাসন খাতের কর্মসূচীর আওতায় কর্মচারী প্রশিক্ষণের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয় যার জন্য এখাতের মোট উন্নয়ন বিনিয়োগের ৬৭% এজন্যে বরাদ্দ করা হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং সেই সংগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দক্ষতা যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন চাকুরীতে নিয়োগ করার দায়িত্ব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত হয়। একটি সমন্বিত জাতীয় নীতি কাঠামোর আওতায় সকল কর্মচারী প্রশিক্ষণ তৎপরতার সমন্বয় ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার আলোকে জাতীয় প্রশিক্ষণ পরিষদ গঠন করা হয় এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তাদের জন্যে একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি (এনটিপি) প্রণয়ন করা হয়। বিশেষ করে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তবে এ ধরনের উন্নয়ন তৎপরতা দ্বিতীয়

পরিকল্পনার পূর্বেই শুরু হয়ে পরিকল্পনাকালে অব্যাহত থাকে। এর মধ্যে একটি একক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটে সমন্বিত প্রশিক্ষণ সুবিধার উন্নয়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এভাবে COTA, (NIPA ও BASC এর সমন্বয়ে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (PATC) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৪ সালের এপ্রিল থেকে তা কাজ শুরু করে। জন প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্ব হল বিসিএস ক্যাডার এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহের নিম্ন পর্যায় থেকে উর্ধতন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া। সাবেক ষ্টাফ প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট-গুলোকে (STI) বিভিন্ন গ্রেডের জুনিয়র কর্মকর্তাসহ প্রধানতঃ অফিস ষ্টাফদের প্রশিক্ষণদানের জন্য আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RPATC) হিসেবে উন্নত করা হয়। পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন পর্যায়ের জুনিয়র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ষ্টাফদেরকে "কর্মচারী প্রশিক্ষণদাতাদের প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ ক্রাশ প্রোগ্রাম" নামে পরিচিত একটি প্রকল্পের অধীনে জেলা পর্যায়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১০। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ভিত্তি পর্যায়, মধ্যম পর্যায় ও উর্ধতন নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে মোট ৬০০০ অফিসারকে প্রশিক্ষণদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই লক্ষ্যমাত্রার স্থলে ৪১০০ অফিসারকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাদের মধ্যে ৯৪৮ জনকে BASC তে, ১,৪৯৩ জনকে NIPAতে এবং ১,৩১০ জনকে COTA তে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বাদবাকী ৭৮৯ জন অফিসারকে ১৯৮৪ এর এপ্রিল থেকে চালু PATCএর সমন্বিত প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার আওতায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই ৭৮৯ জন অফিসারের মধ্যে ৮১ জন ছিলেন উর্ধতন নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের, ৪৮৩ জন মধ্যম পর্যায়ের এবং ২২৫ জন নিয়োগোত্তর ফাউন্ডেশন পর্যায়ের। ষ্টাফ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে লক্ষ্যমাত্রা ছিল বিভাগীয় পর্যায়ে ৪টি ষ্টাফ প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (STI) এবং ১৭টি জেলা ষ্টাফ প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (DSTI) এর প্রতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মোট ২১,৭৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া। যাহোক চলতি পাঁচটি DSTI এর মাধ্যমেই কেবল ষ্টাফ প্রশিক্ষণের জরুরী কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়। ২১,৭৫০ জন লক্ষ্যমাত্রার স্থলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রশিক্ষণ লাভ করেন মোট ১৩,৬৯৩ জন (STI এর অধীনে ৭,৯৯৩ জন এবং এর DSTI অধীনে ৫,৭০০ জন)।

১১। উপরে উল্লেখিত কার্যক্রম ছাড়াও উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থার অফিসারদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী নামে একটি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনাকালে এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মোট ১,৪০০জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ ছাড়াও, এই একাডেমী অনুষদ উন্নয়নের জন্য আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর বন্দোবস্তসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়।

১২। **সাংগঠনিক উন্নয়ন ও পদ্ধতি উন্নয়নঃ** বহিঃসম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, আইএমইডি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে।

১৩। কারিগরি সহায়তা কর্মসূচী, বিদেশী সাহায্য সমন্বয় ও হিসাব বিধি ব্যবস্থার প্রোগ্রামিং ও মনিটরিংয়ের জন্য বহিঃসম্পদ বিভাগ কম্পিউটার ভিত্তিক সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন সাধন করে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর কর্ম মূল্যায়নের জন্য মান নির্ণায়ক নীতির সাথে সম্পর্কিত। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কম্পিউটারাইজড পদ্ধতির মাধ্যমে O&M এর উন্নয়ন এবং কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আধুনিকীকরণের জন্য একটি কর্মসূচী শুরু করে। এসব সুবিধার ক্ষেত্রগুলো এখনো পুরোপুরিভাবে চালু করা যায়নি এবং এর ফলে কর্মসূচীটি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অব্যাহত থাকবে। IMED কম্পিউটার সুবিধাসহ একটি প্রকল্প মনিটরিং ও উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন

করে। পরিসংখ্যান বিভাগ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার এবং মুদ্রণ সুবিধাসহ বিভিন্ন প্রকার পরিসংখ্যানগত সার্ভিস প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। একটি প্রকল্পের অধীনে BIDS এর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ক্ষমতারও উন্নয়ন সাধন করা হয়। BIDS তাঁর নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের কাজও শুরু করে, যা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরও চলতে থাকবে।

১৪। **গবেষণাঃ** যে সমস্ত সংস্থার ভৌত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে তাদের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক গবেষণা তৎপরতা চালানো হয়। সংস্থাগুলো হচ্ছে, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসমূহ, বিআইডিএস, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণার জন্য জাতীয় ফাউনডেশন। এছাড়াও, পরিকল্পনা কমিশনের একটি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তুতির ব্যাপারে কিছু সংখ্যক সমীক্ষা হাতে নেয়া হয়।

১৫। **কর্মচারী কল্যাণঃ** কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামের মতো অঞ্চলগুলোতে কমিউনিটি সেন্টারের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে।

প্রশাসনিক সংস্কার

১৬। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রশাসনে বেশ কিছু সংস্কার ও পুনর্গঠন সাধন করা হয়েছে। একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারী খাতের সংস্থাগুলোকে পুনর্গঠিত করা হয় এবং প্রশাসন, পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের জন্য নতুন নীতি ও পন্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়। অনুভূত চাহিদা পূরণে এবং পরিস্থিতির অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানোর স্বার্থে প্রারম্ভিক বছরগুলোতে কিছু কিছু সংস্কার কিংবা পরিবর্তন অস্থায়ী ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৭। গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং সেই সাথে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতি ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে এতগুলো বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে। উন্নয়ন বিষয়ক নীতি ও কর্মকৌশলের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময় থেকে অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের জন্য ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ সুযোগসহ বেসরকারীকরণের দিকে সরে যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নতুন শিল্পনীতি (NIP) মূলতঃ ছয়টি মৌলিক শিল্প ছাড়া সকল শিল্প ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের জন্য বিনিয়োগ সুবিধার দ্বার খুলে দেয়। বাকী ছয়টি মৌলিক শিল্প সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। বিপুল সংখ্যক শিল্প ইউনিটকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়, বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হয় এবং ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও বেসরকারী খাতের অধীনে আসে।

১৮। সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৭৭ সালে বেতন ও চাকুরী কমিশনের সুপারিশের পর একটি যুক্তিসংগত বেতন কাঠামো গ্রহণ করা হয় যাতে ২০০ বেতন স্কেলকে মাত্র ২১-এ নামিয়ে আনা হয় এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের মধ্যেকার ব্যবধান উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো হয়। ১৯৮১ সালে সকল প্রথম শ্রেণীর চাকুরীকে ২৮টি সাব-ক্যাডারে সমন্বিত করে গোটা সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা হয় এবং চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম-কানুনের প্রচলন করা হয়।

১৯। প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও সংস্কার কমিটির সুপারিশ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে ১৯৮২ সালে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয় এবং এসমস্ত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়নক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য NICAR বা প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও বিভিন্ন সরকারী সংস্থাও পুনর্গঠন করে তাদের কর্মচারী কাঠামোর যৌক্তিকরণ

করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে এসমস্ত পুনর্গঠন ছাড়াও সরকার উন্নয়ন প্রশাসনে একটি বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেন যার ফলে উন্নয়ন তৎপরতার বিশাল অংশ উপজেলা পর্যায়ে নতুন প্রশাসনিক কাঠামোতে হস্তান্তরিত হয়। ১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন তৎপরতা পরিচালনা ও জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টার সংগে সমন্বয় সাধনের জন্য নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রথার সূচনা ঘটে। থানাগুলোকে পর্যায়ক্রমে উপজেলায় উন্নীত করা হয় এবং নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার হিসেবে কাজ আরম্ভ করে এবং তাদের দায়িত্বে কতগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ন্যাস্ত হয় যা এতকাল জাতীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল। পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য একটি বিস্তারিত নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়। প্রশাসনের ধাপ কার্যতঃ ৫টি থেকে (কেন্দ্র, বিভাগ, জেলা, মহকুমা ও থানা) ৩টিতে (কেন্দ্র, জেলা ও উপজেলা) নেমে আসে। নতুন কাঠামোতে উপজেলা প্রশাসনকে অতিরিক্ত জনশক্তি, ভৌত সুবিধাদি এবং উন্নয়ন বাজেট থেকে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করে শক্তিশালী করে তোলা হয়।

২০। ১৯৮২ সাল থেকে অধিকতর বাস্তবভিত্তিক নীতিমালার ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। এসব নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয়গুলো হচ্ছে অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগ এবং অনেক বেশী সংখ্যক প্রকল্পের মধ্যে সম্পদ বন্টন করতে গিয়ে প্রকল্পপিছু অতি অল্প বরাদ্দের প্রবণতা প্রত্যাহার করা, অগ্রাধিকারহীন প্রকল্পগুলো গুটিয়ে ফেলা, পুরোপুরিভাবে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহের জন্য বার্ষিক কারিগরী সহায়তা কর্মসূচীর প্রস্তুতি এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নয় এমন প্রকল্পসমূহের সম্পদ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

প্রকল্প, অর্থ বরাদ্দ এবং ব্যবহার

২১। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জন প্রশাসন খাতে ৫৪টি প্রকল্প (১৪টি কারিগরি সাহায্য প্রকল্পসহ) হাতে নেয়া হয় এবং এগুলোর জন্য চলতি মূল্যে ৫৫˙০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। পরিকল্পনার উপরোক্ত বরাদ্দের তুলনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রকল্পগুলোর অনুকূলে মোট ৬৪˙১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই বরাদ্দের মধ্যে ৪৮˙৩ কোটি টাকা ব্যবহার হয়েছে বলে হিসাব করা হয়েছে (৭৫˙৪%)। ৫৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি বাদ দেয়া হয় এবং ৩৩টি প্রকল্প ১৯৮০-৮৫ এর মধ্যে সমাপ্ত করা হয়। আটটি কারিগরী সাহায্য প্রকল্পসহ অবশিষ্ট ১৭টি প্রকল্প প্রাক্কলিত ৬১˙৩ কোটি টাকা ব্যয়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

বাস্তবায়ন সমস্যা এবং দুর্বলতা

২২। বেশ কিছু সমস্যার দরুণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জন প্রশাসন খাতের উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়। অপেক্ষাকৃত নতুন এই খাতে বেশ কিছু সংখ্যক প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হলেও অনেক উদ্যোক্তা সংস্থা ও সংগঠনেরই প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতার অভাব ছিল। এর ফলে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়া ছাড়াও প্রকল্পের প্রস্তুতি ও প্রসেসের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিলম্বের সূচনা ঘটে। ফলে, পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ভৌত অগ্রগতি ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ব্যাহত হয়। এছাড়াও, সাহায্যপ্রাপ্ত কিছু সংখ্যক প্রকল্পের জন্য বিদেশী সাহায্যে আলোচনা ও লাইন-আপ করতে দেরী হওয়ার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়।

২৩। সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন এবং সেগুলোকে গতিশীল করার ব্যবস্থা নেয়া হলেও অন্তঃ ও আন্তঃ সাংগঠনিক এবং একই সংগঠনস্থ কর্মকাণ্ড, কর্মচারী কাঠামো ও কর্মচারী ব্যবস্থাপনা এবং জটিল প্রশাসনিক ও আর্থিক বিধি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের সমস্যাগুলো থেকেই যায়।

২৪। এই খাতে কর্ম তৎপরতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রশিক্ষণ যা মানগত ও গুণগত এই উভয় ক্ষেত্রেই সংকটের সম্মুখীন হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও বিষয়বস্তু অধিকাংশই ছিল অস্থায়ী ও অনির্দিষ্ট এবং সংস্থা কিংবা কর্মচারী কারোর চাহিদার সাথে এগুলোর সংগতি বিধান করা হয়নি। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার জন্য গঠিত একটি কমিটি লক্ষ্য করেন যে, ষ্টাফ প্রশিক্ষণ ইনিষ্টিটিউটগুলোতে পরিচালিত কোর্সের বিষয়গুলো ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত এবং সেগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্য কর্মসূচীর বিজ্ঞানসম্মত বন্টনের কোন আভাস ছিলনা। বিষয়গুলো বাস্তব দৃষ্টিভংগী নিয়ে তালিকাভুক্ত করা হয়নি এবং কোর্সের সাথেও এগুলো খুব ভালোভাবে সংগতিপূর্ণ নয়। প্রশিক্ষণও খুব অর্থপূর্ণ নয় এবং আলোচনার বিষয়গুলো ছিল বেশীরভাগই অস্পষ্ট। কমিটি PATC এর আওতায় বিভিন্ন ইনষ্টিটিউটগুলোতে বাস্তবভিত্তিক ও প্রয়োজনভিত্তিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণের সমতা বিধান এবং প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাদি উন্নয়নের সুপারিশ করেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এক লাখের উপর ষ্টাফ সদস্যের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু পরিকল্পনাকালে এই লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করে মাত্র ২১,৭৫০ জনে নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও সম্ভব হয়নি। ষ্টাফ প্রশিক্ষণের জন্য ভৌত সুবিধাদ উন্নয়নের অগ্রগতিও ছিল খুবই মন্থর। প্রশিক্ষণে পরিমাণগত ও গুণগত শূন্যতা থেকে যাওয়া ছাড়াও একটি পদ্ধতিগত ফিড-ব্যাক সিষ্টেমের মাধ্যমে প্রশিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার উপর উৎপাদন কিংবা সেবার দিক থেকে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের প্রভাব যাচাইয়ের কোন অনুসৃত পদ্ধতি ছিলনা বললেই চলে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

২৫। একটি দক্ষ জন প্রশাসন পদ্ধতির উন্নয়নই হবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই খাতের মৌলিক লক্ষ্য। জন প্রশাসনের উন্নয়ন একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া হওয়ায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পরিবর্তনশীল প্রয়োজন মেটানোর জন্য একে গতিশীল করার লক্ষ্যে এর বিভিন্ন দিকগুলোর উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রশাসনের দক্ষতা কতগুলো বিশেষ উপাদানের উপর নির্ভরশীল। যেমন (ক) পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা, (খ) কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও কাজের প্রতি তাঁদের অংগীকার, (গ) সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যপ্রণালী, (ঘ) বিভিন্ন সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ এবং (ঙ) তথ্য ব্যবস্থা ও উপাত্ত উপকরণ। উপরোক্ত কাঠামোর আওতায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্যে এই খাতের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী হবে নিম্নরূপ:

(১) সুসংহত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

(২) প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত সরকারের বর্তমান নীতির আলোকে একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি কাঠামোর আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও প্রণয়ন;

(৩) বিদেশী প্রশিক্ষণের উপর ক্রমশঃ নির্ভরশীলতা হ্রাসের প্রয়োজনীয়তার আলোকে প্রশিক্ষণকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে আরো সংগতিপর্ণ করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোর প্রশিক্ষণ প্রচেষ্টাকে সুসংহত করা;

(৪) জন প্রশাসনে তথ্য ও উপাত্ত-ভিত্তির উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় গবেষণা পরিচালনা এবং আধুনিক কর্মচারী ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি গড়ে তোলা;

(৫) সরকারী চাকুরীতে পেশাদারী মনোভাব ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞান উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দক্ষতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে কর্মচারী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পেশাগত পরিকল্পনার প্রবর্তন;

(৬) প্রশাসন ও উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার সাথে মিল রেখে সরকারী অফিস এবং সংস্থাগুলোর পদ্ধতি, কার্যপ্রণালী ও কাঠামোকে যুক্তিসংগতকরণ ;

(৭) হিসাব, বাজেট প্রণয়ন ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ কার্যপ্রণালীর সরলীকরণ ;

(৮) উন্নয়ন কর্মসূচী ও প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের স্থানীয় সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য সুচারুরূপে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সুবিধাদি সৃষ্টি ; এবং

(৯) সরকারী চাকুরীর নৈতিকমান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কর্মমুখী উৎসাহ প্রদান ও পর্যাপ্ত কর্মচারী কল্যাণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলাদি

২৬। একটি পদ্ধতি হিসেবে জন প্রশাসনের সার্বিক উন্নয়নের জন্য স্পষ্টতঃই বহুমুখী উদ্যোগ ও কর্মসূচীর প্রয়োজন। একদিকে সাংগঠনিক লক্ষ্য ও চাহিদা এবং অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে দেশে জন প্রশাসন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য জাতীয় লক্ষ্য ও নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কার্য প্রণালীর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে ব্যাপক ও বিবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন ইউনিটসহ কার্যনির্বাহী সংস্থাগুলোকে উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে তাদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। জন-প্রশাসন খাতের আওতায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখিত উন্নয়ন কর্মসূচীগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে প্রশিক্ষণ, সাংগঠনিক উন্নয়ন, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ও তথ্য পদ্ধতির উপর।

২৭। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোতে যে পুঁথিগত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে তার স্থলে চাকুরীসম্পর্কিত প্রশিক্ষণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলোর নিজস্ব কর্মচারী উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্মসূচী থাকবে এবং প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলো এধরণের পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করবে। এই ব্যবস্থা প্রচলিত প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোর গৃহীত ও তাদের দ্বারাই প্রণীত কর্মসূচী অনুসারে কোর্স পরিচালনার বর্তমান পদ্ধতির স্থলাভিষিক্ত হবে। বাইরের সাহায্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল না হয়ে নিজস্ব অনুষদ ও টীক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোর পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কেবলমাত্র প্রশিক্ষণের সুযোগসুবিধা সম্প্রসারণ না করে প্রশিক্ষণের গুণগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার দিকে খেয়াল রেখে প্রশিক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থার পূর্ণ ব্যবহার ও সুসংহত করণের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

২৮। সকল গবেষণা কর্মকাণ্ডকে কর্মমুখী এবং সুনির্দিষ্ট বিষয় ও সমস্যা-কেন্দ্রীক হতে হবে এবং তা থেকেই নীতিসমূহের দিক নির্দেশনা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বের হয়ে আসবে। গবেষণাকে প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোর স্বাভাবিক কার্যাবলী থেকে একটি আলাদা কাজ হিসেবে মনে করা উচিত হবে না। বরং গবেষণা হবে তাদের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডেরই একটি অংশ যা প্রশিক্ষণের উপকরণ যোগাবে এবং একইসংগে প্রশিক্ষণের মান ও কার্যকারিতা বাড়াবে। এটা নিশ্চিত করতে হবে যে উপযুক্ত সম্পদ বরাদ্দ এবং অগ্রাধিকারের বস্তুনিষ্ঠ প্রত্যয় ও একটি উপযোগী সময় কাঠামোসহ গবেষণা যথাযথভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হচ্ছে। একইসংগে নির্ধারিত দায় দায়িত্ব নিশ্চিত করে গবেষণা কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ও তদারকের একটি ব্যবস্থার উন্নয়নও প্রয়োজন। যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য ভৌত সুযোগসুবিধা ও সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোকে বিভিন্ন সরকারী সংগঠন ও সংস্থার গবেষণা কর্মকাণ্ডের সাথে আরও বেশী করে সম্পৃক্ত করতে হবে।

পরিকল্পনা ... গ্রন্থা... ... বাংলা...

তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

২৯। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জন প্রশাসন খাতের অগ্রগতি ও সম্পাদিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে ১৯৮৫—৯০ সময়ের জন্য এই খাতের কর্মসূচী প্রণয়ন করা হবে। ষ্টাফ উন্নয়ন, সংগঠনসমূহের কাঠামোগত কাজকর্মের উন্নয়ন, কর্মচারী প্রশাসন পদ্ধতিকে গতিশীল ও উন্নত করা, আন্তঃ ও অন্তবিভাগীয় যোগাযোগ, আর্থিক নিয়মকানুন, বিধি ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, গবেষনা ও সমীক্ষা, সার্বিক প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই খাতের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিধি নির্ধারণ করবে।

৩০। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই খাতের কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব কর্মসূচী নেয়া হবে সেগুলো পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

৩১। **প্রশিক্ষণ:** প্রশাসনিক দক্ষতার সার্বিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে চাকুরীতে দক্ষতা বাড়ানোর জন্যে প্রশিক্ষণের গুরুত্বের প্রতি নজর রেখে পেশাভিত্তিক ও ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয় উভয় প্রকার প্রশিক্ষণের কর্মসূচীগুলোকে এই খাতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৩২। সরকারী কর্মকর্তাদের জন্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রণীত প্রশিক্ষণ নীতি অনুসারে জাতীয় বেতন স্কেলের (NPS) ১-১০, ১১-১৩ এবং ১৪-১৯ গ্রেডের যথাক্রমে প্রায় ২৬,৫০০ ৩০,৪০০ এবং ২৬৫,২০০ জন সরকারী কর্মচারীকে চাকুরী-পূর্ব ও চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। জন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উভয় ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার সাথে সংগতি রেখে বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় এবং নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরোপুরিভাবে চালু করার জন্যে সেগুলোর কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ তৎপরতা আরো বাড়ানো হবে। সমন্বিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অধীনে PATC সকল বিসিএস ক্যাডার ও সাব-ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের তাঁদের নিয়োগ পরবর্তী ফাউণ্ডেশন ট্রেনিং প্রদান করবে। মধ্যম ও উর্দ্ধতন নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের অফিসারদের জন্যে PATC রিফ্রেশার্স কোর্স পরিচালনা করবে। সাভারস্থ PATC এর বিভিন্ন নির্মাণ কাজ ১৯৮৬ সালের জুন নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কেন্দ্রটির অন্যান্য সুবিধাদি ১৯৮৮ সালের জুন নাগাদ সম্পন্ন হবে। বর্তমান সুবিধাদি ও পরিচালনা শক্তি অনুসারে PATC এর বার্ষিক প্রাক্কলিত প্রশিক্ষণ ক্ষমতা ১১৬০ জন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে PATC এর আওতায় মোট ৫৮০০ জন অফিসারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩৩। ষ্টাফ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাক্তন ষ্টাফ প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোকে বৃহত্তর প্রশিক্ষণ দায়িত্ব দিয়ে চারটি আঞ্চলিক PATC তে পরিণত করা হবে। ঢাকাস্থ RPATC কে কোটা ভবনে স্থান দেয়া হয়েছে। রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনায় বাকী তিনটি RPATC-এর জন্যে ভবন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সুবিধা গড়ে তোলা হবে। এসব RPATC-এর দায়িত্ব হবে প্রধানতঃ অফিস/সেক্রেটা-রিয়েল ষ্টাফ, সেই সাথে মাঠ পর্যায়ের অফিসার এবং স্থানীয় সরকারসমূহের ষ্টাফ ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণদান। RPATC-গুলোর বার্ষিক নির্ধারিত প্রশিক্ষণ ক্ষমতার (৩,০৩০) ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উল্লেখিত চারটি কেন্দ্রের অধীনে মোট ১৫,১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে। দেখা গেছে যে সরকার ও অন্যান্য সরকারী খাতের সংস্থাগুলোর বিপুল সংখ্যক ষ্টাফকে প্রশাসনিক, আর্থিক ও অফিস ব্যবস্থাপনা অনুশীলনে দক্ষ করে তোলার এই বিরাট প্রয়োজন শুধুমাত্র RPATC-গুলোর নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার আওতায় পূরণ করা সম্ভব হয় না। এ পরিপ্রেক্ষিতে জরুরী (ক্র্যাশ প্রোগ্রাম) কর্মসূচীর ভিত্তিতে ষ্টাফ প্রশিক্ষণ এবং সেই সাথে পাঁচটি জেলা পর্যায়ের ষ্টাফ প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের (DSTI)

অধীনে টীক প্রশিক্ষণকারীদের প্রশিক্ষণ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে। চালু DSTI গুলো হিসাবে, আর্থিক অনুশীলন ও বিধি-ব্যবস্থা এবং অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপজেলা টীক সদস্যদের জন্য প্রতি বছর নয়টি করে একমাসের প্রশিক্ষণ কোর্সের পরিচালনার ব্যবস্থা করবে। অধিকন্তু টীক্ সদস্যের প্রশিক্ষণ ছাড়াও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের জন্যে অফিস ব্যবস্থাপনা, সেক্রেটারিয়েল বিধি-ব্যবস্থা, হিসেব ও আর্থিক নিয়ম ও অনুশীলন বিষয়ে সাত দিনের স্বল্পমেয়াদী কোর্সেরও ব্যবস্থা করা হবে। DSTI গুলোর আওতায় বার্ষিক প্রশিক্ষণ ক্ষমতা ধরা হয়েছে ২,০২৫ জনের। এই ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ১০,১২৫ জনকে টীক প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে। এর ফলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে চারটি RPATC এবং পাঁচটি DSTI-এর আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মোট সংখ্যা প্রায় ২৫,৩০০ জনে দাঁড়াবে।

৩৪। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (APD) উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থাগুলোর অফিসারদেরকে প্রশিক্ষণদান অব্যাহত রাখবে। একাডেমী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে তার প্রশিক্ষণ তৎপরতাকে বহুমুখী করবে। পরিকল্পনা ও আর্থিক ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা, ইউএনও এবং উপজেলা চেয়ারম্যানদের জন্য সাংগঠনিক নেতৃত্ব বিষয়ক ও গ্রাম উন্নয়নমুখী একটি নিয়মিত কোর্সের ব্যবস্থাও একাডেমী করবে। একাডেমী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং পরিকল্পনাবিদ ছাড়া অন্যান্য সরকারী অফিসারদের জন্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে ছয় মাসের একটি থ্রি-এন্ট্রি-মডুলার প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও হাতে নেবে। একাডেমী সরকারের মহিলা নির্বাহীদের জন্যে বিশেষ উন্নয়নমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও পরিচালনা করবে। পরিকল্পনাকালে একাডেমীর প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে খাত ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাবলীর উপর কেন্দ্রীভূত হবে। বাইরের অতিথি প্রভাষকদের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশঃ কমানোর জন্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে একাডেমীর নিজস্ব অনুষদ উন্নয়ন প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা হবে। বার্ষিক ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ দানের ক্ষমতা অনুসারে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে একাডেমীর আওতায় মোট ৩০০০ অফিসারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একাডেমীর ভৌত উন্নয়নের মধ্যে থাকবে অবশিষ্ট কিছু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা এবং হোস্টেল সুবিধার সম্প্রসারণ।

৩৫। উপরোক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র (BMDC), শিল্প সম্পর্ক ইনষ্টিটিউটগুলো (IRI), ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে। অন্যদিকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (RDA) স্থানীয় সরকারের জাতীয় ইনষ্টিটিউট (NILG), সমবায় কলেজ এবং উপজেলা পর্যায়ের কারিগরী প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রগুলো (TTDC) গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এবং সমবায় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। বিভিন্ন বিভাগের অধীন এই বিশেষ প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলো তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুসারে চাকুরীকালীনও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালিয়ে যাবে। একটি পৃথক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে চার্টার্ড অডিট ট্রেনিং একাডেমীর উন্নয়ন সাধন করা হবে।

৩৬। জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির রূপরেখার আওতায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশিক্ষণ চাহিদার উপর একটি জরীপ চালাবে এবং সরকারী খাতের জনশক্তি উন্নয়নের জন্যে পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

৩৭। **সাংগঠনিক উন্নয়নঃ** অর্থবিভাগ, বহিঃসম্পদ বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ এবং BIDS-এর কর্মসূচীগুলো সাংগঠনিক কার্যক্ষমতা উন্নয়নের সংগে সম্পর্কিত করা হবে। একটি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় ঢাকার আগারগাঁওয়ে নির্মীয়মান BIDS এর নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ ১৯৮৭-র জুনের মধ্যে শেষ হবে। নির্মাণাধীন এই ভবনে ইনষ্টিটিউট ইতিমধ্যে আংশিক কাজ-কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা পরিসংখ্যান বিভাগ BBS এর বিভিন্ন অফিসগুলোকে এক স্থানে আনার সুবিধা সৃষ্টির জন্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে একটি

ভবন নির্মাণ করা হবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে BBS অন্যান্য যে কর্মসূচীগুলো নেবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে গোষ্ঠী পর্যায়ের একটি পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়ন, গৃহস্থালী জরীপ কার্যক্রমের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশে এমন একটি পরিসংখ্যানগত মানচিত্র পদ্ধতির উন্নয়ন যা সকল ধরনের জরীপ ও শুমারী কর্মকাণ্ডের জন্যে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া পরিসংখ্যান কর্মকাণ্ড সার্বিকভাবে জোরদার করার জন্যে BBS কে অতিরিক্ত কিছু যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য পরিচালনাগত সমর্থন দেয়া হবে।

৩৮। একটি আধুনিক কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী সহায়তা কর্মসূচী, বৈদেশিক সাহায্যের হিসাব ও কার্য-প্রণালী, দায় পরিশোধ এবং সার্বিক সাহায্য সমন্বয় ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রোগ্রামিং, প্রসেসিং ও মনিটরিং ক্ষমতার উন্নয়নের সাথে বহিঃসম্পদ বিভাগের সাংগঠনিক উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কিত। এধরনের সাংগঠনিক ও কার্য-প্রণালীগত উন্নয়ন কারিগরী সহায়তাসহ বিদেশী সাহায্যের আরো দ্রুত ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আইএমইডি তার মনিটরিং দক্ষতা আরো বাড়া বার কাজ চালিয়ে যাবে।

৩৯। **কর্মচারী ব্যবস্থাপনাঃ** প্রশাসনে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধনের সুযোগ রয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তির ঘাটতি, অপরদিকে অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত জনশক্তি, প্রশাসনিক জনশক্তি সংক্রান্ত নীতিমালা এবং পেশাগত প্রশাসন ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং দুর্বলতা বর্তমান প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য। দেশে কর্মচারী ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হবে। চাকুরী, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং পরিবেশনের জন্যে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতির প্রবর্তন করা হবে। ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতির দীর্ঘমেয়াদী সুফল হবে বেসামরিক কর্মচারীদের নৈতিকবল ও কর্ম-ক্ষমতার উন্নয়ন, চলতি অপরিকল্পিত নিয়োগ নীতি এবং শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক পদোন্নতি প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হবে। একটি যুক্তিসংগত ও বিধিবদ্ধ কর্মচারী ম্যানুয়েল বর্তমানে পদ্ধতিগত সমন্বয়কার্য তদারকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সময় ও জনশক্তি কমিয়ে আনবে। ব্যবস্থাপনা সার্ভিস শাখার উন্নয়ন-এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গতি ও কার্যকারিতা এবং অন্তঃ ও আন্তঃ মন্ত্রণালয় যোগাযোগ উন্নত হবে। উন্নত প্রশাসনিক নিয়মকানুন ও কার্যপ্রণালী প্রবর্তন করলে এটি আরো সহজ হবে।

৪০। **গবেষণাঃ** দেশের জন প্রশাসন পদ্ধতি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব পদ্ধতির বিভিন্ন এলাকাগুলোর প্রকৃত সরলীকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন এবং এর জন্যে বর্তমান অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করা ও উন্নয়ন ব্যবস্থার সুপারিশের লক্ষ্যে ধারাবাহিক সমীক্ষা এবং গবেষণার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। বিভিন্ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসমূহ এ ধরনের সমীক্ষা ও গবেষণা চালাবে। পূর্বোল্লেখিত উপায়ে BIDS এর নিজস্ব ভবনের কাজ সম্পন্ন এবং এর গবেষণা ক্ষমতা বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় পরিচালনাগত সমর্থনের ব্যবস্থা করে BIDS এর ভৌত সুবিধাদির সৃষ্টি করতে হবে। অর্থবিভাগ একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর ব্যবস্থাপনা ও কাজকর্মের একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ণ কার্যক্রম গ্রহণ করবে। পরিকল্পনা কমিশনের সমীক্ষা ও উপদেষ্টা সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদির উপর কিছু সংখ্যক সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হবে।

৪১। **কর্মচারী কল্যাণঃ** উপরোল্লিখিত কর্মসূচীগুলো ছাড়াও সরকারী চাকুরেদের অধিকতর উদ্বুদ্ধকরণ এর লক্ষ্যে সতর্কতার সাথে পরিকল্পিত একটি উৎসাহদানমূলক পদ্ধতির কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংগঠনসমূহ কর্তৃক কর্মচারী কল্যাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হবে। কর্মচারী কল্যাণ কর্মসূচীর সাথে সরকারী কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতাকে অর্থবহভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যে ধীরে ধীরে প্রচেষ্টা চালানো হবে। কর্মচারীদের আবাসিক ব্যবস্থা ও কাজের অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হবে। কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের বর্তমান কল্যাণমূলক কর্মসূচীসমূহও অব্যাহত থাকবে।

অর্থ বরাদ্দ

৪২। জন প্রশাসন খাতের উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহে অর্থ সংস্থানের জন্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ৬৫ কোটি (১৯৮৪/৮৫ সালের মূল্যে) টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ, সাংগঠনিক উন্নয়ন ও পদ্ধতি উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীসমূহে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে। এই খাতের মোট অর্থ বরাদ্দের ৮৯% এ সব কর্মসূচীর চাহিদা মেটানোর জন্যে রাখা হয়েছে। এই খাতের কর্মসূচীভিত্তিক বরাদ্দ নীচে দেয়া হল:

সারণী ১

কর্মসূচী ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচী	অর্থ বরাদ্দ	মোট বরাদ্দের শতকরা হার
(১) প্রশিক্ষণ	৩৪.০৫	৫২.৩৮
(২) প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও পদ্ধতি উন্নয়ন	২৩.৮৯	৩৬.৭৫
(৩) কর্মচারী ব্যবস্থাপনা (পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট) ..	৪.০০	৬.১৬
(৪) গবেষণা	৩.০৬	৪.৭১
মোট: ..	৬৫.০০	১০০.০০

বাসমু: ৮৫/৮৬—৫৪৬০ই—২,৫০০—১৮-৮-৮৬